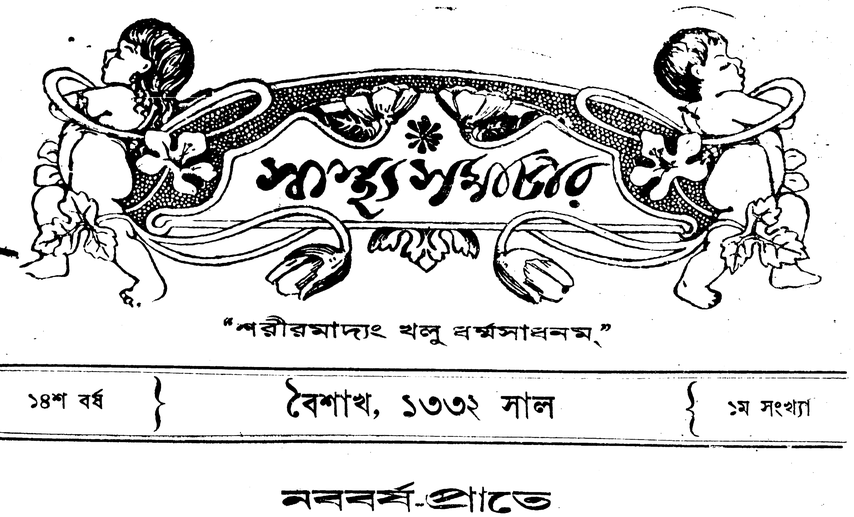

আলোকে ও আঁধারে

শুঁড়ীর দোকানে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় যুবক যখন মদ ক্রয় করেন, তখন তাঁহার প্রাণে আমোদের ঢেউ খেলে ; নেশার ঝোঁকে তিনি ভবিষ্যতের চিন্তা ভুলিয়া যান। কিন্তু পরিণামে তাঁহার ভাগ্যে দুর্নাম, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যনাশ, স্ত্রীর মলিন মুখ-চন্দ্রিমা ও কাতর অশ্রুজল সুনিশ্চিত !

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্য-সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩২ সাল { ১ম সংখ্যা

নববর্ষ-প্রাতে

তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ সন্ন্যাসীর মত ধুলি-ধুসরিত পিঙ্গল জটাজাল গগন-মণ্ডলে এলাইয়া ভৈরব বৈশাখ বিশ্ব-মানবের সভা-দ্বারে আসিয়া করাল পিনাকে ফুঁ দিয়া হাঁক্ পাড়িল—বর্ষ শেষ হইয়াছে, বসন্তের শোভা-সম্পদ সুখ-স্মৃতি স্বপ্নের সুরের মত বিলীন হইয়াছে ; নূতন বর্ষ—নূতন কর্ম্মক্ষেত্র—নূতন চিন্তাধারা তোমার সম্মুখে ! হে মানব, রৌদ্রতপ্ত মুখে রুদ্র উদ্যমের দিব্যজ্যোতি মাখিয়া সুপ্ত প্রাণকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চল ; নর্ম্মেয় মায়া ত্যাগ করিয়া, ঘর্ম্মধারার ক্লান্তি-কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া, নূতন বর্ম্ম আঁটিয়া কর্ম্ম-আহবে ছুটিয়া চল। নশ্বর জীবনের গণিত কয়টি বৎসরের মধ্যে পরিপূর্ণ একটি বৎসর গত হইল ; তোমার দেহ-মনের বার্দ্ধক্য আর এক বৎসর বাড়িয়া গেল। হে জীবন-পথের যাত্রী, তোমার পাথেয়ের হিসাব-নিকাশ কর, তোমার জীবন-শতদলে কতখানি মধু আছে—একবার পরিমাপ করিয়া লও। ব্যবসায়ী আজ যেমন তাহার দোকানে বৎসর-সঞ্চিত ধুলা-বালি ঝাড়িয়া পুরাতন আবর্জ্জনাকে দূর করিয়া, নূতন আসবাবে ঘর ভরিয়া দ্বারে ঘটাম্র- রাখিয়া মঙ্গলের আবাহন করিতেছে ও তাহার পুঞ্জিত পণ্য-দ্রব্যাদির হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করি- আজ তোমার জীবনের প্রত্যেক বিভাগটির জমা-মজুদের ফিরিস্তি করিয়া, কুচি- বহিষ্কার করিয়া, নূতন সঙ্কল্প—নূতন শক্তি—নূতন প্রেমে দেহ-মন আ- আদর-অভ্যর্থনায় সঞ্জীবিত পুলকিত হইয়া উঠ। হে যৌবনের ভিখা

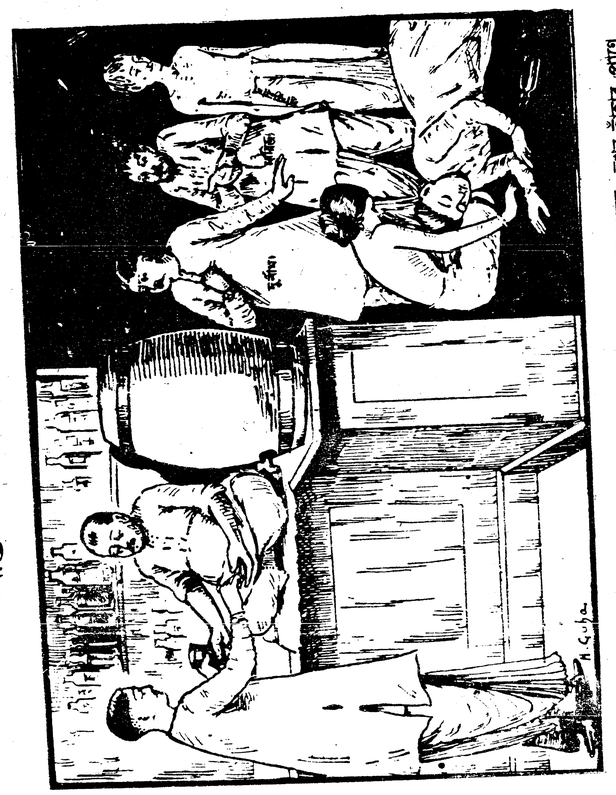

অভিলাষী, চাহিয়া দেখ—প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি তোমার প্রাণের দ্বারে উপনীত—বৈশাখের ক্ষুধাতুর বুকের উপর অরুণ-রঙ্গা চরণ ফেলিয়া কে তন্দ্রা ভাঙ্গা প্রাণ মাতান পঞ্চমুখী শঙ্খ বাজাইয়া স্বর্গ-দূতের মত দিব্য প্রভায় নামিয়া আসিয়াছে! সে নূতন বর্ষ—নূতন বর্ষ!—আজ তার বন্দনা-গীতি গাও!

আজ বৈশাখের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই নববর্ষ প্রাতে আমাদিগকেও পাঠকগণকে বলিতে হইতেছে—আপনার জীবনের হিসাব নিকাশ লও ভাই, কোন্‌টা বেশী—কোনটা কম আছে তত্ত্ব লইয়া দেখ;—ইহাই আমাদের নববর্ষ প্রবেশের প্রথম ও পরম উপদেশ। প্রথমে দেখ—নিজের দেহকে; দেখ তোমার শরীরের ওজন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িল কি কমিল, তোমার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক ভাবে চলিতেছে কি না, তোমার হজম-শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত আছে কি না, তোমার দাঁতগুলি পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় উজ্জ্বল আছে কি না, তোমার চুল-গুলি যথাপূর্ব্ব ঘন সন্নিবদ্ধ, প্রচুর ও ঘোর মসীময় আছে কি না, তোমার বহিস্করণ যন্ত্রগুলি পূর্ব্বের ন্যায় অনুগত আছে কি না, কোন নূতন ব্যাধির বীজ তোমার শরীরের মধ্যে উপ্ত হইবার অবসর পাইয়াছে কি না, ইত্যাদি। তারপর তোমার মানস-ভাণ্ডারের দরজা-জানালাগুলি একবার এই নব রবি-কিরণে খুলিয়া দেখ—খুঁজিয়া পাও কি না তাহার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুকোমল বৃত্তিগুলি; দেখ তাহার মধ্যে আলস্য, কর্ম্মবিমুখতা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, দ্বন্দভাব, অবৈধ আসক্তি, আস্তেয় প্রভৃতি আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে কি না; একবার হিসাব করিয়া দেখ—তোমার পাকা আমিত্বটিকে কতখানি প্রসারিত করিতে পারিয়াছ, তোমার স্মৃতিশক্তি, ধৃতিশক্তি, জ্ঞানার্জ্জন-শক্তি, সহানুভূতি-শক্তি, কর্ম্মের-শক্তি, জীবনী-শক্তি কতটুকু কমবেশী হইয়াছে!

তারপর একবার ঘরের পানে তাকাইয়া দেখ,—তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার স্বাস্থ্যের দিকে নজর কর; তাহাদের মানসিক বৃত্তি-প্রবণতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ—তোমার জীবনের সহিত একত্ব বজায় রাখিয়া তাহারা চলিতে পারিতেছে কি না। কাণ পাতিয়া শোন—তাহাদের জীবনের কোন্ তারটি বেসুরো বাজিতেছে; একবার সিদ্ধান্ত করিয়া দেখ—তাহাদের সঙ্গীতকে তোমার মনোমত সুরে গঠিত করিয়া দিতে পারিবে কি না। অভ্যাস একবার শিকড় গাড়িয়া ফেলিলে, তাহাকে উপড়ান দায় হইয়া উঠে; আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি যে, প্রাণের দ্বারে বারংবার আঘাত করিয়াও আমাদের বর্ষিয়ান্ আত্মীয়দের কদভ্যাসের মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হই নাই মিথ্যার মোহে তাঁহারা এমনি মজিয়া আছেন, যে সত্যের আলোক দেখিয়া তাঁহারা চক্ষু মুদিয়া ফেলেন।

স্বাস্থ্যনীতি, সদাচার, মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সুসাধ্য পন্থাগুলি বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয় কর্ত্তব্য। Child is the father of man—শিশুকাল হইতেই মাতা-পিতা-শিক্ষক-সঙ্গী-প্রতিবাসী পরিপার্শ্বের নিকট হইতে ও মধ্য দিয়া শিশুর জীবনকে ভবিষ্যতের আদর্শানুযায়ী গঠন করি ...বে; তবেই সে শিক্ষা সত্য, কার্য্যকরী ও সফল হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি আদি ...র দেশের শিক্ষক-শ্রেণীর শতকরা নিরানব্বই জনের নাই। পিতা-মাতার জীব ...কোলে গঠিত। সুতরাং জাতিকে সবল, সুস্থ, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশী ...াদের এই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সেও জীবনের গতিকে পরিবর্ত্তিত করি

একটি উজ্জ্বল আদর্শের সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্য-বংশীয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বাড়ীর মধ্যে মাতা পিতা ও বাড়ীর বাহিরে শিক্ষকের প্রভাব শিশুর জীবন-নিয়ন্ত্রনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং কাজে কাজেই পাঠশালার শিক্ষক হইতে কলেজের প্রফেসর পর্য্যন্ত—সকলেরই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া অন্যান্য পুস্তকের অধ্যাপনার অবসরে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দানের কর্ত্তব্যটি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা চাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"বংশরক্ষার বেলা তুমি আছ, আর মানুষ করবে কি ও পাড়ার বামুন?" মানুষ করা মানে আমরা বুঝি—দুটি খাইতে পরিতে দেওয়া এবং নিয়মিত স্কুলের মাহিনা যোগাইয়া যাওয়া। কিন্তু এই ধারণাকে আমাদের বদল করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষাও "মানুষ করা" জিনিষটা যে আরও গুরু দায়ীত্বের, সে সত্যকে আজ নূতন বৎসরের রবি-করোজ্বল শুভ্র প্রভাতে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

নিজের ও নিজ সংসারের হিসাব নিকাশ লইয়া অবশেষে নিজের পাড়া প্রতিবাসী ও নিজের সমাজের—এবং সামর্থ্য ও অবসর থাকিলে নিজের জাতির একটা হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজের মধ্যে বাস করিয়া সমাজকে বাদ দিয়া আপনার স্বাস্থ্য-শক্তি অর্জ্জন করা চলে না। আমি ভাল খাইব—ভাল পরিব—ভাল আচার গ্রহণ করিব—ভাল স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিব, আর আমার পাড়া-প্রতিবাসী অস্বাস্থ্যের পঙ্ক-পল্বলে হাজিয়া মজিয়া থাকুক—তা'তে আমার কি?—এ ধারণা যাঁহারা করেন, তাঁহারা সংসারে স্বাস্থ্য ও সুখ দুটিই ভোগ করিবার স্থায়ী অধিকারী হন্ না। আমি ও আমার পুত্র-কন্যা সুখে থাকিল বটে, কিন্তু আমার পাড়া প্রতিবাসীগণ যখন দুষ্পাচ্য ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও কর্দ্দমাক্ত পানীয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের রোগ-প্রতিষেধ-শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া, আমাদের স্থূল-দৃষ্টির-অগোচরে-ভ্রাম্যমান্ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মারাত্মক ব্যাধি-জীবাণুগুলির সমৃদ্ধি-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিল, যখন তাহারা কলেরা, বসন্ত, আমাশা বা ম্যালেরিয়ায় একে একে মরিতে লাগিল, তখন আমি কি আমার পুত্র-কন্যাকে ভাল খাওয়াইয়া পরাইয়াও সুস্থ রাখিতে সমর্থ হইব? বাটীর আবর্জ্জনা পরের দরজায় ফেলিয়া দিয়া মনে করিলাম—রোগ হইতে মুক্ত থাকিলাম,—এ ধারণাকে দূর করিতে হইবে। আমাকে বাঁচাইতে হইলে, আমার সমাজকেও বাঁচাইতে হইবে; এই সত্য-প্রতীতিকে ভিত্তি করিয়াই প্রাচীনকালে 'নর নারায়ণের সেবা-ভাব' ও আধুনিককালে 'সমাজতন্ত্রতা' বা 'সাম্যবাদের' উদ্ভব হইয়াছে! নিজের যেটুকু বেশী আছে, লোহার সিন্দুকে তাহাকে বন্ধ করিয়া মরিচা ধরিতে না দিয়া, সমাজের অভাবগ্রস্ত প্রাণীকে তাহা বিলাইয়া দিতে হইবে; নিজের স্বাস্থ্য, শক্তি ও চিকিৎসা-জ্ঞান থাকিলে, পরের আধি ব্যাধিতে সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে আত্মদান করিতে হইবে; অপরে যদি কদাচারী ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালনে উদাসীন হয়, তাহা হইলে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে চাহিয়াও তাহাদিগকে সুপথে আনিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সেবা-ব্রত অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই। বিদেশের মাটিতে গিয়া বীর বিবেক সিংহের গর্জ্জনে একদিন চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "F..., my boys, feel. Love for the poor, the down-trodden even unto death—this is our motto. I am ready to go to hundred thousand hells to serve others. Let my life be a sacrifice at the alter of humanity."

এই সেবার ভাবকে আজ দেশের প্রত্যেক নির্জ্জীব প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া দিতে হইবে। এই সেবার মধ্য দিয়া আমাদের দেবতাগণ বড় হইয়া গিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বড় হইয়াছেন, আমাদিগকেও বড় হইতে হইবে। এজন্য দেশের মধ্যে একদল সেবক প্রয়োজন। ভগবান বুদ্ধ, ঈশা, মুশা—নিজেদের উপলব্ধ সত্যে দীক্ষিত করিয়া, মুষ্টিমেয় আপন-ভোলা পরার্থপর একনিষ্ঠ সেবক দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে জগতের মধ্যে প্রচারিত ও সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ম্যাটিসিনি, মার্টিন লুথার, গ্যারিবল্‌ডি প্রভৃতি জগতবরেণ্য কর্ম্মবীরগণ সকলেই সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের কাছে একদল সেবক ভিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহারা অনেকেই চাহিয়াছিলেন—"বেশী নয়, একশ' আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে!"

দেশের লোকের মধ্যে স্বাস্থ্যধর্ম্ম-মন্ত্র ছড়াইতে, গো-পালন ও কৃষির উন্নতির দ্বারা দেশের দুস্থ নর-নারায়ণকে বাঁচার পথে দাঁড় করাইয়া দিতে এবং ব্যাধি, অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্য দিয়া দেশের মুক্তিকে অভিনন্দন করিয়া আনিতে—"স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ" একটি আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আগামী আশ্বিনের মধ্যেই আনুক্রমণিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া যাইবার কথা। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে, ভাল বীজ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে, এখন চাই পরগতপ্রাণ, সত্য-মুক্তি-কাম, আত্ম-নির্ভরশীল, নির্ভীক, নির্বন্ধন কয়েকটি কর্ম্মী—আন্‌কোরা একাগ্র লাঙ্গলের ফাল্ লইয়া। পাঁচ বৎসরে না হোক্, দশ বৎসরে না হোক্, এক যুগে না হোক্, দুই যুগে না হোক্, বর্ত্তমানে না হোক্,—দশ যুগ পরে, একশ' বৎসর পরে—ভবিষ্যৎ কালে জগতের সর্ব্বজাতি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিবে—বাংলায় যথার্থই সোনা ফলে। আমরা কাহারো দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিব না—চাঁদার খাতায় নাম সহি না করিলে রক্তচক্ষু দেখাইব না—আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ মানিফেষ্টো খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে জাহির করিবার স্পর্দ্ধা রাখিব না। নীরব ব্যাকুলতায় যদি কিছু চাই ত সে প্রাজ্ঞের উপদেশ, প্রাচীনের আশীর্ব্বাদ, সাধারণের সহানুভূতি এবং সুহৃদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা! আর চাই—কয়েকটি খাঁটি বাংলার মাটিভক্ত সোনার চাঁদ, যাদের বুক লোহার পাতে মোড়া, প্রাণ যাদের জগতজোড়া, মুক্তির উৎসাহে যারা গৃহ-ছাড়া, কাজের আনন্দে যারা আত্মহারা। সময় হইলেই ডাক্ পড়িবে। ইতি—১লা বৈশাখ, ১৩৩২।

> দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হবে—এটা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির পরে বিশ্বাস; বাস্তবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়।—রবীন্দ্রনাথ।

হিষ্টিরিয়া

[ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, এম্ বি, এম্-আর-এ-এস্]

পুরাকালে সকলের বিশ্বাস ছিল যে, হিষ্টিরিয়া রোগ কেবল স্ত্রীলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জরায়ু ও ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন বশতঃ ইহা উদ্ভূত হয়। সেই জন্য হিষ্টিরিয়া কথাটি "জরায়ু" অর্থ বিশিষ্ট একটি মৌলিক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মত এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ, কখন কখন বালকদেরও এই রোগ হয়, এবং অধিক বয়সে পুরুষদেরও এই রোগ হইয়াছে, এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশে হিষ্টিরিয়া রোগ পূর্ব্বকালে ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার যতই আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইতেছে, ততই এই রোগ আমাদের স্ত্রীলোকদের ভিতর অধিক পরিমানে দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশে ইহার প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং কলিকাতা মহানগরীতে উক্ত রোগগ্রস্ত রোগী অনেক দেখা যায় ও ক্রমে পল্লীগ্রামেও ইহার বিস্তার হইতেছে। যদিও এই রোগ মারাত্মক হয় না বটে, কিন্তু সংসারের সকল লোকেরই একটা অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। যাঁহার সংসারে একটি হিষ্টিরিয়া রোগী আছে, তিনি এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অতএব সকলেরই এই রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা দরকার।

হিষ্টিরিয়া এক প্রকার মানসিক বিকার মাত্র। দেহের কোন্ কোন্ অংশের কি পরিবর্ত্তন হইতে এই বিকার উদ্ভূত হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। হিষ্টিরিয়া রোগীর সময়ে সময়ে হঠাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপনী (convulsion) বা তদ্রূপ লক্ষণাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে হিষ্টিরিয়ার "ফিট" বলে। রোগী ভেদে এ রোগের বিভিন্ন প্রকার লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। ইহা মানসিক আবেগের প্রবলতা মাত্র। অর্থাৎ বিচার বুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া মনের ইচ্ছাশক্তি যখন ভাবাবেগের সম্পূর্ণ পরাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। তাহার অধিকাংশই দেখিলে মনে হইবে যেন ঐ রোগী কপট অভিনয় বা ভান করিতেছে মাত্র; তাই আমাদের দেশে সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা এইরূপ রোগীকে ভূতে পাইয়াছে বলে। বলা বাহুল্য যে, দেখিতে ভানের মত হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহা ভান নয়, কারণ সে সময়ে ঐ সকল লক্ষণাদি প্রকাশের প্রবণতা তাঁহারা রোধ করিতে পারেন না। ইহা অনেক স্থলে অকস্মাৎ কোন শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারনতঃ দাম্পত্য জীবনে কলহ, কোন আত্মীয় বা প্রিয়জনের মৃত্যু-জনিত গভীর শোক, বিচ্ছেদ, জ্বালা-যন্ত্রণা, সাংসারিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি নানাবিধ মানসিক কারণে ইহার উৎপত্তি হয়। দেহের স্থান বিশেষে অত্যন্ত আঘাত লাগিলে, বহুদিন রোগভোগে শরীর দুর্ব্বল হইলে সামান্য কারণে ইহা প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের জরায়ু বা ডিম্বকোষের পীড়া হইতে সাধারণতঃ হিষ্টিরিয়া হইয়া থাকে। কাহারও মতে রতিস্পৃহা অতৃপ্ত থাকিলে কখন কখন হিষ্টিরিয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাঁহারা অতিরিক্ত কোমলাঙ্গী এবং সহজেই যাঁহাদের মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাঁহাদিগকেই এই রোগ সহজে আক্রমণ করে। আমাদের দেশে যে সকল পরিবারের স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া অল্প লেখাপড়া শিখিয়া, আহার, ব্যবহার ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষার নিন্দা করিতেছি না। বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নাটক নভেল স্ত্রীলোকদের মধ্যে অতিশয় প্রচলিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শিক্ষিতা

রমণীরা ঐগুলি পাঠ করিয়া, তাহাতে মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেও, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন না, কেবল কাল্পনিক গল্প পড়িয়া নিজ নিজ জীবনে ঐগুলি প্রতিফলিত করিতে চান। ইহাতে জীবন নৈরাশ্যময় হয় ও হিষ্টিরিয়া উপস্থিত হয়। শিক্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা, শিক্ষক বা গুরুজনদের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া উচিত। রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরুষদের জীবন চরিত, সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি সতী রমণীদের কাহিনী, নীতি সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম পুস্তকাদি তরলমতী পাঠক পাঠিকাদের পড়িবার ব্যবস্থা করা উচিত। পিতামাতা গুরুজনদের বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত যেন কোনও রকমে নাটক নভেলাদি তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের হাতে না পড়ে। ছেলে মেয়েদের ছোট বেলা হইতে আত্ম-সংযম শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ যাঁহারা পিতামাতা কর্ত্তৃক সবিশেষ সমাদরে পরিপালিত ও যাঁহাদের চিত্ত সদাই অব্যবস্থিত, যাঁহারা শৈশব হইতেই সকল প্রকার বাসনার চরিতার্থতা সাধন বিষয়ে গুরুজনের নিকট হইতে সহায়তা পাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা প্রায়ই আত্মাভিমানিনী হন এবং সর্ব্বদা নিকটস্থ সকলের সহানুভূতির জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। কোন রমণীর এই সহানুভূতিস্পৃহা এত অস্বাভাবিকরূপে বলবতী হইয়া পড়ে যে, তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সত্য সত্যই নিজ দেহে অসুখের সৃষ্টি করেন।

লক্ষণ :—হিষ্টিরিয়া রোগে সকলের এক প্রকার লক্ষণ হয় না। ইহাতে নানাবিধ ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ আলোক বা গোলমাল সহ্য করিতে পারেন না; কেহ কেহ খাদ্যে বিকট দুর্গন্ধ অনুভব করেন আবার কেহ কেহ দুর্গন্ধ দ্রব্য সুগন্ধি বসিয়া সমাদরে গ্রহণ করেন। অনেক রোগীর দেহের স্থানবিশেষে (যথা,—মেরুদণ্ড, ডিম্বকোষের উপর, স্তন ইত্যাদি) জোরে চাপিলে বা আঘাত করিলে ফিট হইয়া পড়ে। আবার ফিট হইলে ঐ সব স্থানে চাপিলে বা আঘাত করিলে কখনও কখনও ফিট দূর হইতেও দেখা যায়। হিষ্টিরিয়া জনিত পক্ষাঘাত হইতেও দেখা যায়—তবে সে পক্ষাঘাত চিরস্থায়ী হয় না। উহা ধীরে ধীরে উপশম হয় এবং কখন বা উদ্বেগ বা আতঙ্ক হইতে তাহা দূরীভূত হয়। অনেক হিষ্টিরিয়া রোগী বক্ষে বা পেটের ভিতর হইতে একটী গোলা উঠার কথা বলিয়া থাকেন। হিষ্টিরিয়ার ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে তাঁহাদের নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়। উহা প্রায়ই ফিট হইবার পূর্ব্বে লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। কাহারও কাহারও বুক ধড়-ফড় করে। কেহ কেহ ক্ষনিক রোদন ও হাস্য করেন। কাহারও বিভ্রম উপস্থিত হয় এবং কেহ মরিতে আসিতেছে বা কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিতে আসিতেছে ইত্যাদি নানারূপ ভয় হয়। ফিটের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐরূপ লক্ষাদি উপস্থিত হওয়ায় রোগী তখনই সাবধানতা সহকারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জন্যই হিষ্টিরিয়া ফিটগ্রস্ত রোগীকে মৃগী-রোগীর ন্যায় জলে, আগুনে বা কোন বিপজ্জনক স্থানে পড়িয়া মারা যাইতে দেখা যায় না। কোন প্রকার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিলেই রোগী শুইয়া পড়েন, এবং তৎপরেই তাঁহার হস্তপদাদি সর্ব্ব শরীর আলোড়িত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ থাকে, কেহ কেহ নিজ বক্ষে মুষ্টাঘাত করিতে থাকেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হয়। চক্ষু প্রায় মুদ্রিত থাকে। কখন কখন মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয়, কিন্তু মৃগী-রোগীর ন্যায় ফিটের সময় দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিতে বা অজ্ঞাতসারে মলমূত্র নিঃসরণ হইতে দেখা যায় না। রোগী কোন কথার জবাব না দিলেও এবং বাহ্যতঃ সজ্ঞাহীন বোধ হইলেও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। কিছুক্ষণ পরে আক্ষেপ বন্ধ হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকেন। কেহ কেহ কাঁদিতে থাকেন এবং কেহ বা ভুল বকিতে থাকেন। ফিট উপর্য্যুপরিও হইতে পারে। কাহার কাহারও ফিট্ অল্পক্ষণ থাকে আবার কাহারও ফিট্ ২।৩ ঘণ্টাও থাকে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত

রোগীদের মধ্যে কাহারও কাহারও এক প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে দেখা যায়, যাহাতে রোগীকে যেরূপ অবস্থায় যেভাবে রাখা যাউক না কেন সেইরূপেই থাকে—হস্ত তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা সেই উত্তোলিত অবস্থায়ই থাকে। এইরূপ অবস্থাকে ইংরাজীতে কেটালেপ্সি (catalepsy) বলে। কাহাকেও মনে হয় যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন—ইহাকে ট্রান্স (Trance) বলে। এইরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘণ্টা কতকের পর চলিয়া যাইলেও কখন কখন ইহা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। ইহাতে মুখ বিবর্ণ, হস্তপদাদি শিথিল ও চক্ষু নিমীলিত থাকে। নাড়ী সূক্ষ্ম হয়, শ্বাসকার্য্য এত মৃদুভাবে হয় যে, হঠাৎ দেখিলে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। প্রায়ই ইহা হইতে রোগীর মৃত্যু হয় না। এইরূপ অবস্থা বেশী দিন থাকিলে যত্ন সহকারে রোগীকে মাঝে মাঝে আহার করান না হইলে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়।

চিকিৎসা :—(১) সংযম শিক্ষা—হিষ্টিরিয়া মানসিক বিকার মাত্র। অভিভাবকেরা পূর্ব্ব হইতে বালক-বালিকাদের শিক্ষা ও মনের গঠনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিলে, বালক বালিকাদের কোন বিষয়ে উৎকট জেদ থাকিতে না দিলে, তাহাদের মন সুস্থ সবল হইতে পারে এবং তাহা হইলে এই রোগ কোন ক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা :—দেহ সুস্থ, সবল রাখিতে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, প্রচুর পরিমানে লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার গ্রহণ, নিয়মিত অঙ্গ চালনা, নিয়মিত স্নান, পাঠাভ্যাসের জন্য অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা না করা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা, অত্যধিক চিন্তা, মন সদা প্রফুল্ল রাখা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জরায়ুর বা ডিম্বকোষের কোন পীড়া থাকিলে, প্রদর থাকিলে, তাহার প্রতিকার করা প্রকান্ত আবশ্যক।

(৩) সহানুভূতি প্রদর্শন :—রোগীর ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হইয়া এবং তাঁহার সমুদয় লক্ষণাদি ভাণ মনে করিয়া তাঁহার উপর কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়। সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত সহানুভূতিও ভাল নয়। বাস্তবিক দেখা যায় যে পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়েরা রোগীর প্রতি অযথা সহানুভূতি প্রকাশ করিলে রোগ শীঘ্র সারে না। এজন্য নিজ বাড়ী অপেক্ষা হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইলে শীঘ্র ভাল হইতে দেখা যায়। এমন কি অনেক সময় পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যাইলে, তথায় অপেক্ষাকৃত সাবধানে থাকিতে হয় বলিয়া হিষ্টিরিয়া শীঘ্র সারিয়া যায়।

(৪) মানসিক চিকিৎসা :—যে চিকিৎসকের উপর রোগীর বেশ বিশ্বাস আছে, তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে হিষ্টিরিয়া রোগে স্বপ্নাদ্য ঔষধ ও ঠাকুর দেবতার মাদুলী ধারণ ইত্যাদি খুব প্রচলিত আছে এবং তাহাতে উপকারও দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর মনের বিশ্বাসই এই উপকারের হেতু। পাশ্চাত্য প্রদেশে মেস্‌মেরিজম্ (Mesmerism), হিপ্‌নটিজম্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, যাহার দ্বারা একজন স্বীয় বলবতী মানসিক শক্তি প্রভাবে অন্যের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। ঐ শক্তির দ্বারাও রোগীর মানসিক বিকার দূর করিতে পারা যায়। আমাদের দেশেও ঝাড়ন-ঝোড়ন ইত্যাদির প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাতেও রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিলে কখন কখন হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

(৫) ফিটের সময়—এমোনিয়া (Ammonia) বা স্মেলিং সল্ট (Smelling Salt) বা তদ্রূপ কোন তীব্র গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করাইলে কখন কখন ফিট্ বন্ধ হইয়া যায়। ফিটের সময় কোমরের বা বুকের কাপড় জামা আল্গা করিয়া দেওয়া উচিত। ফিট্ বন্ধ করিবার আরও অনেক প্রকার অবস্থা আছে, যথা—খুব শীতল জল মস্তকের উপর জোরে ঢালিয়া দেওয়া, ঘাড়ের উপর বরফের চাপড়া চাপিয়া ধরা, মরিচ বা লবঙ্গ

বা অন্য কোন উগ্রগন্ধ দ্রব্য পোড়াইয়া নাসিকার নিকট তাহার ধোঁয়া দেওয়া, চামচ গরম করিয়া ঘাড়ে লাগান ইত্যাদি। অল্পক্ষণের জন্য রোগীর নাসিকা ও মুখ বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া ধরিলে অনেক সময়ে ফিট্ ছাড়িয়া যায়। কাহারও কাহারও তলপেটের বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বে ডিম্বকোষের উপর জোরে কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিলে ফিট্ বন্ধ হইতে দেখা যায়। ব্লিষ্টার বা তপ্ত শলাকা প্রয়োগের ভয় দেখাইলে কখন কখন ফিট্ ছাড়িয়া যায়। ফিট্ বন্ধ হইলে পর সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম করা প্রয়োজন।

শিশু-খাদ্য

প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে কোন সুদূর পল্লীতে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে যাইয়া অবগত হইলাম যে, উক্ত গ্রামের এক দাসের (কৈবর্ত্ত দাস) বাড়ীতে সদ্য প্রসূত একটী শিশুকে অসহায় রাখিয়া তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি ৪।৫টী লোক ৩।৪ দিনের মধ্যেই কলেরার করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। শিশুটী খালি ঘরে, বিনাখাদ্যে, বিনা শুশ্রূষায় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ২ দিন হইল অনবরত চিৎকার করিতেছে। আঁতুড়ে শিশু বলিয়া সমাজের ভয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাকে কেহই গ্রহণ করে নাই। এবং নিকটস্থ প্রতিবাসীগণ সর্ব্বদাই তাহার মৃত্যু কামনা করিতেছে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও দুইদিন হইল শিশুটীর মৃত্যু হয় নাই। অপরাহ্ণ বেলা ৪টার সময় এই সংবাদ পাইয়া সেই গৃহে উপনীত হইয়া দেখিতে পাই যে এক মৃতকল্প শিশু ছেঁড়া কাঁথার উপর মলমূত্রে জড়িত হইয়া ক্ষীণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। শিশুটীকে উত্তমরূপে গরম জল দ্বারা ধৌত করতঃ একজন দয়াবান দাস কৃষকের সাহায্যে শুষ্ক বস্ত্রাবৃত করিয়া বাটীর বাহিরে আনয়ন করি। এবং তাহা দ্বারা সদ্য গাভী দুগ্ধ দোহন করিয়া শিশুকে ঝিনুক দ্বারা অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধ পান করাই। প্রথমে সে দুগ্ধ পান করিতে কষ্ট ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে, শেষে আস্তে আস্তে কিছু দুগ্ধ পান করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে। বহু চেষ্টা করিয়াও গ্রামের কাহারও স্তন-দুগ্ধ পান করাইবার সুবিধা পাইলাম না। অবশেষে শিশুকে লইয়া রাত্র ১১টায় যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন শিশু বেশ ঘুমাইতেছিল। পুনরায় তাহাকে গো-দুগ্ধ পান করাইলাম। পরদিন ঐ শিশুর অবস্থার একটু উন্নতি দেখিয়া আশান্বিত হইলাম। তৃতীয়দিন হইতে শিশুর তরল দাস্ত হইতে আরম্ভ হইল। গো-দুগ্ধ বন্ধ করিয়া হরলিকস্-মিল্ক-ফুড্ বোতলের সাহায্যে পান করাইতে আরম্ভ করিলাম, চতুর্থ দিন শিশুটী আর জগতে রহিল না।

পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখা যায় ম্যালেরিয়াক্রান্তা গর্ভবতী জ্বর ও শোথ হইয়া ভুগিতেছে; কিন্তু গর্ভাবস্থায় কোন ঔষধ খাওয়ান কর্ত্তব্য নয় অথবা ঔষধ খাইলে গর্ভস্থ শিশু মারা যাইবে, এই কুসংস্কারের আশঙ্কায় গর্ভিণীকে ঔষধ দেওয়া হয় না, এবং সন্তান প্রসব হইলেই প্রসূতী বিনা চিকিৎসাতেই বা সামান্য ঔষধেই আরোগ্য লাভ করিবে এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। ফলে প্রসবের পরক্ষণেই প্রসূতী বা প্রসূত সন্তানের জীবলীলা শেষ হয়। অথবা প্লীহা, যকৃত সহ ক্ষীণকায় শিশু কিছুকাল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহজগত ত্যাগ করে।

একবার কোন সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকের বাটীতে এইরূপ একটী প্রসূতী ও শিশু রোগী আমার চিকিৎসাধীন হয়। প্রসূতীকে আমি চিকিৎসা করি কিন্তু শিশুটীকে দেখিতে পাই না, জিজ্ঞাসা করাতে কেহই তৎসম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন না।

শিশুটী জীবিত আছে জানিতে পারায় এবং শিশুকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় শিশুর পিতামহ বলেন যে, সেটী আর বাঁচিবে না, তাহাকে দেখান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শিশুর পিতা আমার আগ্রহ দেখিয়া পরে শিশুকে দেখাইলেন; দেখিলাম একটী অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ভগ্নগৃহের এক কোণে অযত্নভাবে ছেঁড়া নেকড়ার মধ্যে মৃতকল্প অবস্থায় শিশুটী পড়িয়া আছে, সদ্য প্রসূত ও প্রসূতীকে আঁতুড় দোষ জন্য পরিবারস্থ কোন আত্মীয়া তাহাদের ঔষধ ও পথ্য দেন না। একজন অশিক্ষিতা রাজবংশী জাতীয়া মলিন বসন পরিহিতা অপরিষ্কৃতা প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা এই দুই জনের ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া থাকে। বহু চেষ্টায় ও উপদেশে এবং নিজে তাঁহাদের ছুইয়া বাড়ীর অন্যের ব্যবহার্য্য খাট চৌকী ও বিছানায় বসিয়া ও তাঁদের ছোঁয়াছিং করিয়া, তবে নানারূপ শুশ্রূষা ও পথ্যের ব্যবস্থা। পরিবারস্থ মহিলাদিগের দ্বারা করিতে সক্ষম হওয়ায়, শিশু ও প্রসূতীর জীবন রক্ষা করিতে পারি।

বিষম সংযোগ

নিম্ন-লিখিত খাবারগুলি এক আহারের সঙ্গে খাওয়া কোন ক্রমে উচিত নয়:—

১। দুধ, চিনি ও ডিম—একত্রে।

২। রাঁধা শাক-সব্জী ও ফল ফুলুরী। ফলগুলি—খাওয়ার আধঘণ্টা আগে বা পরে খাইলে মন্দ হয় না।

৩। চা ও মাংসের পিষ্টক-ব্যঞ্জনাদি [যেমন কল্‌কাতার হোটেলে নব্য বাবুরা খেয়ে থাকেন।]

৪। দুগ্ধ ও মাংস; দুগ্ধ ও মূলা; গুড়, চিনি বা মিশ্রী ও মৎস্য; তালের রস দুধ, দই বা ঘোল ও কলা [ফলারে ব্রাহ্মণদের সাবধান হওয়া উচিত।]

আমাদের বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ পল্লী-সমাজে আঁতুড় ঘরেই অনেক শিশুর ভবলীলা শেষ হয়; তাহার একমাত্র কারণ আঁতুড় দোষ দুষ্ট এবং তাহাকে ছোঁয়াছিং নিতান্ত অধর্ম্ম, অন্যায় ও সমাজ বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করা। শুধু এই বিনা শুশ্রূষায় ও অনুপযুক্ত খাদ্যে ও বস্ত্রের অভাবেই অনেক শিশুর মৃত্যু আমরা নিয়ত দর্শন করিয়া থাকি। কোন একটী ভদ্র পরিবারের প্রথম প্রসূতী কন্যার একটী সুস্থ সবলকায় সন্তান জন্মিবার ৩ দিন পর ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সমস্ত আঁতুড় ঘরে জল পড়িতে থাকে; নিয়ত জলে ভিজিয়া ও ঠাণ্ডায় যখন প্রসূতীর জ্বর ও শিশুর গলা বসিয়া গিয়াছে এবং স্তনদুগ্ধ পান করিবার ক্ষমতা যখন তাহার লুপ্ত হইয়াছে, তখন আমার ডাক পড়ে। অপ্রশস্ত ভিজে সেঁত সেঁতে আঁতুড় ঘর ও তাহার চাল দিয়া নিয়ত জল পতিত হইতেছে। তাহার মধ্যে বালিকা সন্তানটী বক্ষের মধ্যে চাপিয়া বসিয়া কাঁপিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়াই বালিকার নিকট হইতে শিশুকে গ্রহণ করতঃ বালিকাকে সঙ্গে লইয়া একেবারে গৃহস্থের শয়ন ঘরের পরিষ্কৃত বিছানায় আসিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং সকলকে নানারূপ ভয়, অভয় ও হিতবাক্য দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের সেই বিছানায় ও ঘরে আশ্রয় দিতে বাধ্য করিলাম। তারপর নানা প্রকার শুশ্রূষা ও সুপথ্যে শিশু ও শিশু-মাতার জীবন রক্ষা হইল।

একবার একটী সদ্য প্রসূত শিশুর মাতার পীড়া হেতু স্তন-দুগ্ধ বিকৃত হওয়ায় গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। বাড়ীর চাকর প্রতি রোজ কোন দূর স্থান হইতে গর্দ্দভীর দুগ্ধ ২৲ টাকা সেরে খরিদ করিয়া আনিত। সে দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ও জ্বর হয় এবং শিশু ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মারা পড়ে। পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, বাড়ীর চাকর অপ্রত্যাশিত লাভের বশবর্ত্তী হইয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধের পরিবর্ত্তে নিকট হইতে ছাগদুগ্ধ আনিয়া দিত। এবং ঐরূপ দুগ্ধ পানই শিশুর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ স্থির করা হয়।

পল্লীগ্রামের অনাথা বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকগণ বাড়ী বাড়ী হইতে গাভী দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া

থাকে। গৃহ-কর্ত্তা এরূপ সহজ-প্রাপ্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কষ্টসাধ্য সুদুগ্ধ সংগ্রহের দায় হইতে রক্ষা পান। ঐ সকল দুগ্ধে ঐ সকল বিক্রেতা যেথান-সেথানকার অপরিষ্কৃত জল মিশ্রিত করিয়া সরলা গৃহিনীদিগের নিকট দু'পয়সা লাভের প্রত্যাশায় বাড়ীর শিশু-সন্তানদিগকে নিয়ত বিষ পান করায়। অনেক স্থলেই অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঐরূপ দুগ্ধ পানে শিশু পুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক ক্রমে দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হয় এবং তাহাদের পেটের পীড়া প্রায় লাগিয়াই থাকে। অনেক স্থলে কলেরা ও আমাশয়ের বিষ গৃহস্থ পরিবারে ঢুকিয়া সময় সময় মহা অনিষ্ঠ সাধন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে নব্য ডাক্তার বাবুদের অনুগ্রহে সুদূর পল্লীতেও বিলাতী পথ্যের আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ঐ সকল পথ্য প্রস্তুত ও রক্ষা করার পদ্ধতি তথাকার অশিক্ষিতা গৃহিনীরা মোটেই অবগত নহেন। সুতরাং তাহারা সুপথ্য বিশ্বাসে ঐ বিকৃত কুপথ্য প্রদানে শিশু ও রোগীর মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। অনেক স্থলেই তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মাতৃস্তন্যের অভাবে ও দরিদ্রতা হেতু অনেক পরিবার ভ্যাজাল-মিশ্রিত এরারুট, বার্লি, ভাতের মাড় প্রভৃতি পথ্য প্রদানে নিয়ত অনেক শিশুকে যমদ্বারে প্রেরণ করিতেছেন, ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

অনেক বাড়ীতে দেখিয়াছি, আঁতুড় ঘরে নারিকেলের মালা, মেটে সরা বা থালিতে করিয়া দুগ্ধ রাখিয়া শিশুকে তাহা ময়লা নেকড়ার সলিতা অথবা অপরিষ্কৃত পিত্তলের ঝিনুক দ্বারা পান করান হয়; সেগুলি এত ধূলা-মাটী-ছাই মিশ্রিত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ও অনাবৃত অবস্থায় রাখা হয় যে, তাহার মধ্যে রোগ-বীজাণু সহজে প্রবেশ করিয়া নিয়ত শিশু-হত্যা করিয়া থাকে।

ক্রন্দনশীল অনেক শিশুর মাতা, শিশুর ক্রন্দন নিবারণ জন্য শিশুকে নিয়ত অপরিমিত মাত্রায় স্তন-দুগ্ধ বা গাভী-দুগ্ধ পান করাইয়া তাহার অজীর্ণ পীড়া জন্মাইয়া দেন, পরে সে অজীর্ণের হাত হইতে শিশু আর উদ্ধার পায় না।

মাতৃহীন শিশুকে বোতলে করিয়া দুগ্ধ পান করান হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক স্থলেই বোতল ও নল ভাল করিয়া পরিষ্কার না করার ফলে অনেক শিশু মৃত অথবা মৃতকল্প হইয়া থাকে।

প্রথম দন্ত নির্গমের সময় অনেক শিশুর পেটের পীড়া, জ্বর, তড়কা প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে; এই সময় খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ না করিলে অনেক শিশুকেই মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রবন্ধ-প্রস্তাবে উপরিউক্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ সকল উল্লেখ করায় অনেক পাঠক পাঠিকাই বিরক্ত হইতে পারেন; কিন্তু শিশু-খাদ্যের অভাবে বা অনিয়মে বা অজ্ঞতা হেতু আমাদের দেশে কত শিশু যে অকাল-মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে; বরং উল্লেখ করিতে গেলে আখ্যায়িকা সুবৃহৎ হইয়া পড়ে। অথচ এরূপ আখ্যান বিবৃত না করিলেও নিত্য অনিষ্টকর ঘটনাবলী স্পষ্টরূপে দেখান যায় না, প্রবন্ধও সহজবোধ্য হয় না। এই জন্যই এই সকল ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মূক, বধির, অন্ধ, নিরাশ্রয় শিশুদের জীবন কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে ও কিরূপ খাদ্য কিরূপ ভাবে প্রয়োগ করিলে, তাহারা সুস্থ শরীরে বর্দ্ধিত হইতে পারে; তাহাদের জীবনের প্রারম্ভে যে সকল বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে তাহাদিগকে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে; তাহারা রোগাক্রান্ত হইলে, কিরূপে তাহারা সবল থাকিয়া ঐ রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রোগ মুক্ত হইতে পারে; কিরূপ খাদ্য পাইলে তাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারে, বর্দ্ধিত হইতে পারে, জীবন ধারণ করিতে পারে, সেইটী আমাদের প্রবন্ধ বর্ণনার বিষয়।

ভাল বা মন্দ খাদ্যের উপরই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শরীর সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ-ভাবে গঠিত হইয়া থাকে সুতরাং শিশুদের খাদ্য একটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রীতিকর বিষয় বলিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

শিশু জন্মিবার পূর্ব্বেই পরম পিতা অযাচিত ভা

মাতৃ বক্ষে তাহাদের খাদ্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখেন। তদ্বারাই সূচিত হয় যে, শিশু জন্মিবার পরেই মাতৃ-স্তন-দুগ্ধই কেবল মাত্র তাহার খাদ্য; এবং শিশু-জীবনের কয়েক মাস পর্য্যন্ত স্তন-দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও উৎকৃষ্ট—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত এবং সাধারণ সত্য। প্রকৃতি দেবী নিয়ত আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করিতেছেন তাহা বিশেষ রূপে জানিবার চেষ্টা করা বা তাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমে আমরা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

স্তন :—স্তন একটী জীবন্ত স্রাবক এবং নিঃসারক যন্ত্র বিশেষ। স্তন একটী Compound racemose gland, উহাতে অসংখ্য Epithelium গঠিত মধুচক্রের ন্যায় ছোট ছোট কোষ আছে; তাহা দ্বারা চিনি, মাখন এবং প্রটীড্ প্রস্তুত হয়, উহাদের সহিত মাতৃরক্ত হইতে জল এবং লবণ মিশ্রিত হইয়া প্রকৃত দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। ঐ Epithelium-কোষগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত। সে জন্য সামান্য কারণেই উহার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। জল, বাতাস, আহার, ক্লান্তি, পীড়া, মানসিক উদ্বেগ, গর্ভ প্রভৃতি কারণসমূহে দুগ্ধের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। এইরূপে মাতৃস্তন যদি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে এবং যদি মাতার শরীরে কোন প্রকার যান্ত্রিক বা নাড়ী-ঘটিত পীড়া (of nervous origin) না থাকে বা মাতার আহারের এবং নিদ্রার কোন ব্যতিক্রম না হয়, তখন স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ এবং নিয়মিত ভাবে নিঃসারিত হয়। পক্ষান্তরে মাতার শারীরিক অসুস্থতার পরিমাণানুসারে স্তনের কার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। এ সময় যে দুগ্ধ নিঃসরণ হয় তাহার কখন সামান্য পরিবর্ত্তন, কখন বা অধিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্তনে দুগ্ধ তৈয়ারী হইয়া কখনও জমা থাকে না। যখনই শিশু স্তন্য পান করে, তখনই দুগ্ধ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হইয়া আসে। ইহা ব্যতীত শিশুর খাইবার পরিমাণানুসারে স্তন—বেশী বা কম দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। শিশুর পাকস্থলীর আয়তনানুসারে স্তন হইতে দুগ্ধ অল্প বা অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হইয়া থাকে। আবার কম বা বেশী বয়সানুসারে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া থাকে। শিশুর বয়স খুব কম হইলে, অল্পক্ষণ পর পর দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, বয়স বেশী হইলে বেশী বিলম্বে দুগ্ধ নিঃসরণ হইয়া থাকে। এ মতে খুব অল্প সময় অন্তর দুগ্ধ উৎপন্ন হইলে, দুগ্ধের কঠিন পদার্থের পরিমাণ জলের ভাগ অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। এবং বেশী দেরীতে দুগ্ধ উৎপন্ন হইলে, ঐ কঠিন পদার্থ জলের ভাগ অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, বেশী শীঘ্র স্তনে দুগ্ধ হইলে, দুগ্ধ গাঢ় এবং বেশী দেরীতে স্তনে দুগ্ধ হইলে দুগ্ধ পাতলা হয়।

স্তনদুগ্ধ :—সকল প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তুদের দুগ্ধ উপাদানের কম-বেশ অনুসারে প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। সর্ব্ব জীবের দুগ্ধই ফ্যাট্, কার্ব্বহাইড্রেট, প্রটীড্ ও লবণ বর্ত্তমান আছে। আণুবীক্ষনীক পরীক্ষায় জানা যায় মোটামুটি মানব-দুগ্ধে নিম্ন লিখিত উপাদান গুলি আছে :—

Reaction—Amphoretic or slightly alkaline.

Specific gravity :—1028 to 1034		
Water (জল)	87 to 81	per cent
Total Solids (কঠিন পদার্থ)	12 to 13	,,
Fats (মাখন)	3 to 4	,,
Milk Sugar (দুগ্ধ-শর্করা)	6 to 7	,,
Proteids (আমিষ খাদ্য)	1 to 2	,,
Total mineral matter (খনিজ পদার্থ)	01 to 02	,,

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দুগ্ধে জলের অংশ সব চেয়ে বেশী।

ফ্যাট (Fat) ;—স্তন দুগ্ধের তৈলাক্ত পদার্থই ফ্যাট। ফ্যাট দ্বারা শিশুর শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও শরীরের তাপ রক্ষিত হয়। মাতার আহার দ্বারা দুগ্ধের ফ্যাটের কম-বেশী হইয়া থাকে। দুগ্ধে ফ্যাট কম বেশী হওয়া ভাল নহে। দুগ্ধে ফ্যাট বেশী বা কম হইলে, শিশুর বদ্ হজম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, কখন কখন কঠিন মলও হয়, কখন বা দাস্ত বন্ধ হয় এবং ভাল পুষ্টি সাধন

(মাংসল) হয় না। শিশুর এইরূপ অবস্থা দ্বারাই দুগ্ধের মাখন জাতীয় উপাদানের ন্যূনাধিক্য সহজেই বোঝা যাইতে পারে।

চিনি (Sugar);—ইহা যে আকারে দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকে তাহাকে দুগ্ধ-শর্করা (Milk Sugar or Lactose) বলে। দুগ্ধের উপাদান মধ্যস্থ শক্ত দ্রব্যের মধ্যে উহার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা তৈলাক্ত পদার্থ অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়, এবং ল্যাকটিক্ এসিডে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুগ্ধে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে।

প্রটীডস্ (Protieds)—ইহা স্তন-দুগ্ধের মধ্যে মোটামুটি শতকরা ১ হইতে ২ অংশ বর্ত্তমান থাকে। Caseinogen এবং lactalbumin আকারে ইহা দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকে। যখন স্তন-দুগ্ধ পানে শিশুর পুষ্টি সাধন হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধে প্রটীডের অংশ বেশী হইয়াছে এবং মাখন ও আমিষ ঘটিত পদার্থ কমিয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন ধাতব লবণ (Mineral matter, Ash বা Salt):—ইহা দুগ্ধে শতকরা ·১ হইতে ·২ বর্ত্তমান থাকে। স্তন দুগ্ধে শত ভাগের মধ্যে :—

Calcium	phosphate	23·87
”	Silicate	1·27
”	Sulphate	2·25
”	Carbonate	2·85
Magnesium	Carbonate	3·77
Potassium	Carbonate	23·47
”	Sulphate	8·33
”	Chloride	12·05
Sodium	Chloride	21·77
Iron oxide and Alumina		0·37

স্তনদুগ্ধ প্রস্তুত :—স্তন-মধ্যস্থ ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডের এক প্রকার Secretory Activity দ্বারা রক্ত হইতে অসাধারণ উপায়ে Filtration (পরিশ্রুত) হইয়া দুগ্ধ উৎপন্ন হয়; এইরূপে দুগ্ধ উৎপন্ন হওয়ার জন্যই দুগ্ধস্থ শর্করা (milk sugar) lactalbumin এবং serum-albumin প্রভৃতি রক্তে বর্ত্তমান না থাকিলেও দুগ্ধে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত যে সকল খনিজ পদার্থ যে পরিমাণে দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকে, রক্তের সহিত ঐ পরিমাণের কোন সামঞ্জস্য নাই।

ফরষ্টর (Forstor) সাহেব বলেন যে, ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডের Epithelium এবং Protoplasmic cells-এর কার্য্য দ্বারা দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রতোপ্লাজমিক সেলস্এ প্রটীড্ এবং Nucleo-proteids যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। এবং ইহা হইতেই casein উৎপন্ন হইয়া থাকে। Epitheleal cells এবং Protoplasm (জীববস্তু) হইতে ফ্যাট বা মাখন জাতীয় উপাদান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহা হউক, সে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধারণ লোকের কোন প্রয়োজন নাই। এইটুকু মোটামুটি জানিয়া রাখা ভাল যে, ম্যামারী গ্ল্যাণ্ড নামক গ্রন্থটি ও স্তন-মধ্যস্থ এপিথিলিয়াল্ কোষসমূহ রক্ত হইতে অজ্ঞাত উপায়ে স্তনের উপাদান সংগ্রহ করে।

দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে নাড়ীতন্ত্রের শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। নাড়ীর কার্য্য সমভাবে হইলে, দুগ্ধের পরিমাণ, উপাদান প্রভৃতিও সমভাবে হইয়া থাকে। নাড়ী-জনিত উত্তেজনা অথবা অবসাদ জন্য স্তনের পুষ্টি সমভাবে না হওয়াতে প্রটীড্ (আমিষ) এবং ফ্যাট (মাখন) ঠিক অনুপাতে উৎপন্ন হয় না, সুতরাং সে দুগ্ধ পানে শিশুর উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। নাড়ী-ক্রিয়া বেশী হইলে মোটের উপর প্রটীড বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ফ্যাট কম উৎপন্ন হয়। উপবাস, রাগ, দুশ্চিন্তা, আকস্মিক হর্ষ ইত্যাদি দ্বারা উত্তেজিত হইলে ফ্যাট এত কম উৎপন্ন হয় যে, দুগ্ধ খাইয়া শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রসবের পরেই কয়েকদিন ম্যামারি-গ্ল্যাণ্ড হইতে যে দুগ্ধ নিঃসরণ হয় তাহা খাঁটি স্তন-দুগ্ধ হইতে বিভিন্ন। এই দুগ্ধকে Colostrum এবং দুগ্ধ নিঃসরণের এই

সময়কে Colostrum period বলে। এই প্রকার কাল প্রায় ১০ দিন থাকে। এই কলষ্ট্রাম-দুগ্ধে Colostrum Corpuscles নামে কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ বর্ত্তমান থাকে।

হেরিংষ্টন সাহেব (Harringston) এই দুগ্ধ বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া নিম্ন লিখিত পদার্থ ইহাতে বর্ত্তমান দেখিয়াছেন :—

Fat	1·71
Milk Sugar	40·90
Proteids	1·72
Ash	0·79
Water	90·83

তিনি বলেন যে, Colostrum Corpuscles সব সময়েই কোলোষ্ট্রম্ দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকে না। যখন থাকে তখন দুগ্ধে প্রটীডের অংশ কমিয়া যায়। এই জন্য এই সময়ের দুগ্ধ পানে শিশুর ৮ হইতে ১২ আউন্স পর্য্যন্ত ওজন কমিয়া যায়। আবার টাউনস্ হেড (Townshead) সাহেব বলেন যে—ইহাতে শিশুর ওজন তত কম হয় না, যদ্দ্বারা শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে।

Colostrum Corpuscle অন্য সময়েও দুগ্ধে দেখা যাইতে পারে; তখন দুগ্ধের প্রটীড-এর অংশ বেশী হয় বলিয়া ঐ দুগ্ধপানে শিশুর বদহজম হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রসবের পর যখন এইরূপ দুগ্ধ নিঃসরণ হয় বা অন্য যে সময়ে দুগ্ধে Colostrum Corpuscles বেশী হয়, তখন ঐ দুগ্ধ শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে।

স্তন-দুগ্ধের পরিবর্ত্তন :—স্তন-দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুগ্ধের উপাদান প্রত্যেক মাসে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আহার, ব্যায়াম ও পীড়াদি হেতু কখন কখন স্তন-দুগ্ধ স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয় না, কখন অল্প বা কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। যখন দুগ্ধে Colostrum Corpuscles দেখা যায় অথবা দুগ্ধ পানে শিশুর বদ্হজম হয়, তখনই বুঝিতে হইবে কোন কারণে দুগ্ধ উপাদান বা নিঃসরণের ব্যতিক্রম হইয়াছে এবং তখনই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আহার :—আমাদের দেশে প্রসবের পর প্রথম দুই দিন প্রসূতীকে সাবু ও চিড়ে ভাজা ঘি মাখিয়া খাইতে হয়। তৃতীয় দিন আতপ চাউলের অন্ন, ঘৃত ও কালজিরা, খলুপ, মরিচ প্রভৃতি মসলা-বাটা সহ খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে; তারপর তাহাকে ৫ দিন পর মৎস্যের ঝোল ভাত ও দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিক খাবার আরম্ভ করিতে দেওয়া হয়। প্রসবের পর প্রথম কয়েক দিন প্রসূতীকে একটু কম করিয়াই খাইতে দিতে হয়। বেশী গুরু আহার দিলে দুগ্ধে কঠিন পদার্থের পরিমাণ অধিক হয়। তাহা শিশু হজম করিতে সক্ষম হয় না। কারণ তখন কঠিন পদার্থ হজম

খাদ্য সম্বন্ধে কয়টি মামুলি কথা

১। যখন খুব রাগের মাথায় বা খুব পরিশ্রান্ত হ'য়ে আছে, তখন খেয়ো না।

২। খাদ্য দ্রব্য ঝোলা ঝোলা করে' মুখে দিও না; প্রত্যেক গ্রাস অন্ততঃ ত্রিশ সেকেণ্ড কাল চর্ব্বণ কর্ব্বে।

৩। ঠিক আহারের পরেই মৃদু কাজ মন্দ নয়,—একটু বিশ্রাম ভাল; কিন্তু ঘুম বা দৌড়-ঝাঁপের কাজ করা-আদৌ সমীচীন নয়।

৪। জলপান—দুটি আহারের মাঝামাঝি সময়ে ভাল; ঠিক খাওয়ার পরেই দু'চার ঢোকের বেশী জল খাওয়া উচিত নয়।

৫। খাওয়ার পরেই গরম বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করা শুভপ্রদ নয়।

৬। বেশী তৈল বা ঘৃত পাক্করা আহার করা বড় গুরুপাক্, ভাত দেড় ঘণ্টায় হজম হয়, কিন্তু ঘি-ভাত হজম হ'তে ৫।৬ ঘণ্টা লাগে।

৭। টাট্‌কা ফল, আধাটা লাল চাল, জাঁতায় ভাঙা আটা, কাঁচা সব্জী, ডাল, দুধ প্রভৃতির মধ্যেই একটা মানসিক বা দৈহিক দৈত্যের সমস্ত পুষ্টিকর উপাদান লুকিয়ে আছে।

করিবার শক্তি তাহার জন্মে না। শিশু-জীবনের কয়েক দিন এবং কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে দুগ্ধে জলের ভাগ কঠিন পদার্থ অপেক্ষা বেশী এরূপ দুগ্ধ খাইয়া শিশু বেশ হজম করিতে পারে এবং বর্দ্ধিত হইতে পারে, সুতরাং এই সময় প্রসূতীকে বেশ হাল্‌কা ও টাট্‌কা খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। যে সব খাদ্য সহজপাচ্য অথচ বলকারী এরূপ খাদ্য খাইতে দিবে। যে পরিমাণে দুগ্ধ খাইলে সহজে হজম হয় তদনুমাত্রায় দুগ্ধ খাইতে দিবে। রাত্রিতে যথেষ্ট পরিমাণে তরল পানীয় দ্রব্য খাইতে দিবে। নির্দ্দিষ্ট সময় ও সমপরিমাণ খাদ্য খাইতে দিবে। যে সকলে হজমের ব্যাঘাত জন্মে এরূপ খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

ব্যায়াম:—প্রসূতীর নিয়ত বসিয়া শুইয়া না থাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান ভাল। সহজসাধ্য সাংসারিক কার্য্য করা উচিত। গুরুতর পরিশ্রম করা উচিত নহে। যেরূপ নিয়মিত আহারের প্রয়োজন, সেইরূপ সহজসাধ্য পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা উচিত। এরূপে সহজে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় ও সে দুগ্ধ সহজপাচ্য, বলকারী ও শিশু-বর্দ্ধক হইয়া থাকে।

ঋতু:—স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে, মাতৃ-দুগ্ধের ফ্যাট কম ও প্রটীড বেশী হয়। সেজন্য সেই দুগ্ধ শিশু ভাল পরিপাক করিতে পারে না এবং তজ্জন্য শিশুর পেটের পীড়া হইয়া থাকে। প্রসবের পর প্রায় ৬।৭ মাস কাল ঋতু বন্ধ থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে শিশুর হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পরে ঋতু হইলে তজ্জন্য শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। তথাপি ঋতুর কয়েক দিন স্তন-দুগ্ধ কম অথবা একেবারে বন্ধ করা মন্দ নহে।

গর্ভ:—একবার সন্তান হওয়ার পর পুনরায় গর্ভ সঞ্চার হইলে, আর কোলের শিশুকে স্তন পান করান উচিত নহে। একবার সন্তান হইবার পর, ৩।৪ মাসের পর পুনরায় গর্ভ হওয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একমাস পরই পুনরায় গর্ভ হওয়ার কথাও জানি। আমাদের দেশে এরূপ গর্ভ হইলে কোলের ছেলের "এড়ে লাগা" বলে। সেজন্য ঐ দুগ্ধ পান করিয়া ঐ ক্রোড়স্থ শিশুর শরীর-বর্দ্ধনে ব্যাঘাত জন্মায় এবং শিশু রোগা ও পেটের পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শিশুকে স্তন ছাড়ান বড় সহজ নহে, এবং স্তন-দুগ্ধের অনুরূপ খাদ্যও সংগ্রহ করা গুরুতর বিষয়। সুতরাং এরূপ স্থলে যে, গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা অপেক্ষা ক্রোড়স্থ শিশুরই চিন্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠে। আবার একটী ক্রোড়স্থিত এবং আর একটী বর্দ্ধনশীল গর্ভস্থিত সন্তান—এই দুইটীকে এক সময়ে রীতিমত ভাবে খাদ্য যোগান মাতার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন, গর্ভাবস্থায় স্তন পান করাইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। এরূপ স্থলে দুর্ভাগী মাতার বিষম সঙ্কট। মাতা যদি সুস্থ, বলশালিনী ও কার্য্যক্ষম হন, তবে স্তন পান করাইলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। অন্ততঃ ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিরাপদে স্তন্য পান করান যাইতে পারে।

ভয় বা মানসিক উত্তেজনা দ্বারা দুগ্ধের উপাদানের পরিবর্ত্তন বা নিস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্বাভাবিক স্তন-দুগ্ধে শতকরা

ফ্যাট	৩·৪
সুগার	৭
প্রটীডস্	১·৫০
জল	৮৬·১৫

বর্ত্তমান থাকে। যে মাতার শরীর দুর্ব্বল ও বিনি পুষ্টিকর খাদ্য পান না অথবা অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে অধিক সময় অতিবাহিত করেন, সে মাতার দুগ্ধে শতকরা

ফ্যাট	১·১০
সুগার	৪
প্রটীডস্	২·৫০
মিনারেল্ ম্যাটার	·০৭
জল	৯২·৩১

থাকে; ইহাকে Poor milk বা 'হীন-স্তন্য' বলা যাইতে পারে।

মাতা রোগগ্রস্তা, গর্ভবতী ও নাড়ী-প্রধান বিশিষ্টা হইলে, ম্যামারি-গ্রন্থির (Mamuary gland) কার্য্য ভালরূপ সম্পন্ন হইতে পারে না, সেজন্য তাহার স্তন-দুগ্ধে শতকরা

ফ্যাট	০·৮০
সুগার	৫·০০
প্রটীডস্	৪·৫০
মিনারেল ম্যাটার	০·০৯
জল	৮৯·৬১

বর্ত্তমান থাকে;—এরূপ দুগ্ধকে Bad milk বা 'দুষ্ট দুগ্ধ' বলা যাইতে পারে।

যে সকল মাতা ভাল হজম করিতে ও পুষ্টিকর সুখাদ্য খাইতে পারেন, বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না, বসিয়া শুইয়া থাকিয়া জীবনাতিপাত করেন, তাঁহাদের স্তন দুগ্ধে শতকরা—

ফ্যাট	৫·১০
সুগার	৭·৫০
প্রটীডস্	৩·৫০
মিনারেল ম্যাটার	০·২০
জল	৮৩·৭০

বর্ত্তমান থাকে। এরূপ দুগ্ধকে over rich milk বা অতি সমৃদ্ধ স্তন্য' বলা যাইতে পারে।

কোন কারণে যদ্যপি মাতৃদুগ্ধ কম হইয়া যায় এবং তাহা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মাতার খাদ্যদ্রব্যে (ঢেঁড়স্, কলাইয়ের ডাল্, ডাবের জল, তরমুজ, টাট্‌কা ফলমূল ও) জলীয় খাদ্য বাড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার কোন নাড়ীঘটিত উত্তেজনা—ভয়, শোক, বা আনন্দ অধিক হইলে তাহা দূরীকরণে মনোনিবেশ করিতে হইবে। শিশুকে দুগ্ধ দিতে দিতে তিনি উপযুক্তা এরূপ বিশ্বাস তাঁহার মনে উৎপাদন করিতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, মাতৃস্তনে অত্যধিক দুগ্ধ জন্মে। অনেক সময় দুগ্ধ চুয়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। সেরূপস্থলে স্তন-দুগ্ধ যাহাতে কম হয়, সেরূপ চেষ্টা প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মাতার খাদ্যের জলীয়ভাগ খুব কম করিয়া দেওয়া উচিত।

সময়ে সময়ে স্তন-দুগ্ধের কঠিন পদার্থসকল কম বেশী হইয়া থাকে, দুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়; এরূপ পরীক্ষা করার সুবিধা ও সুযোগ সকল স্থানে সকলের ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু শিশুর পুষ্টি ও বর্দ্ধনের ও পীড়াদির বিষয় অবগত হইয়া আমরা স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। তবে সুবিধা হইলে, সেরূপ স্থলে দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দুগ্ধের কঠিন পদার্থ বাড়াইতে হইলে, শিশুকে ঘন ঘন স্তন পান করান উচিত। মাতা পরিশ্রম কম করিবে ও তাহার খাদ্য দ্রব্যে জলীয়ভাগ কম করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে যদি কঠিন পদার্থের ভাগ কমাইতে হয়, তাহা হইলে অনেক পরে পরে শিশুকে স্তন্যপান করাইবে; মাতার পরিশ্রম ও খাদ্যে জলের অংশ বাড়াইয়া দিবে। এইরূপে দুগ্ধে মাখনের ভাগ বাড়াইতে হইলে, মাতাকে আমিষ-ঘটিত পদার্থ (মসুরীর ডাল, ছানা, মাছ, মাংস ডিম প্রভৃতি) ও মাখন-ঘি খাইতে দিবে। পক্ষান্তরে দুগ্ধে মাখনের ভাগ কম করিতে হইলে ঐরূপ খাদ্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। দুগ্ধে প্রটীডের ভাগ বেশী করিতে হইলে, মাতার পরিশ্রম কমাইবে; প্রটীডের ভাগ কম করিতে হইলে পরিশ্রম বেশী করাইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিষ খাদ্যের কম-বেশী করিতে হইবে।

অনেকস্থলে মাতার পীড়াদি হেতু, মাতৃস্তনে দুগ্ধ কম হইয়া থাকে; কিন্তু দুগ্ধের উপাদানের বিকৃতি হয় না; সেরূপ স্থলেও শিশুকে স্তন্যপান করিতে দিবে না ও অন্য খাদ্যদ্বারা তাহার উদর পূর্ণ করিবে।

ঔষধ:—যতদিন পর্য্যন্ত শিশু স্তন্য পান করে সেই সময় কতকগুলি ঔষধ মাতাকে খাওয়াইলে, তাহা স্তন-দুগ্ধের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। সেই দুগ্ধ পানে শিশুর অনিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা কোন পল্লীগ্রামে একটী প্রসূতী-চিকিৎসায় আহূত হইয়া জানিতে পারি যে, তাহার পেটের পীড়া হওয়ায় গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার তাহাকে কয়েক দিন ধরিয়া আফিং ঘটিত

ঔষধ খাইতে দিয়াছিলেন, সে ঔষধে প্রসূতীর উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু শিশুটীর মৃত্যু হইয়াছে। অন্য এক-স্থানে একজন খ্যাতনামা ডাক্তারবাবু একটী স্তন্যদায়িনীর আমাশয় রোগে ইপিকাক প্রয়োগ করিয়া ছিলেন, তাহাতে কোলের শিশুর বমন হইতেছিল। একস্থানে একটী স্তন্যদায়িনী রোগীকে কলচিকম দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল; ঐ রোগিণীর ক্রোড়স্থ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সে উদ্ধার পাইয়াছিল। একজন স্তন্য-দায়িনীকে সেলাইন দ্বারা দাস্ত দেওয়ায় মাতৃদুগ্ধ কমিয়া গিয়াছিল। একজন মাতাকে অতিরিক্ত পালভ লিকরিস্ কোং খাইতে দেওয়ায় ক্রোড়স্থ সন্তানের পেটের পীড়া হইয়াছিল। আমরা বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই এই সকল অনিষ্টের কথা অনুধাবন করিতে পারি। সুতরাং স্তন্যদায়িনীকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, সেই সময় শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করিয়া দিতে হয়, অথবা দুগ্ধে-নিঃসরণকারী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এবং নিতান্ত দরকার হইলেও শিশুর স্তন্য বন্ধ করা না গেলে, খুব সাবধানে বিবেচনার সহিত কম মাত্রায় মাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করা উচিত। আর্সেনিক, এণ্টিমণি লেড, পটাশ আইওডাইড্ মার্কারী, অপিয়ম, মর্ফিয়া, কলচিকম ইত্যাদি-ঘটিত ঔষধ সকল দুগ্ধের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল ঔষধ মাতাকে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

অনেক সময় মাতার শুষ্ক খাদ্য গ্রহণে অথবা তরল দ্রব্য বা জল না খাইলে, অথবা মাতা জোলাপ লইলেও স্তন-দুগ্ধ কম হয়। বেলেডোনা ঔষধ প্রয়োগেও মাতৃ-দুগ্ধ কম হইতে দেখা গিয়াছে।

স্তনের বোঁটা :—কোন কোন মাতার স্তনের বোঁটা সময়ে সময়ে এত ছোট ও চেপ্টা হইয়া থাকে যে, শিশু তাহা টানিতে পারে না। তখন শিশুকে অন্য কোন উপায় দ্বারা মাতৃ স্তন হইতে দুগ্ধ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য Nipple shield দ্বারা স্তন পান করান সুবিধা ও সহজ। কিন্তু উহার রবারের বোঁটা ও কাঁচের নল প্রত্যহ ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে, শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। আবার যখন স্তনের বোঁটা অত্যন্ত নরম হয় এবং সহজেই মাতা বেদনা বোধ করে, তখন মাতা একটু যত্ন ও একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইলে ক্রমে বোঁটার যন্ত্রণা কমিয়া যায়। যদি বোঁটাটী শুষ্ক ও শক্ত হয়, তাহা হইলে স্তন পান করাইলে ঐরূপ অবস্থা দূরীভূত হয়।

দুগ্ধ বন্ধ :—অনেক স্থলে স্তন-দুগ্ধ বন্ধ হইয়া স্তনে বেদনা হয়, এবং স্তন ফুলিয়া শক্ত হয়। এ দেশে তাহাকে "থমক আসা" বলে। এরূপ স্থলে শিশুকে কয়েক ঘণ্টা স্তন্য পান করান বন্ধ করিয়া রাখা উচিত এবং আস্তে আস্তে স্তন-দুগ্ধ হস্ত দ্বারা টিপিয়া অথবা ব্রেষ্টপম্প দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই দুগ্ধ কমিয়া স্তন স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনেক স্থলে স্তনের কোন একটী স্থান ফুলিয়া শক্ত ও পরে তথায় প্রদাহ পূযরূপে পরিণত হয়। গুলার্ড লেসনে উপকার না হইলে, ঐ সকল স্থান কাটিয়া পূয বাহির করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত।

খাদ্য নিরূপণ :—মাতৃ স্তন-দুগ্ধই যে শিশুর প্রথম এবং প্রধান খাদ্য—সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবার উপায় নাই। কিন্তু ঐ দুগ্ধ যদি কোন কারণে বিকৃত, অল্প বা অপ্রতুল হয় তবেই শিশু-খাদ্য-নির্ব্বাচন-সমস্যা উপস্থিত হয়। স্বীয় মাতৃ-স্তন্য যেমন উপযোগী—অন্য মাতৃ-স্তন্য সেই শিশুর সেরূপ উপযোগী হইবে কি না, বা তৎ পরিবর্ত্তে অন্য জীবের স্তন-দুগ্ধ তাহার জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল হইবে কি না—ঠিক করিতে হইবে। আমাদের অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ সকল শিশুরই শরীর এক ভাবে গঠিত নহে। কোন কোনও খাদ্য খাইয়া ভাল থাকে, আবার সেই খাদ্য অন্য শিশুর সহ্য হয় না। একজনের পুষ্টিকর খাদ্য অন্য শিশুর অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক খাদ্য, পিতামাতার আর্থিক অবস্থা, সহর বা পল্লীতে বাস, মুক্ত বা আবদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, শীতপ্রধান গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে বাস, ঋতুভেদ ইত্যাদি শিশু-শরীর পুষ্টি-সাধনের উপর অনেক বিষয় নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুখাদ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন হয়।

আজকাল খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ স্তন্য-দুগ্ধের অভাবে অথবা ফ্যাশনের বশবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সে সমস্ত খাদ্য কখনই স্তন-দুগ্ধের অনুরূপ হইতে পারে না। কোন্ বয়সে কোন্ জিনিষটি কতটা পরিমাণে শিশু-জীবনের বিশেষ উপযোগী, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রকৃতি-দেবী যাহা শিক্ষা দিয়াছেন আমাদের তাহারই অনুকরণ করা উচিত।

প্রকৃতিদেবী সমস্ত স্তন্য-পায়ী জন্তুদের যে খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ আমিষ খাদ্য। মনুষ্য জাতি তাহাদের জীবনের প্রথম বারমাস পর্য্যন্ত অসাক্ষাৎভাবে মাংসাশী (Carnivora)। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে—টাট্‌কা এবং প্রচুর পরিমাণে আমিষ খাদ্য খাইয়া বেশীর ভাগ মনুষ্য-জীবন রক্ষিত হয়।

জীবনের প্রথম বার মাস পর্য্যন্ত প্রথম দ্রুত পুষ্টি সাধনের সময়। এই সময়ে শিশুকে মাতৃ-স্তন্য, ধাত্রী-স্তন্য, কোন জন্তুর দুগ্ধ কিম্বা উহাদের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত কোন খাদ্যরূপ খাওয়ান যাইতে পারে। এই চারি প্রকার খাদ্য মধ্যে মাতৃ-স্তন্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ তত্ত্ব।

যদ্যপি স্বভাব, শরীর ও স্তনের অবস্থা ভাল হয়, মাতা বলবতী, সুস্থশরীরী, সুস্থমনা হন, যদ্যপি তাঁহার ছেলেকে দুগ্ধ খাওয়ানর প্রবল ইচ্ছা, ও স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকে, তবেই সেই দুগ্ধ পানে ছেলের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রুগ্না মাতারও স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকিতে দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে বলবতী মাতারও স্তনে দুগ্ধ কম থাকে। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। মোট্‌কথা, মাতার দুগ্ধ খাইয়া ছেলের পুষ্টি সাধন হয় কি না অথবা কোনরূপ অপকার হয় কি না, তৎপ্রতি বাটীর কর্ত্তা-গৃহিণীর সবিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভুল

ভুল নং ১। ক্ষুধা হইলেই সম্মুখে যাহা পাও তাহাই খাওয়া, অসময়ে (দুষ্ট) ক্ষুধা হইলেই খাদ্য-গ্রহণের সময় হইয়াছে বুঝা!

ভুল নং ২। নানা রকমের তরীতরকারী, মাছ-শাক, ঘি, মশালা, চাট্‌নী-আচার, ভাজা-ভুজি না হইলে খাওয়া দায় হওয়া।

ভুল নং ৩। যাঁরা মাথার কাজ করেন, তাঁদের খাদ্য কায়িক পরিশ্রমী অপেক্ষা খুব কম হওয়া উচিত—এই ধারণা।

ভুল নং ৪। মাছ, মাংস, ডিম না খাইলে শরীরের পোষ্টাই হয় না—এই মত।

ভুল নং ৫। খুব বেশী খাইলে গায়ে জোর হয়।

স্তন্যদানের সাধারণ নিয়ম :—মাতা বসিয়া শিশুকে কোলে রাখিয়া, তাহার মাথা ও পশ্চাৎ ভাগ বেশ সুরক্ষিত করিয়া স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দিবেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুর পেট না ভরে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন সুস্থ মনে, একাগ্র চিত্তে তাহাকে স্তন্য প্রদান করিবেন। প্রত্যেকবার স্তন্যদানের পূর্ব্বে বোঁটা ধুইয়া লওয়া ভাল।

শিশুর ঠোঁট ও গাল এমন ভাবে গঠিত যে, তদ্দ্বারা সে স্তন হইতে বেশ দুধ টানিয়া লইতে পারে। স্তনও এরূপভাবে গঠিত যে, উহা হইতে আবশ্যক মত টাট্‌কা দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া নির্গত হয়। স্তন হইতে টাট্‌কা দুগ্ধ টানিয়া লওয়ায় শিশুর লালা প্রভৃতি হজমকারী পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া তদ্দ্বারা কোনরূপ পচন-ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। শিশুর যতক্ষণ পেট না ভরে ততক্ষণ সে দুগ্ধ টানিতে থাকে, দুধও ক্রমাগত উৎপন্ন হইয়া সমান ধারায় বাহিরে আসিতে থাকে; এই কারণে শিশুও ক্লান্ত হয় না এবং খাইবার সময়ও বেশী লাগে না! ইহা ব্যতীত স্তনের আর

একটী স্বাভাবিক গুণ যে, উহা শিশুর বয়সের উপযোগী উপাদান ও পরিমাণের তারতম্য করিয়া দুগ্ধ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

শিশু জন্মিবার পরই—আমাদের দেশে মাতৃ-স্তন্য দেওয়া হয় না; কারণ স্তনে ভাল দুগ্ধ হয় না এবং মাতাও শিশুকে স্তন দিতে সক্ষম হন না। এরূপ স্থলে প্রসব হওয়ার পর ৩৬ বা ৪৮ ঘণ্টা কাল শিশু স্তন-দুগ্ধ পান করে না। প্রথমে তাহাকে মধু খাইতে দেওয়া হয়, পরে গরুর দুধ জল মিশাইয়া অল্প পরিমাণে ন্যাকড়ার পলিতার দ্বারা তাহার মুখে দেওয়া হয়। শিশু উহা অনায়াসেই পান করিয়া থাকে। উহার পর মাতার শরীর একটু সবল হইলে মাতার স্তন্য পান করান হয়। বিলাতে শিশু জন্মাইবার পর মিল্ক-সুগার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে দেওয়া হইয়া থাকে।

শিশু জন্মিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব শিশুকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাহার ওজন ও জীবনী-শক্তি কম হইতে পারে না। জন্মিবার পর প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক দিন শিশুর খাদ্যের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সময়ে অ হইলে, তাহার জীবন রক্ষার বিশেষ বিঘ্ন হই পারে।

শিশু যত অল্প বয়স্ক হয়, তাহার পরিপোষণ ক তত দ্রুত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার শরী ক্ষয় পূরণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি হইবার সাহায্যের অনেক বার স্তন দিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত শিশুর শরীরের উত্তাপ রক্ষা করি জন্যও তাহার খাদ্যের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত নি অনুসারে শিশুকে খাওয়ান উচিত :—

বয়স—	সময় অন্তর—	২৪ ঘণ্টায়—	রাত্রিতে—
জন্ম হইতে ৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত	২ ঘণ্টা	১০ বার	১ বার
৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত	২ ”	৯ বার	১ বার
৬ হইতে ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত	২½ ”	৮ বার	১ বার
২ হইতে ৪ মাস পর্য্যন্ত	২½ ”	৭ বার	১ বার
৪ হইতে ১০ মাস পর্য্যন্ত	৩ ”	৬ বার	১ বার
১০ হইতে ১২ মাস পর্য্যন্ত	৩ ”	৫ বার	•

এইরূপ সকাল ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র ১০টার মধ্যে স্তন-পান শেষ করান উচিত। নতুবা মাতার ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে। মাতার বিশ্রাম ও ঘুম বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা মাতার স্বাভাবিক দুগ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না।

অনিয়মিত ভাবে দুগ্ধ খাইতে দিলে বা খুব শীঘ্র শীঘ্র বা খুব দেরীতে স্তন্য পান করাইলে দুগ্ধের পরিমাণ ও উপাদান উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ দুগ্ধ পানে শিশুর শরীর বর্দ্ধনের কোন সাহায্য করে না এবং ঐ দুগ্ধ শিশু সহজে হজম করিতে পারে না। শীঘ্র শীঘ্র দুগ্ধ পানে দুগ্ধের জলীয় ভাগ কম এবং কঠিন অংশ বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ দুগ্ধ জমাট দুগ্ধের মত কার্য্য করে; সেজন্য সে দুগ্ধ শিশু হজম করিতে পারে না। আবার দেরীতে দেরীতে দুগ্ধ দিলে দুগ্ধের জ ভাগ বেশী হয় ও কঠিন পদার্থ কম হয়। সু দুগ্ধ জলের মত পাতলা হইয়া থাকে। ইহা সহজে হজম হইতে পারে, কিন্তু শিশুর পুষ্টি মোটেই হয় না। এজন্য নিয়মিত সময় অনুসা পানের ব্যবস্থা মাতাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এক বৎসর পর স্তন-দুগ্ধ ফুরাইবার সময় অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, এই সময় শি আর মাতৃ-স্তন্য না দেওয়াই ভাল। কোন মাতার প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ বর্ত্তমান কিন্তু তা বলিয়া সে দুগ্ধ আর শিশুকে খাইতে উচিত নহে। এক বৎসর পরে অথবা শিশুর দ গমের পর শিশুর হজম করিবার শক্তি বৃদ্ধি

তখন গরুর দুগ্ধ ও শ্বেতসার ঘটিত পদার্থ (দুধের সহিত সাগু, বার্লি ও মিশ্রির গুড়া, ভাতের দলা বা রুটির টুক্‌রা) শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত। এই জন্যই আমাদের দেশে ঐ সময়ে "অন্ন-প্রাশন" মহোৎসব করা হয়। শিশুর বয়স ১০ মাসের উপর হইলেই অর্থাৎ ইন্‌সাইসর বা কর্ত্তনকারী দন্ত উঠিলেই বুঝিতে হইবে শিশুর অগ্ন্যাসয়-রস (Pancreatic juice—যাহা শ্বেত-সারকে পরিপাক করিবার সহায়তা করে) সম্পূর্ণভাবে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তখন তাহাকে শালি জাতীয় বা অন্ন-ঘটিত পদার্থ খাইতে দেওয়া উচিত এবং হঠাৎ স্তন-দুগ্ধ বন্ধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দুই মাসের মধ্যে স্তন-দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর প্রায়ই পেটের অসুখ হইয়া থাকে, সে সময় স্তন-দুগ্ধ বন্ধ করা উচিত নহে, তাহা হইলে পেটের পীড়া বৃদ্ধি হইয়া শিশুর বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে।

অনেক স্থলে মাতার অসুখের জন্য বা মাতৃহীন হইলে স্তন-দুগ্ধ বন্ধ করিতে হয়; তখন মাতৃ-স্তন্যের পরিবর্ত্তে অন্য দুগ্ধ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি গো-দুগ্ধ-পানে শিশু বর্দ্ধিত হয় তবে তাহাই পান করাইবে, নতুবা গর্দ্দভী-দুগ্ধ বা মাতৃ-দুগ্ধের অনুরূপ করিয়া অর্থাৎ গো-দুগ্ধে জল ও অতি সামান্য মিশ্রীর গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাইতে দিবে। যতদিন পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদ্গম না হয়, ততদিন শালিজাতীয় খাদ্য শিশুর মোটেই সহ্য হইবে না; সুতরাং সাগু, বার্লি, বিস্কুট, রুটি, ভাত প্রভৃতি সে সময় খাওয়ান উচিত নহে। কিন্তু দন্ত উঠিবার পর যদি মাতৃ-স্তন্যের অভাব হয়, তখন গো-দুগ্ধের সহিত ঐ সকল পদার্থ ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। তাহাতে শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না, বরং শিশু ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, দন্তোদ্গমের সময় অনেক শিশুর দুর্দ্দম্য পেটের পীড়া হয়; এজন্য অনেক মাতা শিশুকে এরারুট, বার্লি প্রভৃতি পথ্য দেন, তাহাতে তাহার পেটের পীড়া দূরীভূত হওয়া দূরের কথা—বরং বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে; উপরন্তু শিশুর বমনও হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে স্তনে যে পরিমাণ দুগ্ধ থাকে তাহাই পান করিতে দেওয়া উচিত এবং গো-দুগ্ধের সহিত এক চামচ করিয়া সুপরিশ্রুত চূণের জল বা বাইকার্ব্বনেট অব সোডা অথবা সোডা সাইট্রাস অবস্থাভেদে ২।৩ গ্রেন মিশ্রিত করিয়া ২।৩ বার খাইতে দেওয়া উচিত। দন্তোদ্গমের পর বা ১২ মাসের সময় যখন বুঝিবে শিশু গরুর দুগ্ধ এবং যে কোন আকারের শ্বেতসার ঘটিত পদার্থ পাইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন স্তন দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

যখন কোন কারণে শিশুকে মাতৃ স্তন্য দেওয়া অসম্ভব বা অযুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, তখন অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য দ্বারা শিশুর পরিপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কোন-কোন স্থলে দেখা যায়, আপন মাতৃ স্তন্য শিশুর যেমন পুষ্টিকর হয়, অন্য মাতার স্তন্য সেরূপ পুষ্টিকর হয় না। সেরূপ স্থলে দুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা অথবা যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা দ্বারা স্তন-দুগ্ধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

ধাত্রীদুগ্ধ :—মাতার অভাব হইলে কিম্বা বিলাসিতার ব্যসনে অথবা বৈদেশিক রীতি অনুসারে অনেকস্থলে শিশুকে ধাত্রীদুগ্ধ পান করান হয়। এরূপ ধাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হইলে, সে ধাত্রীর মেজাজ ধীর, স্বাস্থ্য ভাল, বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে, এবং যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যাহার স্তনদুগ্ধ শিশু বর্দ্ধনোপযোগী গুণবিশিষ্ট, শিশু লালন পালনে যে অভ্যস্তা ও সক্ষমা—এরূপ ধাত্রীর হস্তে শিশু পালনের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য।

ধাত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। তাহার কোন পুরাতন রোগ—উপদংশ, যক্ষ্মা প্রভৃতি আছে কি না, তাহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা উচিত। যদি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারাই এরূপ ধাত্রী ঠিক করা যায় ভাল,—নতুবা তাহার স্তন-দুগ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ঐ রূপ রোগগ্রস্তা ধাত্রী দ্বারা শিশু পালন করা কখনই উচিত নহে।

ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার খাদ্য, বস্ত্র ও অবস্থান এবং পরিশ্রমের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সাধারণতঃ যেরূপ খাদ্য খাইত, যেরূপ বিশ্রাম করিত তাহাকে তাহাই দেওয়া উচিত, নতুবা ভাল বা মন্দ খাদ্যে অথবা কম বা বেশী পরিশ্রমে তাহার স্তন-দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইলেই ছেলের সে দুগ্ধ সহ্য হইবে না। তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্র ও অবস্থানের জন্য ভাল বায়ু ও আলোকপূর্ণ গৃহ দেওয়া উচিত।

মাতৃস্তন্য ছাড়া—যদি অন্য খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যদ্যপি মাতা রোগগ্রস্তা হন বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুগ্ধও যোগাড় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অন্য স্তনপায়ী জীবের দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানব জীবনের প্রথম গঠন আমিষ জাতীয় খাদ্য দ্বারা হইয়া থাকে; স্তন্যপায়ীদের দুগ্ধ আমিষ এবং উহার উপাদান একই; তবে জন্তুর খাদ্য, অবস্থান ও শরীরিক অবস্থা অনুসারে ঐ উপাদানের কিছু কম বেশ থাকিতে পারে। ঘোড়া ও গাধার দুগ্ধ যদিও মানব দুগ্ধের সদৃশ, কিন্তু তাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তাহা এত বেশী নয় যে, তদ্দ্বারা একটা দেশ বা সমাজ চলিতে পারে, সুতরাং এরূপস্থলে আমাদের সযত্নে পালিত সদ্য গো-দুগ্ধই মাতৃস্তন্য অভাবে উপযুক্ত খাদ্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গরুর দুগ্ধই শিশু খাদ্যের উপযোগী নহে। যে সকল গরু বেশ শক্তিশালী, এবং যে গরুর দুগ্ধ খাইয়া তাহার বৎস বেশ সতেজ হয়, যে গাভী বেশ হজম করিতে পারে, যাহার দুগ্ধের পরিমাণ বেশী ও দুগ্ধের উপাদান সমান, এরূপ গরুর দুগ্ধ পান করিতে দিলেই ভাল হয়। সেজন্য গাভীকেও যত্ন করা প্রয়োজন, তাহার খাদ্য ও অবস্থান যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

জন্মিবার সময় একটি শিশুর ওজন কিছু কমবেশী চারি সের হয়। একটী সুস্থকায় শিশু পাঁচ মাস বয়স পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে মোটামুটি আধ পোয়া (৪ আউন্স) ওজনে ভারি হয়। তারপরেও প্রতিমাসে গড়ে তাহার আড়াই পোয়া করিয়া বাড়া উচিত। একটি পরিপূর্ণ সুস্থকায় এক বৎসরের শিশুর ওজন এগার সেরের নীচে গেলেই তাহাকে ডাক্তার দেখান ও তাহার বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য।

প্রত্যেকবারে কি পরিমাণ দুগ্ধ শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে তাহাও স্থির করা প্রয়োজন ও নিয়ম মত সেই পরিমাণ দুগ্ধ অথবা শিশুর ওজনের পরিমানানুসারে তাহার পাকস্থলীর অবস্থা বুঝিয়া তাহার দুগ্ধের মাত্রা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। শিশুর তিন মাস পর্য্যন্ত যথেষ্ট মাতৃ-স্তন্য থাকিলে, তাহাকে অন্য দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে। তিন মাসের পর হইতে অর্দ্ধেক মাতৃস্তন্য ও অর্দ্ধেক গো-দুগ্ধ (জল মিশ্রিত করিয়া) দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থ মাস হইতে সাত মাসের মধ্যে সুস্থ শিশুর মোট দুগ্ধের পরিমাণ তিন পোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ পোয়া পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে হয়।

শিশু শরীরের তাপরক্ষা করা শিশু খাদ্যের অন্যতম উদ্দেশ্য; সুতরাং শিশু-শরীরের তাপ নির্ণয় করিয়াও শিশুখাদ্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রথম কয়মাস শিশুদের কাঁদিবার সময় চক্ষে জল আসে না ও মুখ হইতে লালা পড়ে না। এতদ্বারা সূচীত হয় যে, তখন তাহাদের পাকস্থলীতে সর্ব্বপ্রকার হজমকারী রস জন্মে না। যতদিন দাঁত না উঠে ততদিন পাকস্থলীতে এই সকল পাকরসের আবির্ভাব হয় না। এই কারণে দাঁত না উঠিলে—১০ মাসের আগে শিশুকে শাক জাতীয় খাদ্য—ভাত, রুটী, মিঠাই-মণ্ডা, ফলফুলুরী এমন কি—সাগু বার্লিও পথ্য দেওয়া কোনক্রমে উচিত নহে। দশ মাসের পর ক্রমে স্তনদুগ্ধ দেওয়া বন্ধ কম করিয়া গো দুগ্ধের সহিত বার্লি, দেশীয় বিলা এরারুট, শটী বা করন্‌ফ্লাওয়ার দেওয়া অভ্যাস করা ভাল; পেটের সামান্য গোলমাল থাকিলে ইহা সহিত ১ গ্রেণ বা আধরতি আন্দাজ লবণ মিশ্রিত

ভাল। যতদিন পর্য্যন্ত মাড়ীর দাঁত না উঠে ততদিন মাংস-ঘটিত খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। মাড়ীর দাঁত উঠিলে পর ক্রমশঃ মাংসের জুস্, মৎস্যের ঝোল, ডিমের শ্বেতাংশ, ভাত ও পাতলা ডাল খাইতে দেওয়া যায়।

উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে পেটের পীড়া, তড়কা (convulsions), রিকেট (Rickets) প্রভৃতি রোগে অনেক শিশু মারা যায়।

শিশুর খাদ্য সর্ব্বদা সামান্য গরম ও একটু মিষ্ট হওয়া আবশ্যক; স্তনদুগ্ধ যে পরিমাণ মিষ্ট থাকে, গরুর দুগ্ধে তদপেক্ষা কম মিষ্ট থাকে, সে জন্য গরুর দুধ খাওয়াইবার সময় তৎসহ একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান উচিত। কিন্তু সাধারণ চিনি অপেক্ষা সুগার অব্ মিল্ক (Sugar of milk) বা দুধ হইতে প্রস্তুত চিনি ব্যবহার করাই ভাল। এই চিনি না পাইলে মিশ্রির গুড়া দেওয়া উচিত। সাধারণ চিনি বা গুড় পাকস্থলীতে গিয়া মাতিয়া অম্ল উৎপন্ন করে ও তাহাতে বদ্ হজম জন্মায়।

খাওয়ানোর পূর্ব্বে প্রত্যেকবার দুগ্ধ ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়; যদি কোন কারণে দুগ্ধ বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যায় তবে খাওয়ানোর সময় দুগ্ধ সামান্য গরম করিয়া লওয়া উচিত। দুগ্ধ কখনও এক্ ফুটের বেশী গরম করা উচিত নহে; দুধের সর ছাঁকিয়া ফেলা ভাল। বীজাণু-দোষ হইতে নিরাপদ করিয়া লইবার জন্য যদি দুধ খুব ফুটাইয়া লইবার দরকার হয়, তাহা হইলে উহাকে আঁটা পাত্রে ঠাণ্ডা হইতে দিয়া তৎসহিত ২।১ কোয়া মিষ্ট কমলালেবুর রস বা আঙুরের রস মিশাইয়া লওয়া চাই।

ঠিক নিয়মিত সময়ে শিশুকে দুগ্ধ খাওয়ান উচিত। যখন তখন ছেলে কাঁদিলেই দুধ খাওয়ান উচিত নহে। সব সময়েই যে শিশু ক্ষুধার জন্য কাঁদে—তাহা নহে, হয়ত তাহার পিপাসা হইয়াছে অথবা অনিয়মিত খাওয়ানোর দোষে পেট ফাঁপিয়াছে, পেট কামড়াইতেছে, গাত্র চুল্‌কাইতেছে বা পিপ্‌ড়া কামড়াইয়াছে, তাহার গায়ে কাপড় কষা হইয়াছে বা বিছানায় প্রস্রাবের জন্য ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। শিশুর শীত বা সর্দ্দি লাগিলেও কাঁদিতে পারে। কাঁদিলেই যে দুধ খাওয়াইতে হইবে এরূপ মনে করা ভুল। তাহার কাঁদার কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

শিশু কাঁদিলেই তাহাকে চুপ করিবার জন্য কাঠের চুষি, আঙ্গুল, ঝুমঝুমি, বাঁশি বা স্তন মুখে দেওয়া ও তাহা মুখে দিয়া ঘুমাইবার অভ্যাস করান ভাল। কিন্তু ঐ গুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। তাহাতে অজীর্ণ, পেট কামড়ান ও পেট ফাঁপাও সারিতে দেখা যায়। নিয়মিত শিশুকে মৃদু মধুর রৌদ্র ও বৈকালে বায়ু-সেবন করান বহু রোগের প্রতিষেধক।

শিশুর খাদ্য ঠিক পরিপাক হইতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে শিশুর মল দেখা প্রয়োজন। যদি মলে সর, ছানা বা দধির মত ছোট ছোট সাদা সাদা পদার্থ থাকে, তবেই জানিবে—তাহার খাদ্য হজম হয় নাই, তখনই খাদ্য পরিবর্ত্তন করা উচিত।

স্তন-দুগ্ধ অম্ল নহে; কিন্তু গরুর দুগ্ধ অল্প অম্ল গুণ বিশিষ্ট, এই কারণে গরুর দুগ্ধের সহিত চুণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে ভাল হয়। চুণের জল মিশাইলে পাকাশয়ে দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে পারে না। যে সকল ছেলে দুধ খাইয়াই দধির মত বমন করে বা ঐ রূপ বাহ্যে করে তাহাদের চুণের জল মিশান দুগ্ধ খাওয়ান উচিত।

যে সকল শিশুর হজম শক্তি কম, তাহাদের মাখম তোলা দুগ্ধ সহ সদ্য কাঁচা পেঁপের গাত্রের ১০।১৫ ফোঁটা সাদা কস দিয়া খাওয়াইলে সহজে হজম হয়।

কোন শিশু যদি উপযুক্ত পরিমাণে না খায় ও ক্রমশঃ রোগা হইতে আরম্ভ করে, তবে তাহার গায়ে তৈল বা মাখম মাখাইলে উহার কিছু ভাগ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিশুর খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করে।

যখন কোন শিশু বেশ সুস্থ দেখায়, শক্ত, সবল, স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও কোলে লইলে ভারি বোধ হয়, বমি করে না, দিবসে অন্ততঃ ২ বার পরিষ্কার হরিদ্রা আভাযুক্ত নরম বাহ্যে হইতেছে, কাঁদে কম, প্রত্যেকের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, খেলা-ধুলায় ভুলিয়া থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে ছেলে বেশ উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে।

[ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

বাঙ্গালীর শুদ্ধাচার (২)

স্ত্রী সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে ভক্তি পরায়ণা শুদ্ধান্তঃকরণা অতি পবিত্রাচারিণী—একান্ত যত্ন-নিপুণতার সঙ্গে গোময় না লেপে এঁটো পাড়েন্ না; কিন্তু তাঁর চক্ষের উপর স্বামী মহাশয় কি আহার গ্রহণ কচ্ছেন, সেদিকে দৃষ্টি নেই। অদূরে অবস্থিত পায়খানার বিষ্ঠাভুক্ত অগণ্য মাছি এসে ভাতে ভাগ বসাইতেছে—নির্ব্বিকার চিত্তে পেটের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন। মাছি তাড়াতে কেহই কড়ে' আঙ্গুলটি তুলেন না!

বর্ত্তমান বেগ ও উদ্বেগ।

(Daily Pas-enger বা বাড়ী হইতে দৈনিক যাতায়াতকারী চাকুরে বাবুর জীবন)

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

ছুট্ ছুট্ ছুট্—গেল গেল গেল—
ওই বুঝি ট্রেণ ছাড়ে;
আজ দেরী হ'লে রেগে বড় বাবু
রাখিবে না মাথা ঘাড়ে।

মাথার চাঁদিতে তৈল ছিটায়ে
স্নান সারে সত্বর;
উত্তমরূপে তেল মাখিবার
আছে কি গো অবসর?

হুড়্ হুড়্ হুড়্ জল ঢালে গায়
দুই চারি পাঁচ ঘড়া;
তবু বাবু বলে "ঠাণ্ডা হয় না,
এমনি ধাতুটা কড়া।

পেটটা গরম রয়েছে সমান
আজ কয়দিন থেকে;
মিছরী ভিজান পড়ে আছে গ্লাসে,
ফাঁক্ নাই খেতে ছেঁকে।

মাছ খাওয়া আজ হবে না হবে না,
কাঁটা বেছে কেন রাখেনি?
তিন্‌টে মিনিট্ বড় জোর খেতে
পাই, সেটা বুঝি দেখেনি?"...

আর্শী চিরুণি ঝট্ ক'রে ল'য়ে
কাটিল মাথায় টেরি;
ফুকারিয়া কন্—"ভাত বাড় ওগো
মিছে করো নাকো দেরী।"

শপ্ শপ্ শপ্ গব্ গব্ গব্
কোঁৎ কোঁৎ কোঁৎ গিলিছে;
পাতের কাছেতে বসিয়া গৃহিণী
অবাক্ হইয়া দেখিছে।

মুখপানে চায় অবলা রমণী,
বুঝে না 'দাসের' জ্বালা;
কি খোয়ারে দিন কাটে গো স্বামীর,
কি কষ্টে দিয়েছে বালা।

অহো কি ভীষণ জীবন হেরিয়া
কেঁদে ওঠে প্রাণ-পাখী!
কি গতি বেগ গো ব্যস্ততা আহা,
দেখে ঝুরে মোর আঁখি!

রুদ্ধশ্বাসেতে দৌড়িছে বাবু
রোদে যায় মাথা পুড়ে;
টস্ টস্ ঘাম ঝরে সারা গায়,
বন্ বন্ মাথা ঘুরে।

বড় বাবুটির দন্ত-খিচুনী,
ছোট সাহেবের হাঁক,
দেখে শুনে পেটে চমকায় পিলে,
রাঙা হয় মুখ-নাক্।

একটা বাজিল টিফিন্ লাগিল
বাবুরা ছাড়িল হাঁফ;
কচুরী জিলাপি চলিল অমনি
খাওয়া বেশ গুপ্‌গাপ্!

কি রুচি-বিকার, কি ছাই খাবার
পুরিতেছে পোড়া পেটে !
গুণ বিচারিতে নাই গো সময়
খেটে দিন যায় কেটে।

"আজি ত বাঁচিনু কোনরূপে বাবা,
কাল যাহা হয় হবে।"
বর্ত্তমানের দারুণ উদ্বেগে
ব্যাকুলিত জীব ভবে।

জোয়ালে বদ্ধ ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ
তাড়িত বলদ-প্রায় ;
যা'র তা'র হাতে, যেখানে সেখানে
পচা বাসি ছাই খায় !

উৎকট রজোমত্ত কর্ম্মী
সতত ঘূর্ণমান ;
ক্ষিপ্ত মানসে স্নেহ-প্রেম-দয়া-
বিবেকের নাহি স্থান।

সাম্‌নে যা' পায় তীক্ষ্ণ রুক্ষ
বিদাহী কটু লবণ ;
গল্ গল্ গল্ হাম্ হাম্ খায়,
করে না গো চর্ব্বণ।

অকালে ভেজাল গো-গ্রাসে খেয়ে
ঝাঁপিল ঘূর্ণিপাকে ;
বন্ বন্ পাক্—দে পাক্ দে পাক্,
আর তারে কেবা রাখে !

ক্লান্ত শরীরে ঘরে যায় বাবু
সন্ধ্যায় কাজ সেরে ;
আখের ছিব্‌ড়ে যেন গো নীরস—
কলে পিষে দেছে ছেড়ে !

নেশার জিনিষ।

১। নেশার জিনিষ ঠিক ভিজে বেড়ালের মত; ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে, ফা'ল্ হ'য়ে বেরোয়। প্রথমে দাস থাকে, পরে প্রভু হয়ে' উঠে।

২। মদ, চুরুট, তামাক, দোক্তা, সিদ্ধি, কাফি, আফিং প্রভৃতি নিজেদের প্রকৃত রূপগুণ লুকিয়ে রাখে ; প্রথম প্রথম খুব আরাম দেয়, কিন্তু পরিণামে দেহ-মনের ধ্বংস সাধন ক'রে ছাড়ে।

৩। মদ যার সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, সুখ তার খিড়্‌কী দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়!

৪। নেশার জিনিষ কোন জন্মে কারো হজম-শক্তি বাড়ায় না, কোন অসুখের উপশম করে না, শরীরের কোন উপকারে আ'সে না; প্রত্যেকটি বিষের সমান্।

৫। নদ-নদী-সমুদ্রে যত লোক ডুবে মরেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মদে ডুবে মরেছে ; একা যে তামাক বিড়ি সিগারেট খরচ হয়, সেইগুলির ছাই ও গুল্ দিয়ে উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী সুবিশাল চিল্কা হ্রদকে স্বচ্ছন্দে বুঁজিয়ে দেওয়া যায়। নেশা লোকের পয়সা নষ্ট করে, মস্তিষ্ক বিকৃত করে, জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করে। নেশার জিনিষ ছুঁয়োনা, কিনোনা, খেয়োনা, খাইও না।

চক্ষু-রত্নের যত্ন

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

নেত্রের দশটি নিষেধ

১। ভোর বা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে, খুব তেজওয়ালা বাতির নিকট, চে'খের কোনরূপ পীড়া, হৃদি দৌর্ব্বল্য, রক্তদুষ্টি বা নাড়ী-দৌর্ব্বল্য (nervous derangement or debility) প্রভৃতি উপসর্গ হ'লে কখনও পড়াশুনার কাজ করবে না।

২। শায়িত বা অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায়, খুব উত্তেজনার সময় বা পরিশ্রান্ত হয়ে' কোন লেখা পড়বে না।

৩। ট্রাম, ঘোড়ার বা গরুর গাড়ী অথবা যে ট্রেন খুব ঝাঁকি মেরে চলে—তার মধ্যে ব'সে, কিম্বা পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে অথবা খাওয়ার ঠিক পরেই প'ড়ো না।

৪। খুব ছোট লেখা বেশী পড়তে অভ্যাস করো না ; ছোট লেখা বল্‌তে এই বুঝি যে, যা' পড়তে চোখের একটু কষ্ট হয়, বাধ-বাধ ঠেকে বা মাঝের এক লাইন্ ভুলে অন্য লাইনের দিকে দৃষ্টি পথহারা হ'য়ে যায়। বায়োস্কোপে ঘন ঘন যাওয়া বা থিয়েটারে রাত্রি জাগরণ চোখের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। বায়োস্কোপে গিয়ে চিত্র দেখানোর পর্দ্দা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে এবং সোজাসুজি না বসে' তির্য্যক্ ভাবে বস্‌তে হয়।

৫। ময়লা হাত দিয়ে কখনও চোখ্ রগ্‌ড়াবে না অথবা মলিন রুমাল বা কাপড় দিয়ে চোখ্ মুছবে না।

৬। পড়বার সময় বইখানি চে'খের খুব দূরে বা অতি নিকটে ধরো না ;—বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবে চোখের সামনে বারো থেকে কুড়ি আঙ্গুল আন্দাজ দূরে পড়ার জিনিষ রাখবে—যা'তে করে' আধ ঘণ্টা একাগ্র মনে পড়ে গেলেও চোখ ক্লান্ত বোধ করবে না বা জলে ভরে' উঠবে না।

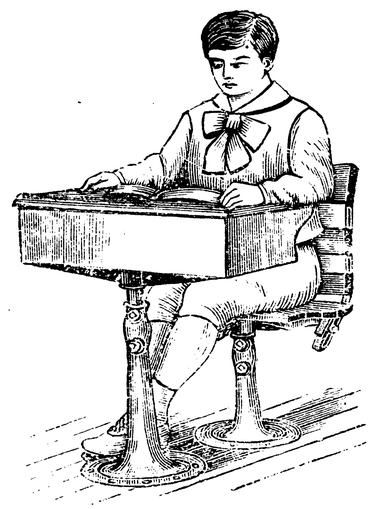

[এইরূপ করে' বসা উচিত]

৭। পড়বার বা লেখ্‌বার সময় জড় ভরতের মত—কোল্-কুঁজো হয়ে' সম্মুখভাগে হুমড়ী খেয়ে ব'সো না।

৮। প্রখর রৌদ্রে বসে' পড়ো না বা লিখো না ;

অন্ততঃ পড়বার সময় সূর্য্যের কিরণ যেন বইয়ের পাতার উপর এসে না পড়ে।

৯। দক্ষিণ চক্ষুতে যখন কিছু বিজাতীয় পদার্থ পড়বে—তখন ঐ চক্ষু ডল্‌বে না, বরং বাম চক্ষু রগ্‌ড়িও। এইরূপ বাম চোখে কিছু পড়লে ডাহিন চক্ষু ডল্‌তে থাক্‌বে। অথবা প্রয়োজন বোধে উপর বা নীচের পাতা উল্‌টিয়ে কাপড়ের খুঁট পাকিয়ে বস্তুটি এক কোণে সরিয়ে এনে সাবধানে বা'র করে' ফেল্‌বে।

১০। হাতুড়ে চিকিৎসকের অনুমোদন-করা, পাড়া-প্রতিবাসীর ব্যবস্থা-দেওয়া কোন ওষুধ বা সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত 'সহস্র প্রশংসা পত্রের নজীর প্রদর্শিত, অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ সর্ব্ব-প্রকার চক্ষু-রোগের মহৌষধ' ভুলেও কখনও চক্ষে দেবে না। মনে রাখবে—

সাত রাজার ধন—এক
মানিকের চেয়ে চোখের মূল্য ঢের বেশী!

কখন্ চশমা নেওয়া দরকার

(১) যখন তুমি বিশ হাত দূরের লোক্‌কে দিন-দুপুরে একবার মাত্র দৃষ্টি ফেলেই চিন্‌তে পার না বা বড় রাস্তার ওপারে দোকানের সাইন্‌বোর্ডগুলো চল্‌তে চল্‌তে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পড়তে পার না কিম্বা যখন এক এক সময়ে আলোর মাঝেও চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে ও চোখে কতকটা সত্যি সত্যি 'সর্ষে ফুল' দেখ্‌তে থাক।

(২) যখন কোন বস্তুর উপর দুই এক মিনিট অনন্যমন্ হ'য়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই চোখ দিয়ে জল পড়ে, চক্ষু আপনা আপনি ভারী হয়ে' বুঁজে আসে এবং খুব অবসন্ন হ'য়ে পড়ে।

(৩) যখন চোখের ভিতর বা চারি পাশে বেদনা অনুভব কর, যখন ক্রমাগত মাথা ধরতে থাকে, কপাল টিপ্ টিপ্—রগ দিপ্ দিপ্ করে; অথচ তার কোন নিকটবর্ত্তী কারণ খুঁজে পাচ্ছ না, ডাক্তারের ব্রোমাইড, এস্পিরিন্ বা নানালা খেয়ে, মাথায় সুগন্ধি কেশ-তৈল

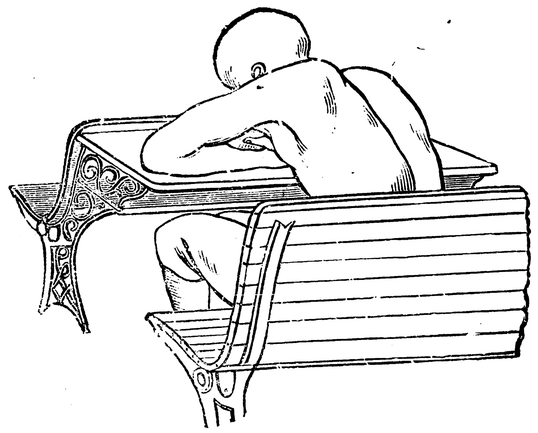

[এইরূপ করে' বসা উচিত নয়]

মেখে, কপালে রক্ত চন্দন-ঘষা কর্পূর সহ লাগিয়ে স্লেসিং সল্ট্ শুকেও কোন ফল হচ্ছে না।

(৪) আফিসে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে যখন চোখ রগড়া'তে হয়, চক্ষু বুজতে হয় বা চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হয়।

(৫) যখন প্রখর রৌদ্রের তেজ একটু সইতে পার না—কপালে হাত দিয়ে বা কোন উপায়ে চোখ আড়াল দিতে হয়।

(৬) বন্ধু বান্ধবরা কাগজ-পত্র যত চোখের নিকট রেখে পড়েন, তার চেয়েও বেশী নিকটে রেখে যদি তোমায় পড়তে হয়।

(৭) যখন খানিকক্ষণ পড়তে পড়তে বইয়ের হরপ্‌গুলো সব যেন তাল্‌গোল্ পাকিয়ে যায়, দুই লাইনের মাঝের জায়গাগুলো লুপ্ত হয়ে লেখাগুলো যেন পরস্পরের কাঁধে চেপে আছে বলে' মনে হয়।

(৮) পূর্ব্বে ছোট হরপগুলো চোখের যতটা নিকটে রেখে পড়তে পারতে, আর তা' না পেরে, বইখানা চোখের আরও নিকটে এনে বা পিছনে ঠেলে যখন পড়তে হচ্ছে।

(৯) ছুঁচের কাজ করতে বা পড়তে যখন মনে হচ্ছে—আরো বেশী আলো পেলে ভাল হয়।

(১০) যখন চোখ মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে লাল হ'য়ে উঠে, মাঝে মাঝে টন্ টন্ করে—জ্বালা করে—ফুলে উঠে, চোখের পাতা নাচে বা চোখের 'তোমা'গুলো কাঁপে আর কেবল অন্ধকারই ভাল লাগে।

স্ত্রীলোক বা পুরুষের উপরিউক্ত দশ দশার যে কোন ত্রয়োদশা এসে যদি উপস্থিত হয়, তাহ'লে জান্‌বে—তা'র চশমা নেওয়ার অবিলম্বে আবশ্যক হয়েছে। অকারণে চশমা পরা যেমন চক্ষের পক্ষে অনিষ্টকর, কারণ উপস্থিত হ'লে চশমা না ব্যবহার করা চোখের পক্ষে তেম্‌নি বিপজ্জনক। জেনে রেখো—এক জোড়া চক্ষুর পরিপূর্ণ জ্যোতির চেয়ে এক জোড়া চশমার দাম অনেক কম; সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়েও সেই বিলয়মান্ জ্যোতিকে ফিরে পাবার চেষ্টা করা উচিত।

চক্ষুর স্বাস্থ্য।

(১) চক্ষুর সুস্থতা দেহের স্বাস্থ্যের উপর পুরো-পুরি নির্ভর করে; চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি পুষ্টিকর আহার খেলে, নিয়মিত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও নিদ্রা দিলে, সংযত ভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করলে এবং বহিষ্করণ যন্ত্র-গুলিকে কর্ম্মক্ষম (বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি পরিষ্কার) রাখ্‌লে তাঁর চক্ষু ভাল না থেকে যায় না। চোখের কিছু দোষ উপস্থিত হ'লে বুঝতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে দেহ-রাজ্যেও কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। সুতরাং চোখকে ভাল রাখ্‌তে হ'লে দেহকে ভাল রাখতে হবে; দেহকে সুটুই, দীর্ঘস্থায়ী ও নীরোগ রাখতে গেলে চক্ষুরও রীতিমত যত্ন নিতে হবে। দেহকে শুধু বসিয়ে খেতে দিলে বা বিশ্রাম না দিয়ে ক্রমান্বয়ে খাটা'লে সে যেমন দু'দিনে ভেঙে পড়ে, চক্ষু সম্বন্ধেও সেই সত্য প্রযুজ্য। তাকেও নিয়ম মত খাওয়ান, স্নান করান, কাজ করান, বিশ্রাম করান ও অসুস্থ হ'লে চিকিৎসা করান উচিত।

(২) একটা অনতিগভীর চওড়া-মুখ (গামলার মত) পাত্রের মধ্যে সহনযোগ্য ঠাণ্ডা জল পুরে তার মধ্যে রোজ একবার করে' কপাল ও চক্ষুর্দ্বয় (নাক বাদ দিয়ে) ডুবিয়ে, বিশ-পঁচিশ বার বেশ জোর করে' বুঁজ্‌বে ও মেল্‌বে;—এরই নাম হ'ল চক্ষু-স্নান। চক্ষের কোন সাধারণ দুর্ব্বলতা ও সামান্য উপসর্গ দেখা দিলে, এক গামলা জলে ২।৪ কাঁচ্চা পরিষ্কার লবন মিশিয়ে তদ্দ্বারা চক্ষু-স্নান সার্‌বে।

(৩) চক্ষুকে ঠাণ্ডা রাখতে গেলে, খাদ্যের সঙ্গে একটু আধটু জলপাই তৈল, পরিষ্কার বাদাম তৈল বা গব্যঘৃতের মাখন খাওয়া ভাল। নারিকেল, বাদাম বা তিল তৈল প্রত্যহ মাথায় মাখা, কপালে ও চক্ষুর চারিপার্শ্বে মালিশ করা চক্ষুর পক্ষে হিতকর; এতে চক্ষুর জ্যোতি অব্যাহত রাখে, চক্ষের ও মস্তিষ্কের শ্রান্তি দূর করে।

(৪) নাছোড়বান্দা চক্ষের পীড়া প্রায়ই কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও হজম-শক্তির চির-পুষ্ট অভাব বশতঃ উদ্ভূত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে অন্ত্রধৌতি * (Colon flushing) করলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(সিফিলিশ গণোরিয়া প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়-জনিত পীড়ার জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই (চক্ষু পাতার দ'না-বাঁধা, চক্ষুর প্রথম ও দ্বিতীয় আস্তরণের বা চক্ষু-মনির প্রদাহ, চক্ষুর মধ্যে স্ফোটক, অক্ষি-নাড়ী ও পেশী-সমূহের অবশতা, অন্ধ্যতা প্রভৃতি) নানারূপ দুসাধ্য যন্ত্রণাদায়ক নেত্র-ব্যাধির সৃষ্টি হয়; ঐ সকল ক্ষেত্রে ভাল চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু-চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কারণ-ঘটক মূল পীড়ার

* অন্ত্রধৌতির বিশদ বর্ণনা সম্বলিত পুস্তিকা স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘে পাওয়া যায়। মূল্য ৵০ এক আনা মাত্র, ৵১০ পয়সার ডাক টিকিট পাইলে ডাকে পাঠান হয়।

চিকিৎসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ডাক্তারেরা ঐ কথাটি অনেক সময় ভুলে যান্।

(৫) খাঁটি সাদা আলো (containing actinic rays) চক্ষের পক্ষে অনিষ্টকর ; এই কারণে মৌচাকের মত ম্যাণ্টেল্-মোড়া গ্যাসের আলো আপত্তিকর। আমাদের দেশে মোটা সলিতা দেওয়া রেড়ীর তৈলের প্রদীপ সব চেয়ে উপকারী। কেরোসিনের আলো ঝড়ের দিনে বা রাস্তা-ঘাটেই ব্যবহার-যোগ্য। কল্-কাতার পড়ার বা শোবার মাঝারী আকারের ঘরে ৫০ বাতির শক্তি-সম্পন্ন বিজলী আলোই শ্রেয়ঃ। আধুনিক আলোক ও বর্ণ-বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করে' স্থির করেছেন যে, লাল ও হলুদ বর্ণ-সুষমা-মিশ্রিত মাঝামাঝি শক্তির আলোই চক্ষুর পক্ষে সর্ব্ব-পেক্ষা সুখকর ও কল্যাণদায়ক।

(৭) বুড়ো আঙ্গুল দুটি খাড়া করে' (যেমন করে' মানুষে কলা দেখায়) চোখের বাহিরের দু'পাশ থেকে আরম্ভ করে' নাকের কাছ পর্য্যন্ত চোখ দুটি মাঝে মাঝে ডলা—বড় সংজ সুন্দর চক্ষুর ব্যায়াম।

(৮) চোখের খুব খাটুনীর পর দু'চারি বার পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া ভাল। ছেলে পিলের চোখে দু'বেলা কাজল পরিয়ে দিতে মা-জননীদের যেন ভুল না হয়। শিশুদের চোখ দিয়ে অকারণে দিনরাত জল গড়াতে থাক্‌লে, ঠাণ্ডা জলে গিরিমাটি ঘষে' চক্ষুর বাহিরে চারিপার্শ্ব দিয়ে হাঁসের ডিমের আকারে প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়। কারো চক্ষু উঠ্‌লে শেয়াকুল কাঁটার (শাল্‌কাঁটার) রস ২ ফোঁটা করে' দিনে দু'বার চক্ষে দিতে হয় আর আলোর তেজ সাধ্যমত এড়িয়ে চলে হলুদ-ছোপান ন্যাকড়া বা কানি দিয়ে চোখ মুছতে হয়।

(৯) দৃষ্টি শক্তিকে বাড়াতে হ'লে—খুব তেজপূর্ণ আকর্ষণক্ষম চক্ষু করতে হ'লে প্রত্যহ নিম্নলিখিত দুইটি বা অন্ততঃপক্ষে যে কোন একটি ব্যায়াম করা সকলেরই কর্ত্তব্য :—

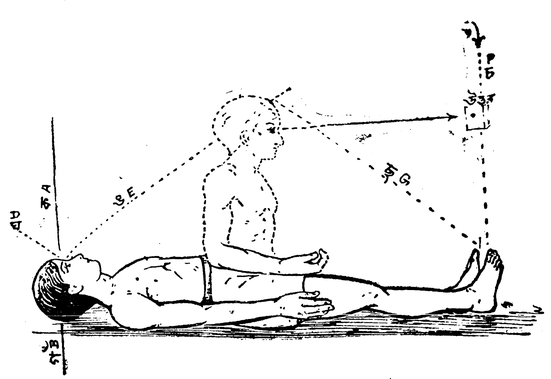

(ক) প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হ'বা মাত্র সর্ব্বোপরি নির্ম্মেঘ নীল আকাশে দেব দিবাকরের রশ্মি মেঝের উপর সুখাসনে (বাবু হয়ে') সন্নিভ জ্যোতি-বিস্ফুরণ। প্রভাতের কুহেলি কালিমার বা সম্মুখের দিকে পা ছড়িয়ে উত্তরমুখ অবসান হইয়াছে ; মধু বসন্তের মধুর জড়িমা ঘুচিয়া হয়ে' বসবে ; তারপর দু'তিন হাত গিয়াছে ; সর্ব্বত্রই একটা জাগ্রত মধ্যাহ্নের দীপ্তি-বিকাশ। দূরবর্ত্তী ঠিক চক্ষুর সমান্তরালে নব-বর্ষের আহ্বান ও ইঙ্গিত ইহার মধ্যে দিয়া তাহার অবস্থিত কোন স্থির ছোট জিনিষে সুস্পষ্ট ঘোষণাকে পরিব্যক্ত করিতেছে।

(দেওয়ালের গায়ে আঁকা একটি যুবক—যাহার প্রাণে বৈশাখী জ্বলজ্যোতির মত আধলা-পয়সার আকৃতিযুক্ত কালির ফোঁটার) প্রতিপ্রস্ফুট আশা ও আকাঙ্খার উদ্দীপনা, তেজ-বিকাশে একাগ্র দৃষ্টিতে অপলকভাবে পাঁচ মিনিট কাল চেয়ে থাকবে [চিত্র দেখ]। সন্ধ্যার পর ঐ রকম একটি বিহ্বল আবেশকে তুচ্ছ করিয়া জাতির জীবন-গগনে মোমবাতি জালিয়ে এক গজ দূরে রেখে তার দিকে একটা প্রদীপ্ত চরিত্র প্রবুদ্ধ উৎসাহ অগাধ পবিত্রতা চেয়ে থাকবে। প্রথম দিনে হয়ত দুই এক মিনিটকাল দম্য সামর্থ্য অনন্যনিষ্ঠ আত্ম-মহিমায় সবিতৃ দেবতার চাইলেই চোখের পাতা পড়ে যাবে—চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ই আবির্ভূত হইয়াছে, সেই যুবক সেই অভ্যুদয়-টস্ করে' জল গড়াবে ; কিন্তু রোজ রোজ একাধিনার প্রধান কর্ম্মী, জাতির আকাঙ্খিত জাগ্রত একটু করে অভ্যাস কর্লে তিন মাসের মধ্যে আবেক-শক্তি।

(৬) রতি দু'য়েক বোরাসিক্ এসিড পাউডার (সব ডাক্তার খানায় কিন্‌তে পাওয়া যায়) ঝিনুক খানেক জলে মিশিয়ে তাই দিয়ে রোজ দু'বার চোখ ধু'লে বা তুলোয় ভিজিয়ে চোখের উপরিভাগটা মুছে নিলে চোখ দিয়ে জল পড়া, চোখ ফুলা, লাল হওয়া প্রভৃতি ছোটো-খাটো চোখের দোষগুলি আরাম হ'য়ে যায়। খাঁটি গোলাপ জল, পদ্মমধুও চোখের অনেক উপসর্গে হিতজনক।

ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপলক নেত্রে চেয়ে থাকা বেশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

(খ). মাটির উপর চিৎ হয়ে' শুয়ে একবার চক্ষের সম্মুখস্থ কড়িকাঠের দিকে চাও, তারপর মাথা না ঘুরিয়ে ডানদিকে একবার ও বামদিকে একবার তাকিয়ে খুব জোরে ত্রিশ সেকেণ্ডকাল চক্ষু বুঁজে থাক। তারপর চক্ষু চেয়ে ঘরের উপর নীচের অটুট কোনের দিকে চাইবার চেষ্টা কর ; তারপর একবার চক্ষু বুঁজে ও খুলে উপরে নীচে ডাহিনে বামে চতুঃপার্শ্বে বিভিন্ন মণ্ডলাকারে দৃষ্টিটি দ্রুত গতিতে ঘুরাইতে থাক। এইরূপ প্রত্যহ একবার চারি পাঁচ মিনিটকাল করবে। এই রকম প্রক্রিয়ার দ্বারাই হিপ্‌নটিষ্টগণ 'ম্যাগ্‌নেটিক্ আই' তৈরী করেন।

(১০) যে রাজার দৃষ্টি শক্তি নেই, অথচ ধনাগারে কোটি কোটি টাকা মূল্যের রত্নাদি আছে, সে অতি গরীব। যে ভিক্ষুক জগতের কোন ঐশ্চর্য্য না পেয়ে কেবল দুটি সুস্থ চক্ষু পেয়েছে, সে ধৃতরাষ্ট্রের মত রাজার চেয়ে অনেক ঐশ্চর্য্যশালী। সকল ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়—চক্ষু ; সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ভগবান-প্রদত্ত চক্ষু-রত্ন ; তার যত্ন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ! !

বাঙ্গালী যুবকের প্রতি নিবেদন

[শ্রীবলাই দেব শর্ম্মা]

বৈশাখের উদ্ভাসিত রৌদ্র-দীপ্তির মধ্য দিয়া নব-বর্ষের আরম্ভ। বৃক্ষে ফল-সম্ভার, কুঞ্জে পিক পাপিয়ার ব্যায়াম করা সকলেরই কর্ত্তব্য :— উদ্বোধন কাকলী, পত্র-পুঞ্জে শ্যামল শোভনীয়তা আর (ক) প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হ'বা মাত্র সর্ব্বোপরি নির্ম্মেঘ নীল আকাশে দেব দিবাকরের রশ্মি মেঝের উপর সুখাসনে (বাবু হয়ে') সন্নিভ জ্যোতি-বিস্ফুরণ। প্রভাতের কুহেলি কালিমার বা সম্মুখের দিকে পা ছড়িয়ে উত্তরমুখ অবসান হইয়াছে ; মধু বসন্তের মধুর জড়িমা ঘুচিয়া হয়ে' বসবে ; তারপর দু'তিন হাত গিয়াছে ; সর্ব্বত্রই একটা জাগ্রত মধ্যাহ্নের দীপ্তি-বিকাশ। দূরবর্ত্তী ঠিক চক্ষুর সমান্তরালে নব-বর্ষের আহ্বান ও ইঙ্গিত ইহার মধ্যে দিয়া তাহার অবস্থিত কোন স্থির ছোট জিনিষে সুস্পষ্ট ঘোষণাকে পরিব্যক্ত করিতেছে।

(দেওয়ালের গায়ে আঁকা একটি যুবক—যাহার প্রাণে বৈশাখী জ্বলজ্যোতির মত আধলা-পয়সার আকৃতিযুক্ত কালির ফোঁটার) প্রতিপ্রস্ফুট আশা ও আকাঙ্খার উদ্দীপনা, তেজ-বিকাশে একাগ্র দৃষ্টিতে অপলকভাবে পাঁচ মিনিট কাল চেয়ে থাকবে [চিত্র দেখ]। সন্ধ্যার পর ঐ রকম একটি বিহ্বল আবেশকে তুচ্ছ করিয়া জাতির জীবন-গগনে মোমবাতি জালিয়ে এক গজ দূরে রেখে তার দিকে একটা প্রদীপ্ত চরিত্র প্রবুদ্ধ উৎসাহ অগাধ পবিত্রতা চেয়ে থাকবে। প্রথম দিনে হয়ত দুই এক মিনিটকাল দম্য সামর্থ্য অনন্যনিষ্ঠ আত্ম-মহিমায় সবিতৃ দেবতার চাইলেই চোখের পাতা পড়ে যাবে—চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ই আবির্ভূত হইয়াছে, সেই যুবক সেই অভ্যুদয়-টস্ করে' জল গড়াবে ; কিন্তু রোজ রোজ একাধিনার প্রধান কর্ম্মী, জাতির আকাঙ্খিত জাগ্রত একটু করে অভ্যাস কর্লে তিন মাসের মধ্যে আবেক-শক্তি।

যুবক কই ? আজ নব-বর্ষের তোরণ দ্বারে পদার্পণ করিয়া আশা-মুগ্ধ-চিত্তে খুঁজিতেছি কই যুবক ! আজও তো জাতি-জীবনের দেহ-মনে অটুট স্বাস্থ্য, অনবদ্য বল-বীর্য্য সঞ্চিত হয় নাই ; এখনও তো সমাজ-প্রাঙ্গন অজ্ঞতার কণ্টক-গুল্মে অরণ্যতুল্য রহিয়াছে ; এখনও তো অজ্ঞতা ও আলস্য দূর হয় নাই, আশা-হীন বক্ষগুলিতে কর্ম্মস্পৃহা উচ্ছসিত হইয়া উঠে নাই, কৃষি ও গো-সেবার গৌরব বিঘোষিত হয় নাই—মন্দির-চূড়ে জয় ধ্বজা উড্ডীন হয় নাই।

অজস্র কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল অভ্যুদয় নয়, যে কাজের উপর বাঙ্গালীর জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে—এমন কাজ আজও একান্ত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করা হয় নাই। করিবার মত একনিষ্ঠ কর্ম্মী নাই বলিয়া কাজগুলি অবহেলিত রহিয়াছে।

চিরিয়া চিরিয়া বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। উচ্চতম আদর্শের তুলনায় পরিমাপ করিবারও প্রয়োজন নাই ; সহজ ভাবে গণনা করিলেও দেখা যাইবে যে, জাতি-গঠন-মূলক কোন কাজই করিবার উদ্যোগ মাত্র

হয় নাই; হইয়াছে মাত্র একটা ক্ষণিক উত্তেজনার চঞ্চল আক্ষেপ! ত্যাগ বা উৎসর্গ যাহা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া অহমিকার এমন একটা তীব্র বিষ্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে—যাহার বিষাক্ত জ্বালায় পুণ্য ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ত্যাগ সত্যই যদি কিছু হইয়াছে, তাহার জন্য দর্পের কি অ ছে? এ ত্যাগ তো নিজের জন্যই, নিজেদের বাঁচিবার জন্যই। আমার জাতি সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আমার যে কর্ত্তব্য তাহা সামান্য মনুষ্য ধর্ম্ম মাত্র; সত্য করিয়া বিশ্লেষণ করিলে উহার বিশেষ মহিমা কোথায়?

বাঙ্গালী জাতি দেহ মনে এমন ক্ষত-দুষ্ট যে, তাহার দ্বারা কোন সমুচ্চ কার্য্যের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই। এখানে আড়ম্বর চলে ভাল, উত্তেজনার মদিরায় উন্মত্ত হইয়া দেশ সেবার নামে একটা বেশ বড় রকম বাহোয়ারীর আয়োজনও চলে বেশ। চলে না—সেই কাজ, যাহা নীরবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিনা দুন্দুভি-নিনাদে করিতে হয়, যাহাতে বক্ষরক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরণ করিতে হয় অথচ তাহার জন্য বাহবা দিবার জন প্রাণী মাত্র থাকে না;—সেই কাজ বাংলায় ভাল চলে না—যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি.ত হয়, অনন্যনিষ্ঠ সাধক হইতে হয়, যাহার জন্য সংযম ও কঠোর পৌরুষের আশ্রয় লইতে হয়।

বাংলায় সত্য কাজ হয় না, তাহার কারণ বাঙ্গালার যুবকগণ পথভ্রান্ত হইয়াছে। যে যুবকের প্রাণে সত্যের অগ্নিহোত্র অনির্ব্বাণ জ্বলিতেছে, অগাধ নিষ্ঠায় যাহার চিত্ত-মন ভরপুর, তেমনি যুবকের আত্মোৎসর্গে দেশের কাজ হইবে। উত্তেজনা কিছু নাই—পুরস্কার কিছু নাই, বরং শুধু নিরাশাকেই সম্বল করিয়া—বেদনাকেই পাথেয় করিয়া চলিতে হইবে; কাজ তবে হইবে।

যুবক বাংলা যেন উদ্‌ভ্রান্ত। লক্ষ্য নাই, নিষ্ঠা নাই, থধূপের মত একবার জ্বলিয়া উঠে—তখনি আবার শীতল অসাড়। এমন করিয়া কি কাজ হয়—কখনও হইতে পারে? যত তুচ্ছ কাজই হউক, স্থির লক্ষ্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা না রহিলে উহা হইতে পারে না। বাঙ্গালী যুবক একটী একটী সাময়িক ঘটনায় যে সেবা-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাচ বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্ম-শক্তি সমর্থন-যোগ্য নহে। ঐ সব সেবার মধ্যে বেশ একটী ক্ষণ-ক্ষয়িষ্ণু উত্তেজক উন্মাদনা আছে; কিন্তু এমন কাজ রহিয়াছে যাহাতে উত্তেজনার লেশ মাত্র নাই, অথচ তাহার সার্থকতা সমধিক।

খুঁটাইয়া কাজের কথা বলিলে আবার সাতকাণ্ড রামায়ণ গাহিতে হয়। তাহার কোন প্রয়োজন নাই, একটা কাজের কথাই আলোচিত হউক। পল্লী-সেবার প্রয়োজন; উহা একটী বিশাল সত্রানুষ্ঠানের মত বিস্তৃত ও ব্যাপক। কিন্তু উহার এমন কয়েকটী অপরিহার্য্য অঙ্গ আছে যাহা করিতে হইলে চাহি—কেবল প্রাণের ঐকান্তিকতা, অপরিমেয় উদ্যম, একটা অচ্যুত শুভ বুদ্ধি আর যৌবনের সর্ব্ব বিজয়ী বীর্য্যস্পর্শ!

বলিয়াছি, বাঙ্গালায় যৌবন নাই—যুবক নাই। যৌবন থাকিলে দেশ এমন হতশ্রী হইত না; যৌবন যে সত্য-শিব-সুন্দরের জ্যোতি প্রীতির প্রস্রবণ। যৌবন থাকিলে পল্লীগুলি সেই যৌবন-স্পর্শে অনুপম শোভা ধারণ করিত, জাতি যৌবনের সেবা-শুশ্রূষায় নব বলে বলিষ্ঠ হওয়া উচিত!

পল্লীর শ্রমজীবি মুর্খ, অজ্ঞান, অন্ধ; কে তাহার সহিত ডাকিয়া কথা কয়? কে তাহাকে দুটা ভাল কথা বলে, কে তাহাকে বলিয়া দেয়, এই মঙ্গল পন্থা—এ পথে চলিলে তাহার ভাল হইবে, বিপদ কাটিয়া যাইবে। গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ, ইহার কারণ কি একমাত্র অর্থাভাব? মিথ্যা কথা, যুবক নাই বলিয়া দেশ অরণ্য হইতেছে! আলো জ্বলিলে যেমন তাহার চারিপাশের অন্ধকার সরিয়া যায়, তেমনি আনন্দ-ভাস্বর যৌবন-দেবতার অধিষ্ঠানে কোন কদর্য্যতাই রহিতে পারে না। তাহাই নহে কি ইউরোপ তাহার যৌবন লইয়া যেখানে পদার্পণ করিয়াছে, সেই স্থানটাই অনুপম শোভায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের কাছে বাধা কিছু নাই, অসাধ্য কিছু নাই।

বাঙলায় শতকরা তিরানব্বই জন অশিক্ষিত। এমন কেহ নাই যে, তাহাদের লইয়া দুদণ্ড দুইটী জ্ঞানের কথা বলে, কিছুক্ষণ সদালাপ করে, ব্যথায় সহানুভূতি প্রকাশ বলে। এ কাজও কি কেহ করিতে পারে না? এই অতি সামান্য কাজ যাহাতে অর্থ-সঙ্গতির কোন আবশ্যকতা—কোন বিশেষ শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন নাই! কেবল একটু মমতা-বুদ্ধি, কেবল একটু অভিন্ন একাত্মবোধ, কেবল নিজের জাতির একটা বিরাট কার্য্যকরী অঙ্গ বলিয়া একটু সুগভীর অনুরাগ থাকিত, তবে নিঃশংসয়ে এই সব উদ্ধার কাজ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। কি করিয়া বিশ্বাস করিব—যুবক বাংলার অস্তিত্ব আছে?

আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে জাতির অন্তর্দেবতা সেই সব যুবককে চাহিতেছেন, যাহারা রৌদ্রস্নাত রৌদ্র-সন্নিভ-তেজঃ-প্রবুদ্ধ রুদ্র দেবতার উপাসক। যাহারা প্রোজ্জ্বল সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মরুভূমির মরিচীকা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে, অটল অক্লান্ত পাদক্ষেপে যাহারা তুঙ্গ অদ্রির শীর্ষদেশকে উল্লঙ্ঘন করিবার প্রয়াসী। এ যৌবন-জল-তরঙ্গের জোয়ার আর কি দেশে জাগিবে না?

আজ আমরা বহির্মুখী বঙ্গীয় যুবকের কাছে এই নিবেদন করিতেছি যে, আসুক ফিরিয়া তাহারা আমাদের ঘরের দুলালরূপে প্রকৃতি-পালিত গৃহের শান্তি-সুধা-সিক্ত আঙ্গিনায়! জাতি এখন হাটের হট্টগোল চাহে না; চাহে আগে ঘর-গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজ গুছাইয়া লইতে—যাহাতে বাঙালী আবার সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি, প্রচুর স্বচ্ছন্দতা, শক্তি-সঞ্জীবন উৎসবের দিন ফিরিয়া পাইবে, তাহার তুলসী তলায় শুকতারার মত আবার আনন্দের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে।

সকলের মান-অপমান, অভাব-অভিযোগ, বিপদ-আপদ ভাগাভাগি করিয়া লইয়া, সকলের মধ্যে সুচিময় সত্যবানের সনাতন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, এস ভাই, নব-জাগ্রত দেশ-সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্ম্ম-পাগল বাংলার সবুজ প্রাণের দল, দেরী করিয়া লাভ কি?—

"মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল-ঘট হয়নিক ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা—সিন্ধু নীরে;
আজি ভার তর মহা মানবের সাগর তীরে!"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু

(১) মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড প্রতিদিন গড়ে ৯২,১৬০ বার স্পন্দন করে। সাধারণ অবস্থায় ইহা বৎসরে তিন কোটিবার স্পন্দিত হইয়া থাকে।

(২) ৫০ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট প্রত্যেক মানুষ সারা জীবনে আপন দেহভারের অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী ওজনের আহার্য্য ও পানীয় উদরসাৎ করিয়া থাকে।

(৩) মানুষ গীত গাহিবার সময় তাহাকে ৪৪টি মাংশপেশী ব্যবহার করিতে হয়।

(৪) পুরুষের মস্তিষ্ক গড়ে ১৫০ ছটাক এবং স্ত্রীলোকের ১।৵০ ছটাক। গড়ে প্রতি পুরুষের মস্তকে সওয়া সের এবং প্রতি স্ত্রীলোকের মস্তকে দেড় সের মগজ থাকে।

(৫) দ্বাবিংশতী বৎসর বয়সে মানুষের সমুদয় অস্থি শক্ত হয় ও জোড়া লাগে। তৎপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সেবায় অমিতাচার একেবারে উচিৎ নহে।

(৬) পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ৪০ বৎসর পরে এবং স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের ওজন ৩০ বৎসর পরে কমিতে থাকে।

(৭) মনুষ্য প্রতি মিনিটে ১০—১৮ বার নিশ্বাস গ্রহণ করে। প্রতি শ্বাস গ্রহণের সময় মানুষ এক পাঁইট্ (Pint) বায়ু দেহ-মধ্যে টানিয়া লইয়া থাকে।

(৮) মনুষ্য-শরীরে প্রায় এক কোটি নাড়ীতন্ত্র (Nerves) এবং মুখমণ্ডলে চৌদ্দখানি অস্থি আছে। একটি মধ্যমাকার মনুষ্য-শরীরে প্রায় সত্তর লক্ষ লোমকুপ থাকে।

(৯) ভ্রূণনাড়ী তিনমাস সময়ের পর মাতৃদেহে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

(১০) প্রত্যেক দশ হাজার লোকের মধ্যে গড়ে একজন লোকের একশত বৎসর পরমায়ু নির্ণীত হইয়াছে।

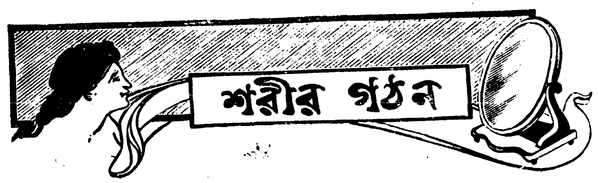

শরীর গঠন

[ডাক্তার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্-বি]

সুস্থ ও শক্তিমান্ শরীর মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার; একটা রাজত্ব অপেক্ষা একটা নিরোগ হৃষ্টপুষ্ট শরীরের দাম বেশী। কতকটা অজ্ঞতার বশে, কতকটা অবহেলায়, কতকটা বিলাসের মোহে, কতকটা ক্ষণিক সুখের উত্তেজনায়, আমরা একদিকে যেমন স্বাস্থ্য-রত্ন হারাইয়া বসি, অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যরত্নকে অধিকার করিবার কোন প্রয়াস করি না। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, জীবনের ধারাকে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরা সামান্য চেষ্টাতেই অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি।

এক চিন্তাশীল ডাক্তার বলিয়াছেন, "মানুষ প্রথম বয়সে পয়সার জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করে। শেষ বয়সে স্বাস্থ্যের জন্য পয়সা নষ্ট করে।" কথাটা খাঁটি সত্য। এই ব্যাপার সমগ্র সভ্য জগতে নিয়ত পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু বাঙ্গলা যেরূপ ব্যাপকভাবে এই নীতির অক্ষরে অক্ষরে স্বার্থকতা সম্পাদন করে, সেরূপ বুঝি আর কুত্রাপি দেখা যায় না। বাঙ্গলা যেমন এককালে বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, শৌর্য্য-বীর্য্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শীর্ষস্থানে ছিল, তেমনি আজ সকল বিষয়ে সে ভারতের কেন—তথা সমগ্র জগতের পদতলে নামিয়া গিয়াছে। "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম, ত্বংহি প্রাণা শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!"— এই মাতৃ-মন্ত্র যে দেশের বীর-কবি যে জাতির কাণের ভিতর মুরজ মন্দ্রে ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন, সেই মন্ত্রহীন ধর্ম্মদ্রোহী কর্ম্মবিমুখ জাতি আজ রাম ছাগলের ভয়ে ঘরে খিল্ আঁটিতেছে— খেঁকি কুকুরের পদ সেবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে!

শক্তিশালী হইতে গেলে—আদর্শ মত শরীর গঠন করিতে গেলে অনেকগুলি জিনিষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমতঃ শরীরকে বাল্যকাল হইতে কষ্ট সহিষ্ণু স্বভাব-সঙ্গত ও শুদ্ধাচারী করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে মানুষ যেমন ভগবানকে নিকটে রাখিয়া তাঁহার অস্তিত্বকে পদে পদে স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুশাসনকে মানিয়া চলিলে তাহার দ্রুত উন্নতি হয়, সেইরূপ শারীর সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির সহিত জীবনের সুরকে মিলাইয়া লইয়া কায়মনোবাক্যে তাহার শরণাগত হওয়া চাই! জীবনকে যতদূর সম্ভব আড়ম্বরশূন্য, নির্লোভী ও আনন্দময় করিতে হয়। এমন অনেক কাজের ভার অনেক লোকের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে যে, সেগুলিকে পরিত্যাগ করিলে পেট চলে না অথবা

তাহাদের মোটেই সরল সহজসাধ্য বলা যায় না; কিন্তু কাজ গুরুত্ব মনের মধ্যে বিনাইয়া গুরুতর করিয়া তোলা কোন

উচিত নহে এবং জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য কাজও উপভোগ্য করিয় মনের আনন্দে খেলাচ্ছলে সাধন করা-উচিত। ইহাতে শরীর ভাঙিয়া না পড়িয়া বরং নূতন তেজে গড়িয়া উঠিবে। "Always think work as play"—এই কথাটা আজকাল পাশ্চাত্যের সকল মনীষীগণ একবাক্যে উপদেশ দিতেছেন। যাঁহারা এই উপদেশমত কাজ করিতেছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যে সকল রোগ হওয়া সম্ভব ছিল—সেগুলির হাত হইতে ত অব্যাহতি পাইতেছেনই, পরন্তু স্বাস্থ্যের অবস্থাও তাঁহাদিগের ক্রমশঃ ভালোর পথে অগ্রসর হইতেছে। কাজকে বোঝা মনে করিয়া—'সারিতে পারিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি' ভাবিয়া যিনি কাজ করেন, যিনি কাজের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন খুসীর ভাব (interest) খুজিয়া পান্ না, জীবন-যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় সুনিশ্চিত!

কিন্তু কাজের সঙ্গে চাই—উপযুক্ত সারবান্ খাদ্য। অনেকে মনে করেন—যাহারা হাতে অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম করে, তাহাদের অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমীদের খাদ্য কম হওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ ভাবেন—প্রত্যহ খুব বেশী পরিমাণে খাইলে শরীর ভাল হয়। কিন্তু এই দুই ধারণাই ভুল! কায়িক পরিশ্রমী অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমীর খাদ্য গুণগত বা পরিমাণগতভাবে কম হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু স্বাস্থ্য-অভিলাষী ব্যক্তি মাত্রেরই খাদ্য-সংযম একটি প্রধান করনীয় বিষয়। খাদ্য সর্ব্বদাই খুব আড়ম্বর-শূন্য, মাঝামাঝি পরিমাণে হওয়া চাই, এবং পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কোন কঠিন দ্রব্যই উদরের মধ্যে পাঠানো স্বাস্থ্যকামী লোকের কোনক্রমে উচিত নহে। খাদ্য গ্রহণের সময় তিনটি জিনিষের প্রতি নজর রাখিতে হয়—(১) খাওয়ার সময়কার মানসিক অবস্থা (২) খাওয়ার সময়ের শারীরিক অবস্থা (৩) খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি।

খাওয়ার সময় খুব পরিশ্রান্ত, উত্তেজিত, দুশ্চিন্তাযুক্ত বা ক্রোধান্বিত থাকিলে, "এটা হজম হয় কি না সন্দেহ" "ওটা বড় গুরুপাক্ জিনিষ"...প্রভৃতি চিন্তা করিলে বা খাওয়ার ঠিক পূর্ব্বে বা পরে ক্লান্তিজনক কোন ব্যায়াম করিলে, খাদ্য যেরূপ পরিমাণ বা প্রকৃতিরই হউক না কেন, গ্রহণ করা উচিত নহে—তাহাতে শরীরের উপকার হয় না। খাদ্য গ্রহণের পূর্ব্বে বেশ তীব্র আকাঙ্ক্ষাজনক ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া চাই; আহারের অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে কোষ্ঠসাফ্ করা চাই এবং আহারের সময় শরীরে যেন কোন গ্লানি না থাকে। শরীর একটু বেসুরো বাজিলে বা আহারে সামান্য অরুচী হইলে, একবেলা উপবাস দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। "উপরোধে ঢেঁকি গেলা" বাঙালীর অম্ল-অজীর্ণের একটি প্রধানতম কারণ। তারপর খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হাজার রুচী—হাজার প্রবৃত্তি হইলেও এমন পরিমাণের খাদ্য কখনো খাওয়া উচিত নহে—যাহা "একটা বিড়ালে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না"। খাদ্যের মধ্যে প্রত্যহ যেন কিছু টাট্কা ফল থাকে; খুব ঘি-গরম মশলা-দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জন বা তেলে-ভাজা যে-কোন জিনিষ একেবারে পরিত্যজ্য; আর রাঁধা জিনিষ যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। জীবন-বিজ্ঞান-বিশারদদের মধ্যে অনেকেই বলেন—'Cooked foods are dead foods—it was never meant for the living being."

মাছ পরিমিত মাত্রায় খাওয়া ভাল। মাংস ও দুধ কোন উৎসব উপলক্ষ্যে খাওয়াই উচিত, কারণ প্রথমটির সেবা প্রত্যহ বাঙালী শরীরের আদৌ উপযোগী নহে; দ্বিতীয়টি কৈশোর কাল হইতে খাওয়ার কোন সার্থকতা নাই—উহা শৈশবের উপযুক্ত খাদ্য। দুধ খাইতে হইলে ক্ষীর করিয়া বা খুব জাল্ দিয়া খাওয়া উচিত নহে; এক ফুট দিলেই নামাইয়া ঈষৎ গরম গরম অবস্থায় কোন কঠিন দ্রব্য সহযোগে খাওয়া উচিত। পাতে একটু ঘি বা মাখন, গ্রীষ্মে একটু দধি বা ঘোল খাওয়া দীর্ঘজীবনের সহায়ক; যাঁহারা মাছ মাংস খান্ না, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে ডাল মুগ, মুসুর বা ছোলার ডাল সিম ও বাদাম এবং সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়া ছানা খাওয়া উচিত। পূর্ণ আহার ২৪ ঘণ্টার মধে একবার হইলে ভাল হয়,—দুই বার হইলে রীতিমত যথেষ্ট হয়; ২ আহারের মধ্যে দরকার মত সামান্য একটু লঘু জল-খাবার খাওয়া চলিতে পারে। খুব বেশী দামের জিনিষের মধ্যে খুব বেশী পুষ্টিকর পদার্থ লুকিয়ে আছে, আর কম দামের জিনিষের মধ্যে তাহা দুষ্প্রাপ্য—এ মত পোষণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের শতকরা নব্বইটি ব্যারাম প্রধানতঃ খাদ্যের দোষে উৎপন্ন হয়। বিগত ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রের সময় রসদ-অনটনে জার্ম্মাণীর সৈন্য-চমূর মধ্যে যখন খাবারের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, তখনই তাহাদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ ও সাধারণ স্বাস্থ্যের অতি আশ্চর্য্য উন্নতি পরিলক্ষিত হ'ল। বুলগার, ইতালিয়ান্, আইরিশ ও আধুনিক রাসিয়ান্রা খুব স্বল্পাহারী; কিন্তু দৈহিক ও মানসিক বলে তাহারা কোন সভ্য জাতিরই পশ্চাৎপদ নহে। আমেরিকা খুব ধন সঞ্চয় করিয়া জাতিগতভাবে প্রত্যহ বড় বড় 'খানা' খাওয়ার অভ্যাস করিয়াছেন। সেই জন্য বাংলার মত সেখানেও ঘরে ঘরে অম্ল রোগ দেখা দিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ইয়োরোপা সুন্দরীর শান্তশিষ্ট ছেলেরা তাহাকে "A nation of dyspeptics" বলিয়া মাঝে মাঝে বেশ বিদ্রূপ করে।

শরীর গঠন করিতে গেলে নেশার আশ্রয় গ্রহণ করা কোনমতে উচিত নহে। অতিবড় নেশার ভক্তও নেশার সপক্ষে কোন

বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না—ইহা ধ্রুব সত্য। প্রত্যেক নেশাটি যমের এক একটি ছদ্মবেশী ছোট বড় দূত বিশেষ! জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী আমেরিকার বিখ্যাত মটরের উদ্ভাবক ও সত্বাধিকারী হেনরী ফোর্ড সত্তরের কোঠা অতিক্রম করিয়া আশীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন; তিনি বলেন "মানুষ সংযমী হয়ে জীবন যাপন কল্লে একশ' পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি সহজে বাঁচতে পারে; আমিও বাঁচব—আশা করি!" আমাদের দেশের খনা—হস্তী ও মানুষের পরমায়ুর সীমা ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন!

এডিসন (যিনি গ্রামোফনের উদ্ভব-কর্ত্তা) ও লুথার বার্ব্যাঙ্ক (যিনি স্যার জগদীশের ন্যায় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্)—ফোর্ডের বিশেষ বন্ধু ও প্রায় সমবয়সী; ইঁহারা সকলেই একশত বৎসর উত্তীর্ণ করবেন বলে' দৃঢ় ধারণা করেন। মাছ, মাংস, মদ, সিগারেট্ ও অন্যান্য পিঠা-পুলি, কেক্, পুডিং, কোর্ম্মা, কাবাব্ প্রভৃতি খাদ্যের প্রাচুর্য্যের নিকট হ'তে এঁরা অনেক দূরে থাকেন এবং টাট্কা ফল-ফুলুরী, লাল ময়দার পাঁউরুটি, ২।৪ রকমের শাক-সব্জী, ঠাণ্ডা জল ও সময় বিশেষে একটু গরম দুধ ছাড়া এঁরা ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ অন্য কিছু খান্ না। সমস্ত জিনিষই এঁরা বেশ উৎসাহের সহিত ভক্ষণ করেন এবং অতি ধীরভাবে প্রত্যেক গ্রাসটি চর্ব্বন করিয়া গলাধঃকরণ করেন। এই সামান্য খাদ্য খাইয়া ইহারা আনন্দের হাসি হাসিয়া বলেন, "আমরা যৌবনকে আবা নূতন রূপের ভিতর দিয়ে উপভোগ কর্চ্ছি!"

তারপর ব্যায়ামের কথা! যাঁহারা মস্তিষ্কের কার্য্য করে তাঁহাদের পক্ষে নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার বটে। মানুষে জীবনের দাঁড়ী-পাল্লায় একদিকে রহিয়াছে মন, অন্যদিকে রহিয়া দেহ! দুইটিরই ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম ও বিশ্রাম চাই; তবেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, তবেই ত জীবনের সার্থকতা! কিন্তু ডন্ করিলে, মুগুর ভাঁজিলে, কুস্তী লড়িলে, ডাম্বেল লইয়া হাত ছুড়িলেই শরীরের উন্নতি-সাধন হয়—এমন নহে! যিনি যে-ব্যা করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন—তাঁহাকে সেই ব্যায়াম করি দেওয়া উচিত। কেহ বাগান কোপাইয়া আমোদ পান্, বাইসাইকেল্ চড়িয়া আমোদ পান্, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া স্ফূর্তি থাকেন, কেহ প্রাতে ও বৈকালে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে কেহ টেনিশ খেলিতে—কেহ কিং কিং খেলিতে—কেহ বা সাঁত কাটিতে পছন্দ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই-সেই কার্য্যগুলি হইল ব্যায়াম। মোট কথা, আলসেমি করিয়া জায়গায় বসিয়া নাড়িয়া কোন কালে ব্যায়াম হয় না—হাত-পা গুলি বেশ একটু খে চাই। ব্যায়াম প্রত্যহ নিয়মিত সময় পরিমিত মাত্রায় করিতে অল্পে অল্পে বাড়াইতে হয়; ব্যায়ামের সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বা প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং 'ইহার দ্বারা আমার শরীরের উন্ন হইতেছে'—এই প্রতীতিকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতে হ চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের খেলাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। প জন্য ছেলেদের যেমন ভৎসনা করিতে হয়, সময় বিশেষে তে খেলার জন্য তাহাদের ধমক্ দিতে হয়। যে ছেলেরা বেশী খে ধূলার পক্ষপাতী তাহারা প্রায়ই দুশ্চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির হাত হ অব্যাহত থাকে—পরোপকার-বৃত্তিটা তাহাদের অধিকাংশের ম অল্প বয়স হইতেই বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাহারা খেলা করে না—মন-মরা হইয়া থাকে বা কেবল বই মুখে করিয়া ভাল ছে সাজে, তাহারাই পর জীবনে সাধারণতঃ যক্ষ্মা প্রভৃতি মারা ব্যায়রামে পতিত হয়। দুই বৎসর বয়স হইতে পঁচাত্তর ব পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার ব্যায়ামের প্রয়োজন।

শরীর গঠনের আরোও কয়েকটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হই সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য পালন, সর্ব্ববিষয়ে নিয়মনিষ্ঠা ও দেহ-মনের নির্মি স্বাচ্ছন্দ্য ও শুদ্ধি!

স্বাস্থ্য-সমাচারকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে

এবং উহার প্রবন্ধাদি সরলভাবে বুঝিতে হইলে শরীরের আভ্যন্তরিন্ যন্ত্রসমূহ ও উহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। আমাদের দেহতত্ত্ব এ বিষয়ে আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিবে। দাম ১।০ মা

বৈচিত্র্য সংগ্রহ

মোটামুটি ধরতে গেলে একটা বয়স্থ হাতীর ওজন প্রায় পঁচাত্তর মন হ'বে।

* * * *

নিরামিষ-ভোজীরা বলেন, মাংসাশীদের চেয়ে তাঁদের মাথায় বেশী ঘনসম্বদ্ধ চুল হয়; এবং ঐ চুল অধিককাল স্থায়ী হয়; অকালে টাক্ পড়া ব্যায়রাম অধিক মাংস-ভোজীদের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়।

* * * *

চীন ভাষায় ৩০,০০০ বর্ণমালা আছে এবং উহা লইয়া ছয় রকম লেখ-ভঙ্গি (Style) প্রচলিত আছে।

* * * *

প্যারিসের ডাক্তাররা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিস্তৃত ও বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ করে' দেখেছেন যে, মাতালের সন্তানেরা কখনও দেহ মনে সুস্থ বা নিখুঁত হ'তে পারে না।

* * * *

একজন সাধারণ মানুষ পাঁচ মিনিটকাল বাতাসের অভাবে মারা যায়; জলের অভাবে এক সপ্তাহের মাথায় মৃত্যু বরণ করে; নিদ্রার অভাবে দশ দিনের ভিতর ইহলীলা সাঙ্গ করে।

* * * *

ইহুদীদের মধ্যে বিয়ের সময় ক'নেকে বরের দক্ষিণ দিকে দাঁড়াবার রীতি মান্তে হয়। কিন্তু জগতের অন্য সব দেশে ক'নে দাঁড়ায় বরের বাম দিকে।

* * * *

য়্যাসেন্সন্ দ্বীপে এক এক রকমের ভীষণ আকারের এক ফুট্ আন্দাজ লম্বা কাঁকড়া দেখা যায়। তারা নদীর তীরে খরগোসের বাসা থেকে ডিম ও ছানা চুরী করে' ত খায়ই, উপরন্তু ঘুমন্ত ধাড়ী খরগোসদের ধরে' নিয়ে গিয়ে দিব্যি ভোজ লাগায়।

* * * *

পায়রা যদি এক গর্ভে পর পর দুটি ডিম পাড়ে, তার একটি ফুটে' স্ত্রী ও অন্যটি ফুটে' পুরুষ পায়রা হবেই। আরও পরীক্ষা করে' জানা গিয়াছে যে, প্রথম ডিমটি স্ত্রী ও দ্বিতীয়টী পুরুষ হয়।

* * * *

একজন জার্ম্মাণ গণনা-বিশারদ স্থির ক'রেছেন যে, সভ্য জগতে কিছু কম বেশী ৮১০০০০০০ একাশী লক্ষ ঘোড়া আছে।

* * * *

জগতে ২৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার রকমের পোকা আছে। তার মধ্যে কতকগুলি পোকা এত ক্ষুদ্র যে, তাদের চার হাজারকে একত্র করলে আধ রত্তি বালির তুল্য হয় কি না সন্দেহ!

শিশু-মঙ্গল

শিশুরে যে কোলে ক'রে থামায় ক্রন্দন,
জাগায় দেবতা-বুকে পুলক-স্পন্দন।
অনাথ শিশুরে যেই গৃহতলে আনে,
স্বর্গ তারে হাসি মুখে নিজ পানে টানে।
যে জননী বাছনীরে আনেন ধরায়,
চৈতন্য শঙ্করে নিত্য সত্য সে জীয়ায়!

রক্ষা-কবচ।

[কবিরাজ শ্রীভবতারণ বিদ্যারত্ন]

ডালিমের ফুল তিন চারিটি কাঁচা দুগ্ধে বাটিয়া অল্প মধুর সহিত প্রত্যহ দুইবার পান করিলে রক্ত-প্রদর রোগে বিশেষ উপকার হয়।

ধাইফুল এক তোলা কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া মধু মিশাইয়া প্রত্যহ একবার বা দুইবার পান করিলে শ্বেত-প্রদরে বিশেষ উপকার হয়।

গণ্ডমালা রোগে—স্ফোটক একটির পর একটি উৎপন্ন হয়; কোনটি অপক্ক থাকে, কোনটি বা পাকিয়া যায়। যে যে গুলি পাকিয়া গলিয়া যাইবে, তাহাতে সজিনা গাছের মূলের ছাল ও দেবদারু কাষ্ঠ (উহার কুচি বা চাঁচি), কাঁজির (আতপ চাউল ধোয়া জল) সহিত বাটিয়া কিছু দিন প্রলেপ দিলে ঘা সম্পূর্ণ ভাল হয়।

মৃগী রোগ হইলে কৃষ্ণতিল তৈল আধতোলা, রসুন বাটা ৵০ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিছু জল খাওয়ার পর প্রাতে প্রতিদিন ৭।৮টার সময় খাইলে রোগ আরোগ্য হয়। কিম্বা শতমূলীর রস অর্দ্ধ ছটাক ও কাঁচা দুধ আধ ছটাক মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতে ১০—২০ দিন খাইলে মৃগীরোগ নষ্ট হয়। পুরাতন হইলে উক্ত যে কোন প্রকার ঔষধ ২ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

প্রথম কুঁচ্‌কী ফুলিলে তাহাতে বটের আটা, কিম্বা শঙ্খহীন শুষ্ক শামুক পরিষ্কার পাটের থলিয়া বা কম্বলের উপর ঘর্ষণ করিতে করিতে গরম হইলে ঐ তাপ দুই বেলা ২০।৩০ বার করিয়া লাগাইলে বসিয়া যায়। কোন স্থানে আব্ উঠিতে থাকিলে ঐ ভাবে শামুকের স্বেদ (foment) ২ বেলা করিয়া লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ ৪,৫ দিন করিলেও যদি না সারে তাহা হইলে অন্য ব্যবস্থা করিবে।

রবিবারে শ্বেত জয়ন্তীর মূল এক আনা, আধ কিম্বা এক পোয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া ২১ দিন খাইলে ধবল নষ্ট হয়। ইহা বৈদ্যনাথের স্বপ্নাদ্য ঔষধ বলিয়া খ্যাত। পুরাতন ধবল হইলে আরো কিছু দিন খাইবে।

সুপারী পাতার রসের সহিত গন্ধক ঘষিয়া মাখিলে সেই স্থানের কেশসকল উঠিয়া যায়।

জন্মিয়া যদি কোন শিশু মাই না টানে, তাহা হইলে সামান্য একটু শুষ্ক আমলকী ও হরিতকী মিহিভাবে গুঁড়াইয়া, ২।৩ ফোঁটা মধুর সহিত মাড়িয়া শিশুর জিহ্বায় ১ মিনিট কাল ধরিয়া দুই চারিবার ঘষিয়া দিবে।

মাষকলাইর আধ ছটাক ডা'ল প্রথমতঃ ঘৃতে ভাজিয়া পরে আধ সের দুগ্ধে আধঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া চিনি বা মিশ্রীর সহিত দুই সপ্তাহ কাল ভক্ষণ করিলে, কিম্বা টাট্‌কা রুই মাছের পেটি অথবা পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া দুই সপ্তাহ কাল খাইলে শুক্র গাঢ় হয় ও সহবাস-শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

কাঁচা ভেড়ার দুগ্ধ লাগাইলে অথবা উহার সহিত অনন্তমূল ঘষিয়া একত্র লাগাইলে জিহ্বা ও মুখের ঘা আরোগ্য হয়।

পানের রস অথবা পিঁয়াজের রস মাথায় মাখিয়া আধঘণ্টা পর দধি ও চিনি দিয়া মাথা ঘষিয়া ধুইয়া ফেলিলে, মাথায় খুস্কি নিবারিত হয় ও উকুন সব মরিয়া যায়।

সাদা কুমড়ার বীজ বা শশার বীজ কিম্বা আমলকী বাটিয়া নাভির নীচে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়। যবক্ষার চূর্ণ ২ দুই আনা হইতে ছয় আনা চিনি অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা প্রতিদিন প্রাতে শীতল জল সহ খাইলেও বিশেষ উপকার হয়। ৪।৫ দিন খাইতে হয়।

সম্পাদকের ডাকবাক্স

চিঠি নং ১

* * মহাশয়, আপনারা নান দিক দিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন—গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু স্বাস্থ্য-পালনের মধ্যেই আপনাদের কার্য্য-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। দেশের লোক পেট্ ভরিয়া খাইতে না পাইলে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবে কি করিয়া? যাহাতে দেশবাসীর ধনার্জ্জন শক্তি বাড়ে—দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে—দেশের লোক দু-মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, সেই উপায় নির্দ্দেশের কিছু আলোচনা আপনার "সমাচারে" স্থান পাওয়া উচিত নয় কি? ধনাগম তৃষ্ণা সকলেরই আছে, কিন্তু আসে কোথা হইতে, দেয় কে? * * আপনার পত্রিকায় কৃষি ও গো-পালন সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—আমরা পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ঐরূপ সংবাদ আপনার স্বাস্থ্য-সমাচারে স্থান দেওয়া উচিত। শ্রীযুত যামিনী বাবুর "জাপানের কৃষি" পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম; ঐরূপ অন্যান্য সভ্য দেশের কৃষি সম্বন্ধে বিস্তৃত পদ্ধতির আলোচনা করিয়া তিনি যদি আমাদের দেশের ভদ্র সন্তানগণ কিরূপে সামান্য জমিকে কারকিৎ করিয়া বহুলোৎপাদিকা কৃষি উৎপাদন করিয়া চাকুরীর ভয়ঙ্কর মোহ ও নাগরিক জীবনের সর্ব্বনাশী বিলাসিতা কাটাইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত সন্ধান ব্যবহারযোগ্যভাবে দিতে পারেন, তাহাহইলে আমরা বিশেষভাবে কৃতার্থ হই।

বিনীত

শ্রীকৃষ্ণকুমার রায়, বাঁকুড়া।

উত্তর।

আপনার কথার যুক্তিযুক্ততা আমরা ইতোমধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি এবং স্বাস্থ্য-সমাচারে যাহাতে মাঝে মাঝে কৃষি, গো-পালন ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি বাহির হয় তাহার চেষ্টা করিতেছি। আগামী মাসেই বোধহয় কৃষি সম্বন্ধীয় কিছু প্রকাশিত হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি আগে, না—দেশের ধনের উন্নতি আগে, এ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। আমরা যখন গত ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল দেশের স্বাস্থ্য-চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন সকলের আগে স্বাস্থ্যকে অর্জ্জন করিবার উপদেশ প্রত্যেককেই দিব। কারণ স্বাস্থ্য না থাকিলে ধর্ম্মার্জ্জনের স্পৃহা ও শক্তি আসিবে কোথা হইতে? কোনটি আগে এবং কোনটি বৃহত্তর তাহার আলোচনা স্বাস্থ্য-সমাচারে বহুবার হইয়া গিয়াছে; এই স্থান-সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তন নিষ্প্রোজন!

চিঠি নং ২

সম্পাদক মহাশয়, নমস্কার জানিবেন!

আমার স্বামীর বয়স ৩৭ বৎসর, এই বয়সেই তিনি হাঁপানী বাঁধাইয়াছেন। শীত ও বর্ষায় খুব বাড়ে। কাসিতে কাসিতে এক একবার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। ডাক্তার দেখিতেছে, কিন্তু বিশেষ উপকার হয় না। বড় ভাবনার মধ্যে আছি। ঐ কাশি উপশমের কিছু ব্যবস্থা করিতে পারেন?

ইতি—

শ্রীসুনীতিবালা সেন, কলস কাঠি।

উত্তর।

কর্পূর ১ড্রাম, মেন্থল ১ ড্রাম—১ ড্রাম ইউক্যালিপ্টাস তেলে মিশাইয়া খুব ঝাঁকাইয়া রাখিয়া দিন্। পোয়া খানেক অতি উষ্ণ জলে উহার ৫।৬ ফোঁটা ফেলিয়া সহ্য-মত উহার বাষ্প আপনার স্বামীকে নাক্ দিয়া টানিয়া লইতে দিবেন। ১৩২৯ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত ডাঃ শ্রীযুত রমেশচন্দ্রের হাঁপানী বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

ইষ্টারের সম্মেলনসমূহ।

গত ইষ্টারের বন্ধে বাংলায় তিন তিনটা মহাসভার অধিবেশন হইয়া গেল। কলিকাতায় হিন্দু-মহাসভা, বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন, মুন্সিগঞ্জে সাহিত্য-সম্মিলন। এতগুলি সভা-মহাসভার অধিবেশনের পর দেশ কি কিছু স্পষ্ট কাজের প্রত্যাশা করিতে পারে না? কেবল প্রস্তাবের কথায় কাজের চিঁড়ে ভিজিবে কি? আমরা আর কতদিন এমন করিয়া বারোয়ারীর মজা করিয়া বেড়াইব?

হিন্দু-মহাসভার উদ্দেশ্য—হিন্দু-সংগঠন! কিন্তু কেমন করিয়া হিন্দু গঠিত হইবে? হিন্দুর যে দেহই নাই। কি অবলম্বন করিয়া সে সবল সুস্থ হইবে? হিন্দুর মন ও চিত্ত কোথায় বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইবে? "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"। সেই শরীর গিয়াই না আজ হিন্দুর এত দুর্দ্দশা ও অবমাননা! হিন্দু-মহাসভায় যে সমস্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে; হইবারই কথা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন—"দেহ মনে সুস্থ সবল হও; তুমি তোমার প্রকৃত রোগ বুঝিতে পারিবে; এবং ভিতরের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় শীঘ্রই সুস্থ হইবে।" হিন্দু-মহাসভা সেই দেহ মনে সবল হইবার স্পষ্ট উপায়টী বলিয়া দিলে এবং তাহাকে একটী স্থায়ী অনুষ্ঠানের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিলে যথার্থই দেশের কল্যাণ হয়। শুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে। হিন্দু সংগঠন করিতে হইলে হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যকে মহত্তর ও কর্ম্মক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করিতে হইবে—'ছুঁৎমার্গ' ও 'অস্পৃশ্যতা' শব্দ দুইটি হিন্দুর অভিধান হইতে একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। নারীর ন্যায্য অধিকারকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পেট্‌রোগা ভণ্ড বাবাজীর দল আর চাই না; এখন চাই—সত্যনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত মহাপ্রাণ কর্ম্মী! ব্রাহ্মণ-মহাসভার সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যায়। টিকি-পৈতের বড়াই করিয়া বৃথা বাক্য-লড়াইয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে। মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া এখন প্রয়োজন—পতিতের উদ্ধার, কর্ম্মজ্ঞানের বিস্তার, সত্যের প্রতিষ্ঠা!

এই সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধেও কয়টী কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্য দেশের অজ্ঞানতা দূর করিয়া দেয়। আমাদের দেশে শতকরা তিরানব্বই জন মূর্খ। লেখাপড়ার দিক দিয়া ৯৩জন বটে; কিন্তু স্বাস্থ্যজ্ঞানের দিক দিয়া বিবেচনায় শতকরা ৯৯½জনই ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য-সম্মিলন কি এমন অবস্থায় কেবল মুষ্টিমেয়ের মানসিক উপভোগ এবং নৃ-তত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক নিদ্রাকর্ষণকারী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ লইয়াই ব্যস্ত রহিবেন? বাঁচিবার সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন না? যে সাহিত্যে জাতি শরীরটার প্রতি অবহিত হয়, স্বাস্থ্যকে ধর্ম্ম সাধনের আদিভূত বলিয়া মনে করে, যে সাহিত্যে একটু কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত হয়, সমষ্টির হিতে ব্যক্তি গত স্বার্থত্যাগ করিতে শিখে, জীবন-বিজ্ঞান, শক্তিচর্চ্চা, ধর্ম্মনিষ্ঠায় জ্ঞানলাভ করে, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ সূক্ষ্মকলার চর্চ্চা না করিয়া সমস্ত করিলে দেশটা বাঁচিয়া যায়।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৫শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল | ২য় সংখ্যা

হিন্দু লোকাচার ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুদিগেরর আচার-ব্যবহার স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত। তবে, হিন্দুরা "অমুক করিলে অমুক হয়, অতএব অমুক কর", এই ভাবে কথাগুলি না বলিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের বজ্র-গম্ভীরস্বরে অনুজ্ঞা-রূপে সেগুলিকে বলিয়া গিয়াছেন। সেরূপ বলিবার দুইটি কারণ থাকিতে পারে; প্রথম কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা—সকল কথাই ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত করিয়া দিলে হিন্দুর হৃদয়ে তাহা সহজে ও স্থায়ীরূপে স্থান পাইবে। দ্বিতীয় কারণ, সমাজের মূঢ়াবস্থা। নিতান্ত শিশুকে "আলমারির জিনিষগুলি ঘাঁটিলে আমার নানারূপ অসুবিধা হইবে, অতএব আলমারি ঘাঁটিও না" এ কথা বলা অপেক্ষা "আলমারির জিনিষ ঘাঁটিলে তুমি শাস্তি পাইবে"—এইরূপ অনুশাসন বলিলে উহা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যখন সমাজে অধিকাংশ লোকেই মূঢ় থাকে, তখন এই ভাবেই বলা সমীচীন। বোধ হয়, এই কারণে সকল কথাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দেবতার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিশদ কারণ সংগোপন করিয়া কেবল সংক্ষেপ আজ্ঞারূপে হিন্দুশাস্ত্রকাররা বলিতেন।

কিন্তু না বুঝিয়া কোনও বিষয় কণ্ঠস্থ করিলে যাহা দাঁড়ায়, আজ আমাদিগের ঠিক সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে! শাস্ত্রকাররা প্রত্যেক জিনিষের হেতু বলিয়া না যাওয়ায় আমাদের কেহ কেহ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদাকে দূরে রাখিয়া তাহার বিধির অক্ষরে অক্ষরে (কখনও বা উহারও বেশী) অনুসরণ করিয়া থাকি। কেহ কেহ বা হিন্দুশাস্ত্রটাকে অসভ্যতার পরিচায়ক কুসংস্কার বা ব্রাহ্মণদিগের চাতুরী জ্ঞানে সদর্পে উড়াইয়া দিই। উভয় পক্ষই যে অন্যায় করি, সেই কথাটা এই প্রবন্ধে কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

(১) মরণাশৌচ ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ, অশৌচের ব্যাপার। হিন্দুদিগের মধ্যে জনন ও মরণ—উভয়বিধ অশৌচগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। অশৌচ গ্রহণ করিলেই হিন্দুরা এই কয়েকটি জিনিষ করেন :—(১) অশৌচের কাল নির্দ্দেশ করেন। (২) হাঁড়ীকুঁড়ী ফেলাইয়া দেন। (৩) ধোপা-নাপিত বন্ধ রাখেন। (৪) ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখেন। (৫) গঙ্গা-স্নান করেন। মরণাশৌচে "কাছা" গ্রহণ, নগ্নপদ হওন, শ্রাদ্ধাদিকরণ—প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একে একে উপরিউক্ত আচরণগুলি সম্বন্ধে দু'চার কথার আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে, দ্বিজদিগের জন্য দশ রাত্রের ও তদেতর বর্ণের জন্য বেশী দিন ধরিয়া অশৌচগ্রহণের রীতি আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই—সর্ব্ব-ত্যাগী, ভিক্ষাজীবী, নিস্পৃহ ব্রাহ্মণেরা কি নিজেদের সুবিধার্থ দশ রাত্রি অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? আর ব্রাহ্মণেতর বর্ণদিগের উপর আধিপত্য দৃঢ় করিবার উদ্দেশে তাহাদিগের জন্য এমন কি মাসাধিককাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন? স্বার্থান্বেষী খৃষ্টীয়ান্ পাদরীরা যাহাই বলুন না কেন, আমার মনে সে ভাব স্থান পায় না। যে সমাজের এক স্তরে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ প্রভৃতি আলোচিত হইত, আর যাহার অপরাংশে অহর্নিশ দণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া তবে স্বাস্থ্যনীতির অনুসরণ করান সম্ভবপর ছিল, সে সমাজে ব্রাহ্মণেরা চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং অপর সাধারণে ঘোর মূঢ় ছিল, এরূপ কথা বলা খুব অন্যায় নহে।

যাঁহারা আমার এরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের সহিত অপরাপর বঙ্গদেশবাসীর তুলনা করিতে বলি। ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া—ঘোর স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সকল বিদ্যা নিজেদের কবলিত করিয়া রাখেন নাই; বঙ্গদেশীয় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালীও ইচ্ছা করিয়া বাকী বাঙ্গালীকেও মূর্খ করিয়া রখেন নাই। দেশে যখন ওলাউঠা, প্লেগ প্রভৃতির প্রকোপ বাড়ে, তখন শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তিরাই বেশী ভুগিয়া থাকে। তাহার কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তিরা অতি সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেই সহজে রোগমুক্ত হইতে পারেন; নিরক্ষর ব্যক্তিকে পরিষ্কৃত করা যত কষ্টের, পরিষ্কৃত রাখা ততোঽধিক কষ্টের, এই কারণে তাহারা অত ভুগিয়া থাকে। এই কথাগুলি যদি মন দিয়া বুঝিয়া থাকি, তবে আমরা সহজেই বুঝিব, ব্রাহ্মণদিগের বেলায় কেন দশ দিন এবং অপরের বেলায় কেন ১৫ অথবা ৩০ দিনের ব্যবস্থা ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, এত সংখ্যা থাকিতে দশ দিনের কম অশৌচ হয় না কেন? যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছু জানেন, তাঁহারা ইহার কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। যে কোন সংক্রামক ব্যাধির সংস্পর্শে আসিবামাত্রই সেই ব্যাধি আক্রমণ করে না; পরন্তু তাহার বিষ দেহাভ্যন্তরে উপ্ত হইতে সময় লয়। এইরূপে কোনও বিষ ১ দিন, কোনও বিষ ৭ দিন, কোনও বিষ ১২ দিন সময় লয়। স্মরণ রাখিবার সুবিধার জন্য ও গড়পড়্তা-হিসাবে এই জন্য বোধ হয় দশ দিনের জন্য অশৌচকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব বেশ বুঝা যায় যে, ব্যাধির অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তির (Incubation period) কালানুসারে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতবর্ণের জন্য দশ-দিবস ও নিরক্ষর মলিনতা-দীনতাদুষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে একমাসকাল অশৌচের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাউলকদলী-সংগ্রহের সুবিধার্থে সম্ভবতঃ এবম্ভূত ব্যবস্থা করা হয় নাই। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও জিজ্ঞাসা করি,—এই তথাকথিত সাম্যবাদের যুগে, বঙ্গীয় খৃষ্টীয়ান্ ও ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কি নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদিগকে বিবাহকালে শ্রেষ্ঠবর্ণের পাত্র-পাত্রীই খুঁজিয়া থাকেন না? মেগল-পাঠানবংশীয় মুসলমান ভ্রাতারা কি কখনও স্বেচ্ছায় এ দেশী মুসলমানদিগের সহিত কুটুম্বিতা করিতে চাহেন? এই বর্জ্জনের হেতু কি ধি নাই? উচ্চবংশগত, cultureগত, traditionগত বা শোণিতগত কৌলীন্যের মর্য্যাদা কি নাই?

বলা বাহুল্য, চর্ম্মগত বা চেহারাগত সুশ্রীই লক্ষ্য নহে—বহুপুরুষগত সংস্কার ও উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা, আচার, ব্যবহারই ঐ সকল লোকের লক্ষ্য। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বংশগত কৌলীন্যের একটা মর্য্যাদা থাকা অবশ্যম্ভাবী। বংশগত শুদ্ধাচার, সদাচার, স্বাস্থ্য ও নিষ্ঠা একত্র বিজড়িত হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। যে কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিকে একটা ইঙ্গিতে যতটা ফল হয়, আর অশিক্ষিত ব্যক্তিকে বর্ষকাল ধরিয়া শিখাইলাও তাহার অর্দ্ধেকও ফল পাওয়া যায় না, সেইকারণে স্বল্পকাল অশৌচগ্রহণে (অর্থাৎ Quarantine) উচ্চবর্ণের কায হয়, কিন্তু মাসাধিককালের কমে নীচবর্ণের কায হয় না।

রন্ধনের মৃৎপাত্রত্যাগের কারণ অতীব সুলভ। মৃৎপাত্রে বহুকাল ধরিয়া রন্ধনকার্য্য চালান যায়ও না এবং যাওয়া উচিতও নহে, কারণ তাহাকে ধাতুপাত্রের ন্যায় দুইবেলা মাজা-ঘষা চলে না। এই হেতু হিন্দুরা অতি সামান্য সামান্য কারণেই তাহাদিগকে বদ্‌লাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহে অশৌচ হইলে বা বংশে অশৌচের সংবাদ শুনিলেই যে পাত্রস্থ খাদ্য-দ্রব্যাদি ভূতপ্রেতস্পৃষ্ট হয়—এ বিশ্বাস এই পাত্রবর্জ্জনের মূলে নাই, বলাই বাহুল্য। পরন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ জাতি এ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই—তাঁহারা যে এত জ্ঞানী হইয়া এমন কুসংস্কারাপন্ন হইবেন, এরূপ মনে করাই অন্যায়।

ধোপা-নাপিত বন্ধ রাখা, নিজ আসন ভিন্ন উপবেশনের নিষেধ ও ভিক্ষা না দেওয়ার হেতু একই—রোগের সংক্রমণ নিবারণ করা। আজকাল বহু সংখ্যক উপায়ে—যথা—রেলবিস্তার, পথঘাটের বাহুল্য, সংবাদ-পত্রের বিস্তৃতি ও তাড়িতবার্ত্তার প্রভাব প্রভৃতি নানা উপায়ে এক স্থানের সংবাদ অতি অল্পসময়ে স্থানান্তরে প্রচারিত হইতে অবসর পায়; কিন্তু বোধ হয়, হিন্দু-দিগের সময়ে এত সহজে সংবাদ-প্রচারের সুবিধা ছিল না অথচ তৎকালে সংক্রামক ব্যাধিরও অভাব ছিল না। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা এমন সাধারণভাবে সামাজিক বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা কাহারও বাড়ীতে সংক্রামক ব্যাধি হইলেও তাহা ব্যাপ্ত হইবার অবসর পাইবে না।

নগ্নপদে ভ্রমণ, "কাচা-গ্রহণ," হবিষ্যান্ন ভোজন, মাছ, মাংস, তৈল ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন—এগুলি কতকটা লোকলজ্জা হিসাবে, কতকটা মানসিক শোকজ্ঞাপনার্থ বিহিত হইয়াছে। সে কালের লোকেরা এ কালের মত রাত-দিন পাদুকা ব্যবহার করিতেন কি না জানা নাই; তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তিরা সদা-সর্ব্বদা নগ্নপদে ভ্রমণ করেন, সর্দ্দি ব্যাধিটা তাঁহাদের অজ্ঞাত। আমরা আজকাল যেরূপ রাত-দিন মোজা-জুতা আঁটিয়া থাকি, আমাদিগের পক্ষে নগ্নপদ হওয়া আর ব্যায়ামকে আহ্বান করা একই কথা হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আমরা নগ্নপদ হওনের ব্যবস্থার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

অশৌচকালের আহার্য্য অতীব বিজ্ঞানসম্মত। সিদ্ধ তণ্ডুলান্ন অপেক্ষা আতপ তণ্ডুলান্ন বহুগুণ পুষ্টিকর; মটর ডাইল মাংসাপেক্ষা কোনওরূপ কম পুষ্টিকর নহে; অন্নে ও ডালে স্নেহময় পদার্থের অভাব থাকায় ঘৃত ভোজনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। পরন্তু এই আহার্য্য বিজ্ঞানকল্পিত complete food অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খাদ্য। মৎস্য ও মাংস কামোদ্দীপকবিধায় মৎস্য-মাংস নিষিদ্ধ। তৈল অপেক্ষা ঘৃত সহজপাচ্যবিধায় ঘৃতই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ফলকথা, যে দিক্ হইতেই দেখা যাইতেছে, সেই দিকেই বুঝা যায় যে, হিন্দুদিগের অশৌচব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যানুকূল বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যবস্থা। কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহার অপভ্রংশ দেখিলে মনে হয়, আমরা কি সেই ঋষিগণের বংশধর? এক প্রসবাগার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমার কথার অর্থ উপলব্ধ হইবে।

(২) জননাশৌচ।

আমরা জানি এবং হিন্দুরাও জানিতেন যে, শরীরের কোনও স্থান ক্ষত হইলে তাহা সহজেই রোগ-বীজাণু-দুষ্ট

হইয়া নানারূপ কঠিন পীড়া আনে; এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও সংশয়াপন্ন করে। এই জন্যই ক্ষতস্থানটিকে প্রলেপসিক্ত করিয়া পরিষ্কার কাপড়ের খণ্ডদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। যখন রমণী প্রসব করেন, তখন তাঁহার জরায়ুর ভিতর গাত্রে ৮।১০ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত একটি ক্ষতস্থান সৃষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় ঐ স্থানটিতে "ফুল" সংলগ্ন থাকে; প্রসবান্তে "ফুল" পড়িয়া গেলে, জরায়ু-গাত্রে সেই স্থানে প্রকাণ্ড ক্ষত সৃষ্ট হয়। রমণীর দেহে যে-যে পরিচ্ছদ সংস্পৃষ্ট হয়, তিনি যে বস্ত্র, তুলা, জল ব্যবহার করেন এবং তিনি যে ভূমিতে বা শয্যাতে বসেন এবং তাঁহার গৃহে যে বায়ু সঞ্চালিত হয়, ইহাদের সকলগুলি হইতে ঐ জরায়ুজ ক্ষত দুষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। এ কথা কে না জানেন? কিন্তু কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া শুনিয়াও নিজ পুরাঙ্গনাদের লোকাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন?

যে কোনও হিন্দুগৃহে যান, দেখিবেন, প্রসবের জন্য বাটীর মধ্যে অপকৃষ্ট ঘরটিই নির্দ্দিষ্ট হয়। সে ঘরটি হয়ত অতীব অন্ধকারময়, আর্দ্র, বায়ুসঞ্চারহীন, গো-গৃহ বা পায়খানার নিকটবর্ত্তী! প্রসূতির ব্যবহারের জন্য যে শয্যাদ্রব্য দেওয়া হয়—তাহা ত্যক্ত মাদুর, ত্যক্ত কম্বল, ছিন্ন কন্থা, মলিন উপাধান মাত্র! প্রসূতির পান-ভোজনের জন্য মৃৎপাত্র দেওয়া হয়—অধিকাংশ স্থলে একই পাত্র উপর্য্যুপরি প্রত্যহই ব্যবহৃত হয়। প্রসূতির পরিচারিকা একজন হাড়ী, ডোম্ বা তজ্জাতীয়া! সর্ব্বাপেক্ষা সুবন্দোবস্ত—সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময় আচার—যে ব্যক্তি প্রসূতির গৃহে যাইবে, সে ময়লা কাপড়ে যাইবে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে কাপড় ত্যাগ করিবে! পাঠক, এতদপেক্ষা "উল্টা বুঝিলি রামের" করুণ দৃষ্টান্ত আর দেখাইতে পারি কি?

চরক-সংহিতায় প্রসবগৃহসম্বন্ধে এই লিখিত আছে,—"প্রশস্ত রূপ-রস-গন্ধায়াং ভূমৌ উপ-লিপ্ত-ভিত্তিং সুবিভক্ত-পরিচ্ছদং প্রাক্‌দ্বারং দক্ষিণ-দ্বারং বা অষ্টহস্তায়তং চতুর্হস্ত-বিস্তৃতং বিধেয়ম।" অর্থাৎ "সূতিকা গৃহটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতরের পরিসর দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, প্রস্থে ৪ হাত (প্রায় ১২ ফীট × ৬½ ফীট) হইবে। দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বদিকে দ্বার থাকিবে। ঘরের মেজে সমতল ও সুপরিষ্কৃত হইবে এবং সূতিকাগৃহ মৃণ্ময় হইলে ঘরের ভিতরের দেওয়ালের গাত্রসকল গোময় ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হওয়া আবশ্যক। ঘরের মধ্যে কোনওরূপ দুর্গন্ধাদি থাকিবে না ও ঘরখানি দেখিতে বেশ সুদৃশ্য হইবে এবং যে স্থানে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইবে, সে স্থানে যেন জলসিক্ত বা অন্য কোনও কারণে অপ্রশস্ত না হয়।" আমার টিপ্পনী করা অনাবশ্যক। কি পাশ্চাত্য, কি প্রতীচ্য—সকল শাস্ত্রের অনুজ্ঞা কি শুনুন, আর বাঙ্গালীর বাড়ী বাড়ী কি ঘন্য ব্যবস্থা হয়, তাহা নিজ নিজ বক্ষে হাত দিয়া স্মরণ করুন; আর একবার "সাধভক্ষণ" ও "পেঁচোয় পাওয়ার" কথা মনে করুণ। যে দেশে সাক্ষাৎ যমরাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ও যমরাজ্যানুমোদিত অবস্থার মধ্যে প্রসূতি গৃহ রচিত হয়, সে দেশে প্রসূত হওয়াটা জীবনমরণ ব্যাপার বলিয়া যে গণ্য হইবে এবং (হয় ত বা) চিরজন্মের মত সাধভক্ষণ করানর ব্যবস্থা থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? আমরা যাহাকে চিকিৎসার ভাষায় 'টিটেনাস্' বা ধনুষ্টঙ্কার বলি, সেই ব্যাধিই এতদিন "পেঁচোয় পাওয়া" নামে উপদেবতা-কীর্ত্তি বোধে পুরোহিত কর্ত্তৃক চর্চ্চিত হইতেছিল! যখন ব্রাহ্মণেরা সমাজের নেতা ছিলেন, তখন তাঁহারা নির্লোভ ও শাস্ত্রচর্চ্চানুরত ছিলেন; এখন তাঁহাদের প্রকৃতশাস্ত্র-জ্ঞান রসাতলে গিয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধিও লোপ পাইয়াছে। পেটের ক্ষুধাও পূর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতরভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে,—আজ তাই কয়েকটি মূর্খ ব্রাহ্মণসন্তান উপ-কথা, উপদেবতা, উপ-আচার, উপ-ব্যবহারের উপসর্গে সমাজকে পীড়ন করিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন!

ফলকথা, যদি আমরা হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাই, তবে ঐ ভাবে প্রসবগৃহ করিলে চলিবে না। বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহটিই প্রসবগৃহ হওয়া চাই—

গৃহ শুষ্ক—যে গৃহ জীর্ণ ভগ্ন নহে, যে গৃহে ময়লা নাই—দুর্গন্ধ নাই, যে গৃহ প্রশস্ত—বায়ুসঞ্চরণপূর্ণ, যে গৃহ পায়খানা—গোয়াল—নর্দ্দমা হইতে বহুদূরে, সেই গৃহেই প্রসব করান চাই। প্রসূতির ব্যবহারের জন্য শয্যা, শয্যাস্তরণ, উপাধান, সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। প্রসবকার্য্য পালঙ্কের উপরে হইলে ভাল হয়—এ কথা চরক ঋষিও আদেশ করেন। প্রসূতির ব্যবহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বাঙ্গরূপে পরিষ্কার হওয়া চাই। নীচজাতীয়া মলিনতাদুষ্টা হাড়ী "ধাই" না রাখিয়া বাড়ীর অপর মেয়েদেরই মধ্যে প্রসূতির সেবার কার্য্য বণ্টন করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কেহ প্রসবগৃহে প্রবেশ করিবেন, তিনি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া—পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া তবে প্রসবগৃহে যাইবেন; বাহিরে আসিয়া তিনি পুনরায় বস্ত্রত্যাগ বা স্নান করিতে পারেন—তাহাতে কিছু আসে যায় না। মোট কথা এই—বাহিরের কোনও ময়লা কাপড়-চোপড়, দূষিত বায়ু, ময়লা হাত, ময়লা জল—সকলগুলি হইতেই রোগবীজ প্রসূতির জরায়ুস্থ ক্ষতকে দুষ্ট বা প্রতিরোধ-শক্তিহীন ক্ষীণপ্রাণ নব বংশধরকে সংক্রামিত করিয়া উভয়ের প্রাণসংশয় করিয়া তুলিতে পারে।

(৩) পানভোজন।

আহারসম্বন্ধে কথা বলা বড়ই শক্ত, যেহেতু, আজ আমরা ঠিক্ কতটুকু হিন্দুয়ানী তাহাতে বজায় রাখিয়াছি, তাহা বলা বড় শক্ত। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ভোজনটা ⅓ হিন্দু, ⅓ মোগলাই, ⅓ ইংরাজী। সে যাহাই হউক, খাঁটি হিন্দুয়ানীর সন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীর খাইবার পারম্পরিক পদ্ধতি এই:—প্রথমে গণ্ডুষ, পরে সূক্ত (তিক্ত), পরে ঘৃত, পরে ডালনা, ডাইল্ ও নানারূপ ব্যঞ্জন, শেষে অম্ল ও সর্ব্বশেষ দুধ, দধি ও মিষ্টান্ন। খাঁটি হিন্দু-ভোজনের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে মাংসের স্থান নাই। কিন্তু ভাতের সঙ্গে ঘৃতের ও অপর ডাইলের মধ্যে মুগ ডাইলেরই আদর বেশী। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত হিন্দু স্বপাক-ভোজন করেন; স্বপাকে কখনও অসুবিধা হইলে মাতা বা স্ত্রীর হস্তে রন্ধন ব্যতীত আহার করেন না। হিন্দুরা ভোজন-ক্রিয়াটাকে ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন; হিন্দুরা ভোজনের স্থানাস্থান বিচার করিয়া তবে ভোজনে বসেন। এগুলির মধ্যে কতটা বিজ্ঞান বা যুক্তি আছে, তাহা দেখা আলোচনা করিয়া যাউক।

প্রথমতঃ—আহারটাকে ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক মনে করা। ধর্ম্মভাবের সঙ্গে মনের পবিত্রতা ও সংযমের নিত্য সম্বন্ধ, এই জন্য আহার করিতে বসিয়া গুরু ভোজনের সম্ভাবনা কম। যাঁহারা আহার করিতে করিতে গল্প করেন, তাঁহারা ঠিক যে ভাল করিয়া চর্ব্বণ করেন বা সকল সময়ে আহারের স্বাদ গ্রহণ করেন, এমন মনে হয় না। আহারে বসিয়া গল্প করিলে অনেক সময়ে ভোজনের মাত্রাও বেশী হইয়া পড়িতে পারে এবং অমনোযোগিতাবশতঃ অখাদ্য কিছু দৈবাৎ উদরসাৎ হইতে পারে ও বিষম লাগিয়া বিপদ্ হইতে পারে। এই জন্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মভাবে সংযত হইয়া পরিষ্কৃত স্থানে একান্তে আহার করার এত আদর। যে হিন্দুরা আহারকে এত পবিত্র মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্ছিষ্টভোজনব্যাপারটা কি বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না? ইহার উত্তরে সেই "উল্টা বুঝিলি" কথাটিই বলিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে প্রসাদভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোথাও উচ্ছিষ্টভোজনের ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালীর লোকাচারে—কথায় "প্রসাদ" আছে, কার্য্যে "উচ্ছিষ্ট-ভোজনই" প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কখনও উচ্ছিষ্ট-ভোজনের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহারা প্রসাদেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। "প্রসাদ" বলিলে উচ্ছিষ্টান্ন বুঝায় না, প্রসাদ বলিলে সেই খাবারকে বুঝায়—যাহা কোনও গুরুলোক প্রসন্নচিত্তে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদপূত করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোথায় আর আজ লোকাচারের প্রভাব কোথায়! ইহাকেই বলে—"কোথাকার জল কোথায় মরে!"

দ্বিতীয়তঃ—শারীরিক পরিপোষণে আহারের সম্পূর্ণতা। এ কথাটি একটু বিশদ করিয়া না বুঝাইলে

সাধারণের বোধগম্য হইবে না। আহারটা রসনার উপভোগের বা দেহের ক্ষণিক বিলাসের সামগ্রী নহে। নিত্য শারীরিক ক্ষয় পরিপূরণ করা, শারীরিক দৈনিক কর্ম্ম যথাসম্ভব সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ করা এবং তাহার গঠনে বা পরিপোষণে সহায়তা করাই খাদ্যের মূল লক্ষ্য। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ সকল কায করিতে হইলে, ছয় জাতীয় খাদ্য দ্রব্য খাওয়া উচিত। সেগুলি যথা :—(২) ছানা বা মাংসজাতীয় খাদ্য; ইহাদের দ্বারা শরীরের ক্ষয়পূরণ ও সৌষ্ঠবলাভ ঘটিয়া থাকে। মাংস, ডিম্ব, দুধ, ডাল, মৎস্য, ছানা, পনির—এই জাতীয় খাদ্য। (২) স্নেহময় পদার্থ—যথা তৈল, ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি; ইহাদের দ্বারা শারীরিক উত্তাপ রক্ষা ও পেশীসঞ্চলন কার্য্য সমাধা হয়। (৩) শালি বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য—যথা চাউল, আটা, ময়দা, সুজি, খৈ, মুড়ি, মুড়কী, শাকসব্জী, সাগু, বার্লি প্রভৃতি; ইহাদের দ্বারাও শারীরিক উত্তাপ রক্ষা, পেশী-সঞ্চলন কার্য্য হইয়া থাকে। (৪) লবণ (৫) জল ও (৬) দেহ-ক্ষয়নিবারক সূক্ষ্ম রস। এই শেষোক্ত জিনিষটিকে ইংরাজীতে (Vitamin) ভাইটামীন্ কহে। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে বেরীবেরী, স্কার্ভি প্রভৃতি ব্যারাম জন্মে। টাট্‌কা ফলের রস, টাট্‌কা মাংসে, চাউলের গাত্রসংলগ্ন পাৎলা রক্তাবরণে ইহা থাকে। এই জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে ফলের আদর এত বেশী এবং বোধ হয়, এই জন্য নিত্য অন্ন-ভোজনও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ডাইলের মধ্যে মুগের ডাইলে এই ভাইটামীন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আছে। অতএব কাঁচা মুগের ডাইল ভিজাইয়া খাওয়া এবং অপরাপর ডাইলের অপেক্ষা মুগের ডাইলই খাওয়া যে অত্যন্তরূপে বিজ্ঞানসম্মত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। হিন্দুরা অত্যন্ত মেধাবী জাতি এবং মস্তিষ্কের চর্চ্চা তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল। এই কারণেই ঘৃতভোজনটা হিন্দুরা কিছু বেশী বুঝেন। লডার ব্রাণ্টন ঘৃতকেই সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবৃদ্ধিকর খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের খাদ্যমধ্যে মাংসের প্রাধান্য থাকিলেও, গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালা দেশের পক্ষে শ্বেতসারবহুল অন্নই যে উত্তম পথ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আর্য্যগণ যে মাংস খাইতেন না বা হিন্দুরাও যে মাংস খাইতেন না, এমন কথা বলি না। বৌদ্ধযুগের তথা বৌদ্ধরাজার (অশোকের) সার্ব্বভৌম্যে এ দেশে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের মতে ছাগমাংসই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিবিবর্জ্জিত মাংস। ছাগমাংসভোজনে যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ জন্মে না।

হিন্দুদিগের মধ্যে চায়ের প্রচলন ছিল না বটে, কিন্তু গুড়, মধু ও চিনির অত্যন্ত আদর ছিল। কেহ পরিশ্রান্ত হইলে এখনও পল্লীগ্রামে গুড় ও জল দেওয়া যায়। সুরাসেবী য়ুরোপ এককালে সুরার ও মাংসসারের (Meat extract) শতমুখে প্রশংসা করিতেন; সৈনিকগণের জন্য সামরিক অশ্ববৃন্দের জন্য পরিশ্রমের পরে সুরাসার ও মাংসসারের ব্যবস্থা ছিল; এখন তৎপরিবর্ত্তে শর্করা খণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। চিনির এরূপ শ্রমহারী গুণের কথা হিন্দুরা বহুপূর্ব্বে জানিতেন। চিনির সম্বন্ধে আর একটি গুণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এত দিন পরে শিখিতেছেন। সেটি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"। হিন্দুদের এই আদেশ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত। আহারে প্রথমে তিক্ত রস ও শেষে মিষ্টরসের ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। আহারের পূর্ব্বে সূপ (soup) বা শুক্তভোজনে পরিপাক-ক্রিয়া আরও বেশী হয়। শূন্যোদরে চিনি খাইলে পাকস্থলীর ভীষণ উত্তেজনা হয়; এই জন্য হিন্দুরা চিরকালই ভোজনের শেষে মিষ্টান্নভোজন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ পুনরায় "উল্টা বুঝিয়াছে"! আমাদের দেশে বহুক্ষণ উপবাসী থাকার পরে এক গ্লাস্ সরবৎ খাওয়ার ব্যবস্থা কে করিল? আমার বিশ্বাস—ইহা আর্য্য-প্রথা নহে, ইহা মোগলাই প্রথা। শূন্যোদরে এক গ্লাস সরবৎ খাইলেই তৎক্ষণাৎ ক্ষুধা নষ্ট হয়, তৎপরবর্ত্তী আহার সহজে পরিপাক হয় না, পেট ভার হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের অশৌচব্যবস্থা প্রভৃতি বর্ণনাকালে

দেখাইলাম যে, উহার মূলে স্বাস্থ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থাই আছে। আরও দু'চারিটি কথাদ্বারা ঐ কথা ও অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। অনেকেরই ধারণা আছে যে, বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সকল প্রথাই বিজ্ঞানসম্মত, আর পুরাতন হিন্দু প্রথাগুলি যুক্তিবাদহীন কুসংস্কারের একটি জলন্ত মূর্ত্তি মাত্র।

প্রথমে শয্যাত্যাগের কথা ধরা যাউক। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করাই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। ঐ সময়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয় আনন্দে মগ্ন হয় না? ঐ সময়ে উঠিয়া উদ্যান-ভ্রমণ, পুষ্পচয়ন ও স্নানাদি করা যে পরম স্বাস্থ্যপ্রদ বিধি, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। রাত্রি জাগরণ করিয়া বেশী বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া পাশ্চাত্য সমাজানুমোদিত বা বিলাসিতার উত্তরসাধক বিধি হইতে পারে—কিন্তু কোনও মতে স্বাস্থ্যকর নহে।

শয্যাত্যাগের পর স্নান করা ও পূজা-বন্দনাদি করা হিন্দুর কর্ত্তব্য। শরীরের আলস্যত্যাগের ও তাহাকে কর্ম্মঠ করিবার পক্ষে প্রাতঃস্নানের মত অনুকূল বিধি খুব কমই আছে। যাঁহার জামাজোড়া কম্ফর্টার আঁটিয়া ইজিচেয়ারে হেলান্ দিয়া চা পান করেন বা সকালে সামান্য একটু বেড়ান ও দুপুরে গরম জলে স্নান করেন, শীতকালে শীত তাঁহাদিগকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাঁহারাই সহজে সর্দ্দি কাসির দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। কিন্তু রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া সর্ব্বঋতুতে প্রাতঃস্নান করিলে শরীর ও মন বড়ই সুস্থ পবিত্র থাকে।

স্নানের সময় আমরা তৈল ব্যবহার করি বলিয়া য়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে greasy বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে, তাঁহারাই জানেন যে, তৈলাভ্যঙ্গকালীন রীতিমত ব্যায়াম (exercise) করার ফল পাওয়া যায়—যে হেতু সমস্ত পেশীই সঞ্চালিত বা দলিত বা উত্তেজিত হয় এবং রক্তসঞ্চলনও বৃদ্ধি পায়, ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এইরূপে শরীরের ক্লেদ বিদূরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা রীতিমত তৈল-ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ত্বক্ অত্যন্ত মসৃণ থাকে—ঘামাচি, চুলকাণি, ফোড়া, ক্ষত তাঁহাদিগের প্রায়ই হয় না; পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে তৈলত্যাগ করিয়া রীতিমত সাবান ব্যবহার করিলে চর্ম্ম উগ্র হয় এবং নানারূপ রোগের আকর হইয়া উঠে। তৈলব্যবহারের ফলে শীতকালে শীতবোধটা খুব কমই হয় এবং গ্রীষ্মকালে অতীব ঘর্ম্মস্রাব হইলেও অকস্মাৎ "chill" লাগিবার ভয় কমিয়া যায়। যে সময়ে খুব ঘর্ম্ম হইতে থাকে, সে সময়ে সেই ঘর্ম্ম যদি বাষ্পাকারে ত্বক্ হইতে দ্রুত উপিয়া যাইতে থাকে, তবে দেহ শীতল হইয়া নানারূপ আকস্মিক পীড়া জন্মাইতে পারে। কিন্তু তৈলাক্তদেহে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলেই চর্ম্মসংলগ্ন অদৃশ্য তৈলবিন্দুর সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে উপিয়া যাওয়ায় "sudden chill" অর্থাৎ আকস্মিক ঠাণ্ডা লাগার ভয় দূর হইয়া যায়। হাম, বসন্ত, আরক্ত জ্বর প্রভৃতি ব্যাধি-গুলির সারিবার সময়ে দেহ হইতে মৃত চর্ম্মত্বক্ স্খলিত হইতে থাকে। ঐ মৃত ত্বকেই ঐ সকল ব্যাধির সংক্রমণ-সমর্থ বীজ থাকে। যে দেশে তৈলের ব্যবহার আছে, সে দেশে ঐ ব্যাধির সংক্রমণ অন্য যে কোন কারণে হউক, তাহা স্বতঃই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে না। আমাদের দেশে সংক্রামক ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইতে না হইতেই রোগীকে "নিম হলুদ" মাখানর প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানানুমোদিত। আজ পাশ্চাত্য দেশেও ঐ সকল ব্যাধির প্রচার নিবারণোদ্দেশে ঐ সময়ে ভ্যাসেলীন বা জলপাইয়ের তৈল ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। নিম ও হরিদ্রা ষোল আনা-রূপে antiseptic বা রোগবীজাণুহারী না হইতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে ঐ ধর্ম্ম যথেষ্টই আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্নানের পরেই আহ্নিকের ব্যবস্থা। আহ্নিক করিতে হইলে কখনও নগ্নগাত্রে বা শুধু মেঝের উপরে যেমন তেমন করিয়া বসিতে নাই। পট্টবস্ত্র বা রেশমের বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া

আহ্নিকে বসিতে হয়। এই সকল বিধির মূলে আধ্যাত্মিকতা ত আছেই, তদ্ভিন্ন স্নানের পরে দেহকে "নব রবি-কিরণে" উষ্ণ করিয়া লওয়ার অনুকূল সকল বিধিই আছে। আসন, পট্টবস্ত্র—এতদুভয়ই তাপ-অপরিচালক। সন্ধ্যা করিবার সময়ে প্রাণায়াম করিতে হয়—প্রাণায়ামও দীর্ঘায়ুঃপ্রদ। সন্ধ্যা-বন্দনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না—আধ্যাত্মিক ভাব বিচারও করিব না। কিন্তু সকল কাজের পূর্ব্বে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম করিলে হৃদয় ও মন যে বড়ই পবিত্রতা অনুভব করে—সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ যে একটা অব্যক্ত পুলকস্পন্দনে অনুপ্রাণিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যদি একটা প্রাণ ভরিয়া হাসিলে দশ দিন পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তবে ঐ এক এক ভক্তি-গদগদ পুলক-স্পন্দনে পরমায়ু দশ বর্ষ বৃদ্ধি হয়।

তৎপরে ভোজন। প্রকৃত হিন্দু স্বপাক ভোজন করিবেন, দিনে একবার অন্ন খাইবেন। সংযমশিক্ষা দেওয়া হিন্দুয়ানীর পদে পদে উদ্দেশ্য। এই জন্যই হিন্দু খাদ্যসম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, আহারে বসিয়া কথা কহিবার অনুমতি থাকিলে অমিতাহারের সম্ভাবনা। এখনকার দিনে, নূতন "ব্রহ্মচারী" (?) এক বৎসর আহারে বসিয়া কথা কহেন না বটে, কিন্তু ইসারায় সকল রকম ঈপ্সিত ভোজ্যই চাহিয়া লয়েন। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু তাহা করেন না। তিনি আহার্য্যগুলি নারায়ণকে নিবেদন করিয়া সন্তুষ্ট মনে পুণ্যচিত্তে নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি প্রকৃতই "আমি শ্রীভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আহারে বসেন, তিনি ভোজন করিয়া যতটা আত্মতৃপ্তি,—যতটা চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন, তাহা কি বর্ত্তমানকালীন উচ্ছৃঙ্খল-লোভী ভোজন-বিলাসী ভুরি-চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় গ্রহণ করিয়াও বোধ করে? ভোজন করিতে বসিয়া সংযতভাবে খাইলে এবং আহারান্তে শারিরীক ও মানসিক প্রসাদ বর্ত্তমান থাকিলে পরিপাকক্রিয়া বেশী হয়, না—কতকগুলা হাঁস, মেষের অস্থি-মাংস "কুঁচকি কঠায়" খাইয়া অবসন্ন দেহ ও লোভ-জনিত অতৃপ্তি লইয়া উঠিলে সহজে পরিপাক হয়? তাহার পরে গোঁড়া হিন্দুরা স্বপাক খান, পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া খান ও কাহারও স্পৃষ্ট ভোজন করেন না;—এইরূপ করার প্রধান গুণ এই যে, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে কোনও রোগ সংক্রামিত হইতে পায়না। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশে টাইফয়েড জ্বর খুব কমই হইত। একই হুঁকায় তামাকসেবন, হোটেলে একই গ্লাসে পান করা, নাম মাত্র ধৌত করিয়া একই বাটিতে চা খাওয়া প্রভৃতি দোষের ফলে ডিফ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধি ব্যাপ্ত হইতে পারে। হিন্দুর ভোজন-ব্যাপারটা ঐ ব্যাপ্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

নিজ ভোজ্য নিজে সংগ্রহ করিয়া নিজে রাঁধিলে আরও দুইটী সুফল পাওয়া যায়। প্রথমতঃ নিজে প্রত্যহ হাত পুড়াইয়া খাইতে হইলে রকমারি করিয়া বিলাসিতার আশ্রয় লওয়া চলে না এবং নিজের মনের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে অনেক ব্যাধির হাত এড়ান যায়। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে পাচকঠাকুর ও ঠাকুরাণীদের প্রভাব বড় বেশী। উঁহাদের মধ্যে কত জন যে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত এবং কতগুলিই যে উপপতি ঘ উপপত্নীরত তাহা জানা গৃহস্থ আবশ্যকীয় মনে করেন না। অথচ এই সকল পাচকদিগের মধ্যে দদ্রু উপদংশ ("পারার ঘা") ও মেহ (গণোরিয়া) যে কত বেশী পরিমাণে দেখা যায়, তাহা চিকিৎসকমাত্রে অবগত আছেন। ইহারা যে কাপড় পরে, তাহা গন্ধ, রূপ ও রস গৃহস্থবাঞ্ছিত না হউক, গণিকালঃ লাঞ্ছিত হইবে—নিঃসন্দেহ। যাঁহারা ময়রাদিগকে এই সকল পাচকদিগকে তাঁহাদিগের অলক্ষ্যে করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে ইহারা যেমন নোংরা তেমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন! আর স্বপাকাহারী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসন্তানদিগের বংশধর হইয়া আজ আমরা বিলাসিতার তাড়নায়, তথাকথিত ব্রাহ্মণের ন্যায় অজ্ঞাতকুল, বেশ্যাসক্ত, বেশ্যালয়-প্রতিপালিত, নি

রোগ ও মলিনতাদুষ্ট পাচকের হস্তে নিঃসঙ্কোচে আহার করিয়া পরম আত্মপ্রসাদে স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ধন্য হইতেছি! এই সকল "ঠাকুরেরা" প্রাতঃ স্নান করিয়া তবে হেঁসেলে (রন্ধনশালায়) প্রবেশ করে—কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা দূরে যাউক, গায়ত্রীর তিনটা অক্ষরও ইহারা জানে না এবং ইহাদের দেহে যেমন কুৎসিৎ রোগ আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাদের পৈতা ও পরিধেয় তেমনি মলিন এবং দুর্গন্ধযুক্ত। ইহারা যে গামছা ব্যবহার করে তাহাতে ইহাদের উপপত্নিগণেরও সেবা হয় এবং সেই গামছায় হাত মুছিয়া ইহারা আমাদিগকে পরিবেশন করিয়া আপ্যায়িত করে; তার উপর রান্নাঘরের ইতস্ততঃ নিষ্ঠীবন-নিক্ষেপ, তরকারীর মধ্যে ফোড়ন-ভ্রমে ইন্দুর বিষ্ঠা প্রদান, ঝোলের মধ্যে ঘর্ম্ম স্খলন, মাঝে মাঝে আপত্তিকর ভাবে দদ্রু প্রভৃতি কণ্ডুয়ন ইত্যাদি নানারূপ ঘৃণ্য লীলা আমাদের দৃষ্টি না এড়াইলেও তুষ্টিকে কখনও ব্যাহত করে না। তাই বলিতেছিলাম যে, প্রকৃত হিন্দুয়ানী বড়ই খাঁটি জিনিষ—বর্ত্তমান হিন্দুয়ানী অনেক বিষয়ে অন্ধ গোঁড়ামী, অথবা স্বেচ্ছাকৃত ভণ্ডামী।

ভোজনের পরেই বিশ্রাম করিবার কথা! দিবানিদ্রা কখনও হিন্দুর অভিপ্রেত নহে; এই জন্যই যজ্ঞোপবীত ধারণকালীন আচার্য্য নব ব্রহ্মচারীকে তারস্বরে বলিয়া দেন—'মা দিবা স্বাপ্সীঃ"—কদাচ দিবা-নিদ্রা যাইবে না। যে দেশ উষ্ণপ্রধান সে দেশে নিদ্রা স্বতঃই দ্বিপ্রহরে অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়। তাহা জানিয়াও হিন্দুরা বারংবার দিবানিদ্রার নিষেধ করিয়াছেন। তাহার কারণ, দিবানিদ্রা স্বাস্থের পক্ষে হানিকর*। দিবানিদ্রা নিষেধের অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থা ছিল—আমাদের পূর্ব্বরীত্যনুযায়ী কাজ করিবার সময় নির্দ্দেশ বিধিটি। বর্ত্তমানকালে, প্রাতে ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কায নাই। আমাদের কাযের সময় সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত। ইংরাজের দেশে কোট প্যাণ্টালুন সঙ্গত হইতে পারে, কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ইংলণ্ডে প্রাতে ৯টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা কষ্টকর হইতে পারে; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়াও কোট প্যাণ্টালুন বিড়ম্বিত হাওয়াও যতটা হাস্যজনক ব্যাপার, এদেশে দীর্ঘদিবসের মধ্যাহ্নে কায়কর্ম্ম করাও তাদৃশ স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ। দশ ঘটিকায় আফিসে যাইতে হইলে, প্রাতে ৬টায় প্রাতরাশ করিবার প্রবৃত্তি খুব অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। কাজেই গত রাত্রি ৯টা হইতে পর দিবস প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত এই বারো ঘণ্টা অভুক্ত থাকিতে হয়। এতক্ষণ অভুক্ত থাকা কষ্টকর বলিয়া অনেকে রাত্রেই গুরুভোজন করিয়া থাকেন। এখন রাত্রেই নিমন্ত্রণাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং "ফল-আহার" জিনিষটি লুচি, পোলাও, চপ্, কাটলেট্, মাছ-মাংস, ক্ষীর-দধি, সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতি ত্রিজাতির খাদ্য-চিহ্নময় পূর্ণ রাজসিক 'খানা'য় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহার পরে বেলা এক ঘটিকার সময়ে "টিফিন" করিবার সময়। যে ব্যক্তি ১০টায় আফিসে যায়, যে ব্যক্তি ৯টায় আহার করে—কাযেই বেলা ১টায় (অর্থাৎ ৪ ঘণ্টা পরে) তাহার তাদৃশ ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। পরে বেলা ৪টার সময়ে যখন তাহার ক্ষুধা পায়, সে খাইবার অবকাশ পায় না। তাহার "পিত্ত পড়িতে" থাকে—সে সন্ধ্যায় (৬।৭টায়) বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করে, রাত্রি ৯।১০টায় পুনরায় আহার করে। এই সময়ের তালিকাটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে:—

---

* গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্য-হানিকর বটে; কারণ চরক বলিতেছেন—"গ্রীষ্ম বর্জ্জেষু কালেষু দিবা স্বপ্নাৎ প্রকুপ্যতঃ।" ভাবপ্রকাশকার ও সুশ্রুত বলেন যে, আহারের পর অন্ততঃ ৪৮ মিনিটকাল রাজার ন্যায় জোড়াসনে বসিয়া, তৎপরে অন্ততঃ একশত পদ ভ্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। ভাবপ্রকাশ আর এক জায়গায় বলিতেছেন যে, আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ অল্পক্ষণের জন্য শয়ন (অবশ্য নিদ্রা নহে) করিলে শরীর পুষ্ট হয়; যথা—ভুক্তোপবিশত স্তব্ধং শয়ানস্য তু পুষ্টতা···। এই পুষ্টতার অর্থ স্থূলতা নহে ত?

সম্পাদক—স্বাস্থ্য-সমাচার।

সাহেবদিগের আহারের সময় :—

প্রাতে ৬।৭টায়—"ছোট হাজরী" (লঘু)।

প্রাতে ৯।১০টায়—"ব্রেকফাষ্ট" (লঘু)।

দুপুরে ২টায়—"লাঞ্চ" (গুরু)।

[কোন মহলে বা ব্রেকফাষ্ট গুরু ও লাঞ্চ্ লঘু হওয়ার প্রচলন আছে।]

বৈকালে ৪টায়—চা রুটি (লঘু)।

রাত্রি ৮টায়—ডিনার (গুরু)।

রাত্রি ১১টায়—সাপার (লঘু)।

[কেহ কেহ সাপারের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছেন।]

হিন্দুদিগের পূর্ব্বে যাহা ছিল :—

প্রাতে ৭।৮টায়—জলযোগ (লঘু)।

মধ্যাহ্নে ১২।১টায়—ভোজন (গুরু)।

সায়াহ্নে ৪।৫ টায়—জলযোগ (লঘু)।

রাত্রে ৯।১০ টায়—ভোজন (গুরু)

[অনেক পরিবারে মাত্র একবার জলযোগেরই ব্যবস্থা ছিল।]

হিন্দুদিগের এখন যাহা হইয়াছে :—

প্রাতে ৯॥০টায়—অন্নাহার (গুরু)।

বেলা ১টায়—জলযোগ (লঘু)।

সন্ধ্যায় ৬।৭টায়—জলযোগ (লঘু)।

রাত্রি ১০টায়—অন্নাহার (গুরু)

[কোন কোন পরিবারে প্রাতে জলযোগেরও বন্দোবস্ত আছে]

উপরে "গুরু ও "লঘু" এই দুইটি বাক্য যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আহার্য্যের পরিমাণজ্ঞাপকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে—পরিপাকের তারতম্যানুসারে ব্যবহৃত হয় নাই। এইবার বেশ মনোযোগের সহিত উপর্য্যুক্ত তালিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে সাহেবেরা যে রকম সময়ে যাহা আহার করেন, সেই ঠিক বিধি এবং হিন্দুরা স্বেচ্ছায় যে রকম সময়ে যেরূপে আহার করিতেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যানুকুল বিধি। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে কর্ম্মজীবি হিন্দুর আহারের কালাকাল বিচার করিবার অবসর নাই। প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইতে না হইতেই অর্দ্ধসিদ্ধ, অত্যুষ্ণ ... মাত্র দুই একটি ব্যঞ্জনের সাহায্যেই হিন্দুকে আহা... সমাপ্ত করিয়া মসীযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়*। আফিসে যখন তাঁহার ক্ষুধার সম্যক্ উদ্রেক হয়—তখ... নির্দ্দিষ্ট "টিফিনের" সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে... ক্লান্ত অবস্থায় আসিয়া ভোজন করিতে গেলেই ভোজনে... মাত্রা বেশী হয় এবং পরিপাক কম হয়। যে ক... কারণ থাকিলে অজীর্ণতা আইসে, বর্ত্তমানকালে হিন্দু... জীবনে সে সকলগুলিই আসিয়াছে। দ্রুত আহার ক... পূরা ক্ষুধার উদ্রেক হইবার পর্ব্বে আহার করা, আহা... করিয়া অনেক পথ হাঁটা, পূরা ভোজনের পর একাদি... ক্রমে মস্তিষ্কচালনা করা, পূরা ক্ষুধার উদ্রেক হই... আহারের অবসর না পাওয়া এবং ক্লান্ত দেহে পথ হাঁটা... পরে আহার করা—এ সবগুলিই বাঙ্গালীর নিত্য অভ্যা... হইয়া জাতিগত ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

"সকড়ীতত্ত্ব"টাও পূরা বিজ্ঞানানুমোদিত। সাহেবে... ও মুসলমানেরা শয্যায় বসিয়া খাইতে কুণ্ঠাবোধ করে... না। কিন্তু হিন্দুরা মনে করিয়া থাকেন যে, দ্বিতীয় পা... পর্য্যন্ত "সকড়ি" হইয়া থাকে অর্থাৎ এক থালা ভা... যেখানে বসান যায়, সেস্থান ত "সকড়ী" হয়ই—কি... যদি এক থালা ভাত বড় একটা বারকোষের উপ... বসাইয়া সেই বারকোষটিকে মাটিতে বসান যায়, অ... সে মাটি এঁটো হয় না। অবশ্য টেবিলে বসিয়া ভোজ... করিলে, জল ছিটাইয় সে জায়গাটিকে পরিষ্কার কর... (নিকাইয়া লওয়ার) প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সাহেবে... বনভোজন করিতে বসিলে স্থানাস্থান বিচার করেন না... কিন্তু হিন্দুরা যেখানেই বসুন, সে জায়গাটাকে পরিষ্কা... করেন এবং "সকড়ী" "সকড়ী" করিয়া 'উদ্ব্যস্ত' করিয়া তুলেন। এটা কি গোড়ামী না মুর্খতা? এটা দুয়ের কিছুই নহে।

যাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব বা 'ব্যাক্‌টেরিওলজী' জানেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আহার্য্য-সামগ্রীর কণ মাত্র পাইলেই ব্যাধি জীবাণুগণ অসম্ভবরূপে বংশবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে এবং আহার্য্য জিনিষের অবাধ স্পর্শে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপ্তিলাভ করে। এই জন্যই প্রকৃত হিন্দুরা যাহার-তাহার স্পৃষ্ট ভোজ্য গ্রহণ করেন না, যথা-তথা পংক্তি-ভোজনে আপত্তি করেন এবং "সকড়ী" "সকড়ী" বলিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। যে সকল ভোজ্য সদ্যঃ ধুইয়া আহার করা চলে (যেমন ফল), হিন্দু সে সকল ভোজ্য যেখানে সেখানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। লুচি ও সন্দেশের চলনটা বর্ত্তমান যুগের; কিন্তু ভাতটা বহু কালের চলন। ভাত ধুইয়া আহার করা চলে না বলিয়া হিন্দু যেখানে সেখানে অন্নগ্রহণ করেন না।

হিন্দুরা বলেন, দুগ্ধে লবণ দিয়া পান করিলে গো-মাংস ভক্ষণ করার তুল্য হয়। অনেকের অভ্যাস আছে—দুধে ভাত মাখিয়া খাইতে খাইতে মাছ বা তরকারী 'টাক্‌না' দিয়া খায়। এ রকম করিলে দুধে লবণ দিয়া পান করারই তুল্য হয়। একত্র দুধ ও মাংস ভক্ষণের নিষেধের হেতুও এই। অনেকে এ সকল কথাগুলি গোঁড়ামী ও বোকামীর দৃষ্টান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, লবণসংযোগে দুধের পরিপাক ক্রিয়া ভাল হইতে পারে না। অতএব এখন আমরা নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, হিন্দুরা লবণসংযোগে দুধের ব্যবহার নিষেধ করিয়া করিয়া যুক্তিসঙ্গত কাযই করিয়াছিলেন।

হিন্দুরা মৃতদেহের সৎকার করিয়া থাকেন—অপরাপর জাতিরা প্রোথিত করেন। সৎকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত বিধি। অগ্নিসংযোগে মৃতদেহস্থ যাবৎ রোগবীজ ও জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; প্রোথিত করিলে তাহার ফলে অনেকটা জমী ও তদূর্দ্ধস্থ বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। তবে প্রসবের ফুল ও সদ্যোজাত শিশু মরিলে এতদুভয়কে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা তত অস্বাস্থ্যকর নহে; যে হেতু এই দুইটিরই সংক্রামক রোগদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম।

বর্ত্তমান সময়ে "ইউজেনিক্‌স্" বলিয়া একটি বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই :—পুষ্টদেহ ও পরিণত বয়সে সন্তানাদি হইলে, তাহারা বেশী স্বাস্থ্য ও মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কথার আলোচনা অপর একদিন করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু হিন্দুরা যে এ বিষয়ে খুব মনোযোগী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে সে ধারণা আছে যে, অষ্টম গর্ভের সন্তান হইলেই কৃতি হয়, বোধ হয়, সেই ধারণা ঐ ইউজেনিক্‌সেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

এই প্রবন্ধে ইতস্ততঃ দু' চারিটি বিষয় লইয়া আমি ইঙ্গিত করা হিসাবে কথা বলিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে অনেক কথা বলা চলে। যেমন বর্ত্তমানকালে অন্ততঃ কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে "Brain food" বলিয়া একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকট হইয়াছে, তাহার কারণ কথাকথিত বিলাতী ঔষধের বিজ্ঞাপন। এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিলে বড় প্রবন্ধ হইয়া পড়ে—অথচ সার সত্য হিন্দুরা বহু বর্ষ পূর্ব্বে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট "Brain food"। এই জন্যই সাত্ত্বিক চিন্তাশীল মনীষীরা ঘৃতভোজনই করিতেন, মাংসের জন্য লালায়িত হইতেন না!

---

* শাস্ত্রাকারেরা বলিয়াছেন যে,…'আয়ুশ্চংক্রমমানস্য মৃত্যুর্ধা... ধাবতঃ'—আহারান্তে সামান্য বেড়াইলে আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং আ... করিয়া দীর্ঘপথ দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, মৃত্যুও তাহার পাছে পা... দৌড়িতে থাকে, অর্থাৎ তাহাকে নানারূপ ক্লেশকর মারাত্মক ... আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের সহরে কেরাণীকুলের ... ঠিক এইরূপ হয় নাই কি? —সম্পাদক, স্বা, স।

রাঁধা-বাড়া

[শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা]

ভারতের সংস্কার—অন্নই ব্রহ্ম এবং শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদিভূত। এই জন্য ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যে আহারের এমন শুচিবিচার এবং রন্ধনের এমন পবিত্রতা রক্ষা করা হইয়া থাকে। হিন্দু যাহা-তাহা খায় না, অনাচারে অশুচি অবস্থায় খায় না, অনাচারীর হাতে অর্থাৎ যাহার তাহার হাতে খায় না। স্বপাক রন্ধন তাহার শ্রেষ্ঠ আচার; অন্যথা তাঁহাদের রাঁধিয়া দেন মা, বোন, কন্যা প্রভৃতি একান্ত আত্মীয়—মানবের জীবন যাঁহাদের স্নেহ-সিঞ্চনে ফুটিয়া ওঠে—যাঁহারা ভগবত-কৃপার সাকার প্রতিমা।

এমন দিন যখন ছিল, তখন হিন্দুর স্বাস্থ্য ও আয়ু অক্ষত ছিল। তখন দেশে যক্ষ্মা প্রভৃতির মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির এমন প্রকোপ ছিল না, এত অকালমৃত্যু ছিল না, অল্পায়ু এত অল্প ছিল না।

কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দু শুচিতাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া, সদাচারকে কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। অধিকাংশ ঘরে, বিশেষতঃ যাঁহাদের অবস্থা একটু স্বচ্ছল এবং যাঁহারা নাগরিক জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের রান্নাঘরে পাচক প্রবেশ করিয়াছে। মা বোন, স্ত্রী, কন্যা আর রাঁধেন না, রাঁধিতে আসেন না; রাঁধিতে কোথাও কোথাও কেহবা অসমর্থতা এবং কেহ কেহ বা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন!

ইহাতে কিছুই প্রতিবাদের ছিল না—যদি না এই উদারতা এবং সাম্যবাদের ফলে জাতীয় জীবন ধ্বংসের পথে ছুটিত।

যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা আত্মীয় স্বজনের দীর্ঘ জীবনের জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা কত শ্রদ্ধায়, শুদ্ধ ভাবে রাঁধিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাহারা রাঁধুনিগিরি চাকুরী করিবে—আগুনের তাপে রাঁধা তাহারা দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে তাহাদের শুচিতার প্রতি লক্ষ্য থাকিতেই পারে না। অনেক কেরাণী অফিসে বড়সাহেবকে দশ বিশটী সেলাম করিলেও বাহিরে আসিয়া বলে "শালা কি পাজী!" চাকর রাঁধুনিও তাহাই করে; তাহারা তাহাদের কাজকে একটী বিড়ম্বনা ভাবিয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধায় অনাচারে রাঁধিয়া দেয়। এই অশ্রদ্ধার কারণও রহিয়াছে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্যই এই বিষের উৎস। স্নেহ যেখানে নাই, সেবা সেখানে হয় না। সেবার ভাব যাহার মধ্যে নাই, তাহাতে পবিত্রতা থাকিতেই পারে না।

মাত্র একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইব—বাজারের কেনা খাবারে, রাঁধুনির রান্নায় আমরা নিতা কি বিষ খাইতেছি।

গত পৌষ মাসে এক জজ সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার চাকর কয়েকখানি পাঁউরুটি লইয়া যাইতেছিল দেখিলাম তাহার সর্দ্দি হইয়াছে, সে নাক ঝাড়িল এবং সেই হাত পাঁউরুটি-ঢাকা-দেওয়া কাপড়ে অসঙ্কোচে মুছিয়া ফেলিল। ভাবিলাম—শিক্ষি স্বাস্থ্যজ্ঞ জজ বাহাদুর এই ভৃত্যের নিষ্ঠি ন অম্লান বদনে আহার করিবেন। কেন? সভ্যতার খাতিরে একটু লক্ষ্য করিলে প্রায় প্রত্যেক পাচক ও ভৃত্যের কার্য্যে এই প্রকার অনাচার লক্ষিত হইবে।

মা এমন পারেন? ভগ্নী, কন্যা স্ত্রী,—কোন আত্মী স্ত্রীলোক? কাহার দ্বারা এমন পৈশাচিক ব্যবহা সম্ভব? অথচ আমরা পাচক রাখিব; কেন না আম যে সভ্য ও সাম্যবাদী। ইহার বিস্তৃত আলোচ আজ থাক্।

কথা উঠিয়াছে—স্ত্রীলোক রাঁধিবে কেন? রন্ধন যে কার্য্য! বেশ কথা—স্ত্রীলোককে দিয়া রাঁধাইতে চা না; কিন্তু তাঁর স্নেহ চাই—ইহা ত সত্য? কিন্তু এ স্নে

কেমন করিয়া পাইব? স্নেহ—সেবার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয়। রোগের সময় কপাল টিপিয়া দেওয়া, মুখে আদর করাই কেবল সেবা নয়,—খাওয়ান একটী শ্রেষ্ঠ সেবা! ভোজনের মধ্য দিয়া আমরা জীবন লাভ করি। যাহার দ্বারা জীবন সুস্থ সঞ্জীবিত হয়, তাহা কি পরম সেবা নহে? তাহা কি হীন কার্য্য? হিন্দুর নারী জাতি এই জন্যই সাগ্রহে—ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া, নারীর একটী গুণ-বিভূতি বলিয়া—জগদ্ধাত্রীর মত রন্ধনশালে গিয়া আমাদের অমৃত যোগাইতেন!

রন্ধন—পাচক-বৃত্তি—সাম্য—শুচিতা এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিবার রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহা পাঠক-বর্গের গোচর করিব। আজিকার শেষ কথা—রন্ধনে আবার শুচিতা ও সঙ্কীর্ণতা ফিরিয়া আসিলে জাতির জীবনী-শক্তিও আর একটু ফিরিয়া আসিবে।

বসন্তের কোষ্ঠী

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

ষড় ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও শীর্ষস্থানীয় রূপে পরিগণিত। কিন্তু ঋতুরাজ—মনুষ্য গো, মীন প্রভৃতির পক্ষে যমরাজ স্বরূপ। বস্তুতঃ বসন্তকালে প্রতিবৎসর কত শত জীব যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলীলা পরিত্যাগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মারাত্মক ব্যাধির বসন্তকালে অধিকতর প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বসন্তরোগ কহে। স্থান ও জাতি ভেদে বসন্তরোগ বহু নামে প্রখ্যাত। যথা:—বোম্বাই প্রদেশে পিচিনৌ, মাদ্রাজ বিভাগে—পেন্না, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—চেচক, পাঞ্জাবে—অম্মরতা মাতা, বারানসীতে—ভবানী, মুলতানে—বাবা, এলাহাবাদে—দেবী, সাঁওতাল পরগণায়—জগদম্বা, ছোট নাগপুরে—গোটী, উড়িষ্যায়—ঠাকুরাণী, আসামে—পীড়ঙ্গ, কুচবিহারে—শীতলা, চট্টগ্রামে—বড় পীড়া.. ইত্যাদি।

একটি কিম্বদন্তী আছে যে, বসন্তরোগ প্রথমে উষ্ট্র হইতে মনুষ্য শরীরে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু এই রোগ সর্ব্বাগ্রে কোথায় কি প্রকারে প্রকাশিত হয় তাহার কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অদ্যাপি কেহ করিতে পারেন নাই। অনেকেই বলেন যে, ভারতবর্ষ এই পীড়ার উৎপত্তি স্থান এবং ভারতভূমি হইতেই ইহা অন্য দেশে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মহারাজ নহুষের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং যজ্ঞ শীতল কালীন্ কুণ্ড হইতে আবির্ভূতা হইয়া "শীতলা" নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রথমে মৎস্যাধিপতি বিরাট-রাজ-সমীপে উপস্থিত হন। তৎপরে বৃন্দাবন, মথুরা, বারণসী, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্য্যটন করেন। ইহা পৌরাণিক সূত্রে গ্রথিত হইলেও জানিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টোব্দের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বসন্তরোগ ভারতবাসীর উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত, পুরাকালে শীতলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনাদি বহু সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত এবং মাতার অর্চ্চকগণ ইন্ অকিউলেশন্ বা নৃ-মসূর্য্যাধান দ্বারা মানবজাতিকে স্বাভাবিক বসন্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহারও বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীনদেশে বসন্তরোগ অন্যূন্ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে সুপরিচিত। আরবদেশে মহম্মদের জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৬৯ খৃঃ রাজপ্রতিনিধি এব্র' ও তাঁহার

অধীনস্থ একদল য়্যাবিসিনিয়ান্ সৈন্য মক্কা নগর আক্রমণ করিতে গিয়া তাঁহারা সহসা এই পীড়ার আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া অবশেষে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করেন যে, কাফ্রিগণ যখন অতি সহজে এই রোগাক্রান্ত হয়, তখন আফ্রিকা দেশ বোধ হয় এই রোগের আকর স্থান। অবশ্য ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। তবে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষের সহিত আফ্রিকার যথেষ্ট সংস্রব থাকায় এই রোগ ভারতভূমি হইতে উক্ত স্থানে যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ক্রুজেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে এবং আমেরিকার চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই রোগ দেখা দিয়াছিল।

বসন্তরোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এতাবৎ কাল বহু উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ফলাফল সম্বন্ধে এখনও মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইন্-অকিউলেসন্ বা নূ-মসূর্য্যাধান অর্থাৎ বসন্ত বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া মৃদু বসন্তোৎপাদন দ্বারা ভবিষ্যতে রোগের মারাত্মকতা নিবারণ প্রথা ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, তাতার আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইত। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শীতলাদেবীর পূজারিগণ নিয়মিত সময়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক, টীকাগ্রহণাভিলাষী নরনারীকে একমাস কাল দুগ্ধ, নবনী, মাংস ইত্যাদি ভোজনে বিরত করিয়া একখানি পবিত্র রক্তবস্ত্র দ্বারা ভুজদ্বয় উত্তমরূপে মার্জ্জন ও কর-পৃষ্ঠস্থ অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঈষৎ ক্ষত উৎপাদন পূর্ব্বক তদুপরি বসন্তের পূয ও গঙ্গাজল মিশ্রিত কার্পাস বন্ধনে এবং মন্ত্রাদি পাঠে নূ-মসূর্য্যাধান কার্য্য সমাধা করিতেন। অতঃপর লোকে বসন্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরস্থ বিষ ঈষৎ লইয়া নিজের শরীরের রক্তের সহিত মিশাইয়া দিত। এই প্রথাকে লোকে বাঙ্গালা টীকা দেওয়া বলিত।

আরব দেশে কেবল হস্তের উপরিউক্ত স্থানে, আবিসিনিয়ায় উরুদ্বয়ে এবং জর্জিয়ায় বাহুর উপরিভাগে টীকা দিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেবল আরব দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আবুবীর মহম্মদ রাজিস্ ব্যতীত এসিয়ায় অপর কেহ ভালরূপ চিকিৎসা জানিতেন না। তিনি রোগ প্রশমন জন্য রক্ত মোক্ষন করিতেন এবং পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ঔষধাদি দিতেন এবং রোগীকে সবল রাখিবার নিমিত্ত নানাবিধ তরল পথ্যাদির ব্যবস্থাও করিতেন। চীনদেশে পূয়ের পরিবর্ত্তে গুটিকার শুষ্ক কন্দু নাসাপরি স্থাপন করিত। স্কট্‌ল্যণ্ডের হাইল্যাণ্ডের শিশুদিগকে বসন্তরোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিত অথবা শিশুদিগের হস্তে বসন্তের পূয মিশ্রিত পশমী সূতা জড়াইয়া দিত। ওয়েল্‌স্ দেশে বসন্তের শুষ্ক কন্দু ক্রয় করিয়া হস্ত বা পদের কোমল স্থানোপরি ঘর্ষন করিত। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথিতনামা চিকিৎসক সিডেন্‌হ্যামের বুদ্ধিমত্তায় বসন্তরোগীর চিকিৎসা-প্রণালী ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সংসারত্যাগী পূতাত্মাগণের রোগ-নিরাময় করণ-ক্ষমতা এবং সংসারত্যাগিনী ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাদিগের মন্ত্রপূত কবচ এতদুভয়ের প্রতি সাধারণের অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। বসন্তখদির বিক্রয় প্রথা সর্ব্বাগ্রে ভারতেই আরম্ভ হয়; কিন্তু জানিতে পারা যায় যে, এই নিয়ম কেবল ভারতবর্ষে নিবদ্ধ ছিল না; উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ বিভাগেও প্রচলিত ছিল।

ভ্যাক্‌সিনেসন বা গো-মসূর্য্যাধানে অর্থাৎ গোবীজ টীকা দিয়া শরীরকে স্বাভাবিক বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিবার নিয়মও এদেশে অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। অতীত ভারতবর্ষে, পারস্যদেশে এবং য়্যাণ্ডিস্ পর্ব্বত-নিবাসী কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ১৭৭৫ হইতে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেন্ গো-বসন্ত বিষয়ে গভীর গবেষণা ও পরীক্ষালব্ধ প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়া ১৭৯৬ খৃঃ গো-বসন্তের বীজ লইয়া মানব শরীরে টীকা দিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। ১৭৯৮ খৃঃ ইহার তথ্য বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮০২ খৃঃ তিনি ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দেড়লক্ষ টাকা এবং ১৮০৭ খৃঃ তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর গবর্ণমেণ্ট ক্রমে নূ-মসূর্য্যাধানে নিবারণ ও গো মসূর্য্যাধানে প্রচলন জন্য প্রয়াস করেন। ১৮৫৬ খৃঃ গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে একটি বিধি বদ্ধ করেন। কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের এই আইন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হওয়ায়, এক্ষণে কেবল গো-মসূর্য্যাধান ব্যতীত নূ-মসূর্য্যাধান দেখিতে পাওয়া যায় না। গো-বীজের টীকাতে মৃত্যু-সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বাঙ্গালা টীকা অপেক্ষা এই ইংরাজী টীকা সর্ব্বতোভাবে উত্তম ও নিরাপদ। সেই জন্য আইন দ্বারা বাঙ্গালা টীকা এদেশে বন্ধ করা হয়। টীকা দিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে। টীকা দেওয়া সত্ত্বেও যদি বসন্ত হয় (হইতেও দেখা যায়), তাহাতে প্রাণের আশঙ্কা প্রায় থাকে না। কিন্তু ইংরাজী টীকার তেজ মানব শরীরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, সেজন্য মধ্যে মধ্যে টীকা লওয়া আবশ্যক।

জন্ম-রহস্য

(গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

গর্ভাধান।

শুক্র।

পুরুষের জনন-যন্ত্র সমূহ হইতে, শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা মুষ্ক বা অণ্ডকোষ, আশয়নালী-মধ্য গ্রন্থি (Prostate gland), বীর্য্যাধার (Vesiculæ Seminalis), কাউপার্ গ্রন্থি এবং মূত্রনালী (Urethra) সন্নিহিত গ্রন্থিসমূহ-নির্গত রসবিন্দুসমূহের সংমিশ্রণে সঞ্জাত। স্ত্রী-সম্ভোগের ফলে প্রতিবারে পুরুষের যতখানি রেতঃপাত বা শুক্র স্খলন হয়, অবস্থা বিশেষে তাহার পরিমাণে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। নির্গত শুক্র গাঢ়, চট্‌চটে, বর্ণহীন; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে দুগ্ধশুভ্র জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপর পুরুষদিগের শুক্র দেখিতে ভাতের ফেনের ন্যায়। শুক্রের গন্ধ অতি অদ্ভুত; উহা কাহারো বাদামের ন্যায়, কাহারো বা করাতের দ্বারা সদ্যছিন্ন অস্থির গন্ধের ন্যায়। আশয়-নালী-মধ্য গ্রন্থি (Prostate) হইতে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম বীজাণুপুঞ্জের শুক্র-মধ্যে অবস্থান হেতু উহার গন্ধ ঐরূপ অপরূপ হয়। শুক্রের গন্ধের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, মুষ্ক হইতেই শুক্র ঐরূপ গন্ধযুক্ত হয়। শুক্রের (alkalinity) ক্ষারধর্ম্ম আশয়নালী-মধ্য-গ্রন্থি নিঃসৃত রসের সংস্রবে ঘটিয়া থাকে বলিয়া অনেক অনুমান করিয়া থাকেন। বীর্য্যাধার-নির্গত রসের সংমিশ্রনে শুক্রের বর্ণের উৎপত্তি ঘটে এবং কাউপার গ্রন্থিসমূহ হইতে নির্গত রসের সংস্রবে উহা আঠার ন্যায় চট্‌চটে হয়। শুক্র অনেকক্ষণ বাতাসে অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে আরও তরল হইয়া যায় এবং উহার আঠার ন্যায় চট্‌চটে ভাবও আর থাকে না।

অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের (Microscope) সাহায্যে শুক্র পরীক্ষা করিলে, তন্মধ্য পুংবীজাণুপুঞ্জ এবং মূত্রনালী ও প্রষ্টেট হইতে নির্গত (granules, cells and epithelia) নানাবিধ কনিকা, কোষাণু এবং সূক্ষ্ম তন্তুসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুং বীজাণুর দেহের মস্তক, মধ্যভাগ এবং পুচ্ছ এই তিনটি অংশ আছে। শুক্রের বীজাণুর দ্বারা উহার সন্তানোৎপাদিকা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বীর্য্যস্খলিত হইবামাত্র

অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পুংবীজাণু-গুলি পুচ্ছ সঞ্চালন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বিচরণ করিতেছে। যত্ন পূর্ব্বক বীর্য্য কোন পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিলে, ৪৮ ঘণ্টা পরেও এই বীজাণুগুলিকে জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রের ও যোনিনালী নিঃসৃত অম্লরসের সংস্পর্শে বীজাণুসমূহ মরিয়া যায়। ইহাদিগের দেহে ৪৭ ডিগ্রীর অধিক তাপ প্রয়োগ করিলে এবং ১৫ ডিগ্রীর ন্যূন শৈত্য প্রয়োগ করিলে ইহারা মরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক (Duhrssen) দুরসেন, সাড়ে তিন সপ্তাহ পরে রমনীদিগের জনন-যন্ত্রসমূহের মধ্যে সজীব ও সচল বীজাণু সমূহ দেখিয়াছেন। জলে। সংস্পর্শে এক ঘণ্টার মধ্যেই বীজাণুসমূহ একেবারে গতিশক্তিহনী হইয়া থাকে।

শুক্র জল অপেক্ষা ভারী এবং উহা জলে ও অম্লরস-সমূহে (acids) অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায় এবং সুরাসার (Alcohol) স্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জমাট বাঁধে। রাসায়নিক ভাঙ্কুয়েলীন শুক্র বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উহার যে সকল উপাদান এবং তৎসমুদয়ের যে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

জল	শতকরা	৯০	ভাগ।
জৈব পদার্থ	”	৬	”
মৃৎলিপ্ত ফস্কেট	”	৩	”
সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)		১	”

ইহা জানা কথা যে, পুং-বীজানু ও স্ত্রী অণ্ডাণু মিলিত হইয়া গর্ভমধ্যে ভ্রূণের সঞ্চার হয়। কিন্তু পুরুষ স্ত্রী-সহবাস করিলেই নারীর অণ্ডাণুর (ovam) সহিত পুরুষের বীর্য্যগত বীজাণু মিলিয়া নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় না। পুরুষ স্ত্রী-সহবাস করিলে স্খলিত শুক্রের সহিত অসংখ্য বীজাণু নির্গত হয় বটে। কিন্তু নারীদিগের অণ্ডাণু অতি অল্প সংখ্যায় নির্গত হইয়া থাকে,—তাহাও আবার ঋতুর কয়েক দিন পর্য্যন্ত সতেজ কার্য্যক্ষম থাকে। প্রতিমাসে রমণীগণের অণ্ডাণুকোষ হইতে দুই তিনটির অধিক অণ্ডাণু কখনও বাহির হয় না। বলা বাহুল্য, রতি সুখ সম্ভোগের সময় পুরুষদিগের শুক্রের সহিত বীজাণু নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু রমণীদিগের অণ্ডাণু কামকেলির সময় বাহির হয় না। সুতরাং অবস্থা খুব অনুকুল না হইলে গর্ভাধান সম্ভবপর নহে। মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার সহিত গর্ভাধানের কোনও সংস্রব নাই।

গর্ভাধান।

গর্ভাধানের স্থান।

পুরুষের বীর্য্য, স্ত্রীসম্ভোগকালে স্খলিত হইয়া সবেগে নারীর যোনি-নালীর (vaginal passage) * মধ্যে প্রবেশ করে। পুরুষেন্দ্রিয় একটু দীর্ঘ ও বীর্য্য খুব বেগে পড়িলে সম্ভবতঃ উহা গর্ভগ্রীবায় গিয়া (Cervix) লাগে। বীর্য্য মধ্যস্থ বীজাণু তথা হইতে গর্ভের ভিতর গিয়া স্ত্রী-অণ্ডাণুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ উৎপাদন হইতে পারে; কিন্তু কোথায়, কি অবস্থায় নারীর অণ্ডাণুর সহিত পুরুষের বীজানুর সম্মিলন ঘটে, তাহা অদ্যাপি কেহ সম্পূর্ণ নির্ভুল বিশ্বাসযোগ্যভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমত এই যে, নারীদিগের কামোদ্দীপনের ফলে তাহাদিগের গর্ভমুখ বা জরায়ু-মুখ প্রসারিত হইয়া পড়ে। পুরুষের শুক্র গ্রহণের জন্যই নাকি—স্থানীয় নাড়ীসমূহের (Nerves) উত্তেজনার ফলে, ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কতকটা বীর্য্য পুংবীজাণু সমেত গর্ভ মধ্যে চলিয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, বীর্য্য যোনি-নালিতে গর্ভ-গ্রীবার সন্নিকটে পতিত হইলে, কতকগুলি পুং বীজাণু পুচ্ছ সঞ্চালনের দ্বারা ব্যাঙাচির মত অগ্রসর হইয়া গর্ভমুখ দিয়া গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। বীজাণুপুঞ্জ জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও উহাদিগের ক্রমিবৎ গতি ক্ষান্ত হয় না।

অনেকের ধারণা অণ্ডাণুকোষ (ovary)-স্থিত অণ্ডাণু যখন 'অণ্ডাণু-পেটিকা' নামক (Graffian follicle) উহার সূক্ষ্ম আবরণকোষ হইতে মুক্ত হইয়া বাহির হয়, তখন কোন পুংবীজাণুর সাক্ষাৎকার না পাইলে উহা অণ্ডাণুপ্রবাহ (Fallopian Tube) ভিতর দিয়া বিচরণ করিতে করিতে জরায়ু-মধ্যে প্রবেশ করে। তথায় মিলনের আশায় থাকিয়া পুংবীজাণুর সাক্ষাৎ পায় ত ভালই, নচেৎ জীবিত বা মৃত অবস্থায় অণ্ডাণু—শরীরের বাহিরে চলিয়া যায়। কখন ও পুংবীজাণু জরায়ু-দেহের উর্দ্ধস্থিত প্রান্তের উভয়দিকে সংলগ্ন অণ্ডাণুপ্রবা নামক নালি (Fallopian Tube) দিয়া চলিতে চলিতে একেবারে তাহাদের ঝুমক ফুলের ন্যায় মুখ বিবরের অগ্রভাগে আসিয়া পড়ে। এইখানে অণ্ডাণুকোষের উপরকার আচ্ছাদন ফাটিয়া স্ত্রীবীজ বাহির হইলে, উভয়ে আকৃষ্ট হইয়া পুংবীজ স্ত্রীবীজের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া যায়—ইহাই হইল গর্ভাধানের সূত্রপাত। তারপর দুইটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজ একীভূত হইয়া অণ্ডাণু-প্রবা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পুনরায় জরায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ে ও তথায় শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নারীদিগের গর্ভাধান কালে নানাপ্রকার বিচিত্র এবং কৌতুহলদ্দীপক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কেহ এ পর্য্যন্ত ঐ সকল ঘটনার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুরুষের বীজাণু এবং স্ত্রীলোকের অণ্ডাণুর মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, এবং সেই আকর্ষণের ফলেই তাহা-দিগের মিলন ঘটিয়া থাকে।

বহু পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, যদি জরায়ু-মধ্যে অণ্ডাণুর সহিত বীজাণুর মিলন ঘটে তবে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ গর্ভাধান হয়। আর যদি বীজাণুরা অণ্ডাণুর পূর্ব্বেই জরায়ু-মধ্যে প্রবেশ করে, তবে স্বভাব-সিদ্ধ আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে উহা ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হইবার জন্য অণ্ডাণুপ্রবা নামক নালীর মধ্যে প্রবেশ করে। এই নালির মধ্যেও অণ্ডাণুর সাক্ষাৎকার না পাইলে, বীজাণুগুলি নালীর ঝালরযুক্ত মুখসকাশে উপস্থিত হয়। তবুও যদি অণ্ডাণু না আসে তাহা হইলে প্রায়শঃ ঐস্থান অতিক্রম করিয়া, উদরদেশের আভ্যন্তরিণ যন্ত্রসমূহ রক্ষাকারী চক্রের ন্যায় আচ্ছাদন—কোষ্ঠধরা কলার মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ করে।

গর্ভাধানের পূর্ব্বে নারীদিগের অণ্ডাণুর আকার ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় দৃষ্ট হয় (অবশ্য চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না), তখন এই কোষের ব্যাসের পরিমাণ প্রায় ০·২ মিলি-মিটার। অণ্ডাণুর উপরিভাগে একটি আবরণী আছে, এই আবরণীর মধ্যে জীবোপাদান বা পীতবর্ণ 'কুসুম' নিহিত থাকে। উচ্চশ্রেণীর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কুসুম পর্য্যবেক্ষণ করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়, এই রেখাগুলি অণ্ডাণুর মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম নালীসমূহের পরিচায়ক এবং বৈদ্যকশাস্ত্রে "Zona radiata" বা "দিব্য মেখলা" আখ্যালাভ করিয়াছে। অণ্ডাণুর জীবোপাদন (Vitellus) পীতাভ, ঈষৎ তরল ও এলবুমেনের ন্যায় পদার্থ। অণ্ডাণুর জীবোপাদান বা কুসুমের মধ্যে একটি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কোষাণুকেন্দ্র" সংস্থিত। এই কোষাণুকেন্দ্র (.Nu-cleres) অতি কোমল আবরণীর দ্বারা আবৃত এবং ইহার মধ্যেই জননবিন্দু (Nucleolus or germinal spot) অবস্থিত। অণ্ডাণু—অণ্ডাণুপেটিকা (Graffian follicles) হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, পুষ্টিলাভ করিলেই উহার কতকগুলি আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এই সকল পরিবর্ত্তন বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবার সাধারণ পাঠকের কোন আবশ্যকতা নাই এবং এই বিষয়টিও খুব সুবোধ্য নহে।

গর্ভাধানের অবস্থা-সূচীত বীর্য্য-নিষেকের পরে অসংখ্য পুংবীজাণু (Spermatozoa) অণ্ডাণুকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরে। যে বীজাণু'টি সর্ব্বাগ্রে 'অণ্ডাণুর' সন্নিহিত হয় সে মস্তকের দ্বারা ডিম্বাণুর উপরিভাগে সূক্ষ্ম আবরণের উপর আঘাত করে, আর সঙ্গে সঙ্গে আহত বা

গর্ভাধান।

* পুরুষ ও স্ত্রীদিগের জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যাভ্যন্তরিক গঠন ও ক্রি[illegible] সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা [illegible] করা উচিত। নূতন গ্রাহকগণ ৵০ র ডাক টিকিট পাঠাইলে ১[illegible] পাইবেন।

পৃষ্ঠ স্থানটি ঈষৎ ফুলিয়া ফাঁপা ফাঁপা হইয়া উঠে। এই উন্নত স্থানটি ভেদ করিয়া বীজাণু মাথা ঠেলিয়া ঠেলিয়া পুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে অণ্ডাণুর মধ্যদেশে উপস্থিত হয়। বীজাণুটি সম্পূর্ণরূপ অণ্ডাণুর কুসুমের (Vitellus) মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার পুচ্ছ সঞ্চালন ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় এবং পরিশেষে বীজাণুর পুচ্ছ একেবারেই অদৃশ্য হয়। সঙ্গে বীজাণুর মস্তক ও মধ্যদেশ একটি গোলাকার জীববিন্দু পুরুষ ভাবগত পরিকোষাণুকেন্দ্র গঠন করে। ইহার পর এই পুরুষভাব-গত পরিকোষাণুকেন্দ্র (The male pronucleus) স্ত্রী-অণ্ডাণুর কুসুমকোষের মধ্যভাগে স্ত্রীভাব-গত কোষাণুকেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় কোষাণুকেন্দ্র পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রীভাব-গত কোষাণুকেন্দ্রদ্বয়ের সম্মিলের পর, কিয়ৎক্ষণ ক্রিয়ার বিরাম দেখা যায়। তাহার পর আবার বিভাগ প্রক্রিয়া (process of Segmentation) আরম্ভ হয়। ডিম্বাণু প্রথমে দুইটি কোষে বিভক্ত হয়, এই দুইটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দুই দুইটি কোষে বিভক্ত হয়। যতক্ষণ না বহুসংখ্যক কোষের উৎপত্তি ঘটে ততক্ষণ এইভাবে এক কোষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অন্য কোষ-গঠন ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই পরস্পর সংলগ্ন কোষ-পুঞ্জই মানব ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা। এই কোষপুঞ্জের পুনঃ পুনঃ সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা ভ্রূণের আকার বৃদ্ধি পায়। কোষসমূহের গঠনবৈচিত্র্য এবং তাহাদিগের সংস্থান বৈচিত্রের দ্বারা ভ্রূণ ক্রমে মানবমূর্ত্তি ধারণ করে। এই পরিবর্ত্তন পরম্পরার পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব অতীব জটিল, সুতরাং আমরা এস্থলে উহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিতে পারিলাম না। ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ ভ্রূণবিজ্ঞান (Embryology) নামে অভিহিত। ইহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অনুশীলনযোগ্য সন্দেহ নাই। যে ডিম্বাণুর গর্ভাধান কার্য্য শেষ হইবার পর বিভাগ প্রক্রিয়া (Segmentation) আরম্ভ হইয়াছে, সে ধীরে ধীরে অণ্ডাণুপ্রবার ভিতর দিয়া জরায়ুগর্ভে প্রবেশ করে এবং তাহার আভ্যন্তরিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তথায় অবস্থান করে। তাহার পর অতি দ্রুত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (mucous membrane) উপরিভাগ ছিন্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রবেশ পথ বা ছিদ্রটি সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়। তখন গর্ভ-গাত্রে নিহিত অণ্ডাণু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; উহা সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হইলে প্রসবকাল সমাগত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া থাকে।

ভ্রূণ-প্রসঙ্গ।

মাসভেদে অবস্থাভেদ।

গর্ভাধানের পর দ্বিতীয় সপ্তাহে ডিম্বাণু প্রায় সিকি ইঞ্চি দীর্ঘ হয়।

প্রথম মাস। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে মস্তিষ্ক, চক্ষু ও কর্ণের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট এবং ভ্রূণ আবরণকারী থলিয়াটি (Amnion) নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চতুর্থ সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ গর্ভাধানের একমাস পরে ভ্রূণের মুখ ও গুহ্যদেশ সংগঠিত হয় এবং অন্যান্য অবয়বের চিহ্নগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে, দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে হৃদপিণ্ডের যে অঙ্কুর বা সূচনা দেখা যায় তাহা এই সময়ে অনেক বাড়িয়া উঠে।

দ্বিতীয় মাসের শেষে ডিম্বাণু কুক্কুট ডিম্বের ন্যায় বড় হয়। ভ্রূণের নাসিকাটি স্বাভাবিক আকার লাভ

দ্বিতীয় মাস। করিতে আরম্ভ করে, এবং কণ্ঠাস্থি ও অধো হনুর (lower jaw) গঠন কার্য্য আরব্ধ হয়।

তৃতীয় মাসের শেষে ভ্রূণ তিন ইঞ্চি এবং সওয়া তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজনে কিঞ্চিদধিক

তৃতীয় মাস। তিন আউন্স হইয়া থাকে। এই মাসে (Placenta) "ফুল" দেখা দেয়, অঙ্গুলিসমূহের উপরিভাগে নখের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। গলা গড়িয়া উঠে এবং জননেন্দ্রি

আকার প্রাপ্ত হইতে থাকে অর্থাৎ এই সময় ভ্রূণ দেখিয়া অনেকটা বুঝা যায়, যে সেইটি স্ত্রী না পুরুষ।

চতুর্থ মাসের শেষে ভ্রূণ পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। দৈর্ঘ্যের প্রায় চারি আনা আন্দাজ স্থান ব্যাপিয়া মস্তক

চতুর্থ মাস। গঠিত হয়। মাথার উপর অতি কোমল চিকণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ দেখা দেয় এবং দেহের স্থানে স্থানে সুকোমল লোমাবলী আবির্ভূত হয়। এই মাসে মুখ ও নাসিকার গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হওয়াতে তাহারা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। ভ্রূণটি স্ত্রী কি পুরুষ জাতীয় তাহাও অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই মাস হইতেই ভ্রূণ অল্প অল্প অঙ্গ চালনা করিতে আরম্ভ করে।

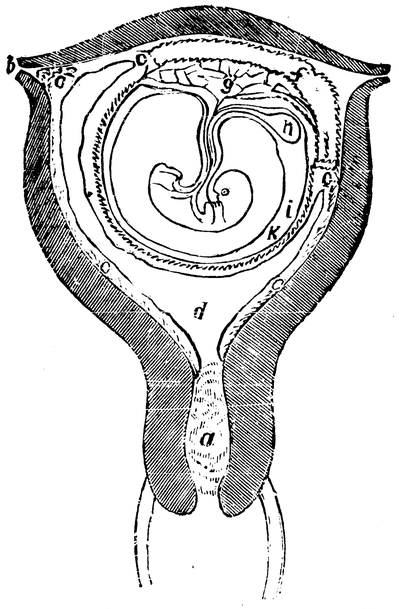

[৭।৪ মাস গর্ভের জরায়ুর লম্বচ্ছেদ—জরায়ু গহ্বরে ভ্রূণ অবস্থিত রহিয়াছে।]

পঞ্চম মাসে ভ্রূণ দশ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ওজনে প্রায় এক পাউণ্ড বা আধসের হয়। সমস্ত শরীর অতি সূক্ষ্ম

পঞ্চম মাস। কেশ সমূহের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই মাসে ভ্রূণের দেহের উপর শুভ্র মেদ বা চন্দনের ন্যায় বসা নির্ম্মিত সূক্ষ্ম আবরণ (Vernix caseosa) দেখিতে পাওয়া যায়। নব প্রসূত জাতকের গাত্রেও এই বসার আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাসে গর্ভধারিণী গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গ চালনা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন।

ছয় মাসের পর ভ্রূণ বার ইঞ্চি লম্বা এবং ওজনে দুই পাউণ্ড বা প্রায় এক সের হইয়া থাকে। এই মাসে

ষষ্ঠ মাস। ভ্রূযুগের এবং চক্ষুর পক্ষ্মসমূহের আবির্ভাব হয় এবং মস্তকের কেশ সমূহ বেশ প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

সপ্তম মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড বা দেড় সের। এই মাসে

সপ্তম মাস। ভূমিষ্ঠ হইলে উপযুক্ত শুশ্রূষার গুণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। দুই দশটি প্রসূত ভ্রূণ সপ্তম মাসে প্রসূত হইয়া বাঁচিয়াছে—সেরূপ ঘটনা আমাদের জানা আছে।

অষ্টম মাসে ভ্রূণ প্রায় ১৬।১৭ সতর ইঞ্চি দীর্ঘ এবং

অষ্টম মাস। ওজনে চারি হইতে সাড়ে চারি পাউণ্ড অর্থাৎ দুই সের বা কিছু উপর হইয়া থাকে।

নবম মাসে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য বড় বৃদ্ধি পায় না, তবে এ

নবম মাস। মাসে ভ্রূণ প্রায় ১৮ আঠার ইঞ্চি লম্বা হয়, এবং উহার ওজন ৪॥০ পাউণ্ড হইতে সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড (২॥০ সের পর্য্যন্ত) হইয়া থাকে।

দশম মাসে ভ্রূণের পূর্ণ-পরিণতি ঘটে এবং গর্ভস্থ ভ্রূণকে উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভ্রূণ বলিতে পারা

দশম মাস। যায়। এই মাসে ভ্রূণ উনিশ এমন কি সময় বিশেষে কুড়ি ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ওজনে সাত পাউণ্ড হয়। নিম্নে

যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে পূর্ণগর্ভা গর্ভিণীর জরায়ু-কোষ মধ্যে ভ্রূণের অবস্থা প্রদর্শিত হইল। ভ্রূণটি জলের ন্যায় তরল পদার্থে পূর্ণ অবরণীর মধ্যে রহিয়াছে।

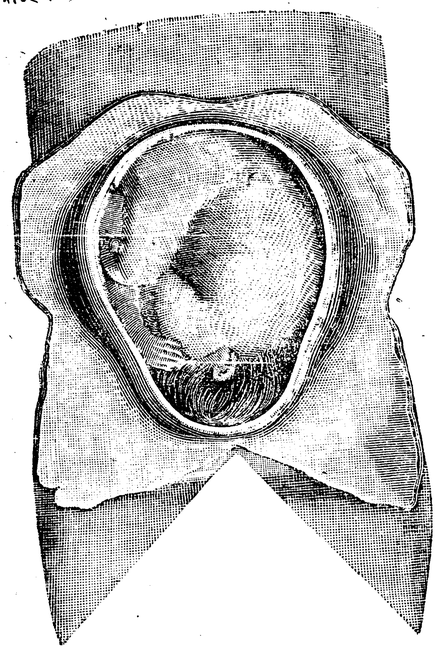

অপত্যপথে ভ্রূণের মস্তকের স্বাভাবিক স্থিতি—

দশম চান্দ্রমাসের শেষে ভ্রূণটির পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রসব-বেদনা আরম্ভ হয় এবং যথাকালে শিশু জন্মগ্রহণ করে।

গর্ভাবস্থা।

নারীর অণ্ডাণুর গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গর্ভাবস্থার আরম্ভ এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের পুরিপুষ্টির পর উহার জন্মের সহিত গর্ভাবস্থার শেষ। ভিন্ন ভিন্ন রমণীর গর্ভ-কালের পরিমাণ ভিন্ন হইয়া থাকে। দশ চান্দ্রমাসে, অথবা শেষ-বার রজস্বলা হইবার প্রথম দিন হইতে গণনা করিয়া সাধারণতঃ ২৮০ দিনে (অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিন ; দশ মাস দশ দিন ভুল হিসাব) গর্ভকাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

গর্ভের সূচনা হইতে গর্ভিণীর শরীরে যন্ত্রসমূহের বিশেষতঃ জনন-যন্ত্র এবং তাহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় প্রধান শারীরিক পরিবর্ত্তন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রজঃস্রাব না হইলেই লোকে উহাকে গর্ভ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে রমণী সুস্থ ও সবল, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যিনি রজঃস্বলা হইয়া থাকেন, তাঁহার রজঃস্রাব বন্ধ হইলে উহাকে গর্ভাধানের লক্ষণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। দুর্ব্বল ও রোগার্ত্ত রমণীদিগের রক্তাল্পতা এবং ক্ষ রোগের উৎপত্তি হেতু শোণিতস্রাব বন্ধ হইতে পারে। শিশুকে স্তন্যদানের অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইলে স্ত্রীলোকে যেমন সেদিকে লক্ষ্য করে না, সেইরূপ রজঃস্রাব ব থাকার সময়ে গর্ভ সঞ্চার হইলেও সেদিকে কে দৃক্‌পাত করে না।

গর্ভ-সঞ্চারের পর তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে নারীদিগে 'গা বমি বমি' করে এবং অল্প অল্প বমি হয়। তৃতী মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে

প্রাভাতিক উপসর্গ।

এই অবস্থায় কখন কতবার ব হইবে, তাহার কোনই ঠিক নাই

যদি কোন সুস্থ সবল রমণী বিবমিষা দ্বারা আক্রান্ত এবং মাঝে মাঝে বমন করিতে থাকে, আর যদি তাহ অসুখের অন্য কোন কারণ বা লক্ষণ দেখিতে না পাও যায়, তাহা হইলে এই প্রকার বিবমিষাকে গর্ভ সঞ্চা একটি সামান্য প্রামানিক লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া ল যাইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় একশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের ক্রমাগত মু জল উঠিয়া থাকে। ইহাদিগের

লালানির্গম —মুখে জল ওঠা।

মুখনিঃসৃত জল অর্থাৎ লালা ক চটচটে, শ্বেতবর্ণ এবং ফেণি সহজে ইহা মুখ হইতে বা

হইতে চাহে না, অথচ না পরিত্যাগ করিলেও সোয়াস্তি পাওয়া যায় না—বড় বিরক্তি ঠেকে।

গর্ভাবস্থায় অনেক রমণীরই নাড়ীতন্ত্রের অসামাঞ্জস্য বা বিশৃঙ্খল ভাব (Nervus derangement) পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময়ে

নাড়ীসম্বন্ধীয় লক্ষণ।

নাড়ীর উত্তেজনা এরূপ অধিক হয় যে তুচ্ছ কারণে হৃদয় মন বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং আনন্দের সামান্য কারণ ঘটিলেই আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। যাহাদিগের শরীর দুর্ব্বল, নাড়ী মণ্ডলীর অবস্থাও মন্দ, একটু অযত্নে তাহাদিগের গর্ভাবস্থায় "হিষ্টিরিয়া" বা মূর্চ্ছা রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সময়ে শরীরের নানাস্থানে শিরা ও মাংসপেশীসমূহের একরূপ কষ্টদায়ক বেদনা হইবার সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী-দিগের ক্ষণেক্ষণে মেজাজের পরিবর্ত্তন, এবং অগ্নিমান্দ্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। আহার বিষয়েও রুচির পরি-বর্ত্তন দেখা যায়, এই সময়ে নানাপ্রকার দ্রব্য খাইতে সাধ হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় রমণী যে প্রকার খাদ্য খাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, এই সময়ে সেইরূপ দ্রব্য খাইবার জন্য তাহার খুব আগ্রহ দেখা যায়।

গর্ভসঞ্চারের পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যে গর্ভিণী স্তন-যুগলে অল্প অল্প ভার বোধ করে। দ্বিতীয় মাসের শেষে

স্তনের পরিবর্ত্তন।

বাহিরের লোকেও স্তনযুগলের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে পারে। সেই সময় হইতে স্তনযুগলের আকার ও পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমশঃ কুচযুগল কঠিন ও গ্রন্থিবহুল হইয়া উঠে। স্তনদ্বয়ের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের নিম্নস্থ শিরা ধমনীসমূহ পুষ্ট হইয়া উঠে, ইহাতে গৌরাঙ্গী রমণীদিগের চর্ম্ম মর্ম্মরের ন্যায় চিক্কণ দুগ্ধধবল হয়। স্তনের আকার বৃদ্ধি হেতু স্তনের এরূপ চাপ লাগে যে স্তন মণ্ডলের উপর শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল রেখাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মাসের পর, স্তনের অগ্রভাগে টিপিলে অল্প অল্প দুগ্ধ বাহির হয়। প্রথম প্রথম এই দুগ্ধ বেশ স্বচ্ছ থাকে, কিন্তু গর্ভ যত পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে এই দুগ্ধের বর্ণ তত গাঢ় হইতে থাকে। স্তনের যে সকল গর্ভলক্ষণাত্মক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহার মধ্যে স্তনবৃন্তের চারি পার্শ্বস্থ স্থানের (areoala) পরিবর্ত্তন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সময়ে স্তনের বৃন্ত উন্নত এবং কঠিন হইয়া উঠে এবং উহার চারি পার্শ্বস্থ স্থানের বর্ণ ধূসর হইতে মসীময় হইয়া থাকে। পাঁচ মাসের সময় স্তনবৃন্তের চারি-পার্শ্বস্থ স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল গোল ব্রণের দ্বারা আকীর্ণ হয় এবং চূচুকের সম্প্রসারণ ঘটে। চুচুক প্রদেশের পর এক ইঞ্চির অধিক স্থান ব্যাপিয়া একটি বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৃত্তটি কতকটা শ্বেত চন্দনের অলকা-তিলকার ন্যায় ছোট ছোট শ্বেতাভ বিন্দু সকলের দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসেই এই বৃত্তের আবির্ভাব হয়, এবং ইহা গর্ভ সঞ্চারের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

গর্ভসঞ্চারের ফলে উদর-প্রাচীরের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। জরায়ু কিছু নীচের দিকে ঝুলিয়া

উদরবৃদ্ধি।

পড়াতে তলপেটের দিক্‌টা কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইয়া যায়। চতুর্থমাসের মাঝামাঝি হইতে সাড়ে আটমাস পর্য্যন্ত উদরের আকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পুরা নবম মাসে উদরের নিম্নাংশের উচ্চতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া অষ্টম মাসের প্রথমে ঐ অংশ যেরূপ আকারের ছিল ঠিক সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ জরায়ু ভ্রূণের বৃদ্ধি হেতু ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আটমাসের শেষাশেষি সময়ে প্রায় বুক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে ; পরে ধীরে ধীরে তলপেটের দিকে নামিতে থাকে। নাভি হইতে উহার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সুস্পষ্ট একটি পিঙ্গলবর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয় কুক্ষিদেশের বর্ণ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। উদর যত বড় হইয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া আসিতে থাকে, গর্ভবতীর নাভি মধ্যস্থ ক্ষত চিহ্নটি তত উচ্চ হইয়া উঠিতে থাকে। তার পর ছয় কি সাতমাসে নাভির

ঐ ক্ষত চিহ্ন চারি পার্শ্বের চর্ম্মের সমান সমান উচ্চ হয়। গর্ভের পরিণত অবস্থায় নাভিক্ষত আরও উচ্চ হইয়া উদরের উপর একটা বড়ীর মত স্ফীত হইয়া থাকে। উদর-প্রাচীরের সম্প্রসারণ হেতু সাধারণতঃ তলপেটের উপর দিয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ কতকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবান্তে এই দাগগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং চিহ্নিত স্থানগুলি ভিতরদিকে অল্প বসিয়া যায়।

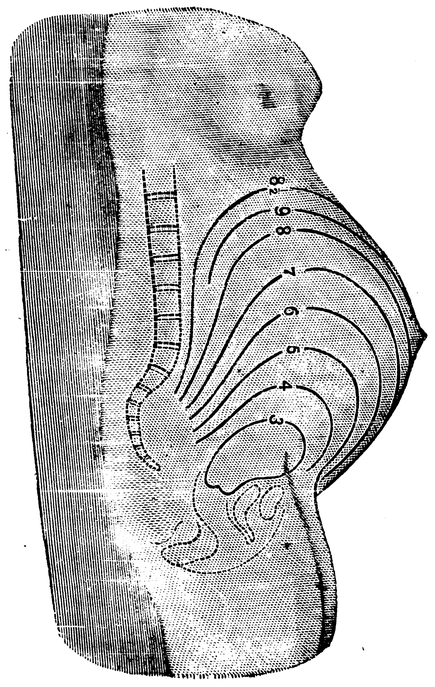

[গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি ও পরিসর—৩, ৪ ৫ অক্ষরের জরায়ুর সেই সেই মাসের পরিসর দেখান হইতেছে। ৮৷৹ হইতে ৯ মাসের মধ্যে জরায়ু কিছু নামিয়া আসে।]

চতুর্থ মাসের প্রথম হইতে আরের ন্যায় একটা পদার্থ তলপেটের অধোভাগ হইতে উঠিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহ বেশ বুঝিতে পারা যায়। চতু মাসের পর, ভ্রূণটিকে সাধারণতঃ

ভ্রূণের অঙ্গ চালনা।

অনুভব করিতে পারা যায়, আর গর্ভাবস্থার শে চারিমাস উদরের উপর হাত বুলাইয়া বাহি হইতেই ভ্রূণের প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুভ করিতে পারা যায়। গর্ভ সঞ্চারের পর অষ্টাদশ সপ্তাহে অর্থাৎ পঞ্চম মাসে গর্ভিণী সর্ব্বপ্রথম ভ্রূণের অঙ্গ সঞ্চাল বেশ স্পষ্ট অনুভব করে। ভ্রূণের এই অবস্থাকে জী সঞ্চারের অবস্থা বলে। গর্ভের পূর্ণাবস্থায়, উদরে উপরে হাত রাখিলে ভ্রূণের ঘন ঘন অঙ্গ সঞ্চাল অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। ঐ সময়ে অ হাত দিয়া ভ্রূণটিকে একটু সরাইয়া দিলে প্রায়শঃ ভ্রূণ নড়িয়া চড়িয়া সাড়া দিয়া থাকে।

চতুর্থ মাসের পর উদরের উপর কাণ রাখিয়া ষ্টেথিস্কোপ বা হৃৎ পরীক্ষায় ব্যবহৃত শব্দবহ যন্ত্র রাখি মনোযোগ দিয়া শুনিলে, ভ্রূণে

ভ্রূণের হৃদ্‌পিণ্ড।

হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ মাস হইতে গর্ভা স্থার শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ শব্দ শ্রবণগোচর হই থাকে। ভ্রূণের হৃদয় স্পন্দন শুনিতে পাইলে গ সঞ্চার সম্বন্ধে আর কোনই সংশয় থাকে না; কা ভ্রূণের হৃদয় স্পন্দন শব্দ গর্ভ-সঞ্চারের একটি বি এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য লক্ষণ।

গর্ভাবস্থায় অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন মূত্রস্রাব হই থাকে, বিশেষতঃ জরায়ু যখন তলপেটের নিম্নভা থাকে, সেই সময় অনেক

মূত্রস্থলী ও মলনালী।

প্রস্রাব হয়। চতুর্থ মাসে জরা উদ্ধগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই উ সর্গের উপশম হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় সাধারণ গর্ভিণীদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে। অন্ত্রসমূহে উপর চাপ পড়ে বলিয়াই যে কেবল এইরূপ ঘটে তা নহে, মলনালীর প্রাচীরের অবস্থান্তর ঘটে বলি প্রধানতঃ গর্ভিণীদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

ঘণ্টা বাঁধিবে কে ?

[শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ]

দেশের সর্ব্বত্র শুনিতে পাইতেছি—পল্লীসংগঠন কর, Back to land, back to villages. সকলেই বলিতেছেন জাতির প্রাণ পল্লীতে—The nation dwells in Cottages. পল্লীর স্বাস্থ্য নাই; শিক্ষাভাব প্রবল, কুসংস্কারের রাজত্ব সেখানে অতএব পল্লীকে সংস্কৃত কর। নানা দলে নানা কথা বলিতেছেন—কেহ বলিতেছেন ম্যালেরিয়া দূর কর সব দুঃখ যাইবে, কেহ বলিতেছেন অর্থাভাব দূর কর ম্যালেরিয়া যাইবে কারণ malaria is a euphemism for insufficient food ete. আবার কেহ কেহ বলিতেছেন ও সব কিছু না খদ্দর—খদ্দর সার "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" সমাজ সংস্কারক তার স্বরে বলিতেছেন কুসংস্কারই মূলীভূত কারণ—"আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর। তর্কেরে লইতে হবে করিয়া সন্ধান।" নানামুনির নানা মত—কিন্তু এটা ঠিক এর কোনটাই ভুল নয়—সমস্যাগুলি যোগ করিলে ঐরূপই দাঁড়ায় বটে। পল্লীসমাজের ধ্বংসের কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক আর্থিক এবং তার ফলেই স্বাস্থ্যাভাব, শিক্ষাভাব ও ধর্ম্মহীনতা। সমস্যাগুলি ত জানা গেল কিন্তু কর্ম্মী কোথায়? এই পুঞ্জীভূত দুঃখ ও দৈন্য ঠেলিয়া বীরের মত যে বলিবে—আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু।

সাহস বিস্তৃত বক্ষপট আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু সেই প্রাণবান্ সেবক কোথায়—কাজ করিবে কে? ঘণ্টা বাঁধিবে কে?—who is to bell the cat?

প্রথমতঃ দেখা যাক্ পল্লীর সংখ্যা কত? কি অভাব, সম্পদ কোথায়? বর্ত্তমানে কি ভাবে কাজ হইতেছে, উন্নতির উপায়ই বা কি?

আমি অদ্যাবধি যতগুলি এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি তাহার প্রায় সকলেই বলিতেছেন—বর্ত্তমান পল্লীসমাজ দূষিত, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন কর। এই দল বলেন পল্লীর যাহা কিছু সবই খারাপ; তাদের স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই, তাদের উচ্চ ভাব নাই। এই সমাজ বিদ্রোহীর দল বলেন "সংহার কর"—তারপর সংস্কার কর অর্থাৎ আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর উপায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ করিবে যে মনুষ্যের যতগুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড-প্রণেতা, রক্ষাকর্ত্তা, সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক এবং সমাজকে একেবারে তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। ভিতরকার যে ভাবধারা (traditions) আছে তাহাকে বাদ দিয়া সত্যলাভ সম্ভব নয়। প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বজায় রাখিতে হইবে। সমাজ মধ্যে বাস করিয়াই যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে ওলাদেবী ও শীতলা দেবীর কৃপা ছাড়া ও যে কলেরা বা বসন্ত প্রতিরোধ করা যায় তাহা গ্রামবাসীকে জানাইতে হইবে। অজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া অথবা কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া নাক শিটকাইলে তাহাদের প্রাণের সন্ধান পাইবেন না—হৃদয়ও জয় করা হইবে না। আমি অনেক কর্ম্মীকে দেখিয়াছি তাঁহারা গ্রামবাসীকে দয়ার চক্ষে দেখেন—কৃপা করিয়া তাহাদের জন্য বক্তৃতা বা কাজের ভান করিয়া তাহাদের কৃতার্থ করেন। এই প্রকার সেবা কখনও জনসাধারণ গ্রহণ করেন না। অশ্রদ্ধার দান নিরন্নও গ্রহণ করেন না। সমাজ সেবা ও পল্লী সেবার প্রথম কথা—শ্রদ্ধয়া দেয়ং, হ্রিয়া দেয়ম্, ভিয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্। সংগঠনকামীকে এই মন্ত্র মনে রাখিতে হইবে এবং সমাজে বাস করিয়াই তাহাদের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া যুক্তি তর্ক ও চরিত্রের মাহাত্মের দ্বারা পল্লীবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা—পল্লীর সম্বন্ধে কর্ম্মীকে প্রথমতঃ

জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে হইবে। রোগ নির্ণয় করা যেমন ডাক্তারের সর্ব্ব প্রথমেই প্রয়োজন হয় এবং পরে চিকিৎসার কথা উঠে পল্লী-সেবককেও প্রথমে পল্লীটার কথা বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে এবং সমগ্রভাবে দেশের কথাও তাহার জানা থাকা দরকার। এই কথাটীর নাম (Village Study) অথবা (Village Survey) আমি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর পল্লীতথ্য সংগ্রহ নামক তথ্য সংগ্রাহক পুস্তিকা ও শান্তি-নিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের (Village Survey) দিকে কর্ম্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে গ্রামটী কাজ করিতে হইবে সেখানকার লোক সংখ্যার গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস—তাহাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের ও গৃহ-শিল্পের ধ্বংশের বিশেষ কারণ—লোকের মাদক দ্রব্যাদির বহুল পরিমাণে ব্যবহার একটা স্পষ্ট ইতিহাস কর্ম্মীকে জানিতে হইবে।

একথা সত্য যে কুটীর-শিল্পের অথবা মৃত্যুহারের কারণগুলি সর্ব্বত্রই এক কিন্তু তবু কর্ম্মী সর্ব্বদাই বুঝিতে পারিবেন যে স্থানীয় কতকগুলি সমস্যা আছে। এই local সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তৃতীয় কথাটি হইতেছে কর্ম্মী কি খাইবেন, কে তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবে। নানা প্রকার সমিতিতে কার্য্যোপলক্ষে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে আমাদের পল্লীবাসীরা আত্ম শক্তিতে একেবারে বিশ্বাস হারাইয়া-ছেন—সর্ব্বত্র এককথাই শুনিতে পাইতেছি—ম'শায় আমার গ্রামটী বড় খারাপ, এখানকার লোকগুলি বড় স্বার্থপর আপনারা সহর হইতে টাকা ও লোক পাঠাইয়া গ্রামটীকে বাঁচান। এই কথাটীর মত ভুল কথা আমি বেশী শুনি নাই। আমার গ্রামকে আমি বড় করিতে না পারিলে বহিরাগত কোন সমিতি অথবা ব্যক্তির সাধ্যও নাই যে উহাকে ভাল অথবা বড় করিয়া দেয়। পল্লী-সমাজের ভিতরে যে শক্তি আছে উহাকে না জাগাইলে কাজ হইবে না। সবই ওখানে বিদ্যমান আছে—গ্রামবাসীদের মধ্যে একজনকে ভার লইয়া কাজে নামিতে হইবে। পরদানে পুষ্ট সমিতি যেমন গ্রামবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করে না, তাহারা কখনও ঐ সমিতির সুখ দুঃখের ভাগী হয় না। বহিরাগত সমিতি দান ও পরিচালনায় প্রথমটা গড়িয়া উঠিলেই গ্রামবাসীকে নিজের কাজ নিজে দেখিতে হইবে। ইংরাজের হাতে পড়িয়া রাষ্ট্র জগতে আমরা নাবালকত্বে (perpetual minor) গতী ছাড়াইতে পারি নাই, পল্লীসংগঠনেও চিরকাল outside agencyর দরকার নাই ; Every thing must should evolve from within কাজেই গ্রামবাসীর সহানুভূতি, উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই হিসাবে কর্ম্মী স্থানীয় হওয়াই দরকার তাহাতে কাজ করিবার সুবিধা হয়। এই তো গেল কর্ম্মীর স্থান নির্ব্বাচনের কথা। এখন দেখা দরকার কর্ম্মী কি ভাবে নিজের ব্যক্তিগত অভাব দূর করিবে আমাদের দেশে একদল তথাকথিত স্বদেশ হিতৈষী আছেন যাহারা বলেন ত্যাগ চাই—ত্যাগ চাই স্বদেশের জন্য যথা সর্ব্বস্ব পণ চাই। এই শ্রেণী লোকেরা বেশ জানেন যে ত্যাগের সীমা আছে মানুষ ন. খাইয়া বেশী দিন কাজ করিতে পারে না। এ কথা চিরকাল সত্য যে তাহাদের বিলাস সাধ অপূর্ণ রাখিতেই হইবে কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মী শাক-ভাতেরও প্রয়োজন নাই এ কথার অর্থ হয় না এখন কথা হইতেছে কর্ম্মীকে পালন করিবে কে এইটাই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। আমি বিশ্বাস অপরের দানে কেহ চিরদিন বাঁচতে পারে না যে রোগীর জীবনীশক্তিই নাই—Vitality অতি low—সে কি কেবল injectionএর জোরে বাঁচিতে পারে। কর্ম্মীর অভাব আছে সত্য কিন্তু সে অভাব তাহাকে নিজেই দূর করিতে হইবে। আইরিশ কবি নায়ক (George Russel) বলিয়াছেন—গ্রামে সব আছে—লুপ্ত সেই অর্থ সম্পদ উদ্ধার করিতে হইবে গ্রামেই দেহের ও মনের ক্ষুধা তৃপ্ত করিবার অবস্থা দিন না হইবে ততদিন কর্ম্মী ও কর্ম্মের স্থায়িত্বের কম। Uuless the countryside can affi to young men some food for soul as as for body they will always go to already over-crowded towns.

স্বাস্থ্য-সমস্যা

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ, এইচ, এম-বি]

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক—সর্ব্ববিধ জাতীয় উন্নতির মূল জাতীয় স্বাস্থ্য। "The wealth of a nation is truly the health of the people"—স্বাস্থ্যই জাতির প্রকৃত সম্পৎ—রাস্কিনের (Ruskin) এই সারগর্ভ কথা যে কিরূপ মূল্যবান্, স্বাস্থ্যহীন দরিদ্র আমরা জাতীয় জীবন-মরণের ভীষণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আজ তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছি। শত বৎসর পূর্ব্বেও আমরা এরূপ স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু ছিলাম না, কিন্তু এই অত্যল্পকাল মধ্যে আমাদের একটা শারীরিক অবনতি কি করিয়া সংঘটিত হইল, কি করিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এত দরিদ্র, দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন এবং এত অধিক রোগপ্রবণ ও অল্পায়ু হইয়া দ্রুত ধ্বংসের পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম, ইহা একটা সমস্যার বিষয় বটে।

বেড়া-আগুনে ঘেরা নিরুপায় অন্ধ মুক্তির সন্ধানে চীৎকার করিয়া চারিদিকে যেমন বৃথা ছুটাছুটি করে, অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইয়া মগ্নপ্রায় ব্যক্তি শ্রান্ত অবসন্ন দেহে সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পায়, মুক্তির শেষ উপায় মনে করিয়া তাহাকেই যেমন সে সবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়, আমরাও তেমনি আসন্ন-মৃত্যুর কবলমুষ্টি হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত দিশাহারা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মতে পরিচালিত ও ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছি। জাতীয় দুর্ব্বলতার জন্য বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর জন্য মক্ষিকাদি জীববিশেষ, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য হৃতসর্ব্বস্ব পল্লীগ্রাম এবং দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষা ও শাসন-নীতিকেই প্রধানতঃ দোষী সাব্যস্ত করিয়া শিক্ষা-সংস্কার, পল্লী-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শাসন-সংস্কার—এক কথায় স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-সংস্কারের জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ফলে, আসল কাজ কিছু হোক্ না হোক্, বাদ প্রতিবাদ ও সমালোচনায় নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে কেহই ত্রুটী করিতেছি না। জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য শিক্ষা, সমাজ ও শাসন-পদ্ধতির আংশিক পরিবর্ত্তন যে একবারেই অনাবশ্যক, এ কথা আমরা বলি না, কিন্তু ইহা ছাড়াও আমাদের জাতীয় অবনতির মূলে আরও একটা বৃহত্তর কারণ অবশ্যই রহিয়াছে, যাহার সন্ধান হয় ত আমরা পাই নাই, অথবা, পাইয়া থাকিলেও, তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া অপ্রধান বিষয়গুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি। নৌকার তলা ফাটিয়া উঠিতেছে, হাল খসিয়া পড়িতেছে,—অথচ তাহার দাঁড়, মাস্তুল, পাল ও দড়াদড়ির সংস্কারেই আমরা অত্যধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি!

আমাদের জাতীয় জীবন-মৃত্যু-সমস্যার মূলে প্রধানতঃ তিনটি কারণই সুস্পষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়,—অর্থাভাব, অন্নাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব। এই তিনটি কারণ পরস্পর এরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত যে, একটিকে অপর দুইটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া বাহির করা নিতান্তই অসম্ভব। সুতরাং অর্থাভাব ও অন্নাভাবের প্রকৃত কারণ ও তাহা দূরীকরণের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে না। অর্থাভাবের প্রধান কারণ foreign exploitation—এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা অনাবশ্যক, আর অন্নাভাবের মূল কারণ যে খাদ্য-শস্যাদির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, তাহাও বলা বাহুল্য। এক্ষণে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জাতীয় স্বাস্থ্যাভাবের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ ব্যাধি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে আমাদের স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ বোধ হয় কতকটা সুস্পষ্ট হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি

যাবতীয় উৎকট ব্যাধি আমাদিগকে আজকাল যেন একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে উপরি-উক্ত প্রত্যেক ব্যাধিরই একটি করিয়া বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সেই ব্যাধির germ বা বীজ বলে এবং ইহাকেই রোগের প্রত্যক্ষ বা মূল কারণ বলিয়া ধরা হয়। এই বীজ কোনরূপে মানব-দেহে প্রবিষ্ট হইলেই ম্যালেরিয়া ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কথা এই যে, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মাদি রোগের বীজ স্মরণাতীত কাল হইতেই ত আমাদের দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে হঠাৎ এই ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে ইহাদের প্রকোপ এতটা বৃদ্ধি হইবার কারণ কি?

প্রথমে ম্যালেরিয়ার কথাই ধরা যাক্।—এনোফিলিস্ (Anopheles) মশকের প্রিয় আবাস বন-জঙ্গল ও খানা-ডোবা আমাদের দেশে পূর্ব্বেও ত প্রচুর পরিমাণেই ছিল; অথচ ম্যালেরিয়ার বীজ ধ্বংস করিবার জন্য কুইনিন্, ইন্‌জেক্‌শন প্রভৃতি নানাবিধ অধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায় তখনও উদ্ভাবিত হয় নাই,—তথাপি আজকাল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কেন? এ অবস্থায় এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ইহার মূলে অবশ্যই আর কোন প্রবল ও পরোক্ষ কারণ আসিয়া জুটিয়াছে, যাহা দ্বারা রোগের এই প্রত্যক্ষ কারণ আমাদের দেহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে। আমরা সেই পরোক্ষ কারণের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া শুধু প্রত্যক্ষ কারণটিকেই এই রোগের একমাত্র কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহারই প্রতিকারে জাতীয় শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করিতেছি; এমন কি, অজস্র অর্থব্যয়ে সুদূর সাগরপার হইতে বিশেষজ্ঞের আমদানী করিয়া 'কমিশন' বসাইতেও ত্রুটী করিতেছি না। ফলে কিন্তু রোগের প্রাদুর্ভাব ও তজ্জনিত অকালমৃত্যুর সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে না। ইহাতে বুঝা যায়, কোথায় কোন প্যাঁচ (screw) শিথিল হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। বহু প্রাচীন-কাল হইতেই আমাদের দেশে ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও রোগের আক্রমণ আমরা কিছুমাত্র কমাইতে পারিতেছি না,—বরং ইহার প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্ত্তমাণ বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ব্বে যক্ষ্মাদি রোগসম্বন্ধে আমরা বোধ হয় এতটা সাবধানতা অবলম্বন করিতে চেষ্টাও করিতাম না, তবুও কিন্তু তখন এই রোগের এতটা রাড়াবাড়ি ছিল না। ইহার মূলেও সেই পরোক্ষ কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এই পরোক্ষ কারণ অন্য কোন দেশে এরূপ বিস্তৃত লাভ বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়োজন করিয়া লইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র কেবল প্রত্যক্ষ কারণের ধ্বংস-সাধনের প্রণালী-টাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, আর তাহাতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া আমরাও রোগের প্রত্যক্ষ কারণ-টাকেই লোকচক্ষুর সমক্ষে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া ধরিতেছি,—যেন ইহার মূলোচ্ছেদই আমাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের একমাত্র উপায়! এইখানেই কি আমাদের মূলে ভুল।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ইহার মূলই বা কি এ আমাদের ভুলই বা কোথায়?

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সোমারসেট্ (Somerset) শায়ারস্থিত Mendip Hills Sanatorium নাম স্বাস্থ্যাবাসের অন্যতম চিকিৎসক যক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা পারদর্শী সুবিজ্ঞ ডাক্তার মুথু (Dr. D. C. Muthu M. D.) অধুনা আমাদের দেশে আসিয়া এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন,—

"There were two schools of physicians who looked at the disease from two different angles. The one regards tuberculosis as an infectious disease while the other believes it to be the product of social and economic conditions of moderm civilization."

(A. B. Patrika Jan. 2, 1925)

এক সম্প্রদায়ের চিকিৎসক germ বা প্রত্যক্ষ কারণকেই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মতে পরোক্ষ কারণই রোগের প্রকৃত মূল। এস্থলে জানা আবশ্যক, রোগের প্রত্যক্ষ কারণ সাধারণতঃ বহির্জ্জগৎ হইতে আসিয়া মানবদেহে প্রবেশ লাভ করে, আর পরোক্ষ কারণ দেহ-মধ্যেই উৎপাদিত হয় বা বর্ত্তমান থাকে। এই রোগের নিদান সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

"The old and the contagious school fortified by pathology and bacteriology maintains that tuberculosis is a disease caused by the implantation of tubercle bacillus. The new school moving with the spirit of the times and with the advance of such sciences as biology, higher physiology, psychology, sociology and economics, affirms that man's environment and his social condition constitute the chief factor in the causation of tuberculosis. *The germ theory of the disease had not satisfactorily explained all the different aspects of the disease. They had made too much of microbes and too little of man* in the past in the treatment of tuberculosis, *the causatian of which lay more in the body than outside.*"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৩ সনের ভাদ্র সংখ্যার "ভারতবর্ষে" "পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে এই germ-theory সম্বন্ধে আমরা একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলাম মাত্র; কিন্তু বাস্তবিক আজ দেখিতেছি, এই

germ বা বীজ রোগের প্রত্যক্ষ বা উত্তেজক (exciting) কারণ হইলেও নব্য চিকিৎসকসম্প্রদায় মূলে পরোক্ষ (predisposing) কারণকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রোগবীজ দেহে প্রবিষ্ট হইলেও এই পরোক্ষ কারণের সহায়তা ব্যতীত উহা সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তাই তাঁহাদের চিকিৎসা-প্রণালীও আজ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইতেছে। রোগের এই পরোক্ষ কারণ কি, তাহাও ডাক্তার মুথু স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—

"There was no valid proof that the wide spread prevalence of the disease was due to its infectious nature. Tuberculosis was a disease of civilization, of vicious, social and economic environment and of *poor and deranged nutrition.* Tuberculosis was not a definite entity, but it was *a deficiency disease affecting the body metabolism, the condition of the blood and the vitality of the system.*"

মানবদেহে জীবনী-শক্তির স্বল্পতাই রোগজননের প্রধান ও সহায়ক কারণ। শুধু বীজ ছড়াইলেই গাছ জন্মে না, উহা অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত জমিও আবশ্যক। বীজ পরিপোষণ করিবার শক্তি যে জমিতে যত বেশী থাকে, সেই জমিতে সেই বীজের অঙ্কুরও তত অধিক পরিমাণে সতেজ হইয়া উঠে; আর তাহার অন্যথায়, অর্থাৎ জমি যদি সেই বীজ পোষণের উপযুক্ত অবস্থায় না থাকে, তবে তাহাতে শত বীজ ছড়াইয়া দিলেও অতি অল্পসংখ্যক বীজ মাত্র কোনরূপে অঙ্কুরিত ও কদাচিৎ বর্দ্ধিত হইতে পারে। শুধু যক্ষ্মা বলিয়া নহে, প্রায় সর্ব্ববিধ রোগের বীজ সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রযুজ্য। আমরা ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে হঠাৎ এত হীনবীর্য্য ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন প্রকার রোগের বীজ দেহে প্রবেশ লাভ করা মাত্র তাহা অতি সহজে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া অচিরেই আমাদের বিনাশ

সাধন করিতে সক্ষম হয়। জীবনীশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তিও (power of resistance) আমাদের ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। জগতের অন্য কোন জাতিরই ত এরূপ দুরবস্থা ঘটে নাই! লুপ্তপ্রায় জীবনীশক্তিকে পুনরায় সতেজ করিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু রোগবীজ ধ্বংস করিবার জন্য "কামান পাতিলে" জাতীয় শক্তি ও অর্থের অপব্যয় ছাড়া অন্য কোন লাভ হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। সুবিখ্যাত ডাক্তার মুখুও যক্ষ্মারোগের প্রকৃত চিকিৎসা সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—

"The old school would aim at curing the disease by destroying infection by segregation, isolation and *injection*, whereas the modern school would concentrate all its efforts in *strengthening the constitution and increasing the vital powers of the patient.* The only effective way of arresting and eradicating the disease lay in bringing about a radical improvement in social, economic and industrial welfare of the people. *No remedy that did not aim at changing the living conditions of the people could ever hope to prevent or cure the disease.*"

ডাক্তার মুথুর এই শেষ বাক্যটী ঘরে ঘরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগের রীতিনীতি আচার ব্যবহার, ও দৈনিক কার্য্যপ্রণালীর যে সকল পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও যে স্বাস্থ্যহানির আংশিক কারণ নহে, তাহা কে বলিতে পারে! দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে দেহ-যন্ত্র স্বভাবতঃই যখন উত্তপ্ত ও নিস্তেজ হইয়া বিশ্রামের শীতল ক্রোড়ে এলাইয়া পড়িতে চায়, তখন ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় ছুটাছুটি করা গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসিগণের স্বাস্থ্যের কতটা উপযোগী, তাহা বিবেচনার বিষয় বটে। সে যাহা হোক্, ষাট্ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের জীবনীশক্তি এতটা অভাব ছিল না বলিয়াই ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মাদি রোগের বীজ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের আক্রমণ ও তজ্জনিত মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইতে পারে নাই। অতএব এক্ষণে এই কয়েক বৎসর মধ্যেই আমাদের জীবনী-শক্তি সহসা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার মূল কারণ কি, তাহা নিরূপণ করিতে পারিলেই আমাদের স্বাস্থ্য-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। রায় বাহাদুর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় তৎপ্রণীত "খাদ্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"খাদ্যের পরিমাণ অধিক হইলে যেমন অজীর্ণ উদরাময় প্রভৃতি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ **যথোচিত খাদ্যের অভাবেও** দেহ সত্বর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং নানাবিধ রোগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। **যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাব যে মনুষ্যের অকালমৃত্যুর এক প্রধান কারণ,** যে কোন দেশের নিতান্ত দরিদ্র লোকের মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহারা দুই সন্ধ্যা দূরে থাকুক, এক বেলাও পেট পূরিয়া খাইতে পায় না। **এই আজীবনব্যাপী স্বল্পাহারের ফলে** তাহাদের শরীর স্বতঃ এত দুর্ব্বল হইয়া থাকে যে, কোন একটি সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহারাই প্রথমতঃ ও সহজে আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্য বহুসংখ্যক লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়।"

বাস্তবিক এইখানেই আমাদের স্বাস্থ্যহানির জাতীয় ধ্বংসের মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবেই আমাদের জীবনী শক্তি ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশে রোগ ও অকালমৃত্যুর এত আধিক্য দেখা যাইতেছে। ইহার উপর

স্বাস্থ্যহানির মূলে আবার একটা মানসিক কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!" অন্নচিন্তা ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও আমাদের সাথের সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহের উপর মনের ক্রিয়া নিতান্ত সামান্য নহে। অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ফলে অসামান্যসুন্দরী ফ্রান্সের রাণী যুবতী মেরী এণ্টয়নেট্ (Marie Antonette) সপ্তাহকাল মধ্যে পক্ককেশা বৃদ্ধায় পরিণত হইয়াছিলেন। এই প্রকার মানসিক কারণে সুস্থ ব্যক্তিও ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন সুতরাং রোগপ্রবণ ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আমাদের এই মানসিক অসুস্থতার মূলেও অর্থাভাব, অন্নাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব—এই ত্র্যহস্পর্শের শুভযোগ ঘটিয়াছে। যিনি যতই অভিনব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপ্রণালী উদ্ভাবন করুন না কেন, এবং ডাক্তার ও ধাত্রীর সংখ্যা দেশে যতই বাড়ুক না কেন, এই মূল কারণের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয় ধ্বংসের পথ ক্রমশঃ প্রশস্ততরই হইতে থাকিবে।

আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল ও দুধ। ইহাদের দুর্ম্মূল্যতাই আমাদিগকে ক্রমশঃ অল্পাহারে অভ্যস্ত করিতেছে। অল্পাহার বলিতে শুধু পরিমাণের অল্পতা নহে, পুষ্টিকর উপাদানের স্বল্পতাও বুঝিতে হইবে। এই অভ্যাসগত অল্পাহারই (chronic starvation) আমাদিগের রোগপ্রবণতা ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও রুগ্না মাতার স্তনে যথেষ্ট পুষ্টিকর দুগ্ধের অভাববশতঃ স্তন্যপায়ী শিশু শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যথারীতি বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে গাভী-দুগ্ধও মহার্ঘ্য বলিয়া শিশুর পক্ষে যতবার যে পরিমাণ দুগ্ধের আবশ্যক, প্রথম হইতেই সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে। অবশেষে অল্পাহারই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়।

চাউল সম্বন্ধেও ঠিক এই অবস্থা। ভাত খাইতে আরম্ভ করিবার সময় হইতেই বালক-বালিকাগণ ক্রমশঃ অল্পাহারে অভ্যস্ত হইতে থাকে। এ কথা শুধু দরিদ্র পরিবারের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে, আমাদের দেশে খুব বড় লোক ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এইরূপ অল্পাহারের পরিমাণ আরও বেশী। কেন না, যিনি যত "বড় চাকুরে"ই হোন্, তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই কতকটা সখ করিয়া (বস্ত্র, বিলাস-সামগ্রী ও অনাবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে), কতকটা বা বাধ্য হইয়া (ডাক্তারী ঔষধ, লণ্ঠন, দেশলাই ইত্যাদির জন্য) তাঁহাকে বিদেশী বণিকের ধন-ভাণ্ডারে ঢালিয়া দিতে হয়। আর বাকি অল্পাংশ হইতে পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যয় (নিতান্ত কম নয়!) বাদে অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে, তাহা দ্বারাই খাদ্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিয়া কোনরূপে পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হয়। সাজ-পোষাকই হইয়াছে আজকাল সভ্যতার মাপকাঠি, সুতরাং পেটে যথেষ্ট অন্ন থাকুক না থাকুক, "ভদ্রলোক" না সাজিলে বাড়ীর বাহির হইবার উপায় নাই। এই সভ্যতার "চাল" বজায় রাখিতে গিয়া ভাতের হাঁড়িতে চালের পরিমাণ কিন্তু ক্রমশঃ কমাইতে বাধ্য হইতেছি। আবার মামুলী ঢেঁকির আসনে বিলাতী কল বসাইয়া চাউলের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান (vitamine) প্রায় সবটাই তুষের সঙ্গে ছাঁটিয়া ফেলিতেছি। প্রাচীনদিগের ন্যায় দু'দশ জন নিঃসহায় দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতিপালন ত দূরের কথা, নিজ পরিবারের ভরণপোষণই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতে যে বয়সে যতবার ও যে পরিমাণ আহার্য্য দেওয়া আবশ্যক, হাজারে কত জন ভদ্রলোক তাহা দিতে পারেন, বা দিয়া থাকেন? বাল্যকাল হইতে এইরূপ অল্পাহারে অভ্যস্ত হওয়ায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে ক্ষুধামান্দ্য জন্মে। তখন স্বতঃই মনে হয়, "কেন, আমরা ত দু'বেলা বেশ পেট ভরিয়াই আহার করিতেছি; বরং বেশী কিছু খাইতে গেলেই "অম্বলের" দোষ জন্মিতে পারে।" ইহার কারণ এই যে খাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি আমরা প্রকৃতিকে যেমন বঞ্চনা করিয়া আসিতেছিলাম, এখন সময় বুঝিয়া প্রকৃতিও তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন (refuses to

act)। ইহার উপর আবার সভ্যতার নূতন সরঞ্জাম "চা"য়ের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় "সোণায় সোহাগা"র সংযোগ ঘটিয়াছে। খাদ্য হিসাবে ইহার উপযোগিতা কিছু থাক্ না থাক্, ইহা দ্বারা স্বাভাবিক ক্ষুদ্‌বৃত্তিটাকে সময়ে অসময়ে "ভোগা" দিয়া বেশ ভুলাইয়া রাখা চলে।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যে আমরা ক্রমশঃ এরূপ অন্তঃসারশূন্য ও রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছি সে কথাটা বুঝিয়াও না বুঝিয়া, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণুগুলিই যে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, জনসাধারণকে তাহাই দেখাইবার ও বুঝাইবার জন্য "ম্যাজিক লণ্ঠন" লইয়া "দেশের কাজে" সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এবং সেই বীজাণুর ধ্বংস সাধন করিতে কোন্ প্রদেশে কত কোটি টাকার আবশ্যক, তাহারই হিসাব করিতে বসিয়া গিয়াছি! মূলে প্রকাণ্ড একটা ভুল রাখিয়া বাহিরে বেবি (baby)-সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছি! আমাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর আত্মবঞ্চনা যে কি হইতে পারে, জানি না। শতবর্ষ পূর্ব্বেও দেশে এত খাদ্যাভাব ছিল না বলিয়াই তখনকার লোকের স্বাস্থ্য উন্নত ছিল, দেহ সবল ছিল, মন সতেজ ছিল, সুতরাং আয়ুকালও কিছু বেশী ছিল। প্রৌঢ়ত্বের অবসানেও অনেকের নাকের উপর চশমা বসিত না, স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য দাঁত বাঁধান ত দূরের কথা, অনেকেই সে বয়সে ছোলাভাজাও চিবাইয়া খাইতেন এবং তাহা অনায়াসে হজমও করিতেন।

শরীর পুষ্টির জন্য আহার্য্যের মধ্যে গব্য দ্রব্য আমাদের প্রত্যেকের কতখানি আবশ্যক এবং অর্থাভাব ও দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ আমরা বাস্তবিক উহা কি পরিমাণে পাইয়া থাকি, তাহা সকলেই জানেন। ইদানীং এই দুগ্ধ-সমস্যার সমাধানে লোকের ঐকান্তিক আগ্রহ দেশের পক্ষে আশাপ্রদ বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাউলের দুর্ম্মূল্যতা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না; অথচ, চাউলের মূল্যের অনুপাতেই কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা ও স্বল্পায়ুতার সহিত অন্ন সমস্যার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন দেখিতে হইবে, চাউলের মূল্য দিন দিন এত বাড়িয়া চলিয়াছে কেন এবং তাহার প্রতিকারেরই বা উপায় কি। চাল-ডাল-ভোজী লোকের সংখ্যা দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, চাউলের মূল্য কিন্তু সে অনুপাতে খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ দেশে আবাদের উপযুক্ত জমি পরিমাণও ত কম বাড়ে নাই! সুতরাং এ হিসাবে চাউলের দর ক্রমশঃ এতটা বৃদ্ধি হওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। তবে এরূপ হইতেছে কেন? অবাধ-বাণিজ্য ও অর্থনীতির দোহাই দিয়া আমরা এ দেশ হইতে প্রতি বৎসর যে প্রায় দশ কোটী টাকার (অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটী মণ) চাউল ও কুড়ি কোটী টাকার গম সমুদ্র পথে রপ্তানি দিতেছি ইহাকেই কি এ দুর্ম্মূল্যতার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয় না? দেশে খাদ্য শস্যের পরিমাণ (supply) প্রয়োজনের (demand) অতিরিক্ত মজুত থাকে না বলিয়াই বেশী ফসল জন্মিলেও তাহার মূল্য কমিতে পারে না; বরং কোন কারণে কোথাও ফসল একবার নষ্ট হইয়া গেলে, দাম আরও চড়িয়াই যায়। আমাদের দেশে হয় এক বৎসরের জন্যও যদি ইহার অর্দ্ধেক রপ্তানি বন্ধ রাখা যায়, তবে পর বৎসরই চাউলের মূল্য অর্দ্ধেক নামিয়া যাইতে পারে! কিন্তু তাহা যে হইবে না, অনেকেই হয় ত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"যে ইহাতে দেশের লাভ ছাড়া লোকসান ত কিছুই হইবে না, পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্য এইরূপে দেশে অর্থাগম হইতেছে বলিয়াই ত আজ আমরা দশ টাকা মণের চাউল খাইয়াও স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া রহিয়াছি, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' মত না খাইয়াই দেশের আনা লোক কোন্ দিন মরিয়া যাইত।" পাট, তুলা ইত্যাদি অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে এ যুক্তি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য হইলেও বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য আয়ুর আধার, প্রাণস্বরূপ অন্ন সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম সব সময়ই খাটিতে পারে? স্থান, কাল ও পাত্রভেদে জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানেরও সাধারণ নিয়মের কিছু-না-কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াই থাকে, আর অর্থশাস্ত্রের এই কূট নীতি কি এতই অপরিবর্ত্তনীয়? আগে চাউলের দর কমাইয়া লও, পরে উহার দর যাহাতে আর বাড়িতে না পারে, সেই পরিমাণ চাউল দেশে মজুত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ স্বচ্ছন্দে বিদেশে ছাড়িয়া দাও, কোনই আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এখন যে ভাবে খাদ্যশস্যের রপ্তানি চলিতেছে, অর্থনীতিদ্‌গণ যাহাই বলুন, আমাদের ত মনে হয়, ইহা দ্বারা আমরা দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু তাহা আমাদের বল, বীর্য্য স্বাস্থ্য, আয়ু—এক কথায়, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিনিময় করিয়া! আর সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোক মরিয়াছিল—তখন দূর দেশ হইতে এত সহজে ও অল্প সময়ে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার সুবিধা ছিল না বলিয়া,—শুধু চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়ার জন্য নয়।

কেহ কেহ মনে করেন, পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্যের আবাদ করিলে, অথবা "চাকরী"-সমস্যার একটা সমাধান করিতে পারিলে, কিংবা জন্মসংখ্যা নিয়মিত (birth control) করিবার নূতন হুজুগে যোগদান করিলেই আমাদের বর্ত্তমান অন্নকষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে! কিন্তু আমাদের বোধ হয়, যে পথই আমরা অবলম্বন করি না কেন, লক্ষ লক্ষ মণ শস্য অধিক উৎপাদিত হইলেও, অথবা "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া"-নীতির অনুসরণ করিয়া দেশের জন সংখ্যা কমাইয়া দিলেও আমাদের খাদ্য শস্যের উপর বৈদেশিকগণের অবাধ-বাণিজ্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিতে তাহার মূল্য বেশী হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই,—কারণ, দূর ভবিষ্যতেও বিদেশী ক্রেতাগণের অর্থের কখনও অপ্রতুল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শিশু-মৃত্যুসংখ্যাও ক্রমশঃ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ "ধুয়া" ধরিয়াছেন,—"দেশী দাইগুলিই যত অনিষ্টের মূল; হয় তাহাদিগকে আন্দামানে পাঠাইয়া দাও, নয় ত আমাদের শিক্ষা মত ইহাদিগকে "সংস্কৃত" (reform) করিয়া অবিলম্বে আঁতুড় ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর—নতুবা এ শিশুমৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবার নয়।" কিন্তু ইহারও মূলে যে সেই প্রকাণ্ড ভুলটা রহিয়া গিয়াছে, পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। ডাক্তার আনি বেসাণ্ট (Dr. Annie Besant) গত জানুয়ারী মাসে দিল্লী নগরীতে All Parties Conference এ সম্মিলিত দেশীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Did they know that average life in India was 23.5 years? Did they realise that epidemics took almost double the toll of life compared with western countries, *because the Indian children were born of starving mothers and were generated by starving fathers?*"

(A. B. Patrika, Jan, 27, 1925)

Chronic starvation বা জন্মাবধি উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই যে আমাদের শিশু-মৃত্যু ও জাতীয় ধ্বংসের মূল কারণ, এই মহীয়সী মহিলার পূর্ব্বে কোন দেশীয় বা বিদেশীয় চিকিৎসক বা অন্য কেহই এই খাঁটি কথা এত বড় গলায় ও এমন স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুরক্ষার উপায় ও নিয়মগুলি সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার ও দেখাইবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন বা শিক্ষিতা ধাত্রীর আবশ্যকতা যে একেবারেই নাই, এ কথা আমরাও স্বীকার করি না; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মূল কারণের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়া এবং তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ না হইয়া শুধু শিশু-মঙ্গল, মাতৃমঙ্গল ও ধাত্রীমঙ্গলের অভিনয়ে অর্থব্যয় করা "ঘোড়ার সম্মুখ ভাগে গাড়ী যোতা"র মতই নিরর্থক

act)। ইহার ,উপর আবার সভ্যতার নূতন সরঞ্জাম “চা”য়ের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় “সোণায় সোহাগা”র সংযোগ ঘটিয়াছে। খাদ্য হিসাবে ইহার উপযোগিতা কিছু থাক্ না থাক্, ইহা দ্বারা স্বাভাবিক ক্ষুদ্‌বৃত্তিটাকে সময়ে অসময়ে “ভোগ” দিয়া বেশ ভুলাইয়া রাখা চলে।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যে আমরা ক্রমশঃ এরূপ অন্তঃসারশূন্য ও রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছি সে কথাটা বুঝিয়াও না বুঝিয়া, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণুগুলিই যে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, জনসাধারণকে তাহাই দেখাইবার ও বুঝাইবার জন্য “ম্যাজিক লণ্ঠন” লইয়া “দেশের কাজে” সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এবং সেই বীজাণুর ধ্বংস সাধন করিতে কোন্ প্রদেশে কত কোটি টাকার আবশ্যক, তাহারই হিসাব করিতে বসিয়া গিয়াছি! মূলে প্রকাণ্ড একটা ভুল রাখিয়া বাহিরে বেবি (baby)-সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছি! আমাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর আত্মবঞ্চনা যে কি হইতে পারে, জানি না। শতবর্ষ পূর্ব্বেও দেশে এত খাদ্যাভাব ছিল না বলিয়াই তখনকার লোকের স্বাস্থ্য উন্নত ছিল, দেহ সবল ছিল, মন সতেজ ছিল, সুতরাং আয়ুকালও কিছু বেশী ছিল। প্রৌঢ়ত্বের অবসানেও অনেকের নাকের উপর চশমা বসিত না, স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য দাঁত বাঁধান ত দূরের কথা, অনেকেই সে বয়সে ছোলাভাজাও চিবাইয়া খাইতেন এবং তাহা অনায়াসে হজমও করিতেন।

শরীর পুষ্টির জন্য আহার্য্যের মধ্যে গব্য দ্রব্য আমাদের প্রত্যেকের কতখানি আবশ্যক এবং অর্থাভাব ও দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ আমরা বাস্তবিক উহা কি পরিমাণে পাইয়া থাকি, তাহা সকলেই জানেন। ইদানীং এই দুগ্ধ-সমস্যার সমাধানে লোকের ঐকান্তিক আগ্রহ দেশের পক্ষে আশাপ্রদ বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাউলের দুর্ম্মূল্যতা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না; অথচ, চাউলের মূল্যের অনুপাতেই কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা ও স্বল্পায়ুতার সহিত অন্ন সমস্যার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন দেখিতে হইবে, চাউলের মূল্য দিন দিন এত বাড়িয়া চলিয়াছে কেন এবং তাহার প্রতিকারেরই বা উপায় কি। চাল-ডাল-ভোগী লোকের সংখ্যা দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, চাউলের মূল্য কিন্তু সে অনুপাতে খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ দেশে আবাদের উপযুক্ত জমির পরিমাণও ত কম বাড়ে নাই! সুতরাং এ হিসাবে চাউলের দর ক্রমশঃ এতটা বৃদ্ধি হওয়ার কোনই কার থাকিতে পারে না। তবে এরূপ হইতেছে কেন অবাধ-বাণিজ্য ও অর্থনীতির দোহাই দিয়া আমরা এ দে হইতে প্রতি বৎসর যে প্রায় দশ কোটী টাকার (অর্থা প্রায় দেড় কোটী মণ) চাউল ও কুড়ি কোটী টাকা গম সমুদ্র পথে রপ্তানি দিতেছি ইহাকেই কি এ দুর্ম্মূল্যতার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয় না দেশে খাদ্য শস্যের পরিমাণ (supply) প্রয়োজনে (demand) অতিরিক্ত মজুত থাকে না বলিয়াই বেশী ফসল জন্মিলেও তাহার মূল্য কমিতে পারে না বরং কোন কারণে কোথাও ফসল একবার নষ্ট হই গেলে, দাম আরও চড়িয়াই যায়। আমাদের দে হয় এক বৎসরের জন্যও যদি ইহার অর্দ্ধেক রপ্তা বন্ধ রাখা যায়, তবে পর বৎসরই চাউলের মূল্য প্র অর্দ্ধেক নামিয়া যাইতে পারে! কিন্তু তাহা যে হই নয়! পাশ্চাত্য অর্থনীতি-শাস্ত্রের বোল আওড়াই অনেকেই হয় ত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—“দে ইহাতে দেশের লাভ ছাড়া লোকসান ত কিছুই হই পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্য এইরূপে দেশে প্র অর্থাগম হইতেছে বলিয়াই ত আজ আমরা দশ টা মণের চাউল খাইয়াও স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া রহিয়াছি, নচেৎ ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের’ মত না খাইয়াই দেশের বার আনা লোক কোন্ দিন মরিয়া যাইত।” পাট,

তূলা ইত্যাদি অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে এ যুক্তি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য হইলেও বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য আয়ুর আধার, প্রাণস্বরূপ অন্ন সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম সব সময়ই খাটিতে পারে? স্থান, কাল ও পাত্রভেদে জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানেরও সাধারণ নিয়মের কিছু-না-কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াই থাকে, আর অর্থশাস্ত্রের এই কূট নীতি কি এতই অপরিবর্ত্তনীয়? আগে চাউলের দর কমাইয়া লও, পরে উহার দর যাহাতে আর বাড়িতে না পারে, সেই পরিমাণ চাউল দেশে মজুত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ স্বচ্ছন্দে বিদেশে ছাড়িয়া দাও, কোনই আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এখন যে ভাবে খাদ্যশস্যের রপ্তানি চলিতেছে, অর্থনীতিবিদ্‌গণ যাহাই বলুন, আমাদের ত মনে হয়, ইহা দ্বারা আমরা দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু তাহা আমাদের বল, বীর্য্য স্বাস্থ্য, আয়ু—এক কথায়, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিনিময় করিয়া! আর সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোক মরিয়াছিল—তখন দূর দেশ হইতে এত সহজে ও অল্প সময়ে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার সুবিধা ছিল না বলিয়া,—শুধু চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়ার জন্য নয়।

কেহ কেহ মনে করেন, পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্যের আবাদ করিলে, অথবা “চাকরী”-সমস্যার একটা সমাধান করিতে পারিলে, কিংবা জন্মসংখ্যা নিয়মিত (birth control) করিবার নূতন হুজুগে যোগদান করিলেই আমাদের বর্ত্তমান অন্নকষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে! কিন্তু আমাদের বোধ হয়, যে পথই আমরা অবলম্বন করি না কেন, লক্ষ লক্ষ মণ শস্য অধিক উৎপাদিত হইলেও, অথবা “চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া”-নীতির অনুসরণ করিয়া দেশের জন সংখ্যা কমাইয়া দিলেও আমাদের খাদ্য শস্যের উপর বৈদেশিকগণের অবাধ-বাণিজ্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিতে তাহার মূল্য বেশী হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই,—কারণ, দূর ভবিষ্যতেও বিদেশী ক্রেতাগণের অর্থের কখনও অপ্রতুল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শিশু-মৃত্যুসংখ্যাও ক্রমশঃ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ “ধূয়া” ধরিয়াছেন,—“দেশী দাইগুলিই যত অনিষ্টের মূল; হয় তাহাদিগকে আন্দামানে পাঠাইয়া দাও, নয় ত আমাদের শিক্ষা মত ইহাদিগকে “সংস্কৃত” (reform) করিয়া অবিলম্বে আঁতুড় ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর—নতুবা এ শিশুমৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবার নয়।” কিন্তু ইহারও মূলে যে সেই প্রকাণ্ড ভুলটা রহিয়া গিয়াছে, পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। ডাক্তার আনি বেসাণ্ট (Dr. Annie Besant) গত জানুয়ারী মাসে দিল্লী নগরীতে All Parties Conference এ সম্মিলিত দেশীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

“Did they know that average life in India was 23.5 years? Did they realise that epidemics took almost double the toll of life compared with western countries, *because the Indian children were born of starving mothers and were generated by starving fathers?*”

(A. B. Patrika, Jan, 27, 1925)

Chronic starvation বা জন্মাবধি উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই যে আমাদের শিশু-মৃত্যু ও জাতীয় ধ্বংসের মূল কারণ, এই মহীয়সী মহিলার পূর্ব্বে কোন দেশীয় বা বিদেশীয় চিকিৎসক বা অন্য কেহই এই খাঁটি কথা এত বড় গলায় ও এমন স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুরক্ষার উপায় ও নিয়মগুলি সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার ও দেখাইবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন বা শিক্ষিতা ধাত্রীর আবশ্যকতা যে একেবারেই নাই, এ কথা আমরাও স্বীকার করি না; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মূল কারণের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়া এবং তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ না হইয়া শুধু শিশু-মঙ্গল, মাতৃমঙ্গল ও ধাত্রীমঙ্গলের অভিনয়ে অর্থব্যয় করা “ঘোড়ার সম্মুখ ভাগে গাড়ী যোতা”র মতই নিরর্থক

বলিয়া মনে হয় না কি ? মাটীর নীচে অন্ধকারে বাসা বাঁধিয়া দুরন্ত কীট বৃক্ষের মূল ধ্বংস করিতেছে, অথচ তাহার মস্তকে নিরন্তর জল-সেচনের জন্য চারিদিকে "দমকল" বসাইবার বিরাট আয়োজন চলিতেছে,—ব্যবস্থা মন্দ নয় !

অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল জাতির সন্তানদিগকে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। শুধু "টনিক" খাওয়াইয়া, "ইন্‌জেক্‌শন" দিয়া বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীব-বিশেষের gland দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য ও সজীবতা ফিরাইয়া আনিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করা কো বাতিকগ্রস্ত (maniacal) বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া ত বোধ হয় না। অ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেই অর্থসমস্যা স্বাস্থ্যসমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়া যাইবে ; বি তাহা না করিয়া সমাজ-সংস্কার, ধাত্রী-সংস্কার প্রভৃ যিনি যতই করুন, এ জাতির ধ্বংসপথ কিছুতেই হইবার নয়। *

* মুন্সীগঞ্জ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন—৬ই মে, বুধবার বঙ্গের জাতীয় শিক্ষার এক স্মরনীয় দিন। মহাত্মা গান্ধি কর্ত্তৃক এই হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মবীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় এম-এ, এম বি মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনা ও স্বার্থত্যাগ ভগবৎকৃপায় সাফল্য লাভ করিল। এই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় মহাশয়—১ লক্ষ টাকা এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয় ৫০০০০ হাজার টাকা এবং শ্রীযুক্ত বাবু মনোমহন পাণ্ডে মহাশয় বাৎসরিক ৫০০০ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধি চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করেন। Prevention is better than Cure—এই সত্যকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন "যাহাতে রোগ না হয়" এই চেষ্টা প্রত্যেক চিকিৎসক সমাজহিতৈষীর সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। চিকিৎস সংখ্যা ও হাঁসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যে সমাজে উন্নতি হইল তাহা মহাত্মা মনে করেন না। বরং চি চিকিৎসদের ব্যবসাবুদ্ধি ও বিজ্ঞাপন দ্বারা পেটেন্ট বিক্রয়ের প্রভূত নিন্দা করেন।

ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া অ বিনীতভাবে তিনি ধুরন্ধরবর্গকে সাবধান করিয়া যেন ভবিষ্যতে তাহারা প্রকৃত জনসেবা দ্বারা মহৎ প্রতিষ্ঠানটী অনুপ্রাণিত ও কার্য্যকরী ক "May this institution be of use to t real suffuers"

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩২ সাল { ৩য় সংখ্যা

স্বাভাবিক উপায়ে রোগ-আরোগ্য

কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, রোগী এবং চিকিৎসক উভয়কেই একযোগে যাহাতে রোগ আরোগ্য হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টাকেই চিকিৎসা বলা হয়। এই চিকিৎসা যথাসম্ভব স্বাভাবিক উপায় দ্বারা হওয়া উচিত। যে সকল অনিয়ম জন্য বা শরীরের দুর্ব্বলতা জন্য রোগ প্রকাশ পায় বা শরীরকে আক্রমণ করে তাহা বিশদরূপে আলোচনা করিয়া এবং স্বাভাবিক পন্থাগুলি কার্য্যকরী করিয়া রোগ নিরাময় করিবার চেষ্টাই প্রকৃত চিকিৎসা। ইহাতে রোগের মূল নষ্ট হয় এবং পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। এই উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক উপায়ে রোগ আরোগ্য প্রবন্ধে ধারাবাহিক ক্রমে আমাদের দেশের প্রচলিত রোগ সমূহ একে একে আলোচিত হইবে, এবং প্রতি রোগ-প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সবিস্তার বুঝান হইবে।

১। রোগ-বর্ণনা ২। প্রাদুর্ভাব ৩। কারণ বা হেতু ৪। শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন * ৫। লক্ষণ সমূহ ৬। রোগ-কালীন অন্য উপসর্গ বা আগন্তুক ব্যাধি সকল ৭। রোগ ভোগ কাল ৮। রোগমুক্তি-পদ্ধতি ৯। সাধারণ প্রতিষেধ বা রোগ আক্রমণ রোধ ১০। রোগ নির্ণয়

১১। চিকিৎসা—

(ক) স্বাভাবিক উপায় দ্বারা।

(খ) রোগগ্রস্ত স্থানের (স্থানিক) চিকিৎসা।

* রোগাক্রমণে শরীরের পরিবর্ত্তন সমূহ সম্যক বুঝিতে হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের কার্য্যাদি কিরূপে চলে ও যন্ত্রাদির গঠন অবস্থান সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। "দেহতত্ত্ব" পাঠ দ্বারা এই প্রয়োজন সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইবে। মূল্য ১৷০ মাত্র, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

(গ) শরীরের সাধারণ অবস্থায় চিকিৎসা—অর্থাৎ যে চিকিৎসা দ্বারা রোগ-প্রবণতা হ্রাস হয় এবং রোগের মূল কারণ সকল কার্য্যকারী হইতে পারেনা।

(ঘ) বিশেষ চিকিৎসা—বা কোন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা, যাহা রোগের মূল কারণের উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করে।

স্বাভাবিক উপায়ে রোগ চিকিৎসা—আলোচনার সহিত যে সকল চিকিৎসা প্রচলিত আছে তাহারও বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া সকল প্রকার চিকিৎসা সংক্ষেপে বলা হইবে। ইহার দ্বারা আমাদের পাঠক এবং স্বাস্থ্য-সেবকগণ চিকিৎসক মণ্ডলীদ্বারা যে চিকিৎসা হয় তাহাতে কথঞ্চিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবে এবং রোগীর সেবা-কালীন চিকিৎসক মহাশয়ের আদেশমত সকল বিষয় সুচারুরূপে পালন করিতে সমর্থ হইবে।

Dysentery প্রবাহিকা।

(আমাশয়)

এই রোগীটীর এদেশে বহু প্রচলন দেখা যায়—সেই জন্য প্রথমেই ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রোগ বর্ণনা আম বা আম মিশ্রিত রক্ত মলদ্বার হইতে পুনঃ পুনঃ নির্গমন হওয়াকে আমাশয় রোগ কহে। ইহা একটী লক্ষণ মাত্র;—অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ জন্য পেটে কনকনানি, কুন্থন, আমযুক্ত মল, বা আম ও রক্তযুক্ত মল জ্বর ও শারীরিয় ক্লেশ ও বহুবিধ লক্ষণ এই রোগে পরিস্ফুট হয়।

বৃহদন্ত্র মধ্যে ক্ষতযুক্ত প্রদাহ জন্য ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল ক্ষত গুদনালিকা (Rectum) এবং বৃহদান্ত্র কুণ্ডলিকা (Sigmoid flexure)এ সাধারণতঃ হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষতের অবস্থানুযায়ী রোগের লক্ষণ সমূহের তারতম্য দেখা যায়।

প্রাদুর্ভাব—জগতে ৪ প্রকার মহামারীর মধ্যে আমাশয় রোগ অন্যতম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওলাউঠা হইতে আমাশয় রোগ বেশী জীবন ধ্বংস করে এবং সৈন্যদিগের মধ্যে গুলি বারুদ অপেক্ষা বেশী প্রাণঘাতী হয়।

বঙ্গদেশে প্রায় বৎসরে দেড়লক্ষ লোকের এই রোগে মৃত্যু হয়। দেড়লক্ষের বহুগুণ লোক এই রোগে ভুগিয়া থাকে। ইহা বহু সংখ্যক লোককে একেবারে আক্রমণ করিতে দেখা যায় এবং এক পরিবারে পর পর অনেকে রোগগ্রস্ত হয় এবং প্রথম প্রথম জীবন-হানিকর হইতে দেখা যায়।

রোগের কারণ বা হেতু—নানা কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য গৌণ কারণগুলি (Remote causes) নিম্নে লিখিয়া দেওয়া হইল :—

১। অপরিষ্কার জল—মলযুক্ত বা কর্দ্দমাক্ত
২। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য
৩। কদভ্যাস বা আহার বিহারে অমিতাচার
৪। তীব্র জোলাপ সেবন
৫। দূষিত বায়ু ও অপরিষ্কার স্থানে বাস
৬। ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা; ত্বকের ক্রীয়াহীনতা এবং ময়লার স্থিতি। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার (Power of resistance) হ্রাস হইলে কিম্বা বহুকালব্যাপী রোগে ভুগিলে উপরোক্ত কারণগুলি কার্য্যকারী হইয়া রোগ আক্রমণের সুবিধা করে।

রোগীর মল পরীক্ষা দ্বারা এই রোগের দুইটী মোটামুটি মুখ্য (Immediate causes) কারণ নির্দ্ধারণ করা যায়—

১। এমিবা জনিত (Entamœba Histolytica)—যখন মলে এই সকল কীটাণু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়।

২। ব্যাসিলাস জনিত—নানারূপ রোগ উৎপাদক জীবাণু সিগা ব্যাসিলাস (Shiga Bacillus) বা ফ্লেক্সনার (Flexnor type Paradysenteric bacilli) ব্যাসিলাস অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিশেষ পরীক্ষা যখন রোগীর মলে পাওয়া যায়।

উপর বর্ণিত এমিবা বা ব্যাসিলাস্ প্রায় সাধারণ সুস্থ লোকের মলেই অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়।

শরীরের দুর্ব্বলতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস হইলে এই সকল জীবাণু শক্তিগত ও সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আমাশয় রোগের লক্ষণ সকল দেখা যায়। পূর্ব্বে যাহারা শান্তিতে মনুষ্য-দেহে বাস করিতেছিল তাহারাই ভীষণ ভাবাপন্ন হইয়া রোগ উৎপন্ন করে; অথবা দূষিত জল, মল ও আহার্য্য দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

মক্ষিকা, পোকা মাকড় প্রভৃতি এই রোগ বহন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এমিবার কোরকগুলি মক্ষিকা দ্বারা গলাধঃকৃত হইবার পর, খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় জলমধ্যে পুনরায় সংক্রামিত হয়। এই জন্যই রান্নাঘর প্রভৃতিতে মাছির প্রবেশাধিকার দিতে চিকিৎসকগণ এত নিষেধ করেন।

শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন—(নিদান Pathological anatomy)।

বৃহদন্ত্রের গাত্রের তিনটি আস্তরণের মধ্যে সর্ব্ব নিম্ন আবরণটির নাম শ্লেষ্মাধরা কলা। আমাশয় রোগে প্রধানতঃ এই আস্তরণ বা কলা এবং প্রায়ই দ্বিতীয় কলাসহ স্ফীত হয় এবং উহাদের মধ্যে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। অন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার আধিক্য হয় এবং গ্রন্থি সকল স্ফীত হয় এবং বিদারিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাধরা কলা স্থানে স্থানে নরম হইয়া যায় এবং স্খলিত হয় এবং ক্ষত উৎপাদিত হয়। শিশুদিগের মধ্যে ইহা বেশী হইয়া থাকে। আরোগ্যের পর মসৃণ দাগ থাকে।

পচ্‌ধরা আমাশয় রোগে প্রদাহ খুব বেশী হয় এবং সেই জন্য বড় বড় ঘা হইয়া থাকে। বৃহদন্ত্রের সর্ব্ব-বহিঃস্থ আস্তরণের মাংসময়া প্রাচীর পর্য্যন্ত এই সকল ঘা ভেদ করিয়া যায়। আরোগ্য হইলে আরোগ্য স্থান সঙ্কুচিত হয় এবং অন্ত্রের মধ্যস্থ ছিদ্রপথকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। অন্ত্রমূলিকা গ্রন্থিসকল (Mesenteric glands) স্ফীত হয়। পরে পাকিয়া স্ফোটকে পরিণত হয়। এইরূপে যকৃৎ মধ্যেও স্ফোটক হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সকল মেদময়-অপকর্ষ (fatty degeneration) প্রাপ্ত হয়; এবং ভিতরকার পরিসর কমিয়া যায় ও থল্‌থলে-ভাব ধারণ করে।

কঠিন অবস্থায় এই প্রদাহ ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

লক্ষণ সমূহ প্রথমতঃ তরল ভেদ হয়—ক্ষুধা কমিয়া যায়। বমনেচ্ছা ও অল্প জ্বর বোধ হয়। মল ক্রমে ছাই রঙের স্বচ্ছবৎ আমে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অল্প-বিস্তর রক্ত ও পূঁজ মিশ্রিত হইয়া আঠাল-ভাব ধারণ করে। তার পর শূলবেদনা, বমন দৃষ্ট হয়। জিহ্বা অপরিষ্কার ও রোগীকে অস্থির দেখা যায়। নাড়ী ক্ষীণ এবং দ্রুত হইয়া থাকে; কঠিন অবস্থায় মিনিটে ১২০ হইতে ১৪০ বার স্পন্দন হয়। প্রস্রাব অল্প ও দোরু বর্ণযুক্ত হয়। দাস্ত বারে ৫।৬ বার হইতে দিবা রাত্র ৪০।৫০ বার হইয়া থাকে।

মৃদু অবস্থায় জ্বর সামান্য থাকে। কঠিন অবস্থায় আক্রমণ হঠাৎ কম্পের সহিত হইয়া থাকে। জ্বর বেশী হয় এবং তাহার বিরাম হয় না। জিহ্বা শুষ্ক ও চক্‌চকে দেখা যায়। ঘন ঘন তলপেটের সূচবিদ্ধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা খুব বেশী এবং মুহুর্মুহু মলত্যাগেচ্ছা ও অধিকতর রক্ত পূঁজ মিশ্রিত মল অতি কুন্থনসহ নির্গত হয়। পচ্‌ধরা জটিল আমাশয়ে জ্বর বেশী হয়; একটু একটু মল-নির্গমনের সহিত ৩০।৪০ বার বাহ্যের বেগ আসে, হাতাপায়ের সন্ধি সমূহে খিল্ ধরে। মলের সহিত অন্ত্র গাত্রের টুক্‌রা টুক্‌রা পচা আবরণ সমূহ পরিত্যক্ত হয় এবং অতিশয় দুর্গন্ধ পাওয়া যায়; বমনেচ্ছা মুহুর্মুহু হইয়া উঠে, রোগী প্রলাপ বকিয়া থাকে এবং শরীর হিমাঙ্গ হয়। দুর্ব্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। নাড়ী ক্ষীণতর ও দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া থাকে।

রোগকালীন জটিল উপসর্গ সমূহ:—প্রথম হইতে রোগীর নিয়মমত যত্ন এবং স্বাভাবিক উপায়ে চিকিৎসা হইলে অন্য উপসর্গ প্রায় দেখা যায় না। তবে কঠিন অবস্থার রোগে অচিকিৎসা ও অবহেলার ফলে অন্ত্রের আবরণে ঝাঁঝরীর ন্যায় বহু

ছিদ্র হইয়া উদর দেশের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ রক্ষাকারী কোষ্ঠধরা-কলার প্রদাহ (Peritonitis) জন্য রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। ফুসফুস্ যকৃত প্লীহা ও বৃক্কে ফোটক দেখা দিলে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।

রোগ ভোগকাল ও রোগ-মুক্তি পদ্ধতি—রোগের হেতু সমূহের উপর ইহা নির্ভর করে। মৃদু রোগ প্রায় সপ্তাহে আরোগ্য হয়। কঠিন হইলে ২।৩ সপ্তাহ সময় লাগে বা ইতোমধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়।

সাধারণ প্রতিষেধ বা রোগ আক্রমণ রোধ—এমিবা অথবা ব্যাসিলাস-জনিত উদরাময় পাকাশয়ের অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায়, দূষিত খাদ্য বা পানীয়ের সহিত বা অপরিষ্কৃত অঙ্গুলি দ্বারা মুখমধ্যে নীত হয়। এই সকল রোগ বীজাণু পাকস্থলী অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পরে বৃহদন্ত্র আক্রমণ করে।

আবরণযুক্ত আমিবাই প্রধান সংক্রামক। আবরণ শূন্য অমিবা পাকস্থলীর পাচকরসে ধ্বংস প্রাপ্তহয়। কিন্তু আবরণযুক্ত এমিবা পাচকরসে ধ্বংস হয় না এবং রোগীর শরীর হইতে মলের সহিত পরিত্যক্ত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবার ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

আমাদের দেশের আর্দ্রভূমি এবং জলীয় বাষ্প পূর্ণ বায়ুমণ্ডল এই সকল আবরণযুক্ত আমিবার বাঁচিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। ইহারা নানাভাবে বাহিত ও পরিচালিত হইয়া পানীয় জল ও খাদ্য দ্রব্য-মধ্যে ক্রমে আশ্রয় পায়।

মাছি ও অন্যান্য কীটেরা এই সংক্রামক জীবগুলিকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিবার প্রধান সহায়। পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। মক্ষিকারা রোগ-জীবাণুপূর্ণ মল ভক্ষণের সহিত আবরণযুক্ত এমিবা (Encysted Amœba) ও অন্যান্য জীবাণু নিজেদের পাকাশয় মধ্যে গ্রহণ করে।

২। এই সকল আবরণযুক্ত এমিবারা মক্ষিকার উদরে কোনরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া অবিকৃত অবস্থায় মক্ষিকার মলের সহিত পরিত্যক্ত হয়।

৩। মক্ষিকারা ৪ মিনিট পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্যাদি পাকাশয়ে প্রবেশ করাইয়া ছিল—তাহা তাহাদের মলের সহিত সদ্য পরিত্যাগ করিতে পারে।

৪। মক্ষিকারা খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিয়া থাকিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারই উপরে মল পরিত্যাগ করে কিম্বা বমন করে। তা'ছাড়া উহাদের পদ ও পক্ষপুটদ্বয়ে মল রোগ-বীজাণু সহস্র সহস্র সংখ্যায় লাগিয়া থাকে। এ জন্যই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবাণুজনিত রোগসকল এত বিস্তৃত হয়।

উপরোক্ত মন্তব্যসকল অকাট্য প্রমাণ দ্বারা মক্ষিকাদের বংশ বৃদ্ধির স্থানগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিবার প্রয়োজনতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের আবাস গৃহ এবং আহারাদির স্থানে যাহাতে মক্ষিকা বা অন্য কীট-পতঙ্গাদি অবাধে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে না পারে তাহা সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত উপায় গুলি প্রতিপালন করিলে এমিবা বা ব্যাসিলস-জনিত উদরাময় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না।

১। মনুষ্য দেহ মধ্যে এই সকল জীবাণু আবরণ-মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। আবরণযুক্ত ও মুক্ত এমিবাসকল মনুষ্য দেহ হইতে মলের সহিত পরিত্যক্ত হইলে যত শীঘ্র বিশোধক দ্রব্য দ্বারা বা অন্য উপায়ে ধ্বংশ করা আবশ্যক।

৩। আবরণযুক্ত এমিবা দ্বারা যাহাতে খাদ্য দূষিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪। সংক্রামণের সকল প্রচ্ছন্ন উৎপত্তি-স্থান মক্ষিকা এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গাদি হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

রোগবাহক কি এবং তাহাদের দ্বারা রোগ কি সংক্রামিত হয়, তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্য-সমাচারের

কিছু কিছু অবগত আছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—কোন মনুষ্য বা জন্তুর শরীর হইতে রোগ উৎপাদনকারী বিষ (জীবাণু বা অলক্ষ্য বিষ) অন্য দেহে গিয়া রোগ উৎপাদন করিলে সেই মনুষ্য বা জন্তুকে রোগ বাহক বলা হয়।

৫। বাহক দ্বারা রোগ বিস্তৃতি বন্ধ করা বিধেয়।

দুই প্রকার রোগ বাহক দেখা যায়—

(ক) **আরোগ্যমুখ রোগী**—যাহাদের এই রোগের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে সকল লক্ষণ নিরাময় হইয়া কেবল মলের সহিত এমিবা পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহারা রোগ বাহকের কার্য্য করে।

(খ) **সংযোগ বাহক**—অর্থাৎ যাহাদের পূর্ব্বে আদৌ রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু তাহারা মলের সহিত রোগ-জীবাণু পরিত্যাগ করিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করিতেছে।

দুই শ্রেণীর বাহকেরা মলসহ পরিত্যক্ত আবরণযুক্ত এমিবা দ্বারা অপরের মধ্যে রোগ বিস্তার করিতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শতকরা ১০।১৫ জন এইরূপ আমাশয় রোগ-জীবাণুর বাহক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (Acton and Knowles)।

প্রতিষেধক চিকিৎসাকে ফলবতী করিতে হইলে, যাহাতে আবরণযুক্ত এমিবাগুলি পরিব্যাপ্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক।

এই জন্য যে সকল কার্য্য-প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) রোগগ্রস্ত স্থানের মল সকলকে বিশোধন করিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষাপযোগীভাবে নিকাশ করিতে হইবে।

(২) ব্যবহার্য্য জলকে সংক্রামণ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং পানীয় জল ও দুগ্ধকে সকল সময়ে ফুটাইয়া খাইতে হইবে।

(৩) ভূমিতে উৎপন্ন ফল ও তরকারি না ধুইয়া ব্যবহার করিবে না।

(৪) মক্ষিকা ও অন্যান্য পতঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিবে। আহারের স্থান ও আহার্য্য সকল মক্ষিকা ও কীটাদি হইতে জাল দ্বারা রক্ষা করিবে এবং সাধারণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, যাহাতে মক্ষিকা বা পতঙ্গাদি বংশ বৃদ্ধি করিবার আদৌ সুবিধা না পায়।

রোগ নির্ণয়—

মল পরীক্ষার উপর রোগ নির্ণয় পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে। রোগ এমিবা জনিত না ব্যাসিলাস্ জনিত তাহা ঠিক করিবার জন্য অনুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা যথারীতি সদ্য-পরিত্যক্ত মল পরীক্ষা দ্বারা কেবলই এই বিষয়ের সঠিক নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে।

সাধারণ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য-সেবকদের এই সকল সুযোগ প্রায় নাই বা তাহাদের দ্বারা হওয়াও সম্ভবপর নহে। তবে মোটামুটি ভাবে সদ্য পরিত্যক্ত মলের লিটমস্ কাগজের উপর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Reaction) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একরূপ ঠিক করা যায়। এমিবাজনিত আমাশয়ের মলে অম্লত্ব অবস্থা থাকে। নীল লিটমস্ কাগজ এই মল সংস্পর্শ লাল হইয়া যায়। এবং ব্যাসিলাস জনিত মলে ক্ষার ভাব বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ লাল লিটমস্ কাগজ তাহার সংস্পর্শে নীল হইয়া যায়।

ব্যাসিলাস জনিত রোগের মলের রক্ত লালবর্ণ থাকে এবং মল ও পরিমাণে কম কম হয়। এমিবা জনিত রোগের মলের অম্লত্ব জন্য রক্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া কালচিটে হয় এবং মল ভষকা ও পরিমাণে বেশী বেশী হইয়া থাকে। কখন কখন উভয় প্রকার কারণ বর্ত্তমান দেখা যায়। বা এমিবা জনিত রোগীর উপর ব্যাসিলস আক্রমণ করে বা ব্যাসিলাস জনিত রোগীর উপর এমিবা আক্রমণ করে। এইরূপ অবস্থাকে মিশ্রিত সংক্রামন (Mixed infection) বলা হয়।

এমিটিন নামক ঔষধ রোগীর ত্বকের নিম্নে দুই দিন উপর্য্যুপরি ইন্‌জেক্‌সন করিলে যদি রোগ এমিবা-জনিত হয়, তাহা হইলে তাহা আরোগ্যমুখ হয়। সেই জন্য আমাশয় রোগের প্রথমেই এমিটিন ইন্‌জেক্‌সন

করা আবশ্যক। যদি কোন উপকার না হয় তবে ব্যাসিলাস জনিত রোগ নির্দ্ধারণ করিয়া উপযুক্তমত চিকিৎসা করিবে।

১১। চিকিৎসা—

কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে যাহাতে চিকিৎসা দ্বারা রোগীর কোন ক্ষতি না হয়, তাহা চিকিৎসকের সর্ব্বতোভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য। রোগ-নিরূপণ হইলে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে সুবিধা পান। তবে আমাদের গরীব দেশে যেখানে ১০,০০০ জনের চিকিৎসার জন্য এক জন শিক্ষিত চিকিৎসক নাই, সেখানে স্বাস্থ্য সেবকেরা এবং জননায়কেরা যাহাতে এই রোগ বিধিমত চিকিৎসা করিতে পারেন এবং সংক্রামক রোগের প্রারম্ভে রোগ-বিস্তার প্রতিরোধ করিতে পারেন, সেইরূপ বিধিসকল আলোচনা করিয়া এই আমাশয় রোগের চিকিৎসা আলোচিত হইল।

প্রতীকারক কার্য্য-প্রণালীগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচিত হইবে।

১। আমাশয় রোগের ও স্বাভাবিক উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

২। স্থানিক চিকিৎসা—(Local treatment) অর্থাৎ রোগ দ্বারা শরীরের যে সকল অংশ দুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উপর ঔষধ প্রয়োগ।

৩। শরীরের প্রকৃতি ও ধাতুগণের দোষ সংশোধন করিবার চিকিৎসা। (Constitutional treatment)

৪। বিশেষ চিকিৎসা—যথা ইন্‌জেক্‌সন দ্বারা।

১। স্বাভাবিক উপায় দ্বারা চিকিৎসা (Treatment of the disease by Natural methods)—প্রথমতঃ অন্নবহানালীর (Alimentary Canal) মধ্যে যে সকল সঞ্চিত পুরাতন আবদ্ধ মল আছে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইবে; এবং যথা সম্ভব তাহাকে বিশ্রাম দিতে হইবে। কারণ রোগ-গ্রস্ত স্থানকে বিশ্রাম দিয়া প্রকৃতি রোগ আরোগ্য করেন। যে কোন দ্রব্য অন্নবহানালীকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহা স্থানান্তরিত করিবে বা সেইরূপ দ্রব্যকে একেবারে সেখানে প্রবেশ করিতে দিবে না। যদি পাকস্থলীতে খাদ্য-দ্রব্য অপরিপক্ক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে রোগীকে ঈষদুষ্ণ জল যথেষ্ট পান করাইয়া বমি করাইবে, যতক্ষণ না পাকস্থলী খালি হয়।

পরে রোগীকে কিছু বিশ্রাম করিতে দিয়া নিম্ন অন্ত্রধৌতি * দ্বারা পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবে। দুই পাইণ্ট বা এক বড় বোতল ঈষদুষ্ণ গরম জল বা Normal Saline দ্বারা অন্ত্রধৌতি ক্রিয়া করাইবে এবং যত বেশীক্ষণ এই জল রোগী ভিতরে রাখিতে পারে ততই ভাল। যদি রোগী বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পাট-করা তোয়ালে দ্বারা মলদ্বার চাপিয়া রাখিবে, তাহাতে কুন্থন ক্রমশঃ কমিয়া যায়। পরে রোগী বিছানার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে, যাহাতে অন্ত্রমধ্যে প্রবি জল উত্তম রূপে অন্ত্রের গাত্রাভ্যন্তর ধুইয়া ফেলিতে পারে।

যদি জল শীঘ্র বাহির হইয়া আসে কিম্বা যদি পূর ২ বোতল জল একেবারে লইতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে এই অন্ত্রধৌতি ক্রিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ঠাণ্ডা জল দ্বারা পুনরায় করাইবে।

এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা অন্নবহানালীর নীচে দিকে যাহা কিছু বিষাক্ত উত্তেজক দ্রব্য ছিল তাহা বহিষ্কৃত হইয়া যাইবে।

এইরূপে স্বাভাবিক চিকিৎসা দ্বারা রোগের প্রথ অবস্থায় (যখন পর্য্যন্ত নিঃসৃত পদার্থ শ্লেষ্মাশূন্য, মল এবং বিনা বেদনায় নির্গত হয়) সকল খাদ্য দ্রব্য ব করিয়া ভোগকাল কমান বা রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। যদি পেটে খুব উত্তাপ বা বেদনা থাকে, তাহা হইলে রোগীর সহ্যমত গরম বা ঠাণ্ডা জলে ভিজা গামছা বা তোয়ালে বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া জলশূন্য করিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

যদি বেদনা বা কুন্থন পূর্ব্ববৎ থাকে, তাহা হইলে হাত সওয়া গরম জলে রোগীকে ১৫।২০ মিনিট যাবৎ (Sitz bath যাহাতে কোমর পর্য্যন্ত জলে ডুবে) কটিস্নান করাইবে। পরে তোয়ালে দ্বারা বেশ করিয়া শুষ্ক করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া পায়ের উপর গরম জলের থলি বা বোতল দিবে। রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণ ইষদুষ্ণ বা ঠাণ্ডাজল খাইতে দিবে। কিন্তু দুই তিন দিন যাবৎ কোন খাদ্য দিবে না।

* অন্ত্রধৌতি সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান বহুল পরিচয় আমাদের অ ধৌতি নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। মূল্য /০ মাত্র ডাঃ মাঃ পৃথক

যদি পেটকামড়ানি বা শূলবৎ বেদনা তবুও থাকে, তাহা হইলে অন্ত্রমধ্যে কোন উত্তেজক দ্রব্য তখনও আছে তাহা অনুমান করিয়া পুনরায় অন্ত্রধৌতি করাইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ দুইবার অন্ত্রধৌতি করান যাইতে পারে এবং অন্ত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইলে জলের মাত্রা কমাইবে। প্রত্যেক দাস্তর পর অল্প পরিমাণ অর্থাৎ ৪ হইতে ৬ আউন্স অনতিশীতল জল পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিবে। এই জল ক্রমে ক্রমে সারা ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের মধ্যে শোষিত হয় এবং এইরূপে রোগগ্রস্ত স্থান সকল উপশমিত হইবে এবং প্রদাহ কমিয়া যাইবে।

যখন মলে দুর্গন্ধ পাইবে রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে এবং মলকে ফিনাইল প্রভৃতি দ্বারা বিশোধন করিবে।

রোগীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিবার চিকিৎসার পদ্ধতি স্থিরীকৃত করিবে। যদি রোগী খুব দুর্ব্বল হয় জ্বরের সময় বন্ধ ঘরের ভিতর ইষদুষ্ণ জলে তাহার গাত্র মুছাইবে। পরে অতি সত্বর গাত্র মুছাইয়া দিয়া জানালা দরজা খুলিয়া দিবে; দেখিবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে। সর্ব্বদা হাত পা গরম রাখিবে। পেটকামড়ানি ও পেটের বেদনার জন্য গরম জলের স্বেদ ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া দিবে এবং যতক্ষণ না বেদনার লাঘব হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বারে বারে দিতে হইবে।

রোগীর গৃহে মুক্তবায়ু বেশ চলাচল করিবে ও রৌদ্রও খুব আসিবে। রোগীকে যথাসম্ভব স্থিরভাবে থাকিতে হইবে ও যত ইচ্ছা নিদ্রা যাইতে দিবে। যদি ক্ষুধায় কাতর হয় তবে অল্প পরিমাণ ইষদুষ্ণ জল খাইতে দিবে। আরোগ্যমুখ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন আহার্য্য দিবে না। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় ও জ্বরের সময় খাইতে দিলে, অন্ত্র মধ্যের প্রদাহ বাড়িয়া যাইবে এবং বাহে বেশী বৃদ্ধি হইবে ও রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় খাদ্য দ্রব্য পরিপাক পাইবে না বা শরীর মধ্যে গৃহীত হইবে না। সেইজন্য আহার্য্য না দেওয়াই বিধেয়।

রোগ আরোগ্য অবস্থায় চিকিৎসাঃ—সুচিকিৎসার ফলে মলের সহিত রক্ত পূঁজ বন্ধ হইলে এবং অন্যান্য দোষাবহ লক্ষণ সকলের অবসান হইলে রোগ শীঘ্রই আরোগ্যমুখ হয়।

ক্ষুধার উদ্রেকের সহিত রোগী খাইতে চাহিবে। এই সময় পথ্য সম্বন্ধে অনিয়ম হইলে, রোগের পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে এবং রোগী খুব বেশী কষ্ট পায়। অল্প অল্প তরল পথ্য দিয়া আরম্ভ করিবে। বার্লি, ভাতের মাড় বা এরারুটের খুব তরল জলবৎ পেয় অথবা ছানার জল অল্প অল্প পরিমাণে আরম্ভ করিবে। পরে ঘোল, নরম সুসিদ্ধ কাঁচকলা মণ্ড দিতে পারা যায়। সকল প্রকার লক্ষণ বিলুপ্ত হইবার তিন দিন পরে নরম সুসিদ্ধ অন্ন অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। কঠিন খাদ্যের পরিমাণ খুব সাবধানতার সহিত ব্যবস্থা দিতে হইবে এবং আস্তে আস্তে বাড়াইয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে দিবে।

রোগী আরোগ্যমুখ অবস্থায় খুব সাবধানে থাকিবে এবং উদর-গহ্বরকে বেশ করিয়া ঠাণ্ডা লাগা হইতে রক্ষা করিবে।

যে সকল খাদ্য অন্ত্র-মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে উত্তেজিত করে, তাহা একেবারে বর্জ্জন করিবে। মদ্য, মাংস বা কোনরূপ আমিষ আহার ডাল বা মশলা বা উগ্র চাটনি নিষিদ্ধ। রোগীর উন্নতির সহিত পথ্য আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন করিবে। সিদ্ধ করা ফল, বেদানা, ডালিম, ফলের রস, নরম সুসিদ্ধ ভাত বা মণ্ড প্রশস্ত। যে সকল আহার্য্য দ্বারা কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়, তাহা একেবারে দিবে না। স্বাভাবিক মল না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ

অন্ততঃ একবার করিয়া অন্ত্রধৌতি দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে।

স্থানিক চিকিৎসা
(Local treatment)

এইরোগে বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশে এবং গুদনালিকায় (Rectum) প্রথমেই প্রদাহ ও ক্ষত হইতে থাকে। সেই জন্য অন্ত্রের নিম্নাংশকে অন্ত্রধৌতি দ্বারা স্থানীয় চিকিৎসা আবশ্যক।

এই রোগ এমিবা-ঘটিত না - ব্যাসিলস-ঘটিত তাহা কেবল বিশেষজ্ঞরাই স্থির করিতে পারেন। সাধারণ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য-সেবকদের নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা নাই। সেই জন্য যাহাতে সহজ ও নিরাপদভাবে চিকিৎসা হইতে পারে তাহাই এখানে বিবৃত হইল।

(ক) নিম্নান্ত্রকে বোরিক লোসন (৫ গ্রেন ১ আউন্স জলে) দ্বারা ধৌত করিবে। অথবা

(খ) লবন জলে (৯০ গ্রেণ বা ৪৫ রতি লবণ ফুটান জল ১ পাইন্ট) ধৌত করিবে।

পরে নিম্নলিখিত আরোগ্যকারী ধুইবার ঔষধ পর্য্যায়-ক্রমে পেটের মধ্যে ব্যবহার করিবে।

১। Methylene Blue লোশন (Gr. X to a pint) তুল্যভাগ ইষদুষ্ণ জল সহ।*

২। এমিটিন এমপুল্ ১ গ্রেন ভাঙিয়া ৮ আউন্স স্বাভাবিক লবণ জলে মিশাইয়া।

এইরূপ অন্ত্রধৌতি দ্বারা পুরাতন মলগুটিকাসমূহ বাহির হইয়া যায়। অন্ত্র-মধ্যে সংলগ্ন যে সকল শ্লেষ্মা ও আবর্জ্জনার মধ্যে এমিবা বা ব্যাসিলাই প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তাহারা ধৌত ক্রিয়ার দ্বারা স্থানচ্যুত হয় এবং এমিবা বা ব্যাসিলস ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিন্তু রোগীর কোন ক্ষতি হয় না।

কখন কখন ম্যালেরিয়া বীজাণুর জন্য আমাশয় রোগ হয় এবং এইসঙ্গে রোগীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও হইয়া থাকে। কুইনাইন বাইহাইড্রোক্লোর ২০ গ্রেন এক পাইন্ট লবনজলে দ্রব করিয়া—তাহার ১০ আউন্স দ্বারা প্রত্যহ এক বা দুই বার অন্ত্রধৌতি করাইবে। রক্ত পরীক্ষা দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর স্থির হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

যখন ব্যাপকরূপে কঠিন অবস্থার রোগ দেখা যাইবে তখন এই প্রক্রিয়া সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩। শরীরের প্রকৃতি বা ধাতু-সকলের দোষসংশোধন চিকিৎসা
(Constitutional treatment.)

আমাশয় রোগের উৎপাদক এমিবা বা ব্যাকটিরিয়া সুস্থ শরীরে বাস কালীন কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। এবং ইহারা বহির্জগত হইতে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও সহজে কোন রোগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যদি শরীরের ধাতু প্রকৃতি দোষযুক্ত হয়, তবেই ইহারা দেহীকে আক্রমণ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। রোগের কারণ বা হেতু আলোচনার সময় এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তবে এই সকল কারণগুলি কতকগুলি ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে এবং শরীর মধ্যে বল রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করে। গত ৩০ বৎসর চিকিৎসা করিয়া যে সকল দেশীয় ঔষধে এই রোগের সর্ব্বতোভাবে উপকার দেখা গিয়াছে তাহাই এই ধাতু বা প্রকৃতি সংশোধন চিকিৎসার প্রসঙ্গে বিবৃত হইল।

(ক) **একষ্ট্রাক্ট বেল ও ইন্দ্রযব লিকুইড**—এটী ১টী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের যোগ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয় ইণ্ডিয়ান ড্রাগ্‌স লিমিটেড কোং দ্বারা এই এই তৈয়ারি করান। ইহাতে আতইচ, বেলশুট, মুথা, ইন্দ্রযব কুর্চ্চির ছাল, বালা, লোধ্র এবং ত্রিফলা যথাযোগ্য মাত্রায় বর্ত্তমান আছে ; এবং বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই যোগ প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল ঔষধ একত্রীভূত ক্রিয়া—আমাশয় রোগে অনেকটা জোলাপের ন্যায় কার্য্য করে। অন্ত্র মধ্য হইতে পুরাতন সঞ্চিত

* এই ঔষধ ব্যবহারে রোগীর প্রস্রাব নীলাভ হইয়া থাকে।

বহিষ্করণ করে এবং লসিকা নিঃসরণ জন্য ক্ষত সকলের আরোগ্যের সুবিধা হয়। তিক্তরস যুক্ত বলকারক ভেষজ সকল অল্প জ্বরের উপদ্রব শান্ত করিয়া অন্ত্র মধ্যস্থিত গ্রন্থিদের বলবৃদ্ধি এবং পিত্তরস নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। এই ঔষধ বহুরোগীতে পরীক্ষিত ও স্থায়ী ফলপ্রদ। ইহার মাত্রা ১ হইতে ২ ড্রাম প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ ছটাক জলসহ।

(খ) **সলফার কম্পাউণ্ড চন্দ্রিকা** (আয়ুর্ব্বেদীয় মহাগন্ধক যোগ চন্দ্রিকাকারে প্রস্তুত) নির্দ্দোষ অথচ জীবাণুনাশক ধাতু উপাদান এবং সংকোচক ও বাতনাশক ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত। অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণুঘটিত যাবতীয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। পাতলা, ভ্যাবকা এবং অপক্ক সচ্ছ সাদা মল, দমকাভেদ এবং শিশুদের দুর্গন্ধযুক্ত মল হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এমিবা বা ব্যাসিলস জনিত আমাশয় রোগে বরাবরই ফলপ্রদ। একষ্ট্রাক্ট বেল ও ইন্দ্রযব লিকুইড ইহার সহিত ব্যবহার করিলে কার্য্যকরী শক্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। মাত্রা—প্রত্যহ ১টী বটিকা করিয়া তিনবার সেব্য। শিশুদের জন্য বয়স হিসাব ½ বা সিকি মাত্রা।

(গ) **ল্যাকটিক এসিড্ ব্যাসিলস্ কালচার**—জীবাণু-ঘটিত সকল প্রকার রোগে—"ল্যাকটিক কালচার" সেবন করিলে—অন্ত্র-মধ্যস্থিত পাচক রসের অম্লত্ব সাধন জন্য রোগ-উৎপাদক জীবাণু সকলকে ধ্বংস করে।

জীবাণু সকল ক্ষারভাবযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই কেবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। "ল্যাকটিক কালচার" ব্যবহার নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্বিষ। প্রত্যহ তিনবার মিছরির সরবৎ সহ ১ শিশি (১ ড্রাম) কালচার খাইতে দিবে। শিশুদের জন্য অর্দ্ধমাত্রা।

(৪) বিশেষ চিকিৎসা
(Specific treatment)

এমিটিন—এমিবার উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করে এবং সেইজন্য ইনজেকসান দ্বারা এই ঔষধ প্রত্যেক আমাশয় রোগীকে প্রয়োগ করা উচিত।

½ বা ১ গ্রেন এমপুল বয়স হিসাবে বা রোগের তেজানুযায়ী প্রত্যহ একবার করিয়া অন্ততঃ দুইদিন ইনজেকশান দ্বারা প্রয়োগ করিলেই এমিবা-ঘটিত আমাশয় রোগ উপশমিত হয়।

যদি ইনজেকশান দিবার যোগ্য চিকিৎসকের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতভাবে লবনজলে ১টি এমপুল্ ভাঙ্গিয়া মিশাইয়া অন্ত্রধৌতি করিলেও যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

Anti Dysenteric Serum (বারোজ ওয়েল্‌ক্যম্ কোম্পানী প্রস্তুত)—রোগ কঠিন হইলে এবং পূর্ব্ববর্ণিত সকল প্রকার চিকিৎসায় ফল না দর্শাইলে এবং রোগীর অবস্থা বিপদজ্জনক হইলে এই Serum Injection করাই শেষ উপায় জানিবে। ইহা উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইনজেকসান দিবার পূর্ব্বে ১ ড্রাম Calcium Salt (Calcium Lactate ব Chloride) ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে। এইরূপ Calcium প্রয়োগের পর Serum Injection দিলে, anaphylaxis হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এই ইনজেকশান চিকিৎসা বহুদর্শী চিকিৎসকের উপদেশ মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

জড়-তত্ত্ব

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস]

পূর্ব্ব-ভাষ।

চিকিৎসা-কার্য্যকে অনেকে যেমন "বাঘ" মনে করেন, তেমনি আবার অনেকে "মোট ফেলার" মত সহজ কায মনে করেন। অথচ, চিকিৎসকের মত দায়িত্বপূর্ণ কায আর নাই। যদি একটা সামান্য ভুল গোড়ায় হইয়া যায়, তবে পরে আর তাহাকে সংশোধন করা অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহার ফলে, একটা প্রাণ চলিয়া যাইতে পারে। মকদ্দমার ও ঝগড়া বিবাদের আপীল আছে, ফাঁসিও রদ হয়, ভাঙা জিনিষ ও জোড়া লাগে, হেলান বাড়ীকে চাড়া দিয়া ঠেস দিয়া তাহাতে বাস করা সম্ভবপর হয়—কিন্তু মানুষের চিকিৎসা বেলায়—"ঐ! যাঃ!!" বলিলে, আর ফিরাইবার উপায় থাকে না। অথচ, এ দেশে, কত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক হেলায় চিকিৎসকের ব্যবসায় জীবিকার উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন!!! এই লোক-দিগকে শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানের পথে চালিত করা আমাদের কর্ত্তব্য। তদুদ্দেশ্যেই, জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিজ্ঞানের মূল কথাগুলিকে সহজ ভাষায় ও সরল প্রণালীতে প্রচারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত, এই প্রবন্ধ-গুলিকে মনোযোগের সহিত পাঠ করা—নীরস বোধে ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিলে গোড়া কাঁচা থাকিয়া যাইবে।

"জড়-তত্ত্ব" কাহাকে বলে?—আমরা যত কিছু জিনিষ দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতক জিনিষ ইচ্ছামত নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। আবার অপর কতক জিনিষ আছে, যাহা আপনা-আপনি নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে ত পারেই না, তাহার উপরে তাহাদের ভিতরে কোনও রকম প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। এই শেষোক্ত জাতীয় জিনিষকেই জড়-পদার্থ বলে। যে বই পড়িলে এই জড় জিনিষগুলির সম্বন্ধে সকল জ্ঞানই জন্মায় সেই বই পড়িয়া "জড়-তত্ত্ব" লাভ করা যায়।

জড়-তত্ত্ব কোন্ কোন্ জিনিষ লইয়া আলোচনা করে?—এক কথায় বলিতে হইলে, ক্ষিতি, অপ্ (জল), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (শূন্যপথ বা ঈথার) ও তেজ (অগ্নি) এই পাঁচটিই জড় পদার্থ বলিয়া আমাদের কাছে আদরণীয়। আর এই পাঁচটি জিনিষের সম্বন্ধে তাহাদের কাহারো বা—

(১) মাপ (measurement) —লম্বা, চওড়া, প্রস্থ, ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান

(২) ঘনত্ব (density)—বা তাহার যে কোনও প্রত্যেক দুইটি অণুর মধ্যে কতটা ফাঁক আছে তদ্বিষয়ক জ্ঞান।

(৩) চাপ (pressure) অর্থাৎ তাহার ওজন।

(৪) গতি-নিয়ম (motion and force)

(৫) তাপের ফল (effects of heat)

এই কয়েকটি বিষয়ই আমাদের জানিবার প্রয়োজন হয়।

আমরা একে একে ঐ পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করিব—যে হেতু ঐ পাঁচটি উপায়ে আমরা জড়-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাহরণ করি।

মাপের কথা।

সমাজে একত্রে বাস করিতে হইলে, জিনিষের আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। আদান-প্রদান করিতে হইলে একটা হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়। সেরূপ হিসাবের মূল—মাপ বা পরিমাণ কল্পনা। সাধারণতঃ

সহজ-প্রাপ্য জিনিষ লইয়াই মাপ করা হইয়া থাকে। যে দেশের লোকের যাহাতে সুবিধা হইয়াছে, সে দেশে সেইরূপেই মাপ করা চলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে রতি (কুঁচ) বা টাকা লইয়া ওজন

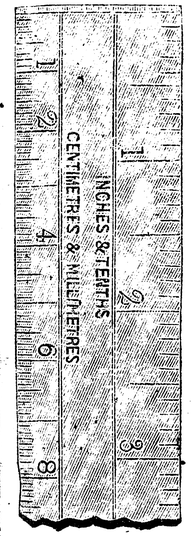

ইংরাজী ইঞ্চি ও ফরাসি মিটার মাপের স্কেল বা গজ। চিত্র—১

করার প্রথা আছে। সের হিসাবে মাপ করারও প্রথা আছে। আঙ্গুলের মাপ ধরিয়া দৈর্ঘ্য মাপ করার প্রথা আছে; বিলাতে ইঞ্চি, ফুট, পাউণ্ড, আউন্স প্রভৃতির চলন আছে। ফ্রান্সে মিটার প্রভৃতির চলন আছে। আগে যখন রেল বিস্তার ঘটে নাই, তখন যে-যাহার দেশে নিজ নিজ দেশীয় মাপ চালাইতেন। এখন আর তাহা করিবার যো নাই—এখন সকলে মিলিয়া সাধারণ মাপ কতকগুলি মানিয়া লইয়াছে—কাযেই সেই মাপগুলি সকলকে জানিতে হয়—তাহা পরে দিতেছি।

মাপ করিতে যাইলে, জলীয় জিনিষ (liquid) ও কঠিন (solid) জিনিষ এবং হাওয়ার মত জিনিষ (gas) এই তিন জাতীয় জিনিষের আলাদা মাপ করিতে হয়। সে সকল মাপ পরস্পর স্বতন্ত্র। তাই আলাদা আলাদা করিয়া মাপের কথা লিখিলাম।

কঠিন জিনিষের মাপ কয় প্রকার।—কঠিন জিনিষের মাপ সাধারণতঃ তিন প্রকারের।

(১) দৈর্ঘ্য মাপ—অর্থাৎ সুধু লম্বায় বা সুধু চওড়ায় বা সুধু মোটা বা আড়ে কত। সুধু এক এক দিকের মাপকে দৈর্ঘ্য মাপ বলে।

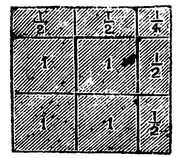

স্কোয়ার (বর্গ) সেণ্টি-মিটারে ভাগ করা কাষ্ঠফলক। চিত্র—২

একটি স্কোয়ার (বর্গ) সেণ্টিমিটারকে স্কোয়ার (বর্গ) মিলি মিটারে ভাগ করিয়া দেখান হইতেছে। চিত্র—৩

(২) কাঠা কালির মাপ—লম্বা ও চওড়া এই দুইটির পরস্পর গুণ বা "বর্গ ফল।" অর্থাৎ যে কোনও জিনিষ যতটা যায়গা জুড়িয়া থাকে তাহাকেই তাহার বর্গমাপ (area) বলে।

(৩) ঘন ফল (Volume)—অর্থাৎ লম্বা, চওড়া

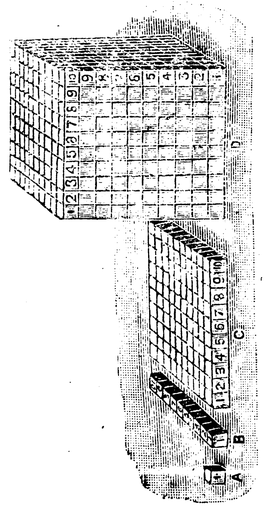

দশখানি A এ'র মত চৌকাতে একটি B'র মত ষষ্টি হইবে। B'র মত ১০ খানি ষষ্টি একত্রিত করিলে ১ খানি C র মত পাথর হইবে; এবং C'র মত ১০ খানি পাথর একত্রিত করিলে D'র মত একখানি ঘন-চৌকা হইবে।

চিত্র—৪

ও পুরুত্ব এই তিনটির একত্রে গুণ করিয়া তাহার ফল। ইহা কাঠাকালি হইতে তফাৎ। কাঠাকালি চৌরস জমির উপরে সেই জিনিষটি রাখিলে কতটা জমি জুড়িয়া সেই জিনিষটি থাকে তাহারই উপরে লক্ষ্য করা হয়;

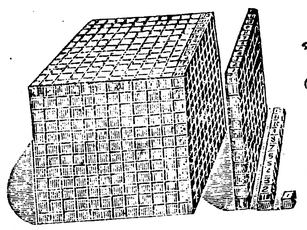

ডানদিক হইতে পর পর বামদিকে গেলে—

(১) প্রথম ছোট্ট চৌকাটি যদি এক ঘন ইঞ্চি (১"×১"×১") হয়, তবে (২) ১২ খণ্ড একত্রিত যষ্টিটাতে ১২×১×১ ঘন ইঞ্চি (৩) পাতলা পাথরের মত খণ্ড খানিতে ১×১২×১২=১৪৪ ঘন ইঞ্চি আছে (৪) বড় চৌকা খানিতে ১২×১২×১২ ঘন ইঞ্চি—অর্থাৎ ১ ঘন ফুট আছে। চিত্র—৫

আর "ঘন ফল" সুধু জমির উপরে কতটা জায়গা জুড়িয়া সেই জিনিষটি থাকিতে পারে তাহা ত জানায়ই, পরন্তু উপরের দিকেও তাহার আয়তন নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ "কাঠাকালি" বা বর্গফল সমতল ক্ষেত্রের মাপ; ঘন ফল—লম্বা, চওড়া ও খাড়াই এই তিন দিকের মাপ সূচিত করে।

তরল ও হাওয়ার মত জিনিষের মাপ=

(১) ওজন
(২) ঘনত্ব
(৩) চাপ
(৪) উত্তাপ

তোমরা হয় ত বলিবে "জলের ওজন আছে বুঝি। হাওয়ার আবার ওজন কি?" হাওয়ারও ওজন আছে। তাহার প্রমাণ, আমরা যদি ভূগর্ভস্থ খনির ভিতরে নামি তবে আমাদের কাণে তালা ধরে, আমরা ভাল করিয়া কথা শুনিতে পাই না। আবার আমরা যদি হঠাৎ খুব উঁচুতে উঠি—তবে আমাদের নাক দিয়া রক্ত পড়ে। অর্থাৎ যে জমিতে আমরা দাঁড়িয়া চড়িয়া বেড়াই, সেই জমির উপরের বায়ুর চাপ আমাদের গা-সহা হইয়া পড়ে। তাহার নীচে নামিলে (কিনা, আরো বেশী বায়ুর তলায় গেলে) কাণে তালা ধরে; তাহার উপরে উঠিলে (কি না, অল্প বায়ুর চাপে) নাকের শির ফাটিয়া রক্ত পড়ে। আমরা যদি কোনও যায়গা চুষি (অর্থাৎ সাধারণতঃ বায়ুর চাপ সেই জায়গার উপরে যতটা থাকে, সেই বায়ুর চাপকে চুষিয়া সরাইয়া দিই) তবে ত্বকের নিম্নস্থ শিরা গুলি ভেদ করিয়া ত্বকের উপরে রক্ত আসিয়া পড়ে। কাযেই এটা মিথ্যা কথা নয় যে বায়ুরও ওজন ও চাপ আছে। আবার, দুধের চেয়ে ক্ষীর যেমন ঘন, তেমনি জলের চেয়ে পারদ ঘন। পারদ এত ঘন যে উহার চেয়ে লৌহ হালকা বিধায়ে পারদের উপরে লৌহ ভাসে!

দৈর্ঘ্য মাপের কথা।—বাজারে মাপিবার জন্য ফিতা (measuring tape) বা কাষ্ঠ ফলক (foot rule) কিনিতে পাওয়া যায়। সেই "মাপের কাঠি বা ফিতার সাহায্যে, মাপ করা শক্ত নয়। প্রত্যেক মাপ-ফিতা বা মাপ-কাঠিতে আজকাল ইংরাজী ফরাসী মাপ দেওয়া থাকে। যথা—

ইংরাজী মতে।

১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট (৩ ইঞ্চি=৪ আঙ্গুলি। ৯ ইঞ্চি=অর্দ্ধ
৩ ফুটে ১ গজ (ইয়ার্ড)
২২০ গজে ১ ফার্লঙ;
৮ ফার্লঙে বা ১৭৬০ গজে } = ১ মাইলে (২ মাইলে ১ ক্রোশ)
৩ মাইলে ১ লীগ

ফরাসী মতে।

১০ মিলি-মিটারে ১ সেন্টি-মিটার
১০ সেন্টি " ১ ডেসি "
১০ ডেসি " ১ মিটার
১০ মিটারে ১ ডেকা-মিটার
১০ ডেকা-মিটারে ১ হেকটো-মিটার
১০ হেকটো " ১ কিলো-মিটার

অর্থাৎ ১ মিলিমিটার =০·০৩৯৩৭ ইঞ্চি
১ সেন্টি-মিটার =০·৩৯৩৭ "
১ ডেসি মিটার =৩· ৯৩৭ "
১ মিটরে ৩৯·৩৭ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ গজ ৩·৩৭ ইঞ্চি

ইংরাজী যে মাপ থাকে, সেই মাপের কাঠি বা ফিতাতে, প্রত্যেক ইঞ্চিকে ষোল ভাগে ভাগ করা থাকে। এই এক একটি ভাগকে বাঙ্গলায় চলিত ভাষায় "এক সূতা" বলে। আমাদের দেশের চলিত মাপ গুলি এই ঃ—

ইংরাজী

১৪৪ বর্গ ইঞ্চি = ১ বর্গ ফুট
৯ বর্গ ফিটে = ১ বর্গ গজ
৩০।০ (সওয়া তিরিশ) বর্গ গজে = ১ বর্গ পোল
৪০ বর্গ পোলে = ১ বর্গ রুড
৪ বর্গ রুডে = ১ একর

জমীর মাপ কালীন শিকল (চেন) ব্যবহৃত হয়। এই শিকলের মাপ ২২ গজ। ইহাকে এক শত ভাগ করিয়া এক ভাগকে লিঙ্ক বলে।

ইংরাজী বর্গমাপ।

৫ শিকল দীর্ঘ × ২ শিকল প্রস্থ
=১০ " " ১ " "
=৪৪০ হাত × ৪৪ হাত
=১৯৩৬০ বর্গহাত
=১ একার
=সাড়ে তিন বিঘা আধকাঠা

ইংরাজী ঘনমাপ।

১৭২৮ ঘন ইঞ্চি = ১ ঘন ফুট
২৭ ঘন ফুটে = ১ ঘন গজ

বাঙ্গলা বর্গমাপ।

৪৭৬ বর্গ অঙ্গুলিতে = ১ বর্গহাত
১৬ " হাতে = ১ বর্গ ধুল
২০ " " = ১ " ছটাক
১৬ " ছটাকে / ৩২০ " হাতে } = ১ বর্গ কাঠা
৩৪০০ " " = ১ বর্গ বিঘা

৩ যবে = ১ অঙ্গুলি = ১ ইঞ্চি
৪ আঙ্গুলে = ১ মুষ্টি
৩ মুষ্টিতে = ১ বিঘৎ
২ বিঘতে বা ২৪ আঙ্গুলিতে } = ১ হাত = অর্দ্ধ গজ
৪ হাতে = ১ ধনু
২০০ ধনুতে = ১ ক্রোশ = ৪০০০ গজ
৪ ক্রোশে = ১ যোজন

দর্জ্জির মাপ

২৷৷০ (আড়াই) ইঞ্চি বা ৩ অঙ্গুলিতে } = ১ গিরা
৮ গিরাতে = ১ হাত
২ হাত বা ১৬ গিরাতে } = ১ গজ
২০ গজে = ১ থান

জমীর মাপ

৫ বর্গহাতে = ১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চায় = ১ ছটাক
৪ ছটাকে = ১ পোয়া
৪ পোয়ায় = ১ কাঠা
২০ কাঠায় = ১ বিঘা
৮০ হাতে = ১ রশি

ডাক্তারি কাযে এ সকল মাপের দরকার না থাকিলেও তুলনা করিবার জন্য সকল রকমের মাপই দেওয়া গেল।

ক্ষেত্রফল (কাঠাকালি) মাপ।—কোন জিনিষের লম্বার মাপ ও চওড়ার মাপকে গুণ করিলে যে অঙ্ক হয়—তাহাকেই ক্ষেত্রফল বলে। যেমন মনে কর একটা ঘরের দেওয়ালে কাগজ মারার দরকার হইয়াছে। কতটা কাগজ লাগিবে, কি করিয়া জানিবে? তাহার উত্তর সেই দেওয়ালটার লম্বা দিকের মাপ যদি ১০ ফুট হয় এবং চওড়া দিকের মাপ যদি ৫ ফুট হয় তবে ১০×৫=৫০ "বর্গ" ফুট (ইংরাজীতে "স্কোয়ার" ফুট বলে) সেই সমস্ত দেওয়ালের মাপ দাঁড়ায়।

সেই বুঝিয়া কাগজ কিনিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে—

(ক) লম্বা দিকের মাপকে, চওড়া দিকের মাপ দিয়া গুণ করিলে যে অঙ্ক হয়, তাহাকে বাঙ্গলায় "বর্গ" ফুট বা ইঞ্চি বা গজ বলে ইংরাজীতে ফুট, ইঞ্চি প্রভৃতির আগে "স্কোয়ার" কথাটি বসাইতে হয়।

(খ) ত্রিকোণ যায়গার বর্গ ফল ½ (উচ্চতা ×ভূমি)

ঘন ফল বা কোন জিনিষের আয়তন (Volume)। গোল, চতুষ্কোণ বা যে আকৃতির জিনিষই হউক না কেন তাহার আয়তন কত তাহা মাপিবার উপায় সেই জিনিষটির লম্বার মাপ চওড়ার মাপ ও খাড়াইয়ের মাপকে একত্রে গুণ করা। ঐ তিনটিকে গুণ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহাকে বাঙ্গলায় ঘন ফুট, ঘন ইঞ্চি, ঘন গজ ও ইংরাজীতে কিউবিক্ ইঞ্চি কিউবিক ফুট বা কিউবিক গজ বলা হয়। কিন্তু যে জিনিষটির ঘন ফল বাহির করা আবশ্যক, সেটি গোল বা ত্রিকোণও তো হইতে পারে। এই জন্য ঘন ফল বাহির করিবার সঙ্কেত এই যে

(ক) চতুকোণ জিনিষের বেলায়—লম্বা × চওড়া × খাড়াই

(খ) ত্রিকোণ " "—½ × তলার বর্গ ফল × খাড়াই

(গ) গোলক " "—পরিধি × ½ ব্যাসার্দ্ধ

(ঘ) লম্বা-গোল " "—তলার বর্গফল × খাড়াই

পুনরায় স্মরণার্থ বলিতেছি যে—

(ক) লম্বা × চওড়া=বর্গ বা স্কোয়ার ইঞ্চি প্রভৃতি

(খ) লম্বা × চওড়া × খাড়াই=ঘন বা কিউবিক ইঞ্চি প্রভৃতি

এইবার জিনিষের ওজনের কথা বলিব। জিনিষকে দুই রকমে ওজন করা যায়। এক উপায়—কোন এমন পাত্র করিয়া লইতে হয় যাহার গায়ে মাপ লেখা আছে; সেই পাত্রের মধ্যে তরল জিনিষকে ঢালিয়া কত মা হইল তাহা দেখিয়া লওয়া। অন্য উপায় হইতে একটা খালি পাত্রকে ওজন করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে জিনিষটিকে ঢালিয়া দাঁড়ি-পাল্লার সাহায্যে সেই পূ পাত্রটিকে পুনরায় ওজন করা। দ্বিতীয় বারের ওজ থেকে প্রথম বারের (খালি পাত্রের) ওজনটিকে বা দিলেই জিনিষের ওজন বুঝা যায়। আরো মাপিবা তৃতীয় পন্থা আছে—সেটি "আপেক্ষিক গুরুত্ব" বুঝাইবা বেলায় বলা যাইবে। এইখানে ওজনগুলি প্রথ দেওয়া গেল।

দেশী মাপ—কঠিন জিনিষ।

৫ ছটাকে = ১	কুনকে	৪ সিকিতে—১	তোলা
২ কুনকে = ১	খুঁচি	৫ সিকিতে—১	কাঁচ্চা
২ খুঁচিতে = ১	রেক	৪ কাঁচ্চায় বা ৫ তোলায়	১ ছটাক
২ রেকে = ১	পালি	২ পালিতে = ১	দোন
৪ পালিতে = ১	দোন	৪ ছটাকে	১ পোয়া
২ দোনে = ১	কাঠি	৪ পোয়ায়—১	সের = ৪০ হইতে ১১২ তোলা
৮ কাঠিতে = ১	আড়ি	৫ সেরে	১ পশুরি
২০ আড়িতে = ১	বিশি	৮ পশুরি বা ৪০ সেরে	১ মণ
১৬ বিশিতে = ১	কাহন		
৮ বিশিতে = ১	মণ		

বাঙ্গালাদেশে ঘটি-বাটি হিসাবে তরল জিনিষের মাপ করা হয় সেই মাপ ঠিক করিবার পূর্ব্বে সেই পাত্রটিকে ওজন করিয়া লইয়া পরে তাহাতে ঢালিয়া ওজন করিয়া সেই মাপ রাখা হয়। একারণ দুধের পোয়া ও তেলের পোয়া এক হয় না।

ইংরাজী ওজন।

কঠিন জিনিষ।		তরল জিনিষ।	
৮ ড্রামে	১ আউন্স	৬০ মিনিম্ (প্রায় ৬০ ফোঁটা)	=১ ড্রা
১৬ আউন্সে	১ পাউণ্ড (প্রায় অর্দ্ধ সের)	৮ ড্রামে	=১ আউন্স=৪৮০ মিনি
১৪ পাউণ্ডে	১ ষ্টোন	২০ আউন্সে	=১ পাই
২৮ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার	৮ পাইন্টে	=১ গ্যা
৪ কোয়ার্টারে	১ হন্দর		
২০ হন্দরে	১ টন		

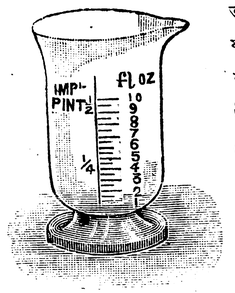

ঔষধ মাপিবার গ্লাস বাম দিকে পাইণ্ট ও ডানদিকে আউন্স দাগ দেওয়া।
চিত্র—৬

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity.)

আমরা ছেলে বেলায় প্রায়ই শুনিতাম—"বল দেখি, একমণ তুলা বেশী ভারী, না একমণ লোহ বেশী ভারী?" বলা বাহুল্য ঐটি ঠকান প্রশ্ন। বলা উচিত ছিল একমণ তুলা বেশী যায়গা লয়, না একমণ লোহ বেশী যায়গা লয়?

আমরা যদি কতকগুলি জিনিষ দেখি তবে বুঝিতে পারিব যে, সেগুলির আঁস বা অংশ ঘন কি ফাঁক ফাঁক। এই যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের ঘনত্ব ইহা চক্ষের সাহায্যে ঠিক করা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ—ঠিক সমান পরিমাণের জল, দুধ, ঘনদুধ, ঘি দেখিলে আমরা তখনই বলিয়া দিতে পারি যে জলের চেয়ে দুধ, দুধের চেয়ে (কাযেই জলেরও চেয়ে) ঘি ও ঘন-দুধ "ঘন" বা "পুরু"। অথচ ঘি জলে ভাসে। তাহার মানে যে ঘি জলের চেয়েও কম ঘন! আবার, কাঠ ও তামা বা যে কোনও ধাতু সমান অংশ লইলেও বুঝিতে পারি যে কাঠের চেয়ে ধাতু "পুরু" বা "ঠাস-বুনন"—অর্থাৎ কাঠের একটা কণা ও অপর একটা কণার মধ্যে যে ফাঁক আছে, তামার যে কোনও দুইটা কণার মধ্যে ততটা ফাঁক নাই। এই জন্য কাঠের ফাঁকের মধ্যে একটা পেরেক সহজে বসে, তামার ভিতরে বসে না! এই জন্য এক মাপের কাঠ ও তামা একই ওজনের নয়। কাঠ জলে ভাসে, তামা জলে ডুবিয়া যায়।

ছোট ছোট জিনিষ হইলে, দাঁড়ি পাল্লার সাহায্যে তাহাদের ওজন সহজেই ঠিক্ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি একটা হাতীকে ওজন করা দরকার হয় তবে কি করিব? ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না! ইহার উত্তর দিবার আগে একটি ছোট খাট বিবরণ নজর করিয়া দেখ:—

(১) একটি গেলাস, একটি প্লেট এবং একই মাপের কাঠ, লোহা, তামা, সীসা প্রভৃতি লও এবং একটি খুব ভাল দাঁড়ি পাল্লা জোগাড় কর। (২) দাঁড়ি পাল্লায় প্লেটের উপরে গ্লাসটি রাখিয়া, সেটিতে কাণায় কাণায় জল-ভর্ত্তি কর। কাণায় কাণায় এমন ভাবে জলভর্ত্তি করিবে যেন একটি ফোঁটা জল প্লেটে না পড়ে। এইবারে শূন্য প্লেট ও জলভর্ত্তি গেলাস শুদ্ধ ওজন কর (৩) তাহার পরে এইবারে ঐ জলভর্ত্তি গেলাসের মধ্যে খুব সাবধানে কাঠের টুকরাটি ছাড়িয়া দাও। কাঠ জলে ভাসে। এই কাঠের টুকরাটি ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে, কতকটা জল প্লেটে উপচিয়া পড়ে। আস্তে আস্তে গ্লাসটিকে তুলিয়া লইয়া জল সহ গ্লাসটিকে ওজন কর। ওজনে যাহা হইল, তাহা হইতে উপচিত জলভরা প্লেটের ওজন বাদ দিলে যে ওজন বাকী থাকে, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, সেই ওজনটিও যা, কাঠের টুকরার ওজনটিও তাই। কিন্তু লোহ প্রভৃতি যে সকল জিনিষ জলে ভাসে না তাহাদের দ্বারা যে জল উপচিয়া পড়ে সে জলের ওজন সেই সকল জিনিষের ওজনের সমান নয়। দেখা গিয়াছে যে সেই সকল জিনিষের ওজনকে উপছান জলের ওজন দিয়া ভাগ করিলে যে সংখ্যা থাকে সেই জিনিষ জলের চেয়ে তত গুণ ভারী।

তাহা হইলে, জলের ওজনের তুলনায় যে জিনিষের ওজন যত গুণ তাহাকেই সেই জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি বলে। জলের অপেক্ষা যে জিনিষের যাহা গুরুত্ব (ভারীত্ব) সেইটিই সেই জিনিষের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। একটা দৃষ্টান্ত দেখ।

একটুকরা লোহ যদি ৫৮৫ গ্রেণ ওজন হয়; এবং জলে সেটিকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইলে যদি ৫১০ গ্রেণ ওজনের জল উপচিয়া পড়ে, তবে ৫৮৫—৫১০=৭৫;

এই ৭৫ দিয়া ৫৮৫ কে ভাগ দিলে ৭.৮ সংখ্যা পাওয়া যায়। অতএব প্রমাণ হইল যে লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব — ৭.৮। ইহা হইতে এই বুঝিতে হইবে যে, যে আয়তনের লোহার টুকরাটি ওজন করা হইল, ঠিক্ সেই আয়তনের জলকে ওজন করিলে যাহা হইত তাহার তুলনায় লোহার টুকরাটি ৭.৮ গুণ বেশী।

কঠিন জিনিষের বেলায় যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করা যায়, তরল জিনিষের বেলাও তেমনি করা যায়। জলের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিকে ১ ধরিয়া লইয়া সেই অনুপাতে অপরাপর তরল জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপিত হয়।

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি জিনিষের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দিলাম।

কঠিন জিনিষ।

স্বর্ণ	১৯.৩০	দুধ	১,০৩
সীসা	১১.৩৫	সমুদ্রের জল	১.০২
রূপা	১০.৪৭	প্রস্রাব	১.০১০
তামা	৮.৮৭		
অ্যালুমিনিয়ম	২.৬৮		
কাচ	২.৫৮		
লবণ	২.২		

তরল দ্রব্যের স্বাভাবিক অবস্থা (অর্থাৎ, তাহার সাধারণ আপেক্ষিক গুরুত্ব) পরীক্ষা করিবার জন্য যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়। দুধ খাঁটি কি না (অর্থাৎ, দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক্ আছে কিনা), তাহা পরীক্ষা করিবার যে কাচের যন্ত্র আছে তাহাকে ল্যাক্‌টো মিটার বলে। প্রস্রাবের স্বাভাবিক অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য যে যন্ত্র আছে তাহাকে ইউরিন-মিটার বলে। দুধ যে রকম স্বাভাবিক ঘন, যদি তাহা হইতে মাটা তুলিয়া লওয়া যায় তবে দুধের ঘনত্ব কমিয়া যায়; কিন্তু যদি মাটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে দুধে জল মিশান যায় ও পালো বালির গুঁড়া, বাতাসা বা চিনি, সুজি প্রভৃতি মিশান যায়, তবে দুধের ঘনত্ব সমানই থাকে। খাঁটি দুধে জল মিশাইলে ল্যাকটো-মিটারের সাহায্যে তাহা ধরা পড়ে। ল্যাক্‌টোমিটারের গায়ে দাগই খাঁটি দুধের ঘনত্বের মাপ।

হাইড্রোমিটার (তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক। চিত্র—৭

চাপ।

যদি বেলুন বা এরোপ্লেনে করিয়া খুব উপরে উঠা যায় তবে হাঁপ লাগে, নাক দিয়া রক্ত পড়ে এবং জ্ঞান হারাইবার ভয় হয়। কারণ, আমরা যেখানে থাকি তদপেক্ষা ঊর্দ্ধদেশের বায়ু অত্যন্ত বিরল (পাতলা)।

যদি খুব গভীর খনির ভিতরে নামা যায়, তবে মনে হয় যেন কেহ কাণ দুইটি চাপিয়া ধরিয়াছে, মাথার উপরে অল্প অল্প বোঝা চাপাইয়াছে। ইহার কারণ আমরা যে সমতলে বাস করি, তাহার চেয়ে যত নিচে যাইব, সেখানে তত বেশী হাওয়ার চাপ।

যদি খুব বেশী জলের ভিতরে ডুব দেওয়া যায়, মনে হয় বুকটাকে কে যেন চাপিয়া ধরিয়া আছে।

যদি একটা গ্লাসে জলভর্ত্তি করিয়া মুখে একখানা পীচবোর্ড লাগাইয়া গেলাসটিকে উপুড় করিয়া ধরা যায় তবে পীচবোর্ড ও জল—কিছুই পড়ে না। ইনজেক্‌শন

জলের গেলাসের উপরের বা পার্শ্বের বায়ু উহার ভিতরের জলের উপরে চাপ দিতে পারে না বলিয়া, গ্লাসের মুখের কাগজটিকে নিচের বায়ুর চাপ ঠেলিয়া রাখে পড়িতে দেয় না। চিত্র—৮

দিবার ডাক্তারি সরুমুখ অ্যাম্পুলের শিশি উল্টাইলে এক ফোঁটা জল পড়ে না—কিন্তু কাৎ করিলেই পড়ে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপরের আঙ্গুলটি নলটির মুখকে বন্ধ রাখে (অর্থাৎ নলস্থ জলের উপরিস্থ বায়ুকে সরাইয়া রাখে) ততক্ষণ ঐ নল হইতে জল পড়ে না, কারণ উপরের বায়ু চাপের ক্রিয়া নাই, অথচ নিম্নের বায়ু চাপের ক্রিয়া আছে—কাযেই নিম্নের বায়ু চাপ নলস্থ জলকে ঠেলিয়া রাখে—পড়িতে দেয় না। চিত্র—৯

এই সকল গুলি হইতে কি বোঝা গেল? বোঝা গেল,যে হাওয়া চারিদিক হইতে আমাদিগের উপরে চাপ দিতেছে।

হাওয়া যে উপর দিক হইতে চাপ দেয় তাহার প্রমাণ, যত মাটীর নীচে যাওয়া যায় তত কাণে তালা ধরে, গা ভারি বোধ হয়।—ঠিক বেশী জলে নামিলে যেমন বোধ হয় সেই রকম বোধ হয়।

উপরের দিকে উঠিলে যে হাঁপ লাগে ও নাক দিয়া রক্ত পড়ে তাহার কারণ বায়ুর নিচের দিক হইতে উপরের দিকের চাপের হ্রাস। হাতের উপরে চুষিলে যে যায়গটা লাল হয়, তাহার মানে কি? যে বায়ুর চাপ চব্বিশ ঘণ্টা হাতের উপরে রহিয়াছে, চুষিয়া সেই চাপ কমাইলে, শিরগুলিতে বেশী রক্ত আসে। আমরা যখন মাটিতে থাকি তখন বায়ুর উপরের দিকের চাপ (ঠেল) আমাদের নাকের ও সমস্ত শিরাগুলিকে ঠেসিয়া বা চাপিয়া রাখে। উপরে উঠিলে ততটা বায়ুর চাপ কমিয়া যায়—চুষিলে যাহা হয় তাহাই হয়—কাযেই নাক দিয়া রক্ত পড়ে। এই জন্যই জলভরা গ্লাসের মুখের পীচবোর্ড ও অ্যাম্পুলের ভিতরের জল পড়ে না, যদি ঠিক উপুড় করিয়া (অর্থাৎ, এটুও কাৎ না করিয়া) উহাদিগকে ধরা হয়।

বায়ুর উপরদিকে ঠেল বা চাপ, নীচের দিকের চাপ না আর বুঝিলাম। এক্ষণে পার্শ্বদিকে বায়ুর যে চাপ আছে, তাহা বুঝান সহজ। একটা মুখ বন্ধ পাত্রে কোনও গ্যাস পুরিয়া লও। তাহাতে ঐ পাত্রটি ফাটে না—কেন, না তাহার ভিতরের গ্যাসের যে চাপ, তাহা সেই পাত্রটির চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর চাপের চেয়ে কম বা সমান। কিন্তু যদি উক্ত পাত্রটিতে উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহার ফলে তন্মধ্যস্থ গ্যাসটা বাড়িয়া সেই পাত্রটিকে ফাটাইয়া দিতে পারে। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্ত পাত্রস্থ গ্যাসটির চাপ তাহার বহিঃস্থ বায়ুর চাপের চেয়ে বেশী হইবে, সেই মুহূর্ত্তে পাত্রটি ফাটিয়া যাইবে।

এই পর্য্যন্ত গেল বায়ুর মত পদার্থের চাপের কথা। কঠিন দ্রব্যের চাপের কথা বুঝান সহজ। মাথায় উঠাইলেই, তাহার নিচের দিকের চাপ অনুভূত হয়।

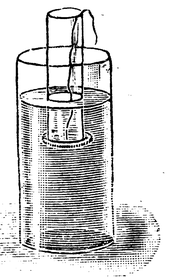

জল যে চতুর্দ্দিকে চাপ দেয় তাহার প্রমাণ। জলের উপর দিকে চাপ দিবার ক্ষমতা থাকার ফলে, চাকতিটি পড়িয়া যাইতেছে না।

চিত্র—১০

তাহার গায়ে ঘা মারিলেই বুঝা যায় যে সহজে তাহার দাগ বসিতে দেয় না।

তরল জিনিষের চাপের কথা আমাদিগের নিকটে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। জলের ভিতরে নামিলে বিশেষ করিয়া লবণাক্ত সমুদ্র জলে নামিলে, আমরা ভাসিয়া উঠি কেন? কারণ, বায়ু চাপের মত, জল ও উপরের দিকে চাপে বা ঠেলে। জলের ভিতরে একটু বেশী করিয়া নামিলে, জলের যে উপরের ও আশেপাশের চাপ আছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই জন্য ডুবুরিরা বেশীক্ষণ জলের নিচে থাকিলে তাহারা তাহার চাপে কষ্ট বোধ করে। এইবারে ঘোলা জলের কথা ছাড়িয়া পাইপের মধ্যে যে জল থাকে তাহার কথা বলিব। যাঁহারা টালার জলের বন্দোবস্ত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অত উঁচুতে জল রাখার উদ্দেশ্য হইতেছে

এই যে, অত উঁচু বাড়ীতেও জল পৌছাইবে। অর্থাৎ যত বেশী উঁচু থেকে জল ছাড়া যায়, প্রায় তত উঁচুতে অথবা তত তোড়ে নলের মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে। এই মোটা কথাটা লইয়া ডুস ও "নাড়ী"র (pulse) একটু আলোচনা করিব।

ডুস।—এ জিনিষটি আর কিছুই নয়—কেবল পেটের মধ্যে জল প্রবেশ করাইবার ছোট-খাট চৌবাচ্ছা-কল। মলদ্বার বা যোনি পথে জল দিয়া ধুইবার জন্য ডুসের প্রয়োজন। পূর্ব্বে ডুসের বদলে এনিমা সিরিঞ্জ্ নামে একপ্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ডুসে থাকে একটা জল ধরিবার পাত্র (ডুস-ক্যান), খানিকটা (৩ হইতে ৬ ফুট লম্বা) রবারের নল, আর মলদ্বারে বা যোনি পথে প্রবিষ্ট করাইবার মত কাঁচকড়ার (vulcanite) নল বা রবারের ক্যাথিটার। কোন উঁচু যায়গাতে ডুসের জলপাত্রটিকে বসাইয়া বা টাঙাইয়া, তাহার তলার দিকের নলমুখে রবারের নলটি লাগাইয়া, রবারের নলের অপরদিকে

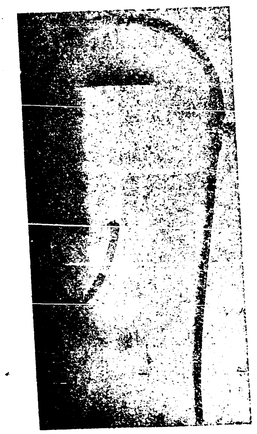

ডুস, রবারের নল ও ক্যাথিটার সমেত।

মলদ্বারের বা যোনি পথের জন্য যে কাঁচকড়ার নল আছে সেটি লাগাইলেই ডুসটিকে ঠিক্ করিয়া খাটান হইল। এই ডুসের জলপাত্রেরগায়ে লেখা ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা সেই ডুসক্যান বা পাত্রে কত পাইণ্ট জল ধরে, তাহা থাকে। সাধারণতঃ, তিন পাইণ্ট (২ সের) জল, একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের পেটের ভিতরে, তাহার মলদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট করান যায়। ডুসটিকে যত উঁচুতে টাঙান হইবে, তত জোরেই মলদ্বারের ভিতর জল যাইবে। পেটের ভিতর খুব তোড়ে জল গেলে তৎক্ষণাৎ বেগে সেই জল বাহির হইয়া আসিবার কথা; তাহা ছাড়া, তত বেশী জোরে জল প্রবিষ্ট হইলে ভিতরে ব্যথা অনুভূত হয়। এই কারণে ২।১ হাতের বেশী উঁচু করিয়া ডুসক্যানটিকে ধরিতে নাই।

পূর্ব্বে, হিগিন্‌সনের এনিমা সিরিঞ্জ নামক পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বারে জল প্রবিষ্ট করান হইত। এই পিচকারীর মাঝখানের হাওয়া-পোরা বলটিতে চাপ দিলে সজোরে পেটের মধ্যে জল যাইত। তাহাতে রোগীর কষ্ট হয়। এ কারণে আজকাল উক্ত এনিমা সিরিঞ্জ একরকম উঠিয়া গিয়াছে। বায়ুর উপর হইতে নিচের দিকে যে চাপ আছে, সেই চাপের ফলে ডুস দিয়া আজকাল মলদ্বার ধৌত করান হয়।

পেটের উপরিভাগে, বাম দিকে পাকস্থলী বলিয়া যন্ত্রটি আছে, আমরা যাহ কিছু খাই প্রথমে সেই খানে জমে। বিষ খাইলে, প্রথমে ঐ খানেই বিষটি গিয়া পড়ে এই জন্য বিষ খাইলে পেট ধুইবার দরকার হয়; তাহাকে পাকস্থলীর ধৌতি (stomach washing) বলে। ঐরূপ করিবার জন্য মুখ দিয়া, গলার ভিতর দিয়া, পেটের মধ্যে একটা মোটা নল চালাইয়া দেওয়া হয়। ঐ নলটি প্রচুর পরিমাণে সুধু জল বা ঔষধের জল দ্বারা পাকস্থলীটিকে ভর্ত্তি করা হয়। নলের মধ্যে জল ঢালিতেই, তাহা পাকস্থলীর মধ্যে যায় না। এই যে পাকস্থলীটাকে কতকটা জলে পূর্ণ করিয়া লইয়া, মধ্যে জল থাকিতে থাকিতেই, নলটিকে টান করিলেই, পেটের মধ্যে যত জল আছে, সে সব জল বাহির হইয়া আসে। তাহার কারণ বায়ুর অবঃ ঐ জলকে চুষিয়া বাহির করে, কিন্তু যদি ঐ নলটি থা

থাকে (অর্থাৎ তাহার মধ্যে হাওয়া থাকে) আর উহাকে উপুড় করা হয় তবে তাহা পেটের ভিতরকার পাকস্থলীর জল টানিয়া বাহির করিতে পারে না। এ কথাটি বেশ নজর করিবার ও ভাবিবার কথা। পাকস্থলী জলপূর্ণ থাকে এবং নলটিও জল পূর্ণ থাকে, অর্থাৎ, যদি নলের মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জলে ভর্ত্তি থাকে—এক ফোঁটা হাওয়া কোথাও না থাকে, তবেই নলটি উপুড় করিলেই পেটের শেষ ফোঁটা জলটি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িবে—তাহার কারণ ঐ স্থলে বায়ুর নিচের চাপ জলটিকে চুষিয়া বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু যদি পাকস্থলী জলে ভর্ত্তি থাকে অথচ নলটি বায়ু পূর্ণ থাকে, তবে সে নলটিকে উপুড় করিলে, পেটের ভিতরকার একফোঁটা জলও বাহির হয় না—কারণ এস্থলে বায়ুর উপরকার ও নিচেকার উভয় দিকের চাপই সমানভাবে কায করিতেছে।

তরল জিনিষের চাপের কথার সঙ্গে, আমাদের দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। যাঁহারা একটু এনাটমী (দেহতত্ত্ব) জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে আমাদের দেহের মধ্যে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড বলিয়া একটি পাম্পের মত যন্ত্র আছে। উহার দুই দিকে দুইটি রাস্তা আছে—একদিক দিয়া ময়লা রক্ত এক রকম আপনিই গড়াইয়া গড়াইয়া হৃৎপিণ্ডে ঢুকিতেছে—অপর দিক দিয়া সজোরে ঐ হার্ট রক্ত ছিট্‌কাইয়া বাহির করিয়া দিতেছে। এই হার্টের যে দিক দিয়া রক্ত ঢোকে, সে দিককার নলকে শিরা বা ভেন (vein) বলে। আর যে দিককার নলের ভিতরে হার্ট সজোরে রক্ত ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দেয় সে দিককার নলকে ধমনী বা আর্টারী বলে। আর্টারী নামক নলগুলি বেশ স্থিতিস্থাপক—অর্থাৎ জোরে তাহার ভিতরে কিছু ঠাসিয়া দিলে, সে নলটি ফাটে না—তখনকার মত বড় হয় এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ আকৃতি ধারণ করে। যদি একটা জলপূর্ণ স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত নলের কোনও অংশে আরো একটু জল ঠাসিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে নলের সেই অংশটি স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মের বশে তখনই বাড়ে এবং পূর্ব্বের আয়তন লাভ করে। এইরূপে, যে বেশী জলটুকু তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করে সেটুকু কোথায় যায়? উপরের অংশের ধাক্কা খাইয়া সে জলটুকু ঐ নলের নিচের অংশে গেল; সেখানেও নলের সেই অংশটাকে প্রথমে জোর করিয়া ফুলাইয়া জলটুকু তাহার মধ্যে ঢুকিল; নলের সেই অংশটুকু ও আবার পূর্ব্ববৎ কোঁচ্‌কাইয়া গেল; তাহার ফলে জলটুকু আরো নামিয়া গেল। ফল কথা—হৃৎপিণ্ড একবার সজোরে যে একটু রক্ত আর্টারির প্রথমাংশে ঢুকাইয়া দেয়, আর্টারির স্থিতিস্থাপক গুণ থাকার ফলে, অনবরত সেই রক্তটুকু আর্টারির ভিতর দিয়া নিচুদিকে অগ্রসর হইতে থাকে; ঐ ভাবে অগ্রসর হইবার ফলে, ঐ সমস্ত আর্টারিটার একদিক হইতে অপর (নিচু) দিকে চাপের ঢেউ খেলিতে থাকে। আর মণিবন্ধে আঙ্গুলের মৃদু চাপ দিলে হৃৎপিণ্ডের ধাক্কার ফলে ও ধমনী স্থিতিস্থাপক গুণের ফলে প্রবাহমান অতিরিক্ত রক্তটুকুর যে ধাক্কা আসিয়া লাগে, তাহাকেই আমরা নাড়ী বা pulse বলি।

যদি মণিবন্ধে বা অপর কোথাও কোনও ধমনী বা আর্টারির উপরে সমমূত্রে বা পাশাপাশি তিনটি আঙ্গুল রাখিয়া অল্প অল্প চাপ দিতে থাক ত দেখিবে যে, কোন কোন লোকের বেলায় নাড়ীকে সামান্য আঙ্গুলের চাপে একেবারে নিবাইয়া দেওয়া যায়; আবার কাহারো কাহারো দেহে বেশী চাপ দিলে তবে নাড়ী নিবিয়া যায়। শেষোক্ত ব্যক্তির বেলায় ঐরূপ হইবার কারণ হইতে পারে, প্রথমতঃ হয় নাড়ীর (আর্টারির) গা আর তেমন স্থিতিস্থাপক নাই, নতুবা দ্বিতীয়তঃ নাড়ীর ভিতরে এত রক্ত ঠাসিয়া আছে, যে একটু বেশী চাপ না দিলে উহাকে নিবান যায় না। এই যে নমনীয়তার হ্রাস + ঠাসিয়া রক্ত থাকা এই দুইয়ের মিশ্রণে যে ফল দাঁড়ায়, তাহাকে অধিক মাত্রায় ব্লাড্-প্রেসার বা রক্তের চাপাধিক্য বলে। এখন এই কথা দুইটির তফাৎ বেশ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর:—

(১) নাড়ী কি?—ইহার উত্তর:—হার্ট হইতে ধাক্কা দিয়া যে বেশী রক্তটুকু আর্টারির মধ্যে পুরিয়া

দেয়, সেই ধাক্কাটি আর্টারির গা দিয়া আসিয়া আঙ্গুলে লাগে—আর সেই অধিকমাত্রা রক্তের ধাক্কাই হইল নাড়ী।

(২) রক্তচাপ কি?—আর্টারির কতকপরিমাণে নমনীয়তা হ্রাসের সঙ্গে রক্তাধিক্য। এই দুইটিই তরল-জিনিষের যে চাপ আছে তাহার প্রমাণ।

উত্তাপ।

দাঁড়িপাল্লায় যেমন ওজন করা যায়, তেমনি পারার সাহায্যে উত্তাপ মাপা যায়। অর্থাৎ একটা জিনিষের ভিতরে তাপ কত আছে সেটা মাপিবার জন্য পারার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শুধু উত্তাপ কেন, বায়ুর চাপ, রক্তের চাপ এ সকলও পারার যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক করা হয়।

থার্ম্মোমিটার।—যে পারার যন্ত্রের সাহায্যে উত্তাপ মাপা যায় তাহাকে ইংরাজীতে থার্ম্মোমিটার ও বাঙ্গালার তাপমান যন্ত্র বলে। থার্ম্মোমিটার অনেক রকমের আছে। রোগীর গায়ের তাপ মাপিবার যন্ত্রকে ক্লিনিক্যাল থার্ম্মোমিটার বলে স্নানের জলের উত্তাপ মাপিবার তাপমাস যন্ত্রকে বাথ-থার্ম্মোমিটারব লে। ইত্যাদি।

জ্বর মাপিবার থার্ম্মোমিটারে ৯৫ ডিগ্রি হইতে ১১০ ডিগ্রি দাগ দেওয়া থাকে। ডিগ্রি বুঝাইতে হইলে এই রকম করিয়া লেখে—৯৫°, ৯৭°, ৯৯° ইত্যাদি। প্রত্যেক দুইটি ডিগ্রির মাঝে চারিটি করিয়া ছোট ছোট দাগ থাকে; সে গুলিকে ডু পয়েণ্ট বলে। সেগুলিকে এমনিভাবে লিখিতে হয়:—

৯৫° ৯৫°২, ৯৫°৪, ৯৫°৬, ৯৫°৮, ৯৬°

প্রত্যেক থার্ম্মোমিটারের ৯৮°৪ এই স্থানে একটি তির → চিহ্ন দেওয়া থাকে। বিলাতের লোকের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮°.৪ বলিয়া, ঐখানে ঐ তিরটি থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ ৯৬° হইতে ৯৮° পর্য্যন্ত। বিলাতের লোকের গায়ের উত্তাপ ৯৮.৪; এই অনুপাতে লোকের কি উত্তাপে কি বুঝায় তাহা নিচে লিখিয়া দিলাম:—

৯৬° হইতে ৯৭° = সাব্-নরম্যাল।
৯৭°৪ হইতে ৯৮° = নরম্যাল।
৯৮°—১০১° = সামান্য জ্বর।
১০১°—১০৫° = বেশী জ্বর (হাই ফিভার)
১০৫°—১১০ = অতিমাত্রায় জ্বর (হাইপার-পাইরেক্সিয়া)

সাধারণতঃ লোকে থার্ম্মোমিটারটিকে বগলে লাগায়, কিন্তু বগলের চেয়ে মুখে, জীবের নীচে, অথবা, মলদ্বারের ভিতরে পুরিয়া জ্বর দেখাই সবচেয়ে ভাল। কারণ কলেরার মত অবস্থায়, রোগীর বগলে যখন থার্ম্মোমিটারের পার ৯৫° দেখায় হয় ত সেই মুহূর্ত্তে মলদ্বারে থার্ম্মোমিটার দিলে ১০৫° দেখায়! মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, বগলের চেয়ে মুখে ও মলদ্বারে অন্ততঃ একডিগ্রি বেশী উঠে।

আধ মিনিট, এক মিনিট, দুমিনিট ও পাঁচ-মিনিট ওয়ালা নানা রকমের থার্ম্মোমিটার পাওয়া যায়। কিন্তু নিতান্ত কচি ছেলে বা ছটফট করিতেছে এমন রোগী ব্যতীত, সকলেরই বেলায় অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া থার্ম্মোমিটারটিকে রাখা উচিত। যদি কেহ মনে করে যে বেশী ক্ষণ ধরিয়া থার্ম্মোমিটারটিকে রাখিলে বেশী উত্তাপ উঠিবে—তবে তাহা ভুল ধারণা। কাচের মধ্যে পারাটি একবার তাতিয়া উঠিলে, উত্তাপ যাহা উঠিবার তাহা পুরা উঠিবেই—তাহার পরে যত বেশীক্ষণই থার্ম্মোমিটারটিকে রাখা যাউক না কেন, আর উঠিবে না।

নাড়ীর কথা বলিবার সময়ে এই কথা না আসিলে এই প্রসঙ্গে নাড়ী ও জ্বরের সম্বন্ধের কথা বলিব। বন্ধে যে নাড়ী পাওয়া যায় তাহা

সুস্থশরীরে নাড়ী, এক মিনিটে ৭০ বার স্পন্দিত হয়।

৯৯°	জ্বরে	„	৮০	„
১০০°	„	„	৯০	„
১০১°	„	„	১০০	„

১০২°	জ্বরে এক মিনিটে	১১০	বার স্পন্দিত হয়।
১০৩°	„ „	১২০	„
১০৪°	„ „	১৩০	„
১০৫°	„ „	১৪০	„

টাইফয়েড জ্বরে নাড়ী অনুপাতে বাড়েনা—বরং আস্তে চলে।

এদেশে যত থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হয় তাহা ফারেণহিট নামক লোকের মাপের অনুযায়ী দাগ করা। বিলাতে সেণ্টিগ্রেড্ নামক অপর মাপের থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হয়।

সেণ্টিগ্রেডমতে ০° ডিগ্রিতে জল জমিয়া বরফ হয়।
ফারেনহীটের ৩২° “ „ „
সেণ্টি গ্রেডের ১০০° „ জল ফুটিতে থাকে
ফারেন্ হীটের ২১২° „ „ „

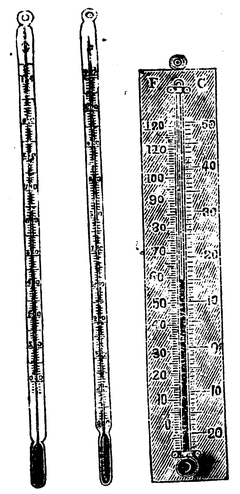

তিনটি তাপমান যন্ত্র। তন্মধ্যে, বড়টির ডানদিকে সেণ্টিগ্রেড্ স্কেল ও বাম দিকে ফারেনহাইট্ মতে তাপের হার দেখান হইয়াছে।

চিত্র—১১

জন্ম-রহস্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গর্ভিণীর শুশ্রূষা।

অনেকে স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থাকে “দশমেসে ব্যায়রাম” বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, নারীরা গর্ভের বৎসরে দশমাস রোগ ভোগ করে বলিয়া তাহাদিগকে বারমাস রোগ ভোগ করিতে হয় না,—কিন্তু এই ধারণার ফলে অনেক নারী নানাপ্রকার স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। অনেক রমণী গর্ভাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনায় অথবা নিজ বিবেচনানুসারে আপনাকে “রোগী” মনে করেন, নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদা অত্যন্ত চিন্তা করেন, এমন কি আহার বিহারের সাধারণ ব্যবস্থার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু এইরূপ আচরণ কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। সুস্থ ও সবল নারীর গর্ভাবস্থায় শারীরিক নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিহিত ব্যবস্থার অনুসরণ করা হইতেছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই যথেষ্ট। যে সকল কার্য্য স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার পরিপন্থী, গর্ভাবস্থায় সে সমুদায় কার্য্য করা কখনই সঙ্গত নহে; কারণ তদ্দ্বারা গর্ভিণী এবং গর্ভ শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। সুস্থ অবস্থায় মহিলাদিগকে শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, গর্ভাবস্থায় রমণীদিগের বিশেষ যত্নসহকারে সেই সকল নিয়ম পালন করা উচিত। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে, তাহারা স্বাস্থ্য-নীতি লঙ্ঘনের অধিকার

লাভ করে না, এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীদিগের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করাই সঙ্গত; দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার করা কখনই উচিত নহে। কিন্তু আহার সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি এবং বাড়াবাড়িও অসঙ্গত। গর্ভাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, ফলের সরবৎ প্রভৃতি তরল পদার্থ পান করা যাইতে পারে, কারণ তদ্দ্বারা বৃক্ক (Kidneys) ও মূত্রস্থালীর (Bladder) ক্রিয়ার অনেকটা আনুকূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু চা, কফি এবং অন্যান্য উদ্দীপক পানীয় অধিকমাত্রায় পান করা উচিত নহে।

যাহাতে চর্ম্ম ও বৃক্কের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, গর্ভাবস্থায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভিণীদিগকে এই সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। গর্ভিণীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে যষ্টিমধুর ন্যায় মৃদু রেচক দ্রব্য সেবন ও শিলে-বাটা কিস্‌মিস্ মিশ্রিত তপ্ত দুগ্ধ পানের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা আবশ্যক। বৃক্কের (Kidneys) ক্রিয়া যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হয়, পানীয় দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। শীতল জল বা যবচূর্ণ মিশ্রিত জলই এইরূপ ক্ষেত্রে আশু ফলদায়ক। শরীরাভ্যন্তর পরিষ্কার এবং লোমকূপসমূহ মুক্ত রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্নান করা আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় সাধারণভাবে স্নান বন্ধ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে পরিষ্কার গরম জলে জননেন্দ্রিয় ধুইয়া পরিষ্কার করা উচিত। গর্ভাবস্থায় যোনি হইতে প্রদরজাত স্রাব আরম্ভ হইলে, প্রত্যহ বিষদোষ নাশক ঔষধ (Boracic Acid Powder অথবা Sodi Citras) মিশ্রিত জলের পিচকারী দিয়া জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার করা উচিত।

গর্ভিণীর উদরে কোনরূপ চাপ যাহাতে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি গর্ভিণীর উদর দুলিতে থাকে, তাহা হইলে (abdominal belt) বা উদর-বন্ধনী (বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়) ব্যবহার করান আবশ্যক। এই বন্ধনী ব্যবহারের ব্যবস্থা এরূপ সুন্দর যে, বন্ধনীটি নিম্নদিক্ হইতেই উদরটিকে আশ্রয় দান করে।

গর্ভাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার কঠোর ব্যায়াম স্ত্রীলোকদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে গর্ভিণী যাহাতে নিয়মিতরূপে গৃহস্থালীর কার্য্য করে, তদ্বিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত করা উচিত। তাই বলিয়া গর্ভিণীকে অধিক আয়াস-সাধ্য কর্য্যের ভার দেওয়া কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। মুক্ত স্থানে নিয়মিতরূপে ও অল্প পরিমাণে ব্যায়াম গর্ভিণীর স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ আবশ্যক,—এই ব্যবস্থা গর্ভসংসৃষ্ট স্বাস্থ্যনীতির অনুমোদিত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গর্ভের শেষাশেষি আবস্থায় দূরপথ পদব্রজে ভ্রমণ, যানে আরোহণ, বেশী উঠা-নামা, বহুক্ষণ ধরিয়া শারীরিক বা মানসিক ব্যায়াম কখনই সঙ্গত নহে।

গর্ভিণী-গমন সঙ্গত কি না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠিতে পারে। বিষয়টি গুরুতর ও প্রণিধানযোগ্য। যে সকল রমণীর পূর্ব্বে গর্ভস্রাব হইয়া সন্তান নষ্ট হইয়াছে, গর্ভাবস্থায় তাহাদিগের পুরুষ-সংসর্গ কোন মতেই সঙ্গত নহে। কিন্তু যে সকল নারী সুস্থ ও সবল, তাহারা গর্ভবতী হইলেও গর্ভকালের প্রথমার্দ্ধে তাহাদিগের পুরুষ-সংসর্গ নিষিদ্ধ নহে। তবে গর্ভিণীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে মৈথুনকালে অযথা বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহারা গর্ভিণী-গমন পাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন। যাহাতে গর্ভিণীর মন অত্যন্ত উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ ও বিষাদে অবসন্ন না হয়, তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জননীর মনে নানারূপ ভাবের যে তরঙ্গ উঠে, গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর তাহার প্রভাব যে অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হইয়া যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা লোকের সহিত সৎ ব্যবহার, নির্জ্জনে সাধু-চিন্তা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান্ ও অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র-কন্যা জননের

প্রবল অভিলাষ মনের মধ্যে পোষন করা বিশেষ ফলদায়ক। গর্ভিণীর অপ্রীতিকর মানসিক অবস্থার জন্য যদি তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আহার-নিদ্রা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

গর্ভাবস্থায় স্তন দুইটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সময়ে যাহাতে স্তনদ্বয়ের উপর কাঁচুলী, ব্লাউস ও গুরু পরিচ্ছদের অযথা চাপ না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ গর্ভাবস্থায় ঐ সকল পরিলে স্তনের অভ্যন্তরস্থ স্তন্যস্রাবী গ্রন্থিসমূহের (Mammary glands) পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে এবং স্তনবৃন্ত দুইটিও যথা সময়ে সংগঠিত হইতে পারে না। গর্ভাবস্থার শেষ মাসে, স্তনবৃন্তের চর্ম্ম কঠিন ও স্থূল হইতেছে কি না এবং যথাযথ বৃন্ত দুইটি উদ্গত হইয়াছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য গর্ভিণীকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। গর্ভিণী এ বিষয়ে যথাযথ উপদেশ না পাইলে, সে নবপ্রসূত সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে গিয়া দেখিতে পাইবে যে, শিশুর আকর্ষণে স্তনের চর্ম্মের স্থানে স্থানে ছড় গিয়াছে এবং ছোট ছোট ক্ষত হইয়াছে। সময় সময় এই প্রকার ক্ষত হেতু স্তনে বড় বেদনা হয়, আর স্তনবৃন্ত যথাযথ গঠিত না হইলে শিশুও মাই মুখে লইতে পারে না। স্তনের বোঁটার চামড়া শক্ত করিবার জন্য প্রত্যহ সম পরিমাণে এল্‌কোহল (Alcohol) বা অডিকোলন মিশ্রিত জলে, দুইবার করিয়া স্তনবৃন্ত ধুইয়া ফেলা উচিত। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে একটু গ্লীসারীন্ ঘষিয়া লইলেও মন্দ হয় না। স্তনের বোঁটা বহির্ম্মুখী করিবার জন্য, স্ত্রীলোকদিগকে প্রত্যহ কয়েকবার ধীরে ধীরে স্তনবৃন্ত টানিতে উপদেশ দেওয়া উচিত। স্তনের বৃন্ত আকর্ষণ করিবার সময় নখ কাটা ও হাত পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। আর এ বিষয়ে কোন জবরদস্তি করাও সঙ্গত নহে। কারণ বেশী জোরে স্তনবৃন্ত আকর্ষণ করিলে স্তনের উপর ক্ষত হইতে পারে। ঐরূপ ক্ষত বিষাক্ত হইলে, (mastitis) জৎক্ষত-প্রদাহ রোগ জন্মিতে পারে।

প্রসব-বেদনা।

গর্ভিণীর যে শারীরিক ক্রিয়ার ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ জরায়ু হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ বা নির্গত হয় তাহাকে (Labour) প্রসব-বেদনা, চলিত ভাষায় "পোয়াতীর ব্যথা" বলে। জরায়ু-কোষের সঙ্কোচনই প্রসব বেদনার প্রত্যক্ষ কারণ। এই সঙ্কোচন হেতু পরিবর্দ্ধিত অণ্ডাণু বা ভ্রূণ—জরায়ু-কোষ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় দশম মাসের প্রথমে বা মাঝামাঝি সময়ে জরায়ুর সঙ্কোচন ও প্রসব বেদনা হইয়া থাকে।

মোটামুটি প্রসব-বেদনার তিনটি অবস্থা। প্রথম অবস্থায় জরায়ু-মুখ (Cervical Canal) মটরের ন্যায় ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া, সিকি, আধুলি ও টাকার ন্যায় ছিদ্র করিয়া উন্মুক্ত হয় এবং প্রথম অবস্থার শেষাশেষি সময়ে তাহার মধ্যে হস্ত মুষ্টি পর্য্যন্ত প্রবেশ করান যাইতে পারে; তদ্দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের বাহির হইবার সুবিধা ঘটে। এই জন্য এই অবস্থাকে সম্প্রসারণের অবস্থা বলে। প্রসব বেদনার দ্বিতীয় অবস্থায় ভ্রূণ জননেন্দ্রিয়ের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যোনিনালী দিয়া বাহির হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহাকে নিষ্ক্রমণাবস্থা বলে। তৃতীয় অবস্থায় ভ্রূণের আনুষঙ্গিক "ফুল," এবং সাময়িক আবরণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্ম্মাদি নির্গত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাকে পুষ্পপতনের বা 'ফুলপড়ার' অবস্থা বলে।

প্রসব বেদনার ক্রমিক অবস্থা।

প্রথমাবস্থা।

জরায়ুর যন্ত্রণাদায়ক প্রথম আকুঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমাবস্থার সূচনা এবং জরায়ু মুখের পূর্ণ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার সমাপ্তি। যে সময়ে জরায়ু-মুখ খুলিয়া যাইতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই ভ্রূণের আবরণ-কোষটি ফাটিতে আরম্ভ করে ও সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে এক-প্রকার ঘোলা জলবৎ রস (Amniotic fluid) নির্গত হইতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এই দুইটিই সমসাময়িক

ঘটনা। প্রাথমিক প্রসূতি বা প্রথম পোয়াতীদিগের এই প্রথম অবস্থা উত্তীর্ণ হইতে বার হইতে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। কিন্তু একাধিক সন্তানবতী প্রসূতিদিগের এ অবস্থা ছয় হইতে আট ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়।

প্রথমাবস্থা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় অবস্থার আরম্ভ এবং সন্তানের জন্মগ্রহণের সঙ্গেই উহার সমাপ্তি।

দ্বিতীয়াবস্থা।

প্রাথমিক প্রসূতিরা এক হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে এই অবস্থা অতিক্রম করে; একাধিক সন্তানবতী প্রসূতিদিগের এই অবস্থা অতিক্রম করিতে দশ পনর মিনিটের অধিক সময় লাগে না।

স্বাভাবিক ভাবে তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিতে দিলে এই ব্যাপারে যে কত সময় লাগিতে পারে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা বড়ই কঠিন।

তৃতীয়াবস্থা।

কেন না, কতিপয় কারণ বশতঃ স্বাভাবিক ভাবে ফুল ও চর্ম্মস্থলী পড়িতে দেওয়া হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন, স্বাভাবিক ভাবে ফুল পড়িতে দিলে, ঐ কার্য্যে এক হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে। কিন্তু এ অনুমান ঠিক নহে, স্বাভাবিক উপায়ে পুষ্পনির্গমে আরও অধিক সময় লাগিতে পারে। স্বাভাবিক চেষ্টায় ফুলটি জরায়ু হইতে বিশ্লিষ্ট হয় এবং তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া যোনি-প্রণালীর মধ্যে আসে। তখন তলপেটের উপরিভাগে চাপ দিলে ফুল নির্গত হয়। এইরূপ প্রচেষ্টায় ফুল পড়িতে সাধারণতঃ বারো হইতে পনর মিনিট সময় লাগে। কখনও কখনও আধ ঘণ্টা পরেও পড়িতে দেখা যায়। জরায়ু হইতে ফুঁল বাহির না হওয়া পর্যান্ত ধাত্রীকে প্রতীক্ষা করিতে হয়।

প্রসবকালে কার্য্য প্রণালী।

সূতিকা-গৃহটি যাহাতে বৃহৎ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হয়, এবং তন্মধ্যে অবাধে বায়ু ও আলোক সঞ্চারিত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সূতিকা-গৃহের যে স্থানে সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করে সেই স্থানে গর্ভিণীর পালঙ্ক স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্ণে রৌদ্র বাতায়ন-পথে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভিণীর শয্যার উপর পতিত হইবে। শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র আসিয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। গর্ভিণীর শয়নের জন্য স্প্রীংযুক্ত খাট উপযোগী নহে। খাটখানি উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া তদুপরি মাদুর সতরঞ্চি কম্বল তোষক প্রভৃতি বিছাইয়া এবং বালিস যথা স্থানে রাখিয়া শয্যা রচনা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন একটি প্রকাণ্ড কলসীতে প্রচুর জল রাখিতে হইবে। হস্তাদি প্রক্ষালন, বিষ দোষনাশক ঔষধ মিশ্রিত জলের সংস্থান, প্রসূতির অঙ্গমার্জ্জনার জন্য ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড সমূহ ভিজাইয়া রাখিবার জন্য এবং প্রসবকালে ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি রাখিবার জন্য চারিটি পোর্সেলেনের বেসিন বা অভাবপক্ষে মাটির অথবা কলাই-করা গামলা আবশ্যক। প্রসব সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য ব্যবহারার্থ প্রচুর পরিমাণে শীতল ও গরম জল সূতিকাগারে রাখিতে হইবে। গর্ভিণীর অন্তর্ধৌতির প্রয়োজন হইতে পারে; সুতরাং তজ্জন্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম ও একটি প্রশস্ত শয্যা-পাত্র (Bedpan) খাটের তলে রাখিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে জল গরম করিবার জন্য সূতিকা-গৃহের নিকটে আগুন করিয়া রাখিতে হইবে। প্রসব-কালে যে দ্রব্য ও পাত্রগুলি ব্যবহৃত হইবে সেগুলিকে পূর্ব্বে উত্তমরূপে মাজিয়া ঘষিয়া কার্ব্বলিক সাবান বা সোডার জলে ধুইয়া রাখিতে হইবে। নবজাত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি এবং গর্ভিণীর ব্যবহার্য্য বন্ধনী প্রভৃতি একটা দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে; বর্ষা বা শীত কাল হইলে সেগুলি আগুণের নিকটে টাঙাইয়া রাখিবে, তাহা হইলে সেগুলি বেশ গরম থাকিবে। প্রসবান্তে প্রসূতির যোনিদ্বারের উপর স্যানিটারী তোয়ালে নামক এক প্রকার তোয়ালে, পশম নির্ম্মিত ছোট ছোট গদী এবং তলপেট বাঁধিবার উপকরণসমূহ হাতের নিকট

রাখা এবং প্রসব বেদনা আরম্ভ হইবামাত্র একটি বড় গামলাতে বিষ-দোষ-নাশক (Disinfectant) ঔষধ জলে ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

প্রসবের পূর্ব্বে গর্ভিণীকে গরম, পাতলা ও ঢিলা পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিতে হয়। পরিচ্ছদ শিথিল বা ঢিলা থাকিলে উহা অনায়াসে খুলিয়া লইতে পারা যায়। প্রসবান্তে প্রসূতির ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার শাড়ী ও অন্যান্য পরিচ্ছদ রাখা আবশ্যক।

গর্ভিণীর প্রসব বেদনার সূচনামাত্রেই তাহাকে বিরেচক ঔষধ সেবন করান উচিত। এ অবস্থাটি সর্ব্বত্র অলঙ্ঘনীয়। এই উদ্দেশ্যে ক্যাষ্টর অয়েল, লিকোরিস্ পাউডার (যষ্টি মধুর গুঁড়া দুধের সহিত), ক্যাসকারা সাগরাডা ব্যবহার করাই সঙ্গত। প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির মলনালী পরিষ্কার রাখিবার জন্য পিচকারী দেওয়ান আবশ্যক। প্রসব বেদনা প্রবল হইয়া উঠিলে পিচকারী দ্বারা মল নিঃসারণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই ব্যবস্থানুসারে কাজ করিলে প্রসব-বেদনার দ্বিতীয় অবস্থায় সঞ্চিত মল নিঃসৃত হইয়া গর্ভিণীর বস্তিদেশ মললিপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রসব বেদনার সময় গর্ভিণীকে ঘন ঘন প্রস্রাব করান আবশ্যক। বিষ-দোষ-নাশক ঔষধ মিশ্রিত গরম জলে বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া এই সময়ে জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগ ভাল করিয়া মুছিয়া দিতে হয়। স্বভাবতঃ প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে পিচকারী দ্বারা যোনির অভ্যন্তর ভাগ ধৌতি করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে জরায়ুমুখ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং ভ্রূণের মস্তক বস্তিদেশের নিম্নাংশে সরিয়া আসে।

প্রথম অবস্থায় কর্ত্তব্য

গর্ভিণী চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে এবং বসিয়া থাকিলেও জরায়ুমুখ বিস্তার-কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং গর্ভিণীকে বলিয়া কহিয়া তাহকে চলাফিরা করান বিশেষ আবশ্যক। তদ্ভিন্ন প্রসব বেদনার প্রথমাবস্থায় যাহাতে অকস্মাৎ 'পানি মুচি' ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ প্রথমেই 'পানিমুচি' না ভাঙ্গিলে জরায়ুমুখ খুলিবার খুব সুবিধা হইয়া থাকে। প্রসব বেদনার প্রথম গর্ভিণী দাঁড়াইয়া থাকিলে মূত্রস্থালীর সঙ্কোচনের ফল সন্তান প্রসবের পক্ষে খুব অনুকূল হয়। কারণ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণী শক্তি গর্ভস্থ ভ্রূণের নিম্নাভিমুখী গতিকে আরও বর্দ্ধিত করে। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে দাঁড়াইয়া থাকিবার ও চলাফিরা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবার প্রায় প্রয়োজন হয় না। কারণ ঐ সময়ে গর্ভিণী শুইয়া না থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই অধিক সোয়াস্তি বোধ করে। কিন্তু সকল গর্ভিণীর প্রথমাবস্থায় "পানিমুচি" ভাঙ্গা একেবারে বন্ধ করা যায় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভিণীকে শয্যায় শুয়াইয়া রাখিয়া এবং প্রসবের জন্য "বেগ দেওয়া" বন্ধ করিয়া পানিমুচি ভাঙ্গা নিবারণ করা যাইতে পারে।

গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াই দ্বিতীয় অবস্থার পরিণতির প্রধান ঘটনা।

দ্বিতীয় অবস্থায় কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অবস্থার প্রথমে, অর্থাৎ ভ্রূণের মস্তক যোনির দ্বারে আসিবার পূর্ব্বে গর্ভিণীর পক্ষে অন্যের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। এই অবস্থায় গর্ভিণীকে শয্যায় রাখিতে হয়। গর্ভিণী তখন প্রসবের জন্য স্বয়ং বেগ দিয়া মূত্রস্থালীর সঙ্কোচন কার্য্যে সাহায্য করিতে পারে। তজ্জন্য গর্ভিণীকে এই সময়ে ছেলে হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়া বেগ্ দিতে বলিতে হয়। এই কার্য্যের সুবিধার জন্য খাটের পাদদেশের বা শিয়রের দিকে খাটের সঙ্গে একখানি তোয়ালে বা গামোছা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। গর্ভিণী দুই হাতে ঐ তোয়ালে বা গামোছা ধরিয়া টানিয়া কোঁথ দিলে, খুব সুবিধা হয়।

ভ্রূণের মস্তক যে সময়ে যোনি-দ্বারে দেখা দেয়, ঠিক সেই সময়ে ধাত্রী, বা ধাত্রীবিদ্যাবিদ চিকিৎসকের সহায়তার খুব প্রয়োজন। এই সময়ে ধাত্রী বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি ভ্রূণের নির্গমনে সহায়তা করিবেন এবং যাহাতে

গর্ভিণীর যোনি ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী পায়ুপস্থ সেবনী নামক ক্ষীণ মাংস-রজ্জু (Perineal Raphe) ছিঁড়িয়া না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এই সময়ে গর্ভিণী নিজ বাম ভাগ চাপিয়া শয্যার উপর শুইয়া থাকিবে এবং তাহার নিতম্ব শয্যার প্রান্তভাগ অতিক্রম করিয়া বাহিরে পড়িবে। এই সময়ে তাহার পদদ্বয় উপরের দিকে তুলিয়া ধরিয়া, উভয় পদের মধ্যে একটি বালিস দিয়া পা দুইটি ফাঁক করিয়া রাখিতে হইবে। এই সময়ে ধাত্রী কিংবা প্রসবকর্ত্তা পদদ্বয়ের পার্শ্বে এবং নিতম্বযুগলের সমতল-ভাবে দাঁড়াইয়া গর্ভিণীর উদরের উপর বাম হস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক উদরটিকে গর্ভিণীর উরুযুগলের মধ্যে এমনভাবে লইয়া আসিবেন, যে প্রয়োজন মাত্রেই ভ্রূণের অগ্রগামী মস্তকটি অঙ্গুলি দ্বারা ধরিতে পারা যাইবে। জরায়ুর আকুঞ্চন মাত্র গর্ভিণীকে কাতরতাসূচক শব্দ করিতে বলা উচিত ; কিন্তু ঐ সময়ে বেগ দিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপ করাতে জরায়ুর আকুঞ্চন-শক্তি যদি হ্রাস পায় এবং ভ্রূণের মস্তক বাহির না হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই ভাল। কিন্তু আকুঞ্চন যদি প্রবল হইয়া শিশুর মাথা বাহির করিয়া ফেলে, তবে সে অবস্থায় মস্তকটি যাহাতে সুবিধামত বাহির হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা ভিন্ন ধাত্রী বা তৎস্থানীয় চিকিৎসক আর কিছুই করিতে পারে না। কারণ ঐ অবস্থায় ভ্রূণের মস্তক ভিতরে ঠেলিয়া দেওয়া সুপরামর্শ-সিদ্ধ নহে। এই সময়ে বাম হস্তের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা ভ্রূণের মস্তক ধরিয়া বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতে হয়, এবং মাথাটি যাহাতে সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় এমন অবস্থায় সেটিকে রাখিতে হয়। যতক্ষণ না, মাথার পৃষ্ঠদেশ বা গ্রীবার উপরিস্থিত প্রদেশ বাহির হইয়া আসে, ততক্ষণ এইরূপ সতর্কতা সহকারে ভ্রূণ মস্তক আকর্ষণ করিতে হয়। এই সময়ে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির সাহায্যে ভ্রূণমস্তকে চাপ দিলে মাথাটি দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের মস্তক বাহির হইয়া আসে।

যদি ধাত্রীরা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জরায়ুর আকুঞ্চনের বা প্রসব বেদনার বেগ হ্রাস করিতে পারেন, তাহা হইলে বেদনা থামিবামাত্র, গর্ভিণীর গুহ্য দেশে পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চাপ দেওয়া ধাত্রীদিগে কর্ত্তব্য। চাপটি যাহাতে কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য ভ্রূ মস্তক অনেক পরিমাণে নিম্নে ঝুঁকিয়া পড়া আবশ্য কেননা মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিবার পূর্ব্বে চাপ দি ভ্রূণ পুনর্ব্বার জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যদি ভ্রূণ-মস্তক অনে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে, তাহা হইলে ধাত্রী পুনর্ব্বার ব্যথা না উঠা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হ তার পর ব্যথা উঠিলে আবার প্রসব করাইবার চে করিতে হইবে। যদি ভ্রূণের মস্তক পর্য্যাপ্ত পরিমা নিম্নাভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু প্রসব কার্য্যে ব হইতে থাকে, তাহা হইলে, গর্ভিণীকে তখন অল্প বেগ দিতে বলিতে হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে গর্ভিণী অল্প বেগ দিলেই ভ্রূণের মাথা বাহির হইয়া আসে।

ভ্রূণের মাথা বাহির হইলেই, উহার নাড়ী গ জড়াইয়া আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা ধাত্রী প্রসবকারকের প্রথম কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পরী যোনি-মধ্যে দুইটি অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া ভ্রূ গলাটি ঠিক করিয়া লইয়া উহার চারিদিক অঙ্গু দ্বারা স্পর্শ করিলেই গলায় নাড়ী জড়ান আছে কি বুঝিতে পারা যায়। নাড়ী সন্তানের গলায় জ থাকিলে, কোন কৌশলে নাড়ীর পাক খুলিয়া দি হয়, নচেৎ নাড়ীটা হয়ত এমন ছোট থাকে যে এ হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ নাড়ীর এ পাক নীচের দিকে টানিয়া আনিয়া মাথার উপর দি সরাইয়া বা গলাইয়া দিয়া পাক খুলিয়া দেওয়া য যদি ভ্রূণের গলায় নাড়ী জড়ান না থাকে, কিংবা নাড়ীর পাক খুলিয়া দেওয়ার পর স্পষ্ট বুঝা যায় নাড়ীর স্পন্দন বেশ চলিতেছে, তাহা হইলে ভ্রূ প্রসব করার জন্য তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে। মাথা বাহির হইবার প্রায় আধ মিনিট পরে আর বার জরায়ুর সঙ্কোচনের ফলে ব্যথা উঠে। সঙ্গে

শিশুর স্কন্ধ দুইটি বাহির হইয়া পড়ে। যে সময় স্কন্ধ দুইটি নামিয়া আসিতে থাকে, তখন মস্তকটি দুই উরুর সম্মুখের দিকে তুলিয়া ধরিতে হয়। তাহাতে স্কন্ধের পশ্চাদ্ভাগ মূলাধার-পীঠিকার (Perineum) উপর আসিয়া পড়ে। তাহার পর মাথাটি একটু পশ্চাতের দিকে সরাইয়া স্কন্ধের সম্মুখভাগ পশ্চাৎ হইতে বাহিরে আনিতে হয়। এ কৌশলে দুইটি স্কন্ধ বাহির হইলে, মস্তক ও স্কন্ধদ্বয় সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিলে ভ্রূণের সমস্ত শরীর বাহির হইয়া আইসে। তখন নব প্রসূত সন্তান তীক্ষ্ণ স্বরে কাঁদিয়া সকলের নিকট আপনার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে। নূতন খোকাকে মায়ের বিপরীত দিকে মুখ করাইয়া "ডান কাতে" শোয়াইতে হয়, এবং যাহাতে নাড়ীতে টান না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। নাড়ীর স্পন্দন-ক্রিয়া বন্ধ হইলে জাতকের উদরের দুই ইঞ্চি উপরে সেটিকে সূতা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিতে হয় এবং বাঁধনের একটু উপরে নাড়ী একখানি সুতীক্ষ্ণ কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। ইহাকেই চলিত কথায় নাড়ী কাটা বলে। নাড়ীর অন্য প্রান্তে সূতা বাঁধিবার কোন প্রয়োজন হয় না;—কেবল কাটিবার সময় (চিত্র-প্রদর্শিত মত) দুইটি আঙুল দিয়া একটু টিপিয়া ধরিলেই হইল। বিশেষভাবে স্মরণ থাকে যেন—বাঁশের চাঁচ, ভোঁতা ছুরী প্রভৃতি অন্য কোন জিনিষ নাড়ী কাটার জন্য ব্যবহৃত না হয়; তীক্ষ্ণধার কাঁচি ব্যবহার করাই উচিত এবং উহা যেন পূর্ব্বাহ্নে গরম জলে ১০।১৫ মিনিট কাল ফুটান হয়।

[শিশুর নাড়ী কি করিয়া কাটিতে হয়।]

যাহা হউক, এই সময় নাভীর উপরে ও ক্ষতস্থানে বোরাসিক এসিড্ পাউডার ছড়াইয়া উদরের উপর দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, খোকাকে একখানি কাঁথা বা কম্বলে জড়াইয়া তাহার শয্যায় রাখিতে হয়। ছেলে হইবার পর প্রসূতিকে আর 'কাত' করিয়া না রাখিয়া তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইতে হয়। এই সময়ে ধাত্রীর সহচরী বা ডাক্তারের অনুচর প্রসূতির জরায়ুর প্রান্তভাগে হস্তস্থাপন করে। তৃতীয় অবস্থার শেষ অর্থাৎ ফুল পড়া পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ ভাবে জরায়ুর উপর হাত রাখিয়া উহার আকুঞ্চন প্রসারণ লক্ষ্য করিতে হয়, জরায়ু প্রান্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক উহার আকুঞ্চন ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে এবং জরায়ুমধ্যে যাহাতে ঘনীভূত রক্ত সঞ্চিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। যে সকল গর্ভিণীর সন্তান প্রসূত হওয়ার পর অতি মৃদুভাবে জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে থাকে, অথবা যাহাদিগের জরায়ুর আকুঞ্চন ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়, তাহাদিগের জরায়ুগুহায় রক্ত

সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। ধাত্রীর সহচরী গর্ভিণীর জরায়ুর প্রান্তে হাত রাখিয়া উহার উদরমধ্যে প্রবেশও লক্ষ্য করিয়া থাকে। জরায়ু উদর মধ্যে উঠিলেই বুঝা যায় 'ফুল'টি পড়িয়া গিয়াছে। ঠিক নাভীর নীচে জরায়ুর উপরের দিকের প্রান্ত ভাগটি বাঁকাইয়া চাপিয়া ধরিয়া মেরুদণ্ডে স্পৃষ্ট করিয়া রাখিলেই, জরায়ু প্রান্তে হস্ত রাখার কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয়। তাহা হইলে সমস্ত জরায়ুটি হাতের নীচে আসে। জরায়ু-গর্ভ হইতে ফুলটি বিশ্লিষ্ট হইলে, একবার জরায়ুর পশ্চাতের দিকে আর একবার নীচের দিকে চাপ দিলে শীঘ্র ফুল পড়িয়া যায়। এই কৌশলে জরায়ু নীচের দিকে যোনি নালীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং ফুলটি উহার সম্মুখের দিকে সরিয়া পড়ে। ফুল পড়িবার পর, উহাকে আনুষঙ্গিক ঝিল্লীর সহিত একটি পরিষ্কৃত পাত্রে (সাধারণতঃ মাটির সরায়) পরীক্ষার জন্য রাখিতে হয়। ফুল পরীক্ষা করিলে উহার কোন অংশ জরায়ু বা যোনি মধ্যে আছে কি না জানিতে পারা যায়।

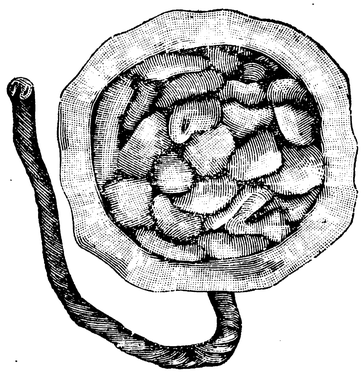

[ফুলের নীচের দিক, যে দিক জরায়ুর গায়ে সংশ্লিষ্ট থাকে।]

ফুল পড়িবার পর, যোনি বা জননেন্দ্রিয় এবং উরুদেশের রক্ত ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা এবং এবং মলাদিযুক্ত বস্ত্রখণ্ডসমূহ সরাইয়া ফেলা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। গর্ভিণীর জননেন্দ্রিয়াদি প্রক্ষালন জন্য অপেক্ষ কৃত মন্দবীর্য্য লাইসল্ সলিউসান ব্যবহার করাই ভাল। অঙ্গপ্রক্ষালনের পর, জননেন্দ্রিয়ের উ তোয়ালে বা পশমিনা গদী রাখিয়া বন্ধনী দিয়া করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। তোয়ালে প্রভৃতি ভিজা থাকে, সুতরাং ব্যবহার করিবার সময় নিঙ্গড়াইয়া লইতে হয়। তোয়ালে—পশ্চাতে নিত উপরিভাগ পর্য্যন্ত এবং সম্মুখে উদরের উপর টানিয়া দিতে হয়। ইহার পর বন্ধনী দ্বারা বাঁধন দি হয়। স্তনযুগলের নিম্নদেশ হইতে উরুদ্বয়ের প্রায় অ পর্য্যন্ত বাঁধন দিতে হয়। বন্ধনীর চাপ এরূপ ভাবে রাখি হয় যে, জরায়ুটি তদ্দ্বারা নিম্নগামী হইয়া (pelvis কুক্ষিগত থাকে। এই কাজটি শেষ হইলে প্রসব সং কর্ত্তব্য শেষ হয় এবং প্রসূতিও শান্তি লাভ করে।

সূতক-কাল।

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি যে স ধীরে ধীরে সুস্থ ও সবল হইতে থাকে, তাহা

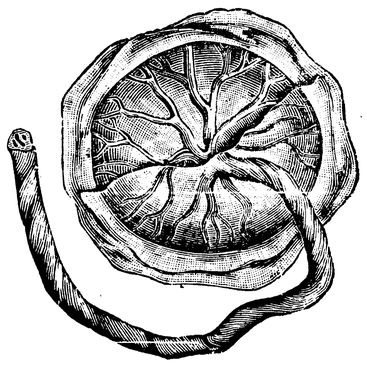

[ফুলের উপর দিক, যাহা সন্তানের দিকে ফিরান ও যাহার শী কেন্দ্রের সহিত "নাড়ী" যুক্ত থাকে।]

সাধারণতঃ সূতক কাল বলে। তবে সূক্ষ্মভাবে বি করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রসবের পূ অবস্থার পর হইতে জরায়ু কোষের সম্পূর্ণ স্বাভা

অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সময়—অর্থাৎ প্রসবের পর দেড়মাস পর্য্যন্ত সূতককাল। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূতকস্রাব বন্ধ হইলেই—অর্থাৎ প্রসবের দশ বার দিন পরেই সূতক কালের অবসান হয়।

শিশুর জন্ম এবং ফুলপড়ার অব্যবহিত পরে, প্রসূতি যেরূপ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে তাহা পূর্ণ গর্ভাবস্থায় রমণীরা কল্পনাও করিতে পারে না। সূতিকাগারে থাকিবার সময় প্রসূতি সাধারণতঃ বিরাম সুখভোগ এবং ক্লেশের অবসান হেতু তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। নানা ক্লেশজনক গর্ভাবস্থায় এরূপ তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কোনমতেই সম্ভবপর নহে। প্রসবান্তে, রক্তক্ষয় ও যন্ত্রণা ভোগ হেতু প্রসূতির পিপাসা প্রবল হইয়া থাকে। তাই প্রসবের পর প্রসূতি ক্রমাগত জল খাইতে চাহে। প্রসবের পরে প্রায় বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রসূতির প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়, ঐ সময়ে তাহাকে প্রস্রাব করিতে বলিলে সে প্রস্রাব করিয়া মূত্রস্থালী শূন্য করিয়া ফেলিতে পারে। যে কয়দিন প্রসূতি শয্যাগত থাকে, সে কয়দিন স্বভাবতঃ মলত্যাগের বেগ অনুভূত হয় না। শয়ানাবস্থা, উদরের পেশী সমূহের শিথিলতা এবং উদরের অভ্যন্তরে বিসদৃশ চাপ বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে

প্রসবের পর, জরায়ুর সঙ্কোচ বশতঃ মাঝে মাঝে তলপেটে তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। এই বেদনা এদেশে "হাঁদলের ব্যথা" নামে পরিচিত। নূতন প্রসূতিরা এই বেদনা অনুভব করে না; কিন্তু যে সব প্রসূতির একাধিক সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রসবের পর "হাঁদলের ব্যথায়" কষ্টভোগ করিয়া থাকে। স্তন-যুগলের পরিসর বৃদ্ধি এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারকালে প্রসূতিরা স্তনমধ্যে সূচিবেধ তুল্য ঈষৎ তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। স্তন যদি দুগ্ধের চাপে অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে স্তনে বড় বেদনা হয়। প্রসূতিকে যখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে দেওয়া হয়; তখন সে মাংসপেশীসমূহের দুর্ব্বলতা হেতু অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার শরীর যে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, শয্যায় শুইয়া থাকিবার সময় প্রসূতির সে বিষয়ে কোন ধারণাই থাকে না। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা অধিক দিন থাকে না, অল্পকালের মধ্যেই প্রসূতি তাহার স্বাভাবিক বল, উৎসাহ ও উদ্যম পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সূতককালে প্রসূতিকে লঘুপাক, রুচিকর এবং পর্য্যাপ্ত আহার্য্য প্রদান করা আবশ্যক। প্রথম দুই দিন

সূতককালে আহার। বলকারক তরল খাদ্যই প্রসূতির উপযোগী। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে তৃতীয় দিন প্রসূতিকে অল্প পরিমাণে দুই তিনবার কঠিন অথচ লঘু খাদ্য এবং আনুষঙ্গিক পানীয় প্রদান করা যাইতে পারে। তৃতীয় দিনের পর হইতে প্রসূতির আহারের ব্যবস্থা আরও উত্তমরূপে করিতে হয় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিতে হয়। কিন্তু প্রসূতি যতদিন শয্যাগত থাকে, ততদিন তাহাকে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর অল্প-পরিমাণে কয়েকবার করিয়া খাদ্য প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক। ভোজ্য দ্রব্যগুলি যাহাতে নানাপ্রকার হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টিরাখা বিশেষ আবশ্যক। শোণিত স্রাবের বাহুল্য, বা পূর্ব্ব পীড়া নিবন্ধন যে সকল প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহাদিগকে সবল রাখিবার জন্য পানীয় হিসাবে অল্প পরিমাণে পুরাতন সুরা দেওয়া যাইতে পারে।

মূত্রাশয়। সন্তান প্রসবের পর ২৪ ঘণ্টাকাল মূত্রাশয়ের উপর দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। প্রসূতি যাহাতে ষোল ঘণ্টার মধ্যে ২।১ বার প্রস্রাব করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

মলকোষ্ঠ। প্রসবের পর, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে অথবা তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা যাইতে পারে। যদি মলত্যাগের বেগ স্বভাবতঃ না হয় তাহা হইলে পিচকারী করিয়া মলস্থলী মধ্যে সাবান জল দেওয়া আবশ্যক।

সুস্থ সবল রমণীরা সন্তান প্রসব করিবার পর, তাহাদিগের যোনি-নালী ও জরায়ুতে পচন ক্রিয়া চলিতে

অন্তর্ধৌতি। পারে না, বিনা পরীক্ষাতেও ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু যে সকল রমণীর জননেন্দ্রিয়ে পরিশেষে 'ব্যাক্‌টিরিয়া' বা কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদিগের যোনি মধ্যে বাহির হইতেই কীটাণু প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং কীটাণু-বিসর্প এবং সূতকস্রাবের পচন নিবারণার্থ শোষণশীল কার্পাসে (Absorbent cotton) নির্ম্মিত ছোট ছোট গদি রিষদোষ নাশক (antiseptic) ঔষধে ভিজাইয়া যোনিদ্বারে সন্নিবেশিত করিতে হয় এবং ঘন ঘন ঐ গদি বদলাইয়া দিতে হয়। যে সকল রমণী বলিষ্ঠ এবং সুস্থ, প্রসবের পর তাহাদিগের যোনির অন্তর্ধৌতি করিবার প্রয়োজন হয় না।

শয্যায় বিশ্রাম। এবং সূতকস্রাব জলের ন্যায় বর্ণহীন হইয়া সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়, ততদিন প্রসূতিকে শয্যায় শুইয়া থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ প্রসবের পর দশ বা দ্বাদশ দিনে প্রসূতি শয্যাত্যাগ করিবার উপযুক্ত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ঐ সময়ে বিশেষ গুরুতর কারণ ভিন্ন শয্যায় থাকিবার প্রয়োজন হয় না। প্রসবান্তে প্রসূতির বিশ্রামের পর, ১০।১২ ঘণ্টা পরে দুগ্ধ বেশী না থাকিলেও নবজাত শিশুকে স্তন টানিতে দেওয়া উচিত; ইহাতে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার কার্য্যের সুবিধা হয়, জরায়ুর স্বাভাবিক সঙ্কোচনে সহায়তা করা হয় এবং সন্তানটিরও ঐ দুগ্ধগত কলোষ্ট্রাম নামক রেচক দ্রব্য খাইয়া কোষ্ঠ সাফ করিবার সুযোগ ঘটে। প্রসবের পর যত দিন পর্য্যন্ত না স্তনে

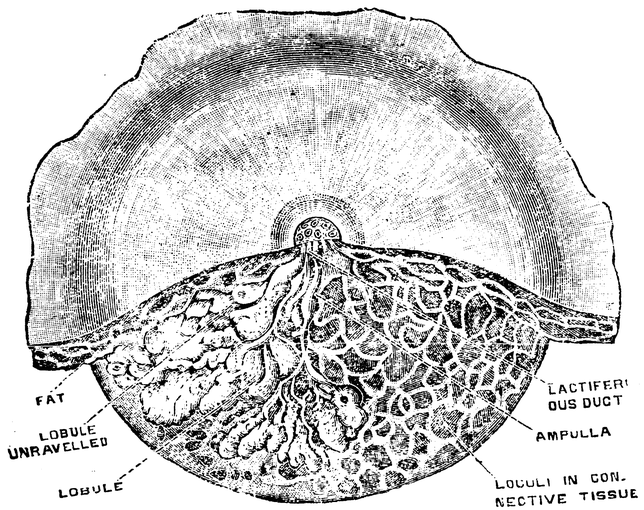

স্তনের অর্দ্ধভাগের চর্ম্ম অপসৃত করিয়া নীচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বির থলি ও দুগ্ধবহ নালিকাগুলি দেখান হইয়াছে।]

যতদিন না ক্ষতগুলি সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায়, জরায়ু যথাপূর্ব্ব সঙ্কুচিত হইয়া উদর-গহ্বরে প্রবেশ করে

দুগ্ধ আইসে, ততদিন দিবসে অতি সামান্য ব্যবধানে চারিবার শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

স্তন্যদান রীতি। স্তনে পরিমিত দুগ্ধ সঞ্চার হইবার পর, দিবাভাগে দুই ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রিকালে চারি পাঁচ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যপান করাইতে হয়। স্তনপান করাইবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনের বৃন্ত বা বোঁটা গরমজলে ধুইয়া ফেলা উচিত। স্তনেরবোঁটায় যে দুগ্ধ শুকাইয়া অম্লরসযুক্ত হইয়া থাকে তাহাই ধুইয়া ফেলিবার জন্য প্রথমবারে স্তনের বৃন্তটি প্রক্ষালন করা হয়। কারণ ঐ বিকৃত দুগ্ধে শিশুর অপকার হইতে পারে। স্তনবৃন্ত হইতে দুগ্ধ ধুইবার জন্য দ্বিতীয়বারে স্তনবৃন্তটি প্রক্ষালন করা হয়, কারণ যাহাতে দুগ্ধ লাগিয়া না থাকিতে পারে সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কেননা স্তনের বৃন্তে সংলগ্ন দুগ্ধ পচিয়া স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থিসমূহে এবং দুগ্ধ নালীতে বিষক্রিয়া ঘটাইতে পারে। স্তন যদি গ্রন্থিযুক্ত, স্ফীত এবং কোমল বোধ হয়, তাহা হইলে একভাগ হরিদ্র-বর্ণ মোম এবং আটভাগ জলপাই তৈল উত্তমরূপে মিশাইয়া এবং উহা একখণ্ড ফ্লানেলীতে মাখাইয়া স্তনের উপর লাগাইয়া দিলে উহার প্রতীকার হয়। যদি স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ অল্প হয়, তাহাতে প্রসূতিকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য ও উহার মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াইয়া দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তবে প্রসূতির পরিপাক শক্তির যাহাতে কোনরূপ বিকার না ঘটে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রসূতির আহারের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

নিদ্রা। যাহাতে শীঘ্র প্রসূতির শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূরীভূত হয় তজ্জন্য তাহার প্রচুর ও প্রগাঢ় নিদ্রা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রকৃতিই প্রসূতির সম্পূর্ণ অনুকূল; যেহেতু প্রসবের পর, সূতকাবস্থায় কোন প্রসূতির নিদ্রা হইতেছে না, এরূপ অবস্থা প্রায় দেখা যায় না। তবে বিশেষ কোন কারণে এই অবস্থায় প্রসূতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

হাঁদলের ব্যথা। যে সকল প্রসূতির জরায়ুর মধ্যে 'চাপবাঁধা' রক্ত থাকে তাহারাই প্রসবের পর হাঁদলের ব্যথায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। সুতরাং জরায়ু মধ্য হইতে সঞ্চিত রক্ত বাহির করিয়া ফেলাই যন্ত্রণার প্রতীকারের প্রধান উপায়। এই জন্য জরায়ুটি অল্পে অল্পে টিপিলে এবং সঙ্কুচিত করিলে ঘনীভূত রক্ত সাধারণতঃ নির্গত হইয়া যায়। যে সকল প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যপান করায় না, তাহারা অত্যন্ত তীব্র 'হাঁদলের ব্যথায়' আক্রান্ত হইলে উহার প্রতীকারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করিতে পারে।

(সমাপ্ত)

সমালোচনা।

প্রভাতী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বারো আনা। আলোচ্য পুস্তকখানি গদ্য-পদ্যের গীতি-কাব্য। ভক্তের হৃদয়ে বিমল শুভ্র প্রভাতে যে সকল চিন্তা স্বতঃ জাগ্রত হয়—যে সকল উচ্চভাব আসিয়া হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে, গ্রন্থকার নিজ জীবনের মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন কষ্ট-কল্পনা নাই—লোক-মনোরঞ্জনকর বিনান বাক্যচ্ছটা নাই; ইহা revealation য়ের মত পবিত্র, উপভোগ্য ও একটা অপার্থিব জ্যোতিঃমণ্ডিত। আমাদের বড় ভালো লাগিয়াছে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র; জীবনকালে মহর্ষি স্বীয় পৌত্রের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলনীতি—বিশ্বজনীন্ জ্ঞান, ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি—কেমন করিয়া ভগবদেচ্ছায় সাধিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাই তৎকালীন্ বালক পৌত্রের নিকট কথাচ্ছলে পরিব্যক্ত করিতেন; ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেগুলি একান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই বক্তৃতাগুলি বর্ত্তমান নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন; এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। পুস্তকখানির সমালোচনা কি করিব—পুস্তকখানি পড়িলে মনে হয় যেন মহর্ষি পুনরায় বাঙ্ময় হইয়া সম্মুখে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রত্যেকটি বিষয় এমন নিখুঁত সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ করা সঙ্কলয়িতার অসীম লিপিচাতুর্য্য ও শ্রুতিধৃতির পরিচায়ক। পুস্তকখানি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার পুনঃ পুনঃ পাঠ করা উচিত।

আলোচনা

ভূস্বর্গে কলেরা।—

কাশ্মীর রাজ্য ভূস্বর্গ বলিয়া পরিচিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, নারী সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর ভূস্বর্গই বটে। কিন্তু সেই স্বর্গে কলেরার এত প্রাদুর্ভাব কেন? প্রায় প্রতি বৎসরই সংবাদ পাওয়া যায় যে, কাশ্মীরে কলেরা রোগে বহু লোক মরে। এবারও দেখা যাইতেছে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কলেরা রোগ সেখানে সংক্রামকভাবে বর্ত্তমান ছিল, এখন কমিতেছে। ৩০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, কেবল সেই এক সপ্তাহেই ১৫১৯ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৮৫৭ লোক মরিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সপ্তাহেও তাহা হইলে অনেক লোক নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে। ইহাই কি ভূস্বর্গের লক্ষণ? সকলেই জানেন, প্রধানতঃ পানীয় জল দূষিত হইয়া কলেরা রোগ বিস্তৃত হয়। আজ কালকার দিনে দূষিত পানীয় জল শোধিত করিয়া লওয়া কঠিন নহে—জল শোধন করিবার অনেক বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্ততঃ জল ফুটাইয়া লইলেও অনেকটা শোধিত হইতে পারে। অথচ, প্রতি বৎসরই বিস্তর লোক কলেরায় মরে। সুতরাং বেশ প্রতীতি হয় যে, লোক-শিক্ষার অভাবই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। কাশ্মীর গবর্মেণ্টের উচিত কাশ্মীরবাসীকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, বিশেষতঃ কলেরার প্রাদুর্ভাব সময়ে জল শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে বাধ্য করা।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা।—

৮ কাশীধামে সম্প্রতি দুইটী সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল—একটী ১৩ মাইল ও আর একটী ৫ মাইল। গত ৭ই জুন ১৩ মাইল প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে কাশীর হেল্‌থ ইউনিয়ন ক্লাবের মিঃ কে, সি, চক্রবর্ত্তী ৪ ঘণ্টা ৪ মিনিটে এই ১৩ মাইল সন্তরণ করিয়া প্রথম হন। ২২জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৮জন লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়স্ক বালক শ্রীমান পি, সি, বাগচি ৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়া যুগ্ম স্থান অধিকার করেন। আর ৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৩২টি বালক যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স্ক এইচ, সি, দাস প্রথম হন। কলিকাতা ও কাশীতে সন্তরণ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে চলিতেছে, ইহা বেশ সুখের বিষয়। দেশের সর্ব্বত্রই এই ব্যাপারে বালক ও যুবকগণকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটী প্রধান নগরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং সর্ব্বত্র শাখা সন্তরণ সমিতি স্থাপন করিয়া এবং যথোচিত পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কার্য্য করা উচিত। ক্রমে ইংলিশ চ্যানেল ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলেদের পাঠাইতে হইবে। আর মনে থাকে যেন, ওলিম্পিক গেম্‌সে ভারতবর্ষ উল্লেখযে গ্য বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। সে কলঙ্ক ভঞ্জন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য-প্রতিকৃতি।

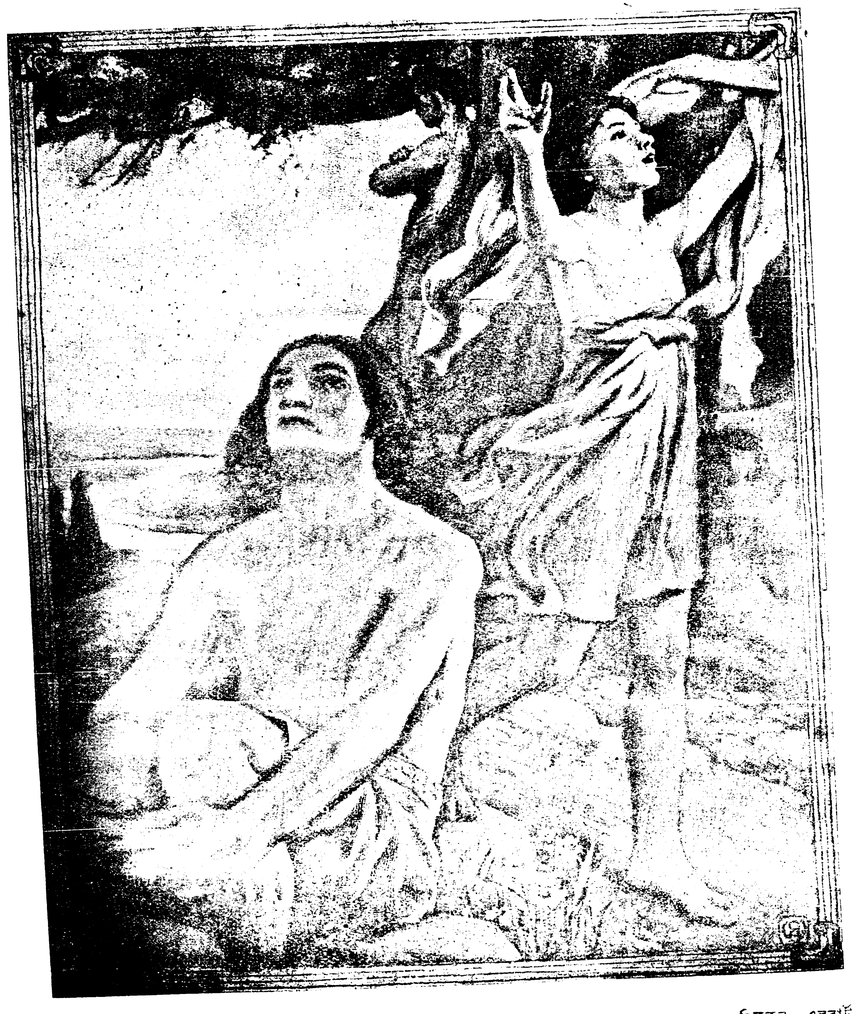

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে। চিত্রকর—এলবার্ট।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

স্বাস্থ্য অর্জ্জন

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মানুষ যখন দেশের আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন তাহার বন্ধুগণ ও তাহার সমাজ তাহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভগবানের আদেশের বিরুদ্ধে চলিতে চায়, তখন সে রোগে নিপতিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে নিজেকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র বিবেচনা করিবার পরিবর্ত্তে মনে করে যেন, তাহার উপর শত অত্যাচার অবিচার করা হইয়াছে; এবং যাহাকে সম্মুখে পায়, অথবা যে তাহার কাহিনী শুনিতে বিরক্তি বোধ না করে, অন্ততঃ মুখে বিরক্তি প্রকাশ না করে, তাহারই নিকট নিজের মন্দভাগ্য ও দুরবস্থা বর্ণনা করিতে বিরত হয় না।

মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে—সুস্থ থাকিবে, সুখী থাকিবে এবং ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে বলিয়া। মানুষ যদি নিজেকে সুখী রাখে, তবে ষোল আনা সম্ভাবনা যে, সে সুস্থ থাকিবে; আর সুস্থ থাকিতে গেলেই তাহাকে ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই হইবে।

জগতে স্বাস্থ্য হইল সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক পদার্থ। প্রকৃতি স্বয়ং এ বিষয়ে আমাদের সহায়। স্বাস্থ্য হইল প্রকৃত সামঞ্জস্য; প্রকৃতির সকল শক্তিই সেই সামঞ্জস্য রক্ষার্থ উন্মুক্ত। আজ-কাল অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন না যে, তাঁহারা রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া আরোগ্যদান করিতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের পথে রোগীকে পরিচালিত করা মাত্রেই তাঁহাদের ক্ষমতা ও শক্তি পর্য্যবসিত। আরোগ্য দান করে প্রকৃতিই; নীরোগ করিবার সকল শক্তি প্রকৃতিরই নিকটে খুব সহজ ও স্বাভাবিক।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল আমরা যে জানি না, তাহা নহে। এতটুকু সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি যাহারই আছে, সে-ই তো সেই সমস্ত নিয়ম জানে। দুঃখের বিষয়, অনেকে সেই সকল নিয়ম সকলের পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক না ভাবিয়া, সে গুলিকে ব্যতিক্রমস্থল মনে করে। সেই

সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে আজ না হোক, দুদিন দশদিন পরে যে শাস্তি পাইতেই হইবে, সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিজেদের শান্তি লাভের পথ উন্মুক্ত করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি কেবল জানিয়া রাখিলে চলিবে না, কেবল মুখস্থ করিলেও চলিবে না; আমাদের কর্ত্তব্য—সমস্ত হৃদয় মন দিয়া, সমস্ত শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করা। নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার কৌশলেরই আমাদের অভাব; আসলে সেই নিয়মগুলি পালন করিবার অভ্যাস আমরা অর্জ্জন করি না।

আমাদের জানা উচিত যে, স্বাস্থ্যের মূলে প্রকৃতির মঙ্গল নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিবার অভ্যাস রাখা চাই। এই অভ্যাস যে কেহ রাখে না, তাহা নহে। রাশি রাশি লোক এই অভ্যাস অর্জ্জন করে, ইহা তো আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেক দিন সকল সময়েই যাহাতে সুস্থ থাকিতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখে। যে সকল নিয়ম তাহারা সহজে পালন করিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতে সেগুলি প্রকৃতির অনুকূলই বটে।

স্বাস্থ্যলাভ করিবার, নিজেকে সুস্থ রাখিবার মূল মন্ত্র হইতেছে—স্বাস্থ্যকেই ধ্যান কর, আরোগ্যকেই সর্ব্বদা আবাহন কর,—অস্বাস্থ্যকে নহে, রোগকে নহে। স্বাস্থ্যের আদর্শের প্রতি তোমার লক্ষ্য ও দৃষ্টি স্থির রাখ এবং তুমি আপনাকে যে প্রকার সবল সুস্থ, সুখী ও আত্মনির্ভরশীল দেখিতে চাও, নিজে সেইপ্রকার হইয়াছ, তাহাই মনে সর্ব্বদাই চিন্তা কর; প্রাণের ভিতর তোমার নিজেকে সেইপ্রকার আদর্শ ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করিয়া দেখিতে থাক।

স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্বপ্রধান সহজসাধন হইতেছে—মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সম্ভবমত ভিতরে টানিয়া লও; সম্ভবমত তাহা কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখ এবং সম্ভবমত ধীরে ধীরে নাসিকা দ্বারা সেই টানিয়া-রাখা বায়ু বাহির করিয়া দাও। এই জন্যই প্রাণায়ামকে হিন্দুরা সন্ধ্যাহ্নিকে অঙ্গরূপে ধরিয়া লয়। প্রাণায়াম অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণে পক্ষে খোলা যায়গায় গিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা অধিকতর সহজ বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ আমাদের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু আহার করা আবশ্যক, তদপেক্ষা আমরা প্রায় এক-তৃতীয় অংশ অধিক আহার করি। সেই এক-তৃতীয় অংশকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট বলক্ষয় ও বৃথা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমাদের চিকিৎসা ও যোগোপদেষ্টাগণ বহুপূর্ব্বে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এইজন্য আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, উদরের অর্দ্ধেক আহার্য্য দ্রব্যে, সিকি অংশ জল এবং সিকি অংশ বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবে; তাহা হইলে রোগের সম্ভাবনা থাকিবে না।

স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতেছে ভয়। ভয় হইলেই রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চলন থাকে না—ব্যতিক্রম ঘটিবেই। রক্ত সঞ্চলনে ব্যতিক্রম ঘটিলেই পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়; এবং পরিপাক শক্তির ন্যূনতা ঘটিলেই জীবনের সমস্ত কার্য্য প্রণালীর উপর আঘাত পড়ে। ভয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিবে, খুব গভীর রূপে নিশ্বাস লইবে এবং আহার কমাইয়া দিবে। কার্য্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে; আলস্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে; সকলের গুণ গ্রহণ করিবে ও সকলকে প্রশংসা করিবে; অপরের দোষ বাহির করিতে অগ্রসর হইও না। বৃথা ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইও না; সকলকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে শিক্ষা কর; সকলকেই ভগবানের সন্তান জানিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করিবার অভ্যাস অর্জ্জন কর। সর্ব্বদা সুস্থ লোকদিগের সহিত আহার বিহার কর। স্বাস্থ্য সংক্রামক জানিও।

রোগী ও চিকিৎসক

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস]

বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ-বচন আছে—"তৃষ্ণা এগোয়, না জল এগোয়?" ইহার অর্থ এই যে, তৃষ্ণার্ত্ত লোককেই জলের দিকে অগ্রসর হইতে হয়; জল কখনো তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে না।

"চিকিৎসক ও রোগী, ইহাদের মধ্যে ঐ ভাবের সম্বন্ধ কিরূপ" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার উত্তরে বলিতে হয়—"রোগীকেই অনুসরণ করিয়া চিকিৎসক ধন্য হন।" অর্থাৎ,—যেটা স্বাভাবিক হওয়া উচিত, তদ্বিরুদ্ধ কার্যই এদেশে হইয়া থাকে। রোগী রোগের যন্ত্রণায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় বটে;—কিন্তু কিসে রোগ আর না হয়, কি করিলে আর ভুগিতে না হয়, সে সম্বন্ধে রোগী সম্পূর্ণ উদাসীন! তাহার ফলে, রোগী ক্রমান্বয়ে ভোগে, তাহার রোগ কখনো নির্দ্দোষভাবে আরাম হয় না, কায়েই শেষে হতাশ ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। আর আমার মত লোককে রোগ-প্রতিকারের জন্য রোগীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া ধন্য হইতে হয়।

সুধু রোগীকেই বা দোষ দিই কেন? সমস্ত বাঙ্গালা দেশে যত লোক আছেন—তাঁহারা সকলেই এইরূপ উদাসীন-ভাবাপন্ন। যাঁহারা তথাকথিত "শিক্ষার" অভিমান করেন, তাঁহারাও এ পর্য্যায় হইতে বাদ যান না। বরঞ্চ তাঁহাদের অহম্-অহমিকা তাঁহাদিগকে আরো বিপদের সম্মুখীন করে। যে সন্তান তাহার পিতামাতার বংশের ভাবী-গৌরব, নয়নের মণি, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব—সেই সন্তান যতক্ষণ ব্যারামে কাতর হইয়া না পড়ে—যতক্ষণ শয্যাশায়ী হইয়া না পড়ে—ততক্ষণ তাহার পিতামাতার ভ্রূক্ষেপও হয় না যে, সেই সন্তান সুস্থ আছে কি না? অর্থাৎ, নিজ নিজ সন্তান সুস্থ কি না, যে হারে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি হওয়া উচিত সেই হারে ছেলেরা বাড়িতেছে কি না, যদি না বাড়ে তবে তাহার কারণ কি, ছেলেদের মেজাজ ঠিক আছে কি না, যদি না থাকে তবে তাহাদের কোষ্ঠশুদ্ধ হইতেছে কি না, বা তাহাদের যকৃতের কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে কি না, শিশুটি অনর্থক কান্নাকাটি বা "বায়না" করিতেছে কি না, যদি করিতে থাকে তবে কেন,—কোন্ বাঙ্গালী পিতামাতা নিত্য এ সকল সংবাদ লয়েন? অথচ, বাড়ীতে যদি একটা গৃহপালিত কুকুর বা গরু বা পাখী থাকে, তবে গৃহস্বামীর সতর্ক দৃষ্টি থাকে—সে জীবটি সময়ে ও যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য পাইল কি না, সে আজ আহারে অরুচি দেখাইতেছে কেন, আজ তাহার গলার আওয়াজ বিকৃত বোধ হইতেছে কেন—প্রভৃতি খুটিনাটির দিকে সর্ব্বদাই গৃহস্বামীর শ্যেনদৃষ্টি থাকে। কিন্তু কয় জন পিতামাতা, কয় জন স্বামী, ভ্রাতা, কয় জন শ্বশুর-শ্বাশুড়ী—তাঁহাদের পরম আদরের বৌ-ঝির আহার্য্য ও শারীরিক স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখেন? ছেলের কি পোষাক হইবে, মেয়ের কি কাপড় হইবে, পরিবারের কি গহনা হইবে, বাহিরের ঘরে কয়-খানা বিদ্যুৎ-বাতির আলো বা পাখা বসিবে ও কোথায় বসিবে, কতগুলা কার্পেট বা কৌচ বসিবে—এ সকলের দিকে যেমন কর্ত্তার তেমনি গৃহিণী ও বাড়ীর সকল ছেলে-পিলেরই সমান দৃষ্টি! লোক-লৌকিকতায় কত আড়ম্বর হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অতিমাত্রায় অবহিত। কিন্তু ঘরের ভিতরে পূরা দস্তুর ছুঁচোর কীর্ত্তন!!! কে কি খাইল, কে কি না খাইল; যাহা খাইল তাহা তাহার বয়স বা শারীরিক অবস্থার অনুপাতে যথেষ্ট হইল কি না,—তাহা কেই বা দেখে, আর কেই বা শুনে!!!

কাযেই, আমাদের বাঙ্গালীর সংসারে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশী; আমাদের ছেলেরা যতদিন নিজ নিজ দৈহিক অবস্থা বুঝিতে সমর্থ না হয়—অর্থাৎ, প্রায় ১২।১৩ বৎসর বয়স তাহাদের যতদিন না হয়—ততদিন তাহারা রুগ্ন ও রোগা (শীর্ণ) থাকে, তাহাদের দেহের

ময়লা ঘুচে না, তাহাদের মেজাজ কখনো সুস্থ থাকে না তাহারা "রোগের-আড়ৎ" হইয়াও কোনও গতিকে পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যফলে মানুষ হইয়া উঠে।

ব্যক্তিগত ভাবে যদি এই দেখা যায়—অর্থাৎ, প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যদি এই ঔদাসীন্য পরিদৃষ্ট হয়, তবে যে যে কাযে স্বাস্থ্যের সহিত অপর বিষয় বিজড়িত আছে—যেমন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে—সেখানেও বাঙ্গালীর অদূরদর্শিতা স্বপ্রকাশ। এমন কি, যাঁহারা "জাতীয়" বিদ্যালয় ও শিক্ষাপরিষদ লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন এবং সগৌরবে "জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞানের" জয় ডঙ্কা বাজাইয়া সাধারণের কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিতেছেন, তাঁহারাও এই বিষয়ে উদাসীন! ইহা আমাদের দেড়শতবর্ষব্যাপী ইংরাজী-দাসত্বের ছাপমারা "দাস মনোবৃত্তির" ফল!

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, উপায় কি? উপায়নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, কারণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের উদাসীনতার হেতু নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, কতকটা পূর্ব্বের ইতিহাস জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যতদূর জানা যায়, এদেশে ব্যারামের প্রকোপ কোনও কালে তাদৃশ প্রবল ছিল না। ম্যালেরিয়া, ডিসপেপ্‌সিয়া, মধুমেহ, ক্ষয়কাশ, শিশুদিগের যকৃতের পীড়া (infantile liver), "নাড়ীর দোষ" প্রভৃতি অতি মাত্রায় ও চিরস্থায়ী ভাবে এদেশে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাযেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ব্যারাম সম্বন্ধে সর্ব্বদাই লোককে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া, এখন যেমন ব্যারামের স্বরূপ সহজেই নির্ণীত হইতেছে, তখনকার দিনে তাহা নিরূপিত হইত কি না জানা নাই—অন্ততঃ কবিরাজেরা নিজেরাই ব্যারাম ধরিতেন এবং নিজেরাই চিকিৎসা করিতেন—সাধারণকে তদ্বিষয়ে কিছু জানিতে দিতেন কি না, সন্দেহ। তাহার উপরে, এদেশে টোট্‌কার প্রচলন খুবই ছিল। বহু রমণী টোট্‌কা-জ্ঞানে ও তৎপ্রয়োগে সিদ্ধহস্তা ছিলেন। কাযেই কতকটা ভাল-স্বাস্থ্যের ফলে, কতকটা কবিরাজ মহাশয়দিগের গোপনতা-স্পৃহার দোষে এবং কতকটা রমণীদিগের গায়ে পড়িয়া টোট্‌কা প্রয়োগের জন্য—এদেশের পুরুষেরা রোগ ও রোগী সম্বন্ধে এক রকম উদাসীনই থাকিতেন। একে পূর্ব্বকালে, এদেশের লোকের সকল বিষয়ে "বিশ্বাসের" উপরে অতি মাত্রায় দোহাই দেওয়া হইত, তাহার উপরে এদেশে সকল শাস্ত্রই গুহ্য থাকিত; কাযেই, এ দেশের লোকেরা কখনো ব্যারাম ও ব্যারামী সম্বন্ধে মাথা ঘামায় নাই।

তাহার পর আসিল ইংরাজ। ইংরাজ এদেশে আসিয়াই, আমাদের হাঁড়ির ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। এ দেশের নানা রকম প্রাকৃতিক বাধা বিভাগ ও জাতিবর্ণের বিড়ম্বনা—দুইটিই তাহারা লক্ষ্য করিল। তাহার উপরে তৃতীয় কীলক স্বরূপ, তাহারা ইংরাজী ভাষাতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করিল। যাহাদের পরস্পর গ্রামের মধ্যে নদ-নদী ও পর্ব্বত অরণ্যানীর ব্যবধান; যাহাদের দেশী বাসীন্দার মধ্যে নানা ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও আচার-বৈষম্যের আধিক্য; তাহাদের মধ্যে, ইংরাজী-শিক্ষিত আর একটি ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থান্ধ জীব সৃষ্টি করা ইংরাজ আবশ্যক মনে করিল। যখন রোমের সম্রাট জুলিয়াস্ সিজার ইংলণ্ড বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন রোমবাসীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এত অর্থ ও লোক ক্ষয় করিয়া, আপনি ইংলণ্ড বিজয় করিয়াছেন বলিতেছেন; কিন্তু সেই ইংলণ্ড আমাদের হাত ছাড়া না হইতে পারে, তাহার কি ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন? তাহার উত্তরে চতুর জুলিয়াস্ সিজার (সম্রাট) বলিয়াছিলেন—I have established fifty *Roman* schools there. অর্থাৎ, যাহাতে ইংরাজের ইংরাজত্ব নষ্ট হয় এবং অলক্ষ্যে অথচ কায়মনোবাক্যে ইংরাজ রোমক বনিয়া যায়—আমি সেই ব্যবস্থাই করিয়াছি!!! রোমকদিগের ভায় রোমদেশীয় চিন্তাধারা ইংরাজের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য রোমান্-বিদ্যালয় খুলিয়াছি!!!

রাজ্যের ভিত্তি কায়েমী করা ছাড়াও ইংরাজী-শিক্ষার বহু রকমের ফল আছে। খাইতে, শুইতে, বসিতে—আমরা এক্ষণে ইংরাজের পণ্য ব্যবহার করিতেছি। ইংরাজী শিক্ষার ফলে একদিকে রাজত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপরে রহিল ও অপর দিকে সেই সঙ্গে ইংরাজী মালের প্রচুর কাট্‌তি হইবার উপায় হইল। যাহা হউক, ইংরাজী শিক্ষার অন্য সু বা কু ফলের সঙ্গে আমাদের ততটা প্রয়োজন নাই—যতটা ইংরাজী শিক্ষার ফলে—কিসে, কতটা ও কেন আমরা রোগ ও রোগী সম্বন্ধে উদাসীন ভাবাপন্ন হইলাম, এই কথাটার বিচার লইয়া। পূর্ব্বে, আমাদের এদেশের জাতি-ধর্ম্মই ছিল—লোকেরা চিরকাল সকলে মিলিয়া মিশিয়া, এক রকম অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকিতে অভ্যস্ত ছিল। ইংরাজ চোরে-কামারে দেখা করিতে দেয় না। তাহার শিক্ষা বিভাগ, তাহার স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। কাযেই, এদেশে ইংরাজী-আমলে, বিশ্ববিদ্যালয় সুধু শিক্ষাই দিতে লাগিল, স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্যতত্ত্ব লইয়া রহিল, চিকিৎসা বিভাগ ডাক্তারদিগকে লইয়াই রহিল—ফলে, আমরাও রাজকার্য্যের ব্যাপারে "জাতীয়তা"র বিড়ম্বনাটাকে ভাল করিয়া পরিপাক করিয়া লইলাম। আমরা জনসাধারণে, চিকিৎসামূলক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারকে অস্পৃশ্য মনে করিতে শিখিলাম। ভিতরে-ভিতরে এই সংস্কার দৃঢ়মূল হইয়াছে বলিয়াই ত আজ আমাদের দেশের লোকের হাতে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেও, আমরা কিছুতেই কাযে, ব্যবহারিক জীবনে সকলগুলিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া কায করিতে পারি না—সেই ইংরাজী স্বাতন্ত্র্য-আদর্শকেই বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই মর্কটানুসরণের ধারা চালাইয়া আসিতেছি!!!

তাহার উপর আমরা একটা মস্ত কথা ভুলিয়া যাই যে, ইংরাজ এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করে, তাহাদের রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী মুন্সী, উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবারই জন্য। তাহাদের প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের সেই সঙ্গে যে দু' একটি এদেশীয় লোক "মানুষ" হইয়া গিয়াছেন—সে তাঁহাদের সুকৃতির ফলে। ইংরাজ যখন নিজ রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করাই উদ্দেশ্য করিয়াছিল, তখন তাহার-দেশের-শিক্ষার আদর্শ কত উচ্চ, তাহা

দেখিবার তাহার অবসর ও প্রয়োজন ছিল না। এখনো সেই মনোবৃত্তির পরিচয় শিক্ষাকার্য্যে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। যতটুকু বিদ্যা না হইলে রাজকার্য্য চালান যাইবে না, ইংরাজ ততটুকু বিদ্যাদানেরই ব্যবস্থা করিয়াছিল। কাযেই, কিসে আমরা ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে মানুষ হই, তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার ইংরাজের প্রয়োজন তখনো ছিল না, এখনো হয় নাই।

তবেই মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে—পূর্ব্বে পুরুষেরা স্বাস্থ্যবান ছিলেন ও দেশ স্বাস্থ্যসম্পদে পূর্ণ ছিল। সে কালের বৈদ্যেরা জনসাধারণকে স্বাস্থ্যকথা বা চিকিৎসার পরিচয় দিতে নারাজ ছিলেন। ইংরাজী আমলে, নগদ পয়সার চটকে, পঙ্গপালের ন্যায় বাঙ্গালী ইংরাজের চাকুরী করিতে ছুটিল; তাহার ফলে, তাহাদের মধ্যে একদিকে যেমন বিলাসিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বহিতে লাগিল, অপরদিকে তাহারা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া, মানুষ হইতে না শিখিয়া, ইংরাজের তোতাপাখী হইতে লাগিল—ফলে আত্মনির্ভরতা, দূরদর্শিতা, স্বাধীনচিন্তার ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল!

এই কথা আজ বড় করিয়া বাঙ্গালীকে শুনাইতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালী জাগিয়া ঘুমায়। বাঙ্গালী নিত্যই দেখিতেছে যে

(১) তাহার শিশু অকালে প্রাণ হারায়।

(২) তাহার শিশুরা বাঁচিয়া থাকিলেও রোগা ও রুগ্ন, অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া, স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া, কোনও রকমে যেন ফাঁড়া কাটাইয়া, দেহ ধারণ করিয়া থাকে মাত্র।

(৩) সধবা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অম্ল ও ক্ষয় রোগে, সূতিকা ও রজো-আধিক্যদোষে জর্জ্জরিত হইয়া, অল্পায়ুঃ হইতেছেন।

(৪) ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ক্ষয়কাশ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ইচ্ছাবসন্ত, প্লেগ, ওলাউঠা, আমাশয়, টাইফয়েড্ জ্বর—প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলি এদেশে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এবং যমরাজের মাশুল-স্বরূপ, নিত্যই অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ হনন করিতেছে।

(৫) গো-জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের স্বাস্থ্য ও সম্পদের হানি ঘটিতেছে।

কিন্তু এমন মর্ম্মান্তিক দংশনের ফলেও বাঙ্গালীর চৈতন্য হয় না—বাঙ্গালী আপনার বুকের সন্তানকে বাঁচাইবার জন্যও এতটুকু চেষ্টা করেনা! হায়! এ জাতির পরিণাম যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি আকুল হইয়াছি!

ছেলের পর ছেলে মরিতেছে, দুই চারিটা ছেলে মাত্র জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া আছে,—স্ত্রী রুগ্না, জীর্ণা—তবু বাঙ্গালীর অঙ্গুলি হেলন পর্য্যন্ত নাই—বাঙ্গালী "অদৃষ্ট" বাদী, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ও নিজের ক্ষুদ্রত্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, রাজার অনুকম্পা-পরবশ-চেষ্টার আশায় মুখ তাকাইয়া, দিনের পর দিন নিশ্চিন্ত মনে, নৈরাশ্য জনিত সুখের সাগরে নিমজ্জমান!

কিন্তু আজ বাঙ্গালীকে বড় করিয়া শুনাইতে হইবে যে—

(১) "আমি দীন", "আমি হীন" ব'লে পিছে প'ড় না'ক;

তোমাতে আমার বল, আমি তব আশাস্থল—

এই মন্ত্রের সাধনা শিখিতে হইবে। আপনার বাহুকে আপনার জাত-ভাইয়ের বাহুকে বিশ্বাস করিতে শিখিতে হইবে; রমণীজাতিসুলভ অদৃষ্টবাদিতা, হীনের ন্যায় কৃপার দান প্রতীক্ষা, নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধ,—এ সমস্তই দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

(২) বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইবে—তাহার বোঝা তাহাকে নিজেকেই বহিতে হইবে—অপর কেহ তাহার স্ত্রী পুত্রের সুখ দুঃখের ভাগ লইতে পারে না।

(৩) বাঙ্গালীকে আদাজল খাইয়া জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে—কি করিলে শরীর ভাল থাকে ও কি করিলে ব্যারাম হয়,—এই বিষয়দ্বয় লইয়া। জ্ঞান যতক্ষণ না ঘরে ঘরে বিস্তৃত হইতেছে, ততক্ষণ বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই। আমার স্বার্থ অপরের স্কন্ধে তুলিয়া দিলে, সে ব্যক্তি যদি তাহা বহন করিতে স্বীকৃত হয়, তবে সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে যথেষ্ট আপনার সুবিধা করিয়া লইবে—ইহা স্বভাবের নিয়ম। লোকে একটা মামলা করিতে হইলে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার প্রত্যেক ঘটনার সন্ধান লয়, সাক্ষীসাবুদের তদ্বির করিয়া ঘটনা-সামঞ্জস্য বাচনিক বজায় রাখিবার জন্য কত পড়া মুখস্ত করিবার মত শিখায়, উকীল ও মামলাবাজ লোকের কাছে কত শলা-পরামর্শ লয়, পারিলে নূতন আইন ও নজীর আপনিই পড়িয়া লয়—মকদ্দমার সময়ে উকীলের পাশে দাঁড়াইয়া বুদ্ধি জোগায়;—হারিলে আপিল করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, তবু এতটুকুও ধৈর্য্য হারায় না, এতটুকু বিচলিত হয় না, চেষ্টা এতটুকুও মন্দ হইতে দেয় না। আর—বাড়ীতে ছেলেরা কি খায়, কি খায় না; কোন্ খাবার কি অবস্থায় কতটুকু খায়; তাহার পড়ার চাপে সে নত হইয়া পড়িতেছে কি না; যে বিদ্যালয়ে তাহারা পড়ে সেখানে যথেষ্ট আলো-হাওয়া আছে কি না; তাহারা বাড়ীতে বা বাহিরে যথেষ্ট আলো ও রৌদ্র সেবন করিতে পায় কি না—এ সংবাদ কয়টি পুত্রের পিতামাতা রাখেন? সংবাদ রাখা দূরের কথা, এ প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকর্ত্তা মস্তিষ্কের অবস্থার সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হন! পুত্রের তথাকথিত "সুস্থ" অবস্থার সংবাদ তাঁহারা লইবেন না;—আবার ছেলে অসুস্থ হইলে, দুই চার দিন লঙ্ঘন দিয়া, দুই চার দিন টোট্‌কা সেবন করাইয়া, দুই দিন হোমিওপ্যাথি সেবন করাইয়া, তাহার পরে যখন অবস্থা জটিল হইয়া দাঁড়ায়, তখন আজ এবেলা ডাক্তার ও বেলা ও ডাক্তার, এই ভাবে আঁচ পাঁকু করিয়া—শিশুটিকে বিসর্জ্জন দেন! কোন্ পিতা নিজ শিশুর অস্বাস্থ্যের কারণ বুঝিবার জন্য মকদ্দমা চালাইবার জন্য যে শ্রম করেন, তাহার এতটুকু আয়াস স্বীকার করেন? কোন্ পিতা উকিল, কৌন্সিলি নির্ব্বাচন করিবার বুদ্ধির তিলার্দ্ধ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক নির্ব্বাচন করেন? কোন্ পিতা প্রাণের দায় চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রণালীর দোষ গুণ নির্ণয় করিবার জন্য সেই রোগ সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হইবার চেষ্টা করেন? অথচ, এরূপ না করিলে সময়ে সময়ে রোগীর প্রাণ যায়।

আজ তাই বলি হে বঙ্গবাসি! তোমরা "শিক্ষিত" বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য, এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় জ্ঞানের ও আকাশের তাবৎ বস্তুতত্ত্বের তথ্য নির্দ্ধারণে যত্নবান হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নিজ দেহতত্ত্ব, নিজ স্বাস্থ্যতত্ত্ব, না শিখিলে তোমার কোনও কালে ভদ্রস্থতা নাই। আজ প্রত্যেক পাঠশালায়, স্কুলে, কলেজে এবং প্রত্যেক জাতীয় বিদ্যামন্দিরে সযত্নে এই সকল জিনিষ শিখান চাই। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির অপেক্ষা স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব কম আবশ্যক নহে। ঘরে ঘরে, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে, দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব অধীত হওয়া চাই। ছেলেপুলেকে শুধু মুখে আদর করিলে চলিবে না—শুধু মায়া মমতার তাড়নে ক্ষণিক স্নেহালিঙ্গন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যদি ছেলেকে সত্য সত্যই ভালবাস, যদি সত্য সত্যই ছেলেকে "অমূল্য নিধি", সাতরাজার ধন এক "মাণিক", "সৃষ্টিধর", "গোপাল" প্রভৃতি মনে কর, তবে সে গোপালের যথেষ্ট যত্ন করিতে শিখ। দৈবযোগে পিতৃত্ব মাতৃত্ব লাভ হইয়াছে—কিন্তু দৈবযোগে বা যাদুবলে শিশুপালন, শিশুরক্ষা শিক্ষা করা যায় না। শিক্ষার অভাবে শুধু যে অ-যত্ন হয়, তাহা নহে, অনেক সময়ে কু-যত্নও হয়। গল্পে আছে, একটি প্রভুভক্ত হনুমান, তাহার নিদ্রিত প্রভুর সেবা করিতেছিল। একটা মাছি, বারম্বার তাড়ান সত্ত্বেও, প্রভুর দেহের উপরে বসিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করায়, হনুমান স্থির করিল যে, উৎপাতকারী মাছিকে কাটিয়া ফেলা উচিত। পুনর্ব্বার মাছিটি প্রভুর বুকের উপরে বসিবামাত্রই সে তরবারির একটি বিষম আঘাত করিল। ফলে, মাছিটি মরিল বটে, কিন্তু প্রভুও দ্বিখণ্ডিত হইলেন। শিক্ষিত না হওয়ার ফলই এইরূপ। কিন্তু তাই বলিয়া, বর্ত্তমান ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে, আমি শিক্ষার আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি। আজ আমাদের দেশের প্রধান অভাব—অর্থের অভাব নয়, সামর্থ্যের অভাব নয়, হৃদয়ের অভাব নয়—

জ্ঞানের অভাবই আজ ভারতের প্রথম ও প্রধান অভাব।

সেই জ্ঞানের অভাব ঘুচাইতেই হইবে। জাতিবর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিক্ষাদান করিতে হইবে।

শিক্ষা বলিলে, ইংরাজের স্কুল কলেজের শিক্ষাকে মনে করিতে ভুলিয়া যাও।

শিক্ষা বলিতে, এমন শিক্ষাকে বুঝিতে আরম্ভ কর—যাহা

দেহে শক্তি, মনে স্ফূর্ত্তি, চিত্তবৃত্তির অবাধ স্ফুরণ অতএব "মনুষ্যত্বের" পূর্ণ বিকাশ } অতএব আত্মনির্ভরতা } ঘটায়।

অন্ততঃ আজ হইতেও বাঙ্গালীর চেষ্টা হউক—

(১) দেশী ভাষায় শিক্ষার প্রচলন

(২) দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, (স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তৎসঙ্গে মাতৃতত্ত্ব, গার্হস্থ্যধর্ম্ম), শিশুতত্ত্ব ও সেই সঙ্গে গোপালন—সকল বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হউক।

(৩) দেশের ও বিশেষ করিয়া স্থানীয়, ইতিহাস ভূগোলও অবশ্য পাঠ্য হউক। রামায়ণ, মহাভারত পুনঃ পুনঃ অধীত হউক।

ইহা ছাড়া, যে যাহা শিখিতে পারে, শিখুক।

প্রত্যেক বালককে মৌখিক ভাবে দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিখান হউক। প্রত্যেক যুবক যৌন সম্বন্ধীয় তথ্যে সুপণ্ডিত হউক। প্রত্যেক জনক জননী শিশুতত্ত্ব শিশুপালন, শিশুচিকিৎসা ও খাদ্যবিচার সম্বন্ধে শিখিতে থাকুন।

বাড়ীতে কাহারো কোনও ব্যারাম হইলে, প্রথমাবধি জনক জননীর সে বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া চাই। সে ব্যারামটির কারণ, চিকিৎসা ও ভাবী ফল সম্বন্ধে অভিভাবকের সযত্নে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সুবিধামত, চিকিৎসকের নিকটে তদ্বিষয়ে পরিচয় লওয়াও বাঞ্ছনীয়। এক কথায়, মকদ্দমা তদ্বির করার চেয়ে বেশী যত্নে (যে হেতু প্রাণের দায়ে)

ব্যারামের তদ্বির করা চাই। বাড়ীতে একটা ব্যারাম হইলে, কি ভাবে তাহার তদ্বির করিতে হয় তাহা মল্লিখিত ১৩৩০ সনের ভাদ্র মাসের "স্বাস্থ্য" পত্রিকায় "রোগীর বিবরণী বা রিপোর্ট" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চঃ—একটি ছেলেকে ডাক্তার করিতে হইলে, প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় পড়ে। এ কথাটি সকলকে তলাইয়া বুঝাইবার জন্ত নিম্নে খরচের হিসাব দিলাম। প্রত্যেক দফাই খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

(১) শৈশব—(২ বৎসর কাল)।—প্রত্যহ ১ সের করিয়া গড়ে দুধ ধরিলে, এবং টাকায় তিন সের করিয়া দুধ ধরিলে, দুই বৎসরে দুধের দাম ১৬৮৲, দুইবৎসরে কাপড় চোপড়—গড়ে অন্যূন ২০৲ এবং দুই বৎসরে চিকিৎসার ব্যয়, অন্যূন ৪০৲ [বিছানা শয্যা ও বাড়ী ভাড়া ধরিলাম না।] মোট—২২৮৲

(২) তিন হইতে ৯ বৎসর (৭ বৎসর)। খাবার বাবদ মাসে গড়ে ১০৲ হিসাবে ৮৪০৲; কাপড় চোপড় বাবদে ১০৫৲ জুতাছাতি বাবদে ২০৲ এবং চিকিৎসা বাবদে ১৫০৲—মোট ১১১৫৲ [শেষের তিন বৎসর (৭, ৮ ও ৯ বৎসর) পাঠ্যাবস্থা। তাহাতে স্কুলের বেতন অনেকস্থলে লাগে না এবং প্রাইভেটে মাষ্টারও থাকে না। পুস্তকে দামও সামান্ত—এ কারণে, উহার ব্যয় ধরা হইল না।]

(৩) স্কুল (৮ বৎসর কাল ব্যাপী)। আটবৎসরে গড় পড়ত ৩৲ হিসাবে বেতন ২৮৮৲; পুস্তক ১১২৲ পরীক্ষার ফি ১৫৲ খাই খরচ ১১৫০৲। কাপড় চোপড় ৪০০৲ মোট ১৯৬৫৲

(৪) কলেজে (২ বৎসর)। গড় পড়তা ৬৲ বেতন ধরিয়া মোট বেতন ১৪৪৲ বই ৫০৲ খাই খরচ ২৮৮৲ কাপড় চোপড় ১০০৲ মোট ৬০২৲

(৫) ৬ বৎসর মেডিকেল কলেজের খরচ।—বেতন ৯০৲ পুস্তক ১৫০৲ পরীক্ষার ফি ৬০৲ খাই খরচ ৮৬৪৲ কাপড় চোপড় ৩০০৲ মোট ২৩৩৪

ইহার উপরে, ১৫ বৎসর বয়স হইতে ডাক্তারি পাশ হওয়া, এই দশ বৎসরে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া ধরিলেও, ৩৬০০৲ উপার্জিত হইত। অতএব সর্ব্বসাকল্যে ব্যয় দাঁড়াইতেছে অন্যূন ২২৮৲ + ১১১৫৲ + ১৯৬৫৲ + ২৩৩৪৲ + ৩৬০০৲ = ৯২৪২ টাকা।

এত ব্যয়ে একটা ডাক্তার তৈয়ারী হয়—আর এই দরিদ্রদেশে আমরা তাহাদিগের ষোল আনা কায উশুল করিতে পারি না। কি পরিতাপের বিষয়!!!

খাদ্য দোষে শিশু-যকৃত

(Infantile Liver).

[ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

মাতা যখন দেখিতে পান তাঁহার সযত্ন রক্ষিত স্নেহের পুতলি, আদরের ধন, জীবনের ধ্রুব-তারা ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছে, ভাল করিয়া দুগ্ধ পান করিতেছে না, গা গরম গরম বোধ হয়, হস্তপদ সর্ব্বদাই গরম থাকে, কুন্থন সহ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মল ত্যাগ করে, অথবা নিয়মিত রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, খাদ্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, খিট্‌খিটে হয়, সর্ব্বদাই কাঁদে, সহজে শান্ত হইতে চায় না, কোনরূপ স্ফূর্ত্তি নাই, স্যাঁৎস্যাঁতে মাটীতে শুইয়া থাকিতে ভালবাসে, জলপাত্র দেখিলে সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, জলসহ পাত্রটী মুখে টানিয়া ধরে,—তখনই মাতার মাথায় টনক পড়ে তাহার সন্তানের কিবা অসুখ হইয়াছে। তখনই গৃহিণী মহলে একটা সাড়া পড়ে—কেহ বলেন বাতাস লাগিয়াছে, কেহ বলেন দোষ হইয়াছে, কেহ বলেন এঁড়ে লাগিয়াছে। ঝাড়া-ফিঁকা, জলপড়া, তেলপড়া, টোট্‌কা ইত্যাদি অনেক ব্যবস্থাই তখন হইতে থাকে। তাতেও যখন শিশুর কোন উন্নতি দেখা যায় না তখন কর্ত্তার কাণে সে সংবাদ গৃহিণী কাঁদিয়া কাটিয়া প্রকাশ করেন—তুমি এদিকে দেখই না—কি লইয়া থাক, কি কাজে ব্যস্ত আছ—এ দিকে সোনার ধন খোকা যে মরিতে বসিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন কর্ত্তার প্রাণে ঘোর আশঙ্কা আসে এবং সকল কার্য্য ফেলিয়া তাহার প্রতিকারের জন্ত ব্যস্ত হন। ছোট ছেলে কটু তিক্ত ঔষধ সেবন করিতে পারিবে না বলিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই ভাল—বন্ধুদিগের নিকট এরূপ সৎ উপদেশ লইয়া কর্ত্তা এমন একজন সবজান্তা পুঁথিগতবিদ্যা ফোঁটা-কেলা ডাক্তার বাবুকে ডাকেন। ডাক্তার বাবু প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীস্থ সকলকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া এ পুঁথি সে পুঁথি ঘাঁটিয়া ২।৪টি অনুবটিকা খোকার জন্ত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু খোকার কোথায় কোন যন্ত্রে কি পীড়া হইয়াছে তাহার মোটেই অনুসন্ধান করেন না। তিনি কেবল লক্ষণের সহিত ঔষধের মিল দেখেন। ২ দিন, ৪ দিন ক্রমে ১৫ দিন, এক মাস গেল, খোকা কিন্তু সারিল না। ক্রমে তাহার হাত পা মুখ ফোলা ফোলা, ফ্যাঁকাসে হল্‌দে আভাযুক্ত হইল; অন্যান্য লক্ষণও প্রবলতর হইতে লাগিল। তখন জ্বর বেশী, বাহ্যে প্রস্রাবের অনিয়ম, খাদ্যে অনিচ্ছা, দুগ্ধ পানের পরেই বমন, নিয়ত ক্রন্দন ও অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। তখন কর্ত্তা পীড়া কঠিন বোধে আর একজন ডাক্তার ডাকিলেন, হোমিওপ্যাথিক, এ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী প্রভৃতি অনেক চিকিৎসা হইল। শেষ শান্তি স্বস্ত্যয়নও করা হইল, অনেক অর্থ ব্যয় হইল। ফলে খোকা স্নেহ মমতা ভুলিয়া মাতৃক্রোড় হইতে চলিয়া পড়িল, সব ফুরাইল।

প্রায় প্রতি পরিবারে এরূপ শোক, ক্রন্দনের রোল, হা-হুতাশ নিয়ত দেখি ও শুনি, কিন্তু লোকের কি একটা ধারণা হইয়াছে যে আনাড়ী ফোঁটা-ফেলা চিকিৎসা-শাস্ত্রানভিজ্ঞ বই পড়া ডাক্তার না হইলে আর শিশু চিকিৎসা হইবেই না। এখন চিকিৎসার অর্থই ঔষধ খাওয়ান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ, আজ একটা কাল একটা, আজ একজন কাল আর একজন, আজ হোমিও, কাল এ্যালো, পরশু শাস্ত্রীয় ঔষধ, এইরূপে নিয়ত ডাক্তার ও ঔষধ পরিবর্ত্তনে রোগ ত সারেই না বরং জটিল হয়। শেষে তার ভবলীলা শেষ হয়। পথ্যও যে চিকিৎসা, তা আর বড় কেহ মনেই করেন না। পথ্যের দোষেই রোগ ও পথ্যের সুব্যবস্থাই রোগ আরোগ্যের কারণ—এ কথা রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে বুঝান সহজ নহে। বরং বুঝাইতে গেলে খ্যাতি যশ অর্থ সকল দিকেই হানি হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষতি স্বীকার আপনার খেয়ে পরের জন্ত কোন ডাক্তার করিতে বড় রাজি হন না। এরূপ স্থলে স্বাস্থ্যসমাচারের ন্যায় জনহিতকর পত্রিকা ছাড়া মনের জ্বালা জুড়াইবার আর স্থান কোথায়? আজ যে শিশু-যকৃত সম্বন্ধে এত কথা লিখিতে বসিয়াছি তাহাও যে খাদ্য দোষেই জন্মে এবং শিশু খাদ্যের সুনিয়মেই যে তা হয় না বা আরোগ্য হয়—কত বছর ধরিয়া নানা প্রকারে লোক সমাজে তাহা বুঝাইতে আর সমর্থ হইলাম না। তাই মনের ক্ষোভে এ রোগটী যে সহজসাধ্য নহে, ডাক্তারকে টাকা দিলে যে ইহা সারে না, ইহা না হওয়া বা সারা যে কেবল মাত্র খাদ্যের বিচার করার ফল—তাই আজ কিছু বলিতে চাই।

অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এরূপ রোগ-গ্রস্ত অনেক শিশু আমার চিকিৎসাধীন হইয়াছে। আমি বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক এরূপ অনেক শিশুকে দেখিয়াছি যে, অলক্ষিত ভাবে এই পীড়া শিশুকে আক্রমণ করে। এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুদিগের মধ্যেই ইহা প্রবল হয়। সাধারণতঃ সপ্তম বা অষ্টম মাসেই পীড়া আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ দন্তোদ্গম বা প্রসূতির পুনঃগর্ভ সঞ্চারের সময়েই অধিকাংশ স্থলে রোগ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ৩য় ও ৪র্থ মাসেও এই পীড়ার সূচনা হইতে দেখা গিয়াছে। শিশুর জন্মের কয়েক দিন পরেও কয়েকটী শিশুকে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। শিশুর তিন বৎসর বয়সের পর আর এ রোগ হইতে দেখা যায় না।

ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল শিশুই এ রোগে আক্রান্ত হয়। সহর বা পল্লী, ভদ্র বা অভদ্র স্বাস্থ্য-পূর্ণ গৃহ বা স্থান—কোন স্থানেই এরূপ পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখি নাই। সযত্নে পালিত শিশু ও

অযত্নে রক্ষিত বালক—কেহই এই ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পায় না।

এই পীড়ায় যকৃত অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইয়া শেষে যকৃত অভ্যন্তর দিকের নাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যকৃতের অগ্রধার পরিষ্কার উচ্চ বোধ হয়। স্পর্শে মসৃণ, গোলাকার ও পাতলা বোধ হয়। যকৃত কঠিন ও অনম হয়। প্রথমে বেদনা থাকে না কিন্তু অকস্মাৎ কাঁওল আরম্ভ হইলে, সামান্য বেদনা হয়। উদর ক্রমে স্ফীত হইয়া পড়ে, চর্ম্মস্থ শিরা সকল স্পষ্ট দেখা যায়। জ্বর ক্ষুধামান্দ্য, বমন ও হস্তপদে শোথ হয়।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় শিশুর দৈহিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না, কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই বর্ণের মলিনত্ব লক্ষিত হয়। তৎপর চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। সমস্ত শরীর ও চক্ষু ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়। মল, প্রথমাবস্থায় হরিদ্রাভ, পরে সেটা কর্দ্দমের ন্যায় হয়। পীড়ার প্রথমে মূত্র পরিষ্কার থাকে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হয়; পরিশেষে গাঢ় পীতবর্ণ হয়। বস্ত্রে লাগিলে, ধৌত করিলেও তাহার দাগ যায় না। ঘর্ম্ম মোটেই হয় না। পরিশেষে হস্তপদে শোথ উপস্থিত হয়।

কাঁওল উপস্থিত হইলেই যকৃত দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া পঞ্জরাস্থির নিম্নে প্রবেশ করে। তখন অনেকেই মনে করেন যে, পীড়া আরোগ্য হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ দ্রুত সঙ্কোচনই বিপজ্জনক।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পরিপাক ক্রিয়ার দোষেই যে এরূপ পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব প্রবণতাও ইহার একটী কারণ। আমরা দেখিয়াছি একটী মাতার ১৮টী সন্তান শুধু এই পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একটি পরিবারের পুত্র ও কন্যার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে ৭টি পুত্রেরই এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু কন্যা ৪টীর কোন রোগ হয় নাই। সেজন্য অনুমান হয় কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়। এদেশে এমন পরিবার নাই যেখানে এ রোগে ২।৩টীর মৃত্যু হয় নাই।

মাতৃ দুগ্ধই আমাদিগের শিশুসমূহের স্বাভাবিক প্রধান খাদ্য। মাতাও সুখে দুঃখে সুস্থ বা অসুস্থ শরীরে শিশুকে নিয়ত স্তন্য দান করেন; কিন্তু কোন অবস্থায় তাঁহার স্তন্য অখাদ্যে পরিণত হয় এবং কখন সেরূপ দুগ্ধ আর সন্তানকে পান করান কর্ত্তব্য না তাহা মোটেই বিবেচনা করেন না বা জানেন না। গর্ভের প্রথমাবস্থাতেও ঐ স্তন্য পান করান অনুপযুক্ত মনে করেন না। গর্ভাবস্থায় মাতৃ শরীরের যে পরিবর্ত্তন হয়, ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে মাতৃদুগ্ধ শিশু-খাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়। এই অবস্থায় গর্ভস্থ ভ্রূণ ও ক্রোড়স্থ শিশু যথোপযুক্ত ভাবে পোষিত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই মাতার গর্ভ ধারণের অব্যবহিত পরেই ক্রোড়স্থ শিশু এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই ইহা এঁড়ে লাগা বলিয়া প্রথম উপেক্ষা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালী মাতাগণ, আলস্য-পরতন্ত্র পরিপাককৃচ্ছ, অনুপযুক্ত সময়ে পুনঃ পুনঃ গর্ভ ধারণ করিয়া দুর্ব্বলতা দ্বারা আক্রান্তা হইতেছেন। এই সমস্ত ঘটনাতেই মাতার স্বাস্থ্যহীনতা জন্মে সেই সময় ঘটনাতেই তাঁহার গর্ভজাত শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অসুস্থ মাতা হইতে কখনই সুস্থ সন্তানের আশা করা যাইতে পারে না।

মাতৃদুগ্ধের পরেই গোদুগ্ধ শিশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতা হেতু শিশুর তাহার সহিত ভাজাল মিশ্রিত হওয়ায় তাহা আর পুষ্টিকর দেহবর্দ্ধক থাকে না। এতদ্ব্যতীত এখন আর গো-চারণ মাঠ না থাকায় গাভীর অনুপযুক্ত ও অনিষ্ট কৃত আহার জন্য গাভী আর বলকারক দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে সমর্থ হয় না। দুগ্ধ দোহনাধার অপরিষ্কার হেতু অনেক সময় সে দুগ্ধ বিষবৎ হয়। অনেক সময় বাসি দুগ্ধ সদ্যদুগ্ধ বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। শিশুকে এ প্রকারে গোদুগ্ধ পান করাইলে শিশু পুষ্ট ও বর্দ্ধি

হইতে পারে, মাতাও তাহা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করেন না। হয়তঃ বাসি দুগ্ধই শেষ রাত্রে বা পর দিবস প্রাতঃকালে পান করাইয়া থাকেন। অনাবৃত পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া তাহা জীবাণুদুষ্ট হইলে, মাছি কীট, পতঙ্গাদি দ্বারা উৎসৃষ্ট হইলেও তাহা পান করান হইয়া থাকে। এইরূপে বিকৃত ও বিষদুষ্ট গোদুগ্ধ পানে শিশু-যকৃত ক্রমে বিকৃত হওয়ায় শিশু এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, শিশু হয়ত কোন কারণে ক্রন্দন করিতেছে কিম্বা বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। তখনই তাহাকে কিছু দুগ্ধপান করাইয়া সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দুগ্ধের পরিমাণ, অবস্থা অথবা কতক্ষণ পূর্ব্বে দুগ্ধপান করান হইয়াছে তাহা মোটেই প্রণিধান করা হয় না। কোন কুটুম্ব বাড়ীতে শিশু ক্রোড়ে করিয়া গেলেই তাঁহারা আদর করিয়া কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া দেন—বিবেচনা করেন না যে, তাহার দুগ্ধ পানের আবশ্যকতা আছে কি না? এইরূপ অনিয়মিত ও অতিরিক্ত পানহেতু পাকস্থলীতে গ্যাস ও অম্ল উৎপন্ন হইয়া যকৃতের দোষ জন্মিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

শিশুর দন্তোদ্গম হইলেই তাহাকে কিছু কিছু অন্ন জাতীয় খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। তখন আর তাহার শুধু দুগ্ধে পোষণ হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায়, এই সময় অন্য প্রকার খাদ্য না দিয়া শুধু দুগ্ধই পান করান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দুগ্ধের অভাবে দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই অনেক শিশুকে শাগু, বার্লি, প্রভৃতি অন্ন জাতীয় খাদ্য দেওয়া হইয়া থাকে। যে সকল শিশু হামকুড়া দেয়, তাহারা যাহা হাতের নিকট পায়, তাহাই খুঁটিয়া মুখে দেয়। আবার অনেক স্থলে শিশুকে আদর করিয়া অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দেওয়া হয়। এরূপে অযত্নে রক্ষিত বালকগণ নিয়তই অখাদ্য খাইয়া তাহার পাচকাগ্নি বিকৃত করে। সুতরাং তাহাদের যকৃত বিকৃত হওয়ায় তাহারা এই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ক্ষুদ্রায়তন প্রকোষ্ঠে শিশুসহ অধিক লোকের বাস, অস্বাস্থ্যকর গৃহ, শারীরিক ব্যায়াম ও বিমুক্ত বায়ুর অভাব জন্যও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত কারণ সমূহ হেতুই শিশু যকৃত ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সামান্য জ্বর হয়। শেষাবস্থায় কাঁওল উপস্থিত হয়, হস্তপদে শোথ দেখা দেয় এবং যকৃত দ্রুত সঙ্কুচিত হওয়ায় শোথ ও পৈত্তিক বিষে বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহার ভোগ কাল তিন মাস হইতে ১২ মাস পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

আমি এই পীড়াগ্রস্ত অনেক শিশু দেখিয়াছি এবং নিয়তই ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, ইহা ম্যালেরিয়া-জনিত বা জীবাণু-ঘটিত কোন পীড়া নহে; অথবা লিভারের বসাবিশিষ্ট অপকৃষ্টতাও নহে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই পীড়ার বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পীড়া সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কেবল মাত্র সুপথ্য ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করা ব্যতীত কোন ঔষধে ফল লাভ করিতে পারি এরূপ কোন সদুপদেশ প্রাপ্ত হই নাই। দুই একটী রোগীকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, উপরিউক্ত আহারের অনিয়ম হেতু এই পীড়া ক্রমে উৎপন্ন হইয়া যখন যকৃতের পৈত্তিক আকুঞ্চন (Billiary cirrhosis) উৎপন্ন হয়, তখনই শিশুর মৃত্যু ঘটে।

পীড়া উপস্থিত হইয়া পড়িলে তখন আর কোন ঔষধেই ফল লাভ হয় না। কিন্তু পীড়ার প্রথমাবস্থায় যেরূপ খাদ্য দ্বারা শিশু এই পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার ও খাদ্যের বিশেষ বিধি ব্যবস্থা করিলে অনেক শিশুকেই এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

যে স্তনদুগ্ধ বা গর্ভিণীর দুগ্ধ পানে এইরূপ পীড়া হইতেছে, তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ উপদেশ প্রায়ই প্রতিপালিত হয় না। কারণ শিশু স্তন্যপানে অভ্যস্ত; সুতরাং স্তন্যপান করিতে

না পাইলেই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। মাতাও সন্তানের ক্রন্দন শ্রবণে উপদেশ উপেক্ষা পূর্ব্বক স্তন্য পান করাইয়া থাকেন। রাত্রে শিশু মাতৃক্রোড় হইতে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে ফল লাভ করা দুরাশা। দুষ্ট গাভীদুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; অথবা তাহাকে জলসহ উত্তমরূপে ফুটাইয়া সেবন করান উচিত। শিশুর দন্তোদ্গম হইলে, বিস্কুট, পাঁউরুটি, হাতরুটি ও ভাতের সঙ্গে সব্জী, মাছের ঝোল অথবা দুধভাত দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশু এই পীড়া দীর্ঘদিন ভোগ করে বলিয়া পথ্যের বাছবিচার ঠিক রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। শিশুর পিতামাতার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, পথ্যের কঠিন ব্যবস্থা দ্বারা কোন উপকার হইবে না; সুতরাং তাঁহারা ঐরূপ সহজসাধ্য বিকৃত পথ্যই প্রদান করিয়া পীড়া জটিল করিয়া ফেলেন। তাঁহারা চান ঔষধ। আমি তরুণ সেফালিকাপত্রের নিষ্কাশিত রস এক ঝিনুক মাত্রা প্রাতঃকালে সেবন ও লিভারের উপর গুলঞ্চের প্রলেপ দিয়া অনেক স্থলে উপকার পাইয়াছি।

পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতে পথ্যের বান্ধাবান্ধি নিয়ম ও উক্ত পত্রের রস সেবন এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিলে রোগমুক্তির আশা করা যাইতে পারে।

দেশসেবা না ভণ্ডামী ?

"যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।" যিনি যথার্থই স্বদেশ প্রেমিক, যিনি নিজের জন্মভূমিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, যাঁহার স্বদেশ প্রেমে কপটতা নাই, স্বদেশ প্রেমের যিনি 'ফেরী' (ferry) করেন না, স্বদেশ-প্রেম যাঁহার ব্যবসা কিম্বা পেশা নয়, তিনি দেশে বর্ত্তমান কালে দুর্নীতির একাধিপত্য দেখিয়া মর্ম্মাহত না হইয়াই পারেন না।

যিনি মুখে স্বদেশী কাজে বিদেশী,—যিনি অপরকে যে অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করেন, নিজে সেই কাজ করেন,—ভণ্ডামিতে যিনি সিদ্ধহস্ত,—স্বদেশ-প্রেমিকের ছদ্মবেশে যিনি স্বদেশের বুকে ছুরি বিদ্ধ করিতে তৎপর, সেই সকল মহাপ্রভুর ভণ্ডামির মুখোস খুলিবার সময় আসিয়াছে।

মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে। অল্পবয়স্ক অপরিণত-বুদ্ধি, অনভিজ্ঞ যুবক সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতা আবার আরও বেশী। অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার অভাবে সবযুক সম্প্রদায় নিজেদের হিতাহিত সহজে বুঝিতে পারে না,—আপাত-সুখকর পরিণামে দুঃখজনক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিয়া থাকে। যৌবনে প্রবৃত্তি সহজেই চঞ্চল, উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য বহুদর্শী নীতিবিদ্ কবি-পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন,

"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্।"

যুবক সম্প্রদায়ের এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগে একশ্রেণীর লোকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় বাহির করিয়া লইয়াছে। যুবকদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই অতি প্রবল। নানা কৌশলে সেই প্রবৃত্তিকে আরও উত্তেজিত করিয়া এই শ্রেণীর লোকে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম মানব মহাত্মা গান্ধি মর্ম্মান্তিক ব্যথার সহিত সংবাদপত্রের অশ্লীল বিজ্ঞাপনগুলির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা খুলিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা

বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গলা সংবাদপত্র হাতে করিতে দেখিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কেন?

কেন,—না, বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই কুৎসিত রোগের উৎকট বীভৎস বর্ণনায় পূর্ণ। সে বর্ণনা পাঠ করিলে ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে! যুবক যুবতীর ইন্দ্রিয়লালসার উদ্দীপনা করাই যে সেই সকল বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাদের অর্থাগমেরও সীমা থাকে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল সংবাদপত্রে এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন বাহির হয়, সেই সকল সংবাদপত্রেই ঢক্কানিনাদে অশ্লীলতার নিন্দা প্রচারিত হইয়া থাকে! ইহা কি কপটতা নয়—ভণ্ডামি নয়? কিন্তু এরূপ ভণ্ডামির কারণ কি? কারণ—অর্থলোভ। পেশার খাতিরে অশ্লীলতার নিন্দা না করিলে চলে না, অথচ, অশ্লীলতাপূর্ণ বিজ্ঞাপন না ছাপিলে অর্থাগমও হয় না। কাজেই ভণ্ডামি ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

আজকাল আবার আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। কেবল কুৎসিত ঔষধের বিজ্ঞাপন নয়, বাঙ্গালার সাহিত্যও কলঙ্কিত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি art বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, কথাটা বিলাত হইতে আমদানী। এই আর্টের দোহাই দিয়া সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে, নাট্যে অনাচার ব্যভিচারের চূড়ান্ত হইতেছে। অশ্লীলতার সমর্থন কল্পে, দুর্নীতির পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য art কথাটি ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্নীতি প্রচার যাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলেই দুর্নীতিবাগীশেরা আর্টের দোহাই দিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।

আর্ট যাহা তাহা স্বর্গীয়, পবিত্র। কিন্তু যাহা পাঠ করিলে, শ্রবণ করিলে, দর্শন করিলে মন অপবিত্র হয়, চিত্তের বিকার উপস্থিত হয়, তাহা art কেমন করিয়া হইবে? Art ও দুর্নীতি ইহাদের মাঝে একটা সীমা-রেখা থাকা আবশ্যক, এবং আছেও। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ না হয়, ততদূর পর্য্যন্ত art এর সীমা। সেই সীমা পার হইলেই, ইন্দ্রিয়লালসার উদ্দীপনার আভাষ জন্মিলেই তাহা দুর্নীতি। উলঙ্গ শিশু art; কিন্তু উলঙ্গ যুবক-যুবতী দুর্নীতি, ক্রীড়াশীল হাস্যময় সদানন্দ শিশুকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিলেও চিত্তের বিকার জন্মে না, তাই তাহা art। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক যুবক-যুবতীর উলঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে art বলিয়া চালানো চলে কি? অথচ চলিতেছে; কিন্তু এখন সে সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে—art ও দুর্নীতি একাকার হইয়া গিয়াছে। এই দুর্নীতি প্রচারে বাধা দিবার কেহ নাই, art ও দুর্নীতির মাঝখানের মুছিয়া-যাওয়া সীমারেখা খুঁজিয়া বাহির করিবারও কেহ নাই। কাজেই art এর নামে অশ্লীলতা, দুর্নীতি, কুরুচি—সবই অবাধে চলিয়া যাইতেছে।

এই দুর্নীতিকে art বলিয়া প্রচারের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি? একমাত্র উদ্দেশ্য—অর্থ লাভ। এই সব নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি, লালসার উদ্দীপক বর্ণনা, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাট্যাভিনয় হুহু করিয়া বিকায়—ইহাতে জলের ন্যায় অর্থাগম হয়।

মদ্যপানে মানুষ যে কিরূপ পশুতে পরিণত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পথেঘাটে অহরহঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্যপানে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, চিকিৎসক মাত্রেরই মত এইরূপ। কিছু দিন পূর্ব্বে মদ্য বর্জ্জনের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। মদ্যপদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই কি এই আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? পাঠকেরা যদি এরূপ মনে করেন, তাহা হইলে নিতান্ত ভুল করিবেন। সে মদ্যবর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল রাজনীতির খাতিরে—ইংরেজকে জব্দ করিবার জন্য। কিন্তু সে রাজনীতিক চাল যখন ব্যর্থ হইল—ইংরেজ যখন জব্দ হইল না, তখন সে আন্দোলনও ক্রমে নিবিয়া গেল। এখন আর কাহারও মুখে মদ্য বর্জ্জনের নাম পর্য্যন্ত শুনা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে এখন বিশেষ বিশেষ মার্কায়

মস্তের বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। কেবল তাহাই নয়। মদের বোতলের লেবেলে হিন্দুর পরমারাধ্য দেবদেবীর চিত্রও বাহির হইতেছে, দেবদেবীর নামে মদের বোতলের brand,—মার্কাও প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু হিন্দুসমাজ এ সকল দেখিয়াও দেখে না। কারণ হিন্দু সমাজের প্রাণশক্তি নাই, হিন্দু সমাজ জড়। অন্য সমাজের অন্য ধর্ম্মের এমন অসম্মান, অপমান হইলে লাঠালাঠি দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত, রাস্তায় ড্রেণে মদের স্রোত বহিয়া যাইত, কত মদের দোকান ধ্বংস হইত তাহা কে বলিতে পারে! যে সকল কাগজে মদের প্রশংসাপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হয়, সেই সকল কাগজেই পেটের দায়ে, পেশার খাতিরে মদের নিন্দাও কালে ভদ্রে একটু আধটু বাহির যে হয় না তাও নয়। কথায় ও কাজে এমনই সামঞ্জস্য!

এ রকম ভণ্ডামি শুধু আমাদের দেশেই আছে, অপর কোন দেশে নাই, এমন কথা বলিলে এ দেশের প্রতি অবিচার করা হইবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতির খাতিরে নানা রকমের ভণ্ডামি নানা দেশে চলিতেছে। অহিফেনের কথাটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক। এই অহিফেনের বিষ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া লোকের কি যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কে না জানেন? পাকা আফিম অর্থাৎ চণ্ডুর ধূম পান করিয়া চীনা জাতটাই [illegible]লুপ্ত হইয়া গেল! এই অহিফেনের ব্যবসা একটা মস্তবড় ব্যবসা। ইহাতে অজস্র অর্থাগম হয়। মহাচীনের হতভাগ্য অহি[illegible]দের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া জনকতক পাদ্রী চীনেদের রক্ষার জন্য সে দেশে অহিফেনের রপ্তানী রহিত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সে আন্দোলনের যৌক্তিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিলেন না, অহিফেনের রপ্তানী রহিত করিতে প্রতিশ্রুত হইতেই হইল। কিন্তু কাজে অবশ্য কিছুই হইল না। কারণ তাহাতে স্বার্থে ঘা পড়ে—অর্থহানি হয়। এই সেদিনও জেনেভায় কত আড়ম্বর করিয়া অহিফেন কনফারেন্স হইয়া গেল। কিন্তু ঐ আড়ম্বরই সার— বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পার[illegible] যায় নাই।

তার পর চাএর কথা ধরুন। 'চা' যে কত বড় অনিষ্টকর পদার্থ, বিশেষতঃ আমাদের এই গরম দেশে, এই কথা বুঝাইবার জন্য আমরা দশ-বারো বৎসর ধরিয়া কত চেষ্টাই না করিতেছি। কিন্তু এতটুকু সুফল ফলিয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। খাঁটি বিশুদ্ধ চা'ই শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এই স্বভাবতঃ অনিষ্টকর পদার্থ যদি ভেজাল সহযোগে বিক্র[illegible] করা হয়, তাহা হইলে সে জিনিসটা সদ্য প্রাণঘাতী বি[illegible] হইয়া দাঁড়ায়। অল্পমাত্রায় সেঁকো কুঁচিলা প্রভৃতির ন্যায় চা'ও slow poison বা মৃদুবীর্য্য বিষের কাজ করিয়া থাকে। সংবাদপত্র-সেবক ও সংবাদপত্র-পাঠকেরা যে এ কথা জানেন না এমন মনে করিতে পারি না। কিন্তু চায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া এই বিষ সেবনে সহায়তা করিতেও তাঁহারা ইতস্ততঃ করেন না। সে বিজ্ঞাপনের ঘটাই বা কত! শীতকালে চা পান করিলে শরীর গরম হইয়া শীতের প্রকোপ অনুভূত হয় না। আবার গ্রীষ্মকালে চা পান করিলে শরীর শীতল হয়!!! চায়ের এই দুই পরস্পর বিরোধী বিপরীত ধর্ম্ম কত বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল, সে কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না!!!! এ রকম hypocrisy আর কত দিন চলিতে পারে?

চায়ের ন্যায় তামাকও আর একটি অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ। কিন্তু ইহার ব্যবহারও তদনুপাতে সার্ব্বজনীন। ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ—প্রায় পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই লোকে কোন না কোন আকারে তামাক সেবনে অভ্যস্ত। দোক্তা, গুল, সুর্ত্তি, জরদা, বিড়ি, সিগারেট, বার্ড়সাই, চুরুট, গুড়ুক, পাইপ, প্রভৃতি কত রকম আকারে ও নামে এই বিষটি যে ব্যবহৃত হয়, সে সকল তত্ত্ব আমরা জানিও না। আর ইহার প্রচারে জন্য কত না অর্থ ব্যয় করা হয়! মদ, আফিম, সিদ্ধি, গাঁজা, চরস প্রভৃতির ব্যবহার কিছু সংযত করিবার জন্য লাইসেন্স এবং বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যবস্থা আছে, এবং হয় ত তাহাতে সামান্য কিছু ফল ফলিলেও ফলিতে পারে। কিন্তু চা-তামাক একেবারে নাম-কাটা সেপাই—ইহাদের সাতখুন মাপ। ইহাদের বিক্রয় ও ব্যবহার সংযত করিবার জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই। অথচ অনিষ্টকারিতায় ইহারা প্রথমোক্তগুলির অপেক্ষা একটুও কম নয়। তথাপি ইহারা কেন যে আবগারি আইনের আমলে আসে না, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

আবার irony of fate (অদৃষ্টের উপহাস) দেখুন! অনেক আন্দোলন আলোচনার পর আইন হইল যে, যোল বৎসরের কম বয়স্ক কেহ তামাক সেবন করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! পথে ঘাটে বাহির হইলেই ষোল বছরের কম বয়স্ক অনেক ছেলের মুখেই সিগারেট বিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নিষেধ করিবার কেহ নাই। আইনটি কি কেবল Statute Bookএর শোভাসম্পাদন করিবার জন্য রচিত হইল? গতিক দেখিয়া ত সেই রকমই বোধ হয়। আর আইন চলিবেই বা কি করিয়া? এ যে বজ্র আঁটুনী, ফস্কা গেরো। ছোট ছোট ছেলেদের ধরিবে কি করিয়া? তাহারা নানা রকমে হাত ফস্কাইয়া পিছলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে হাত দিলে যথার্থই আইন রচনার ফল হইতে পারিত, সেটা স্পর্শও করা হয় নাই। যাহারা ষোল বছরের কম বয়সের ছেলেকে তামাক বা কোন রকম মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিলে আইনটি যথার্থই ফলপ্রসূ হইতে পারিত। কিন্তু গলদ ঐখানেই— বিক্রেতা সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুতরাং তামাকের অবাধ বিক্রয় চলিতেছে, শিশুরাও অবাধে ধূমপান করিতেছে। অথচ মনকে প্রবোধ দেওয়াও চলে যে, এত বড় আইন রহিয়াছে— আর কি? এ বড় তাজ্জব তামাসা।

স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা

রোগ হইলে চিকিৎসকের শরণ লইতে হয়। কারণ, রোগী সাধারণতঃ জানে না, কেমন করিয়া তাহার রোগ হইল, এবং কেমন করিয়াই বা রোগ আরাম হইবে। কিন্তু রোগ কেন হয়, এবং হইলে কি উপায়ে তাহা আরাম হইতে পারে, চিকিৎসক তাহা জানেন। সেই জন্য রোগ হইলেই লোকে চিকিৎসকের কাছে ছুটিয়া যায় যে, তিনি রোগীর অবস্থা দেখিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করিবেন ও আরোগ্যের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুস্থ থাকা বা অসুস্থ হওয়া না হওয়া শিক্ষার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

অনেক রোগ আছে, যাহা কেন হয় জানা থাকিলে আমরা সাবধান থাকিতে পারি। তাহা হইলে সহজে সেই রোগ আমাদের আক্রমণ করিতে পারে না। আবার শরীরের সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতেছে।

এই অভিজ্ঞতা কিসে হয়?—ইহা অর্জ্জন করিতে হয়—যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় স্বাস্থ্যও একটা বিদ্যা। শৈশব কাল হইতে যেমন যত্ন করিয়া অন্যান্য বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয়, তেমনি স্বাস্থ্য বিদ্যাও উপার্জ্জন করিবার বিষয়। অন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিলে যেমন আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের অনেকটা সুবিধা হয়, স্বাস্থ্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তদ্রূপ আমাদের অনেক উপকার হয়। সে উপকার বড় কম নয়। স্বাস্থ্য বিদ্যা জানা থাকিলে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি, অনেক রোগ সহজে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে না। শরীর সুস্থ থাকিলে আমরা জীবনে অনেক সুখ

ভোগ করিতে পারি। শিশুকাল হইতে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখিতে শিক্ষা করিলে আমরা দীর্ঘজীবী হইয়া সুস্থ ও সবল থাকিয়া জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কোন ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা কতকগুলি লোককে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর কি না, এবং তাহার বা তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর কি না? তাহার উত্তর এই যে,—হাঁ, খুবই সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন এই শিক্ষা দেওয়ার উপায় কি? উপায় অনেক আছে। উপদেশ, অধ্যয়ন, দৃষ্টান্ত—প্রভৃতি নানা উপায়ে এই শিক্ষা দেওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শৈশব কালই শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়। এই সময় যেমন সাধারণ শিক্ষা আরম্ভ করা হয়, সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং তাহা করাও উচিত। কেন না, স্বাস্থ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কদভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে, বেশী বয়সে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা লাভ করিলেও কোন ফল পাওয়া যাইতে পারে না।

শিক্ষার যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে, স্থান, কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার একটী বা একাধিক প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া শিশুকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বই পড়াইয়া স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাজেই তাহাদের উপদেশ এবং বিশেষ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মুখ ধোয় না, দাঁত মাজে না। ইহার যে কি বিষময় ফল তাহা সকলেই জানেন। এ ক্ষেত্রে শিশুর এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য শিশুর পিতা মাতাই প্রধানতঃ দায়ী। এবং ইহার ফল প্রধানতঃ শিশুকে ভোগ করিতে হইলেও, পরোক্ষভাবে শিশুর পিতা মাতাকেও যে কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করিতে হয় না এমন নহে।

এই সকালে উঠিয়া মুখ ধোওয়া ও দাঁত মাজা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়। শিশুর শিক্ষা মাতার উচিত উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুকে ইহার দোষ গুণ বুঝাইয়া দেওয়া। শিশু এক কথায় কিম্বা এক দিনে অবশ্য ইহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে অথবা ধীরে ধীরে তাহাকে অভ্যাস করাইতে হইবে। অভ্যস্ত হইয়া যাইবার পর কোন দিন মুখ ধুইতে বা দাঁত মাজিতে ভুলিয়া গেলে মুখ দুর্গন্ধ হইবে। তখন শিশু আপনা আপনি এই অভ্যাসের উপকারিতা এবং উহা উপেক্ষা করার কুফল বুঝিতে পারিবে।

শিশুকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিতে হইলে শিশুর গৃহে তাহার পিতা, মাতা, অভিভাবক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশে বয়স্ক ব্যক্তিরাও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সেই জন্য ছেলে বুড়ো সকলেরই এক সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা লাভের আর একটা স্থান—বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইলে রীতিমত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্বাস্থ্য বিদ্যাও পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে হয়। এ দেশের শিশু বিদ্যালয় গুলিতে সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ syllabus প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই syllabusএর ছাঁচে ঢালিয়া প্রত্যহ ঝুড়ি ঝুড়ি স্বাস্থ্যনীতিমূলক শিশু পাঠ্য পুস্তক পুস্তিকা বিরচিত হইয়া মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে; এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা তাহা মুখস্থ করিয়া গড় গড় করিয়া আবৃত্তি করিয়াও যাইতেছে। কিন্তু ছাত্রেরা পুস্তকে যাহা পাঠ করিতেছে নিজ নিজ জীবনে তাহা কতদূর অভ্যাস করিতেছে তাহা বলা কঠিন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ছেলেরা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা করিতেছে কি না, তাহা বলা যায় না। কারণ, পুস্তক পাঠ করিয়া মুখস্থ করিয়া

তোতাপাখীর মত আবৃত্তি করাকে আমরা শিক্ষা বলি না। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পড়ে—চুরি করা বড় দোষ; এবং যুক্তাক্ষর শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে—মিথ্যা কথা কহিতে নাই। কিন্তু উহা তারা কেবল পড়ে—শিখে না। কারণ, বর্ণপরিচয়-পড়া ছেলেরা যে চুরি করে না এবং যুক্তাক্ষর জানা ছেলেরা যে মিথ্যা কথা বলে না, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং ইহাকে শুধু পড়া বলিতে পারি—শিক্ষা কেমন করিয়া বলি?

সেইরূপ স্বাস্থ্যনীতিও জীবনে অভ্যাস করিতে হয়। তবে প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা হইতে পারে। নচেৎ কেবল মুখস্থ করিয়া লাভ কি? বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্যনীতি যথার্থ শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষক মহাশয়দের কেবল পুঁথিগত ভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানা থাকিলে চলিবে না—নিজ জীবনে স্বাস্থ্যনীতি পালন করিতে হইবে ও নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্রদিগকে সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। শিক্ষা লাভের ফলে যদি জীবনে কোন ব্যক্তিগত উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে স্বাস্থ্য নীতি শিক্ষা। শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার নীতিগুলি জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না—সেগুলি জীবনে অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তনা সার্থক হইবে।

গৃহ ও বিদ্যালয় ছাড়া শিশুর স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার অন্যান্য উপায়ও আছে। শিশুর উপযুক্ত সঙ্গী, সাথী, নির্ব্বাচনে অবহিত হইতে হইবে। সুস্থ, সবল, দৃঢ়কায় বালককে সহচররূপে পাইলে তাহার দেখাদেখি, অন্য বালকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং তাহাতে অভ্যস্তও হইতে পারে।

বাড়ীর কাছে কিম্বা বিদ্যালয়ে ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা থাকিলে কিম্বা ব্যায়ামাগার থাকিলে রোগা দুর্ব্বল ছেলেরা অপর বালকদের দেখাদেখি বলব্যঞ্জক ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইতে পারে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিও হইতে পারে।

স্বাস্থ্যমূলক পুস্তক পুস্তিকা যদি ছেলেরা আগ্রহের সহিত পড়ে, তবে তাহা হইতে কতকটা উপকার পাইতে পারে। তা ছাড়া, বায়স্কোপে, সার্কাসে বলবান ব্যক্তিদিগের ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া নিজ নিজ স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে অবহিত হইতে পারে।

শিশুদের স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা খুবই সম্ভব; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণকে উপযুক্ত হইতে হইবে। শিশুর স্বাস্থ্যের উপর ত স্নেহশীল সন্তানবৎসল পিতামাতাকে নজর রাখিতে হয়ই; ইহার অতিরিক্ত, তাহার স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা প্রণালীর উপরও তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা না হইয়া পড়ে—কদভ্যাস না দাঁড়াইয়া যায়—সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছেলে যাহাতে কুসঙ্গে মিশিয়া কুশিক্ষা না পায়, নাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যাহাতে কুশিক্ষা বা কুঅভ্যাস জন্মিতে পায়ে এমন পুস্তক যেন ছেলে পড়িতে না পায়, কিম্বা এমন বায়স্কোপ যেন দেখিতে পায়।

কুসঙ্গে মিশিয়া, কুৎসিত চলচ্চিত্র দেখিয়া কুরুচিব্যঞ্জক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মন্দ অভ্যাস জন্মিবার ফলে অনেক ছেলেকেই স্বাস্থ্যহীন হইতে দেখা যায়। সুশিক্ষার ফল সুন্দর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন,—কুশিক্ষার ফল স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু—এ কথাটি সকলেরই যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

ভোগ করিতে পারি। শিশুকাল হইতে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখিতে শিক্ষা করিলে আমরা দীর্ঘজীবী হইয়া সুস্থ ও সবল থাকিয়া জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কোন ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা কতকগুলি লোককে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর কি না, এবং তাহার বা তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর কি না? তাহার উত্তর এই যে,—হাঁ, খুবই সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন এই শিক্ষা দেওয়ার উপায় কি? উপায় অনেক আছে। উপদেশ, অধ্যয়ন, দৃষ্টান্ত—প্রভৃতি নানা উপায়ে এই শিক্ষা দেওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শৈশব কালই শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়। এই সময় যেমন সাধারণ শিক্ষা আরম্ভ করা হয়, সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং তাহা করাও উচিত। কেন না, স্বাস্থ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কদভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে, বেশী বয়সে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা লাভ করিলেও কোন ফল পাওয়া যাইতে পারে না।

শিক্ষার যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে, স্থান, কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার একটী বা একাধিক প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া শিশুকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বই পড়াইয়া স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাজেই তাহাদের উপদেশ এবং বিশেষ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মুখ ধোয় না, দাঁত মাজে না। ইহার যে কি বিষময় ফল তাহা সকলেই জানেন। এ ক্ষেত্রে শিশুর এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য শিশুর পিতা মাতাই প্রধানতঃ দায়ী। এবং ইহার ফল প্রধানতঃ শিশুকে ভোগ করিতে হইলেও, পরোক্ষভাবে শিশুর পিতা মাতাকেও যে কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করিতে হয় না এমন নহে।

এই সকালে উঠিয়া মুখ ধোওয়া ও দাঁত মাজা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়। শিশুর শিক্ষ মাতার উচিত উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুকে ইহা দোষ গুণ বুঝাইয়া দেওয়া। শিশু এক কথা কিম্বা এক দিনে অবশ্য ইহা বুঝিতে পারিবে না কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে অথবা ধীরে ধীরে তাহাকে অভ্যা করাইতে হইবে। অভ্যস্ত হইয়া যাইবার পর কো দিন মুখ ধুইতে বা দাঁত মাজিতে ভুলিয়া গেলে মু দুর্গন্ধ হইবে। তখন শিশু আপনা আপনি এ অভ্যাসের উপকারিতা এবং উহা উপেক্ষা করার কুফ বুঝিতে পারিবে।

শিশুকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষ গৃহে তাহার পিতা, মাতা, অভিভাবক এবং ব্য ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশে বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সেই জন্য ছে বুড়ো সকলেরই এক সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা ক আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা লাভের আর একটা স্থান বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দানের ব্যব করিতে হইলে রীতিমত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যব করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্বাস্থ্য বিদ্যাও প তালিকাভুক্ত করিতে হয়। এ দেশের শিশু বিদ্যা গুলিতে সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তি হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ syllabus প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন সেই syllabusএর ছাঁচে ঢালিয়া প্রত্যহ ঝুড়ি ঝু স্বাস্থ্যনীতিমূলক শিশু পাঠ্য পুস্তক পুস্তিকা বিরচি হইয়া মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে; এবং বিদ্যাল ছাত্রেরা তাহা মুখস্থ করিয়া গড় গড় করিয়া আবৃ করিয়াও যাইতেছে। কিন্তু ছাত্রেরা পুস্তকে যা পাঠ করিতেছে নিজ নিজ জীবনে তাহা কতদূর অভ্যা করিতেছে তাহা বলা কঠিন। সুতরাং প্রকৃত প ছেলেরা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা করিতেছে কি না, তা বলা যায় না। কারণ, পুস্তক পাঠ করিয়া মুখস্থ করি

তোতাপাখীর মত আবৃত্তি করাকে আমরা শিক্ষা বলি না। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পড়ে—চুরি করা বড় দোষ; এবং যুক্তাক্ষর শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে—মিথ্যা কথা কহিতে নাই। কিন্তু উহা তারা কেবল পড়ে—শিখে না। কারণ, বর্ণপরিচয়-পড়া ছেলেরা যে চুরি করে না এবং যুক্তাক্ষর জানা ছেলেরা যে মিথ্যা কথা বলে না, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং ইহাকে শুধু পড়া বলিতে পারি—শিক্ষা কেমন করিয়া বলি?

সেইরূপ স্বাস্থ্যনীতিও জীবনে অভ্যাস করিতে হয়। তবে প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা হইতে পারে। নচেৎ কেবল মুখস্থ করিয়া লাভ কি? বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্যনীতি যথার্থ শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষক মহাশয়দের কেবল পুঁথিগত ভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানা থাকিলে চলিবে না—নিজ জীবনে স্বাস্থ্যনীতি পালন করিতে হইবে ও নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্রদিগকে সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। শিক্ষা লাভের ফলে যদি জীবনে কোন ব্যক্তিগত উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে স্বাস্থ্য নীতি শিক্ষা। শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার নীতিগুলি জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না—সেগুলি জীবনে অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তনা সার্থক হইবে।

গৃহ ও বিদ্যালয় ছাড়া শিশুর স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার অন্যান্য উপায়ও আছে। শিশুর উপযুক্ত সঙ্গী, সাথী, নির্ব্বাচনে অবহিত হইতে হইবে। সুস্থ, সবল, দৃঢ়কায় বালককে সহচররূপে পাইলে তাহার দেখাদেখি, অন্য বালকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং তাহাতে অভ্যস্তও হইতে পারে।

বাড়ীর কাছে কিম্বা বিদ্যালয়ে ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা থাকিলে কিম্বা ব্যায়ামাগার থাকিলে রোগা দুর্ব্বল ছেলেরা অপর বালকদের দেখাদেখি বলব্যঞ্জক ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইতে পারে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিও হইতে পারে।

স্বাস্থ্যমূলক পুস্তক পুস্তিকা যদি ছেলেরা আগ্রহের সহিত পড়ে, তবে তাহা হইতে কতকটা উপকার পাইতে পারে। তা ছাড়া, বায়স্কোপে, সার্কাসে বলবান ব্যক্তিদিগের ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া নিজ নিজ স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে অবহিত হইতে পারে।

শিশুদের স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা খুবই সম্ভব; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণকে উপযুক্ত হইতে হইবে। শিশুর স্বাস্থ্যের উপর ত স্নেহশীল সন্তানবৎসল পিতামাতাকে নজর রাখিতে হয়ই; ইহার অতিরিক্ত, তাহার স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা প্রণালীর উপরও তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা না হইয়া পড়ে—কদভ্যাস না দাঁড়াইয়া যায়—সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছেলে যাহাতে কুসঙ্গে মিশিয়া কুশিক্ষা না পায়, নাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যাহাতে কুশিক্ষা বা কুঅভ্যাস জন্মিতে পায়ে এমন পুস্তক যেন ছেলে পড়িতে না পায়, কিম্বা এমন বায়স্কোপ যেন দেখিতে পায়।

কুসঙ্গে মিশিয়া, কুৎসিত চলচ্চিত্র দেখিয়া কুরুচিব্যঞ্জক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মন্দ অভ্যাস জন্মিবার ফলে অনেক ছেলেকেই স্বাস্থ্যহীন হইতে দেখা যায়। সুশিক্ষার ফল সুন্দর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন,—কুশিক্ষার ফল স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু—এ কথাটি সকলেরই যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়

আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে—পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ। ইহার মোটামুটি অর্থ এই যে, পঞ্চাশ বছর পার হইলেই সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের জীবন উপভোগের কাল পঞ্চাশ বৎসরের অধিক নহে। এই প্রবচনটি সকলেই প্রায় ধ্রুব সত্য বলিয়া মানেন। পঞ্চাশ বৎসর পার হইলেই এদেশের লোকে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করে, অপরেও তাই মনে করে। আমরা জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছি—কেন?—কেন? কেন? পঞ্চাশ বৎসর পার হইলেই আমরা নিজেদের বৃদ্ধ মনে করিব কেন, সংসার উপভোগ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যায় বসিতে যাইব কেন?—কেন?—কেন?

কোন দিক দিয়াই আমরা এই প্রবচনটির সার্থকতা দেখিতে পাই না, ইহার সমর্থন করিতে পারি না। এই প্রবচনটি কেন যে ব্যর্থ, তাহার একটু বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রে আমাদের আয়ুষ্কাল এক শত বৎসর। এই শতবর্ষব্যাপী জীবনকাল চারিভাগে বিভক্ত। যথা, বাল্যকাল, যৌবনকাল, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য। এই প্রত্যেক ভাগটি পঁচিশ বৎসর করিয়া—মোট একশত বৎসর। শাস্ত্রীয় হিসাব মত ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যকাল। ২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যৌবনকাল। ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ত্ব। তৎপরে বার্দ্ধক্য।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান ধারণা অনুসারে ১৬ বৎসর বয়স হইলেই যৌবনকাল আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই আমাদের আয়ুষ্কালও সেই অনুপাতে কমিয়া আসিয়াছে। ষোল বৎসর বয়স হইতে না হইতেই আমরা যুবজনোচিত আচরণ করিয়া থাকি। এইরূপে অকাল-বার্দ্ধক্যও আমরা ইচ্ছা করিয়াই টানিয়া আনিয়াছি। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই অতি সহজেই আমরা আমাদের আয়ুষ্কা[ল] বাড়াইয়া লইতে পারি।

শাস্ত্রীয় হিসাবমত শতবর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে হইলে
বাল্যকাল হইতেই তাহা অভ্যাস করিতে হয়। শৈশ
কাল হইতেই শিশুকে এই তিনটি বিষয়ে অভ্যা
করাইয়া দিতে হয়—খাদ্য, ব্যায়াম ও বিশ্রাম। এ
বিষয়ত্রয়ে অভ্যস্ত হইলে শরীর সহজে পীড়িত হয় ন
জরাও অকালে দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না
শিশুর শরীরের অবস্থার উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন কর
দিতে হয়, তাহার সামর্থ্যোপযোগী ব্যায়ামের মা
নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হয়; এবং সে যাহাতে নিয়মি
সময় বিশ্রাম করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হ
কিছুদিন ধরিয়া অভ্যাস করাইলেই যথেষ্ট হইল—ত
পর কলের মত সহজ সরল ভাবে জীবন-ধারা বহি
চলিয়া যায়—আর কিছুই ভাবিতে হয় না।

উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়। শিশুর শারীরি
অবস্থা দেখিলেই তাহার জীবনকাল কতদিন হইতে পা
তাহা কতকটা আন্দাজ করিয়া বলিতে পারা যা
তদনুযায়ী পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয়ে উপযুক্ত ব্য
করিয়া দিয়া শিশুকে তাহা অভ্যাস করাইয়া
সেই আনুমানিক আয়ুষ্কাল আরও অনেক দিন বাড়া
দেওয়া যাইতে পারে।

এই তিনটি বস্তুর মধ্যে খাদ্যই প্রধান। উপ
খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই আয়ুষ্কাল অতি স
ও স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইতে পারে। বাল্যকাল
সময়। এই সময়ে সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হইতে থা
২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি চলে। ২৫ ব
বয়সে শরীর পূর্ণ পরিণতি লাভ করায়
যৌবন আরম্ভ হয়। খাদ্য সুনির্ব্বাচিত হইলে

অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। যে সকল খাদ্যে প্রোটীন, খনিজ পদার্থ ও ভাইটামাইন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, শিশুর পক্ষে তাহাই উপযুক্ত খাদ্য। দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, শাকসব্জি, তরকারি ও ফল মূলে এই উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকে।

কিন্তু একা খাদ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা চলে না। যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়ামও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। নচেৎ খাদ্য যথোচিত ভাবে শরীরে গৃহীত হইবে না। কাজেই শরীরও ঠিকমত পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে না। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। কোন কারণেই ব্যায়াম একদিনের জন্যও বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। যে সকল শিশু স্কুলে যায়, তাহাদিগকে প্রত্যহ দুইবার স্কুলে যাতায়াত করিতে হয়। ইহা মন্দ ব্যায়াম নয়। কিন্তু স্কুলবাড়ী খুব কাছে হইলে অন্য প্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা দরকার। বাগানে দৌড়াদৌড়ি খেলা ছেলেদের পক্ষে খুব ভাল। ব্যায়ামে কেবল মাংসপেশী পুষ্ট হয় না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও পরিণতি লাভ করে। ব্যায়ামে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। শরীরের আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার প্রণালীগুলি সতেজ ও সক্রিয় অবস্থায় থাকায়, শরীরাভ্যন্তরে আবর্জ্জনা জমিতে পারে না। ফুসফুস, বৃক্ক, অন্ত্র ও চর্ম্ম নিয়মিত ভাবে আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দেয়। ইহার আর একটা গৌণ ফল এই যে, ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলি বাহির হইয়া গিয়া শরীরের আভ্যন্তরীন যন্ত্র তন্ত্রাদি পরিষ্কার অবস্থায় থাকায়, খাদ্য শরীর মধ্যে সহজেই গৃহীত হইয়া দেহের যথোচিত পুষ্টি সাধন করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ বিশ্রাম। খাদ্য ও ব্যায়াম যেমন দরকার, বিশ্রামও ঠিক সেই অনুপাতে দরকার। যখন আমরা জাগ্রত থাকি, তখন অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে আমাদের দেহের যে সকল অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় সেই সকল ক্ষয়ের পূরণ হয়। ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায়, ফুটবল ক্রিকেট খেলায় ছেলেদের খুব উৎসাহ দেখা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া বিজয় গৌরব লাভের জন্য তাহারা অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, খুব বেশী মেহনত করিয়া ব্যায়াম করিলে বা পড়াশুনা করিলে পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া যায়—যথোপযুক্ত সময় বিশ্রাম করিলে, প্রত্যহ অন্ততঃ ৮।১০ ঘণ্টা নিদ্রা যাইলে, পরীক্ষার ফল তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাল হইতে পারে। এই তত্বটি একবার তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া অভ্যাস করাইয়া দিতে পারিলে, আর কোন ভাবনা থাকে না, তাহারা আপনিই আপনাদের দৈনন্দিন কার্য্য প্রণালী নিয়মিত করিয়া লইতে পারে। নিদ্রার সময়েই শরীরের মাংসপেশীগুলি সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া পড়িয়া তাহাদের ক্ষয়পূরণের অবসর পায়। এই কারণেই নিদ্রা যাইলে ব্যায়ামজনিত ক্লান্তি দূর হইয়া থাকে।

ছেলেবেলা হইতে এই তিনটি বিষয় অভ্যাস করাইতে হইবে। কিন্তু সে অভ্যাস ফলপ্রদ হইতেছে কি না, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? অবশ্য তাহা বুঝিবার উপায় আছে। সব চেয়ে সহজ উপায় ছেলের দেহের ওজন লওয়া। তিন মাস অন্তর ওজন লইয়া লিখিয়া রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে উপকার হইতেছে কি না। যদি দেখা যায়, ওজন নিয়মিত অনুপাতে বাড়িতেছে—কমে নাই কিম্বা স্থির থাকে নাই, তাহা হইলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়।

আমরা এই যে প্রস্তাবটি করিতেছি, কেবল ব্যক্তিগত ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এবং বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট বয়সের শিশুদের প্রদর্শনী করিতে হইবে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া প্রদর্শনী বৎসরের একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে হওয়া চাই। বড় বড় সহরের প্রত্যেক পল্লীতে এইরূপ একটী করিয়া প্রদর্শনী করা চলে। সেই প্রদর্শনীতে ছেলেদের বাৎসরিক জীবনযাপন প্রণালীর ও তাহার ফলাফলের হিসাব এবং ওজন দাখিল করিতে হইবে। সেই সকল প্রদর্শনীর হিসাব একত্র করিয়া statistics

প্রস্তুত করা আবশ্যক। বৎসর বৎসর এই ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ প্রস্তুত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, জাতিগত ভাবে আমাদের দৈহিক উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে। উন্নতি হইলে ভালই। কিন্তু অবনতি হইলে বুঝিতে হইবে, কার্য্যপ্রণালীতে ত্রুটি আছে, তখন তাহার সংশোধন করিতে হইবে। এই ভাবে কিছুকাল চলিলে পূর্ব্বোক্ত প্রবচনটির সংশোধন আবশ্যক হইবে।

স্বাস্থ্য

[শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

সুখের বিষয় যে সুরটা ফিরিয়াছে। এ জীবন নশ্বর, এ সংসার অনিত্য—এই ভাবটা যে একটু শিথিল হইয়াছে, ইহাকে জাতীয় নবজীবনের পূর্ব্বরাগ বলা যাইতে পারে। আর এ জীবন ও পরজীবন এক-পা এ-দিক ও-দিক মাত্র। আমাদের আমিত্ব এজীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে যেরূপ অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে—পর জীবনেও সেইরূপই থাকিবে। যাহাদের ইহজীবনে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা নাই, তাহাদের মৃত্যুর পরেও নাই, ইহা একপ্রকার অবধারিত সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া, সুখময় ভবিষ্যৎকে পাইবার আশা আকাশ-কুসুম ব্যতীত আর কিছু নহে।

২। ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলেও—নিজ নিজ জীবন—নিজ অস্তিত্বের সহিত বিশ্বের আদান প্রদান—প্রত্যেকের কাছে কতই না প্রিয়! কি যোগী, কি ভোগী; কি ধনী কি দরিদ্র; কি সবল কি দুর্ব্বল; সকলেই সর্ব্বদা এই প্রিয়তম জিনিসটির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক যত্নে সমাধা করিতেছেন। এমন কি জীবন এতই প্রিয় যে, গলিত-নখদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ, স্পন্দহীন গলিত কুষ্ঠ, চিররোগী, পরান্নভোজী, পরাধীন মানবগণও অনন্ত দুঃখরাশির মধ্যে নিজেকে সুখী বলিয়া মনে করে। কেহই যেন মরিতে চায় না। পরন্তু মৃত্যু ও মৃতের কথা ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া থাকে। জীবনে প্রীতি প্রত্যেক মানবেরই অন্তরতম সত্য বা অনাহত ধর্ম্ম। কাজেই জীবনটা কিছুই না বলি আর ঠেলিয়া ফেলিবার যো নাই। দুঃখের স প্রতিযোগিতা করিয়াই হউক, কি সুখেই ইহার মধ্যেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" ফুটাইয়া তুলি হইবে; এবং যিনি যতটা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে বা পারিবেন, তিনিই সংসারে মানবমণ্ডলীর নয়নের সম্মুখে ততোধিক পরমরমণীয়—অনবদ্য আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন ও হইবেন।

৩। সমস্ত জগৎই কর্ম্মশীল। দুঃখে হইয়া জড়ের ন্যায় নয়ন মুদিয়া থাকিলে সুসার নাই, বরং মুদ্রিত নয়নে অনন্ত মৃত্যুর উপাসনা মঙ্গলদায়িনী প্রকৃতির ইঙ্গিত বলিয়া বোধ যাহাতে এই পৃথিবীকেই শান্তি সুধা পরিপ্লুত করা যাহাতে ধরাতেই অমরার সৃষ্টি করা যায়, প্রত্যেকেরই বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। জীবনে সুখী হইব, শান্তি আনিব,—পৃথিবীর প্রত্যেক শান্তিবারি বর্ষণ করিব, শৃঙ্খলা বিধান করিয়া দারিদ্র্য ও অকাল মৃত্যু হইতে দূরে অবস্থান এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে পদার্পণ করা শ্রেয়ঃ। এই পৃথিবীতে যত দুঃখ ও বিড়ম্বনা বিদ্যমান আছে, স্বাস্থ্যহীনতা মধ্যে প্রধান ও উন্নতির পরিপন্থী। স্বাস্থ্যরক্ষা বা আমিত্ব সম্যকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সৃষ্ট প্রাণীরই প্রধান ধর্ম্ম। এই স্বাস্থ্য শরীরে-

আত্মায়। যাহার শরীর সুস্থ নয়, তাহার মনও দুস্থ—তাহাতে আত্মার স্পন্দনও অতি মন্দ। তাই ঋষি "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" এই মহামন্ত্র কতই না উল্লাসের সহিত গাহিয়াছেন।

৪। জীব-সৃষ্টি-কৌশল—জন্মমৃত্যু—জড়ের সহিত চৈতন্যের সংযোগ-বিয়োগের নিগূঢ় তত্ত্ব—অদ্যাপি মানব-বুদ্ধির অগম্য হইলেও, দেহ রক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য এক প্রকার সকল সুসভ্য মানব-সমাজই অবগত আছে। যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তৎ সম্বন্ধে সকলকেই শিক্ষা দেওয়া ঠিক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গীভূত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদেশবাসী সকলেই কতকটা উদাসীন। তদ্ধেতুই এ দেশ প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যমানুচরগণের নিত্য-লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। ব্যারামে ভোগা—চিকিৎসার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মূল্যবান স্বাস্থ্য হারাইয়া, শূন্য-মনে মর্ম্মান্তিক বিলাপে দিক্ দেশ পূর্ণ করা যেন এ দেশে একটা অভ্যস্ত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। দেশবাসিগণ যাহাতে ব্যারাম না আইসে, সেজন্য পূর্ব্ব হইতে ততটা মনোযোগ দিতে চাহে না। তাহাদের মৃত্যুর পর শেষ প্রবোধ "নিয়তি কেন বাধ্যতে"। যেন নিয়তির সংহার-দণ্ড একমাত্র দেশী লোকের উপরই ঘুরিতেছে।

৬। কংগ্রেসই বল, কনফারেন্সই বল, বিজ্ঞান ইন্‌সটিটিউটই বল, ধর্ম্ম-সভাই বল, স্বদেশী আন্দোলনই বল—দেশ হইতে অকাল-মৃত্যুর সহচর প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগগুলিকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে, বোধ হয় দেশে এমন দিন আসিবে যে বিজ্ঞান থাকিবে কিন্তু বিজ্ঞ আর থাকিবে না, ধর্ম্ম থাকিবে কিন্তু ধার্ম্মিক আর থাকিবে না, আন্দোলন থাকিবে কিন্তু স্বদেশী আর থাকিবে না; সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। পরন্তু যাঁহারা স্বদেশী বলিয়া গৌরব করেন, মাতৃ সেবক বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন, জাতীয়তা রক্ষার জন্য যাহাতে দেশে স্বাস্থ্যোন্নতির বিশিষ্ট বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া বিধেয়। এই জন্য সভা সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, ধনী লোকদের অর্থ সাহায্যের ব্যাপকতা ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীরদের জীবনোৎসর্গরূপ মহৎব্রতের প্রচুরতার তীব্র অভাব উপলব্ধ হইতেছে।

৭। সুস্থতার অরুণ রাগ দেশে ফুটাইতে হইলে, যতবিধ সুশৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, সংযমকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুসঙ্গত উপায়ে পরিমিত পবিত্র খাদ্য, পানীয়, বস্ত্রাদির বন্দোবস্ত ও ব্যায়াম (শ্রম) প্রথা প্রচলন করা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। দেশের দুর্দ্দিনে "মাক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম" নীতিকে একটুকু ঘরের বাহির করিয়া দিলেই আমরা দেখিব দেশের অবস্থা কি শোচনীয়। ধনীরা চর্ব্ব্যচুষ্য-লেহ্য পেয়াদি সুখসেব্য মূল্যবান সামগ্রী আবশ্যক হইতে প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করিতেছেন; আর ব্যায়ামের অভাবে উদরাময় বাত ইত্যাদি নানা ব্যাধিসহ-কোনমতে দিন গুলি কাটাইতেছেন। পক্ষান্তরে দেশের দশ—মুটিয়া-মজুর-কৃষক—যাহাদিগকে দিন-মজুরী করিয়া—গতর খাটাইয়া দিন কাটাইতে ও জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে কুৎসিত আহারে দিনের দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ধীর ভাবে ভাবিতে গেলে ইহা কতই না ভয়াবহ শোচনীয় পরিণামের বিষয়। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের দুইটা দিকই নাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে—ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণীই অতিরিক্ত আহারে ও অনাহারে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। যাহাতে দেশের সাধারণ লোক, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, কৃষককুল স্বাস্থ্যকর আবাসে থাকিতে পারে, পেট ভরিয়া দুমুটা খাইতে পারে, এবং পবিত্র জল বায়ুর উপকারিতা শরীরের উপর উপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য প্রচুর কাজের সৃষ্টি, আয়ের পন্থা আবিষ্কার ও কোন সঙ্গত উপায়ে শিক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থার প্রয়োজন। যাহাতে তাহাদের শুষ্ক ও ম্লান ওষ্ঠাধর ও অনশন-ক্লিষ্ট নয়ন-কোটর হইতে কালিমার রেখা চিরদিনের জন্য অপনীত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বিশুদ্ধ জল বায়ুর উপকারিতা ও দূষিত জল বায়ুর অপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য গ্রামে সভা, সমিতি ও প্রধান প্রধান সহরে সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে দেশের ভিক্ষুকগণ ভিক্ষার জন্য যেরূপ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, দেশের উন্নতিকামী লোকদিগকেও সেইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 'গাথা'—স্বাস্থ্য লাভের উপায়—নিরুপায় ও নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষদের নিকট গাহিয়া ফেরা ঠিক। স্বাস্থ্যের সহিত জন্মমৃত্যু ও জীবনের কি নিকট সম্বন্ধ তাহা প্রত্যেকে যাহাতে সুন্দররূপে আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তৎপ্রতি যত্ন লওয়া উচিত। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোকদের ঔদাসীন্য যাহাতে লোপ পায়, স্বাস্থ্যকে সুখের আকর বলিয়া যাহাতে তাহারা জানিতে পারে, তাহাও গভীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ঠিক। কার্য্য ব্যপদেশে ধনীদের অকাতর অর্থদান, দেশশুদ্ধ লোকের সহানুভূতি, অকাতর পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান নিরতিশয় আবশ্যক।

ঘণ্টা বাঁধিবে কে?

(২য় পর্য্যায়)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

জর্জ্জ রাসেল বলিয়াছেন—পল্লীতে মনের ও দেহের খাদ্যের (food for body as well as for soul) অভাব; তাই পল্লীবাসী সহরবাসের জন্য এত ব্যস্ত। কথাটি ভাবিবার বিষয়। পল্লীবাস অনেকেই ছাড়িয়াছেন; তার কারণ, সেখানে শিক্ষিতেরা নিজের রুচি বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন না। পল্লীবাস করিতে হইলেই মামলা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হয়। যিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে জানেন না অথবা দিতে চান না চতুর পল্লীবাসী তাঁহাকে মূর্খ উপাধি দিয়া থাকেন। অবশ্য কেবল মূর্খ উপাধি দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না—লোকটীকে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। ফলে তাঁহাকে সহরে পলাইয়া বাঁচিতে হয়। দেখা গিয়াছে, পল্লীতে বাস করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থ, লোকবল, চতুরতা ও বুদ্ধি থাকা অত্যাবশ্যক। পল্লীবাসী প্রতিবেশী দুষ্ট ও অর্থবান্ লোককে যতটা খাতির করেন বিদ্বান্ ও নিঃস্ব প্রতিবেশীকে ততটাই কৃপার চক্ষে দেখেন। যাঁহারা পল্লীগ্রামে কখনও যান নাই, এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না জানি; কিন্তু কথাটি সত্য। যিনি পল্লীসংগঠনকামী হইবেন—চতুর বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবেন, তাঁহাকে একটু চতুরও হইতে হইবে। আমি নানাপ্রকার সংগঠন কার্য্যে দেখিয়াছি যে কর্ম্মীর এই চতুরতার ও বিষয়-জ্ঞানের অভাব তাহার কার্য্য পণ্ড করিয়াছে।

পল্লীবাস করিতে হইলে দল পাকাইবার অথবা দলে যোগ দিবার মত প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। গুপ্ত কবি ঠিক বলিয়াছেন—

যেখানে বাঙ্গালী সেখানে দলাদলি।

পল্লীতে দলাদলির উত্তেজনা এত বেশী যে, অনেকে গ্রামে দলাদলি না জমাইতে পারিলে বেশ অসুবিধা হয়। মামলাবাজ একদল লোক প্রতি গ্রামে সংগঠনকামী লক্ষ্য করিয়া থাকেন—ইঁহারা বিরাট অধ্যবসায়ের সহিত প্রতিনিয়ত সৎপরামর্শ দিয়া পল্লীবাসীর মামলা মোকর্দ্দমার সহায়তা করেন। সৎপরামর্শ দিবার সময় ইঁহারা পারিশ্রমিক লন না সত্য, কিন্তু দেখা গিয়াছে, মামলা উপলক্ষে সহরে যাতায়াতে তাঁহাদের বেশ লাভ হয়। উকীল নিযুক্ত করা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বেশীর ভিটে ক্রোক্ হইয়া যাওয়ার দিন পর্য্যন্ত ইহারা অর্থ সমান ভাবেই রোজগার করেন। সংগঠনকামী

ইহাদিগকে ঘৃণা করিলে ইঁহারা একটুও দমিবেন না; পরন্তু তাহার নামে ২নং মামলা রুজু করাইবেন। আইন ইঁহারা পড়েন নাই, কিন্তু উকীলকে ইঁহারা শিখাইতে পারেন। সরকার দশ ধারার আসামী ঠিক করার সময় ইঁহাদের উপর কেন লক্ষ্য রাখেন না জানি না। পল্লীবাস করিতে হইলে ইঁহাদের অনুগত থাকিতে হইবে।

আমাদের এক বন্ধু বলিতেন—পঞ্চমকারে পল্লীজীবন ব্যতিব্যস্ত। তান্ত্রিকের পঞ্চমকার নহে—ইহারা বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য—মামলা, ম্যালেরিয়া, মহাজন, মামুলি ও মোহ। —মামুলি অর্থে গতানুগতিক জীবন যাপনের অভ্যাস; মোহ অর্থে পুলিশ ও নায়েবের প্রতি অহেতুকী ভক্তি। আমার সহরবাসী বন্ধুরা বলিবেন, এ নিন্দুকের নিন্দাবাদ। আমার বাঙ্গালীর পল্লী—

সে ত "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি দেখিয়াছি, পল্লীবাসীর জীবন এক দুঃস্বপ্নে ভরা। মেয়ে বড় হলেই বিয়ের ভাবনা অপেক্ষা জাতিপাতের দুঃস্বপ্ন ও পিতৃবিয়োগ হইলে শোক অপেক্ষা জ্ঞাতিভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজনের দুঃস্বপ্ন। আর স্মৃতি সে ত আরো দুঃখময়—একদিকে রঘুনন্দনের হাঁচি, টিক্‌টিকি—আর একদিকে পল্লীসমাজধ্বজদের গত অত্যাচারের বহু স্মৃতি।

সংগঠনকামীকে এই পুঞ্জীভূত বাধার সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এ বড় বিষম ঠাঁই। তুমি সেবা করিতে যাও, তাদের গ্রামে স্কুল খোলো, জঙ্গল কাট, অথবা মামলা মোকদ্দমা মিটাইবার চেষ্টা কর—পল্লীবাসী উহার মধ্যে মতলব (motive) আবিষ্কার করিবেই করিবে। সৎ কাজকে সৎ ভাবে গ্রহণ করার জন্য যে উদার চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন তাহা ইহাদের নাই।

তোমার মেয়ের ভাল বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে ইহাদের গাত্রদাহ হইবে—বরপক্ষকে পত্র দিয়া কুৎসা রটনা করিবে, অথবা নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিয়া নিজে যাইয়া নিন্দা করিয়া আসিবে—এমনই পরশ্রীকাতরতা! গল্প আছে যে, প্রতিবাসী-পুত্র মুন্সেফ হইয়াছে এ সংবাদে কেহ মনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'মুন্সেফ্ হইলে কি হয়—মাইনে পাবে না।'

কথায় কথায় বয়স্কদের মধ্যে ইতরজনোচিত গালাগালি হইতে দেখা যায়। সন্ধ্যায় বৈঠকে গঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে পরস্ত্রীর আলোচনাও কম হয় না। বয়স্থা কন্যা অথবা ভাদ্রবধূ যে বাড়ীতে থাকে তার আশে পাশেই শীষ্ দিতে দিতে গ্রাম্য মাতব্বরেরা যাতায়াত করেন। যাহারা নারী হরণ করেন রাত্রিতে, তাঁহারাই দিবাভাগে পাতিত্যের দোষে রমণীর বহিষ্কারের ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা মামলা করিতে যাইয়া কলিকাতায় মুরগী খান, তাঁহারাই গ্রামের কোন বাড়ীতে গোপনে, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের প্রতিবেশী-পুত্রেরা প্রীতিভোজন করিলে, তাহাদের কঠোর সামাজিক দণ্ড দেন। যে বিধবা অভাবের প্রবল তাড়নায় প্রতি দিন সমাজধ্বজদের কাছে ভিক্ষা করেন ও শেষে ভিক্ষা না মিলিলে অসতী হন, সমাজ-নেতারা গম্ভীরভাবে কালের দোষ দিয়া বলিবেন, বিধবা অসতী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। এমনই চমৎকার যুক্তি ইঁহাদের!

এই ত পল্লীর নৈতিক আবহাওয়া। এই সকল দুর্নীতির ফলে পল্লীজীবন এত ঘৃণ্য, এত ভয়াবহ হইয়াছে। বিপদে আপদে আর সে সহানুভূতি দেখা যায় না—গ্রামবাসীদের জীবনেও আনন্দ নাই। সন্ধ্যার পর নীরব পল্লীতে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখা যায়—আনন্দ কোলাহল নাই—হরিসভা কবে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? সংগঠনকামীকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ লক্ষ্য করিতে হইবে—ভাবিতে হইবে।

আমার মনে হয়, পল্লীর এই দুর্গতির কারণ শিক্ষিত ও গ্রামের শীর্ষস্থানীয়দের পল্লীত্যাগ। জমিদার পল্লী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ইয়ারকীর লোভে গিয়াছেন—মধ্যবিত্ত নোকরীর আশায় বাস্ত ভিটা ছাড়িয়াছেন। গ্রামে নেতাদের অভাবে গেঁজেলদের রাজত্ব হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণের মূর্খ পুত্রেরা পিতার নামের

দোহাই দিয়া অপঠিত শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া পল্লীবাসীকে ঠকাইয়া দুপয়সা করিতেছেন। ফলে আসিয়াছে ম্যালেরিয়া। টোল উঠিয়া গিয়াছে—গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ভাঙ্গিয়া সবাই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়াছেন।

যিনি পল্লীসংগঠন করিতে যাইবেন, তাঁহাকে প্রথমতঃ বাধা দিবে—প্রবীণ দল! দ্বিতীয়তঃ গ্রামের জমিদারের কর্ম্মচারিগণ; তৃতীয়তঃ গ্রামবাসী জন সাধারণ। কর্ম্মীর ধৈর্য্যও যেমন দরকার তেমনি দরকার দীর্ঘকালব্যাপী সংগঠন কার্য্যের। নৈতিক আবহাওয়া বদলাইতে হইলে শিক্ষিতদের গ্রামে ফিরিতে হইবে—নিজের জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়া ও নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের সাহায্যে পল্লীর দূষিত আবহাওয়া দূর করিতে হইবে।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নেরা ভোটের সময় নিরন্ন ও নিরক্ষর গ্রামবাসীকে কৃতার্থ করেন; আবার ভোটের পালা সাঙ্গ হইলেই 'কাকস্য পরিবেদনা।' এই সব মতলব লইয়া পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিশিতে গেলে, প্রকৃত সমবেদনার সৃষ্টি কখনও হইবে না—স্থায়ী মিলন হইবে না। 'চালাকী দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য্য হয় না।' ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে যে ব্যবধান গঠিত হইয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে—গুপ্ত কবির মত বলিতে হইবে

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

প্রেম আসিলেই অপ্রেম দূরীভূত হইবে; গ্রামে মনোমত খাদ্য মিলিবে—গ্রাম বাসযোগ্য হইবে।

(ক্রমশঃ)

বাংলার মাটী

(ইতিবৃত্ত)

[কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার]

বঙ্গের অমর কবি রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শী গানের সঞ্জীবনী শক্তিতে অনেকেরই হৃদয়ে বাংলার মাটী ও বাংলার জলের প্রতি সুষুপ্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির বাঁশরী-ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ চিরকালই মুখরিত এবং সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য যে টুকু কবিতা আবশ্যক বাংলায় কখনই সেটুকুর অভাব হয় নাই। সমাজের বিবর্ত্তনের জন্য কবিতার ন্যায় বিজ্ঞানও আবশ্যক। এতদুভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেবল কবিতারই রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে আমাদের চরিত্রের এক দিক্ বিকশিত হইয়াছে, অন্যদিক বিকশিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেরূপ সুখ হইতে পারি, তাহার রহস্য ভেদ করিয়া সেরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারি না। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, বাংলার মাটীর একদিক যেমন কবির মনোমোহন সঙ্গীতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, অপর দিক সেইরূপ বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয় নাই। বাংলায় কবি অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দুই একজন মাত্র দেখা দিয়াছেন।

কবির কল্পনায় বাংলার মাটী শস্য-শ্যামলা। কিন্তু বস্তুতঃ কি তাহাই? বাস্তবিকই কি বাংলার সর্ব্ব স্থানে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা এত অধিক যে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল জন্মিয়া থাকে? ফলতঃ তাহা নহে

এবং হইতেও পারে না। কারণ বাংলার সকল স্থানের মৃত্তিকা সম শ্রেণীর ভূস্তর হইতে উৎপাদিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সমুদায় কারণের উপর বঙ্গীয় মৃত্তিকা-তত্ত্বের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আকাশ-পথে ক্রমশঃ আবর্ত্তন করিতে করিতে উহা অনেক পরিমাণ আদিম তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগ অনেক পরিমাণে শীতল হইয়া গেলেও ইহার ভিতরে এত উত্তাপ সঞ্চিত আছে যে, তাহাতে লৌহ প্রভৃতি কঠিন ধাতুও দ্রব অবস্থায় রহিয়াছে। উপরের যে অংশ শীতল হইয়া কঠিনীভূত হইয়াছে তাহা প্রায় ২০ মাইল গভীর হইবে। এই ২০ মাইল গভীর ভূপঞ্জর যে একরকম উপাদানে প্রস্তুত অথবা উপাদানগুলি সকল স্থানে একভাবে সজ্জিত, তাহা নহে। পক্ষান্তরে ইহা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। পৃথিবীর বয়সের বৃদ্ধির সহিত এই সমুদায় স্তর ক্রমশঃ উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বনিম্ন স্তর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সর্ব্ব প্রথম উৎপাদিত। সর্ব্বোচ্চ স্তর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।

যদি পৃথিবীর প্রথম বয়স হইতে কোনরূপ নৈসর্গিক দুর্ঘটনা না হইত, তাহা হইলে স্তর গুলি উৎপত্তির সময় অনুসারে পর পর সজ্জিত থাকিত; কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ঝটিকা, নদ-নদীর স্রোত, বন্যা, সমুদ্রের তুফানোচ্ছ্বাস, বারিপাত প্রভৃতি ক্ষয়কারী শক্তি দ্বারা অনেক স্থানেই স্তরসমূহের আদিম সংস্থান ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। পুরাতন স্তর নূতনের উপর আসিয়াছে, নূতন পুরাতনের নীচে গিয়া পড়িয়াছে; সমুদ্রগর্ভ পর্ব্বতে উন্নীত হইয়াছে, পর্ব্বত সমুদ্র-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভূপঞ্জরের স্তরসমূহের আদিম সংস্থান-প্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপর দিকে অগ্রসর হইলে ভূপঞ্জরের যে সমুদায় স্তর দৃষ্ট হয়, সে গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। [১] এজোইক (Azoic) [২] পেলিওজোইক (Paleozoic) [৩] মেসোজোইক (Mesozoic) এবং [৪] নিয়োজোয়িক (Neozoic)। সর্ব্ব নিম্নস্তরে জীব অথবা উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তদূর্দ্ধ পেলিওজোইক যুগের স্তরসমূহে জীবনের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং বহুদিবস পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মেসোজোইক যুগের স্তরের সময় জলচর ব্যতীত স্থলচর জীবও উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কোন প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। নিয়োজোইক স্তরেই আমরা বর্ত্তমান সময়ের উদ্ভিদ্ ও জীব এবং তাহাদিগের জ্ঞাতি-দিগকে দেখিতে পাই। নিয়োজোইক শ্রেণীর প্লিওসিন্ নামক তৃতীয় স্তরেই প্রথম মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গ দেশে পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর স্তরই অল্প বিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ এজোইক্ এবং নিয়োজোইক শ্রেণীর স্তরের দ্বারা প্রায় সমভাবে বিভক্ত। এজোইক শ্রেণীর দুইটী সর্ব্ব-নিম্ন স্তরের নাম নিস্ (gneiss); একটী পুরাতন, অপরটী অপেক্ষাকৃত নূতন। অপেক্ষাকৃত নূতনটীকে Peninsular gneiss অথবা উপদ্বীপস্থ নিস্ বলে। বঙ্গ-দেশের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রায় ১৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩৫০ মাইল প্রস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই নিস্ অথবা প্রধানতঃ এই নিসজাত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যে সমস্ত প্রস্তর কিম্বা মৃত্তিকা সলিল-বাহিত কণা (পলি) দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেগুলিতে স্পষ্ট স্তরের পর স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ মৃত্তিকা অথবা প্রস্তরকে ভূ-বিদ্যায় Sedimentary (পলিজাত) প্রস্তর বলে। নিস্ শ্রেণীর প্রস্তর পলিজাত। কিন্তু পলিজাত হইলেও ইহা অত্যধিক উত্তাপ, চাপ প্রভৃতির দ্বারা এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত, বিপর্য্যস্ত ও স্থানচ্যুত হইয়া

গিয়াছে যে, উহার আদিম স্তরসমূহ অনেক সময় পরিলক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের প্রসারণী-শক্তির প্রভাবে নিম্ন হইতে এক দ্রবীভূত পদার্থ ইহার অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাকে গ্রানিট্ (granite) বলে। গ্রানিট্ আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভার ন্যায় উপরে উঠিয়া পড়ে না; জমির উপরিভাগের অনেক নিম্নে থাকিয়া যায়। গ্রানিট্ অবশ্য অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তর (igneous rock)। গ্রানিটে খনিজ পদার্থসমূহ অনিয়মিতভাবে মিশ্রিত। কিন্তু নিসে সেগুলি প্রায় সমরেখায় অবস্থিত, তরঙ্গায়িত পর্দ্দা হিসাবে সজ্জিত। নিস্‌কে পরিবর্ত্তন-সম্ভূত (metamorphic) প্রস্তর বলে। তাহার কারণ এই যে, ইহা আদত পলিজাত হইলেও চাপ, উত্তাপ ও ভূপঞ্জরের ইতস্ততঃ গতি-বিধিতে উহা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহা এক প্রকার পলিজাত ও অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তর হইতে কুঞ্চিত (Foliated) গঠন প্রণালী ও সম্ভেদ (cleavage) দ্বারা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। অপর পক্ষে ইহাদের নিয়তাকার এবং সময়ে সময়ে শর্করাবৎ গঠন প্রণালী ও পর্দ্দার (layer) অস্থায়ী অবস্থা ইহাদিগকে পলিজাত প্রস্তর হইতে পৃথক করিয়া দেয়। বঙ্গদেশে আন্দুল, বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ, ভাগলপুরের দক্ষিণাংশ, কটকের উত্তর ও পূর্ব্ব, দার্জ্জিলিং, গয়ার উত্তর ও দক্ষিণ, হাজারিবাগ, মানভূম, মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশ, পালামৌ, রাঁচি, সম্বলপুর, সিংহভূমের মধ্যাংশ ও সাঁওতাল পরগণা—প্রভৃতি জেলায় নিস্ অথবা পরিবর্ত্তন-সম্ভূত প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সমুদায় পরিবর্ত্তনসম্ভূত প্রস্তরে একেবারে তাহাদের আদিম অবস্থা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাদিগকে উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত (Submetamorphic) প্রস্তর বলে। উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত প্রস্তর নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে দৃষ্ট হয়;—বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিম, কটক (সামান্য), দার্জ্জিলিংএর দক্ষিণাংশ, গয়ার পূর্ব্বদিক (সামান্য), হাজারিবাগের উত্তর পূর্ব্ব, মানভূমের দক্ষিণাংশ, মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশ, পাটনার রাজগৃহ পর্ব্বতশ্রেণী, সম্বলপুর (সামান্য) ও সিংভূমের প্রায় সমস্ত।

নিস্-সম্ভূত স্থানের জমি অত্যন্ত ভগ্ন ও অসম বলিয়া উহাতে জল আটকাইতে পারে না। তজ্জন্য যে সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও সরস, সেইরূপ স্থানেই শীতকালে ফসল জন্মিয়া থাকে। উচ্চ জমিতে কেবল ভাদুই রবি শস্য হয়। নিস্‌জাত জমি অবশ্য গ্রানিট্‌জাত জমি অপেক্ষা ভাল। কিন্তু ইহাতে যে কোয়ারজ্ (Quartz) ও অভ্র আছে,-সে গুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিদ্ খাদ্য নাই।

পরিবর্ত্তনসম্ভূত ও উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত প্রস্তর-শ্রেণীর ঊর্দ্ধে বিন্ধ্য শ্রেণী (Vindhyan system) অবস্থিত। ইহাতেও জীব অথবা উদ্ভিদ-কঙ্কাল পরিদৃষ্ট হয় না। সাহাবাদ জেলার দক্ষিণাংশ এবং পালামৌ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের কিয়দংশ ব্যতীত বঙ্গের আর কুত্রাপি বিন্ধ্য শ্রেণীর প্রস্তর নাই। কিন্তু মধ্যভারতে প্রায় ৪০,০০০ মাইল ব্যাপিয়া এই শ্রেণীর প্রস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। বিন্ধ্য শ্রেণীর পর ভারতবর্ষে গন্ধবান শ্রেণীর আধিপত্য (Gondwana system); এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু ভারতে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্তর-সমূহের প্রায় কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। জলের ক্ষয়কারী শক্তি উহাদিগকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। গন্ধবান শ্রেণী —চারিটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত এবং পেলিওজোইক্ যুগের কার্ব্বনিফেরাস (carboniferous) স্তর হইতে মেসোজোইক্ যুগের জুরাসিক (Jurassic) স্তর পর্য্যন্ত সমস্ত স্তর ইহার অন্তর্ভূত। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে গন্ধবান শ্রেণীর উপশ্রেণী গুলির নাম :—(১) তালচের (Talchers) (২) দামোদর (Damodar) (৩) পঞ্চকোট (panchets) ও (৪) মহাদেব (Mahadevas)। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটী বিভাগ আছে, যথাঃ— (১) বরাকর (২) লৌহ প্রস্তর (৩) রাণীগঞ্জ। এই বরাকর বিভাগের স্তর হইতেই প্রধানতঃ এতদ্দেশে পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। পঞ্চকোট ও মহাদেব

উপশ্রেণীর প্রস্তর হইতে বালুকাময় জমি উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ গন্ধবান শ্রেণী সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। গন্ধবান শ্রেণী-জাত মৃত্তিকা সারবিহীন ও চাষ-আবাদের অনুপযুক্ত। আন্দুলের উত্তরাংশে, বর্দ্ধমানের উত্তর-পশ্চিম কোণে, কটকের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, হাজারিবাগ, মানভূম, পালামৌ, ও সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে, পুরীর পশ্চিমে ও রাঁচীর উত্তর-পশ্চিমে গন্ধবান শ্রেণীর প্রস্তর রহিয়াছে। পুরাকালে ভারতে এই শ্রেণীর প্রস্তর বহুল পরিমাণে বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার অধিকাংশ ভাগই বিলুপ্ত হইয়াছে।

মেসোজোইক যুগের শেষ ও নিয়োজোইক্ যুগের প্রারম্ভের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত তেজের ভয়াবহ বিকাশ হয়। এই ভীষণ ভূকম্পনে হিমালয় পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হয়। উপদ্বীপস্থ নিসের বিদীর্ণ অংশসমূহ (fissures) দিয়া এই সময় লাভা প্রবাহ বহির্গত হইয়া দক্ষিণ ভারতের নিসের অনেকাংশ আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপ লাভা আবৃত অংশের পরিমাণ দুই লক্ষ বর্গ মাইলের কম নহে এবং ইহা দাক্ষিণাত্য-ট্রাপ (Deccan trap) নামে পরিচিত। এই ট্রাপ হইতেই প্রসিদ্ধ রিগর অথবা দাক্ষিণাত্যের কালামাটি উদ্ভূত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রাজমহল পর্ব্বতের কিয়ৎ পরিমাণ স্থান ব্যতীত আর কোন স্থানেই রিগর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গ দেশের অনেক স্থানে ধূসর অথবা কৃষ্ণাভ ধূসর বর্ণ এক প্রকার জমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে লেটারাইট (Laterite) বলে। বালেশ্বর, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, কটক, মেদিনীপুর, পালামৌ, পুরী, রাঁচি প্রভৃতি জেলায় অল্প বিস্তর পরিমাণে লেটারাইট পাওয়া যায়। লেটারাইট—উহার অব্যবহিত নিম্নস্থিত প্রস্তরের ধ্বংসাবশেষ। সময়ে সময়ে এই ধ্বংসাবশেষ জল-প্রবাহ দ্বারা নিম্ন ভূমিতে নীত হইয়াছে এবং তথায় গিয়া আবার জমাট হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত প্রকার লেটারাইটকে নিম্ন ভূমিস্থ (Low level) এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারকে উচ্চ ভূমিস্থ (Highlevel) লেটারাইট বলে। বঙ্গদেশে লেটারাইট প্রায়ই নিম্নভূমিস্থ লেটারাইট। অত্যন্ত জমাট লেটারাইট জল সংরক্ষণ করিতে পারে না বলিয়া উহাতে ভাল গাছ জন্মে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত চূর্ণীভূত লেটারাইটে মন্দ জমি হয় না।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তর-স্তরের বিষয় বিবৃত হইল সেইগুলিই বঙ্গদেশের ভূপঞ্জর গঠন করিয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় এই সমুদায় স্তর ব্যতীত টারসিয়ারী (Tertiary) উপ-যুগের কয়েকটী স্তর দৃষ্ট হয়। এই জেলায় ভূপঞ্জরের অবস্থান সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, আধুনিক স্তরগুলি উপরে উঠিয়াছে। এরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ সম্ভবতঃ স্তরসমূহের মুদ্রন (folding) এবং স্থানচ্যুতি (Fouling)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের মৃত্তিকা পলিস্তর ও নিসস্তর দ্বারা প্রায় সমভাবে বিভক্ত। পলিস্তর (Indo Gangetic Alluvium) নিয়োজোইক যুগের অন্তর্গত এবং ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক স্তর। ইহা নিম্নস্থিত প্রস্তরাদির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের নিস্ স্তর এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের নিস্ ও নিস্-জাত অপরাপর মৃত্তিকার মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ পলিক্ষেত্র অবস্থিত। অন্যদিকে ইহা পঞ্চনদ হইতে আরম্ভ হইয়া আসাম অঞ্চলে শেষ হইয়াছে। এই ভারত প্রান্ত-ব্যাপী ক্ষেত্রের পরিমাণ তিন লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না।

উৎপত্তির হিসাবে পলিস্তরকে নূতন ও পুরাতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। উভয়ের মূল ভিত্তি অভ্র ও চূর্ণসংযুক্ত কর্দ্দম। পুরাতন পলিস্তর অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং ক্রমাগত জলস্রোত দ্বারা ইহার উপরিভাগ ধৌত হওয়ায় ইহা অনেকটা তরঙ্গায়িত। পক্ষান্তরে নূতন স্তর নূতন বালি সংযোগে গঠিত হইতেছে। গঙ্গার ব-দ্বীপ (Delta) এই স্তরের অন্তর্গত। পুরাতন স্তরে কাঁকড় নামে পরিচিত কার্ব্বনেট অব লাইমের গুটি পাওয়া যায়। ইহা হইতে ঘুটিং চুণ প্রস্তুত

হয় ও ইহা রাস্তা ঘাট ও গৃহভিত্তি-গঠনে ব্যবহৃত হয়। বিহার অঞ্চলে ও বঙ্গদেশের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্রাকার যে এক প্রকার কাঁকড় পাওয়া যায়, তাহা মিশ্রিত লৌহ পেরকসাইড (iron peroxide) ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থানে স্থানে ইহাকে বনবুট বলিয়া থাকে। নূতন স্তরে এই উভয় প্রকারের কাঁকড়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ পলিস্তরও আছে যাহা নূতন কি পুরাতন তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। ভাগীরথীর পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত বদ্বীপ নূতন পলিস্তরের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উত্তর ভাগ বন্যা-পৃষ্ঠা (Flood level) হইতে অনেকটা উচ্চ হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণাংশ এখনও বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে নূতন স্তরের জমি ৪৮১ ফুট বসিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় একটী ৪৮১ ফুট গভীর কূপ খনন কালে দেখা যায় যে, উহার নিম্নে আধুনিক সময়ের শম্বুক কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা দ্বারা উক্ত অনুমান অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার দ্বারা আরও বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের বিশাল পলিজাত ভূখণ্ডের পূর্ব্বে সিন্ধুনদের দিক দিয়াই জল নিষ্কাশিত হইত। বঙ্গ উপসাগরের সম্মুখীন দেশ বসিয়া যাওয়ায় এখন দুই দিক দিয়াই জল নিকাশ হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে নূতন স্তরের জমিসমুদায় অপেক্ষাকৃত অধিক উর্ব্বরা; কারণ উহাতে বৎসর বৎসর পলি পড়ে। পক্ষান্তরে পুরাতন স্তরের জমিতে নদীসমূহ পার্ব্বতীয় নদী এবং উহাদের জলবেগ এত অধিক যে, উহাতে পলি পড়া দূরে থাকুক, বরং মৃত্তিকা ধৌত হইয়া নিম্নস্থানান্তরিত হয়। উপরিস্তরের মৃত্তিকা সাধারণতঃ কর্দ্দম বহুল হইলেও অধস্থ স্তরসমূহে পৃথক পৃথক বালুকা, কর্দ্দম ও দোয়াঁশ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী স্তর অনেক স্থলে যথেষ্ট গভীর। আবার উপরের মৃত্তিকা স্থানে স্থানে কেবল শুষ্ক বালুকাময়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকার অধস্তন স্তর দ্বারা জল নিষ্কাশিত না; এবং তজ্জন্য সলফেট্ ও কার্ব্বনেট অব্ সোডা প্রভৃতি ক্ষার জমিয়া মৃত্তিকা একবারে অনুর্ব্বর করিয়া দেয়। বিহার অঞ্চলেই এরূপ জমি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গ দেশের পলিস্তর ও নিসর্জাত ক্ষেত্রসমূহের মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভারি কাদা, কাদা, কাদা-দোয়াঁশ, দোয়াঁশ, বেলে দোয়াঁশ, বালি। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই কয়েক জাতীয় মৃত্তিকার নাম বিভিন্ন। ভারি কাদাকে বিহারে বলে করেল ও বঙ্গে এঁটেল অথবা মেটেল বলিয়া থাকে।

এই স্বাভাবিক মাটী পরীক্ষা করিয়া উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ ও কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদির পোষণ উপযোগী খাদ্য বা সারের দ্বারা মৃত্তিকার সচরাচর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকেন। আমরা এখন বাংলার ফুল, ফল, ও শস্যের উপযোগী করিবার জন্য যে যে কৃত্রিম খাদ্য বা সার যোগ করিয়া যে যে ফসলের উপযোগী মাটি প্রস্তুত করিব ক্রমান্বয়ে তাহাই বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেশবন্ধু-স্মরণে!

আজ সমগ্র ভারতের উপর দিয়া শোকের বন্যা বহিয়া যাইতেছে! সেই ভাবধারা আজ সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে! বঙ্গমাতার প্রিয় সন্তান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মানবলীলা সংবরণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন! বাঙ্গালা মায়ের কোল শূন্য হইয়াছে! বাঙ্গালী জাতি নেতৃবিহীন অনাথ হইয়াছে! বাঙ্গলার রাজনীতিতরণী কর্ণধার বিহীন হইল! জগতের সহিত ভারতের রাজনীতিক দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ না হইতেই ভারত দেউলিয়া হইয়া পড়িল!

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একা বাঙ্গালা মায়ের সন্তান নহেন—তিনি ভারত মাতার প্রিয়তম সন্তান। তাঁহার রাজনীতি-চতুরতা হয় ত বিশমার্ককেও পরাজিত করিতে সমর্থ ছিল। চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তায়, কল্পনার প্রসারতায়, ভাবের গভীরতায়, সংগঠন নৈপুণ্যে, চিন্তার মৌলিকতায় চিত্তরঞ্জন প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ দেশ-সেবক মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত ভারতে আর কেহ নাই। যে কাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন—তাঁহাকে সকলের পুরোভাগে দেখা যাইত। ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে তিনি যেমন সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন,—তাঁহার ন্যায় প্রচুর অর্থও কেহ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, আইন-জ্ঞানে ও আইন-ব্যবসায়ীর গুণপনায়ও কেহ তাহার সমকক্ষ ছিলেন না—আবার সেই প্রভূত আয় এক কথায় বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় একেবারে সন্ন্যাসী সাজিতেও আর কেহ পারেন নাই!

তিনি যে স্বরাজ্য দল গঠন করিয়া গিয়াছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার প্রভাব তাঁহার দলের শত্রুগণকেও একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে। দেশ-সেবা যে ছেলেখেলা নহে—অবসর-বিনোদনের সৌখিন উপায় মাত্র নহে—তাহা তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া, সকলের চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছিলেন। দেশ-সেবা যে রীতিমত কাজ, উহা যে একনিষ্ঠ হইয়া একাগ্র চিত্তে করিতে হয়, অনন্যমনা হইয়া না করিলে যে দেশ-সেবা করা হয় না, তাহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য তিনি ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় এবং তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উহাতেই মনে প্রাণে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দানে দাতাকর্ণ, প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম, কর্ম্মশক্তিতে হার-কিউলেস, রাজনীতিজ্ঞতায় চাণক্য, ত্যাগে বুদ্ধ,—চিত্তরঞ্জন তাঁহার অননুকরণীয় চরিত্র মহিমায় ভারতে নেতৃত্বের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র নারায়ণের বন্ধু ছিলেন বলিয়া দেশবন্ধু সার্থকনামা পুরুষসিংহ। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তিনি স্বয়ং কারাবরণ করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র আত্মজকেও জেলে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। Lawless law বা বেআইনী আইনের কার্য্যতঃ প্রতিবাদ তাঁহার মতন করিয়া আর কেহই করিতে পারেন নাই।

চিত্তরঞ্জনের মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিবামাত্র সমগ্র দেশ একবাক্যে তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ দূরদর্শিতা বলে তিনি স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া যে রাজনীতিক ব্রহ্মাস্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহার প্রয়োগে তিনি বার বার সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, যে সফলতা ভারতের আর কোন রাজনীতিকের ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন দেশব্যাপী যে ভাবের বন্যা ছুটিল, তাহার তরঙ্গ সমুদ্র পারস্থিত দেশগুলির পর্য্যন্ত কূলে কূলে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। দার্জিলিং হইতে শবদেহ যখন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল, তখনকার দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না, এবং যে দেখে নাই, তাহার মত দুর্ভাগ্যও কেহ বোধ হয় নাই। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা হইতে ষ্টেসনে তাঁহার শবদেহের প্রতীক্ষা; তার পর যতই সময় যাইতে লাগিল ততই লোক সমারোহের বৃদ্ধি। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে পাঁচ ছয় লক্ষ নর-নারীর একত্র সমাবেশ এই কলিকাতাতে পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া কেহ স্মরণ করিতে পারেন না। সমগ্র দেশ-ব্যাপী সম্পূর্ণ হরতালও আর কখনও এমন করিয়া হয় নাই। এই যে শোক-প্রবাহ ইহা দেশবাসীর হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে স্বতঃস্ফূরিত, ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র ছিল না। এই যে কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয়—ইহাও স্বতঃস্ফূরিত—কাহাকেও এতটুকু অনুরোধ করিতে কিম্বা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় নাই। দেশের মনের উপর

যাঁহার এমন প্রভাব তিনি যে কত বড় মহান্ তাহার সম্যক্ ধারণা করাও সহজ নহে।

মৃত্যুকালে দেশবন্ধুর বয়স ৫৫ বৎসরের অধিক হয় নাই। ইহা কি মরিবার বয়স? কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের মহৎ-জীবন প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না। সার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন বয়সেও বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষম আছেন। স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরোজী মহোদয়ও প্রায় পরিণত বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্তের কথা ছাড়িয়া দিতে হয়; কারণ, এগুলি নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু অকাল-মৃত্যুই যেন এ দেশের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন মহৎ জীবনের কথাই ধর না কেন, মৃত্যুকালীন বয়সের সন্ধান লইলেই দেখা যায়, তাঁহাদের অকাল মৃত্যু হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশ-সেবকেরা দেশের ও দশের সেবায় যখন প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যান। এবং হয়ত এমন ভাবে আপনার অস্তিত্ব ভুলিতে না পারিলে বুঝি বা দেশ-মাতৃকার সম্যকপ্রকারে সেবাও করা যায় না!

পথ্য-চিকিৎসা

(২)

"আহার এবং ঔষধ—দুইই" এই রকম একটা প্রবচন আমাদের দেশে খুব চলিত আছে। যে বস্তু ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, অথচ পীড়ারও উপশম করে, তাহার আদর আমাদের কাছে খুবই বেশী। এইরূপ কয়েকটি বস্তু আমরা অতি পবিত্র বলিয়া মনে করি, এবং কত আদর করিয়া তাহাকে মিষ্ট মিষ্ট নামে অভিহিত করি। যেমন বেল বা শ্রীফল, আনারস, পেঁপে প্রভৃতি। এই সকল বস্তু কেবল যে সুখাদ্য তাই নয়, ইহাদের সমুচিত ব্যবহারে পীড়ার উপশমও হইয়া থাকে।

শ্রীফল অতি সুখাদ্য। ইহা যেমন সুস্বাদু ফল, তেমনি তৃপ্তিদায়ক খাদ্য। বেলের সরবৎ গ্রীষ্মকালে অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। সামান্য পেটের অসুখে, বিশেষতঃ আমাশয় রোগে বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রীফল ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকারও পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পাকা অপেক্ষা কাঁচা বেলই সমধিক প্রশস্ত। বেলের মোরব্বা চমৎকার খাদ্য ও ঔষধ। কাঁচা বেল পোড়াইয়া খেজুরে গুড় সহ তরুণ আমাশয়ে অতি প্রসিদ্ধ পথ্য। তবে অবশ্য পীড়ার কঠিন অবস্থায় চিকিৎসকের মত না লইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে।

সুপক্ক সুমিষ্ট পেঁপে যেমন তৃপ্তিকর খাদ্য, তেমনি স্নিগ্ধ। অথচ, ইহার হজমীশক্তি অদ্ভুত বলিলেই চলে। কাঁচা পেঁপের তরকারী, চাটনী প্রভৃতিরও এই গুণটি বিশেষ ভাবে আছে। তাছাড়া, কাঁচা পেঁপে হইতে পেপসিন নামক একটী ঔষধও প্রস্তুত হয়। তাহারও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কবিরাজীশাস্ত্রে কাঁচা ও পাকা পেঁপের গুণের বর্ণনার শেষ নাই। কাঁচা পেঁপে দুই এক ফোঁটা আটা কলা বা অন্য কোন দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

শতমূলী নামক একটী পদার্থ পল্লীগ্রামে অযত্নে স্বতঃই প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ইহার সহিত সকলেই বোধ হয় অল্লাধিক পরিমাণে পরিচিত। ঔষধার্থ ত ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ই। তাহা ছাড়া খাদ্যরূপেও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে। ইহার অনেক গুণ। মোরব্বার আকারে ইহা বেশ সুখাদ্য খাদ্য। অথচ ইহা স্নিগ্ধতাগুণসম্পন্ন, এবং চক্ষুর পক্ষে উপকারী। সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের স্তনে দুগ্ধ কম

গেলে, ইহা কিছু দিন নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে আবার স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ সঞ্চার হয়। তাহা ছাড়া, ইহা বলকর পথ্য। কবিরাজ মহাশয়েরা ইহার বিলক্ষণ আদর করিয়া থাকেন।

আমলকীও এইরূপ একটী মহাগুণসম্পন্ন বনজাত ফল। দুই প্রকার আমলকী আছে। এইটী ঔষধার্থে এত বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে, ইহার অপর এক নাম অমৃত ফল। কবিরাজী শাস্ত্র মতে আমলকী ত্রিদোষ—বায়ু, পিত্ত, কফ—নাশক। রক্তপিত্ত, ও প্রমেহ রোগে আমলকীর মোরব্বা মহোপকারী পথ্য পর্য্যায় ভুক্ত। রোগ প্রশমনার্থ আমলকী ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করিলে চিকিৎসকগণের মত লইয়া ব্যবহার করা উচিত। কারণ, ব্যবহার ভেদে ইহার গুণের তারতম্য হয়। আর শুধু খাদ্যরূপে আমলকীর মোরব্বা পরিমিত মাত্রায় স্বচ্ছন্দে সকল সময়ে সকল অবস্থায় খাওয়া যায়।

উচ্ছে আমাদের গৃহিণীগণের একটী অতিপ্রিয় তরকারী। প্রাচীনা গৃহিণীরা উচ্ছের তরকারীর ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগ প্রশমন করিতে পারিতেন। জ্বরের পর অরুচি হইলে উচ্ছের সুক্ত যে কি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন তাহা কে না জানেন? অরুচি নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। উচ্ছের ব্যঞ্জন সপ্তাহে দুই একদিন নিয়মিত ভাবে ভক্ষণ করিলে জ্বর, পিত্ত, কফ প্রভৃতি রোগ দমন করিয়া থাকে। সম্প্রতি উচ্ছের আর এক গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা নিয়মিত ভক্ষণে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না—ইহা না কি বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ প্রতিষেধক। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা ও বিস্তৃত ভাবে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

হেলেঞ্চাশাক পল্লীবাসীদের কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। ইহা স্বভাবজাত শাক। কালেভদ্রে লোকের যখন খাইবার সাধ যায়, তখনই লোকে ইহা কিঞ্চিৎ তুলিয়া লইয়া যায়। ইহার তরকারী খাইতে তেমন সুমিষ্ট না হইলেও, ইহা মহোপকারী পথ্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্যতঃ ইহা শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশক। কিন্তু ব্রাহ্মীশাক নামে ইহা বিবিধ ঔষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী রোগের তরুণ অবস্থায় গৃহস্থলোকে ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইলে উপকৃতই হইতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

খাদ্য সংরক্ষণ।—

দীর্ঘকাল ধরিয়া খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করিতে হইলে দুইটী উপায় অবলম্বন করা হয়; যথা, বোরিক এসিড ব্যবহার বা বরফ ব্যবহার। ইয়োরোপের অনেক দেশে, বিশেষতঃ বিলাতে লোক সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হয় না। সেই সকল দেশকে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। দূরদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে তাহা পাছে বিকৃত হইয়া যায়, সেই জন্য হয় বোরিক এসিড ব্যবহার করিয়া, না হয় বরফের বাক্সে খাদ্য রাখিয়া তাহা

জমাইয়া লইয়া খাদ্য চালান দিতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, বোরিক এসিড ব্যবহার করিলে খাদ্য বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটি অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষার জন্য বোরিক এসিডের ব্যবহার প্রশস্ত নহে। কিন্তু গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার জন গ্লেইষ্টার নিজে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বোরিক এসিড ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক মহাশয় কয়েকটি বোরিক এসিডের কারখানার মজুরদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দশ বারো বৎসর ধরিয়া বোরিক এসিডের কারখানায় কাজ করিতেছে এমন স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বদা বোরিক এসিড লইয়া নাড়া চাড়া করিলেও এবং কারখানার আবহাওয়া বোরিক এসিডের সূক্ষ্ম চূর্ণে পূর্ণ থাকিলেও এবং তাহা মজুরদের শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া অনবরত তাহাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চিত হইতে থাকিলেও তাহাদের স্বাস্থ্য উত্তম। বিশেষতঃ তিনি বলেন যে, বরফে জমাইয়া খাদ্য দূরদেশে প্রেরণ করা চলিলেও, সেখানে উহা বরফের বাক্স হইতে বাহির করিবার পর অল্পক্ষণ মধ্যেই পচিয়া যাইতে পারে। অতএব বরফ অপেক্ষা খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষার পক্ষে, বোরিক এসিড বহু গুণে উৎকৃষ্ট। এখন গবর্মেণ্ট কোন মত গ্রহণ করিবেন তাহা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই কলিকাতা সহরে বরফের বাক্সে মৎস্য আমদানীর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সহরে লোক সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, মৎস্যের আমদানীও তদনুপাতে বাড়িতেছে; তথাপি মৎস্যের মূল্যও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি কেবল মৎস্য ব্যবসায়ীদের অতি লোভ—profiteering এর ফল। বাজারে যথেষ্ট মৎস্য আমদানী হওয়া সত্ত্বেও মৎস্য ব্যবসায়ীরা কতক মাছ বরফের বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়া খরিদ্দারকে কম মাছ দেখাইয়া অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিয়া থাকে। যে দিনকার আমদানী সে দিন বিক্রীত না হইলেও তাহাদের কোন ক্ষতি নাই—বরফের ভিতরে থাকিয়া পর দিন কিম্বা আরও দুই চারি দিন পরে নিশ্চয়ই বিক্রীত হইয়া যাইবে। বরফের এরূপ ব্যবহার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাংস কিম্বা মাখন বিলাতে রপ্তানী করিতে হইলে বরফের ঘরে (cold storage) উহা রক্ষা না করিলে চলে না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ দূর হইতে কলিকাতায় বরফের বাক্সের ভিতর মৎস্য আমদানী করিবার পর কেবল বেশী দাম আদায় করিবার জন্য সেই মৎস্য দুই চারি দিন ধরিয়া বরফের ভিতর রক্ষা করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। সকলেই জানেন, টাটকা মৎস্যের স্বাদ এক রকম, আর দীর্ঘকাল বরফে রক্ষিত মৎস্যের স্বাদ আর এক রকম। বরফে রক্ষা করিলে মাছ না পচিতে পারে, কিন্তু উহার স্বাদ নিশ্চয়ই বিকৃত হইয়া যায়—ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে মতন খাইতে লাগে। আমরা আশা করি, কর্পোরেশন এ দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন; কেবল মৎস্য আমদানী করিবার সময়ই এবং সেই জন্যই বরফ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবেন, কিন্তু এখানে বরফের ভিতর মাছ আটকাইয়া রাখিতে দিবেন না। তাহা হইলে মৎস্যের মূল্য কিছু কমিতে পারিবে, গরীব লোকে একটু আধটু মাছ খাইয়া বাঁচিবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩২ সাল | ৫ম সংখ্যা

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নির্দ্দেশ

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

(১) পুষ্টি বা পরিপোষণ।

আমরা জানি যে, জীবন ধারণ করিতে হইলে, অন্ততঃ পাঁচ প্রকারের খাদ্য আবশ্যক; যথা:—

(১) শ্বেতসার বা শালি জাতীয় খাদ্য—যেমন, ভাত, তরকারী, অথবা আটা-ময়দা বা ছাতু ও শাকসব্জী, অথবা ফল-মূল।

(২) আমিষ বা মাংস জাতীয় খাদ্যদ্রব্য—যেমন—মাছ, মাংস, ডিম অথবা ডাল বা ডালের তৈয়ারি পাঁপর, বড়ি, বড়া, ধোঁকা প্রভৃতি; অথবা ছানা।

(৩) স্নেহজাতীয় পদার্থ—যেমন, ঘি, তেল, মাখন, চর্ব্বি।

(৪) লবণ মসলা ও জল।

(৫) ভাইটামীন্ নামক একপ্রকারের পদার্থ। ইহা দুধে, টাট্‌কা শাকসব্জীতে, টাট্‌কা মাংসে, ঘৃতে, মুগের ডালে প্রভৃতিতে আছে। ["টাটকা" কথাটি স্মরণ-যোগ্য।]

এই পাঁচ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে—

(১) মাংস জাতীয় খাদ্য হইতে—দেহের গঠন, পুষ্টি ও ক্ষয় পরিপূরণ ঘটিয়া থাকে। এবং

(২) শালী জাতীয় খাদ্য হইতে ও (৩) স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতে } দেহের কার্য্যশক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

শিশুদিগের সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা বলিবার আছে; প্রথমটি এই যে প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকদের তুলনায় তাহাদিগের শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে;—এই জন্য শিশুদের দেহে স্বভাবতঃ বেশী মেদ থাকে, এবং এই জন্যই, শিশুখাদ্যে (দুধে) মাখনের ভাগ যথেষ্ট থাকা চাই; কারণ, স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতেই দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়। যে দুধে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, সে দুধে অপর উৎকৃষ্ট দুধ হইতে ক্রীম (নবনীত ?) মিশাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিশুদিগের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হইতে থাকে; এ কারণে, তাহাদিগের

জমাইয়া লইয়া খাদ্য চালান দিতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, বোরিক এসিড ব্যবহার করিলে খাদ্য বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটি অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষার জন্য বোরিক এসিডের ব্যবহার প্রশস্ত নহে। কিন্তু গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার জন গ্লেইষ্টার নিজে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বোরিক এসিড ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক মহাশয় কয়েকটি বোরিক এসিডের কারখানার মজুরদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দশ বারো বৎসর ধরিয়া বোরিক এসিডের কারখানায় কাজ করিতেছে এমন স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বদা বোরিক এসিড লইয়া নাড়া চাড়া করিলেও এবং কারখানার আবহাওয়া বোরিক এসিডের সূক্ষ্ম চূর্ণে পূর্ণ থাকিলেও এবং তাহা মজুরদের শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া অনবরত তাহাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চিত হইতে থাকিলেও তাহাদের স্বাস্থ্য উত্তম। বিশেষতঃ তিনি বলেন যে, বরফে জমাইয়া খাদ্য দূরদেশে প্রেরণ করা চলিলেও, সেখানে উহা বরফের বাক্স হইতে বাহির করিবার পর অল্পক্ষণ মধ্যেই পচিয়া যাইতে পারে। অতএব বরফ অপেক্ষা খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষার পক্ষে, বোরিক এসিড বহু গুণে উৎকৃষ্ট। এখন গবর্মেণ্ট কোন মত গ্রহণ করিবেন তাহা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই কলিকাতা সহরে বরফের বাক্সে মৎস্য আমদানীর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সহরে লোক সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, মৎস্যের আমদানীও তদনুপাতে বাড়িতেছে; তথাপি মৎস্যের মূল্যও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি কেবল মৎস্য ব্যবসায়ীদের অতি লোভ—profiteering এর ফল। বাজারে যথেষ্ট মৎস্য আমদানী হওয়া সত্ত্বেও মৎস্য ব্যবসায়ীরা কতক মাছ বরফের বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়া খরিদ্দারকে কম মাল দেখাইয়া অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিয়া থাকে। যে দিনকার আমদানী সে দিন বিক্রীত না হইলে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই—বরফের ভিতরে থাকিয়া পর দিন কিম্বা আরও দুই চারি দিন পরে নিশ্চয়ই বিক্রীত হইয়া যাইবে। বরফের এরূপ ব্যবহার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাংস কিম্বা মাখন বিলাতে রপ্তানী করিতে হইলে বরফের ঘরে (cold storage) উহা রক্ষা না করিলে চলে না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ দূর হইতে কলিকাতায় বরফের বাক্সের ভিতর মৎস্য আমদানী করিবার পর কেবল বেশী দাম আদায় করিবার জন্য সেই মৎস্য দুই চারি দিন ধরিয়া বরফের ভিতর রক্ষা করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। সকলেই জানেন, টাটকা মৎস্যের স্বাদ এক রকম, আর দীর্ঘকাল বরফে রক্ষিত মৎস্যের স্বাদ আর এক রকম। বরফে রক্ষা করিলে মাছ না পচিতে পারে, কিন্তু উহার স্বাদ নিশ্চয়ই বিকৃত হইয়া যায়—ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে মতন খাইতে লাগে। আমরা আশা করি, কর্পোরেশন এ দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন; কেবল মৎস্য আমদানী করিবার সময়ই এবং সেই জন্যই বরফ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবেন, কিন্তু এখানে বরফের ভিতর মাল আটকাইয়া রাখিতে দিবেন না। তাহা হইলে মৎস্যের মূল্য কিছু কমিতে পারিবে, গরীব লোকে একটু আধটু মাছ খাইয়া বাঁচিবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩২ সাল | ৫ম সংখ্যা

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নির্দ্দেশ

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

(১) পুষ্টি বা পরিপোষণ।

আমরা জানি যে, জীবন ধারণ করিতে হইলে, অন্ততঃ পাঁচ প্রকারের খাদ্য আবশ্যক; যথা:—

(১) শ্বেতসার বা শালি জাতীয় খাদ্য—যেমন, ভাত, তরকারী, অথবা আটা-ময়দা বা ছাতু ও শাকসব্জী, অথবা ফল-মূল।

(২) আমিষ বা মাংস জাতীয় খাদ্যদ্রব্য— যেমন— মাছ, মাংস, ডিম অথবা ডাল বা ডালের তৈয়ারি পাঁপর, বড়ি, বড়া, ধোঁকা প্রভৃতি; অথবা ছানা।

(৩) স্নেহজাতীয় পদার্থ—যেমন, ঘি, তেল, মাখন, চর্ব্বি।

(৪) লবণ মসলা ও জল।

(৫) ভাইটামীন্ নামক একপ্রকারের পদার্থ। ইহা দুধে, টাট্‌কা শাকসব্জীতে, টাট্‌কা মাংসে, ঘৃতে, মুগের ডালে প্রভৃতিতে আছে। ["টাটকা" কথাটি স্মরণ-যোগ্য।]

এই পাঁচ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে—

(১) মাংস জাতীয় খাদ্য হইতে—দেহের গঠন, পুষ্টি ও ক্ষয় পরিপূরণ ঘটিয়া থাকে। এবং
(২) শালী জাতীয় খাদ্য হইতে ও
(৩) স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতে } দেহের কার্য্যশক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

শিশুদিগের সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা বলিবার আছে; প্রথমটি এই যে প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকদের তুলনায় তাহাদিগের শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে;—এই জন্য শিশুদের দেহে স্বভাবতঃ বেশী মেদ থাকে, এবং এই জন্যই, শিশুখাদ্যে (দুধে) মাখনের ভাগ যথেষ্ট থাকা চাই; কারণ, স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতেই দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়। যে দুধে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, সে দুধে অপর উৎকৃষ্ট দুধ হইতে ক্রীম (নবনীত ?) মিশাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিশুদিগের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হইতে থাকে; এ কারণে, তাহাদিগের

খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মাংস জাতীয় পদার্থ থাকা চাই; এবং তাহা দুধে ছানার আকারে যথেষ্টই থাকে।

আমরা মানুষ—কতকটা প্রকৃতির তাড়নায় ও কতকটা নিজ বুদ্ধি, যুক্তি ও গবেষণার ফলে, উপরের উক্ত নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া লইয়াছি। এখন যদি প্রকৃতির লীলার দিকে দৃকপাত করি, তবে ঠিক উপর্য্যুক্ত বিধানের পোষক প্রমাণই পাইব।

একটা যে কোনও ছোলার বীজকে যদি মাটিতে পুঁতি, এবং পুঁতিবার ২।৪ দিন পরে তাহাকে উঠাইয়া পরীক্ষা করি, তবে কি দেখিতে পাই? দেখিব যে, ছোলার বীজের দুইটি দলের মাঝখান হইতে "কল" বা অঙ্কুর উঠিয়াছে। যদি কোনও প্রকারে উহার উত্তাপ লইতে পারি, তবে দেখিব যে, ছোলার ভিতরকার "কল" উদ্গমের (জন্মের) সঙ্গে সঙ্গে, ছোলার ভিতরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে, ছোলার ভিতরের শাঁস ক্রমশঃ পাতলা হইয়া কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোলার ভিতরের শাঁসটি কি? উহা ঐ অঙ্কুরের খাদ্য। উহাতে আছে—শ্বেতসার ও শর্করা, সামান্য পরিমাণে স্নেহ পদার্থ এবং যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ জাতীয় পদার্থ। অঙ্কুরটি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে উহার শিকড় নিম্নাভিমুখী, এবং পত্র-পল্লবের আভাষ মাত্র যাহা উদ্গত হইয়াছে—উভয়েই নানা জাতীয় কোষ দ্বারা সুরক্ষিত। অঙ্কুরটি সূর্য্যালোকের দিকে পত্র পল্লবগুলিকে চালিত করে এবং পৃথিবীর দিকে মূলকে চালিত করে। উহার প্রথমাবস্থায় সমস্ত খাদ্যই ঐ বীজের দুইটি দল হইতে প্রাপ্ত হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, সূর্য্যকিরণ সাহায্যে ও ভূমি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

গাছপালা ছাড়িয়া যদি কোনও একটি ডিম ভাঙিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, উহার মধ্যে স্নেহবহুল "কুসুম" ও খাঁটি আমিষ জাতীয় অণ্ডলালা থাকে। এই উভয় জাতীয় খাদ্য খাইয়াই ডিমের মধ্যে ভ্রূণটি বাড়ে।

ফল কথা উদ্ভিদই বল, পক্ষীদের কথাই বল, আর স্তন্যপায়ী জীবের কথাই বল,—সকল অবস্থাতেই জ বা গর্ভস্থ শিশুর খাদ্য প্রায় একই উপাদানযুক্ত; যথা—

	আমিষ জাতীয়,	স্নেহ জাতীয়,	শ্বেতসার জাতীয়
স্ত্রীলোকের দুগ্ধ	২·২৯	৩·৮১	৬·২০
গো দুগ্ধ	৩·৫৫	৩·৬৯	৪·৮৮
ডিমের কুসুম ও লালা	১৩·৫	১·৬০	——
ছোলার শাঁস	২১·৭	৪·২	৫৯·০

এখানে বক্তব্য এই যে মানব-শিশুরা স্ত্রীলোকে ও গরুর দুধ বহুকাল ধরিয়া পান করে; কাযেই, উপরে শতকরা হার হিসাবে দুধের উপাদানগুলি ব দেখাইলেও, মোটের উপরে, মানব ও গো শিশু বহু পরিমাণে ঐ সকল উপাদান পাইয়া থাকে। ভ্রূণাবস্থায় স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণেরা মাতৃ-খাদ্যের অংশ মাতৃদে হইতে "ফুলের" সাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বৃক্ষের বীজটি কঠিন ত্বকের মধ্যে সুরক্ষিত। অঙ্কুরটি যখন বাহির হয়, তখন তাহার শিকড়ের প্রান্তে কঠিন ত্বক থাকে। এবং যতদিন না উহা বেশ বড় হয়, ততদিন উহার উপরাংশটি কঠিন ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে। অণ্ড হইতে যে যে প্রাণী জন্ম গ্রহণ করে, তাহারাও যতদিন না বেশ পুষ্ট ও সক্ষম হয়, ততদিন অণ্ডের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। পরে অণ্ড ভে করিয়া বাহির হইলেও, কিছুকাল তাহাদের মা তাহাদিগকে নীড়ের মধ্যে আটকাইয়া রাখে, নয় পোকা-মাকড় ধরিয়া আনিয়া স্বয়ং শিশুদিগে গুষ্ঠাভ্যন্তরে ছাড়িয়া দেয়, চরিবার সময়ে, উড়িবা সময়ে, ও প্রথম-প্রথম আহার্য্য সংগ্রহের সময়ে, বয় কাছে-কাছে থাকে। মানুষের বেলায় এই মা সাহচর্য্য ও লালন পালন আরো বেশী কঠিন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী।

মোট কথা এই দাঁড়াইতেছে—জীবের জীবনে প্রথমাবস্থাতে, তাহার পরিপোষণের ভার প্রকৃতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য, সর্ব্বত্রই সকল প্রাণীরই (১) ভ্রূণাবস্থায় পাঁচ জাতীয় খাদ্যের আয়োজ থাকে; এবং (২) ভ্রূণ ও শৈশবাবস্থায় প্রত্যে

প্রাণীরই মাতৃ-স্নেহের ভিতর দিয়া অথবা অপর কৌশল দ্বারা রক্ষণা-বেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত আছে।

(২) ভোজন ও পরিপাক ক্রিয়া।

খাদ্যের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চারিটি; যথা—শারীরিক পুষ্টি, ক্ষয় পরিপূরণ, কার্য্য করিবার ক্ষমতার সঞ্চার, দৈহিক উত্তাপ রক্ষা। এই হিসাবে খাদ্যের উদ্দেশ্য বিচার করিলে আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে একই ব্যাপার দেখিতে পাই।

উদ্ভিজ্জেরা মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া তাহা কাণ্ড ও শাখার মধ্যে চালিত করে; কাণ্ড ও শাখাগুলি আবশ্যকীয় পদার্থ ঐ রস হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখে। পত্রগুলি বায়ু হইতে অক্সিজেন ও কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড্ নামক বাষ্পদ্বয় আকর্ষণ করিয়া, আপনার প্রয়োজন মত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্প সংগ্রহ করিয়া রাখে। ঐ কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পই শ্বেতসার গঠনে নিযুক্ত হয়। শ্বেতসার গাছের মাঝ-(পিথ) ও প্রত্যেক উদ্ভিদকোষের মধ্যে থাকে। মূল রস সংগ্রহ করে; কাণ্ড ও শাখা রস সঞ্চারিত করে; পত্র বায়ু হইতে গৃহীত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ বাষ্পকে সূর্য্যালোকের সাহায্যে শ্বেতসারে পরিবর্ত্তিত করে। এই শ্বেতসারই জীবজন্তুর ভোজ্য। সূর্য্যালোক শ্বেতসার প্রস্তুত কার্য্যে প্রধান সহায়ক বিধায়ে, গাছপালা মাত্রেই সূর্য্যাভিমুখী হয়।

উদ্ভিদ্ জগৎ ছাড়িয়া প্রাণী জগতে আসিলে, আমরা দেখিতে পাই—কতকগুলি প্রাণী উদ্ভিদ্‌ভোজী, অপর কতকগুলি মাংসাশী। উদ্ভিদ্‌ভোজী অধিকাংশ প্রাণীই অপর প্রাণীর খাদ্য—যেমন মাছ, ছাগল, মেষ, গো, মহিষ, শূকর, হরিণ। মাংসভোজী প্রাণীরা অধিকাংশই অপর উদ্ভিদভোজী প্রাণীর ভোক্তা—যেমন বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। যাহারা উদ্ভিদভোজী—উক্ত উদ্ভিদ খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাহাদের দেহের মধ্যে কত প্রকার ব্যবস্থা আছে। কাহারো গ্রীবা দীর্ঘ, কাহারো সম্মুখে এক পাটি দাঁত নাই; কাহারো জিহ্বা অতীব দীর্ঘ, কেহ লাফাইয়া বা উড়িয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতে পারে, কাহারো চক্ষু আছে; কাহারো গলদেশে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য, কাহারো খাদ্য নরম করিবার জন্য থলি থাকে; কোন কোনও জানোয়ারের পাকস্থলী চারিটি কক্ষে বিভক্ত, ইত্যাদি।

মানুষের বেলায়—হস্তপদাদি আছে খাদ্য সংগ্রহের জন্য; এবং পরিপাক কার্য্যের জন্য আছে নানা জাতীয় রস।

উদ্ভিদেরা তরল ও বায়বীয় খাদ্য খায় বলিয়া উহাদিগের দন্ত বা পাকস্থলীর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ভূমি হইতে রসকে আকর্ষণ করিয়া, উক্ত রসকে সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য যে কৌশলের প্রয়োজন, তাহা উহাদের দেহে আছে। এবং পত্র মাত্রেই সবুজবর্ণ হয়; ঐ সবুজবর্ণটি, ক্লোরোফিল্ নামক এক প্রকারের রঞ্জন পদার্থ থাকার ফল। উক্ত ক্লোরোফিল সূর্য্য কিরণের সাহায্যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ বাষ্পকে শ্বেতসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এই জন্য গাছের যে দিকে সূর্য্য-কিরণ-পাত হয়, সেই দিকেই গাছ বাড়ে এবং সেই দিকেই সবুজ পত্র থাকে। ইতর প্রাণী ও মানুষ কঠিন খাদ্য খায় বলিয়া উক্ত খাদ্য আহরণের জন্য উহাদের দেহে নানা জাতীয় কৌশল বর্ত্তমান আছে; এবং খাদ্য কঠিন বলিয়া ঐ কঠিন খাদ্যকে ক্ষুদ্রাংশে পরিণত করিবার জন্য, নরম করিবার জন্য, এবং তরল করিবার জন্য নানা প্রকারের বন্দোবস্ত তত্তদ্দেহে বর্ত্তমান আছে। কাযেই বেশ বুঝা গেল যে, উদ্ভিদই হউক, আর ইতর প্রাণীই হউক, আর মানুষই হউক—সকলের পক্ষেই খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিবার মূল নিয়ম এক; কিন্তু জীবভেদে, উক্ত প্রক্রিয়ার কৌশলের বিভিন্নতা বর্ত্তমান আছে।

(৩) রক্ত সঞ্চালন।

রক্ত চলাচলের উদ্দেশ্য—খাদ্যের পরিপাচক রসকে দেহের প্রত্যেক স্থানে লইয়া যাওয়া এবং দেহের দূরা-তিদূর স্থান হইতে তত্তৎ স্থানের মল সংগ্রহ করিয়া,

তাহার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। গাছের দেহের মধ্যে রক্ত না থাকিলেও রস সঞ্চালিত হয়। ইতর প্রাণীর দেহের মধ্যে ঐ প্রকারে ভুক্ত খাদ্যের রসের অথবা জলের অবাধ সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। এবং নরদেহে হৃৎপিণ্ড ও শিরাধমনী সাহায্যে রক্তসঞ্চালনের কথা অবিদিত নাই। ফল কথা, প্রকৃতির রাজ্যে বহুর মধ্যে একত্বেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যতঃ দেখিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর জীবনের গতি, স্থিতি, ধারণের উপায় ও প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই একই নিয়মানুগ।

(৪) শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ও মলত্যাগ।

যেমন প্রস্রাব ও মল ও ঘর্ম্ম দেহের ময়লা, তেমনি আমাদের নিঃশ্বাস বায়ুও দেহের ময়লা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, গাছপালার সবুজবর্ণ পত্রের সাহায্যেই গাছের আবশ্যকীয় খাদ্য প্রস্তুত ও সংগৃহীত হয়। এক্ষণে আরো বলি যে, গাছপালার পত্রের নিম্নদিকে সূক্ষ্ম ছিদ্র অসংখ্য আছে; গাছ তাহার দেহ হইতে ঐ ছিদ্রপথে অপ্রয়োজনীয় বাষ্প নিষ্কাশন করে। উহাই উদ্ভিদের নিঃশ্বাস কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মাছ, তাহার কানকোর সাহায্যে, জল হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে, এবং জলের উপরিভাগে উঠিয়া মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তদ্ব্যতীত মাছ মলত্যাগও করে। মূত্রত্যাগের কথা জানা নাই। পোকা, মাছ, পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতিরা স্বতন্ত্র মূত্রত্যাগ করে না; তাহাদের মল ও মূত্র একত্রে বাহির হয়। কিন্তু, বড় বড় জন্তুর বেলায় প্রস্রাব ও মল উভয়ই স্বতন্ত্র নির্গত হয়। মানুষেরা, আরো এক ধাপ উঁচু; তাহারা তাহার উপরে, ঘর্ম্ম নামক পদার্থ দ্বারা দেহের মল বাহির করে।

কাজেই উদ্ভিদ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত—যে দিকেই তাকাও, দেহ হইতে সকলেই মল ত্যাগ করে—তবে সে মল ও তাহার ত্যাগের প্রণালী অবস্থাভেদে নানা প্রকারের।

(৫) স্নায়ুর কার্য্য।

উদ্ভিদের স্নায়ু আছে কি না তাহা জানা নাই—অর্থাৎ, নরদেহে, মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্নায়ু রজ্জু যে ভাবে আস্তৃত আছে, উদ্ভিদ দেহে সেই রূপ স্নায়ু বিন্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও, উদ্ভিদদেহে স্নায়ুর কার্য্য নিরন্তর ঘটে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। পরগাছা লতাগুলি সে ভাবে অপর বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া উঠে, তাহাতে উক্ত পরগাছার বোধশক্তি প্রমাণিত হয়। গাছের শিকড় যে ভাবে রসের দিকে, বা বিঘ্ন ঠেলিয়া ধাবিত হয়, তাহাতেও বোধশক্তির প্রমাণ পাই। গাছের পাতা ও ডাল রৌদ্রের অভিমুখে কোন্ প্রেরণায় ধাবিত হয়? রৌদ্র-রোদ তাহাদের স্নায়বিক কার্য্যের পরিচায়ক নয় কি? ফুল দিনে মুদ্রিত হয় এবং রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয়—ইহাও তাহাদের বোধশক্তির পরিচায়ক নয় কি? লজ্জাবতী লতা স্পর্শে কুঞ্চিত হয় কেন?

নিকৃষ্ট জীবদেহে সম্পূর্ণ স্নায়বিক বিকাশ না থাকিলেও, স্নায়বিক কার্য্যের পরিচয়ের অভাব নাই। আরসুলা, ইন্দুর, প্রভৃতির শুঁড় ("গোঁফ") অত্যন্ত স্পর্শবোধক। গভীর ও ময়লা জলে আলোক পাত করিলে, মৎস্যেরা সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কেন্নো মাকড় প্রভৃতি স্পর্শ মাত্রেই বোধ করে। কুকুরের আঘ্রাণ শক্তি অতীব প্রবল। আরসুলা, পিপীলিকা ও ইন্দুরের ঘ্রাণশক্তি বেশ প্রবল। কাযেই, বেশ দেখা যাইতেছে যে শ্রীভগবান সমস্ত প্রাণী জগৎ একই আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন—গাছই হউক আর মাছই হউক, স্নায়বিক কাজ উভয়েই দর্শায়—তবে কাযের তারতম্য অস্বীকার করিবার যো নাই।

(৬) সন্তানোৎপাদন।

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই প্রাণীর সৃষ্টি। প্রত্যেক প্রাণীর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য—বংশ রক্ষা করা। "বংশ" বলিলে, তদ্‌গত বিশেষ ধর্ম্মগুলির উপরে লক্ষ্য করা হয়।

উদ্ভিদ জগতে, এক জাতীয় ফুলের পুংরেণু তজ্জাতীয় স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরে মধু মক্ষিকা কর্ত্তৃক আনীত হইলে, তবে ফলোৎপাদিত হয়। কোনও কোনও একই ফুলে পুং ও স্ত্রী কেশর বর্ত্তমান থাকে। এই গেল গর্ভোৎপাদন প্রক্রিয়া। জীবজন্তু ও মানুষের বেলায় আসল প্রক্রিয়াটি ঠিক এইই, যদিও কার্য্যকালে কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র। তৎপরে, গাছের প্রত্যেক ক্রূণ (ফলের বীজ) উপযুক্ত জমী পাইলেও, শৈশব প্রভৃতি দশা প্রাপ্ত হইতে পারে না, বিধায়ে প্রত্যেক গাছের অজস্র বীজ জন্মে—দশ বিশটি বীজ নষ্ট হইলেও, আর দশবিশটা জমীতে লাগিতে পারে, এই উদ্দেশ্য। তৎপরে, যাহাতে বাতাসে উড়িয়া (যেমন তুলার বীজ), জলে ভাসিয়া (যেমন ডাব), জীবজন্তু কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া (যেমন আম, বেল ইত্যাদি) নানাস্থানে বীজ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা আছে। এক যায়গায় বা একদেশে বহু লোকের বাস ঘটিলে, যেমন খাদ্যাদি দুর্ম্মূল্য ও মড়ক উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ কারণেই, প্রাকৃতিক উপায়ে, গাছের বীজ স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা আছে। মানুষে ও ইতর জন্তুরা স্ব স্ব শিশুকে বহুকাল ধরিয়া আগলাইয়া রাখে এবং খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেয় ও লালন পালন করে। গাছের বেলায়, তাহার বীজ উৎপাদন কার্য্যে পর্য্যন্ত জীবজন্তুর সন্তানোৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—তাহার পরে আর হয় না। গাছ বীজ উৎপাদনের বেলায় বহু যত্ন করে; তাহার উপরে একধাপ উঠিলে দেখা যায় যে ক্রিমি কীটেরা বা মৎস্যেরা নির্জ্জন স্থানে ডিম পাড়ে। আর একধাপ উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে পক্ষীরা নীড় বাঁধে ও ডিমে তা দেয়। আরো একধাপ উঠিলে দেখিতে পাই যে, বড় বড় জানোয়ারেরা বহু দিবস স্ব স্ব সন্তানকে স্তন্যদান করে ও কিছুকাল পরে শিশুকে সঙ্গে করিয়া আহার্য্য অন্বেষণ করা শিখায়। চরমধাপে উঠিলে, মানুষের বেলায় দেখা যায় যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া রীতিমত লালন পালন, চিকিৎসা ও শিক্ষাদান করিয়া তবে নর-শিশুকে মানুষ করা সম্ভবপর হয়! এই জন্য সৃষ্টির ক্রমাগত যতই উন্নত স্তরে উঠা যায়, ততই জনক জননীর অপত্য স্নেহের ও অপত্য প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই অপত্য স্নেহের প্রেরণাতেই জনক জননী মাতৃতত্ত্ব, শিশুতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন।

(৭) কুলগত দোষগুণ।

উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর পক্ষে কুলক্রমাগত দোষ-গুণগুলি অতীব সুপ্রকট। প্রাণী জগতের এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, শিকারী কুকুর ও ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, দশবিশ উর্দ্ধতন পুরুষের দোষ গুণ পায় বলিয়া, ঘোড়ার ও কুকুরের বংশ পরিচয়ের পুস্তক পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদেশে পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তক দৃষ্টে নর ও মাদা ঘোড়া ও কুকুর লোকে কিনিয়া থাকে। হায়! মানুষের বেলা রূপান্ধ মোহ বা অর্থ লালসাই যৌন সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়। সেখানে প্রকৃতির নির্দ্দেশকে আমরা অগ্রাহ্য করি। তাহার ফলে, আজ পৃথিবীতে জরা, অল্পায়ুতা অকাল মৃত্যুর এত বেশী বাড়াবাড়ি!!! কিন্তু এদেশের হিন্দুরা সামাজিক ব্যাপারে প্রকৃতির নির্দ্দেশকে অবহেলা করিতেন না। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এই জন্যই কুলাচার্য্যেরা এ দেশে পাত্র ও পাত্রীর উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষের কুলের সংবাদ রাখিতেন। এখনকার সমাজে কুলাচার্য্য নাই—কুলাচার প্রতিপালন করা দোষাবহ হইয়া পড়িয়াছে! "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ" বলিয়া যে প্রবাদ বচনটি এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও কুলাগত দোষ-গুণের সংক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদের পরীক্ষাগারে নানা জাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণে নানা রকমের নূতন জাতীয় গাছপালা তৈয়ারি করা হইতেছে—সেখানে ভিন্ন দুই জাতীয় উদ্ভিদের কুল-ক্রমাগত দোষগুণের সংমিশ্রণে তৃতীয় দোষগুণ সমন্বিত উদ্ভিদ উদ্ভূত হইতেছে। এত দেখিয়া এত শুনিয়াও আমরা পাঁটী বিক্রয় করার ন্যায় কন্যার

বিবাহ দিয়া থাকি। কাযেই পাঁঠাধর্ম্মবিশিষ্ট সন্তানাদিও জন্মে।

(৮) ব্যাধির সংক্রমণ

ঘাম মাখা একটা জামা বর্ষার দিনে ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহার যায়গায় যায়গায় কাল দাগ ধরে—ইহাকে "মসী" বা "ম'ষে" বলে। কিন্তু খুব খট্‌খটে শুক্‌না দিনে রৌদ্রে জামা টাঙাইয়া রাখিলে ঐ রূপ কিছুই হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—

রৌদ্রহীন	বাতাসশূন্য
আলোক শূন্য	স্যাঁতস্যেঁতে

এই চারিটি জিনিষের একত্র মিলন হইলেই সেখানে নানা প্রকারের জীবাণু জন্মায়। জীবাণুরা এত সূক্ষ্ম উদ্ভিদ বা প্রাণী যে, তাহাদের এক লক্ষটি একত্রিত হইলে তবে সূচের অগ্রভাগটি যত বড় ততটুকু দেখায়। এই জীবাণুরা—

রৌদ্র, বাতাস ও আলোর অভাব } এমন জায়গায়
স্যাঁতস্যেঁতে ভাবের আধিক্য } জীবাণুরা বাড়ে।

এবং

রৌদ্র, হাওয়া ও আলো পাইলে } জীবাণুরা মরিয়া
স্যাঁতস্যেঁতের অভাব ঘটিলে } যায়।

মসী, "ছাতার" মত এক জাতীয় অতীব সূক্ষ্ম উদ্ভিদ। মসীর মত অনেক জীবাণু আমাদের দেহে বাসা বাঁধে যদি আমরা কিছুদিন—

অন্ধকার	স্যাঁতস্যেঁতে
রৌদ্রহীন	বায়ুহীন

ঘরে বাস করি। এই জন্য, গরীবদিগকেই যত ছোঁয়াচে ব্যারাম প্রথম ও বেশী করিয়া ধরে। ছোঁয়াচে ব্যারাম বলিলে—ক্ষয়কাশ, হাম, বসন্ত, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, সর্দ্দি, টাইফয়েড জ্বর, আমাশয়, ইত্যাদিকে বুঝায়। এসকল ব্যারামই নিবার্য্য। কিসে তাহা নিবারিত হয়, তাহা বুঝা সহজ। সহরে বা গ্রামে বড় বড় রাস্তা, ও চওড়া রাস্তা করিয়া দিলে, প্রত্যেক পল্লীতে অনেকটা খোলা যায়গা রাখিলে; সূর্য্যালোকের গতি অবাধ হয়, তাহার উপরে গ্রামের জল নিকাশের জন্য ভাল ড্রেণ প্রভৃতি করিলে, রোগ জীবাণুরা বাসা বাঁধিতে পায় না। এই জন্যই—সরকারকে রাস্তা বাহির করিবার ও খেলার জন্য পার্ক বা উদ্যান করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতে হয়। এই জন্যই ড্রেণ বসাবার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে সরকারের নিকটে বাটীর নক্সা দিয়া পাস করাইয়া লইতে হয়—পাছে বাড়ীর কোনও অংশ অস্বাস্থ্যকর থাকে। আমরা অন্যায় করিয়া রাগ করি—আমাদের টেক্স দিতে খুঁত খুঁত করি, আমরা লুকাইয়া বাড়ীর ভিতরে অনেক কিছু করি; কিন্তু সে সব কার ক্ষতি কার?

পল্লী-সংগঠন

রাজনীতির মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা দিন কতকের জন্য বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু মোহের ঘোর কাটিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। রাজনীতিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে পল্লী-সংগঠন করিতে হইবে, এ তত্ত্ব সহজেই বুঝা গেল। সেই জন্য আমাদের স্বরাজ-সাধনার প্রথম সোপান হইতেছে, পল্লী-সংগঠন।

পল্লী সংগঠন করিতে হইলে, যাহারা পল্লী ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছে প্রথম তাহাদিগকে পল্লীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু পরিত্যক্ত পল্লী এখন যত্ন অভাবে শ্রীহীন, নানাবিধ রোগের আকর। সেখানে বাসে ফিরিয়া যাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পল্লীগুলিকে বাসের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে—তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইবে।

পল্লী সংগঠনের ন্যায় এরূপ একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে স্বদেশের এবং বিদেশের নানা অবস্থার খবর লইতে ও রাখিতে হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমনই থাক, এখন যে সে অবস্থা খুবই হীন, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কিন্তু প্রতীচ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের অবস্থা আমাদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নহে। স্বাস্থ্য—বিশেষতঃ গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষার সেখানে সুব্যবস্থা কিরূপ, আমরা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিব।

আমেরিকার মফঃস্বলের গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য বেতনভোগী স্বাস্থ্য-কর্ম্মকারীগণ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকেন—তাঁহারা অপর কোন কাজই করেন না। গৃহস্থ লোকের নিত্য নৈমিত্তিক ও দৈনন্দিন অপরিহার্য্য কার্য্যগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলিও অন্যতম এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই গ্রাম্য স্বাস্থ্য-রক্ষার কার্য্যক্ষেত্র প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসর নূতনভাবে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-বিভাগ এই সকল কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। গ্রাম্য-চিকিৎসকেরা, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং জনসাধারণ সর্ব্বদা এই বিভাগের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্যের প্রণালী বিভিন্ন রকমের হওয়াই সম্ভব। তবুও কতকগুলি বিষয়ে সকল জেলার অবস্থাই প্রায় সমান। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ অবস্থার উল্লেখ করিলে সকলে বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা সেইজন্য যথাসম্ভব সাধারণ ভাবে বিষয়টি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কোন জেলায় স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী স্বাস্থ্য বিভাগ স্থাপন করিতে হয়। এরূপ বিভাগ স্থাপন করিতে হইলে কিছু অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কর্ত্তৃপক্ষকে অতি বিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, যদি জনসাধারণ এই অর্থ ব্যয় অনাবশ্যক কিম্বা অপব্যয় বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে মুস্কিল। সুতরাং সাধারণের মনের ভাব বুঝিয়া অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন কল্পে অর্থ ব্যয় করিলে জনসাধারণ বিরক্ত হইবে না বুঝিলে তবে তাঁহারা অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সাধারণের মনের ভাব কেমন করিয়া বুঝিবেন? তাহার উপায়টিও অব্যর্থ, এবং সে উপায়টি হচ্ছে—লোক-মত গঠন করা। অর্থাৎ প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণকে স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের উপকারিতা, এ বিষয়ে অর্থব্যয়ের সার্থকতা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ বিষয়ে সাধারণের মন স্বতঃই পূর্ব্ব হইতে অনেকটা প্রস্তুতই থাকে। গ্রামের ও গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টার কথা শুনিলে কেই বা প্রসন্ন না হয়? কর্ত্তৃপক্ষ কেবল সেই সুপ্ত ভাবটিকে জাগাইয়া দেন, লোকদিগকে ভাবিতে, আলোচনা করিতে এবং সিদ্ধান্ত করিতে সুরু করাইয়া দেন। লোকশিক্ষা আরম্ভ করিবার সময় জেলার কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় চিকিৎসকগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অপরাপর উপায়ও অবলম্বিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া, জেলার প্রধান প্রধান লোকদের লইয়া স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিও নানা প্রকারে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। যখন অধিকাংশ লোক স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের উপকারিতা বুঝিতে পারে, তখন স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন কল্পে সাধারণ অর্থব্যয় করিতে গেলে লোকে যে আপত্তি করিবে না, ইহা অনেকটা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জনসাধারণ যখন কোন স্থানে স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তখন আন্দোলন উপস্থিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষকে উহার আবশ্যকতা জানানো হয়। ইহার ফলে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। জেলার কর্ত্তারা অনেক সময় নিজেরাই স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এরূপ

স্থলে সাধারণের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভের জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের উপকারিতা ও কার্য্যবিধি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহার সফলতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

সকল জেলায় সমান ভাবে কাজ করিবার সুবিধা হয় না। স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। কোন সময়ে কোথাও কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তদুপলক্ষে স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের উপকারিতা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া খুব সহজ হয়; এবং এই উপলক্ষে উহা স্থায়ীভাবে স্থাপনও করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যবিভাগ গঠনপ্রণালী

কোন জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় নগরের লোক সংখ্যা ৫০০০০এর কম হইলে গ্রাম ও নগরের জন্য সম্মিলিত ভাবে স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপিত হইলে খরচ কম হয়, কার্য্যেরও সুবিধা হয়। এই সম্মিলিত বিভাগের জন্য একজন হেল্‌থ অফিসার বা স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীই যথেষ্ট। অবশ্য স্থল-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হওয়াও অসম্ভব নহে। স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সরকারী আইন ও স্থানীয় আইন, আদেশ, বিধিব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন। কোনরূপে আইন লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরই হাতে থাকা উচিত। তবে যোগ্য লোক যাহাতে নির্ব্বাচিত হয়, সরকার সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন, এবং প্রয়োজন হইলে হস্তক্ষেপ করিবেন। যেখানে সরকারের হস্তক্ষেপ করার সুবিধা হইবে না, সেখানে সরকারের বিবেচনায় অযোগ্য লোক নিযুক্ত হইলে সরকার কোন অর্থ সাহায্য করিবেন না, এবং পূর্ব্ব হইতে অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন। তবে রাজনীতিক দলাদলির ত্রিসীমানায় কেহ যাইবেন না। যোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হইতে দেখিলে সরকারও কোনরূপে হস্তক্ষেপও করিবেন না। মোট কথা, খুব গুরুতর প্রয়োজন না ঘটিলে সরকার স্থানীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি স্থানীয় চিকিৎসক সমাজের অনুমোদিত হইলে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা হয়—কার্য্যে কোন গোলযোগ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। নচেৎ প্রতি পদে বাধা-বিঘ্ন ঘটা বিচিত্র নহে। স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন কি না, তাহার কৈফিয়ৎ জেলার কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকারকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় (private practice) চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না—তিনি কেবল মাত্র তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবেন। সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরই এ পদে নিয়োগ বাঞ্ছনীয়।

সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগে এমন একজন স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী থাকিবেন, যিনি পল্লী স্বাস্থ্যবিভাগ সংগঠন কার্য্যে পরামর্শদাতারূপে কার্য্য করিতে পারিবেন। শিশু স্বাস্থ্য, যক্ষ্মাকাস, যৌনপীড়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন; তাঁহার পরামর্শ অনুসারে গ্রাম্য স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে, যেখানকার যেরূপ প্রয়োজন তদনুরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারিবে। দরকার হইলে সরকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বিশেষ পরামর্শ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এইরূপ ভাবে জেলায় জেলায় সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট জেলাগুলিকে উৎসাহ দানের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি, প্রধান ব্যয়ভার জেলার অধিবাসীদেরই সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়। জেলার আয়তন ভেদে ব্যয়েরও তারতম্য হয় এবং জেলাবাসীদের আগ্রহের উপর স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের অস্তিত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে।

একজন 'বারোমেসে' অর্থাৎ (full-time ; ইনি আর অন্য কোন কাজ কিম্বা অবসর সময়ে স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারিবেন না) চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী, একজন সেবিকা (nurse) ও একজন পরিদর্শক কর্ম্মচারী হইলে ছোট ছোট জেলাগুলির কাজ এক রকম চলিয়া যাইতে পারে। জেলার আয়তন বড় হইলে সেবিকা ও পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। আর অফিসের কাজ চালাইবার জন্য কেরাণী ভৃত্য প্রভৃতি আরও দুই একজন করিয়া লোক আবশ্যক হইতে পারে। ইহাদের ভ্রমণ ব্যয় চাই, অফিসবাড়ী ও তাহার কার্য্য পরিচালনের ব্যয় প্রভৃতিও আছে। স্থল বিশেষে, অর্থাৎ যেখানে কোন একটা বিশেষ পীড়ার বেশী প্রাদুর্ভাব, সেখানে সেই পীড়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও রাখিতে হয়। এইরূপে কোন জেলায় দন্ত-চিকিৎসক, কোথাও স্যানিটারী এঞ্জিনীয়ার, কোথাও জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি প্রদেশে এই সকল কার্য্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯টি রাজ্যের ৭৬টি জেলায় সকল ব্যয়ভার সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ প্রদান করিতেছেন। আর রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য-বোর্ড ২৩টি প্রদেশের ১০৫টি জেলাকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

স্বাস্থ্য-বিভাগের কাজ কি কি ?

জেলার স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান ও প্রথম কাজ— লোকশিক্ষা। যে সকল রোগ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অপর এক ব্যক্তির শরীর বা এক স্থান হইতে অপর স্থানে সংক্রামিত হয়, তাহা কিরূপে হয়, এবং সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতিরই বা উপায় কি ? এই সকল বিষয়ে লোককে শিক্ষা দান।

এই শিক্ষা দিবার কয়েকটি উপায় আছে।

(১) বক্তৃতা। সুযোগ থাকিলে, চিত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, নক্সা, মানচিত্র, আদর্শ চিত্র বা মূর্ত্তি এবং চলচ্চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে বক্তৃতাগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া।

(২) পুস্তিকা। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ ও অন্যান্য সূত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে পুস্তিকা রচিত, মুদ্রিত ও বিতরিত হইবে।

(৩) স্থানীয় সংবাদপত্রে সংবাদ বা প্রবন্ধরূপে স্বাস্থ্যতত্ত্বের আলোচনা।

(৪) জেলায় কোন মেলা, প্রদর্শনী, সম্মিলনী, নাচ-তামাসা প্রভৃতি উপলক্ষে একস্থলে অনেক লোকের সমবেত হইবার সম্ভাবনা হইলে সেখানে স্বাস্থ্য প্রদর্শনীও খোলা যাইতে পারে, এবং প্রদ্রষ্টব্য পদার্থগুলির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(৫) স্বাস্থ্যরক্ষার উপকারিতা ও আবশ্যকতা লোককে বুঝাইয়া দিবার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন।

অবশ্য কেবল বিভাগীয় বেতনভোগী মুষ্টিমেয় ঐ জন কতক লোকের দ্বারা এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে স্বাস্থ্য বিভাগ মতলব বাহির করিবেন, এবং সাধারণ সভাসমিতির বা স্বেচ্ছা সেবকগণের সাহায্যে যথাসম্ভব কার্য্য পরিচালন করিবেন।

সংক্রামক রোগ নিবারণ

স্বাস্থ্যবিভাগের দ্বিতীয় কার্য্য সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করা। কোন স্থানে সংক্রামক কোন রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা শুনিলেই, সেই রোগ যাহাতে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িতে বা সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া পড়িতে না পারে, সেপক্ষে সতর্কতা সূচক প্রতিষেধক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জানা রোগীর তথ্য সংগ্রহ ও কাহারও দেহে ভিতরে ভিতরে রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মিলে তাহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও বাড়ীর কর্ত্তার কাছ হইতে এই সকল সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে। স্বাস্থ্য বিভাগের যোগ্যতা অনুসারে রোগের বিবরণ সংগ্রহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে বা অসম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র সংগৃহীত হইতে পারে।

(২) আইনানুসারে রোগীকে স্বতন্ত্র করিবার

ব্যবস্থা বা কোয়ারেণ্টাইনে রাখিবার ব্যবস্থা স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগই করিয়া থাকেন।

(৩) রোগ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য রোগোৎপত্তির মূল সূত্রানুসন্ধান। সম্ভব হইলে হেল্‌থ্‌ অফিসারের স্বয়ং বসন্ত, ডিফথেরিয়া, স্কারলেট ফিভার টাইফয়েড ফিভার, পোলিওমায়েলিটিজ ও সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজিটিজ রোগাক্রান্ত সর্ব্বপ্রথম রোগীকে দেখিতে গিয়া তাহার মূল সূত্রানুসন্ধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৪) রোগ যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে সেজন্য সেবিকারা বাড়ীবাড়ী ঘুরিয়া গৃহস্থকে রোগ নিবারণ সম্বন্ধে উদদেশ দিয়া বেড়াইবে।

(৫) সংক্রামক রোগের বর্ত্তমান ও অতীত ইতিহাস অফিসের রেকর্ডভুক্ত হইয়া থাকিবে, এবং রোগাক্রান্ত স্থানের মানচিত্রও অফিসে রক্ষিত হইবে।

(৬) সংক্রামক রোগ নির্ণয়ে মতভেদ ঘটিলে যিনি রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে।

(৭) বসন্ত, টাইফয়েড ও ডিফথিরিয়া রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য বিনামূল্যে রোগ নিবারণের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে যখন বিনামূল্যে প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক নমুনা বিতরিত হয়, তখন তাহা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের হাত দিয়া বিতরিত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ দ্রব্যগুলি ভাল অবস্থায় ও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাৎ জেলার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে সঞ্চিত রাখিবার ভার জেলার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীকেই লইতে হইবে।

পরীক্ষাগার বা Laboratory

সংক্রামক রোগের লক্ষণ নির্ণয় এবং জল ও দুগ্ধের সংক্রামকতা নিবারণের উদ্দেশ্যে সরকারী বা জেলার নিজস্ব স্থানীয় ল্যাবরেটরী থাকা চাই। সরকারী ল্যাবরেটরী দূরে অবস্থিত হইলে, জেলার নি[...] ল্যাবরেটরী না থাকিলে কাজের বিলক্ষণ অসু[...] ঘটিতে পারে।

যৌন রোগ নিবারণ

১। লোকশিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়তা [...] কোথাও থাকে, তবে তাহা এইখানে। ইহা সামাজি[...] ব্যাধি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা করা যেমন দরকা[...] সমাজকেও সেইরূপ এই কুৎসিত ব্যাধি হইতে [...] করা দরকার। সুতরাং এই সামাজিক স্বাস্থ্য র[...] জন্য লোকশিক্ষার বিশেষ রকম ব্যবস্থা করা গ্রাম্য স্বা[...] সমিতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কর্ত্তব্য। এবং তা[...] করাও হইয়া থাকে। উপদেশ, বক্তৃতা, দৃষ্টান্ত প্র[...] সকল উপায়েই ইহা করা হয়।

২। যৌন রোগাক্রান্ত (অর্থাৎ, গণোরিয়া, [...] সিফিলিস প্রভৃতি রোগ দুষ্ট) ব্যক্তিরা অর্থাভাবে চিকি[...] করাইতে না পারিলে, সমাজের কল্যাণার্থ গ্রাম্য স্বা[...] সমিতি স্বয়ং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, কিম্বা তা[...] যাহাতে চিকিৎসার কোন না কোন রকম ব্যবস্থ[...] সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। দরিদ্র লোকদের [...] রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য জেলার চিকিৎ[...] গণকে প্রয়োজন হইলে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ ক[...] হইবে।

৪। যৌন রোগ সংক্রান্ত আইন চালাইবার [...] ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের সহিত গ্রাম্য স্বাস্থ্য[...] সহযোগিতা করিবেন; এবং এ বিষয়ে লোকমত গঠনে[...] চেষ্টা করিবেন। তাহাতে আইনের কার্য্য পরিচাল[...] সুবিধা হইবে।

যক্ষ্মারোগ

১। যক্ষ্মারোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্যও [...] শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। এই শিক্ষার প্র[...] সময় বাল্য কাল হইতে এবং প্রধান স্থান পাঠ[...] বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ [...]

[...]াশ খুলিয়া, চলচ্চিত্র, লণ্ঠন চিত্র ও পুস্তিকার সাহায্যে [...]এই শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকে।

২। জেলার ভিতর যত যক্ষ্মা রোগী আছে, গ্রাম্য স্বাস্থ্য বিভাগ তাহাদের রোগ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

৩। কাহারও যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহার পরীক্ষার জন্য স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহযোগিতায় রোগ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়।

৪। যে সকল বাড়ীতে যক্ষ্মা রোগী আছে, [...]সেবিকারা মধ্যে মধ্যে ঐ সকল বাড়ীতে গিয়া রোগের [...]শুশ্রূষা সম্বন্ধে এমন ভাবে উপদেশ দেন, যাহাতে তাঁহারা শুশ্রূষাকারী চিকিৎসকগণকে যথোচিত পরিমাণে সাহায্য করিতে পারেন। যক্ষ্মা রোগীরা যাহাতে যক্ষ্মা-[...]নিবারণের বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির ও স্বাস্থ্যকর [...]আবেষ্টনের সাহায্য পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে [...]পারিলেই ভাল হয়। তবে স্যানিটেরিয়াম চিকিৎসার [...]যোগ লাভ করা অসম্ভব হইলে, গৃহেই উপযুক্ত রূপ [...]সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা দরকার।

৫। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এই রোগের সঞ্চার [...]হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে [...]ছাত্রদের দেহ পরীক্ষা করা হইবে। তাহা ছাড়া, সাধারণভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের ব্যবস্থা [...]করিয়া যাহাতে তাহারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত না হইতে [...]পারে তাহার চেষ্টা করা হইবে।

[...]বিশেষ বিশেষ রোগের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা।

ম্যালেরিয়া, বক্রকীট, ট্রাকোমা, প্রভৃতি রোগ [...]সম্বন্ধে জেলা বিশেষে বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার হয়। [...] সকল ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ [...]বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক। সময় সময় এমন [...]অবস্থা ঘটে যে স্থানীয় স্বাস্থ্য সমিতিকে কিছু কাল [...]করিয়া এই শ্রেণীর কোন একটী রোগের সঙ্গে সংগ্রাম [...]করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে নিযুক্ত থাকিতে হয়।

ম্যালেরিয়া।—ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে এই কাজগুলি করিয়া রাখিতে হইবে; যথা—

১। রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ। বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়াবাহী মশকের সন্ধান লইতে হয়। সমগ্র জেলার খবর ত রাখিতেই হইবে, তৎসহ গ্রাম, নগর প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সংবাদ লইতে হইবে। মশকদের পরিদর্শন করিয়া, রোগীদের রক্ত ও প্লীহা পরীক্ষা করিয়া, স্কুলের ছাত্র রোগী হইলে তাহার আক্রান্ত হইবার ইতিহাস এবং চিকিৎসকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে।

২। গ্রামে, পল্লীতে, নগরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সুবিবেচিত ও কার্য্যোপযোগী কর্ম্ম পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৩। এই রোগের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং ইহা নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহাও সাধারণকে জ্ঞাত করা হইবে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বিবিধ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সামঞ্জস্য আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এই—

১। জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া, মশক ডিম্ব নষ্ট করিয়া কিম্বা মৎস্যের চাষ করিয়া মশক বংশ ধ্বংস।

২। ম্যালেরিয়া রোগীকে আবৃত রাখিয়া এবং কুইনাইন সেবন করাইয়া, মশকেরা যাহাতে তাহার দেহ হইতে রোগ বীজাণু সংগ্রহ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা। এই উপায়ে ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতা নিবারণ করা যায়।

৩। কুইনাইনের সাহায্যে রোগীকে উত্তমরূপে নিরাময় করিয়া।

বক্রকীট।—রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া এই রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হয়, এবং লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা হইলেই এই রোগ

নিবারণ করা সুসাধ্য হইয়া উঠে। রোগ নিবারণের কার্য্যপদ্ধতি মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায়।

১। পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (sanitary privies) নির্ম্মাণ করিয়া ময়লা দূরীভূত করিয়া এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণ।

২। ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগ উপশম।

ট্রাকোমা।—ইহা অস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য রোগ। এই রোগের চিকিৎসার জন্য এবং অস্থায়ী হাঁসপাতাল স্থাপনের জন্য সরকার হইতে কিম্বা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

সাধারণ স্বাস্থ্য

জল ও দুগ্ধ বিশুদ্ধভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা। পায়খানা ও আবর্জ্জনা দূরীকরণের বন্দোবস্ত। প্রত্যেক স্বাস্থ্য বিভাগের ইহাই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্ব্ব সাধারণের সমবেত চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেবল সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। নগর।—স্বাস্থ্য বিভাগ মফস্বলের সকল নগরের স্বাস্থ্যমূলক পরিদর্শন করিবেন। জল কোথা হইতে সংগ্রহ করা হয়, এবং তাহা নিরাপদ কি না, সে সন্ধান লইবেন। পায়খানার বন্দোবস্ত কিরূপ তাহাও দেখিবেন। দুগ্ধ নিরাপদ কি না, তাহা দূষিত হইবার কোন আশঙ্কা আছে কি না, এবং নগরগুলির সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ তাহাও দেখিতে হইবে।

মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহের এবং পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার জন্য স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীরা সরকারের স্যানিটারী এঞ্জিনীয়ারের সাহায্য সর্ব্বদা পাইবেন। কোন অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সংশোধন করিতে হইলে একদিকে যেমন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, পক্ষান্তরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন এবং সরকারী আদেশগুলি কঠোরভাবে পরিচালন করিতে হইবে।

দুগ্ধ যাহাতে বিশুদ্ধভাবে সরবরাহ হয়, তাহার জন্য কড়া আইন চাই। ডেয়ারী, দুগ্ধ ভাণ্ডার, খাদ্য দ্রব্য সরবরাহের দোকান বা বাজারগুলি স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা পরিদর্শন করিবেন।

২। স্কুল।—পল্লী-বিদ্যালয়গুলির বৎসরে একবার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইতে হইবে। তাহা ছাড়া স্বাস্থ্য-কর্ম্মীরা দেখিবেন যে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সম্মত, স্কুলে যথেষ্ট আলো ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে, এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য যাহাতে সুন্দরভাবে রক্ষিত হয় এমন পাকা রকমের ব্যবস্থা আছে।

৩। পল্লীবাসীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে যে, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, নির্দ্দোষ জল সংস্থান, এবং মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গের গৃহ প্রবেশ নিবারণের জন্য পর্দ্দার ব্যবস্থা করিলে তাঁহাদের বাস-গৃহগুলি স্বাস্থ্যপূর্ণ আদর্শ ভবনে পরিণত হইবে। গ্রাম্য বাস-গৃহগুলিতে যাহাতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্ম্মিত হয়, সে পক্ষে গ্রামবাসীগণকে উপদেশাদি এবং পরিদর্শনাদির দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে।

৪। সাধারণ ভবন ও বিদ্যালয় ক্লাব প্রভৃতি মধ্যে পরিদর্শন করিয়া, কোথাও কোন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা দেখিলে সেগুলি সংশোধন করিবার উপদেশ দিতে হইবে।

শিশু-স্বাস্থ্য

১। শিশুর জন্মের পূর্ব্ব হইতে স্কুলে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থা।—ধাত্রীদের উপদেশ দান ও তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে হইবে। সেবিকারা গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া সন্ধান লইবেন, এবং প্রয়োজন মত উপদেশ দিবেন। শিশুর খাদ্য ও শিশু পালন সম্বন্ধে প্রসূতিগণকে উপদেশ দিবেন। প্রত্যেক জননীকে স্বতন্ত্রভাবে, কিম্বা কয়েক জনকে একত্র সমবেত করিয়া এই শিক্ষা দান কার্য্য চলিতে পারে। শিশুর গর্ভাবস্থান কাল হইতেই চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে

প্রসূতির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জন্ম রেজিষ্ট্রির সুফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। মফঃস্বলের স্থানে স্থানে কতকগুলি গ্রামের শিশুগুলিকে মধ্যে মধ্যে সমবেত করিয়া স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহায়তায় শিশুদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। শিশুদিগের দৈহিক অবস্থার বা খাদ্যের দোষ থাকিলে তাহার সংশোধন করিতে উপদেশ দিতে হইবে। শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

২। স্কুলের স্বাস্থ্য।—শিশুরা স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলে সেখানেই তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা। পল্লী বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের দৈহিক পরীক্ষা করিতে হইবে। কেবল যে সকল ছাত্রের পিতামাতা বা অভিভাবক এরূপভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা পছন্দ করেন না, তাহাদিগকে অবশ্য বাদ দিতে হইবে। পরীক্ষায় যে সকল ত্রুটি ধরা পড়িবে, বালকের পিতামাতা ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা জানানো হইবে। এই সকল ত্রুটির সংশোধনের জন্য সেবিকারা ছাত্রদের বাড়ী-বাড়ী গিয়া তাহাদের বাড়ীর লোকদের বলিবেন যে, পারিবারিক চিকিৎসক কিম্বা দন্ত চিকিৎসককে আহ্বান করাইয়া উহাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হউক। যে সকল পিতামাতা অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিবেন না, তাহাদের জন্য স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রসূতিদিগকে পুষ্টিকর শিশুখাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে।

অপরাপর কাজ

১। সমগ্র পল্লী অঞ্চলে সম্পূর্ণ রূপে জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে স্থানীয় রেজিষ্ট্রীর চিকিৎসক ও জনসাধারণের সাহায্য লইতে হইবে ও যেখানে প্রয়োজন হইবে সেখানে আইন প্রচলন করিতে হইবে।

২। কোন কোন রাজ্যের জেলার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীকে দরিদ্রদিগেরও চিকিৎসা করিতে হয়। এ ব্যবস্থা ভাল নয়। ছোট ছোট জেলায় চলিলেও, বড় জেলায় চলে না। সে সব স্থলে চিকিৎসক স্বতন্ত্র হওয়া উচিত।

৩। কোন কোন জেলায় শ্রমিক ও কারখানার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে।

৪। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণ ও জনসাধারণকে নিরাপদ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৫। উন্মাদ রোগের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ রাখা। ইহাও জেলার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর অন্যতম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

৬। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্যের বিবরণ যত্ন সহকারে লিখিয়া রাখা ও সরকারী আইনানুসারে তাহা হইতে রিপোর্ট প্রস্তুত করা। ইহাতে চলতি, সাপ্তাহিক ও মাসিক রোগের বিবরণ থাকে। ইহা রাজ্যের প্রধান স্বাস্থ্য বিভাগে পাঠাইতে হয়।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও সাধারণের ঔদাসীন্য

মানুষের রোগ হইলে তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য চিকিৎসকগণকে যে কি পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হয় জনসাধারণ তাহার খবর খুব কমই রাখেন। শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্। মানুষের শরীরে কত রকম ব্যাধিরই যে আক্রমণ হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল রোগ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার ভার চিকিৎসকগণকে লইতে হইয়াছে। রোগ আরাম করিতে হইলে রোগের কারণ, প্রকৃতি, আরোগ্য লাভের

উপায় প্রভৃতি জানা আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনেক গবেষণা, অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে হয়। যে সকল মানব-হিতৈষী ব্যক্তি গবেষণার ফলে রোগের প্রকৃতি বা রোগ নিরাময়ের উপায় কিম্বা ঔষধাদির আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে মানব-সমাজ যে কতদূর ঋণী তাহা তাহারা জানে না। পৃথিবীর লোকসংখ্যার অনুপাতে এক কোটী লোকের মধ্যে একজন হিসাবে এরূপ নব-আবিষ্কর্ত্তা আছেন কি না সন্দেহ। আর চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সংখ্যার অনুপাতে হাজার করা একজনের বেশী আবিষ্কর্ত্তা পাওয়া যাইবে না। যেখানে কোটী কোটী লোকের মধ্যে একাধিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কর্ত্তা নাই, সেখানে সামান্য জন যে তাঁহাদের খবর রাখিতে পারে না, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সাধারণের এই ঔদাসীন্যের জন্য কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশানুরূপ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনেক রকমের আছে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানবের যতটা শুভ সাধন করে, অপর কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রই এতটা মানব-হিতের দাবী করিতে পারে না। কিন্তু জনসাধারণের বিবেচনায় ইহা অতি নগণ্য শাস্ত্র। সমর-বিজ্ঞানের—মানুষকে হত্যা করিবার বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে কত অর্থই না ব্যয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু কামান বন্দুকের গুলিতে আহত বা রোগাপহত ব্যক্তিগণকে বাঁচাইবার বিদ্যাটির উন্নতি সাধনের জন্য কত অর্থ ব্যয় করা হয় তাহার হিসাব কেহ রাখেন কি? একটু একটু রাখেন বই কি! সুপ্রসিদ্ধ সার রোণাল্ড রস একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক। তিনি চিকিৎসা জগতে অনেক মৌলিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি "সায়েন্স প্রগ্রেস" নামক বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে এই ধরণের একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণের কৃতঘ্নতার উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে, লোকে ইহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া থাকে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। জনসাধারণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিতরকার কোন খবরই লইতে বা রাখিতে চায় না। এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ ভার ডাক্তারের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে। রোগ হইলে তাহারা আরাম হইবার জন্য ডাক্তারের বাড়ী ছুটিয়া যাইবে, কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রে কিসে যে কি হইতেছে—কত ধানে কত চাল হয়—সে খবর একটুও রাখিবে না। নরহত্যা-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাহারা কোটী কোটী টাকা খরচ করিবে, কিন্তু তদনুপাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তাহা যৎপরোনাস্তি সামান্য। ডাক্তার রোণাল্ড রস বৃটেনের একটা আনুমানিক হিসাবও দিয়াছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণার জন্য গ্রেটবৃটেনের লোকেরা বৎসরে ১৩০০০০ পাউণ্ড, ঐ বাবদে আর এক দফায় ৫০০০০ পাউণ্ড একুনে এই ১৮০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে। ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ডের লোক সংখ্যার অনুপাতে লোক প্রতি বছরে এক পেনী বা এক আনা মাত্র দেয়। আর এই বার্ষিক এক আনা দক্ষিণার পরিবর্ত্তে তাহারা এমন সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যাবিষ্কারের আশা করে, যদ্দ্বারা তাহাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইবে ও তাহারা সুস্থ ও সবল থাকিয়া জীবন উপভোগ করিবে এবং পীড়িত হইলে আরোগ্য লাভ করিবে! চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আর কি! চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে ক্ষেত্রে লোকে এক আনা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, সে ক্ষেত্রে অন্য সকল বিজ্ঞানোন্নতিকল্পে তাহারা পাউণ্ড হিসাবে ব্যয় করিতে মুক্তহস্ত। রাজনীতি, সমরনীতি, নৌবিদ্যা, নগরশাসন ও সাধারণ শিক্ষা ব্যাপারে বৎসর বৎসর কোটী কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে।

কিন্তু সাধারণের আর এ বিষয়ে এতটা উদাসীন থাকা উচিত নয়। কারণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যতটা উন্নতি হইবে, সাধারণও ততটা উপকৃত হইবে। অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্যও তাহাদের মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করা উচিত।

নিম্ব

[কবিরাজ—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ]

নিম্ববৃক্ষ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বঙ্গের প্রাচীনা গৃহিণীগণ ইহার ব্যবহার বিশেষ রূপেই জানেন। নিমবেগুণ, নিমপাতা ভাজা ভোজন এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

নিমের পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান ধৌত করিলে ক্ষত সত্বর আরোগ্য হয়। খোস পাঁচড়া ও চুলকানি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি এই জলে স্নান করিলে সদ্যই উপকৃত হইয়া থাকেন।

বাড়ীর নিকটে নিম গাছ থাকিলে বাড়ীর অধিবাসী-বৃন্দের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এই বিশ্বাস সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়। নিম তৈলের সার হইতে প্রস্তুত মার্গো-সোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও ব্যবহৃত হইতেছে। অধিক পুরাতন বৃক্ষ হইতে একপ্রকার নির্য্যাস নির্গত হয়; তাহা খাইতে সুস্বাদু। ইহা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি জনিত রোগ নিরাময় হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে নিম্বের সাধারণ গুণ :—

রুক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু, অগ্নি ও বাত নাশক এবং শ্রমশক্তি কারক।

নিম্বের প্রয়োগ স্থল :—

তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহরোগ নষ্ট করে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে বিভিন্ন রোগে নিম্বের ব্যবহার :—

(১) কুষ্ঠ রোগে :—পঞ্চনিম্ব—নিমের পাতা, মূল, ত্বক, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু, ঘৃত, গোমূত্র, জল, আমলকীর জল অথবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ১ বৎসরের পুরাতন কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

(২) নিমের ছাল ও পলতার ক্বাথ পান করাইবে।

(৩) নিমের তৈল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

অন্যান্য চর্ম্মরোগে :—

(১) নিমছাল ও সোঁদাল পাতার ক্বাথ দ্বারা দুষ্ট স্থান মর্দ্দন করিলে পদ্মকঁটা নষ্ট হয়।

(২) নিম্ব পত্রচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অথবা নিম্ব পত্র ও আমলকী একত্রে বাটিয়া ভোজন করিলে বিষফোট, ক্ষত, শীতপিত্ত, চুলকনা ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট করে।

(৩) নিম ফলের শাস চূর্ণ নিয়মিত সেবন করিলে স্ফোটক, বিসর্প, নাড়ী ব্রণ আরোগ্য হয়।

(৩) নিম্ব তৈল ব্যবহার করিলে দদ্রু, বিসর্প, চুলকনা, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

মেহরোগে :—নিমছালের ক্বাথ পান করিলে পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়।

জ্বরে :—নিমছালের ক্বাথ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। দাহজ্বরে, নিমপাতার ক্বাথ ইক্ষু গুড়সহ পান করিলে বিশেষ ফল হয়।

তৃষ্ণায় :—কফজ তৃষ্ণায় নিম্ব পুষ্পের উষ্ণ ক্বাথ ফলপ্রদ হয়।

বাতরক্তে :—নিমফল উষ্ণ জলের সহিত পেষণ-পূর্ব্বক পান করিলে বিষ নষ্ট হয়।

টাক ও কেশের অকাল পক্কতায় :—নিম্ব তৈলের নস্য লইলে উপকার হয়।

গৃধ্রসী রোগে :—মহানিম্বের মূলের ত্বক জলে উত্তম রূপে পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিবে।

ক্রিমিরোগে :—নিম্বপত্র রস মধুসহ পান করিবে।

ক্ষতে :—নিম্বতৈল ব্যবহার করিলে ক্ষতের জীবাণু নষ্ট হয়।

দাস্ত পরিষ্কারে :—নিমফলের বিশেষতঃ মহানিম ফলের চূর্ণ ব্যবহার করিবে।

বসন্তরোগে :—নিম্ব, বিল্ব, কাঁটানটে শাকের মূলের ছাল একত্রে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৪ রতি। প্রতিদিন প্রাতে এক এক ব[টিকা] বসন্তের প্রাদুর্ভাব সময়ে সেবন করিলে বসন্তের ভ[য়] থাকে না। ইহা বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

পাকস্থলীর ডায়ারি

[শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম-এ]

একটি ১২ বৎসর বয়স্ক বালকের পাকস্থলী (Stomach) যদি সজীব হইয়া ডায়ারি লিখিতে পারিত, তাহাই কল্পনা করিয়া লিপিবদ্ধ হইল—ডায়ারির মাত্র এক পাতা উদ্ধৃত করা হইল।

সকাল ৭টা—

কাল প্রায় রাত ১০টার সময়ে আমার "বাবু" নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেই গুরু আহার হজম করতে সারারাত ধরে চেষ্টা করে, সবে একটু বিশ্রাম করবো মনে করেছি, এমন সময়ে গরম গরম আধসেরটাক্ দুধ, তার সঙ্গে খান ৪।৫ বিস্কুট এসে হাজির হল। বিশ্রাম আর হল না, আবার কাজে লাগলুম।

সকাল ৮টা—

আঃ দুধটাকে অতিকষ্টে ঠেলে ঠুলে নামিয়ে দিয়েছি, আবার খানকয়েক আধচিবানো গরম মটর ডালের বড়া এসে উপস্থিত। জ্বালাতন করলে! দেখি চেষ্টা করে। "বাবুর" মায়ের বিবেচনাটা খুব। ছেলে রান্নাঘরে গিয়ে মা বড়া ভাজছেন দেখে চাইলেন, আর মাও আদর করে দিলেন। অম্‌নি খানকতক গেলা হল।

সকাল ১০টা—

বাবুর ইস্কুলের সময় হয়েছে, আর কি—ভাত, ডাল আলুভাজা, ইলিশ মাছ, দুধ, আরো কত কি! পোড়া অদৃষ্টে কি আর বিশ্রাম আছে। অসহ্য হয়ে উঠলো দেখ্‌ছি। এমন করে আর পারা যায় না। কি করি, যতক্ষণ বইবে ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করতেই হবে।

বেলা ১টা—

বাবুর বাড়ী থেকে মা "টিফিন" পাঠিয়েছেন—খানা লুচি, ৩টা আলুর দম, ২টা সন্দেশ। বাঃ বাঃ বেশ চলছে যাহোক। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না, অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ যে আছে!

বেলা ৩টা—

বাবু ক্লাস পালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুলের ফটকো[র] কাছে দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ করে আমার জন্যে কতকগুলো আধভাজা আধকাঁচা ছোলা মটর কলাই ইত্যাদি পাঠালেন। এর নাম শুন্‌ছি "অবাক জলপান"—অবাক্ই বটে! তার ওপরেই আবার খানিকটে ভীষ[ণ] ঠাণ্ডা, কাদার মত, পচা দুধেতে চিনিতে মেশা[নো] "কুলপী বরফ্" এসে হাজির। আমি আর ত পারিনা। ওঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে, এইবারে মোচড় দিতে আর[ম্ভ] করলুম।

বেলা ৩॥টা—

আমার মোচড়ানিতে বাবু ত গ্যাঙ্গাতে আর[ম্ভ] করলেন। তাই দেখে মাষ্টার মশায় তাড়াতাড়ি পাড়া[র] একটি ছেলে সঙ্গে দিয়ে আমার বাবুকে বাড়ী পাঠালেন। আমি চুপচাপ করে থাকলে আরো কত আমার ওপ[র] চাপাতেন জানি না। এইবার বোধ হয় বাড়ী গি[য়ে] একটু বিশ্রাম পাবো। দেখ, যাক্!

বেলা ৪॥টা—

ও বাবা, বিশ্রাম কোথায়! বাবু ত বাড়ী গিয়ে আঃ করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আ[মি] আরো ২।৪ টা মোচড় দিলাম—বাছাধন ভাল করে বুঝুন, আমার ওপর কি অত্যাচার করছেন, তাহলে যদি পোড়া অদৃষ্টে একটু বিশ্রাম লাভ হয়। কিন্তু হল না, বাবুর মা এসে "তাইত, কি হয়েছে আহা উহু" সুরু করলেন। তার পরেই দেখি, একগ্লাস ঘোল এসে হাজির। আমি এবারে ধর্ম্মঘট করেছি, হাত গুটিয়ে বসে রইলুম,—বাবা, আমার দ্বারা আর কিছু হচ্ছে না। দে মোচড়, দে মোচড়! ওমা, একি? আধ গেলাস জল মেশান পাতিলেবুর রস। নাঃ, কোমর বেঁধে লাগতে হল—আর শুধু মোচড়ে চলবে না। প্রাণপণে উপর দিকে এক ঠেলা লাগালুম,—বাপ্, তবু খানিকটে হালকা হয়ে গেল।

বেলা ৫॥টা—

বাবুর বাপ আপিস থেকে আসতেই বাবুর মা তাঁকে বল্‌লেন "ছেলের কি হয়েছে, খুব বমি কর্‌ছে, পেট কামড়াচ্ছে ভয়ানক, কেন এমন হল কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না।" তা পারবেন কেন? যাই হোক, বাপ ত ছুটলেন ডাক্তারের বাড়ী।

বেলা ৬॥টা—

যাক্, বাঁচলুম বাবা! ডাক্তার বাবু এসে বলে গেলেন যে, ওষুধ কিছু দেবেন না, "একবারে উপোস্। রাত্রে কিছু খেতে দেবেন্ না"—উঃ তাহলে আশা আছে! আজ রাত্রে এই সমস্ত আবর্জ্জনা সাফ করে উঠতে পারি ত কিছু বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে।

জড় বিজ্ঞানের সহিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্বন্ধ

চিকিৎসা-শাস্ত্র এখন সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কত দিনের প্রাচীন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মিশরে দশ হাজার বৎসরের পুরাতন সভ্যতার আবিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। মিশরের মমি এখনও যেরূপ অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে অনুমান হয়, তৎকালে রস শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু, চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাচীন কালের লোকেরা কতখানি উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় না।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের বয়স আড়াই হাজার বৎসরের বেশী নয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ বিবেচনা করেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকজাতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের মতে হিপোক্রেটেসই চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা, যেমন আমাদের ধন্বন্তরী। ভারতের ধন্বন্তরী ও গ্রীসের হিপোক্রেটেস এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, তাহা গবেষণার বিষয়, এবং তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আলোচ্য। গ্রীসে তৎপূর্ব্বে চিকিৎসা কার্য্য প্রায় এলোপাতাড়ী ভাবে সম্পন্ন হইত। হিপোক্রেটেসই সর্ব্ব প্রথম রোগের লক্ষণ, তাহার উৎপত্তি, পরিণতি ও পরিণাম পরিদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করেন। কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যথাসাধ্য ভ্রমশূন্য সিদ্ধান্ত করিবার প্রণালী হিপোক্রেটেসেরই সমসাময়িক এরিষ্টটল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এরিষ্টটলের উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য যুক্তিশাস্ত্রের বা তর্কশাস্ত্রের ভিত্তির উপর কেবল যে চিকিৎসা বিজ্ঞানই গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই

নয়—এই শাস্ত্র আধুনিক সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তার পর আসেন গালেন। তিনি জীবদেহ লইয়া বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গালেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কিন্তু গালেনের পর বহুদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রে নূতন কিছু হয় নাই। সপ্তদশ শতকে বেকনের নূতন তত্ত্ব প্রচার, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে মিলের নূতন যুক্তি শাস্ত্রের অবতারণা হয়। সপ্তদশ শতকে বেকনের তত্ত্বের অনুসরণ করিয়া উইলিয়াম হার্ভে আধুনিক জীব-দেহতত্ত্ব (physiology) প্রবর্ত্তিত করেন। তিনিই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্বন্ধে অভিনব তত্ত্ব সমূহের প্রচার করেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে যে সকল পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে, উইলিয়াম হার্ভেকে তাহার আবিষ্কর্ত্তা বলা চলে। নিম্নশ্রেণীর জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবদেহ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটনের প্রথার তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহারই সমসময়ে সীডেনহাম রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া বহু নূতন তত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। রোগোৎপত্তির কারণ, লক্ষণানুসারে রোগের শ্রেণীবিভাগ তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়; এবং তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান উন্নতি পথে দ্রুত ধাবমান হইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতেই জন মেয়ো (John Mayow) চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত রসায়ন-শাস্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষার পরিণামে অম্ল-জান বাষ্পের আবিষ্কার হয়, এবং বস্তুবিজ্ঞানের (পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের) সহিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ, সাধারণ বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ঘটিত জ্ঞান যে নিত্য নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহার মূলে হার্ভে, সীডেনহাম ও মেয়োর আবিষ্কার ও পরীক্ষা প্রণালী বিরাজমান। তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন ও উইলিয়াম হাণ্টার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। জন হাণ্টার সমগ্র ব্যাধিবিজ্ঞান আলোচনা করিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচনের পথ নির্দ্দেশ করেন। তা ছাড়া, পূর্ব্বাবিষ্কৃত পরস্পর বিচ্ছিন্ন তথ্য সমূহের মধ্যে সাধারণ ভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন তিনিই। ইংলণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জ্জন্স নামক বিদ্যালয়ের সংগ্রহাগারে জন হাণ্টার আবিষ্কৃত, সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ ১৪০০০ নমুনা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নাম ও পরিচয় সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি-পত্রে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা যে কত পরিশ্রম ও কত বড় অধ্যবসায়ের পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি জীবজন্তু লইয়া পরীক্ষা করিতে বড় ভালবাসিতেন। সুপ্রসিদ্ধ জেনার যখন বসন্ত রোগের টীকা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার কথা একটা সাধারণ সভায় প্রকাশ করিলেন, তৎপর দিন হাণ্টার তাহাকে চিঠি লিখিয়া পরামর্শ দিলেন যে, অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছ কেন? একটা শজারুর উপর পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেল।

তাহার পর হইতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরস্পর পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিয়াছে। সুবিখ্যাত রাসায়নিক চিকিৎসক পাস্তুর তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা মানব সমাজের যতখানি উপকার করিয়াছেন, তেমন আর কেহ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রয়োগ করিয়া তিনি যে জীবাণুবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার ফলে চিকিৎসা জগতে নবযুগ সঞ্চার হইয়াছে। এই বিষয়ের উন্নতি সাধনে চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরাও বড় অল্প সহায়তা করেন নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে অন্যান্যের মধ্যে জার্ম্মাণীর ভার্চো (Virchow) এবং স্কিমিডেবার্গ (Schmiedeberg) নামও অমর হইয়া থাকিবে।

গত শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জগতে যে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার আরও একটা কারণ আছে। সেই কারণটি হচ্ছে, কৃত্রিম চক্ষু অর্থাৎ অণুবীক্ষণ বা বীক্ষণ যন্ত্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে

মানুষের এবং বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিকের সামনে এ যাবৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল! এই নূতন চক্ষু দিয়া মানুষ এমন একটা অদৃশ্য জগতের সন্ধান পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যাহা এত দিন মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অগোচর ছিল, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানবের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। মানুষ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র এমন এক শ্রেণীর জীবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিতেছিল, যাহার কথা তাহারা আগে কিছুই জানিতে পারে নাই, সাধারণ চর্ম্মচক্ষে যাহাদিগকে দেখা যাইত না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া সেই জীবাণু, কীটাণু ও বীজাণু রাজ্য ধরা পড়িয়া গেল, মানুষ তাহাদের গতি-বিধি, জীবনযাপন প্রণালী, বংশবৃদ্ধি ও অন্যান্য বহু তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিল।

প্রথম প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রীড়নকের হিসাবে লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিত মাত্র। কিন্তু ফ্রান্স দেশে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, শক্তি-শালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র সমূহ নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবাণু রাজ্যের সহিত মানুষের ক্রমে পরিচয় হইতে লাগিল। সেই জন্য জীবাণু ঘটিত গবেষণামূলক অনুসন্ধান কার্য্যে ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করিয়াছেন এবং তৎপরেই তাঁহাদের প্রতিবেশী জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধানের ফল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অণুবীক্ষণের পরেই এই কার্য্যে সমধিক সহায়তা করিয়াছে রঞ্জন রশ্মি (Roentgen ray)।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র সফলতা লাভ করিতে পারিত না। এমন কতক প্রকার জীবাণু ছিল, যাহাদের কোন বিশেষত্ব দেখা যাইত না বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক শ্রেণীর জীবাণু বলিয়া বুঝা যাইত না। তাহাদের অনেকের বর্ণ এমন যে তাহার দরুণ তাহাদিগকে ধরিতে পারা যাইত না। অবশেষে তাহাদের রঞ্জিত করিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই উপায়ে যক্ষ্মা জীবাণু ও অপরাপর জীবাণু ধরা পড়িয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সকল বীজাণুর চাষ করিয়া তাহাদের জীবন-গতি নিখুঁত ভাবে জানিতে পারা গিয়াছে। কতকগুলি রোগের জীবাণু এমন সংগোপনে শরীরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া এক দেহ হইতে আর এক দেহে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত যে, বহুকাল তাহাদের এই গুপ্ত চাল ধরিতে পারা যায় নাই। রোজেনাউ (Rosenow) তাহাদেরও গতিবিধি পরিষ্কার রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গত যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে জীবতত্ত্ব বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অণুবীক্ষণের কার্য্যশক্তিরও বোধ হয় সীমায় আসিয়া পৌছানো গিয়াছে। এই যন্ত্র সাহায্যে ০·১ মাইক্রণ বা এক ইঞ্চির আড়াইলক্ষ ভাগের এক ভাগ মাপের বস্তু ধরা পড়ে। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল যে বস্তুটিকে মোটামুটিভাবে দেখিতে পাই তাই নয়—তাহাদের দৈর্ঘ্য, গঠন, বর্ণ ও অন্যান্য বিশেষত্বগুলি বেশ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারি। ইহা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, জীবাণুগুলি যতই ক্ষুদ্র এবং যতই বিভিন্ন শ্রেণীর হউক না কেন, তাহারা কতকগুলি প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অধীন। এখন আমাদের সামনে অণুবীক্ষণের অতীত জগৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী আবিষ্কার colloid bodies বা ধূলিকণা। কোন একটা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালা কিম্বা দরজায় সামান্য একটু সরু ফাঁক দিয়া সূর্য্য কিরণ আসিতে দিলে নিয়ত সঞ্চরমান এই ধূলিকণা সকল দেখা যায়। অন্য কোন উপায়ে ইহাদের অস্তিত্ব জানা যায় না। ব্রাউন নামক একজন উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ প্রথম এই দিকে মনোযোগ দেন। তার পর লণ্ডনের টঙ্কশালার অধ্যক্ষ টমাস গ্রেহাম এই বিষয়ে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া আর একটা জীবজগতের সন্ধান পান। এই সকল জীবাণুর আকার ০·১ হইতে ০·০০১ অর্থাৎ এক ইঞ্চির আড়াই লক্ষ ভাগের এক ভাগ হইতে আড়াই কোটি ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত। আপাত দৃষ্টিতে ইহা

ধূলিকণা মাত্র; কিন্তু অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়া ইহাদিগকে অন্য রকম দেখা যায়—যেন ইহারা চট্‌চটে তরল পদার্থে দোদুল্যমান জীব এবং সদা-চঞ্চল। অতীব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ না হইলে ইঁহারা দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার অণুবীক্ষণেও ইহাদের সকলগুলি ধরা পড়ে না। কেবল ইহাদের গাত্রে আলোক প্রতিফলিত হইয়া ইহারা ধরা পড়ে। অণুপরমাণু এবং সাধারণ জীবাণুর মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস এই colloid bodies এর উপর সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনরায় শীতল হইলে ঘনীভূত হইয়া জলকণায় পরিণত হইয়া মেঘের আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই জলকণা সমূহ colloid আকারে মেঘে অবস্থিতি করে।

ইহার পর গর্টনারের পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বস্তু রাসায়নিক (physicochemist)। তিনি মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদে জলের সংস্থান কিরূপ সে বিষয়ে বহু পরীক্ষার পর শীতকালে যাহাতে এই সকল ঔষধি তরুলতা মরিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার পরীক্ষাগুলিও colloid chemistryর অন্তর্গত। এই সকল পরীক্ষার ফলে মানব দেহ গঠন সম্বন্ধে নূতন শাস্ত্র গঠিত হইতে চলিয়াছে।

বস্তু রসায়ন বা physico chemistryকে একটী নূতন বিজ্ঞান বলা চলে। সার উইলিয়াম বেইলিস এতৎ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বস্তু বিজ্ঞান (physics) ও রসায়ন বিজ্ঞান (chemistry) এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, এখন আর তাহা থাকিতেছে না। বস্তুর কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় (অর্থাৎ colloidal বা অণুঘটিত অবস্থায়) ইলেক্‌ট্রণগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগ-বিয়োগ সম্ভবপর। এবং ইহাই বস্তু গঠনের বা তাহাদের রূপান্তরের মূল সূত্র। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়া যে সকল পদার্থ সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের সহিত কলয়েড, পরমাণু, অণু ও ইলেক্‌ট্রণগুলির পার্থক্য আছে। এই শেষোক্তগুলি সদা-চঞ্চল তাহারা তাহাদের জলীয় আধারে ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে দ্রুত সঞ্চরণ করিতেছে। মাধ্যাকর্ষণের ইহাদের উপর কোন প্রভাব নাই। চাপ, তাপ ও আবহের অবস্থানুসারে ইহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ মধ্যে ড্যালটন atomic theoryর আবিষ্কার করেন এবং অণু সকলের গঠনোপাদানের তারতম্য নির্ণয় করেন। তৎকালে এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপযোগী নিখুঁত যন্ত্র-তন্ত্রাদির আবিষ্কার না হইলে ড্যালটনের সিদ্ধান্তগুলি এমন নিখুঁত হইয়াছিল তাহাকে অলৌকিক ব্যাপার বলিলেও চলে।

এই কলয়েডগুলি অতি আশ্চর্য্য জিনিস। পরীক্ষা অবিসম্বাদী রূপে এই সত্য নির্ণীত হইয়াছে যে, ইহা ভাসমান অবস্থায় থাকে—প্রকৃত পক্ষে দ্রব অবস্থা তাহাকে বলা যায় না। ইহাদের আকার আয়তন সে আকার এত স্পষ্ট যে তাহাতে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হয়। এই গুণেই ইহাদের লইয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। এমন কি, প্রবল শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহাদের ছায়া পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। সেই ছায়ার মাপ ০·০১ মাইক্রণ বা এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

মোজলে নামক একজন ইংরেজ বস্তু-বৈজ্ঞানিক রণ্টজেন রে প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করেন যে আলোক-কণা পরমাণুর গাত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া হয়। এতদ্দ্বারা তিনি পরমাণুসমূহকে বিশ্লিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকলেই জানেন, উদ্‌জান (Hydrogen) পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, এবং য়ুরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা ভারী। এতদুভয়ের খুব সম্ভবতঃ ৯২টি ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ (Elements) আছে। ইহাদের মধ্যে চারিটি ছাড়া অপর সকলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মূল পদার্থের মাণু গঠন ব্যাপারে একটি সাধারণ নিয়ম বা

আছে। হাইড্রোজেন হইতে য়ুরেনিয়াম পর্য্যন্ত মূল পদার্থগুলির পরমাণু সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধনশীল। এই সংখ্যা বৃদ্ধির একটি ধারা আছে। সেটী এই যে, পাশাপাশি দুইটী মূল পদার্থের মধ্যে এক বা একাধিক উদ্‌জান বাষ্পের পরমাণুর ভারের পার্থক্য আছে। উদ্‌জানের পরমাণুর গঠন হচ্চে, একটী মাত্র প্রোটোনের (proton) চতুর্দ্দিকে দ্রুত ঘূর্ণ্যমান একটী ইলেক্‌ট্রণ। এই পরমাণুটি সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এবং ইহার গঠনোপাদানভূত ইলেক্‌ট্রণ ও প্রোটোনের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম বলিয়া ইহাকে একক রূপে ধরিয়া অন্যান্য মূল পদার্থের পরমাণু-গঠনের ধারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই ভাবে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, কার্ব্বণের একটী পরমাণুতে ১২টি প্রোটোন ও ১২টী ইলেক্‌ট্রণ আছে। সেইরূপ, অম্লজানের একটী পরমাণু ১৬টি প্রোটোন ও ১৬টি ইলেক্‌ট্রণ লইয়া গঠিত। স্বর্ণের পরমাণুতে প্রোটোন ও ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ১৯৬টি করিয়া, এবং পারদের পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া ২০০টি হিসাবে প্রোটোন ও ইলেক্‌ট্রণ পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত যে নিখুঁত, তাহা মাইথি (Miethe) পরীক্ষা দ্বারা চাক্ষুষ ভাবে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছেন। এমন কি, তিনি পারদের পরমাণুকে স্বর্ণের পরমাণুতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পরীক্ষা অবশ্য আর্থিক হিসাবে সফল হয় নাই; কারণ এক ডলার মূল্যের স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে ৩০০০০ ডলার খরচ পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক হইতে এই পরীক্ষা যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রাচীনকালের alchemistদের পরশ-পাথরের কল্পনা বা সীসক হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কল্পনা নিছক কল্পনা মাত্র নহে। রণ্টজেন আলোকের বৈদ্যুতি-চুম্বক গতিবেগের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির দশ কোটী ভাগের এক ভাগ হইতে শত কোটী ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ পরমাণুর আয়তন অপেক্ষা কম। এই সত্যের সহায়তায় পরমাণুসকলের আয়তনের হিসাব করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রাদারফোর্ড কল্পনা করেন যে, কোন মূল-বস্তুর পরমাণুভূত যথানির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটোনকে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্‌ট্রণগুলি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া ড্যানিস বৈজ্ঞানিক বোর পরমাণুবাদকে সৌরমণ্ডলের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। তিনি বলেন, সূর্য্য যেন অস্তি (positive) তড়িৎ এবং গ্রহগণ যেন নাস্তি (negative) তড়িৎ। সূর্য্যরূপ অস্তি-তড়িতের আকর্ষণে গ্রহরূপ নাস্তি-তড়িৎ তাহার চতুর্দ্দিকে অতি বেগে ভ্রমণ করিতেছে। পরমাণুবাদও ঠিক এইরূপ। এই কল্পনার ভিত্তির উপরই বোর হাইড্রোজেন স্পেক্‌ট্রামের ভিতর আলোক রেখার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেন। রাদারফোর্ড, টমসন, এ্যাষ্টন ও অপরাপর অনেক পণ্ডিত গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ওই কেন্দ্রের আশেপাশে ইলেক্‌ট্রণগুলি তাহার সহিত সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া ঘুরিতেছে। এই ইলেক্‌ট্রণগুলিকে ভ্যালেন্স ইলেক্‌ট্রণ (valence electron) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ইলেক্‌ট্রণগুলির গতিবিধির পরিবর্ত্তনই রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।

আবার আরেনিয়াম দেখাইয়াছেন যে, ইলেক্‌ট্রোলাইট সকল জলে প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রবীভূত হইলে ক্ষেত্র বিশেষে তাহা আইয়োণিক (ionic) ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই আয়োনিক হইতে অস্তি ও নাস্তি আয়নস্ পৃথক করিলেই তবে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়। রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের উপরই জীবজগতের জীবন নির্ভর করে। সেইজন্য মানব-দেহের শতকরা ৭৫ ভাগ জল ও তরল পদার্থ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক।

বায়ুমণ্ডল, জল ও ভূপৃষ্ঠের শতকরা গড়ে ৪৭ অংশ অম্লজান। বিনা অক্সিজেনে মানুষের মস্তিষ্ক ৭ হইতে ১০ মিনিটের বেশী চেতন অবস্থায় থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শরীরের মধ্যে অম্লজান সঞ্চিত করিয়া রাখিবার বা উৎপন্ন করিবার কোন কল কৌশল না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। দেহের মধ্যে যে অক্সিজেনের ক্রিয়া হয়, যাহার ফলে তথায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাই জীবনীশক্তির মূল। দেহ মধ্যে

অম্লজান সহ নানা বস্তু রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ ও তেজে জীবনীশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। ইহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিও বলা যায়। সকল খাদ্যই প্রধানতঃ কার্ব্বণ, উদ্‌জান ও অম্লজান-ঘটিত পদার্থ। কার্ব্বোহাইড্রেট পদার্থগুলির মধ্যে চিনিকে দেহ-এঞ্জিনের কয়লা বলা চলে। ইহাই তাপ ও তেজ উৎপাদন করে। অতিরিক্ত ইন্ধনাংশ চর্ব্বিতে পরিণত হইয়া যায়। তাহাতেও ওই কার্ব্বণ, অম্লজান ও উদ্‌জানই আছে। তবে তাহাদের অনুপাত স্বতন্ত্র। ওই চর্ব্বির তত্ত্ব লইলে উষ্ট্র যে কেমন করিয়া দুস্তর মরুক্ষেত্রে অনাহারে ও বিনা জলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে, তাহা বেশ প্রতীয়মান হইবে। চিনির যত সহজে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, চর্ব্বির উপাদানভূত উদ্‌জান তত শীঘ্র রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না বা কার্ব্বণ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। অম্লজান সহযোগে চর্ব্বি ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া তাপ, তেজ ও জল উৎপাদন করে। জীবনের পক্ষে এইগুলিই প্রধান জিনিস। প্রোটীনজাত দেহোপাদান হইতে যে এমিনো এসিড উৎপন্ন হয় তাহা অতি শীঘ্র চিনিতে পরিণত হয়। প্রোটীন মাত্রেই নাইট্রোজেন আছে। আর অধিকাংশ প্রোটীনেই কিঞ্চিৎ গন্ধকও আছে। ইহাদের দ্বারা স্নায়ু গঠিত হয় ও চূণ প্রভৃতি ধাতু বিশ্লিষ্ট ও সঞ্চিত হয়।

উক্ত স্নায়ুঘটিত কলোয়েডগুলির মধ্যে উদ্‌জানের আণবিক বিশ্লেষণের ফলে কার্ব্বণ ও অম্লজান মিলিত হইবার সুযোগ পায়। তাহাতেই তাপ ও তেজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সম্মিলিত কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড শিরাবাহিত হইয়া ফুস্‌ফুসে আসিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হইয়া যায়।

রয়েল্ কলেজ অব ইংল্যাণ্ডের পার্কিন নামক বৈজ্ঞানিক রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি দেশবাসীর কাছে কোন উৎসাহ পান নাই। তাঁহার ছাত্র হফম্যান রঞ্জন বিদ্যা জাম্মাণীতে লইয়া গেলে তথায় উহা হইতে বহু ঔষধ ও বিস্ফোরক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্র দ্রব্য দর্শনের পক্ষে এই রঞ্জন দ্রব্য বিলক্ষণ সাহায্য করে। ইহাদেরই সাহায্যে অনে... বিদ্যুত-চুম্বক-তরঙ্গ অক্ষিগোলকে ধরা পড়ে। সর্ব্ব পে... দীর্ঘ তরঙ্গগুলি লাল রংয়ের বলিয়া বোধ হয়। তা... পর দৈর্ঘ্যের হ্রস্বতা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে কমলা, পী... হরিৎ, নীল ও বেগুনী রংয়ের তরঙ্গ দৃষ্ট হয়।

বস্তু-রসায়ন-বিজ্ঞান ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়া... ফলে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে... বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের পরীক্ষাগারে টেষ্ট-টিউব ... যে যে পদার্থ দিয়া যে সমস্ত পরীক্ষা করেন ও যে... ফল প্রাপ্ত হন, চিকিৎসকেরা মানবদেহরূপ ল্যাবরেটরীতে... সেই সকল পদার্থ ব্যবহার করিয়া তদনুরূপ ফল প্রা... হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ মানবদেহ, তথা জীবমা... মাত্রেই (এমন কি, আধুনিক জড়-বিজ্ঞানানুসারে স... জগৎও) একটী বিরাট ল্যাবরেটরী। প্রকৃতিদে... বৈজ্ঞানিক রূপে এই দেহে কত রকম্ বস্তু রসায়ন... বিজ্ঞান-ঘটিত ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন তাহা ভাষায় ব... করা যায় না। এই বিজ্ঞানাগারের যন্ত্র-তন্ত্র এমন ... ও নিখুঁত, এখানকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল এ... সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ যে তাহা মানুষের কল্পনাতে... আসে না। মানব এই বিজ্ঞানাগারের ক্রিয়াকল... যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহারই ফল আধু... চিকিৎসা শাস্ত্র। এই বিজ্ঞানাগারের স্বাভাবিক... নিত্য নিয়মিত কাজের কোন ব্যতিক্রম বা বৈগু... ঘটিলে আমাদের পীড়া উপস্থিত হয়, এবং চিকি... তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসানুযায়ী ঐ দোষ ত্রুটির সংশো... কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ঔষধাদির দ্বারা প্র... দেবীকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এখন তাঁহা... শাস্ত্রটিকে অনেকটা নিখুঁত করিয়া আনিয়াছে... বিজ্ঞানাগারে টেষ্ট টিউবে তাঁহারা যে ফল প্রা... দেহের মধ্যেও তাঁহারা ঠিক সেই ফলই উৎপাদন ক... পারেন। শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত আবর্জ্জনা ... থাকিলে রক্ত পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা তাহার প... নিখুঁত রূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। আগে...

তাঁহারা দেহ পরিত্যক্ত পদার্থ যথা মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার ফল তেমন নিখুঁত সুন্দর হইত না।

মানব-দেহের যে সকল যন্ত্র দিয়া ময়লা বাহির হইয়া যায়, তন্মধ্যে বৃক্ক অন্যতম। ইহার মধ্য দিয়া ময়লা বাহির হইবার সময় ইহা অণুগুলি ছাঁকিবার চালুনীর কাজ করে। ইউরিয়া নামক একটী পদার্থ ক্ষুদ্রতম অণুর সমষ্টি মাত্র। এই পদার্থটি জলে দ্রব হয় না। সুতরাং ইহার আকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটে না। রাউনট্রি (Rowntree) ও জেরাঘ্‌টি (Geraghty) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক বিশেষ একপ্রকার রঞ্জন পদার্থের সাহায্যে বৃক্কের মধ্য দিয়া ইউরিয়া ছাঁকিবার কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। রাউনট্রি আর এক প্রকার রং লইয়া লিভারের কার্য্যেরও সন্ধান লইয়াছেন। মান (Mann) পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে একটা কুকুরের যকৃৎ বাহির করিয়া লইলে তাহার দেহে আর ইউরিয়া উৎপন্ন হয় না। তাহার রক্তেও আর চিনির অস্তিত্ব দেখা যায় না।

সাধারণতঃ কার্ব্বোহাইড্রেটমূলক খাদ্য যে অবস্থায় ভুক্ত হয়, সেই অবস্থায় শরীরে গৃহীত হয় না। উহা শরীরের মধ্যে চিনিতে পরিণত হইয়া তবে গৃহীত হইতে পারে। কার্ব্বোহাইড্রেট দেহ মধ্যে যে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তাহাকে গ্লুকোজ বলে। পিচকারী দ্বারা গ্লুকোজ, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জল শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। Mann এই পরীক্ষা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। শরীর কোন রূপে বিষাক্ত হইয়া পড়িলে এই উপায়ে রোগীর মৃত্যু কিছু ক্ষণের জন্য নিবারণ করা যাইতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় রক্ত ক্ষারধর্ম্মী। রক্তে ক্ষারের পরিমাণের আধিক্য হইলে তাহাকে alkalosis বলা হয়। আবার ক্ষারের পরিমাণ কমিয়া গেলে তাহাকে বলা হয় acidosis। মেদজাত acid শরীরের মধ্যে শোষিত না হইলে ডায়াবেটিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল অম্ল পদার্থকে শোষিত করাইতে হইলে চিনি আবশ্যক হয়। এই চিনির পরিমাণ কম হইলে acid শরীরে শোষিত হইতে না পারায় ডায়াবেটিস রোগ জন্মে। এ কথা অনেক দিন হইতেই জানা আছে যে, ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে এবং পরে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্বোহাইড্রেট-ঘটিত খাদ্য আবশ্যক। সেই কার্ব্বোহাইড্রেট চিনিতে রূপান্তরিত হইয়া Acidosis ও মুমূর্ষু অবস্থা নিবারণ করে। Acidosis অবস্থার নিবারণের পক্ষে Insulin চমৎকার ঔষধ। চিকিৎসা, পথ্য ও insulin সাহায্যে Wilder ডায়াবেটিস রোগীদের অস্ত্র চিকিৎসার পর মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে পারিয়াছেন। ডায়াবেটিস রোগগ্রস্ত নহে এমন যে সকল লোকের রক্ত acidosis অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদেরও এই প্রণালীতে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি Thalhimer, Fisher, Mensing ও Snell অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে ও পরে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জলে শতকরা দশ অংশ গ্লুকোজ দ্রবীভূত করিয়া পিচকারী সাহায্যে সেই দ্রব চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তে মিশাইয়া দিয়া এবং তৎসহ insulin ব্যবহার করিয়া অসামান্য উপকার পাওয়া গিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে বস্তু-রসায়ন-বিজ্ঞান (Physico-chemistry) যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ইহাকে জীবনী-শক্তি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। চিকিৎসক মাত্রেরই এই শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হউন না কেন, সাধারণ ভাবে বস্তু-রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা প্রত্যেকের পক্ষেই অপরিহার্য্য। আর অস্ত্র চিকিৎসকগণের ত কথাই নাই—তাঁহাদের জন্য নিত্য নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে। বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় অস্ত্র চিকিৎসক অসাধ্য সাধন করিতেছেন। যে সকল রোগ পূর্ব্বে শিবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, অস্ত্র চিকিৎসক তাহাদের অনেককেই প্রাণ দান করিতেছেন। অস্ত্র-চিকিৎসার শৈশবে বহু

রোগীর এমন চিকিৎসা হইত, যাহাতে তাহাদের অধিকাংশই রক্ষা পাইত না। Rehabilitation অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে তাহার পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূল কথা।

অধুনা অনেকে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বলেন যে, বিজ্ঞান এখন মানুষ-মারা যন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যস্ত; সভ্য জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য—কি উপায়ে অল্প সময়ে ও অল্প চেষ্টায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক নরহত্যা করা যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন নহে; কিন্তু ইহা নিতান্ত একদেশদর্শী পক্ষপাতমূলক মন্তব্য। বিজ্ঞান যেমন মানুষ মারা কলও তৈয়ার করিতেছে, তেমনি মানুষের জীবন রক্ষার বিষয়েও কম কাজ করে নাই। বিজ্ঞান যে চিকিৎসা শাস্ত্রের কতখানি উন্নতি সাধন করিয়াছে—বিগত যুদ্ধে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের সহায়তায় নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যেমন অসংখ্য লোক হতাহত হইয়াছে, তেমনি লক্ষ লক্ষ আহত মরণাপন্ন লোক প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে। দেহ হইতে গুলি ও অন্যান্য অস্ত্রের খণ্ড বাহির করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান কত লোককে বাঁচাইয়া দিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কত অঙ্গহীন ব্যক্তি বিজ্ঞানের কৃপায় নষ্ট অঙ্গের স্থলে নকল অঙ্গ ফিরিয়া পাইয়া আবার সাধারণ মানুষের মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। অস্ত্র চিকিৎসকেরা একজনের দেহের কোন নষ্ট অঙ্গের স্থলে অপরের দেহের সেই অঙ্গ যোড়া দিয়া তাহাকে সহজ মানুষ করিয়া দিয়াছেন। এ সকল কথা স্বীকার না করিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হয়।

চা পান

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

"কি করিবে বক্তা—যথা শ্রোতা না মিলিবে ?
ন্যাংটা সন্ন্যাসীর দেশে ধোপা কি করিবে ?

বহু দিবস হইতে চায়ের আবাদ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেরূপ লাভজনক হইয়াছে, এবং জনসাধারণ চা-পানে যেরূপ অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহাতে এই সর্ব্বদেশব্যাপী চা-পান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চা এক প্রকার বৃক্ষের পাতা। সেই পাতা, তৈয়ারি চায়ের আকারে লোকের নিকট উপস্থিত হয়। চায়ের পাতায় ট্যানিন নামক এক প্রকার অতীব তীব্র কষায় বিষাক্ত পদার্থ আছে, প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টাকাল পাতাগুলিকে জলে ভিজাইয়া উক্ত রসের পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

অনেকে বলেন, চীনদেশ চায়ের জন্মস্থান। কেহ কেহ বলেন, অতি পুরাকালে বোধি-ধর্ম্ম নামক জনৈক বৌদ্ধ সাধু ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করেন এবং তিনিই প্রথমে তথায় চায়ের প্রচলন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৎকালীন চীন সম্রাটের শ্বশুর ওয়াংমেং প্রথমতঃ চা পানীয়রূপে ব্যবহার করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা চীন দেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক চা ইউরোপে নীত হয়। প্রায় চারিশত বৎসর গত হইল, চা সর্ব্বপ্রথম চীন দেশ হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। তখন ইহার এক পাউণ্ডের মূল্য প্রায় দুইশত টাকা ছিল। সেই সময় একজন নাবিক ইংলণ্ডের রাজাকে দুই পাউণ্ড চা প্রদান করিলে, তিনি অতি উৎকৃষ্ট উপহার প্রাপ্ত হইলেন মনে করিয়াছিলেন।

ভারতে বোধ হয় ইহার প্রচলন সপ্তদশ শতাব্দী

মধ্যভাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। এক্ষণে আসাম, সিংহল এবং বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় প্রধানতঃ দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে যথেষ্ট চা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি ও ত্রিবাঙ্কুর পর্ব্বতে চায়ের বাগান আছে। বৈজ্ঞানিক মতে আসামের বন্য চা পৃথিবীর সকল দেশের চায়ের আদিপুরুষ। আসাম ব্যতীত কুত্রাপি বন্য চা দেখা যায় না। ১৭৮০ খৃঃ ডাক্তার কিড চীনে চা কলিকাতার বোটানিক্যাল উদ্যানে প্রথম রোপণ করেন। ১৮১৯ খৃঃ আসামের বন্য চা মেজর ব্রুস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃঃ আসামে চীন-দেশীয় চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। এক্ষণে আসামে প্রায় দশ লক্ষ বিঘা জমিতে চায়ের আবাদ হইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৬ লক্ষ বিঘা ভূমিতে বাৎসরিক প্রায় ২৪ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক চা আসামে জন্মিয়া থাকে। আসামের চা এখন চীনা চাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, আসামের চা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষায়, তজ্জন্য ইহার ব্যবহারে অম্ল, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা বেশী হয়। আসাম ও সিংহল প্রদেশের চা অপেক্ষা দার্জ্জিলিংয়ের চা অধিকতর সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। চায়ের নিজস্ব মৌলিক গন্ধ ব্যতীত উহাকে সুগন্ধ করিতে হইলে চা পাতার সহিত সেই সকল পুষ্পের পরাগ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

অপরিমিত চা পান করিলে নিদ্রালুতা ঘটে। চা রক্তের গতি বৃদ্ধি ও স্নায়ুমণ্ডলীকে দুর্ব্বল করে, এবং ফলে ডিস্‌পেপসিয়া রোগ জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, চা পানে ডিস্‌পেপসিয়া হয় না, চা পানের রীতির দোষেই ডিস্‌পেপসিয়া হইয়া থাকে। সামান্য কিছু খাদ্য-সামগ্রীর সহিত চা পান করা উচিত। অনেকেই খালি পেটে চা পান করিয়া থাকেন; কিন্তু খালি পেটে চা পান করিয়া পরে যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা রীতিমত পরিপাক হয় না। প্রথমে তরল পদার্থ পান করিলে চর্ব্বণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। চর্ব্বণ ক্রিয়া সম্যক্ না হইলে নিয়মিত পরিমাণে পাচক রস নির্গত হইতে পায় না—লালা উৎপন্ন হয় না। তজ্জন্য পরিপাকের জন্য যে প্রধান রসের আবশ্যক তাহার অভাব হয়। যাহাদের পরিপাক শক্তি অল্প, তাহাদের পক্ষে চা পান নিষিদ্ধ। অন্ততঃ খালিপেটে চা পান করা উচিত নহে। অত্যধিক চা পানে বক্ষস্থল ধড়ফড়, মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, শিরঃশূল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পন, স্মরণশক্তি হ্রাস প্রভৃতি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উৎপাদিত হয়। হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ক্রিয়াও তাড়াতাড়ি হইতে থাকে। ধমনীর স্ফীততা বশতঃ অধিক পরিমাণ রক্ত বৃক্কদ্বয়ের (kidney) মধ্য দিয়া যাওয়ায় অধিক মূত্র বহির্গত হয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য হৃদপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, অসংযত স্বভাব, অজীর্ণ প্রভৃতি আনয়ন করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। যাঁহারা নিত্য নিয়মিতভাবে ও অধিক পরিমাণে চা পান করেন, তাঁহাদের সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অপকার হয়। যাহাদের কোন প্রকার হৃদরোগ অথবা অন্য কোন প্রকার স্নায়বিক ব্যাধি আছে, তাহাদের পক্ষে চা পান বিশেষ অপকারী। অধুনা এ দেশে বিশেষতঃ ছাত্র সমাজেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অত্যধিক চা পানই ইহার অন্যতম কারণ হইয়াছে। চা যত তীব্র (অর্থাৎ কড়া) হইবে, তাহার অনিষ্টকারিতা তদ্রূপ অধিক হইবে।

চা যে বিষ তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত সত্য। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ইহা সকলের পক্ষেই সমানভাবে বিষের কার্য্য করে। বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক চায়ের অপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। চিকিৎসকগণ ও বৈজ্ঞানিক-গণ চায়ের উপকারিতা ও অনুপকারিতা বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। সেই সকল পরীক্ষার ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, চায়ে দুই প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। এক প্রকারের নাম থিয়েন; অপর প্রকারের নাম ট্যানিন্। চায়ে শতকরা ছয়ভাগ থিয়েন ও তাহার ওজনের সিকি ভাগের অধিক ট্যানিন্ থাকে। এই থিয়েন একটি তীব্র বিষ, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এক আউন্সে প্রায় পনের গ্রেন থিয়েন পাওয়া যায়। চায়ে যথেষ্ট পরিমাণ থিয়েন ও ট্যানিন্

নামক বিষাক্ত পদার্থ থাকায়, অম্ল, অজীর্ণ, শূল বেদনা, ডিস্‌পেপসিয়া, মস্তক ঘূর্ণন, শিরঃশূল, উদরাময়, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। চায়ের ভিতরের ট্যানিন্ বিষ হৃদিরোগ ও হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী।

চা পত্রস্থিত ট্যানিন পদার্থ পাকস্থলীর পক্ষে অনিষ্টকর। চায়ের পত্রে যে ট্যানিন বিষ থাকে, তাহার অপকারী ধর্ম্মকে নষ্ট করাই দুগ্ধের উদ্দেশ্য; তজ্জন্য চায়ের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। চায়ের পত্র বারম্বার সিদ্ধ করিলে, তাহা হইতে ট্যানিন অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়। সেই কষের জল পানের ফলে পরিপাক ক্রিয়ার হানি হইয়া নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। চা অধিকক্ষণ সিদ্ধ হইলে থিয়েনের ভাগ অধিক হয়। তজ্জন্য তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কেফিন নামক আর এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে, তাহা চায়ের সহিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করে এবং অধিক রক্ত মস্তকে যাওয়ায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়; তাহার ফলে অনিদ্রা আসিয়া থাকে। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণ সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, চায়ে এমন একটি অম্ল পদার্থ আছে, যাহা নিয়মিতরূপে মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে বাত রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। এতদ্ব্যতীত প্রস্রাবে যে তরল অম্ল পদার্থ থাকে, চায়ে তাহা অধিক পরিমাণে আছে। চায়ে কেফিন ও থীন নামক হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজক দুইটি পদার্থ থাকিয়া শরীরের রক্ত চলাচল-ক্রিয়া ঘর্ম্ম ও মূত্র সকল গুলিই বৃদ্ধি হয়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার অলমন্ বলেন—প্রতি পিয়ালা চায়ের ভিতর কেফিইন নামক এক প্রকার বিষ আছে, এই চা লোকে পিয়ালা পিয়ালা পান করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলেন—পানকারিগণের সংখ্যা হিসাবে জগতে যে পরিমাণে যত পানীয় খরচ হয়, তাহাতে জলের পরই চায়ের স্থান নির্দ্দেশ করা যায়।

চীন দেশের নিকট হইতে ইংরাজেরা চা পান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহারাই আমাদের চা পানের শিক্ষাগুরু। কিন্তু ইংরাজেরা শীতপ্রধান দেশবাসী, তাঁহাদের পক্ষে চা পান করা সম্ভব এ দেশের পক্ষে নহে। অধুনা সৌখীন কোটিপতি হইতে পর্ণ কুটীরবাসী কাঙ্গাল পর্য্যন্ত চা পানের বিশ্ববিমোহিনী মোহে মুগ্ধ হইয়াছে। সাধারণ অবস্থাপন্ন ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে ভাত না হইলে এক দিন চলে, কিন্তু চা না হইলে এখন চলে না। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সমাজও ঘোর চা-পায়ী হইয়াছেন। অধুনা চা পান এ দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া এখন অন্ন জলের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রথমে কেবল মাত্র ধনীর বিলাসের সামগ্রী হইয়া ক্রমে নেশায় পরিণত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে যদিও এখন পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ সকলে চা পানে অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু সহরে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই নেশা সকলকেই এক প্রকার গ্রাস করিয়াছে। যাঁহারা দোকানের তৈয়ারী চা পান করেন, তাঁহারা এক প্রকার বিষ পান করিয়া থাকেন। আজকাল সহরে সহরে বহুসংখ্যক চায়ের দোকান হইয়াছে। তাহাতে একই পাতা বারম্বার সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ পানীয় পরম অনিষ্টকর। কারণ সমস্ত ভাল চা বিক্রীত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহারই পাচমিশালী চায়ের পাতা বা গুঁড়া এদেশে পাওয়া যায়। অধিকাংশ চায়ের দোকানের চা তাহাতে প্রস্তুত হয়। গরান কাষ্ঠের গুঁড়া সময়ে সময়ে জলে চায়ের সহিত মিশ্রিত করা হয়। তাহার ফলে চা চায়ের রং বেশ লাল হইয়া থাকে। একই জলপাত্র ময়লা জলে চায়ের পাত্রগুলিকে ধৌত করায় নানা জাতির মুখের লাল বা উচ্ছিষ্ট মিশ্রিত জল উদরে যায়। তথাপি লোকে পরম তৃপ্তির সহিত দোকানের চা পান করিয়া ধন্য হয়।

ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা মারাত্মক বিষ। শৈত্য নিবারণ চায়ের প্রধান গুণ বটে, কিন্তু এ গরম দেশে সেরূপ কোন জিনিসের প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু গরম দেশে উগ্রবীর্য্য পানীয় সেবনে শরীর

প্রভৃত অনিষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি চারিদিকেই চায়ের জীবন্ত রক্তাভ মূর্ত্তি প্রকটিত। অর্থনীতির দিক দিয়াও ইহা অব্যবহার্য্য। চা পান আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন। তাই আমরা ইহার অনুকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া এখন চায়ের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছি। দেশ নিঃস্ব হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। দুর্ভিক্ষের দেশে আহার কমাইবার ইহা একটী অমোঘ ঔষধ। সস্তায় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার এমন জিনিস আর নাই। দেশে দ্রব্যাদি সস্তা হইলে বোধ হয় চা পানের এরূপ প্রচলন হইত না। এমন ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে চা পান ভাল কি মন্দ—উপকার কি অপকার—সে বিষয়ে সহৃদয় পাঠকগণ সমালোচনা করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না।

হে গঙ্গাবারি সদৃশ কলিকালের কলুষ-ভূষণ উত্তপ্ত সোমরস, তোমাকে দূর হইতে নমস্কার করি!!

নিদ্রা

[শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল্]

জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাল আমরা নিদ্রায় অতিবাহিত করি। সুতরাং নিদ্রা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা খুব অন্যায় হইবে না। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের শরীর সর্ব্বদা ক্ষয় পাইতেছে। শরীরের ক্ষয় পূরণ ও পোষণের নিমিত্ত, ও মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য নিদ্রার দরকার। দৈনিক কয় ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক তাহা আমাদের জানিতে হইবে। ডাক্তারগণ কত বয়সে কয়ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক, তাহা মোটামুটী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ মোটামুটী সত্য, কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ঠিক খাটিবে কি না বলা যায় না। দেখা যায়, শিশু ও দুর্ব্বল লোকদের অধিক নিদ্রার দরকার। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর তাহার নিদ্রার পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। সমবয়স্ক দুই জনের মধ্যে এক জনের একঘণ্টা নিদ্রা কম হইলেও চলিতে পারে, অপর জনের একঘণ্টা বেশীও লাগিতে পারে। তারপর পূর্ব্বদিনের কৃত কাজের পরিমাণের দরুণও নিদ্রা বেশী বা কম দরকার হইতে পারে। পূর্ব্বদিনে অধিক ও কঠোর কাজ করিলে রাত্রে ক্ষয় পূরণের জন্য অধিক নিদ্রা আবশ্যক হইবে। ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে কত ঘণ্টার নিদ্রা আবশ্যক তাহা তাহার বয়স, শারীরিক অবস্থা ও দৈনিক কৃত কার্য্যাদির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা যাইতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, শরীর যতটুকু নিদ্রা চায় তাহাতে কার্পণ্য করা সঙ্গত নয়। কোন রাত্রিতে ঘুম না হইলে তৎপর দিবস কাজে কোনই উৎসাহ থাকে না, দিনটাই এক প্রকার বৃথা নষ্ট হয়। সুতরাং রাত্রিতে যাহাতে সুনিদ্রা হয় তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

কি প্রকারে সুনিদ্রা হইতে পারে? সুনিদ্রার জন্য শয়নকক্ষ স্বাস্থ্যকর হওয়া দরকার, বিছানাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত ও নিদ্রা সম্পর্কেও কতকগুলি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা আবশ্যক। এই বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিম্নে আমরা এক একটী করিয়া সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

(১) বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুঠরীতে বা ঘরে বিছানা রাখিতে হইবে। দুবেলা ঘরটীকে পরিষ্কার করিতে হইবে। আসবাব প্রভৃতি জিনিস দ্বারা ঘরটীকে পূর্ণ করা সঙ্গত নহে। যত কম জিনিস শয়ন গৃহে রাখা যায় ততই মঙ্গল। মৎস্য যেমন জলের জীব, মানুষও সেইরূপ বায়ুর জীব, সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখিতে

হইবে। বায়ুই মানুষের জীবন, বায়ু ব্যতীত মানুষ এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা মানুষ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বায়ু চায়। সুতরাং যাহাতে শয়ন কক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। দিনের বেলা সমস্ত দরজা ও জানালা খোলা রাখিবে ও রাত্রিতে দুই একটা জানালা খোলা রাখিবে, যেন প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। দিনের বেলা সূর্য্যের আলো যাহাতে শয়ন গৃহে প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। উক্ত আলো জীবাণু নষ্ট করে।

(২) আমাদের বিছানা এমন হওয়া চাই যেন সহজে তাহা ধৌত করা যায়। সর্ব্বদা ত্বক্ দ্বারা ময়লা বাহির হইয়া থাকে। ঘুমের সময় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয় ও রক্ত ত্বকের নিম্নে অধিকতর সঞ্চালিত হওয়ায় ময়লা অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে। সহজেই শরীরের ময়লায় বিছানা দূষিত হয়। মাঝে মাঝে বিছানা ধৌত না করিলে তাহা শীঘ্রই অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যহ বিছানা গুলি রৌদ্রে দেওয়া উচিত, ইহাতে অনেক জীবাণু নষ্ট হয়।

(৩) রাত্রিতে বাতাস শীতল থাকে, শারীরিক যন্ত্রগুলিও তখন বিশ্রাম করে। এই অবস্থায় শরীর কিছু গরম রাখার জন্য একখানা বস্ত্র শরীরের উপর রাখা উচিত। বস্ত্রখানা এইরূপ হওয়া উচিত যেন বাতাস সহজে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। আমরা বায়ুর জীব—সর্ব্বদা বায়ু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করা আবশ্যক।

(৪) রাত্রিতে ভোজনের অব্যবহিত পরেই শয়ন করিতে যাইবে না। খাবার ২।৩ ঘণ্টা পরে শয়ন করিবে, তাহা না হইলে হজম করিতে অসুবিধা হইবে। অধিকন্তু রাত্রিতে স্বপ্নাদি দেখিতে হইতে পারে। স্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাতকারী।

(৫) ঘুমানোর সময় এক গ্লাস জল খাইয়া শয়ন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহাতে সহজে ঘুম আসে, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস প্রভৃতির কাজ ভাল চলে ও শরীরস্থ ময়লা বাহির করিবার পক্ষে সাহায্য করে। খাওয়ারও একটি নিয়ম আছে; একেবারে এক চুমুক খাওয়া খুব উপকারী নহে, একটু একটু করিয়া খাওয়ার মতন গ্লাসের জল খাইতে হইবে।

(৬) নিদ্রায় কখন যাইবে ও ঘুম হইতে কখন উঠিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবে। অভ্যাস করিলে কিছুতেই কষ্ট লাগিবে না। রাত্রে দশটা কি সাড়ে দশটায় শয়ন করিবে।

দুপুর রাত্রের পূর্ব্বের একঘণ্টা ঘুম, পরের দুইঘণ্টা ঘুমের চেয়ে বেশী উপকারী ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(৭) পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ঘুমের প্রথম তিন ঘণ্টা খুব ভাল ঘুম হয়, তারপর পাতলা ঘুম হয়। সুতরাং ঘুমের প্রথম অবস্থায় কাহাকেও বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে জাগ্রত করা উচিত নয়।

(৮) রাত্রিতে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনেকের মতে ভাল। ইহাতে খুব শীঘ্র ঘুম আসে। এত সহজে অন্য কোন অবস্থায় ঘুম আসে না। এইরূপ শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসে ও রক্তসঞ্চালনে কোন অসুবিধা হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন চিৎ হইয়া শয়ন করিলে রাত্রিতে স্বপ্ন হয়। তাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করিতে উপদেশ দেন। কখনও বাম পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করিবে না। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের কাজ ভাল হয় না, এবং পাকস্থলীর উপর যকৃতের চাপ পড়িয়া পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

(৯) বালিশ খুব উঁচু করিবে না, উঁচু বালিশে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়।

আমরা এই পর্য্যন্ত কি প্রকারে ঘুমাইলে সুনিদ্রা হয় তাহা বলিয়াছি। কিন্তু অনেকে মাঝে মাঝে অনিদ্রায় খুব কষ্ট পান। আহার না করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, কিন্তু নিদ্রা না হইলে অল্প কয়দিনের মধ্যেই মানুষ মারা যায়। এক দিন কোন কারণে নিদ্রা না হইলে তৎপর দিন শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। দুচার দিন একাদিক্রমে ঘুম না হইলে শরীর ও মন এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; শরীর কিছুতেই ভাল লাগে না, মন কিছুই ঠিক করিতে পারে না; বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি হ্রাস হয়। এইরূপ কয়দিন চলিলে মৃত্যু অনিবার্য্য! সুতরাং অনিদ্রার উপদ্রব উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটি কথা এই সম্পর্কে বলা যাইতেছে। আশা করা যায়, অনেক অনিদ্রাগ্রস্ত ব্যক্তি তাহা হইতে উপকার পাইবেন।

(১) যদি সহজে ঘুম না আসে তাহা হইলে মনকে খালি রাখিতে চেষ্টা করিবে; মন হইতে সর্ব্ব-প্রকার চিন্তা তাড়াইবে, কোন চিন্তা মনে উদয় হইলেই তাহাকে ভিতরে অবস্থান করিতে বাধা দিবে। অভ্যাস করিলে ইহা সহজসাধ্য। আবার শয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ একটী বিষয় চিন্তা করিলেও সহজে ঘুম আসে। এই উভয় উপায় দ্বারাই মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত বা দুর্ব্বল হয়। তখন সহজে ঘুম আসে।

(২) ঘুমের সময় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয়। অতএব যাহাদের ঘুম হয় না, তাহারা যাহাতে শয়ন করিলে মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যে সকল কাজে মন চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হইতে পারে, এইরূপ কোন কাজ করিবে না; সর্ব্বদা শান্ত ও ধীর থাকিতে চেষ্টা করিবে।

(৩) রাত্রে হালকা (লঘু) আহার করিয়া ঘুমাইবে। ইহাতে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত পাকস্থলীতে আসিবে ও মস্তিষ্কে রক্ত স্বল্পতার দরুণ সহজেই ঘুম আসিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে ঘুমের পূর্ব্বে পূর্ণ (গুরু) আহার করিলে অপাক হইবে ও স্বপ্নাদির দ্বারা নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে।

(৪) শরীর গরম কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া শয়ন করিলেও সহজে ঘুম আসিবে, কারণ ইহাতেও মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হইবে।

(৫) আলোর ঘুম ভাঙ্গার শক্তি আছে। সুতরাং যাঁহারা অনিদ্রায় কষ্ট পান, তাঁহারা রাত্রে ঘুমানোর সময় জানালা ভালরূপ বন্ধ করিয়া ঘুমাইলে কতক উপকার পাইতে পারেন। ঘরে আলো প্রবেশ করিতে না পারিলে তাঁহাদের ঘুম অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে।

(৬) রীতিমত ব্যায়াম করিবে, ইহাতেও ঘুমের সহায়তা করে। যাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কোন-রূপ ব্যায়াম করা অসুবিধাজনক মনে করিলে, অন্ততঃ দুই বেলা কিছু সময় হাঁটিয়া বেড়াইবেন। যুবকগণও ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে রীতিমত দুইবেলা হাঁটার অভ্যাস করিতে পারেন।

সম্পাদকের ডাকবাক্স

প্রশ্ন—

মাননীয়, স্বাস্থ্য সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি আপনার "স্বাস্থ্য সমাচারের" গ্রাহক। আপনি নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের সেবা এবং ব্যক্তি গত ভাবে উপদেশ দানে যে মহান উপকার করিতেছেন, তাহার পুরস্কার মানবের সাধ্য নাই যে দিতে পারে। সারা বাঙ্গালার বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সবাই কোন না কোন প্রকার ব্যাধি লইয়াই জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন

করিতেছে মাত্র। কত কাল পরে আবার আমরা দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ স্বাস্থ্য আপনার করিয়া ফিরিয়া পাইব জানিনা।

সহর এবং পল্লীবাসী, যথা ক্রমে অজীর্ণ এবং ম্যালেরিয়াতে জীর্ণশীর্ণ। স্বল্পায়ু হইয়া এ পৃথিবীতে আসা যে কত বড় পাপের কঠোর শাস্তি তার ইয়ত্তা নাই। দেশব্যাপী "ডিস্‌পেপসিয়া" রোগে আমরা স্বল্পায়ু; এই অগ্নিমান্দ্য যত দিন থাকিবে তত দিন আনুষঙ্গিক অন্যান্য রোগ আক্রমণ করিবেই।

দেশব্যাপী এই রোগের কোন পেটেন্ট ঔষধ আছে কিনা। থাকিলে সে ঔষধের নাম ঠিকানা। এবং আপনার প্রকাশিত স্বাস্থ্য-সমাচারের ভাদ্রের সংখ্যায় ডিস্‌পেপসিয়া রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসা প্রণালী প্রকাশ করিলে জন সাধারণের অশেষ উপকার হইবে।

আমিও অনেক ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী চিকিৎসা করিয়াছি। এবং আপনার আবিষ্কৃত টাইকো-সোডা ট্যাবলেট এবং বাইসুরেটেড ম্যাগনেসিয়া, একোয়া টাইকোটিস, আয়ুর্ব্বেদ মতে মহাশঙ্খ ভুবনেশ্বর বৃঃ লবঙ্গাদি ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াও সন্তোষজনক উপকার পাই নাই। অধিকাংশ রোগীরই রাত্রে হজম হয় না, প্রাতে ৩।৪ বার অজীর্ণ মল ভেদ হয়। উদ্গার উঠে। তল পেটে বায়ু সঞ্চার হয়। এই সব লক্ষণে পেটেন্ট অথবা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিলে উপকার হয় জানাইলে কৃতার্থ হইব।

কোষ্ঠবদ্ধাজীর্ণ এবং উদরাময় সংযুক্ত অজীর্ণের বিস্তৃত চিকিৎসা প্রণালী অথবা নির্দ্দিষ্ট ঔষধের নাম ইত্যাদি আপনার প্রকাশিত কাগজে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

পেটেন্ট ঔষধের ব্যবস্থা হইলে নাম ও দাম জানাইলে ভিঃ পিঃ ডাকেও আনাইতে পারি। আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিলাম।

বশংবদ কবিরাজ—

শ্রীগোবিন্দ লাল কাব্যতীর্থ কাব্যরত্ন কবিভূষণঃ
গ্রাম, পুকুরপার। পোঃ পুকুরপার। (পাবনা)

উত্তর—

দেশব্যাপী ডিসপেপসিয়া রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়াছেন। অম্ল অজীর্ণ এবং ডিসপেপসিয়া রোগ আমাদের নিজ নিজ পান ও ভোজনের অনিয়ম হেতু এবং ভেজাল দ্রব্য আহার দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কেবল ঔষধ খাইলে এই রোগ আরোগ্য হইবে না। রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ব্যবস্থা দিতে হইবে। ডাক্তার বসুর ল্যাবরেটরী দ্বারা প্রকাশিত "পারিবারিক ঔষধাবলী ও গৃহ-চিকিৎসা" নামক পুস্তিকাতে ৬৪ পৃষ্ঠায় এই রোগের চিকিৎসা কালীন কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ ও লালা মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

২। সময়মত ও ক্ষুধামত খাইবে। বরং কিছু ক্ষুধা রাখিয়া খাইলে সহজে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া যায়।

৩। আহারের সহিত অধিক জল খাইলে পাচকরস সকল নিস্তেজ হইয়া যায় এবং পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। এই জন্য আহারের সময় অধিক মাত্রায় জল খাইবে না। আহারের অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পরে পুরা এক গ্লাস জল পান করিবে।

৪। প্রত্যূষে, বৈকালে ও রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। ইহার দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কৃত হয়; এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ ময়লা সকল দ্রবীভূত হইয়া মল ও মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায় এবং মল ও মূত্র পরিষ্কার থাকে।

৫। অধিক পরিপাকে মশলা বা তৈল বা ঘৃত খাওয়া যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিবে।

৬। আহারের সময় চিত্ত আবেগশূন্য করিবে মন প্রফুল্ল রাখিবে। রাত্রে কখনও গুরু ভোজন করিবে না।

৭। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে একটু বেড়াইয়া বেড়াইবে

এবং প্রত্যূষে উঠিয়া খোলা বাতাসে সূর্য্যকর প্রখর না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। শয্যাত্যাগ করিয়াই এক গ্লাস জল পান করিতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রে নিদ্রার অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করিবে, এবং দিবসে আহারের পর অন্ততঃ ১৫ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিবে।

আপনি কয়েকটী দেশীয় ও বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহারে সন্তোষজনক উপকার পান নাই লিখিয়াছেন। এবং কোন ফলপ্রদ পেটেন্ট ঔষধের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমি নিজে যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানে তৈয়ারী সকল ঔষধ ব্যবস্থা দিয়া থাকি এবং টাইকো-সোডা ট্যাবলেট উপরি লিখিত নিয়ম মত ব্যবহারে রোগীরা সন্তোষজনক ফল পাইয়া থাকেন। তবে যদি রোগী নিয়ম পালন না করে তবে ঔষধে উপকার হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধাজীর্ণ এবং উদরাময় সংযুক্ত অজীর্ণের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধ ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসের "স্বাভাবিক উপায় দ্বারা রোগ আরোগ্য" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। অন্ত্রধৌতি দ্বারা কোষ্ঠ বদ্ধ বা উদরাময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে অন্ত্রধৌতি নামক পুস্তিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গত বৎসর প্রকাশিত সুবিজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীন ডাক্তার শ্রীযুত যদুনাথ বসুর লিখিত বাঙ্গালীর যথার্থ অন্নপ্রাশন প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঔষধ সম্বন্ধে "ল্যাকটিক এসিড ব্যাসিলস কলচার" (দধীবীজ), একষ্ট্রাক্ট বেল ও ইন্দ্রযব লিকুইড এবং কম্পাউণ্ড সলফার ট্যাবলেট ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। তবে কিরূপ অবস্থায় কোনটি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা উক্ত প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

স্বাস্থ্য ব্যাপারে ঔদাসীন্য।—

সে দিন পার্লামেণ্টে একজন সদস্য প্রশ্ন করেন যে, ভারতে কতগুলি বসন্ত রোগের হাসপাতাল আছে, তাহাদের অবস্থাই বা কেমন? এবং যে সকল সহরে মিউনিসিপ্যালিটী আছে, সে সকল সহরে বসন্ত-রোগের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করা ও রোগীকে স্বতন্ত্র করার কি রকম ব্যবস্থা আছে? ভারতসচিবের সহকারী আর্ল উইণ্টারটন বলিলেন, জানি না; স্বাস্থ্য-শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা আর মন্ত্রীরা দায়ী। ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা,—ভারতবাসীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক ব্যাপার। যেহেতু স্বাস্থ্য ব্যাপারের জন্য প্রাদেশিক লাটেরা ও তাঁহাদের মন্ত্রীরা দায়ী, অতএব ভারত-সচিব মহাশয়ের সে সম্বন্ধে কোন খবর রাখিবার দরকার নাই! যেন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপার অতি তুচ্ছ ব্যাপার, ভারত সচিবের গ্রাহ্য নহে! সুতরাং দেশের স্বাস্থ্য যে এইরূপ হীন থাকিবে, তাহার উন্নতির যে কোন ব্যবস্থা হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ভারত সচিবের এই ঔদাসীন্যে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকদিন হইল সহসা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যুর দিন চার পাঁচ পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। পরে তাহাই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার পুরুষ সিংহ,

ভারতে রাজনীতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক, কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতায় দেশীয় ইয়োরোপীয় শত্রু মিত্র সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। আজীবন তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা অসাধারণ ছিল। বঙ্গদেশ হইতে প্রথম যে তিনজন বাঙ্গালী যুবক বিলাতে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে যান, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ান হইয়া দুই বৎসর মাত্র সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকুরী তাঁহার ললাটলিপি ছিল না, দেশসেবাই ছিল বিধিলিপি। তাই দুই বৎসর পরেই তাঁহার দাসত্বের অবসান ও মুক্তিলাভ ঘটে। তারপর সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক রূপে, সংবাদ পত্রের সম্পাদক রূপে দেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। একবার আদালত অবমাননার অপরাধে তাঁহাকে কিছুদিন কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। সার সুরেন্দ্রনাথ একাধিকবার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন যজ্ঞে তিনি প্রধান হোতার পদ গ্রহণ করিয়া এমন তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করেন যে, কয়েক বৎসর পরে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া যায়। সেই সময়ে তিনি সাধারণ্যে বাঙ্গলার "অনভিষিক্ত রাজা" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বজ্রনাদে বিদেশীপণ্য বর্জ্জন ঘোষণা করেন। শেষ বয়সে সুরেন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তিনি সংস্কৃত শাসনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজনীতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, আমরা একটী বিষয়ে তাঁহার পরম অনুরাগী ছিলাম। অপর নেতৃগণের ন্যায় তিনি নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন। সেইজন্য তাঁহার দেহ বরাবর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম ছিল। অন্যান্য নেতৃগণ ও সর্ব্বসাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণ করিলে ভালই হয়।

বিবর্ত্তনবাদের বিপদ!—

ডারউইন সাহেবের বিবর্ত্তনবাদের সহিত আমাদের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকারই সম্ভবতঃ কিছু না কি[ছু] পরিচয় আছে। ডারউইন সাহেব অনেক বৈজ্ঞানি[ক] গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বানর জাতি মানবের পূর্ব্বপুরুষ, অর্থাৎ জীব-সৃষ্টি[র] বিবর্ত্তন নীতির ফলে বানর জাতি হইতে ক্রমোন্নতি[র] হিসাবে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। ডারউইনের এ[ই] সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সমাজে এতই আদৃত হইয়াছে [যে] ইহাকেই ভিত্তি করিয়া অনেক নূতন শাস্ত্র গড়ি[য়া] উঠিয়াছে ও উঠিতেছে (যদিও ইদানীং কোন কো[ন] পণ্ডিত এই অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্ত্তনবাদ বা evolution theoryতে সন্দেহ প্রকাশ করিতে আর[ম্ভ] করিয়াছেন)। কিন্তু ডারউইন সাহেবের বিবর্ত্তনবা[দ] প্রচারের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র মনু[ষ্য] সৃষ্টি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে God created man after his own image অর্থাৎ ঈশ্বর আপনা[র] অনুরূপ আকারে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। খৃষ্টী[য়] ধর্ম্ম জগতের সিদ্ধান্তের সহিত, সুতরাং, খৃষ্টীয় বৈজ্ঞানি[ক] জগতের গরমিল হইতেছে; ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানে[র] বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। সম্প্রতি মার্কিন রাজ্যে[র] ডেটন নামক প্রদেশে এই উপলক্ষে একটী মাম[লা] উপস্থিত হইয়াছিল। অধ্যাপক জন স্কোপেসের নামে এই মর্ম্মে অভিযোগ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহা[র] ছাত্রদিগকে বিবর্ত্তনবাদ শিক্ষা দিয়াছেন। জজ জুরীদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, আসামী ছাত্রদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতি মনুষ্যেতর জা[তি] হইতে বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। এ[ব]ং এরূপ কথা দেশের আইনের বিরোধী। অতএ[ব] আসামী আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তাঁহার দণ্ড হও[য়া] দরকার। জুরীরা ৯ মিনিট আলোচনার পর সিদ্ধা[ন্ত] করেন যে, আসামী দোষী। তাঁহার ১০০ ডল[ার] জরিমানা হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন। এ[ক্ষণে] ঊর্দ্ধতন আদালত কি সিদ্ধান্ত করেন—ধর্ম্ম বড় কি বিজ্ঞান বড়—তাহাই দেখিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—(১) আগামী আশ্বিন-সংখ্যা ২৮শে ভাদ্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণের ঠিকানায় প্রেরিত হইবে। (২) তমলুকের শ্রীমতী—দত্তের পত্রোত্তর আগামী সংখ্যায় সবিস্তারে প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে।

" [illegible] স্পর্দ্ধা দেখ! গোকুল সিং, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নিকাল্ দেও শূয়ারবাচ্ছাকে"—

(১৯৫ পৃষ্ঠা)

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩২ সাল | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাহুতে তুমি মা শক্তি !

বাঙ্গালী শক্তি-পূজক, শক্তির উপাসক। তাই মা আমার আদ্যাশক্তি—যাবতীয় শক্তির আধার। সেই শক্তির উপাসক বাঙ্গালী আমরা আজ শক্তিহীন কেন? কারণ আমরা মায়ের প্রকৃত পূজা ভুলিয়াছি!

মা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী বর্ষে বর্ষে তাঁহার সন্তানগণকে দেখিতে ও দেখা দিতে আসেন। মায়ের সন্তান আমরা সারা বৎসর মায়ের আগমন-পথ চাহিয়া বসিয়া থাকি। আনন্দময়ীর আগমনে ধনধান্যপুষ্পভরা শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বঙ্গভূমি বর্ষে বর্ষে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু সে আনন্দের মাত্রা দিন দিন কমিতেছে কেন? কারণ আমরা মায়ের প্রকৃত পূজা ভুলিয়াছি।

আমাদের প্রাচীন কালের জীবনধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে সারা বৎসর যেখানে থাকুক না কেন, দুর্গোৎসবের সময় মহানন্দে প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিত। এখন পূজার ছুটীতে প্রায় লোকে গৃহ ছাড়িয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হয়। পূর্ব্বে পূজার সময় সকলে নববস্ত্র পরিধান করিয়া, দরিদ্রদিগকে নববস্ত্র দান করিয়া আনন্দ লাভ করিত; এখন ঠিক তাহার উল্টা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এখন পূজা আসিলেই, পূজার খরচ কেমন করিয়া চলিবে, এই ভাবনায় বাঙ্গালী সাধারণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। মহাপূজা এখন মহানন্দের কারণ না হইয়া মহা নিরানন্দের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন এমনটা হইল? কারণ এখন আমরা মায়ের প্রকৃত পূজা ভুলিয়াছি।

আমরা মায়ের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করি। মা কি আমার শুধু কাঠ, খড়, মাটীর মূর্ত্তি? না, তা নয়। মা আমার চিন্ময়ী—মৃন্ময়ী ন'ন। কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি ভুলিয়া শুধু মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। তাই আজ আমাদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা।

মা মহিষমর্দ্দিনী আমাদের শক্তির প্রতীক। মা'কে যখন আমরা চিনিতাম, জানিতাম, তখন

DOUBLE COLOUR PAGE

আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে মায়ের পূজা করিতাম। সে পূজা কি ?—শক্তি-সাধনা ! নিজে শক্তিমান্ না হইলে কেহ শক্তির সাধনা করিতে পারে না। বাঙ্গালীর তখন বাহুতে শক্তি ছিল, তাই বাঙ্গালী মায়ের প্রকৃত পূজাও করিতে পারিত। বাঙ্গালী তখন দীর্ঘজীবী নীরোগ, সুস্থ, সবল ছিল। বাঙ্গালী তখন লাঠি ধরিত, অশ্বারোহণে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, নৌকারোহণে দেশ বিদেশে বাণিজ্য চালাইত, উপনিবেশ স্থাপন করিত।

আজ বাঙ্গালীর জীবন-ধারা বদলাইয়াছে। বাঙ্গালী শক্তি-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছে ! বাঙ্গালীর বাহুতে আর বল নাই। বাঙ্গালী আজ ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, অনাহারে শীর্ণ। তাই আজ বাঙ্গালী মায়ের পূজা ভুলিয়াছে, মায়ের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়াছে। বাঙ্গালীর মা যে শক্তির প্রতীক, তাহা ভুলিয়া বাঙ্গালী আজ ভাবিতেছে, মা শুধু কাঠ, খড়, মাটীর মূর্ত্তি মাত্র। তাই মায়ের আগমনে বাঙ্গালী আজ আনন্দের আস্বাদ পায় না, মহাপূজায় মহোল্লাসে উন্মত্ত হয় না,—পূজা কেমন করিয়া কাটিবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই আজ বাঙ্গালী পূজার ছুটীতে প্রবাসে গিয়া আত্ম-গোপন করে, না হয় কংগ্রেস কনফারেন্স সাহিত্য-সম্মিলন করে।

বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালী আজ নিজেকে ভুলিয়াছে। বাঙ্গালী যে কি দুর্জ্জয় শক্তির আধার ছিল, তাহা ভুলিয়াছে। বাঙ্গালী যে একদিন শক্তি-চর্চ্চা করিত, তাহা আজ সুদূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন ! বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব যে শক্তির সাধনা, তাহা আজ বাঙ্গালী ভুলিয়াছে। কোন্ যাদুকরের মোহিনী মায়ার রূপার কাঠির স্পর্শে আজ বাঙ্গালী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে !

বাঙ্গালীকে আবার জাগিতে হইবে—বাঙ্গালীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে হইবে। শক্তিরূপিণী মায়ের প্রকৃত পূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আবার বাঙ্গালীকে বাহুবলের চর্চ্চা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর সুপ্ত শক্তিকে আবার জাগাইয়া তুলি হইবে। বাঙ্গালীর অসাড় দেহে আবার প্রা সাড়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আবার দে আনন্দের বান ডাকাইতে হইবে।

মায়ের আগমন আসন্ন। এস বাঙ্গালি, আ হইতে আবার আমরা মহাশক্তির পূজা আ করি। সে পূজা কি ?—শক্তি লাভ !

মা—আমার মা ! আমার শক্তিরূপিণী আমার ভক্তিরূপিণী মা ! আমার জ্ঞানরূপিণী আমার বিদ্যারূপিণী মা ! আমার জগজ্জননী আমার মহিষমর্দ্দিনী মা ! আমার পাষণ্ডদ মা ! আমি সেই মায়ের ছেলে—সেই স্নেহময় আদরের সন্তান—সেই আনন্দরূপিণীর সন্তান ! আমার দুঃখ কিসের ?

আমি সেই মায়ের পূজা করিব—শক্তি করিব। স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, বল লাভ করি বাহুবলের চর্চ্চা করিব। ইহাই আমার দুর্গোৎস ইহাই আমার মাতৃপূজা। ইহাই আমার ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ। ইহাই আমার ইহকাল পরকা ইহাই আমার সাত্ত্বিক মহাপূজা। ইহাই আ সাধনা।

এস মা জননি, পাষাণি, ঈশানি, আমার হৃ আসিয়া অধিষ্ঠান কর। আমি তোমার মৃ মূর্ত্তির প্রতিরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কুলকুণ্ড শক্তিতে জাগ্রত করিয়া তোমার পূজা করি—শ লাভ করি। স্বাস্থ্য-শক্তি আমার সাধনা হ আমার পূজা সার্থক হউক !

পারিবে কি বাঙ্গালি, মায়ের শক্তি রূ উদ্বোধন করিয়া তাঁহার প্রকৃত পূজা করিতে—শ শক্তিলাভ করিতে ? তোমাকে পারিতেই হই শক্তি স্বাস্থ্য লাভ তোমাকে করিতেই হ তোমার বাঙ্গালী নাম সার্থক করিতেই হ তোমাকে শক্তিময়ী মায়ের শক্তিময় সন্তান হই হইবে। তবেই তোমার বার্ষিক মাতৃ-আবাহন তোমার দুর্গোৎসব সার্থক হইবে।

স্বাস্থ্যতথ্য শিখাইবার কথা।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

(১) আমরা "গোঁফ-খেজুরের" জাতি।

ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, সেটা এই :—দুইটি লোক, অতীব অলস, সারাদিন শুইয়া ও ঘুমাইয়া কাঁটাইত। তাহারা এত বড় অলস ছিল যে আহারের চেষ্টাও করিত না; কেহ দয়া করিয়া খাবার মুখের ভিতরে দিয়া দিলে, শুধু গিলিয়া খাইত—চর্ব্বণ করিবার কষ্টও তাহারা স্বীকার করিত না। একদিন কোন লোক একটা খেজুর তাহাদিগের মধ্যে একজনকে খাইতে দেয়; দুঃখের বিষয়, খেজুরটা মুখের ভিতরে না পড়িয়া, উপর ঠোঁটের গোঁফের উপরে পড়ে; সে লোকটা এত কুড়ে যে, গোঁফ হইতে খেজুরটাকে টানিয়া মুখের মধ্যে দিতে পারে নাই ! সেই অবধি, অতি-বড়-কুড়েকে "গোঁফ-খেজুরে" এই আখ্যাটি দেওয়া হয়। একদিন এই দুইটি অলস-প্রধান ব্যক্তি যথাপূর্ব্ব শুইয়া আছে, এমন সময়ে তাহাদের ঘরে আগুণ লাগে। তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। ক্রমশঃ আগুণ যখন একজনের পৃষ্ঠদেশে ঠেকিতেছিল, তখন তাহার সহচরকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল—"পি—পু"। সহচর শুনিয়া উত্তর করিল,—"ফি—শু"। তাহারা অত্যন্ত অলস বিধায়ে, কথাও অতি সংক্ষেপে কহিত। "পি—পু"—মানে "পিঠ পুড়িতেছে;" আর তাহার উত্তর "ফি—শু"—মানে "ফিরিয়া শুইও"। বলা বাহুল্য, এই দুই জনই পুড়িয়া মরিল, তবু ঘরের বাহির হইল না। আলস্যই ছিল তাহাদের স্বধর্ম্ম—এবং সেই ধর্ম্ম বশতঃই তাহারা মরিল।

এতগুলি কথা যাহা বলিলাম, তাহা অলীক রূপক কথা হইলেও, বর্ণে বর্ণে আমাদিগের পক্ষে খাটে—অন্ততঃ স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে বাঙ্গালীর প্রতি প্রযোজ্য। হিন্দু বাঙ্গালী ষোল-আনা মোহগ্রস্ত, ষোল-আনা কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ; অথচ খাটিয়া টাকা রোজগারের কথা উঠিলই, সাংখ্যের পুরুষ সাজিয়া "অর্থমনর্থম ভাবয়নিত্যং" ইত্যাদি বুলি কপ্‌চাইয়া থাকেন; এবং স্বাস্থ্যকথা পাড়িলেই—"নশ্বর দেহ" প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া ঘোর বৈরাগ্যের অবতারণা করেন। ঐ সঙ্গে, ভণ্ডামির মাত্রা বাড়াইবার জন্য, বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর প্রত্যেক নৈষ্ঠিক আচারে, জীবনের প্রত্যেক নৈমিত্তিক কার্য্যে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত আছে !!! আছে ত মানি—কাযে কবে তোমরা কতটা কর ?

কাযে যাহা হয়—তাহা তো কাহারো অবিদিত নাই। এক্ষণে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এখন হইতে যাহাতে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা, বাঙ্গালীরা, আমরা না সংসারকে পুরা মাত্রায় ভোগ করি—না স্বর্গে স্থান পাই। আমাদের জীবন-যাত্রাটা অতি-মাত্রায় তিক্ত-রসাত্মক। পরাধীনতার জন্য যাহা ভোগ করিতে হয় তাহাতো আমাদিগের আছেই; তাহার উপরে, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বেশী-মাত্রায় কষ্ট পাই। এখন হইতে, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা হওয়া উচিত—কিসে আমরা ও আমাদের বংশধরেরা সুস্থ থাকে। সেই চেষ্টার কতকটা সাহায্য করিবার জন্যই, এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(২) ঘাত-প্রতিঘাত, বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

ছেলেরা স্বভাবতঃই মারামারি, যুদ্ধ, শিকার প্রভৃতির গল্প কথা পড়িতে ও শুনিতে ভালবাসে। চিত্ত-চমকপ্রদ, ঘটনার পর ঘটনা, লোমহর্ষণ কার্য্যাবলী, আকস্মিক বিপৎপাত ও তাহা হইতে উদ্ধার, ইত্যাকার জাতীয় বর্ণনাই ছেলেদের মন সহজে আকৃষ্ট করে। এই জন্যই বাঘ, ভাল্লুকের কথা, শিকার শিকারীর

কথা, যুদ্ধের কথা, বীরত্বের কাহিনী সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বেশী বেশী থাকে। যে অসহায়-অবস্থায় জন্মাইয়া, প্রতিদিনই প্রতিকূল-অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, দেহকে রক্ষা করিয়া, শিশুকে বড় হইতে হয়, সে কথা তো শিশুকে কেহই শুনায় না—অথচ, এই নিঃশব্দ, দৈনিক প্রতিকূল ঘটনার প্রতিঘাত সৃষ্টি করা, শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কতকটা এই আভ্যন্তরিক সংগ্রামের প্রতিচ্ছায়া হিসাবে, কতকটা সংস্কার বশতঃই, শিশুরা এই জাতীয় গল্পে আকৃষ্ট হয়। এ কথাটা সকল শিক্ষক ও অভিভাবক ভাবেন না। তাই আজ এইদিক দিয়া, শিশু ও বালক-পাঠ্য শিক্ষা-পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা আমার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দেশ কি জাগিবে? আমাদের দেশের নন্দগোপালদের জন্য আমরা অবহিত হইব কি?

(১) রোগ ও রোগ-জয়ের ইতিহাস।

আমরা উপযুক্তভাবে বই লিখিলে, একাধারে গল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ভূগোল শিখাইতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে করুন যে, সহজ কথায়, বর্ত্তমান সময়ে, মধ্যে-মধ্যে এসিয়া-খণ্ডে যে ভীষণ ভাবে ওলাউঠার আবির্ভাব হয়, ঐতিহাসিক কোনও পূর্ব্বযুগে কোন্ কোন্ দেশে তাহা হইয়াছিল, সেই দেশগুলির নাম ও অবস্থা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের সেই সেই ভূখণ্ডের বিবরণ বেশ সরস করিয়া লিখিলে, গল্পচ্ছলে কত কথাই শিখান যায়। সম্প্রতি ভারতবর্ষে কোন্ সালে প্রথম প্লেগের আবির্ভাব হয় এবং অতীত কোন যুগে ইংলণ্ডে ব্ল্যাক ডেথ্ নামক মহামারি হইয়াছিল—এতদুভয়ের তুলনা মূলক সমালোচনার মুখে একসঙ্গে চিকিৎসাতত্ত্ব, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তত্ত্বকথার আলোচনা করা সম্ভবপর হয়।

কি ভাবে, কোন্ কোন্ জনপদ, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইচ্ছাবসন্ত, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; গৌড়, ভুবনেশ্বর, উজ্জয়িনী, হালিসহর, বর্দ্ধমান, বারাসাত প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগরগুলি কি করিয়া শ্মশানে পরিণত হইল—এসকল কথার রসরচনার মুখে, রোগ রোগের কি অসীম ক্ষমতা বেশ করিয়া বুঝান যায়। একদিকে রোগের এই জনপদ-বিধ্বংসী ক্ষমতা; অন্য দিকে, পাস্তুর, কক্, লিষ্টার প্রভৃতি মনীষিগণের রোগ জয়ের গৌরবেতিহাস যেমন চিত্তকর্ষক হইবে তেমনি শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিবে। রোগ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মশা, মাছি, উকুন প্রভৃতির রোগ বিস্তারে কত হাত, তাহার বর্ণনাও কম মুখরোচক নহে।

একদিকে এই সকল বৈজ্ঞানিক-তথ্যের আলোচনা এবং তৎসঙ্গে অন্যপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কার্য্যকারিতার বিবরণ দেওয়া, নিতান্তই সমীচীন। আজ সমগ্র জগতে লর্ড লিষ্টারের আবিষ্কৃত পচন নিবারক ঔষধের প্রয়োগের ফলে, অস্ত্র চিকিৎসা কতটা উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছে শুধু এই একটা বিষয়েরই বর্ণনা কি লোমাঞ্চকর! তাহার উপরে, বর্ত্তমান কালে, আঁতুড় ঘরের উন্নতি সাধন করিয়া শিশুমৃত্যুর হার কত কমিয়াছে; "শিশু-মঙ্গল" প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণে কত শিশু পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছে; মজুরদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলির ফলে তাহাদের জীবন কত সুখের হইয়াছে; জল-পুলিশের সাহায্যে ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত জাহাজকে আটকান ফলে, কত দেশের লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়া যাইতেছে—এ সকল কথাও বেশ্ করিয়া বুঝাইয়া দিলে—বালকে ইহার মধ্যে অদৃশ্য যুদ্ধের কথা ভাবিয়া, মোহিত হইয়া পড়িবে। মানুষকে সুস্থ রাখিবার জন্য বস্ত্রবয়নের প্রয়োজন; পাদুকারও প্রয়োজন; সুপেয় জলেরও প্রয়োজন; উপযুক্ত খাদ্যেরও প্রয়োজন—এতদ্ভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য নিত্য কতই লোক অন্ন পাইতেছে, সে কথাও ভাবিবার কথা। ফল কথা ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে, স্বাস্থ্যতত্ত্বের সঙ্গে সমাজ তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি—সকল কথারই আভাষ দেওয়া যাইতে পারে। চুলচেরা তাগকরা ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্যকথা নিতান্ত নীরস;—কিন্তু তাহা না করিয়া সকল বিষয়গুলিকে একত্রে জড়াইয়া উপরি উক্ত

ভাবে স্বাস্থ্য কথার আলোচনার ফলে, অতি সরস ভাষায়, সরস উপাদানের সমষ্টি সংযোগে যে উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তাহা যেমন শিক্ষাপ্রদ হইবে, তেমনি মনোহারীও হইবে।

(৪) পুরাকালের স্বাস্থ্যকথা।

পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের স্বাস্থ্যকথার আলোচনা করা, অতীব শিক্ষাপ্রদ। এদেশের ঐ বিষয়ের ইতিহাস পাইবার উপায় নাই বিধায়ে, তৎকালে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কথা আলোচনা করা সমীচীন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে "ব্ল্যাক্‌ডেথ্" নামক একটি ভীষণ মড়ক হয়। সেই মড়কে ইয়োরোপ প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থায়, আত্মরক্ষার্থ ভিনিস্ সহর চিকিৎসকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া, রোগ-নিবারণের চেষ্টায় চেষ্টিত হয়। ইয়োরোপে রোগ প্রতিকারের বোধ হয় এই প্রথম চেষ্টা। তাহার পরে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ডে ভীষণ মড়ক হয়; এবং সেই মড়ক বন্ধ হয় পর বৎসরে ভীষণ অগ্ন্যুপাতের ফলে। ঐ আগুণে ৪০০টি রাস্তায় ১৩০০০ বাড়ী পুড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মড়কের বীজও পুড়িয়া যায়। কিন্তু, ইংলণ্ডে তখনো রোগ প্রতিকারের (অর্থাৎ স্বাস্থ্য চেষ্টার) ব্যবস্থা হয় নাই। তৎকালে জাহাজে যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের মধ্যে "স্কার্ভি" নামক একটি মারাত্মক রোগ ছিল। মাত্র ১৫০।২০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রোগের প্রতিকার করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক কথায় বলিতে গেলে, তখন রোগ হইলে, তৎকালোচিত বিধিমত সেই রোগ সারাইবারই ব্যবস্থা হইত—কিসে সে রোগ আর না হয়—অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—কথা কেহই কল্পনাতেও আনিতেন না। তবে পুরাকালে কাপ্তেন কুক্ নামক জনৈক নাবিক ১১৮ জন লোকসহ তিন বৎসর জলে জলে প্রায় সমস্ত পৃথিবীই পরিক্রমা করিয়াছিলেন; এমত স্থলে, তাঁহার যে মাত্র একটি লোক ব্যারামে মারা পড়ে—তখনকার কালের পক্ষে এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা বটে। তিনি তাঁহার জাহাজের লোকজনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য এবং তাঁহার পক্ষে অতি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার মত স্বাস্থ্যান্বেষী তৎকালে বিরল ছিল। তদীয় নিয়মাবলী সকলের পাঠ্য।

(৫) মহারথীদিগের কথা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বেশী দিনের পুরাতন নহে। পাশ্চাত্য মতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তাহা হইতেও অধুনাতন। জগতের নিয়মই এই যে, মানুষ ক্রমাগতই সুখস্বাচ্ছন্দ্য চায়; এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সঙ্গে বংশ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বংশবৃদ্ধি অতি মাত্রায় হইলে, ব্যারামের প্রকোপ বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মড়কের প্রাদুর্ভাব হয়। বর্ত্তমানে এই কার্য্যধারা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিপদে পড়িলেই বুদ্ধি বাড়ে; আজ তাই মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য, রোগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য আয়ুষ্কালকে বাড়াইবার জন্য দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ করিবার জন্য পাশ্চাত্য মনীষীরা কিরূপ উদ্যমের সঙ্গে কার্য্যে লাগিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। সেই সকল রণজয়ের ও রণবীরদিগের বার্ত্তা উচ্চকণ্ঠে ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় জগতের সকলকেই শুনান উচিত—শিশুদিগকে ত বটেই।

প্রথমেই ইচ্ছা-বসন্তের কথা ধরা যাইতে পারে। ডাঃ জেনার কি করিয়া, গোয়ালাদের নিকট হইতে গো-বসন্ত ও ইচ্ছা বসন্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা অবগত হইলেন; কি করিয়া টীকার যুক্তি দিলেন; কেমন করিয়া আপন সন্তানকে টীকা দিলেন, এবং সেই টীকা লওয়ার ফলে আজ ইচ্ছা-বসন্ত কত কমিয়া গিয়াছে, এগুলি অতীব বিস্ময়কর কাহিনী—ইহাদিগের বিবরণ সকলেরই পক্ষে শিক্ষাপ্রদ।

তাহার পর লুই পাস্তরের কথা। ইনি একজন সামান্য রাসায়নিক ছিলেন; ফ্রান্স ইহাঁকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। কি সামান্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া, ইনি জগতের কত বড় হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা

অবর্ণনীয়। অনেকেই জানেন যে দ্রাক্ষার রস হইতে সুরা হয়। দ্রাক্ষার রসকে "পচাইয়া" (উৎসেচন করাইয়া বা গাঁজাইয়া) তবে মদ হয়। এই উৎসেচন ধর্ম্ম বুঝিতে যাইয়া, ইনি আজ ফ্রান্সকে মদ্য ব্যবসায়ে জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় করিয়াছেন। তাহার পরে, রেসমের গুটি একজাতীয় কীটাণু কর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ায়, ফ্রান্সের রেসমের কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল; ইনি সেই কীটাণু ধ্বংসের উপায় বাহির করেন। মেষের গায়ে এক রকম কীটাণু জন্মানর ফলে, মেষের মধ্যে মারাত্মক ক্ষত রোগ ও মড়ক হইতে আরম্ভ হইল। এই ব্যারামকে অ্যান্থ্র্যাক্স্ কহে। ইহা মানুষের পক্ষেও মারাত্মক। কাযেই, মেষকুল ও মেষপালক একত্রে ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়ায়, ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। এখানেও পাস্তর দেশ ত রক্ষা করিলেনই —পরন্তু জীবাণুরা যে অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কারণ, এবং মৃতজীবাণুদের শরীর-রস হইতে "টীকা" লইলে সেই ব্যারাম হয় না, হইলেও সারিয়া যায়, এই মহাসত্য দুইটি আবিষ্কার করিয়া, জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের জীবাণুতত্ত্ব ও টীকা-চিকিৎসা (ভ্যাক্সীন ও সীরাম) তাঁহারই আজীবন সাধনার ফল। পাস্তর জীবাণুতত্ত্ব বাহির করিলেই, লর্ড লিষ্টার জীবাণুধ্বংসের পথ আবিষ্কার করিলেন। মুখ্যতঃ পাস্তর, ও গৌণতঃ লিষ্টারের কৃপায় আজ অস্ত্র চিকিৎসার এত শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্নে যাইতেছিল—কেমন করিয়া ল্যাভেরান, ম্যান্‌সন, রস, গর্গাস, রজার্স প্রভৃতি তাহার ধ্বংসের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করিবার অতি মনোরম বিষয়। এই ইতিহাস যেমন চমৎকার তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষার কর্ত্তাদিগের কথা।

গ্রামে গ্রামে "মিউনিসিপ্যালিটি" না থাকিলেও আজকাল অনেক গ্রামেই মিউনিসিপ্যালিটি নামক একটা কর্ত্তৃত্ব করিবার দল দেখা যায়। ইহারা তিন বৎসর অন্তর কতকটা দেশীয় লোকের দ্বারা ও কতকটা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যে যে লোকেরা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য (ইংরাজীতে তাঁহাদিগকে কমিসনার বা কাউন্সিলার বলে) মনোনীত হন, তাঁহারা বেতন পান না—তাঁহারা সপ্তাহে, পক্ষান্তরে, বা মাসে সকলে একত্রিত হইয়া, একমত হইয়া, যে যে কায তালিকা প্রস্তুত করেন, সেই সেই কার্য্যগুলিই করা হয়। কাযেই, কায করিবার জন্য মাহিনা করা লোক রাখিতে হয়। এই মাহিনা-করা লোকদিগের প্রধানকে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এই বেতনভুক লোকেরা, জমিদার সাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত অবৈতনিক কমিসনারদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। অন্যত্র চাকুরিয়াদের ন্যায়, ইঁহারা বরাবরকালের জন্য নিযুক্ত হন—অর্থাৎ তিন বৎসর অন্তর কমিসনারগণ বদল হইলেও, কর্ম্মচারী চেয়ারম্যান প্রভৃতি বদল হন না। আবার, এই চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকে কোন কোন স্থলে কমিসনারদিগের মধ্যে হইতেও বাছিয়া লওয়া হয়—কাযেই তাঁহারা তিন বৎসর অন্তর বদলী হন এবং তাঁহারা বেতন পান না। যাহা হউক, এই অবৈতনিক তিন বৎসর কালের জন্য নিযুক্ত কমিসনারগণ একত্র সভাস্থ হইলেই মিউনিসিপ্যালিটি নামে আখ্যাত হন। রাস্তাঘাট দেখিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার; স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কায করিবার জন্য হেল্‌থ্ অফিসার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টার, কুড ইন্‌স্পেক্টর, টীকাদার, শ্মশান ঘাটে "চিত্রগুপ্ত" প্রভৃতি ছোটখাট কর্ম্মচারীগণ উক্ত চেয়ারম্যানের অধীনে থাকিয়া কায করেন। এই গেল গ্রামে গ্রামে ব্যবস্থা।

কোথাও জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড নামক একটা সংঘ দেখা যায়। তাঁহারা রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য নিযুক্ত। তাঁহারাও অবৈতনিক কর্ত্তা; এবং তাঁহাদিগেরও অধীনে চেয়ারম্যান প্রভৃতি বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তফাৎ এই যে মিউনিসিপ্যালিটি শুধু সেই গ্রামের কায করেন, জেলাবোর্ড সমগ্র জেলা ধরিয়া কায করেন।

এই জেলাবোর্ডসমূহ ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপরে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গবর্ণমেণ্টের মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী ও ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক হেলথ এই তিনজন কর্ত্তৃত্ব করেন।

(ক্রমশঃ)

খাদ্য নির্ব্বাচন ও দন্ত রক্ষা।

মানুষের জীবন ধারণ ও শরীর পোষণের উপযোগী খাদ্য কি কি হইতে পারে এবং সাধারণ নিত্য নিয়মিত খাদ্য-তালিকা হইতে কোন্ কোন্ পদার্থ বর্জ্জন করা উচিত, এবং কোন্ কোন্ নূতন খাদ্য সেই তালিকায় যোগ করা উচিত, ইহা লইয়া বহু পরীক্ষা হইয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফল অতি চমৎকার। পরীক্ষার ফলে অনেক নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে এত নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভবিষ্যৎ খাদ্য-ভাণ্ডারে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। খাদ্য নির্ব্বাচন ও খাদ্যের পরিবর্ত্তন দ্বারা কত যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারা যাইতেছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারে জীবজন্তুকে বিভিন্ন রকম খাদ্য খাইতে দিয়া তাহাদের কত রকম যে রূপান্তর সাধন করিতেছেন, তাহা এই সকল পরীক্ষাগারে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কাহাকেও বর্ণনা করিয়া বুঝানো সম্ভব বা সহজ নহে। কোন পশুকে এমন খাদ্য দেওয়া হইতেছে, যাহা খাইয়া সে তাহার জাতির স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আবার কাহারও জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, তাহারা স্বাভাবিক আকারের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হইয়া উঠিতেছে। খাদ্য-নির্ব্বাচনের কৌশলে কাহারও অস্থি-কঙ্কালের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করা হইতেছে। আবার কাহারও বা শিরা, তন্তু প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে। কাহারও চক্ষু, কাহারও দন্তের এই ভাবে বিকৃতি ঘটানো হইতেছে। বস্তুতঃ পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকেরা যাদুকর সাজিয়া অসাধ্য সাধন করিতেছেন, খোদার উপর খোদকারী করিতেছেন, ভগবানের সৃষ্টির বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন, জীবজন্তুদের দেহ লইয়া ভেল্‌কী-বাজী খেলিতেছেন।

উদ্ভিদ-রাজ্যেও এক শ্রেণীর উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন, নূতন নূতন ধরণের অদ্ভুতদর্শন ও অভিনব গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতেছেন। এক জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প-কেশরে অপর জাতীয় পুষ্পের পরাগ নিক্ষেপ করিয়া যৌন সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া অশ্বতরের ন্যায় নূতন জাতীয় বর্ণ-সঙ্কর উদ্ভিদের সৃষ্টি হইতেছে। কোন জাতীয় উদ্ভিদ কণ্টকবহুল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নূতন সার প্রস্তুত করিয়া সেই সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া সেই জমিতে ঐ কণ্টকবহুল বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া নিষ্কণ্টক ঐজাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। কাঁটার জন্য ফেনী মনসার গাছ পশুর খাদ্য হইবার অযোগ্য ছিল, এখন তাহাকে কণ্টকশূন্য করিয়া উৎকৃষ্ট পশু খাদ্যে পরিণত করা হইতেছে। কোন গাছের ফল বীজবহুল বলিয়া মনুষ্যের খাদ্যের অযোগ্য ছিল। সার প্রয়োগ কৌশলে ঐ বৃক্ষের ফল বীজশূন্য করা হইতেছে, এবং তাহা মনুষ্যের উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইতেছে। কোন ফল অম্লরসাধিক্যবশতঃ অভক্ষ্য ছিল, তাহার অম্লরস দূরীভূত করিয়া তাহাকে মিষ্টত্ব প্রদান করা হইতেছে। আবার যাহারা বিক্রয়ার্থ বৃক্ষের বীজ বা কলম প্রস্তুত করে, তাহারা সবল সুপুষ্ট বৃক্ষ উৎপাদনের জন্য তাহার বীজের পুষ্টি সাধনে মনোনিবেশ করে। কোন কোন গাছ বা ফল বিষগুণযুক্ত ছিল। কিন্তু কৃষি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা-ক্ষেত্রের পাল্লায় পড়িয়া তাহা নির্ব্বিষ সুখাদ্যে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা ফলের সাধারণ আকার অনেক বাড়িয়াছে। কোথাও বৃহদায়তনের মূল (আলু প্রভৃতি) উৎপন্ন হইতেছে। বলিতে কি, বৈজ্ঞানিকের কার্য্য তৎপরতায় সৃষ্টি-রাজ্যে যুগান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

খাদ্যের ত্রুটিতে অনেক সময়ে নানা প্রকার রোগ

জন্মে। এই সকল স্থলে ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্য-চিকিৎসাই সমধিক প্রশস্ত। খাদ্য-নির্ব্বাচনের ত্রুটির সংশোধন করিয়া অনেক সময়ে এই শ্রেণীর রোগ আরাম করা যায়। পীড়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যে বস্তুর প্রয়োগে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে, সেই বস্তু যাহাতে আছে, এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাইটামাইন এইরূপ একটী উপাদান। এই জিনিসটির প্রকৃত স্বরূপ এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। গুণের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা, এ, বি, সি। প্রথমটি স্নেহ-জাতীয় পদার্থে এবং অপর দুইটী জলে দ্রবনীয়।

শরীরের পুষ্টি সাধনে কেবল খাদ্যই একমাত্র উপাদান নহে। খাদ্য ব্যতীত অপর জিনিসের উপরও পুষ্টি-কারিতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যেখানে দেখা যায়, রীতিমত খাদ্য গ্রহণেও শরীরের প্রয়োজনানুরূপ পুষ্টিসাধন হইতেছে না, এরূপ অনেক স্থলে সূর্য্যালোকের প্রভাবে এই দোষ কাটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। রিকেট্স এক প্রকার রোগ। গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে এঁড়ে লাগা বলে। ছেলেদেরই প্রায় এই রোগ হয়। ছেলে খায় দায় অথচ শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। এই রোগ স্বভাবতঃও হইতে পারে, আবার কৃত্রিম উপায়েও ইহা উৎপাদন করা যাইতে পারে। যে উপায়েই হউক, এই রোগ হইলে, সূর্য্য কিরণ ইহার অব্যর্থ মহৌষধ বলিলেও চলে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে এই তত্ত্বটির চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কতকগুলি ইন্দুর পালন করিয়া তিনি তাহাদের খাদ্যের ইতরবিশেষ করিয়া দিলেন। কতক-গুলিকে যথোচিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে লাগিলেন; এবং কতকগুলিকে পুষ্টিকারিতাশূন্য খাদ্য খাওয়াইতে লাগিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্দুরেরা কয়েক দিনের মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে রিকেট্স রোগে আক্রান্ত হইল। তার পর তাহাদের খাদ্যের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, অর্থাৎ অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়াই তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে সূর্য্য-কিরণে রাখা হইতে লাগিল। রৌ[দ্র] সেবনের ফলে তাহারা কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথ[ম] শ্রেণীর পুষ্টিকর-খাদ্য-পুষ্ট ইন্দুরগুলির ন্যায় পুষ্টি লা[ভ] করিতে লাগিল। সূর্য্য-কিরণ যে কেবল রিকেট্স রো[গ] আরাম করিতে পারে তাহা নয়, তাহা এই রোগ নিবা[রণ] করিয়াও থাকে। যে সকল লোক নিয়মিত ভা[বে] রৌদ্র সেবন করে, তাহাদের রিকেট্স রোগ হয় না। এই কারণে আমাদের নব-প্রসূতিরা শিশুদিগকে তৈ[ল] মাখাইয়া কিছুক্ষণ করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া থাকেন। নব্য-বঙ্গ ও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে এই প্রথা অসভ্যতা পরিচায়ক বলিয়া ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হওয়ায়, সচরাচর শিশুরা রিকেট্স রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

কেবল আসল সূর্য্যালোক নয়, কৃত্রিম উজ্জ্বল আলো[কে]রও এই গুণ আছে। পারদবাষ্প হইতে উদ্ভূত আলো[ক] বা 'আর্ক-লাইট' প্রয়োগ করিয়াও রিকেট্স রোগে সুফ[ল] পাওয়া যায়। সূর্য্য-কিরণ প্রত্যক্ষ ভাবেই সমধি[ক] উপকারী। পাতলা কাচাবরণের মধ্য দিয়াও সূর্য্য-কিরণে[র] উপকারিতা কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু মিলিমিটার পুরু কাচের ভিতর দিয়া যে সূর্য্য-কির[ণ] আসিতে পারে, তাহার রিকেট্স রোগ আরাম করিবা[র] ক্ষমতা নাই। আর পারদবাষ্প দীপ লোক সাধা[রণ] পাতলা কাচের ভিতর দিয়া আসিলেই তাহার গুণ ন[ষ্ট] হইয়া যায়। বস্ত্রও সূর্য্য-কিরণের উপকারিতার ইত[র] বিশেষ করিয়া থাকে। কালো পোষাক অপেক্ষা সা[দা] পোষাকের ভিতর দিয়া যে সূর্য্য-কিরণ গায়ে লাগে তাহা বেশী উপকারী।

সূর্য্য কিরণের রোগারোগ্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সূর্য্য কিরণের অন্তর্গত বেগুনী বর্ণ (ultra-violet radiations) এই অপূর্ব্ব গুণ সম্পন্ন। সূর্য[্য] কিরণ হইতে কোন ক্রমে এই বর্ণ পৃথক হইয়া পড়িলে কিম্বা বাধা পাইলে সূর্য্য কিরণের আর কোন গু[ণ] থাকে না। শিশু দেহে সূর্য্য কিরণের আশ্চর্য্য ফ[ল] প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। শিশুদিগকে ঘন ঘন রৌ[দ্র] সেবন করাইলে তাহাদের রক্তে অজৈব ফসফেটসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সূর্য্যকিরণের গঠনোপাদান সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না। ঋতু-ভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বসন্ত গ্রীষ্মকালে সূর্য্য কিরণে বেগুনী রশ্মির পরিমাণ অধিক। আর শীতকালে তাহার পরিমাণ কম। ঋতু-ভেদে রৌদ্রসেবী শিশুর রক্তেও তদনুপাতে ফসফেটের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পশু-দেহেও রৌদ্রের ফল খুব স্পষ্ট। জুন হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত কয় মাসে মেষ, গরু, শূকর প্রভৃতি পশুর thyroid এ আইয়োডিন ধাতুর পরিমাণ ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত কয় মাসের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বেশী। ঋতুভেদে রক্তের উপাদানের এই পরিবর্ত্তন হইতে বুঝা যায় যে, বৎসরের সকল সময়েই রক্তের গঠন একই প্রকার নহে। সুতরাং ইহাও খুবই সম্ভব যে, আবহাওয়ার অবস্থা, ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার সাধারণতঃ মানবদেহের পুষ্টি সাধনের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্থির হইতেছে যে, মানুষের দেহের পুষ্টি সাধনের খাদ্য ছাড়া অন্য কারণও আছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে এইখানে আর একটী কথার অবতারণা করা যাইতেছে। সম্প্রতি একটী নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন খাদ্যে রৌদ্র লাগাইলে কিম্বা আলো লাগাইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইন্দুরের যকৃৎ বাহির করিয়া তাহাতে আলোক প্রতিফলিত করিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাংসপেশীগুলিও এই ভাবে এইরূপ গুণযুক্ত হইতে পারে। যে চর্ব্বি সাধারণ ভাবে রিকেটস রোগ নিবারণ করিতে পারে না, তাহাতে আলোক লাগাইলে তাহা এমন গুণ সম্পন্ন হয় যে, তদ্দারা উক্ত রোগ দ্রুত ও সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হয়।

বংশানুক্রম

আরও কথা আছে। ইন্দুর লইয়া পরীক্ষার সময় দেখা গিয়াছে, অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়াও কোন ইন্দুরের দেহে কৃত্রিম উপায়ে রিকেট্স রোগ উৎপাদন করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এক শ্রেণীর ইন্দুরগণকে এইরূপ খাদ্য দিয়া পালন করিতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণকেও সেইরূপ খাদ্য দিতে থাকায়, এই সন্তানগুলির রিকেট্স রোগ হয়। পিতৃমাতৃগণ রোগাক্রান্ত না হইলেও উক্ত খাদ্য তাহাদের দেহে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—তাহাদের সন্তানেরা পিতৃমাতৃ দেহ হইতে রোগপ্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাই তাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হইল। ইহাতে এই নূতন তথ্যটি জানা গেল যে, রিকেট্স রোগ উৎপাদনে বংশানুক্রমের প্রভাবও কম নয়।

ভাইটামাইনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুষ্টিকারিতার বিষয় অন্য ভাবে আলোচিত হইত। তৎকালে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণ বিবেচনা করিয়া একটা আদর্শ খাদ্য নির্ব্বাচনের চেষ্টা করা হইত। জড়বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, একটা কল চালাইবার সময় তাহার কর্ম্মশক্তির সহিত তাপ-বিকীরণের খুব নিগূঢ় একটা সম্বন্ধ আছে। Joule পরীক্ষা ও হিসাব করিয়া দেখেন যে, আধসের ভারী কোন জিনিস ৭৭২ ফিট উঁচু হইতে জলের উপর নিক্ষেপ করিলে এক পৌণ্ড ওজনের জলের তাপ ১ ডিগ্রি ফারেনহীট অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম জলের তাপ ১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়। কলকারখানায় ইহাই তাপের মানদণ্ড। জীবদেহের তাপমানও প্রকারান্তরে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভুক্ত খাদ্যের কি পরিমাণ হজম হইয়া বা অম্লজানসহযোগে দগ্ধ হইয়া কতখানি তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাও হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাকে ক্যালোরি (calorie) নাম দেওয়া হইয়াছে। এতকাল পর্য্যন্ত খাদ্যের গুণ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণে এই ক্যালোরিরই অবাধ প্রভুত্ব ছিল। পুষ্টিকর খাদ্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় কেবল এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট হইত যে, সেই খাদ্যে যথোচিত পরিমাণে ক্যালোরি বা তাপোৎপাদক উপাদান আছে কি না। অবশ্য সকলের পক্ষেই একই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি উপযোগী না-ও হইতে পারে—বিভিন্ন ব্যক্তির

জন্মে। এই সকল স্থলে ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্য-চিকিৎসাই সমধিক প্রশস্ত। খাদ্য-নির্ব্বাচনের ত্রুটির সংশোধন করিয়া অনেক সময়ে এই শ্রেণীর রোগ আরাম করা যায়। পীড়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যে বস্তুর প্রয়োগে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে, সেই বস্তু যাহাতে আছে, এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাইটামাইন এইরূপ একটী উপাদান। এই জিনিসটির প্রকৃত স্বরূপ এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। গুণের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা, এ, বি, সি। প্রথমটি স্নেহ-জাতীয় পদার্থে এবং অপর দুইটী জলে দ্রবনীয়।

শরীরের পুষ্টি সাধনে কেবল খাদ্যই একমাত্র উপাদান নহে। খাদ্য ব্যতীত অপর জিনিসের উপরও পুষ্টি-কারিতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যেখানে দেখা যায়, রীতিমত খাদ্য গ্রহণেও শরীরের প্রয়োজনানুরূপ পুষ্টিসাধন হইতেছে না, এরূপ অনেক স্থলে সূর্য্যালোকের প্রভাবে এই দোষ কাটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। রিকেট্‌স এক প্রকার রোগ। গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে এঁড়ে লাগা বলে। ছেলেদেরই প্রায় এই রোগ হয়। ছেলে খায় দায় অথচ শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। এই রোগ স্বভাবতঃও হইতে পারে, আবার কৃত্রিম উপায়েও ইহা উৎপাদন করা যাইতে পারে। যে উপায়েই হউক, এই রোগ হইলে, সূর্য্য কিরণ ইহার অব্যর্থ মহৌষধ বলিলেও চলে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে এই তত্ত্বটির চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কতকগুলি ইন্দুর পালন করিয়া তিনি তাহাদের খাদ্যের ইতরবিশেষ করিয়া দিলেন। কতক-গুলিকে যথোচিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে লাগিলেন; এবং কতকগুলিকে পুষ্টিকারিতাশূন্য খাদ্য খাওয়াইতে লাগিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্দুরেরা কয়েক দিনের মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে রিকেট্‌স রোগে আক্রান্ত হইল। তার পর তাহাদের খাদ্যের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, অর্থাৎ অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়াই তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে সূর্য্য-কিরণে রাখা হইতে লাগিল। সেবনের ফলে তাহারা কয়েক দিনের মধ্যেই এ শ্রেণীর পুষ্টিকর-খাদ্য-পুষ্ট ইন্দুরগুলির ন্যায় পুষ্টি করিতে লাগিল। সূর্য্য-কিরণ যে কেবল রিকেট্‌স আরাম করিতে পারে তাহা নয়, তাহা এই রোগ নিবা করিয়াও থাকে। যে সকল লোক নিয়মিত রৌদ্র সেবন করে, তাহাদের রিকেট্‌স রোগ হয় এই কারণে আমাদের নব-প্রসূতিরা শিশুদিগকে মাথাইয়া কিছুক্ষণ করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া থাকে। নব্য-বঙ্গ ও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে এই প্রথা অসভ্যতা পরিচায়ক বলিয়া ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হওয়ায়, সচরাচ শিশুরা রিকেট্‌স রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

কেবল আসল সূর্য্যালোক নয়, কৃত্রিম উজ্জ্বল আলো কেরও এই গুণ আছে। পারদবাষ্প হইতে উদ্ভূত আলো বা 'আর্ক-লাইট' প্রয়োগ করিয়াও রিকেট্‌স রোগে ফল পাওয়া যায়। সূর্য্য-কিরণ প্রত্যক্ষ ভাবেই সমধি উপকারী। পাতলা কাচাবরণের মধ্য দিয়াও সূর্য্য-কিরণে উপকারিতা কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্ত মিলিমিটার পুরু কাচের ভিতর দিয়া যে সূর্য্য-কি আসিতে পারে, তাহার রিকেট্‌স রোগ আরাম করি ক্ষমতা নাই। আর পারদবাষ্প দীপ লোক সাধা পাতলা কাচের ভিতর দিয়া আসিলেই তাহার গুণ হইয়া যায়। বস্ত্রও সূর্য্য-কিরণের উপকারিতার হ্র বিশেষ করিয়া থাকে। কালো পোষাক অপেক্ষা সা পোষাকের ভিতর দিয়া যে সূর্য্য-কিরণ গায়ে লাগে তা বেশী উপকারী।

সূর্য্য কিরণের রোগারোগ্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্প্র যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফলে জানিতে পা গিয়াছে যে, সূর্য্য কিরণের অন্তর্গত বেগুনী বর্ণ (ultra violet radiations) এই অপূর্ব্ব গুণ সম্পন্ন। কিরণ হইতে কোন ক্রমে এই বর্ণ পৃথক হইয়া প কিম্বা বাধা পাইলে সূর্য্য কিরণের আর কোন থাকে না। শিশু দেহে সূর্য্য কিরণের আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। শিশুদিগকে ঘন ঘন

সেবন করাইলে তাহাদের রক্তে অজৈব ফসফেটসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সূর্য্যকিরণের গঠনোপাদান সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না। ঋতু-ভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বসন্ত গ্রীষ্মকালে সূর্য্য কিরণে বেগুনী রশ্মির পরিমাণ অধিক। আর শীতকালে তাহার পরিমাণ কম। ঋতু-ভেদে রৌদ্রসেবী শিশুর রক্তেও তদনুপাতে ফসফেটের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পশু-দেহেও রৌদ্রের ফল খুব স্পষ্ট। জুন হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত কয় মাসে মেষ, গরু, শূকর প্রভৃতি পশুর thyroid এ আইয়োডিন ধাতুর পরিমাণ ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত কয় মাসের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বেশী। ঋতুভেদে রক্তের উপাদানের এই পরিবর্ত্তন হইতে বুঝা যায় যে, বৎসরের সকল সময়েই রক্তের গঠন একই প্রকার নহে। সুতরাং ইহাও খুবই সম্ভব যে, আবহাওয়ার অবস্থা, ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার সাধারণতঃ মানবদেহের পুষ্টি সাধনের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্থির হইতেছে যে, মানুষের দেহের পুষ্টি সাধনের খাদ্য ছাড়া অন্য কারণও আছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে এইখানে আর একটী কথার অবতারণা করা যাইতেছে। সম্প্রতি একটী নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন খাদ্যে রৌদ্র লাগাইলে কিম্বা আলো লাগাইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইন্দুরের যকৃৎ বাহির করিয়া তাহাতে আলোক প্রতিফলিত করিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাংসপেশীগুলিও এই ভাবে এইরূপ গুণযুক্ত হইতে পারে। যে চর্ব্বি সাধারণ ভাবে রিকেটস রোগ নিবারণ করিতে পারে না, তাহাতে আলোক লাগাইলে তাহা এমন গুণ সম্পন্ন হয় যে, তদ্দ্বারা উক্ত রোগ দ্রুত ও সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হয়।

বংশানুক্রম

আরও কথা আছে। ইন্দুর লইয়া পরীক্ষার সময় দেখা গিয়াছে, অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়াও কোন কোন ইন্দুরের দেহে কৃত্রিম উপায়ে রিকেট্‌স রোগ উৎপাদন করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এক শ্রেণীর ইন্দুরগণকে এইরূপ খাদ্য দিয়া পালন করিতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণকেও সেইরূপ খাদ্য দিতে থাকায়, এই সন্তানগুলির রিকেট্‌স রোগ হয়। পিতৃমাতৃগণ রোগাক্রান্ত না হইলেও উক্ত খাদ্য তাহাদের দেহে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—তাহাদের সন্তানেরা পিতৃমাতৃ দেহ হইতে রোগপ্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাই তাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হইল। ইহাতে এই নূতন তথ্যটি জানা গেল যে, রিকেট্‌স রোগ উৎপাদনে বংশানুক্রমের প্রভাবও কম নয়।

ভাইটামাইনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুষ্টিকারিতার বিষয় অন্য ভাবে আলোচিত হইত। তৎকালে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণ বিবেচনা করিয়া একটা আদর্শ খাদ্য নির্ব্বাচনের চেষ্টা করা হইত। জড়বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, একটা কল চালাইবার সময় তাহার কর্ম্মশক্তির সহিত তাপ-বিকীরণের খুব নিগূঢ় একটা সম্বন্ধ আছে। Joule পরীক্ষা ও হিসাব করিয়া দেখেন যে, আধসের ভারী কোন জিনিস ৭৭২ ফিট উঁচু হইতে জলের উপর নিক্ষেপ করিলে এক পৌণ্ড ওজনের জলের তাপ ১ ডিগ্রি ফারেনহীট অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম জলের তাপ ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়। কলকারখানায় ইহাই তাপের মানদণ্ড। জীবদেহের তাপমানও প্রকারান্তরে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভুক্ত খাদ্যের কি পরিমাণ হজম হইয়া বা অম্লজানসহযোগে দগ্ধ হইয়া কতখানি তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাও হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাকে ক্যালোরি (calorie) নাম দেওয়া হইয়াছে। এতকাল পর্য্যন্ত খাদ্যের গুণ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণে এই ক্যালোরিরই অবাধ প্রভুত্ব ছিল। পুষ্টিকর খাদ্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় কেবল এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট হইত যে, সেই খাদ্যে যথোচিত পরিমাণে ক্যালোরি বা তাপোৎপাদক উপাদান আছে কি না। অবশ্য সকলের পক্ষেই একই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি উপযোগী না-ও হইতে পারে—বিভিন্ন ব্যক্তির

পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ক্যালোরির প্রয়োজন হইতে পারে। সাধারণ আকৃতির একজন মানুষ, যে বেশী পরিশ্রম করে না, তাহার পক্ষে ২৫০০ ক্যালোরি যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু খুব পরিশ্রমী একজন লোকের পক্ষে ৫০০০ ক্যালোরি দরকার।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাদ্য।

প্রোটীন (আমিষ জাতীয় খাদ্য,) কার্ব্বোহাইড্রেটস (শালিজাতীয় খাদ্য), ফ্যাট্‌স (মাখন বা স্নেহজাতীয় খাদ্য) ও লবণ—ইহাই শরীর ধারণের জন্য আবশ্যক। মাংস, ছানা, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য, শর্করা শ্বেতসার প্রভৃতি শালিজাতীয় খাদ্য, ঘৃত মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ইহার সহিত কিছু উদ্ভিজ্জ ও কিছু খনিজ লবণ সামান্য পরিমাণে হইলেই আমাদের খাদ্যের সকল অভাব মিটিয়া যায়। তবে খাদ্য মুখরোচক করিবার জন্য কিছু মশলার দরকার। খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় অংশু তাহাতে যথোচিত পরিমাণে জল মিশাইয়া লইতে হইবে। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য উক্তরূপ বিজ্ঞানানুমোদিত খাদ্যের সহিত কিছু বাজে জিনিসও লইতে হয়, যাহাতে খাদ্য মালে (ওজনে) বাড়ে ও উদর পূর্ণ করিয়া আহারে তৃপ্তিদান করে।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের খাদ্য নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ হয়। আমিষজাতীয় এক খাদ্য যেমন অপর খাদ্যও তেমনি—উভয়েরই মূল্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই। অপরাপর বিষয়েও এই একই রূপ নিয়ম। যে কোন খাদ্যই আহার করা যাউক না কেন, তাহাতে ঐ কয় জাতীয় উপাদান নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ক্যালোরিতে থাকিলেই হইল।

কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই নির্দ্ধারণের অযৌক্তিকতা বেশ ভাল করিয়াই বুঝা গিয়াছিল। সে সময়ে মাংস, দুগ্ধ ও ডিম্ব দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা অনেক বিবেচনা করিয়া মাংসের পরিবর্ত্তে জিলেটিন ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। কি তাহাতে কোনই সুবিধা হইল না। শাকসব্জি, মাংস দুগ্ধ ডিম্ব—কোনটারই স্থান পূরণ করিবার উপযোগী খাদ্য পাওয়া গেল না। গত মহাযুদ্ধের সময়ও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। স্বভাবজাত খাদ্যের কৃত্রিম খাদ্যের দ্বারা পূরণের চেষ্টা সফল হয় নাই এখন চরম সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কৃত্রিম খাদ্য স্বাভাবিক খাদ্যের স্থান পূরণ করিতে কিছুতেই পারে না।

বৈজ্ঞানিক খাদ্যের এই নিষ্ফলতায় জড়বৈজ্ঞানিকে অবশ্য আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। স্বাভাবিক খাদ্য বিশ্লে করিয়া তাঁহারা যে যে রাসায়নিক উপাদান পাই ছিলেন, সেই সেই উপাদান উপযুক্ত মাত্রায় খা সত্ত্বেও কেন যে কৃত্রিম-খাদ্যভোজীরা পুষ্টিলাভ কর পারিতেছে না, তাহা ভাবিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের রহিল না। অথচ, স্বাভাবিক যে কোন খাদ্য দে ভাবেই হউক খাইয়া তাহাদের পুষ্টিলাভে কো ব্যাঘাত ঘটিতে দেখা গেল না। এখন বুঝা গিয়াছে কোন একটি মাত্র প্রোটীন খাদ্য মানব দেহের নাইট্রে জেন ঘটিত উপাদানের অভাব মিটাইতে পারে আর কেবল ক্যালোরি দ্বারা মানুষের প্রয়োজ খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। কে ক্যালোরির হিসাব করিয়া খাদ্যে উপযুক্ত পরি ঐ কয় জাতীয় পদার্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল, প্রোটী অন্তর্গত আমিনো-এ্যাসিড (Amino Acids) একটী পদার্থ শরীর পোষণের জন্য অত্যাবশ্যক। কার্ব্বন, ৫টী হাইড্রোজেন, একটী নাইট্রোজে দুইটী অম্লজান পরমাণুতে এই বস্তুটী গঠিত। ১৮ প্রকার আমিনো-এ্যাসিড আছে। প্রোটীন পরিপাক পাইয়া এ্যামিনো-এ্যাসিড উৎপন্ন ইহাতে বুঝা গেল, বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত বিশুদ্ধ প্রো এই আমিনো এ্যাসিডের অভাব মিটাইতে সমর্থ নহে

খাদ্যের গুণাগুণ বিচার গেল বাহিরের ব্যাপা ইহা ছাড়া একটা ভিতরের ব্যাপার আছে—খাদ্য

করা। শরীরাভ্যন্তরে যে যে যন্ত্রের সাহায্যে যে যে প্রণালীতে খাদ্য পরিপাক পাইয়া শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে তাহাও বিবেচ্য। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, শরীরের পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত ঘটিলেই রিকেট্‌স রোগ উৎপন্ন হয়। শরীরের অপরাপর অবস্থাতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। দেহ-মধ্যস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস বাহির হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেও শরীর পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। কোন খাদ্য ভোজন করিলে তাহা চর্ব্বণ করিবার সময় লালা বহির্গত হয়। তাহা গলাধঃকৃত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে বা পাকাশয়ে গমন করিলে অনেক রকম হজমি রস ত বাহির হয়ই, তাহা ছাড়া পিত্ত এবং প্যানক্রিয়াস নামক দুইটি যন্ত্রও বাহির হয়। পূর্ব্বে চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিতেন যে, যে সকল যন্ত্র-তন্ত্রের ক্রিয়ায় পাচক রস নির্গত হয়, তদনুরূপ যন্ত্রতন্ত্রাদিরই ক্রিয়ায় পিত্ত ও প্যানক্রিয়াটিক রসও নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি পরীক্ষায় এই ধারণা ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কুকুরের ক্ষুদ্র অন্ত্রের নাড়ী কর্ত্তন করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে, উক্ত রস নিঃসরণের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অন্ত্রে খাদ্য যে অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হয় তাহা অম্লধর্ম্মী—অর্থাৎ পাকাশয়ের হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড তৎসহ মিশ্রিত থাকে। এই এসিডের সংস্পর্শে আসিয়া অন্ত্রের গাত্র হইতে একপ্রকার রস বাহির হইয়া রক্তস্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্যানক্রিয়াজে আসিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তথা হইতে আর একপ্রকার রস বাহির করায়। অন্ত্র হইতে নির্গত এই বিচিত্র রস একপ্রকার hormone বা রাসায়নিক দূত। ইহাকে secretin বলা হয়। পুষ্টিলাভের পক্ষে এই রসটির প্রয়োজন আছে। এইরূপে প্যানক্রিয়াজেরও বহির্মুখীন ও অন্তর্মুখীন রস নিঃসৃত হয়। ঐ অন্তর্মুখীন রসই insulin। এই রস প্রত্যক্ষভাবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহে চিনির শোষণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

শরীর পোষণ ক্রিয়ায় endocrine glandsএর প্রভাবও অল্প নয়। শরীর পোষণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে thyroid gland অল্প সাহায্য করে না। এই সকল ব্যাপার হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শরীর পোষণ ক্রিয়ায় আভ্যন্তরীন রসস্রাবের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ পক্ষে thyroid glandএর প্রভাব খুব বেশী। মোটের উপর endocrine gland গুলি প্রত্যক্ষভাবে শরীর পোষণে সহায়তা করে।

আবার, মনে কোন ভাব প্রবল হইলে শরীরের উপর তাহার ক্রিয়া হয়। অত্যধিক ভয়ে শরীরের যন্ত্রের এমন কতকগুলি কাজ হয়, যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় হয় না। উত্তেজনা, ক্রোধ, বিরক্তি, ব্যস্ততা, উদ্বেগ—এই সকল ভাব শরীর-ক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর। ক্রুদ্ধ জননীর বিষাক্ত স্তন্য পান করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের কথাও শোনা যায়। মনে এই সকল ভাব প্রবল হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, এবং সে সময়ে কিছু খাইলে তাহা হজম হয় না, হয় ত বমি হইয়া যায়, নয় ত উদরাময় হইতে পারে। আবার ইচ্ছা, প্রত্যাশা, সন্তোষ, তৃপ্তি—এ সকল ভাব শরীরের পক্ষে হিতকর, অন্ততঃ তাহারা দেহের কোন অনিষ্ট করে না। এ সকল ভাবের আবেগের সময় আহার করিলে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হইয়া থাকে।

এইখানে একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। জীব মাত্রেই কতকগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়াধীন। তন্মধ্যে আহার অন্যতম। জীব মাত্রকেই আহার করিতে হয়, কারণ তাহার ক্ষুধা পায়, এবং ক্ষুধা তাহাকে আহারে প্রবৃত্ত করে। তখন সে ভাবে না যে শরীর পোষণ করাই আহারের উদ্দেশ্য। সে জানে ক্ষুধার নিবৃত্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই সে আহার করে। শরীর পোষণ ক্রিয়া বলিয়া যে একটা বিদ্যা (science) আছে, তাহার সৃষ্টি হইবার বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই জীবগণ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মাত্র আহার করিয়া আসিতেছে। তখন, যখন এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় নাই, লোকে কেমন করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিত?—শুধু

অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক সংস্কার (natural instinct) দ্বারা। চলাফেরা, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য, এবং শরীরকে সবল রাখিবার উপযোগী তেজ উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ক্ষুধা সেই প্রয়োজনের কথা জানাইয়া দেয়। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই যখন প্রধানতঃ খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তখন আর লোকে পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া খাদ্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বসে না—তাহা কেবল সুস্বাদু ও পরিমাণে যথেষ্ট থাকিলেই হইল, যাহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময়, কিম্বা খনির ভিতর যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া লোকে আটক পড়ে, কিম্বা সমুদ্রে জাহাজ বিপন্ন হইলে, লোকে অখাদ্য ভোজনেও ইতস্ততঃ করে না—ক্ষুধার নিবৃত্তি করা চাই—তা সে যে জিনিস দিয়াই হউক।

কিন্তু ক্রমে বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ ভাল মন্দ, সুস্বাদ বিস্বাদ, উপকারী অপকারী খাদ্যের বিচার করিতে শিখিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অবশ্য অনেক সময় লাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপূর্ব্বে অনুপযুক্ত খাদ্য ভক্ষণের ফলে অনেক লোককে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, অনেক মানবজীবন আহুতি দিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থা যে কেবল মানুষেরই হইয়াছিল তাহা নয়। মানবেতর প্রাণীও খাদ্যাখাদ্যের গুণদোষ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ও অখাদ্য বর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে। ইহাও অভিজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে, এবং বংশানুক্রমে এই অভিজ্ঞতার ফল তাহারা ভোগ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটা কথা আছে। কতক প্রাণী উদ্ভিজ্জভোজী। সকল উদ্ভিদই অবশ্য তাহাদের খাদ্য নয়—কতকগুলি মাত্র তাহাদের খাদ্য। সেই খাদ্য যেখানে সুলভ সেইখানে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে ও সংখ্যায় বাড়িতে পারে। কিন্তু কোন দৈব দুর্ঘটনা ক্রমে সেইস্থানে সেই খাদ্যের একেবারে অভাব হইলে তাহারা যদি অন্য খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে তবেই বাঁচিয়া যায় নচেৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ দেশ ভেদে আবহাওয়ার ভেদ ঘটে বলিয়া একই প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্য সর্ব্বত্র সুলভ নহে। এক স্থানের এক শ্রেণীর প্রাণীরা যে সুলভ খাদ্য গ্রহণ করে, অন্য তাহা দুর্লভ হইলে সেই শ্রেণীর প্রাণী অন্য খাদ্য ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। আমিষভোজী প্রাণীদের অবস্থাও খাদ্য সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ। স্থান ভেদে তাহাদেরও খাদ্য বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে।

মানুষ প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস করিতেছে, এবং তাহারা উদ্ভিজ্জভোজীও বটে, আমিষভোজীও বটে। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই রকম উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ খাদ্য জন্মে না—স্থান ভেদে ইহাদের বিস্তর প্রকারভেদ হয়। সেই কারণে বিভিন্ন দেশের মানুষকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। এক এক স্থানের মানুষ যাহা খাইয়া সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে, অনভ্যাস হেতু অন্য স্থানের মানুষ হয় ত তাহা পছন্দ করিবে না, কিম্বা তাহা হয় ত তাহার সহ্য হইবে না। তাহা হইলে অবস্থাটা এই দাঁড়াইল যে, খাদ্য মানুষের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সেইটাই প্রধান কথা নয়; যেখানে যে খাদ্য সুলভ সেই স্থানের মানুষের নিজেকে সেই খাদ্যের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। নচেৎ সে বাঁচিতে পারে না। এই কারণে বৈজ্ঞানিকেরা খাদ্য-বিচার পূর্ব্বক জীবজগৎকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া খাদ্যানুসারে তাহাদের নাম করণ করিয়াছেন—উদ্ভিজ্জভোজী, আমিষভোজী, নিরামিষভোজী ইত্যাদি। খাদ্য হিসাবে দন্তের গঠনের ইতর বিশেষ হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ দন্তের গঠনের অনুযায়ীও করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর খাদ্যভোজী জীব যদি সেই খাদ্যের পরিবর্ত্তে অপর এক শ্রেণীর খাদ্য ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে পুরুষানুক্রমে তাহাদের দন্তের গঠনও পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই খাদ্যের উপযোগী হইয়া উঠে। ভল্লুক, কুক্কুর ও বিড়াল জীবদেহ-তত্ত্বানুসারে একই শ্রেণীর জীব ছিল। তাহাদের খাদ্যও প্রথমে একই প্রকার ছিল; অর্থাৎ তাহারা

আমিষভোজী জীব ছিল। কিন্তু ভল্লুক প্রায় নিরামিষভোজী হইয়াছে; কুক্কুর মানুষের সংশ্রবে আসিয়া আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই ভোজন করিতে শিখিয়াছে; আর বিড়াল আমিষভোজীই আছে। এই তিন শ্রেণীর জীবের দন্ত পূর্ব্বে একই প্রকার ছিল; কিন্তু খাদ্যের বিভিন্নতায় তাহাদের দন্তের গঠনে পার্থক্য জন্মিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে না পারায় কয়েক জাতীয় মানুষ ও পশু ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে তাসমানিয়ান জাতীয় শেষ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় এই জাতীয় আর এক ব্যক্তিও এখন জীবিত নাই। অষ্ট্রেলিয়া, আন্দামান প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীরা এই ভাবে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতিরও বোধ হয় এই দশা উপস্থিত।

মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ কেবল শরীর পোষণের জন্য খায় না, এমন কি, আহার কালে সে কথা সে চিন্তাও করে না। সে খায় প্রধানতঃ ক্ষুধার তাড়নায়,—ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য—উদর পূরণের জন্য। বিজ্ঞান-সম্মত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই সে আহারে বিরত হয় না—তাহার পেটে যত ধরে, সে তত খায়। তবে যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং পুষ্টিলাভ করে, তাহার কারণ, সে যাহা খায় তাহাতে তাহার শরীর পোষণোপযোগী উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। অবশ্য, মানুষ বিচার পূর্ব্বক না খাইলেও সে যাহা খায়, তাহা কতকটা পুরুষানুক্রমিক সংস্কার বশতঃ।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষের খাদ্যে প্রোটীন, চর্ব্বি ও কার্ব্বোহাইড্রেট যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। কিন্তু এই বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে খাটে না। সুমেরু নিহিত চিরতুষারাবৃত প্রদেশের অধিবাসী এস্কিমো জাতি উদ্ভিজ্জ খাদ্য না খাইয়াও জীবিত থাকে। কার্ব্বোহাইড্রেট তাহার খাদ্য তালিকায় কদাচিৎ স্থান পায়। প্রোটীন ও চর্ব্বিতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু প্রাচ্যদেশের লোকদের খাদ্যে কার্ব্বোহাইড্রেটের ভাগই বেশী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিকদের নির্দ্ধারিত খাদ্য তালিকাই আদর্শ নহে। আসল কথা, কি খাইব, কি খাইব না—ইহাই প্রধান প্রশ্ন নয়। প্রধান প্রশ্ন হচ্চে—কি পরিমাণে খাইব, এবং কখন খাওয়া বন্ধ রাখিব। দেহের পুষ্টিকারিতা-সমস্যার সমাধান এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে।

এখন আবার খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সামাজিক আচার, ব্যবহার ও প্রথা মানিয়া চলিতে হয়। সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আহার বিষয়েও পরিবর্ত্তন হইতেছে। নিত্য কত নূতন নূতন খাদ্যের উৎপত্তি হইতেছে। আহারের সময়, পরিমাণ, খাদ্যের প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক বা আবশ্যকমত বাঁধাধরা নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও বাধ্য হইয়া খাইতে হয়, আবার প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়েও আহারে বিরত থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজন করিয়া উদরকে ভারগ্রস্ত ও পাকস্থলীকে উৎপীড়িত করিতে হয়, আবার স্থল বিশেষে ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইতেই আহার বন্ধ করিতে হয়। প্রকৃতির বিধানের এই সকল ব্যতিক্রম,—খোদার উপর এই খোদকারী—ইহার ফল যাইবে কোথায়? আহার বিহার সম্বন্ধে জাতিগত আচার ব্যবহারের ফল সমগ্র জাতির উপর ফলিতে বাধ্য এবং ফলিতেছেও। পুষ্টিকারিতা ও অজীর্ণতার বড় নিকট সম্বন্ধ। আলো ও ছায়ার মত ইহারা পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। যেখানে আলো, সেখানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, কিন্তু আলোর অভাব হইলেই অন্ধকারের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ, শরীর পুষ্টিলাভ করিতে থাকিলে কথাই নাই। কিন্তু পুষ্টিলাভে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহার অনিবার্য্য ফল অজীর্ণতা। অধুনা অজীর্ণ রোগ দেশব্যাপী বলিলেই হয়। সুতরাং জাতির দৈহিক পুষ্টিলাভে যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে, সে কথাও অবিসম্বাদিত সত্য, এবং আহারের দোষেই যে অজীর্ণতা দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই।

মানুষ অনেক বিষয়েই নিজেকে বর্ত্তমান কাল, দেশ ও পাত্রোপযোগী করিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু খাদ্য বিষয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার এখনও খর্ব্ব হয় নাই। এখন কিন্তু সেই পূর্ব্ব-সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন ক্ষুধার নিবৃত্তি ও উদর পূর্ত্তির জন্য আহার করিলেই যথেষ্ট হইবে না। বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিয়া, যাহা আমাদের দেহের পুষ্টিকারিতায় সাহায্য করিবে, তাহাই মাত্র উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা পুষ্টিকর নহে, শরীরের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক, তাহা যতই মুখরোচক ও সুস্বাদু হউক না কেন, তাহার লোভ সংবরণ করিতে হইবে। নচেৎ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি সভ্যতা সবই বৃথা—পশুতে ও মানবে কোন পার্থক্য থাকিবে না। এইটী করিতে পারিলে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারা যাইবে। যাহারা এটী পারিবে না, তাহাদিগকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে চির বিদায় লইতে হইবে—সে জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকিবে না,—যেমন অনেক জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

এখন আমাদিগকে বহু শত সহস্র বৎসরের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস বদলাইতে হইবে। ইহা সাধনাসাপেক্ষ। সৈনিকগণ যেমন তাহাদের চিরদিনের চলাফেরার অভ্যাস ভুলিয়া গিয়া নূতন ধরণের চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত হয়, আমাদিগকে এখন খাদ্য সম্পর্কে তাহাই করিতে হইবে। আমাদের বিচারশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও বিচারশক্তি পরিচালন পূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। শরীরের পুষ্টিসাধন ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে অধুনা যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সন্ধান লইতে হইবে ও তদনুসারে খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য কি ভাবে পাক করিলে রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর হইবে অথচ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে না, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। রকমারি খাদ্য যাহা সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। তার পর, খাদ্য গ্রহণে নিজেকে উপযুক্ত করিতে হইবে। আহার কালে মনে প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা থাকা আবশ্যক। আর ঘড়িধরা সময়ে, ক্ষুধার উদ্রেক হউক আর নাই হউক, খাইতে হইবে—এ নিয়ম বদলাইতে হইবে। "আপ রোটি খানা।" আহার বিষয়ে সামাজিক প্রথার অনুসরণ করিলে বা অপর লোকের মুখ চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া আরও আছে। খাদ্যে রুচি জন্মাইবার জন্য শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা চাই, যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা চাই, প্রত্যহ শীতল জলে যথেষ্ট সময় স্নান করা চাই, খোলা যায়গায় প্রচুর টাট্‌কা, তাজা বায়ু ও সূর্য্য-কিরণ উপভোগ করা চাই।

এই সকল নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকিবে, এবং লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতির প্রতিশোধ সহ্য করিতে হইবে।

প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য মানব জাতিকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর এই সকল নিয়ম লঙ্ঘনের ফল অপরিহার্য্য। আবার দন্ত চিকিৎসকের এ বিষয়ে একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। দন্ত যাহাতে অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়ে, দাঁতে পোকা পড়িয়া গর্ত্ত না হয়, দন্তমূল যাহাতে শিথিল না হয়, এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দন্ত চিকিৎসকের কাজ। উপযুক্ত ভাবে খাদ্য গ্রহণ করিলে দন্ত ভাল থাকিবে। দন্তোদ্গমের পূর্ব্ব হইতে দন্ত চিকিৎসক সতর্কতা অবলম্বন করিলে, এবং শিশুর পিতা মাতাকে যথোচিত উপদেশ দিলে তবে দন্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে। কেবল তাহাই নয়, কেবল শিশুর দন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, দন্ত চিকিৎসকের সকল কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। শিশুর পিতামাতা, বিশেষতঃ জননীর দন্ত যাহাতে ভাল থাকে, তাঁহার খাদ্য যাহাতে সুজীর্ণ হয়, তাহা দেখিতে হইবে। তবে তাঁহার সন্তানের দন্ত সুগঠিত সুপরিণত ও সুন্দর হইবে।

জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুর দন্তোদ্গম হয় না। দন্তোদ্গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু তাহার স্বাভাবিক খাদ্য অর্থাৎ মাতৃস্তনদুগ্ধ খাইবে। সকল স্তন্যপায়ী জীবই এই নিয়ম পালন করে। কেবল মানুষই প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দিয়া পালন করিবার চেষ্টা করে। তাহার ফলও হয় তেমনি। কৃত্রিম প্রাণ্ড পুষ্ট শিশুর দন্ত শীঘ্রই খারাপ হইতে আরম্ভ হয়।

মাতৃস্তন্যে শিশুর যখন আর কুলাইবে না, তখন তাহাকে এমন খাদ্য দিতে হইবে, যাহাতে তাহার দেহের পরিপুষ্টি হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে অথচ দন্তগুলি সুদৃঢ় হইয়া পরিণত হইতে পারে। কোন্ খাদ্য কোন্ শিশুর পক্ষে কিরূপ উপযোগী হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। শিশুর দন্তের পরিপুষ্টি ও পরিণতির পক্ষে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট—নিম্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর উপর তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, খাদ্যে চূণের উপাদান থাকিলেই তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দন্ত দৃঢ় করে না। খাদ্যের চূর্ণাংশকে অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, এ পক্ষে ভাইটামাইন A'র উপযোগিতা খুব বেশী। ইহা দন্তের দৃঢ়ীকরণে চূর্ণকে সহায়তা করে। আবার কোন কোন খাদ্যে এমন উপাদান থাকে, যাহার দরুণ চূর্ণ দন্তগঠনে সাহায্য করিতে পারে না। ফলে দন্ত নরম, ভঙ্গপ্রবণ, ক্ষয়শীল হইয়া পড়ে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, চাউল ও সাদা ময়দা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিশু-খাদ্য।

দন্তের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সাধনে পুষ্টিকর খাদ্যের উপযোগিতা কতখানি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। এ দিকে দন্ত-চিকিৎসকগণের গবেষণার যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। মানুষে যা খায়, এবং সেই খাদ্য ভোজনের ফলে তাহার কোন্ দন্ত কত দিনে পড়িয়া যায়, কত দিনে তাহার আর একটাও দাঁত থাকে না—এ সকল দন্ত-চিকিৎসকের অনুসন্ধানের বিষয়। দন্ত-চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য ও অনুসন্ধান-যোগ্য বহু বিষয়ই এ যাবৎ উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শিশুদিগের মধ্যে দন্তের ও মাড়ির গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও দন্তের অবস্থা এইরূপ। শিশু ও প্রবীণ ব্যক্তিদের দন্তের স্বাভাবিক গঠন যে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার কোন আদর্শ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। দন্তের গঠনের এই পার্থক্যের জন্য দায়ী কি খাদ্য, না অন্য কিছু? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ কি? দন্তের ভালমন্দ কি খাদ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে, না, খাদ্য চর্ব্বণের প্রণালীর উপর? দন্ত-চিকিৎসককে এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে।

দন্ত চিকিৎসক এখন কেবল রুগ্ন দন্তের চিকিৎসা মাত্র করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে "prevention is better than cure" নীতির অনুসরণ করিতে হইবে।

"দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী !"

(গল্প)

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

এক

অসহযোগের জীমূত ভেরী স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। বহু যুক্তিবাদপূর্ণ রাশি রাশি প্রবন্ধের বিরাম নাই; কিন্তু তথনও সহরের প্রায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতি প্রবন্ধেই প্রসঙ্গক্রমে সহরবাসীদিগকে আকুল পত্রিকার পৃষ্ঠায় পল্লীসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞাপক আহ্বানে আবেদন—ওগো, পল্লীতে ফিরিয়া এস,

পল্লীকে উন্নত কর, পল্লী হইতেই তোমাদের মুক্তি, আমাদের মুক্তি, ভারতের মুক্তি!...ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বাগাড়ম্বর যে খুব বেশী থাকিত তাহা নহে, পল্লী-প্রত্যাবর্ত্তনের সপক্ষে যুক্তি-তর্কও কিছু কম থাকিত না; তবে পল্লীতে ফিরিয়া গিয়া কে কি ভাবে কাজ করিবে, কেমন করিয়া পল্লীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আপনাকে গলাইয়া লইতে পারিবে, পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে কি কি অনুষ্ঠানের দরকার, তাহার কোন হিসাব-নিকাশ এ পর্য্যন্ত কোন কাগজে বাহির হয় নাই, সে সকল পদ্ধতির ব্যবহারযোগ্যভাবে বিচার-বিশ্লেষণ বা মীমাংসা খুব কম লেখকই করিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন একটা সাপ্তাহিকে কোন অজ্ঞাতনামা পল্লীবাসীর পল্লীসম্বন্ধীয় একটা মনোজ্ঞ উচ্ছ্বাস পড়িয়া সহরবাসিনী মঞ্জুলা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। সেই দিন আফিস হইতে স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিবামাত্র কোন আদর-আপ্যায়ণ না করিয়াই স্ত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ওগো শুন্‌ছ, চাকরী-বাকরী ছেড়ে দেশে ফিরে চল, সহরে আর মন্ টিক্‌ছে না।"

স্ত্রীর হঠাৎ এই উক্তি শুনিয়া জ্ঞানবাবু যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া গেলেন। কারণ, তাঁহার স্ত্রী মঞ্জুলা সহরের ক্রোড়েই লালিতা-পালিতা, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের ভিটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় কোন্ এক সুদূর পল্লীর বুকে ম্লান হতাশে জাগিয়া থাকিলেও সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মঞ্জুলার কপালে খুব কমই ঘটিয়াছে; তাই আজ তিনি আদরিনী ভার্য্যার হঠাৎ এ ভাবান্তর দর্শনে অবাক্ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটা সোফার উপর শুইয়া পড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন্—"মঞ্জু, গান্ধীজীর শিষ্য হলে নাকি? হঠাৎ পল্লীর উপর এত মমতা যে?"...

জ্ঞানেন্দ্রনাথের পা দুই খানি আপনার কোলের উপর লইয়া মঞ্জুলা একটু গম্ভীর অথচ করুণ স্বরে কহিতে লাগিল "না ঠাট্টা নয়। পল্লীতে আমি যাবই। সহরের ইঁট্-পাথরে তৈরী দেওয়ালে অন্ধকারময় ঘেরাটোপে বদ্ধ থেকে প্রাণ অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছে। নিত্য ধরা-বাঁধা কাজ—সকালে উঠে চাকরকে বাজারের পয়সা দেওয়া, ঠাকুরকে রান্নার তাড়া দেওয়া, চা-জলখাবার গোছানো, খাওয়া, গল্পের বই পড়া, বসনভূষণের পারিপাট্য করে' নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া, হয়ত একটু সেলাই করা আর নিশ্চিন্ত আলস্যে নিদ্রা দেওয়া...এ রকম একবেয়ে জীবন আর ভাল লাগ্‌ছে না। পল্লীর প্রাচুর্য্যের মধ্যে—তার অনাবিলতার মধ্যে—তার বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাণটাকে ডুবিয়ে দিতে পাল্লে জীবনটার অনেক নূতন রকম খোরাক্ পা'য়া যাবে। তা'ছাড়া দরিদ্র পল্লীবাসী আমাদের সেবা-যত্নের মুখ চেয়ে আছে; তাদের শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান ও শুশ্রূষাদান কর্ত্তে হবে—মায়ের মত বুকভরা স্নেহ-প্রীতি দিয়ে তাদের ক্ষত-বেদনায় প্রলেপ দিতে হবে। দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মত লোকেরই এখন পল্লীতে ফিরে গিয়ে তার পঙ্কোদ্ধারে প্রাণমন ঢেলে দেওয়া উচিত—পতিতোদ্ধারে যেমন করে' একদিন নিমাই-নিতাই আপন ভুলে লেগে পড়েছিল!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ পত্নীর মুখে আজ এই মহান্ সঙ্কল্প শুনিয়া মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি একদিন এই পত্নীর তেজঃপূর্ণ প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া এক কথায় গভর্মেণ্টের উচ্চপদ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার ছোট ভাইকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া দুইজনে স্বাধীন ব্যবসায় লাগিয়াছিলেন। ব্যবসাটি উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছিল ও সম্প্রতি বেশ লাভজনক দাঁড়াইয়াছে। ছোট ভাই নন্দবাবু বয়সে অপরিপক্ক হইলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার শিক্ষকতায় ও সাহচর্য্যে অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায়-বুদ্ধিতে বেশ তীক্ষ্ণ ও হিসাব-পত্রে বেশ পটু হইয়া উঠিয়াছেন। পল্লী-ভিটার প্রতি জ্ঞানবাবুর চিরদিনই একটা আন্তরিক টান ছিল; দেশে পিতৃ-পরিত্যক্ত তিন-মহলা চক্-মিলানো ভগ্নপ্রায় দালানটি তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে বহু অর্থব্যয় করিয়া মেরামত করিয়াছিলেন। নিজেদের অমনোযোগিতা ও রক্ষণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখনও যে কয়খানি তালুক ও গাঁতি নিলাম-বিক্রয়ের কবল হইতে কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, ফেলিয়া-ছাড়িয়া তাহার বাৎসরিক্ আয় দুই তিন সহস্রের কম ছিল না; এতদ্ব্যতীত বাগান, পুষ্করিণী, খামার জমী প্রভৃতি যে সম্পত্তি যাহা আছে, খনার উপদেশানুযায়ী "খাটিয়া খাটাইয়া" বা "কাঁধে ছাতি" রাখিয়া চালাইতে পারিলে, তাহাতে একটা বড় সংসারে খোরাকের অভাব কোন দিনই অনুভব করিতে হয় না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিলেন, আরও বৎসর দশ কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসাটিকে আরও বর্দ্ধিতায়তন ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া নন্দকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি সপরিবারে পল্লী জননীর স্নেহ-শীতল অঞ্চল-বিচ্ছায়ে আশ্রয় লইবেন। প্রিয়তমা পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বুঝি তাঁহাকে আজ সে ইচ্ছা নির্দ্ধারিত সময়ের অগ্রবর্ত্তী করিতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিলেন—"দেখ মঞ্জু, পল্লীতে ফিরে যাওয়ার সার্থকতা কতখানি আমি বুঝি। অবশ্য এ কথা ঠিক্, যে আমাদের মত সহরবাসীর পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে' প্রথম প্রথম নানারূপ অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে হবে। তার উপর, পল্লীর স্বাস্থ্য সহরের চেয়ে অনেকাংশে নিকৃষ্ট—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশা, কলেরা প্রভৃতির লীলাভূমি আমাদের গ্রাম। নিজের জীবনের জন্য তত উৎকণ্ঠিত নই—যত তোমার ও বাণীর জীবনের জন্য চিন্তিত। তোমাদের যদি কিছু হয়—"

বাণী ইঁহাদের তিন বছরের মেয়ের নাম। মঞ্জুলা জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"দেখ, জীবনটা ত মরণের জন্য আয়োজন। মর্‌ব ত একবার। মুক্তি ভোগের মধ্য দিয়ে নয়—ত্যাগের মধ্য দিয়ে। পল্লীতে ফিরে আমাদের ব্রত হবে—জাতিপাত্র নির্ব্বিশেষে মানুষের সেবা, ধর্ম্ম হবে—নরনারায়ণের পূজা, কর্ম্ম হবে—লোকের হিত সাধন! এতে বিসর্জ্জন দিতে হবে অহমিকার মোহ, আহুতি দিতে হবে উচ্চ পদের গরিমা, অগ্নিসাৎ কর্ত্তে হবে শয়তানের মিথ্যা প্রলোভন! পয়সা রোজগার করে' মানুষ যতটা সুখ পেতে পারে—তা'ত লাভ করেছ, এখন সুবিবেচনার সঙ্গে সেই পয়সা খরচ করে' কি আনন্দ লাভ করা যায়—এস দেখি। সমষ্টির কল্যাণ কর্‌তে গিয়ে ব্যষ্টির প্রাণের মায়া কর্ল্লে কি চলে?" মঞ্জুলার মুখে একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; ঘর্ম্মবিন্দু-খচিত ললাট সমেত অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি তাহার যেন শরৎ-প্রভাতের শিশির-সিক্ত একখানি সুবর্ণ কমলের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। জ্ঞানেন্দ্রের অন্তরাত্মা যেন আজ রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া উপদেশ দান করিতেছে এবং যেন তাঁহার মনোভাব জানিবার জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে!

এমন সময় হাসির ঝর্ণা বহাইয়া শেফালির মত শুভ্র কচি মেয়ে বাণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দুইটি স্নেহ-নিবিড় বাহু-শৃঙ্খলে পিতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া আধ কচি আধ বুদ্ধোপম প্রাণ-কাড়া স্বরে বলিতে লাগিল, "বাবা, মা বলেছে—আমরা ঠাকুরদাদার দেশে যাব; সেখানে নাকি অনেক আম কাঁঠাল লীচু আছে—কত খেলার সাথী আছে—তারা ঝগড়া করে না। বাবা, তুমি নিয়ে যাবে? সেখানে রাতদিন খেল্‌ব—নদীতে নাইব—পাখীর গান শুন্‌ব—চাঁদ মামার জ্যোৎস্না মেখে তোমার বুকের উপর ঘুমিয়ে পড়্‌ব। শীগ্গির করে' চল না বাবা"—

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাণীর টুল্‌টুলে গালে একটি চুমো খাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"মঞ্জু, পল্লীতেই ফিরে যাওয়া স্থির। দিন সাতেকের মধ্যে রওনা হব। কালই নায়েব মহাশয়কে চিঠি লিখে দিচ্ছি!"

দুই

মধুমালতী গ্রামখানি এককালে যে সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার বর্ত্তমান্ দুরবস্থার মধ্যেও তাহা বেশ বুঝা যায়।

এই গ্রামের বর্ত্তমান্ জমিদার শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী রায়। প্রবল প্রতাপশালী জমিদার—সন্দেহ নাই; কেন না, তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল না খাউক, নায়েবের হুম্‌কীতে ও পাইকের লাঠির ভয়ে প্রজারা কিস্তিতে কিস্তিতে খাজ্‌নার টাকাটি কড়াক্রান্তিতে কাছারীতে আসিয়া গণিয়া যাইত। নিকুঞ্জবাবু সেকাল ও একালের একটা অপূর্ব্ব খিচুড়ী বিশেষ। তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিলাতী আসবাব্-পত্র ও সাজ-সজ্জা যথেষ্ট আছে, আবার ঠাকুর-দালানে বারো মাসে নিয়মিত তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে; কখনও বা তাঁহার মজ্জিতে হরি সঙ্কীর্ত্তন হয়, কখনও বা বাইজীর নাচে মজলিস জমিয়া উঠে। অন্ধ কুসংস্কারে তিনি একজন নিরক্ষর চাষার চেয়েও বিশ্বাসী, আবার গ্রামের মধ্যে বা নিকটে কোনো ছোট-বড় রাজপুরুষ আসিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও আদর-আপ্যায়ণ করিতে কোট্ প্যাণ্ট্ পরিয়া সম্পূর্ণ বিদেশী খানা টেবিলে সাজাইয়া "একান্ত অনুগত ভৃত্যরূপে" হাজীর থাকেন। যাহা হউক, আজকালকার অধিকাংশ পল্লীবাসী-ভূস্বামীর তিনি একটি যে উজ্জ্বল জীবন্ত আদর্শ—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্মুখে মহাপূজা আসিতেছে। জমীদার-বাড়ী দুর্গা-প্রতিমা দুই মেটে গড়া শেষ হইয়াছে। পাড়ার ছেলেরা ঠাকুর-দালানে আসিয়া দল পাকাইয়া হট্টগোল করিতেছে। প্রৌঢ় পেট-সর্ব্বস্ব নায়েব মহাশয় সজিনার ডাঁটার ন্যায় মোলায়েম গোঁফ্‌গুলি উর্দ্ধদিকে পাকাইয়া তুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে মাঝে মাঝে এক একবার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া ঘুরিয়া যাইতেছেন, বাচাল ছেলে পিলেদের এক একবার ধমক দিতেছেন ও পটুয়াদের "হাত চালাইতে" তাড়া কষাইতেছেন।

বাবুর বৈঠকখানায় বহু লোকের সামাগম। কেহ ফর্দ্দ করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ টিপ্পনী কাটিতেছে, একদল তাস পিটিতেছে, আর একদল "পোয়া বারো, ছ'তিন ন'য়ের" তুমুল নাদে আসর সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। বৈঠকখানা-ঘরের সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড সতরঞ্চের উপর পাঁচ সাত জন পুরোহিত বসিয়া বিরাট রকমের শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক-যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়াছেন; চীৎকার করিয়া করিয়া যাঁহাদের গলা যত ক্ষীণ কাতর হইয়া পড়িতেছে, তিনি তত পৈশাচিক প্রবলতার সহিত নাসা-গহ্বরের মধ্যে নস্য ঠাসিয়া দিতেছেন। চাকর-বাকরদের এখন হইতে তামাক সাজিতে ও ফায়-ফরমাইশ খাটিতে খাটিতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্ত্তা এক সাড়ে সাত হাত লম্বা ফর্শীর নলে মুখ লাগাইয়া তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া পায়ের উপর পা মুড়িয়া নির্ব্বিকারভাবে শয়ন করিয়া আছেন। মাঝে মাঝে ফর্দ্দকারীর প্রশ্নের দুই এক কথায় উত্তর দিতেছেন; যে দিকে গোলমাল্ বেশী গড়াইতেছে—সেইদিকে ঈষৎ হাত তুলিয়া "ওহে আস্তে সব" বলিয়া গম্ভীর গোছের হাঁক্ পাড়িতেছেন। পূজা-সংক্রান্ত যাহার যাহা উপদেশ শ্রবণ করিবার ছিল, আত্মীয় কর্ম্মচারীরা তাহা শুনিয়া একে একে স্বকার্য্য-ব্যপদেশে চলিয়া গেল। পূজার উপকরণাদি, ছেলে-মেয়ে-আত্মীয়-স্বজনের কাপড়-চোপড়-পোষাক-আশাক্-বিলাস-দ্রব্যাদি ও নিমন্ত্রণের ঘি-ময়দা, সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতি ক্রয় করিবার বা বায়না দিবার ভার এক একজন কর্ম্মচারীর উপর পড়িল। অবশেষে নিকুঞ্জবাবু সদর নায়েব মহিমবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন্ "একটা দোয়াত-কলম সাদা কাগজ নিয়ে এখানে এসে বস, নিমন্ত্রিতদের ফর্দ্দ কর্ত্তে হবে।" তারপর বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতি চীৎকার করিয়া বলেন "ওহে, তোমরা এখন খেলাটেলা বন্ধ কর; সব উঠে এসে আমার চার পাশে বস, নিমন্ত্রিতদের একটা ফর্দ্দ তৈরী কর্ত্তে হবে—তোমাদের পরামর্শ চাই!"

সঙ্গে সঙ্গে জমিদারবাবুর কথামত কাজ হইল—সকলে গল্প-গাছা ও আড্ডা-খেলা ছাড়িয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া মিশ্রীর দানার মত জমিয়া পড়িল। কাহাকে নিমন্ত্রণ করা যাইবে—কাহাকে যাইবে না, সেই সূত্রে কে সমাজে বাধে—কাহার জাতি গিয়াছে—

কাহার ছেলে নীচু ঘরে বিবাহ করিয়াছে—কাহার সহধর্ম্মীর কন্যার ননদের কুলত্যাগের সংবাদ শোনা গিয়াছে···ইত্যাদি নানারূপ সলা, পরামর্শ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল। যাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, নায়েব মহাশয়ের শ্রীকর-ধৃত কাগজের সীটে দুয়ার কালি দিয়া তাঁহাদের নামধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া লওয়া হইল। বাহিরের গ্রামগুলি সারিয়া গ্রামের ভিতরকার ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের নামের ফর্দ্দ ধরা হইল।

একজন প্রস্তাব তুলিলেন—"গোপাল বসু মহাশয়কে যেন কোন মতে নিমন্ত্রণ করা না হয়, কারণ তিনি মুখ্যি কুলীন হইয়া সম্প্রতি পুত্রের বিবাহ এক বিশ্বাসের ঘরে দিয়াছেন।" গোপাল বাবুর এক মাতব্বর এই দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন; তিনি জমিদার মহাশয়ের নিকটে এই বলিয়া আপত্তি পেশ করিলেন, "ইহাতে গোপাল ভায়ার কোন দোষ নাই। তাঁহার অবাধ্য পুত্র বি-এ পাশ করিয়া নিজেকে একজন কেষ্ট-বিষ্ণু জ্ঞানে নিজেই ঐ সম্বন্ধ গোপনে গোপনে স্থির করে ও মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হওয়ায় কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ও কলিকাতা হইতে একজন পুরোহিত যোগাড় করিয়া বিবাহ করিয়া আসে। গায়ে-হলুদের দিন পিতার নিকট এক মার্জ্জনা-ভিক্ষা-প্রার্থনাপূর্ণ চিঠি আসে। বিবাহ ছেলের মামা বাড়ী হইতে সম্পন্ন হয়; গোপাল বিবাহের রাত্রে এক প্রকার অভ্যাগতের ন্যায়ই নিরপেক্ষভাবে বন্ধুক অবস্থায় সেখানে হাজীর ছিলেন।" নিকুঞ্জবাবু স-পার্ষদ বিচার করিয়া ঠিক করিয়া দিলেন যে, যদি গোপাল বসু মহাশয় পুত্রকে অবিলম্বে ত্যজ্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন্, তাহা হইলে তাঁহার বাটীতে আগামী পূজায় বা পরবর্ত্তী কোন সামাজিক কার্য্যে তিনি নিমন্ত্রিত হইবেন—নচেৎ নহে!

মনতোষ দাস বহুকাল ধরিয়া বাবুদের সরকারে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রধান চাকুরী নিকুঞ্জ বাবুর মোসাহেবী করা। অন্দরে-বাহিরে তাঁহার অসীম প্রতাপ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চেহারা, পেটে খর্ব্বাকৃতি, পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্যায়, নাকটি বেশ প্রলম্বিত হইয়া আসিয়া হঠাৎ গোঁপের উপরে একেবারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে; কাণ দুটি দেওয়াল হইতে প্রবর্দ্ধিত ছোট ছোট দু'খানি সাইনবোর্ডের মত; মাথার মধ্যস্থলে এক গাছও কেশ নাই, অথচ চারিপাশ হইতে চুলগুলি আঁচড়াইয়া এমন চমৎকার কায়দায় সেই কলঙ্কিত সাহারাকে সংগুপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, কেশ-তৈল বিক্রেতাগণ তাঁহার কেশ-বিন্যাস দেখিয়া পুরাদস্তুর স্পর্দ্ধা করিতে পারে। মনতোষের একটি ভাইঝি বিবাহের ৩ বৎসরের মধ্যে অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। মনতোষের বড় ভাই বহুকাল পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, প্রৌঢ়া ভ্রাতৃবধূ কন্যাকে পাত্রস্থ দেখিয়াই কাশীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কন্যাটির একমাত্র অভিভাবক এখন মনতোষ নিকুঞ্জবাবু মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় পর মনতোষের বাড়ী গমন করেন; জমিদারের আশ্রিত পোষ্যবর্গ বলিতেন—সেখানে দাবা খেলিতে যান্, কিন্তু দুষ্ট লোকে অন্য একটা বদ্‌নাম রটাইত। কিন্তু যাহা হউক, সে কথার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে বাবুর বৈঠকখানার চলমান্ প্রসঙ্গের অনুসরণ করা যাক্।

মনোতোষবাবু এতক্ষণ ধরিয়া তাহার স্বভাব-রীতি অনুযায়ী প্রতি কথায় অল্প বিস্তর ফোড়ন দিতেছিলেন। গোপালবাবুর নিমন্ত্রণ রদ্ হইয়া গেলে, মোসাহেব-কুল-চূড়ামণি ব্যাঙের ন্যায় নিকুঞ্জবাবুর পশ্চাদ্দেশ হইতে লাফাইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং দুই করতালু মৃদু-মন্দভাবে ঘর্ষণ করিতে করিতে নিবেদন করিলেন—"বাবুমশায়, আমার একটা আর্জী আছে। আমাদের গ্রামের হরিশ মিত্রের ছেলের আস্পর্দ্ধা এখানকার বোধ হয় সকলেই জানেন; তার ম্লেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার ও নৈরাকারের কথা, বাবু, আপনিও অনেক দেখেছেন ও শুনেছেন। কলকাতার হোটেলে সে রোজ নিষিদ্ধ শ্রীরাম-পক্ষীর মাংস উদরস্থ কর্ত্ত—এ কথা অনেকেই জানে। তা'ছাড়া সমাজের চক্ষে ধুলি দিয়ে বাঁছাধন যে কত কাণ্ড করেছেন তার

ইয়ত্তা নেই। এখানে এসে চাঁড়াল, হাড়ী, মুচী, ধোপা, নাপিত, মুসলমান, যুগী, তাম্‌লি, তেলি, তাঁতী প্রভৃতি যত ছোট জাতের সঙ্গে মিশে কোদাল নিয়ে জঙ্গল কাটে, পুষ্করিণীর পাঁক্ তুলে কেরোসিন ছড়িয়ে মাছগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে. এক কোঁটা জল মুখে দেবার যো' নেই। সে দিন আমার ছেলেটার একটু পেটের অসুখ কোরেছিল ; পাত্র সায়রে আমার স্ত্রী কাপড় কাচ্‌তে গিছ্‌ল, বেটার ফিরিঙ্গি-স্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে বলেছে—খবরদার জলে নেমোনা, রোগা ছেলের গু কেচে কি গ্রাম শুদ্ধু মজাবে ?···দেখুন একবার ওদের আস্পর্দ্ধাটা ! তার উপর শুন্‌লুম্—ওরা দুজনেই চাড়ালের ভাত খায়, অন্ত্যজ জাতিদের ডেকে নিয়ে লেখাপড়া শিখায়, আবার ভণ্ডামী জাহির কর্‌বার জন্যে ভাবের বন্যে ছুটিয়ে যত হা-ঘরের ছোট লোক ব্যাটাদের নিয়ে হরি-সংকীর্ত্তন করা হয়। ওই ব্যাটা জুটে গ্রামটাকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছে ; আমাদের পশার প্রতিপত্তি, আপনার গৌরব-মান সব বুঝি রসাতলে গেল ! ও বেটাকে যেন কোন মতে নিমন্ত্রণ না করা হয় !"

অনেকেই রী-রী করিয়া এ কথায় বেজায় সায় দিয়া উঠিলেন। জমিদার বাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"জ্ঞানটাকে জব্দ কর্‌তে হবে—ও বড় বাড়্ বেড়েছে। দু-পাতা ইংরাজী পড়ে, আর দুটো পয়সার মুখ দেখে সাপের পাঁচ্ পা দেখেছে। ওর নেমন্তন্ন বন্ধ কর।" নায়েব মহাশয় বলিলেন, "উনি প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন কচ্ছেন্। গতবার কয়েকজন প্রজাকে পুণ্যের তলবে আস্‌তে নিষেধ করেছিলেন ; ও পাড়ার সর্দ্দার-খাঁরা টাকায় চার আনা কিস্তি খেলাপী সুদ দেবে না বলে' পরশুদিন আমার মুখের উপর তম্বী করে গিয়েছে। কোন ভদ্রলোকই ওঁর বাড়ীতে যান্ না--যত ছোট লোক নিয়ে ওঁদের কারবার। শুন্‌তে পাই—ওঁর স্ত্রী নাকি সন্ধ্যার পর ছোট লোকেদের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সাবু-মিশ্রী-খই-বাতাসা দিয়ে আসেন আর তাদের ছুয়ে কখনও স্নান পর্য্যন্ত করেন না।"···ইত্যাদি

শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় টিপ্পনী কাটিলেন—"ঘোর কলি—ঘোর কলি। বিষ্ণু সংহিতায় আছে—'কামকারণোস্পৃশ্য ত্রৈবর্ণিকংশন্ স্পৃধ্য'—অস্পৃশ্য জাতি যদি ইচ্ছা কোরে ত্রিবর্ণকে স্পর্শ করে, তা'হলে সে প্রাণদণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত। আর আজকাল ত্রিবর্ণ ইচ্ছা কোরেই সেই অস্পৃশ্য জাতিকে বুকে জড়িয়ে ধরছে। এদের এক-ঘরে কোরে ঘোরতর নির্য্যাতন করা উচিত !"

যাহা হউক, তৎক্ষণাৎ জমিদারবাবুর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে স্থির-নির্দ্ধারিত হইল যে, যেহেতু হরিশ মিত্রের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রটা ভয়ানক রকমের ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহাকে আগামী মহাপূজার নিমন্ত্রণের সৌভাগ্য হইতে সপরিবারে বঞ্চিত করা হইল। ভবিষ্যতে তাহার সুমতি সঞ্চারের জন্য সমাজপতিগণের পরামর্শানুযায়ী তাহাকে মিঠাকড়া ভাবে জব্দ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে !

তিন

পূজার আর দিন কয়েক মাত্র বাকী আছে। মধুমালতী গ্রামে একদিকে যেমন পূজার ধুম লাগিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর নীল-তাণ্ডব সুরু হইয়াছে। আজ তাহাদেরই মনে আনন্দ—যাহাদের ঘরে যথেষ্ট পয়সা আছে ও শরীরে সুস্থতা আছে। এরূপ লোক আজ মধুমালতী গ্রামে মুষ্টিমেয়। যাহারা প্রায় সকলেই নিকুঞ্জ বাবুর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অনুগৃহীত শ্রেণীর লোক—তাঁহাদিগের মুখেই অধীর আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর লোক—যাহাদের মাথার উপর দিয়া সারা বর্ষার জল বহিয়া গিয়াছে, দিন ভর খাটিয়া যাহাদের উদরান্নের সংস্থান নাই, রৌদ্রে তাতিয়া মাঠে হাঁটিয়া—কোদাল-কুড়ুল-লাঙ্গল চালাইয়া যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা মহাজনের গালাগালি ও জমিদারের আস্ফালন শুনিয়া শুনিয়া শিরঃপীড়া মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, ঝঞ্ঝাবাত বজ্রপাত তুচ্ছ করিয়া জ্বর-গায়ে যাহাদের পান্তা ভাতের আমানী খাইয়া কা

নামিতে হয়, যাহাদের স্ত্রী-পুত্রের নিকট শতগ্রন্থিযুক্ত কাপড়ও শাল-দোশালার ন্যায় মূল্যবান্, যাহারা অসুখে ডাক্তার পায় না—ঔষধ পায় না—উপযুক্ত সেবা-সুশ্রূষা পায় না, তাহাদিগের এ ত দুর্গোৎসব নহে—দুর্গতির উৎসব ! এ মহা সমারোহের সূচনায় তাহাদের ম্লান মুখে আজ হাসি-গান কই ?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সপরিবারে আজ দুই বৎসর কাল স্বগ্রাম মধুমালতীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পল্লীর পর্ণকুটীরে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে একান্ত-সমর্পিত-প্রাণ হইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যেই গ্রামে বেশ একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রধান দৈত্য ছিল ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা ; কালাজ্বরও তৎসঙ্গে একটু-আধটু দেখা দিতেছে। কলিকাতার একটি "পল্লীসেবক বিদ্যালয়ে" অবসরমত পাঠ সমাপন করিয়া, তাঁহার ছোট ভাই নন্দবাবু বেশ একটি ছোটখাটো ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছিলেন ; ছুটির দিন্ হইলেই গ্রামে আসিয়া দাদা ও বউদিদিকে তিনি "স্বাস্থ্যধর্ম্ম" বিষয়ে একটু একটু লেক্‌চার্ দিয়া এবং একটা ম্যাজিক লণ্ঠন্ কিনিয়া তৎসাহায্যে কিরূপ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি, কিসে নিবারিত হয়, কেমন করিয়া চিকিৎসিত হইতে হয়, রোগ-জীবাণু কাহাকে বলে, কি ভাবে সংক্রামণের হাত এড়াইতে হয়—এই সকল বিষয়ে বেশ সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। এই বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ গ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং এই বক্তৃতায় যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু কাজ হইতেছে—তাহা পল্লীর মধ্যে ব্যাধি-পীড়িতের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের এক সম্বন্ধী ঐ মহাকুমার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ; সুযোগ পাইলে তিনিও আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে শিক্ষাদান করিয়া যান্। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটি আদর্শ গোশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আট নয়টি গরু রাখা হইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে একটি মাত্র চাকর আছে ; সে রাত্রের জন্য মাত্র সামান্য খোল্ বিচালি কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখে ও সারা দিন গোচর-ভূমিতে মুক্ত বায়ুর মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া রাখে। অন্যান্য কাজ মঞ্জুলাই দেখে। গরুগুলির সেবার জন্য একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি গো-চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী।

টোট্‌কা গাছ-গাছড়ার পরিচয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে মঞ্জুলা তাহার মা'র নিকট থাকিয়া আগে হইতেই বেশ ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছেন ; এই সেবাব্রতে লাগিয়া উহার চর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। তার উপর তাঁহার আগ্রহ ও আনুকূল্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাস্ত-ভিটা-সংলগ্ন এক টুক্‌রা জমীতে একটি গার্হস্থ্য ভেষজ-উদ্যান রচিত হইল। একটি মালীর সাহায্যে মঞ্জুলা তাহার সযত্ন তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামে কাহারো কোন সামান্য অসুখ করিলে, এই স্থান হইতে লতাপাতা বনৌষধি সহজে সংগৃহীত হইয়া ব্যবস্থা ও পরামর্শসহ অভাবগ্রস্তের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইত।

ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন্ যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ও মহৌষধি—তাহা জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাতে-কলমে ভালো রকমই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য এই সময়ে অন্নবস্ত্র অপেক্ষা কুইনাইন্ বিতরণ অধিক প্রয়োজনীয়-জ্ঞানে অকাতরে কুইনাইন্ দান করেন ; কখনও বা মঞ্জুলার অগ্রজের প্রেস্ক্রিপ্সন্-অনুযায়ী-প্রস্তুত জ্বরের মিক্সচার্ প্রজাদিগকে বিলি করিয়া থাকেন। পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী হাতুড়েগণ 'উহাতে উগ্র বিষ আছে, বেশী দিন ব্যবহার করিলে মৃত্যু হইতে পারে'—এই কথা বলিয়া অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগকে নিরস্ত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে বটে, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিয়া থাকেন—"আমার প্রজারা সবাই নীলকণ্ঠ হ'য়েছে, কালান্তক বিষ হাস্‌তে হাস্‌তে হজম কোরে ফেল্‌তে পারে !"

গ্রামে ফিরিয়া মঞ্জুলার খাটুনীর আর অন্ত নাই। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বিশ্রামের অবসর থাকে না ;—আজ ও পাড়ায় নমঃ শূদ্রদের একটি মেয়ের পা

পুড়িয়া গিয়াছে, তাহার জন্য লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া বা মলম প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে, চাষাধোবাদের একটি ছেলে স্কুলের মাহীনা পায় না, টাকা যোগাড় করিয়া মাষ্টারের নিকট পঁহুছাইয়া দিতে হইবে, বিষ্ণু মাইতীর মাথায় পেয়াদা লাঠি মারিয়াছে—তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, গোয়ালাদের বউ রোগা ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার পথ্য রাঁধিয়া দিতে হইবে, পাঁচী পাটনী একখানা ছেঁড়া কাপড়ের আশায় বসিয়া আছে—যোগাড় করিয়া দিতে হইবে, ব্যায়াম-শালার কয়টি ছেলে আহার করিবে—তাহাদের সময়মত খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে, পাশের বাড়ীর একটি ভদ্র গৃহস্থের বধূ নিঃসঙ্গ অবস্থায় টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন, ঘড়ী ধরিয়া তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইয়া ও সুযোগ মত তাঁহার একটু সুশ্রূষা করিয়া আসার বিশেষ দরকার...এইরূপ সহস্র কায করিবার থাকে। মুখে তাঁহার কখনও অতৃপ্তির রেখা মাত্র নাই; চক্ষে :করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, হস্ত দুইখানি বিশ্ব-কল্যাণে আত্ম-নিয়োগের জন্য পক্ষিণীর পক্ষপুটের ন্যায় চির প্রসারিত। সেবার পরিপূর্ণ উন্মাদনায় মঞ্জুলা নিজেকে ভুলিয়াছে—এমন কি নিজের স্বামী-কন্যাকে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইয়া যায়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও কর্ম্মের কিছু কমি নাই; কর্ম্ম করিতে করিতে প্রায় তিনি স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত পান্ না—বিশেষতঃ এই সময়। গ্রামের দুই চারিজন গৃহস্থের পাঁচ সাতটি "ডাংপিটে হতচ্ছাড়া" ছেলেকে গলাইয়া পিটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া আপনায় কর্ম্মীদল গঠন করিয়া লইয়াছেন—উহাদের সহিত চাষাপাড়ার পনের কুড়িটি যুবক আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার উপর, গ্রামের কয়েকটি কলেজের ছাত্র পূজার ছুটিতে বাটী আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতি অল্প বিস্তর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, দুই একজন অগ্রগামী ছোক্‌রা মালকোঁচা বাঁধিয়া তৎপরতার সহিত কাযে লাগিয়াও গিয়াছে। এক দল ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দিবারাত্র পালা করিয়া শুশ্রূষা করিতেছে ও ঔষধ যোগাইতেছে; অন্যদল পুষ্করিণীসমূহের পৈঠা দাম প্রভৃতি পরিষ্কার করিতেছে, অথবা ইজারা-লওয়া পুষ্করিণীগুলি হইতে মাছ উঠাইতেছে; আর একদল জঙ্গল ও রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ জল-নিকাশের নালীগুলি কাটিয়া গভীর ও ক্রমঢালু করিয়া দিতেছে; আর একদল হয়ত যে সকল নিম্ন শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেপিলেরা নৈশ বিদ্যালয়ে পাঠ করে, তাহাদিগকে ভাল ভাল শিক্ষাপ্রদ ছবি, খেলনা, প্রয়োজন মত দেশী তাঁতে-বুনা কাপড়-জামা, মুড়ী-মুড়কী-বাতাসা বা অন্যান্য খাবার বিলাইতেছে. যে সকল কচি ছেলেদের বাপ মার বাড়ীতে গাভী রাখিবার সঙ্গতি নাই—তাহাদিগকে নিয়মিত দুধ যোগান, প্রভৃতি নানারূপ কায করিয়া বেড়াইতেছে। আনন্দময়ীর আগমন এই তরুণ কর্ম্ম-পাগল প্রাণগুলির আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া সূচিত হইয়া উঠিয়াছে!

দক্ষিণ পাড়ায় যাইবার রাস্তাটা বর্ষাকালে বরাবর কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়। গতবারে জ্ঞানেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই স্থানটার সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল কিন্তু এবারে শ্রাবণ মাস হইতে পুনরায় পুরাতন অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর, রাস্তার দুই পার্শ্ব এত জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, দিনের বেলায়ও অনেকে চলিতে ভীত হয়। আজ পঞ্চমীর প্রত্যূষে জ্ঞানেন্দ্রনাথের কর্ম্মী-সেনা আসিয়া কোদাল, কুড়ুল ও দা লইয়া একনিবিষ্ট ব্যগ্রতায় এই কাযের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানবাবু সে শ্রেণীর নেতা ছিলেন না, যাঁহারা অনুগামীগণকে মাছ ধরিতে জলে নামাইয়া দিয়া, নিজেরা কোঁচা দুলাইয়া ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া হুকুম করিবেন ও রগ্‌ড় দেখিবেন। তিনি নিজে যে কায করিতে দুর্ব্বলতা বা অপমান বোধ করেন, সে কায করিতে কর্ম্মীদলকে কখনও পরামর্শ দেন্ না—তা' হউক না কেন তাহারা বয়সে ছোট, জাতিতে ছোট, বিদ্যায় ছোট বা ধনে ছোট! তাই ছেলেদের সঙ্গে তিনিও আজ গাত্রে কাদা মাখিয়াছেন।

এই সেবা-ব্রতধারী শিক্ষিত ধনী-সন্তান জ্ঞানেন্দ্রনাথের মাটি-মাখা ধুলি-ধুসরিত অপরূপ মাধুর্য্য-শ্রী আজ সত্যেন্দ্রনাথের "মাটি" শীর্ষক্ কবিতাটির কয় ছত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছে :—

এই যে মাটি এই যে মিঠা
এই যে চির চমৎকার।
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা
মাটিই প্রাণের পারাবার।
মাটিই আবার প্রাণের কাঠি
মাটির মাঝে উদয় লয়;
যে মাটিতে ভাঁড্ গড়ে রে
সেই মাটিতেই মানুষ হয়!

যাহাহউক, জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত ছেলেরা অশান্ত উৎসাহে মাটি কাটিতেছে ও জঙ্গল ঝুড়িতেছে, এমন সময় কৈবর্ত্ত পাড়ার পাঁচু দাস শশব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া জ্ঞানবাবুর পদপ্রান্তে শুইয়া পড়িল, তাহার মাথার একধার হইতে রক্ত ঝু ঝিয়া পড়িতেছে, পৃষ্ঠদেশে আঘাতের চিহ্ন, দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা গেল—বেচারা প্রহারের চোটে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাহার মাথাটি কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া, একজন কর্ম্মীকে জল আনিতে ইঙ্গিত করিয়া, কাপড়ের অগ্রভাগ দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মীরা পাঁচুদাসকে ঘেরিয়া লোষ্ট্র-নিক্ষিপ্ত মধুচক্রের ন্যায় গুঞ্জন করিতে লাগিল—মুখে তাহাদের অজ্ঞাত অত্যাচারীর প্রতি অব্যক্ত ক্রোধের আভাস, চক্ষে তাহাদের সহানুভূতির সুকোমল প্রস্ফুরণ, বক্ষে তাহাদের রুদ্ধ আবেগের তরঙ্গ-হিল্লোল! তাহাদের মধ্যে দুই একজন জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া পাঁচুদাসের শুশ্রূষা করিতে লাগিল; একজন বাটী হইতে একখানা তালবৃন্ত ও অন্য এক জন একবাটি গরম দুধ লইয়া আসিল। পাঁচু কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইবার পর জ্ঞানবাবুর পদদ্বয় ধারণ করিয়া ক্ষীণ কাতর স্বরে কহিতে লাগিল, "ছোটবাবু, আমাকে রক্ষা করুন্। জমিদার বাবুর পাইক্ একটু আগে আমার বাড়ীতে গিয়ে মেরে আমায় আধ-মরা কোরে ফেলেছে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহার হাত দুইখানি পায়ের উপর হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া, উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার অপরাধ?"

পাঁচুদাস নিকটস্থ একটা জিয়ল্‌গাছে হেলান্ দিয়া বসিয়া কহিতে লাগিল, "বল্‌ছি শুনুন্ বাবু। জানেন বোধ হয়, আমি নিকুঞ্জবাবুর ভিটে-বাড়ীর প্রজা। আপনার অধীনে ও পারে যে বিঘে দেড়েক্ জমি রাখি, গাঁতা খাটিয়ে আমরা দুই ভাই মিলে তাতে ভাদুই কলাই ও সাদা আলুর চাষ করেছি। এখন কলাই তোল্‌বার আর আলুর পাকা লতা ও কলম রুইবার সময়। ভোর থেকে আমরা কাজে বেরুই, দুপুর বেলায় স্নান কোরে চারটি খেয়ে আবার মাঠে বেরুই, ফির্‌তে রাত্রি হ'য়ে যায়। পুজোর সময় বাবুর বাড়ী কয়দিন বেগার দিতে হবে বলে' কাল বিকেলে পাইক্ ডাক্‌তে গিয়েছিল—পাইনি। আজ ভোরে আমার ছোট ভাই ভুবন আগেই মাঠে বেরিয়ে গেছে, আমি তামাক খেয়ে তার পাছু নেব—এমন সময় পাইক এসে আমার হাত ধোরে মনের সাধে গালে ও পিঠে দশ বারোটা ঘুষি ও চড় মার্‌লে। বল্লে—হারামজাদা নবাবের বেটা, থাকিস্ কোথায়? বড় আস্পর্দ্ধা হোয়েছে তোর—না? কাল বিকেলে একবার এসে ঘুরে গেছি, আজ একটু পরে এলে আর ধর্‌তে পাত্তুম না। কাল হাজীর না হওয়ার দরুণ নায়েব মশায় এক টাকা জরিমানা করেছেন—এখনই কাছারীতে গিয়ে দিয়ে আস্‌বি চল্। আমি হাতজোড় কোরে বল্লুম—ভাই, আমার ত এখন ব্যাগার দেবার সময় নেই, দিন রাত্তির দুই ভাই মিলে ক্ষেতের কাজ করি—না হ'লে আমরা সারা বচ্ছর অনাহারে মর্‌ব। জরিমানার একটা টাকা এখনই দিয়ে দিচ্ছি—গিয়ে সরকারে জমা দিয়ে বলগে—আমি আজ রাত্রে নায়েবমশায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌ব। এই কথা শুনেই ত পাইক খাপ্পা হোয়েউঠে আমায় অশ্রাব্য ভাষায় গালগাল্ করতে করতে লাঠির বাড়ি এক ঘা মাথায় বসিয়ে দিলে।

আবার লাঠি তুলতে যাচ্ছিল, আমি দুই হাত দিয়ে লাঠি-খানা ধোরে মুচড়ে কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে, আপনার কাছে ছুটে আস্‌চি। আজ আর আমার অব্যাহতি নেই—নায়েবের হুকুমে আমাকে বেইজ্জত"—একাদিক্রমে এতগুলি কথা বলিয়া পাঁচু শ্রান্ত হইয়া পড়িল; একজন কর্ম্মী জলের গ্লাসটি তাহার মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ এক ভগবান্ ব্যতীত কোন পার্থিব শক্তিরই তোমাকে বেইজ্জৎ কর্‌বার সাধ্য নেই—এটা নিশ্চয় জেনো।"

অদূরে নায়েবমহাশয় দুই জন পাইক সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন—দেখা গেল। কর্ম্মীরা সকলে যেন ব্যূহ রচনা করিয়া জ্ঞানেন্দ্র ও পাঁচুদাসকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল; জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্লীহাসর্ব্বস্ব নায়েবমহাশয় উপর ও নীচেকার পাটির গুটি আট-নয় দন্তের অভাবে ওষ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া আরক্ত চক্ষে কহিলেন, "জ্ঞানবাবু, যদি ভাল চান্ ত পাঁচুকে বের করে' দিন্, নচেৎ নিকুঞ্জবাবুর কড়া হুকুম—আপনারও মাথা বাঁচানো দায় হবে।"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, চারিপার্শ্বে অনেক দূর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি দ্বিগুণ তীব্রতায় ফিরিয়া আসিল; নায়েব ও পাইকদ্বয় এই আকস্মিক অদ্ভুত হাসি শুনিয়া যেন একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল। জ্ঞানবাবু বলিলেন, "যখন এই সৃষ্টিছাড়া স্বার্থ-হারা বম-ভোলাদলের সর্‌দার হোয়েছি, তখন শির্‌দার সেজে প্রস্তুত হোয়ে আছি—জান্‌বেন্। মাথার ভয় কর্‌তে গেলে আপনাদের মত বাঘ ভাল্লুকের ভেতর কি এক দিনও বাস কর্‌তে পার্‌তুম? এতগুলো সজীব প্রাণের পাঁচীল ভেঙে আপনার মত নিষ্ঠুর পশু—পাঁচুদাসকে কখনই টেনে নিয়ে যেতে পার্‌বে না। পাঁচুদাস আপনাদেরও প্রজা, আমারও প্রজা; আপনারা তাকে মার্‌তে এসেছেন, আমি তাকে আজ বাঁচাতে দাঁড়িয়েছি। এই কয়টা লোকের মৃতদেহের স্তূপ মাড়িয়ে তবে আপনাদের ওকে ধর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে!"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতের কোঁচা কুণ্ডল দাগুলি একে একে দংশনোদ্যত বিষধরের মত হিংসায় কাঁধের উপর আসিয়া উঠিল—তাহাদের চক্‌চক্ ধারালো অগ্রভাগগুলি রূপালী জরির মত সূর্য্য-কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তিনটে কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুকে নিরস্ত্র কর্‌বার জন্য এতগুলি অস্ত্রের আস্ফালনের কোন প্রয়োজন নেই। আঘাত কর্‌বার শক্তি অপেক্ষা আঘাত সইবার শক্তিই আমাদের প্রদর্শন কর্‌তে হবে। ভাইসব, এ কাজের গোড়ায় কত কলঙ্ক মাথায় নিতে হবে—কত অপমান্ হজম কর্‌তে হবে—কত অত্যাচারের সম্মুখে বুক পেতে দিতে হবে। শেষে জয় আমাদেরই। গীতায় আছে—নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি,—সর্ব্বদা মনে রেখো!"

এই বলিষ্ঠ ছোক্‌রাদের একটা মিলিত নিঃশ্বাসে তাঁহার প্রলয়ঙ্করী প্লীহাটি যে কোন মুহূর্ত্তে ফাটিয়া যাইতে পারে—এ আশঙ্কা নায়েবের মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি মানে মানে সরিয়া পড়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। যাইবার সময় শাসাইয়া গেলেন—"আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছ, জ্ঞানবাবু। কত ধানে কত চাল শীগ্‌গিরই টের পাবে।"

চার

আজ আশ্বিনের মহা সপ্তমী! আনন্দময়ীর আগমনে নিকুঞ্জবিহারীর বাড়ীতে আজ আনন্দ-লহরী উঠিয়াছে। ঠাকুরদালানে লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে, উঠানে ছেলে মেয়েরা রঙ-বেরঙের কাপড় জামা পরিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে; মেয়ে-পুরুষের হুড়াহুড়ি, বকাবকি, তোড়-কঙ্কনের আওয়াজ, উচ্চ হাস্যরোলে প্রকাণ্ড বাড়ীখানি যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে; চাকর-বাকরেরা তামাক সাজিতেছে ও ঢালিতেছে, বাবুদের কাপড় কোঁচাইতেছে, ফায়-ফরমাইস্ খাটিতে খাটিতে তাহারা গলদ ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। সারা বাড়ী পিপীলিকাটির পর্য্যন্ত স্থানাভাব অবসর নাই।

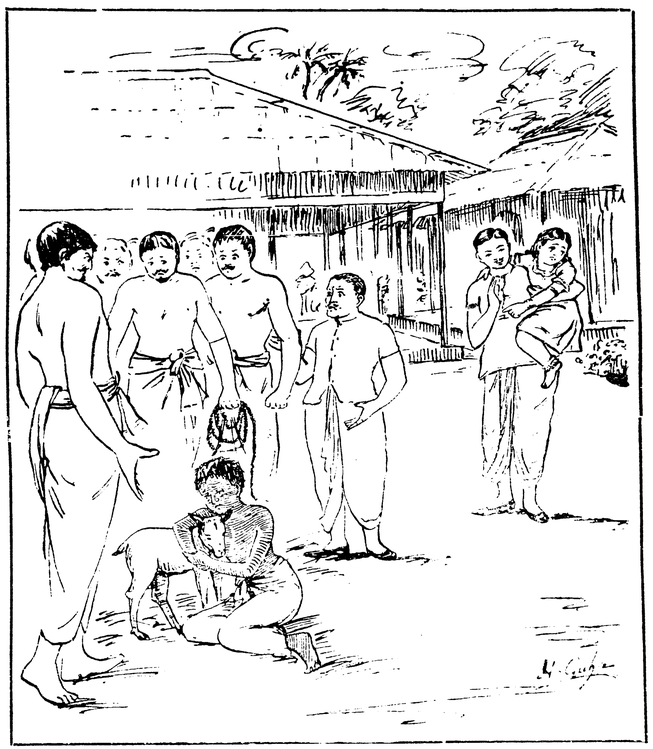

মধু চতুঃপার্শ্বস্থ যমদূত সদৃশ পাইকদিগের উপস্থিতিতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে পাঁচুর গলা জড়াইয়া ধরিল। (১৯৪ পৃষ্ঠা)

DOUBLE COLOUR PAGE
BLANK PAGE(S)

তবে সাদা কথায় অবসর বলিতে যাহা বুঝি, তাহা নিকুঞ্জবাবু ও তাঁহার পারিষদবর্গের যথেষ্ট ছিল, কারণ বিরাট সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে আমোদ-প্রমোদ ও গল্প-গাছায় কালাতিপাত করিতে-ছিলেন। নিকুঞ্জবাবু ইয়ারবর্গকে বলিতেছিলেন, "দেখ, জ্ঞান ছোক্‌রাকে বেশ রীতিমতভাবে শিক্ষা না দিলে আর চল্‌ছে না। সে সামান্য একটা তালুকদার হোয়ে আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমার লোকজনদের অপমানিত করে, আমার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে—এত স্পর্দ্ধা তার! পরশু দিনকার ঘটনায় আমার এতদূর রাগ চড়েছে যে, আমি থানায় ডায়েরী করিয়ে দিয়েছি। এবার একটা কিছু খুঁটিনাটি ঘটনা পেলেই ওর হাতে হাতকড়ী দিয়ে পুলিসে পাঠিয়ে দেব—তখন বাছাধন মজাটা টের পাবেন।"

মনতোষবাবু হাঁটুর উপর ভর্ দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "তা আর বল্‌তে! তখন বুঝবেন্ ঠ্যালার নাম বাবাজীবন্! পল্লী-সেবার বুজরুকী সুড়্‌সুড়িয়ে বেরিয়ে যাবে'খন। আরে মশায়, যত রাজ্যের ছোট লোকের ছোঁড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আড়্‌পারের নগেন রক্ষিত কবিরাজ—আমার মামাতো ভাই, বেশ দু'পয়সা পাচ্ছিল; ব্যাটারছেলে দুনিয়ার লোক্‌কে কুইনাইনের পিণ্ডি গিলিয়ে তার পসারটা একেবারে মাটি করে দিয়েছে। আবার মাগিটা শুদ্ধ নাকি কবিরাজী সুরু কোরে দিয়েছে! আমাদের ১০।১৫ ঘর মুচী প্রজা রয়েছে, তা'দের প্রায় খোরাক্ বন্ধ; ওই বেটাদের জ্বালায় গো-ভাগাড়ে আর গরু পড়ে না। কে.ন্ এক বুড়ো ব্রাহ্মণকে পুষেছে—সে সাক্ষাৎ ধম্বন্তরীর মত মরণাপন্ন গরুগুলোকে চিকিৎসা কোরে বাঁচিয়ে তুল্‌ছে! মুচী ব্যাটার' বৎসরান্তে অ মাকে এক জোড়া কোরে চটি জুতো নজর দিত, এ বছর আর দেয়নি। গরুর চাম্‌ড়াই পায় না, দেবে কোত্থেকে?"

নৃত্যগোপাল পণ্ডিত সুরু করিলেন, "আমার ছেলে নলিন্ সেদিন বল্‌ছিল—মাসখানেক পূর্ব্বে মুসলমান্‌দের একটা গরু মরেছিল, কুলাঙ্গাররা তার হাড়গুলো বের কোরে শুকিয়ে ও গুঁড়িয়ে গানে ফলকর গাছের গোড়াগুলোতে নাকি সার প্র... করেছে। ঐ সব গাছের ফল খাওয়াও যা গরুর অস্থি খাওয়াও তা! ছিঃ ছিঃ হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল!"—এই কথা বলিয়া হিন্দু-কুলধ্বজ উঠিয়া বাহিরে গিয়া গলা খাঁকারী দিয়া অনেক কষ্টে একটু নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আসিলেন্।...

এইরূপ ভাবে সেই সমাজপতিদের বৃহতী সভায় একটি সত্যনিষ্ঠ, মহাপ্রাণ, দৃঢ়ব্রত যুবকের নানা দিক্ দিয়া বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অবাধ আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতে লাগিল।

সেদিন মহানবমীর প্রাতঃকাল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহার দলবল সহ গ্রামপার্শ্বস্থ নদীতে কয়েকখানি জেলে ডিঙ্গী লইয়া কচুরী পানা তুলিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কচুরী পানা কয়দিনের মধ্যে নদীকে এমন ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, হাটুরে নৌকা পর্য্যন্ত উহার প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সর হইতে পারে না—গ্রামবাসীগণের স্নানের বিধাও যথেষ্ট হইতেছে। দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জনের নদীতে বাচ্ খেলা হয়, কিন্তু নদী পরিষ্কার করিবার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই; ঠাকুর দেখিবার ও নিমন্ত্রণ খাইবার আমোদে সকলেই বিভোর হইয়া আছে!

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী মঞ্জুলা রান্নাঘরের পাট সারিয়া, কর্ম্মী ছেলেদের জন্য জল-খাবার গুছাইয়া রাখিয়া, ঘরের বারাণ্ডায় চরকা লইয়া সুতা কাটিতে বসিয়া গেছেন। তাঁহার মাসী-শাশুড়ী অদূরস্থ ঢেঁকীশালে পাড়ার একটি অনাথা বিধবার সাহায্যে চিঁড়া কুটিতেছিলেন। মালী ফুলবাগানে ফুলের কারকিৎ করিতেছিল—তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ে বাণী হাতে-বোনা-লেস্-বসানো একটি সুন্দর রঙীন্ খদ্দরের ফ্রক্ পরিয়া এক গোছা জীবন্ত ফুলের তোড়ার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সম্মুখের খিড়্‌কীর রাস্তা দিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে পাড়ার বউ-ঝিরা ভাল ভাল সাজপোষাক পরিয়া, নৃত্য-দোদুল্ কল-কণ্ঠ শিশুদের কোলে লইয়া জমিদার-বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে। রাস্তার ধারের একটা

গাছের ডালে পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া একটা দোয়েল্ ক্রমাগত শীষ্ দিতেছিল, সরস স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া উদীয়মান্ সূর্য্য-কিরণের তেজকে বেশ উপভোগ্য করিয়া তুলিতেছিল; আজ পৃথিবীর পুঞ্জীভূত শোক-দুঃখের উপর কে যেন একটা পুলকের আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে।

ঘরর্ ঘরর্ করিয়া মঞ্জুলার চরকার অশ্রান্ত ঝঙ্কার চলিয়াছে; মিহি সুতায় লাটাই ভরিয়া উঠিতে চলিল। এমন সময় একটি ছোট ছাগল তাড়াইতে তাড়াইতে "মা ঠাক্‌রুণ" বলিয়া ক'চি গলায় ডাক্ দিয়া একটি দশ বছরের ছেলে হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাওয়ার নীচে দাঁড়াইল। চরকা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া—"কে রে মধো? আয় উঠে বোস্। দাঁড়, এইটুকু লাটাইয়ে জড়িয়ে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা কচ্ছি"—বলিয়া মঞ্জুলা লাটাই লইয়া সুতা জড়ানোয় মনোনিবেশ করিলেন। মধু দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিল না; উঠানে বসিয়া পরম তৃপ্তিতে পাঁঠাটিকে পাতা খাওয়াইতে ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

চাড়াল্-পাড়ার নদে চাড়ালের পিতৃহারা ছেলে মধু। নদেরচাঁদ নিকুঞ্জবাবুর পাইক ছিল; ও বছর পাথর-গাতির চর্ লইয়া দাঙ্গায় সে আহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া দুই মাসের মধ্যেই মারা পড়ে। দয়ার অবতার নিকুঞ্জবাবু গরীব পাইকের প্রাণের দাম কুড়ি টাকা ধার্য্য করিয়া উহার বিধবা পত্নীকে দিতে হুকুম করিয়াছিলেন, নায়েবের হাত দিয়া ঐ রাশি পঞ্চদশে পরিণত হইয়া অবশ্য অনাথার হাতে পঁহুছিয়াছিল। এক্ষণে চরকা কাটিয়া, ধান ভানিয়া, বেতের জিনিষ বুনিয়া এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথের সদাব্রতের কল্যাণে বিনা-কর্জ্জে ইহাদের সংসার চলে। গত বৎসর ছেলেটা দুই মাস ধরিয়া কালাজ্বরে ভুগিয়া মরিতে পড়িয়াছিল; মঞ্জুলার দাদা পাঁচ সাতটি ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া ইহাকে বাঁচার পথে চলিবার সামর্থ্য দান করিয়া গিয়াছেন।

মঞ্জুলা হাতের কাজ শেষ করিয়া মধোর দিকে স্নিগ্ধ নেত্রে তাকাইয়া বলিলেন, "ওরে, রোদ্দুরের মধ্যে গিয়ে বস্‌লি যে? উঠে বোস্। ওমা, আবার পাঁঠা কোত্থেকে যোগাড় কল্লি?" মধো একগাল্ হাসিয়া বলিল, "বাবুদের বাড়ী থেকে ঠাকুর দেখে আস্‌ছিলুম, পাশের আট্‌চালাটায় সাম্‌নে দেখি পাঁচ ছ'টা পাঁঠা একসঙ্গে বাঁধা রয়েছে, আর দড়ী ছেঁড়ার জন্য গলা-চেরা চীৎকার কোরে ছট্‌ফট্ কচ্ছে—এদের বোধ হয় আজ বলি দেবে। মনে বড় কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল, ইচ্ছে হ'ল দড়ীর গেরো খুলে পাঁঠাগুলোকে ছেড়ে দিই; কিন্তু চারিদিকে লোক জন—বড্ড ভয় কত্তে লাগ্‌ল। কি করি, মুখ বুঁজে খানিক ক্ষণ তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভগবান্‌কে কি কল্‌ম, তিনি যেন আমার প্রাণের ব্যথা বুঝতে পাল্লেন। এই ছোট পাঁঠাটা ফাঁস্ গলিয়ে কেমন কোরে বেরিয়ে পড়্‌ল, আমার হাতে একটা কচি কাঁঠাল পাতার ডাল ছিল—লোভে লোভে বেচারী আমার পাছু চলে' এসেছে।"

মঞ্জুলা কহিলেন, "তুই যে পাঁঠা সঙ্গে কোরে আন্‌লি বাবুরা যদি বকে?" বাল-সুলভ সারল্যের সহিত মধো অবাক্ হইয়া বলিল—"বা রে বা, আমি সঙ্গে এনেছি বুঝি, ও ত আমার সঙ্গে এল! ওর কি প্রাণে ভয় নেই ঠাক্‌রুণ? মা যদি ওর রক্ত দেখে সজ্ঞা হবেন তবে ওর গলার দড়ী আল্‌গা কোরে দিলে কেন?" এই সোজা যুক্তির প্রতিবাদ করিবার বা বাক্য বাৎসল্যময়ী মঞ্জুলার মোটেই যোগাল না; তিনি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা বেশ কোরেছিস্ যা, মাসীমার কাছ থেকে চিঁড়ে-বাতাসা চেয়ে নি খেয়ে, বাগানে বাণী আছে—তার সঙ্গে খেলা কর্‌গে ওঁরা ফিরে এলে কাছারীতে আমি পাঁঠার ন্যায্য দাম পাঠিয়ে দেব'খন্।" মধু উৎফুল্ল চিত্তে পাঁঠার ছানা কোলে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে ঢেঁকীশালের দিকে চলিয়া গেল!

শুষ্ক করিয়া পোড়াইয়া সার্ করিবার মানসে উহা কচুরী পানাগুলি ছোট ছোট গাদায় সাজাইয়া, জ্ঞানেন্দ্র নাথ সদলে জমীদারবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া আসিতেছিলেন, ছেলেরা গাহিতেছিল—

'বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলা মাতরম্।
ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্"—

এমন সময় বহির্বাটীর বারাণ্ডা হইতে নিকুঞ্জবাবু গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্ দিলেন, "জ্ঞান, শুনে যাও, কথা আছে!" জ্ঞানবাবু সদলবলে প্রাঙ্গনে ঢুকিয়া সরাসর নিকুঞ্জবাবুর সম্মুখে হাজীর হইলেন, মুখে তাঁহার নির্লিপ্ত প্রসন্নতা, চক্ষে তাঁহার নির্ভীক উৎসাহের দীপ্তি!

নিকুঞ্জবাবু কহিলেন, "দেখ জ্ঞান, হরিশ বাবুর ছেলে তুমি—তোমাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আস্‌ছি। তুমি আজ আমার বিদ্রোহাচরণ কত্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হোয়ে গিয়েছি। তুমি এ গ্রামে এসে অবধি আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করেছ; সমাজের শাসন-প্রণালী উপেক্ষা করে' ছোট লোকদের সঙ্গে মিশেছ; তাদের ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে, বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে, পুষ্করিণীতে কেরোসিন্ ছড়িয়ে, কুস্তি-মুগুর ভাঁজার আখ্‌ড়া খুলে, লক্ষীছাড়া ছেলেদের খদ্দর পরিয়ে—চর্‌কা কাটিয়ে—গান গাইয়ে একটা উদ্দাম বিশৃঙ্খলার রাজ্য গড়ে' তুলছ। সে দিন পাঁচুদাসকে আমার আইনের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। আজ আবার তোমার আশ্রিত চাড়াল্-পাড়ার এক ছোঁড়া আমার ঠাকুরের বলির পাঁঠা চুরী করে' তোমার বাড়ী লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। এ সব ব্যাপার কি বল দেখি? একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ্ বাধাতে চাও, না জেলে যেতে চাও?"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ অসংক্ষুব্ধ চিত্তে মৃদু অথচ সংহতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে যে শাস্তি দিতে আপনার অভিরুচি হয় দিন্; শাস্তির ভয়ে আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হব না। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন মুরজ-মন্দ্রে গেয়েছিলেন—

"শতেক শতাব্দী ধরে', নামে শিরে অসম্মান্ তার;
মানুষের নারায়ণে তবুও না কর নমস্কার।
তবু নত করি' আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি—
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্।
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান্।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেদিন জীমূত-গর্জ্জনে বলে' গিয়েছেন, "যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গলা দেশের একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না? কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই? আমরা কি দেখিয়াও দেখিব না? বুঝিয়াও বুঝিব না? বর্ণাভিমান্ লইয়া কি এমনি করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! উঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর। উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী, মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ!" কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সিংহনাদে গর্জ্জন করে' উঠেছিলেন, "ইচ্ছা হয়—তোর ভুঁইমার্গের গণ্ডী ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল্ দীন দরিদ্র আছিস্' বলে' তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন না। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন না হ'লে কোনও দেশ কোন কালে উঠেছে, দেখেছিস্?"... নিকুঞ্জবাবু, আমি এই মহাপুরুষদের উপদেশ-বাণী অনুসরণ কোরে চলেছি, আমি মানুষ তৈরীর মশালা বিলাচ্ছি। আমি এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে কোন বাধা-বিঘ্নকেই গ্রাহ্য করব না—নিশ্চয় জান্‌বেন! আর আপনার পাঁঠা চুরীর কথা এই প্রথম শুন্‌ছি, আগে বাড়ীতে গিয়ে না শুনে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ কত্তে পার্‌ব না।"

এই সময় মনোতোষবাবু কর্ত্তার কাণে কাণে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝ্তে পাল্লেন্ না—একবার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে হবে, গৃহিণী সচীব সখি"—নিকুঞ্জবিহারী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "অসহ্য স্পর্দ্ধা! তাহ'লে জ্ঞান, তুমি প্রকাশ্যভাবেই আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা কর্ল্লে? বেশ, পরাজয়ের ক্ষতিকে সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে' থেকো। মনোতোষ, যাও এখনিই তুমি আটজন পাইক সঙ্গে নিয়ে জ্ঞানেদের বাড়ী যাও, সহজে পাঁঠা না পাও—জোর করে' নিয়ে আস্বে। আমার হুকুম, এখনি যাও।"

মনোতোষবাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুঁকাটি বৈঠকের উপর কোনমতে বসাইয়া রাখিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পাইকের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানেন্দ্র ছেলেদের সহিত গাহিতে গাহিতে বাড়ীর দিকে চলিলেন—

"বাহুতে দাও মা শক্তি
হৃদয়ে দাও মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

বাড়ীতে পঁহুছিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেখিলেন—সম্মুখের চত্বরে মধু ও বাণী দুইজনে একাগ্রচিত্তে বসিয়া ছাগল-ছানাটিকে কুলপাতা, অরহর গাছের পাতা প্রভৃতি ভূরি ভোজন করাইতেছে—তাহাদের মুখে মধুর আতিথেয়তার এক দিব্য আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বহির্বাটির বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িয়া, কর্ম্মীদিগকে হাত মুখ ধুইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া জলযোগ সারিতে বলিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাবেন না?" জ্ঞানেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ যাচ্ছি, বাবুর লোক-জনদের হাতে পাঁঠাটাকে প্রত্যর্পণ করেই যাচ্ছি!" আর একজন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "তবে কি আপনি শিশুদের স্নেহ-ডোর হ'তে আশ্রিত ছাগ-শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে, হত্যা করবার জন্যই পাষণ্ডদের হাতে তুলে দেবেন?"

"নিজের হাতে গড়া সৃষ্টির হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলে মায়ের তৃপ্তিসাধন হয় না; যার হয়, সে মা নয়—রাক্ষসী। মৃণ্ময়ীর বুকে চিন্ময়ীর এক কণা ছ'য়াও যদি নৃত্য করে, তাহলে কিছুতেই আজ ছাগের র[ক্তে] যূপকাষ্ঠ কলঙ্কিত হবে না!"

যুবকগণ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল!

কিছুক্ষণ পরে পাইকদলকে সম্মুখভাগে আগা[ইয়া] দিয়া বীর সেনাপতি মনোতোষবাবু সভয় পদবিক্ষে[পে] জ্ঞানবাবুর বহির্বাটির সম্মুখে আসিয়া হাজীর হইলে[ন]। জ্ঞানবাবু বাণীকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "মা, তো[রা] দ.দাদের সঙ্গে জলখাবার খাবে চল।" মধু পাঁঠার [গলা] জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে কয়েকখানা বা[...] পুরিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে ছিল, তাহার [...] চাহিয়া বলিলেন, "ওরে, জমিদারবাবুদের পাঁঠা [...] দে। তোদের কাল্‌কে আমি সুন্দর একটা [...] পাঁঠা এনে দেব।" বাণী কাঁদিয়া বলিল "না বাবা, পাঁঠা দিও না। এ আমাদের সঙ্গে ভাব কোরে ফেলে[ছে], আমার সঙ্গে কত কথা বলেছে। ওকে কিছু[তেই] ছাড়্‌ব না; ওরা কেটে ফেল্‌বে!" মধু চতুঃপা[র্শ্বে] যমদূত সদৃশ পাইকদিগের উপস্থিতিতে বিন্দুমাত্র ভ্র[ূক্ষেপ] না করিয়া দ্বিগুণ বেগে পাঁঠার গলা জড়াইয়া ধ[রিল]। মনোতোষের ইঙ্গিতে একজন পাইক্ মধোর [হাত] মুচড়াইয়া তাহ'কে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পাঁঠার [গলায়] দড়ী পরাইয়া দিল, বেচারা "ম্যা ম্যা" করিয়া [বুক] ফাটা চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময় রাস্তা[য়] এক পাগল গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

"বনের মহিষ অজা—মায়ের বাছা,
মা ত সে বলি লন্ না;
যদি বলি দিতে আশ্ স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান দাও বিলাস-বাস[না]

পাঁচ

নবমী-সন্ধ্যা! জমিদারবাবুর বাড়ী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব[...] মত হাসিখুশী মুখে আজও সকলে ঠাকুর দে[খিতে] আসিতেছে। সন্ধ্যারতি এখনই আরম্ভ হ[ইবে]। পাড়ার বউ-ঝিরা ঠাকুরদালানের একপার্শ্বে [বসিয়া] জটলা করিতেছে; ছেলে মেয়েরা বাঁশি বাজাইতে[ছে],

হাততালি দিতেছে, নাচিতেছে, আছাড় খাইয়া কাঁদিতেছে, কেহ কেহ বা অন্য লোকের দেখাদেখি ঠাকুরদালানের সিঁড়ির উপর আসিয়া সরল কুতুহলে টিপ্ টিপ্ করিয়া প্রণাম করিতেছে। ঢাকীরা নিজ নিজ যন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে; পুরোহিত ঠাকুর পঞ্চ প্রদীপ শঙ্খ, চামর প্রভৃতি তদারক করিয়া হাতের কাছে গুছাইয়া রাখিতেছেন। নিকুঞ্জবাবু হুক হস্তে ঠাকুর-দালানে আসিয়া হাঁকডাক করিতেছেন। চারিদিকে হর্ষ কোলাহলের মেলা বসিয়া গিয়াছে।

মধু আজ সকালের পর একবারও ঠাকুর দেখিতে আসে নাই। পাইকের গলা-ধাক্কা ও আছাড় খাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে রীতিমত বেদনা হইয়াছে—হাত দুইটা ফুলিয়া ব্যথা হইয়াছে। আজ সে সারা দ্বিপ্রহর মায়ের কাছে শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছে এবং পাঁঠার ছানাটির জন্য অশ্রু ফেলিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়াছিলেন, কাল আর একটা পাঁঠা কিনিয়া দিবেন, কিন্তু যেমনটি যায়—তেমনটি ত আর আসে না; দশ বৎসর বয়সের মধ্যে সে কত পাঁঠা দেখিয়াছে, কিন্তু এমন নিবিড় মমতা ত কোনটির প্রতি জন্মায় নাই। সন্ধ্যার সময় সে মোহাবিষ্টের মত মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল, জননীকে বলিল "মা, আমি ঠাকুর দেখ্‌তে যাব; মা দুর্গাকে ডেকে পাঁঠার ছানাটার প্রাণ ভিক্ষা চাইব।" বিধবা জননী মঞ্জুলা-প্রদত্ত নূতন খদ্দরের কাপড়খানা কোঁচা দিয়া পরাইয়া ছেলেকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া চলিলেন্।

উৎসর্গ-করা জমিদার-বাড়ীর পাঁঠা ভুলাইয়া লওয়ায় কতখানি দুঃসাহসিক অপরাধ করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই মধুর ছিল না। আজ তাহার হৃদয়ের সমস্তখানি জুড়িয়া সেই ছোট্ট ছাগল-ছানাটির মঙ্গল-চিন্তাই জাগিয়া আছে। তাহার মা ঠাকুর-দালানের নীচে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে ঠাকুর প্রণাম করিয়া পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। মধু সরাসর ঠাকুর-দালানের উপরে উঠিয়া প্রায় প্রতিমার কোলের নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল ও বিড় বিড় করিয়া খানিকক্ষণ কি বকিল! তার পর ঘাড় ফিরাইয়া বাল-সুলভ আগ্রহে তন্ময় হইয়া ঝাড়-লণ্ঠন জ্বালানো দেখিতে লাগিল। চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিতেই পুরোহিত-ঠাকুরমহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল—এই মধোর উপর। রাগে তাঁহার শিখা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইবার উপক্রম হইলে; সম্মুখে সর্প দেখিলে গুণীন্ যেরূপ সশঙ্ক ত্রস্ততায় মন্ত্রপূত শিকড় আঁকড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া শুভ্র পৈতার গুচ্ছ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া, দীর্ঘ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, পরুষ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আরে এ চাঁড়ালের ছেলেটা ঠাকুর-দালানের উপর উঠে এসেছে যে! যাঃ, প্রতিমা শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে' গেল! দরোয়ান্‌গুলো কি কেবল মাহিনা গণতেই বহাল্ আছে? সব একেবারে শুচিভ্রষ্ট হ'ল—ছি ছি ছিঃ!" কি অদৃষ্টের পরিহাস! আজ জগত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী ব্রহ্মময়ী জননী চণ্ডালের ছেলের গায়ের বাতাস লাগিয়া অশুদ্ধা হইয়া গেলেন্!

অন্দরের দরজা খুলিয়া তন্মুহূর্ত্তেই নিকুঞ্জবাবু খালি গায়ে ভুঁড়ী দুলাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন্; মধুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার মধুময় মুখখানি ক্রোধের আগুণে রক্ত-জবার মত হইয়া উঠিল; তিনি ব্যাঘ্র-হুঙ্কারে বলিলেন, "এই সেই নদে চাঁড়ালের ছেলে মধোটা না?—এই হারামজাদাই ত আজ বলির পাঁঠা চুরী করেছিল। এখন আবার ঠাকুর-দালানে উঠ্‌তে সাহসী হয়েছে! অন্ত্যজের স্পর্দ্ধা দেখ! গোকুল সিং, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নিকাল্ দেও শূয়ার-বাচ্ছাকে—"সঙ্গে সঙ্গে প্রভুভক্ত দেশোয়ালী সেই নির্দ্দোষ সরল বাল-গোপালের কাণ ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া নীচে নামাইয়া দেউড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া গেল। মধোর মা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। হিন্দুস্থানী গালি-বৃষ্টির সহিত প্রবল মুষ্ঠ্যাঘাতের করকা-পাত সম ধারায় মা-শিশুর উপর পতিত হইতে ল্যাগিল। তাহাদের বেদনা-বিদ্ধ ব্যাকুল ক্রন্দন সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা-ঢক্কা-নিনাদে নিঃসহায় নিশ্চেষ্টতায় ডুবিয়া গেল!...

ঘড়ীতে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে; সন্ধিপূজা রাত্রি বারোটার ভিতর। বাড়ীর বৈঠকখানায় তখন পুরাদমে বাইজীর নাচ গান চলিতেছিল ও মাঝে মাঝে বীভৎস হাসির হল্লা উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গান বাজ্‌না থামিয়া গেল; আরক্তনেত্রে নিকুঞ্জবাবু বাহিরে আসিয়া ঈষৎ বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "ওরে কে আছিস্, বলির পাঁঠাগুলো নাইয়ে এখানে নিয়ে আয়!" খানিক বাদে একজন চাকর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া ভয়-চকিত কণ্ঠে বাবুর কাছে ব্যক্ত করিল, "আজ্ঞে, পাঁচটা পাঁঠাই পাওয়া যাচ্ছে না, দড়ীশুদ্ধ লোপাট!" বাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "এঁ্যা, এ কি অমঙ্গলের কথা! যা, শীগ্গির পাঁঠাগুলো খুঁজে নিয়ে আয়। নইলে আজ তোদের ধরে' হাঁড়ীকাঠে বলি দেব।" তৎক্ষণাৎ তিন চারিজন লোক হন্ত-দন্ত হইয়া পাঁঠার খোঁজে দৌড়িল।

পুরোহিত ঠাকুর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন; শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "এবার পূজোয় মহা অনর্থ ঘট্‌তে লাগ্‌ল দেখ্‌ছি! আঃ, এদিক যে পূজোর সময় অতিবাহিত হয়ে' যায়! ওরে ব্যাটারা, শীগ্গির খুঁজে আন্।" এমন সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চারিজন সঙ্গী লইয়া জমিদার ও পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিলেন, "পাঁচ্ পাঁঠাই হাজীর হ'য়েছে মশাই, আর খুঁজ্‌তে যেতে হবে না।" নিকুঞ্জবাবুর জ্বলমান ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; তিনি দন্ত-নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন, "ইয়ার্কী কর্‌বার আর জায়গা পেলে না? দাঁড়াও, কালই তোমাদের কারসাজী ভাঙ্‌ছি।" এই বলিয়া তিনি টর্‌টর্ করিয়া ঠাকুর-দালানে উঠিয়া গেলেন। পুরোহিত ঠাকুর দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিয়া মনে মনে গালি পাড়িলেন, "আরে মর্ আবেগীর ব্যাটারা, মায়ের বলি নিয়ে রঙ্গ!"

যাহাহউক, কিছুক্ষণ পরে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাটির সীমানার ধারে পাঁচটি পাঁঠাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল। যথারীতি স্নান করাইয়া সিন্দুর পরাইয়া যূপকাষ্ঠের নিকট তাহাদিগকে কড়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ক্রমে ক্রমে সন্ধিপূজা দেখিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, জনতার ভিড়ে প্রাঙ্গনে তিলার্দ্ধ ধারণেরও স্থা[illegible] রহিল না। শেষে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল, দানবীয় উল্লা[illegible] ঢাকের বাজ্‌না স্থরু হইল; চেলীর জোড় পরিয়া, এক[illegible] কৃষ্ণকায় দৈত্য সদৃশ বলিকাটা ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলে খাঁড়া[illegible] ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। স পার্ষদ নিকুঞ্জবা[illegible] ঠাকুর-দালানে বসিয়া পুরা দমে আশ্বস্তির নিঃশ্বা[illegible] ছাড়িলেন।

কিন্তু বলির সময় এক অঘটন ঘটিয়া বসিল। লোক[illegible] জনে যূপকাষ্ঠে পাঁঠা পুরিতে গিয়া দেখে—জ্ঞানেন্দ্রনাথ[illegible] সকলের অজ্ঞাতসারে ইতোমধ্যে তাহার মধ্যে মাথা দিয়া[illegible] শুইয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গী চারিজন চারি পদে ভর দিয়া[illegible] পর্য্যায়ক্রমে হাড়ীকাঠের পশ্চাতে স্তব্ধ আগ্রহে[illegible] দণ্ডায়মান্! এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্মি[illegible] রোমাঞ্চিত হইয়া গেল, বলিকাটা কসাই খাঁড়া লইয়া[illegible] ছুই পদ পিছাইয়া গেল, নিকুঞ্জবাবুর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত[illegible] বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। পুরোহিত মণ্ডপ হইতে নামিয়া[illegible] আসিয়া বলিলেন, "জ্ঞানবাবু, একি কাণ্ড?" জ্ঞানবা[illegible] হাড়ীকাঠের ভিতর হইতে হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ[illegible] নিকুঞ্জবাবুর বাড়ী তান্ত্রিক মতে দুর্গাপূজা! প্রথমে[illegible] পাঁচটি নরবলি, পরে পাঁচটি পাঁঠাবলি!" সমবেত জন[illegible] মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জবাবু ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "জ্ঞান[illegible] আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ কোরে পূজা প[illegible] কত্তে এসেছ? হিন্দু হয়ে' হিন্দু দেবীর অপমান্ কচ্ছ[illegible] যদি ভালাই চাও ত—"

জ্ঞানবাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া, অস্বাভাবি[illegible] উত্তেজনাপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আজ মায়ে[illegible] অবিচারের সম্মুখে মাথা পেতে দিয়েছি। 'আয় [illegible] সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে?' দেখ্‌ব—[illegible] মায়ের ব্যথা না মানুষের প্রথা!" গোকুল সিং ও সুমঙ্গ[illegible] সিং ব্যাপার সঙ্গীন্ বুঝিয়া সীতারাম জপ করিতে করিতে[illegible] আগে হইতেই সরিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের [illegible] পনেরো বার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়াও সাড়া পাও[illegible] গেল না।

পুরোহিত ঠাকুর উপায়ান্তর না দেখিয়া হাড়ীকাঠ হইতে জ্ঞানবাবুকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া শাস্ত্র-বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে স্থরু করিলেন। বিরক্ত হইয়া জ্ঞানবাবু কহিলেন, "আমি শাস্ত্র মানি না, যুক্তি মানি না, তর্ক মানি না; আমি মানি—সহজ বুদ্ধি, বিবেক আর প্রাণের ডাক্! সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের বুকে ছুরী বসিয়ে মায়ের পূজা—উঃ অসম্ভব! আপনার বুকের শোণিত স্নেহের উত্তাপে জ্বাল্ দিয়ে সুধারূপে নিখিল-বিশ্বের ক্ষুধা নিবারণ কচ্ছেন যে জননী, সেই জননী কিনা একটা অকলঙ্ক অসহায় ছাগ-শিশুর রক্তপান কোরে আপনার পিপাসা মেটাবেন, মা কি দানবী? শাস্ত্র-বচন শুন্‌তে চান্—তাও কিছু কিছু উদ্ধৃত কত্তে পারি"—এই বলিয়া তিনি তন্ত্র-পুরাণাদি হইতে বলিদানের বিরুদ্ধ-বাদ পূর্ণ ও সঠিক উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক বহু শ্লোক অনর্গল আওড়াইয়া গেলেন।

আজিকার এই জনমণ্ডলীর মধ্যে এমন খুব কম লোকই ছিল—যাহারা জ্ঞানেন্দ্রনাথের নিকট কোন-না-কোন প্রকারে উপকৃত বা ঋণী নহে; তাহাদের মধ্যে বেশ একটা অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-পাড়ার মুরুব্বি শ্রীযুত্ বিহারী চাটুজ্যের সদ্য-বিবাহিত বি-এ-পাশ-করা যুবক-পুত্র অগ্রসর হইয়া বুক ফুলাইয়া বলিল, "সমাজের এই কুসংস্কারের বিপক্ষে আমিও আজ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত!" কৈবর্ত্তপাড়ার কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমরা বলি চাই না, জ্ঞানবাবুর কথা শুন্‌তে চাই!" একজন ভিড়ের মধ্য হইতে বীভৎস কর্কশতায় কহিয়া উঠিল, "ওই পাষণ্ড পুরোহিতটাকে বলি দেওয়া হোক্; পাঁঠার ল্যাজ্‌টি এ জন্মে ওর মাথার পিছনে টিকি হয়ে' দেখা দিয়েছে।" কে একটি ছোকরা সরু গলায় চীৎকার করিয়া হাত তালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিল, "বলির সময় চলে' গিয়েছে। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে!" যাহাহউক, বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এ বৎসর নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতে আসিয়া মা দুর্গা একেবারে নিরামিষাশী রহিয়া গেলেন!

রাত্রি একটার সময় জ্ঞানবাবু বিজয়-ভাস্বর মুখে বাড়ীতে ফিরিয়া এক দুঃসংবাদ শুনিলেন্। সন্ধ্যার সময় মধু নিকুঞ্জবাবুর দরোয়ানের নিকট প্রহার খাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছে; হতভাগ্যের দুইটি দাঁত খসিয়া গিয়াছে, হাত-মুখ-চক্ষুর্দ্বয় ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা, অজ্ঞানবৎ পড়িয়া আছে; তাহার মা কাঁদাকাটা করিতেছে। দুইজন ছোক্‌রাকে তৎক্ষণাৎ পাশের গ্রাম হইতে 'সবে-ধন-নীলমনি' গোছের এক হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া, মঞ্জুলাকে সঙ্গে লইয়া জ্ঞানবাবু চাড়ালপাড়া অভিমুখে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া চলিলেন্।

* * * * *

বিজয়া দশমীর বৈকাল। বাবুদের বাড়ী হইতে ঠাকুর বাহির হইয়াছে—সানাইয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোকের উচ্ছ্বাস গুমরিয়া উঠিতেছে। প্রতিমা সারা গ্রাম ঘুরিয়া তবে ভাসানের জন্য নদী-তীরে আসিবে; তারপর বাচ্‌খেলা হইবে।

কল্য রাত্রি দুইটার সময় ডাক্তার আসিয়া মধুর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "অক্ষকাস্থি বা গলার হাড় (clavicle) ভাঙিয়া গিয়াছে, বাঁচা শক্ত।" সকাল হইতে মধুর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ দাঁড়াইতেছিল। একবার সে যন্ত্রনায় অসহ্য চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই নির্জীব হইয়া পড়িতেছে, কখনও বা চক্ষু মুদিয়া বিকারের ঝোঁকে বলিতেছে—"আমার পাঁঠার ছানাটা আছে ত? মা কি তাকে নিয়েছেন্? সে যদি যায়—আমিও যাব!" বেলা ৪টার সময় এই দেব-হৃদয় দরদী বালকের অপাপবিদ্ধ আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া মায়ের কাছেই উড়িয়া গেল।

পাড়া ঝাঁটাইয়া সকলে প্রতিমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছে—বাড়ীতে আর কেহ নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দুইটি কর্ম্মী সাথে করিয়া শ্মশানঘাটে আসিয়াছেন—সম্মুখে মধুর চিতা জ্বলিতেছে। এমন সময় সম্মুখের ঘাটে একখানি দুপাটি পান্‌শী আসিয়া লাগিল। তাহার মধ্য হইতে উর্দ্দি-পরিহিত একজন দারোগা—দুইজন

সিপাহী সঙ্গে লইয়া অবতরণ করিল। মধুর মা অদূরে 'আছাড়-পিছাড়ি' খাইয়া কাঁদিতেছে, মঞ্জুলা তাহাকে অনেক কষ্টে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চিন্তাগ্নি-উত্তাপে জ্ঞানেন্দ্রের অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছে, তিনি নির্ব্বাসিত-প্রায় অগ্নির দিকে শূন্যমনে তাকাইয়া আছেন; দারোগার কথায় তাঁহার চমক ভাঙিল—"জ্ঞানবাবু, আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে!"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অপরাধ?"

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দারোগা গণ্ডদ্বয় ফুলাইয়া ততোধিক নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ, শান্তিভঙ্গ, দাঙ্গাহাঙ্গাম', অবৈধ জনতা এবং পূজার পাঁঠা চুরী—"

"ওঃ আচ্ছা, কি কর্ত্তে হ'বে? হাতকড়ির দরকার হবে কি?"—বলিয়া জ্ঞানেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলেন।

দারোগাবাবু বলিলেন, "কিছু দরকার হবে না, আপনার উপর সে বিশ্বাস আছে। এখনই আমাদের সঙ্গে নৌকায় উঠে থানায় যেতে হবে। মাপ করবেন—এ আমাদের ডিউটি!"

"চলুন" বলিয়া জ্ঞানবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবেন, এমন সময় একজন কর্ম্মী দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রতিমা বাহির হবার পর থেকেই নিকুঞ্জবাবুর ভয়ানক ভেদ বমি হচ্ছে, তিনি একেবারেই নির্জ্জীব হয়ে পড়েছেন। পাশের গাঁয়ের ডাক্তারটি তিন ক্রোশ দূরে একটা ডাকে গিয়েছেন—তাঁকে পাওয়া যায়নি। অবস্থা বিপজ্জনক!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যথাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এ্যাঁ সেকি? তোমরা শীগ্গির ছুটে আমার বাড়ীতে যাও; আমার ওষুধের বাক্স থেকে কর্পূরের আরক, ডায়ারিয়া ট্যাবলেট্ প্রভৃতি নিয়ে সেখানে দৌড়াও। গ্রাম্য ডাক্তারের চেয়ে তোমরা ঢের ভাল চিকিৎসা কর্ত্তে পার্ব্বে। সাবধান! সেবা-শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তোমাদের প্রাণ দিয়েও নিকুঞ্জবাবুকে বাঁচানো চাই—"

আগন্ত যুবক ছুটিয়া চলিয়া গেল। তারপর মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া অভয়প্রদ মৃদু হাস্যে বলিলেন, "ভাবনা কি? সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে। মধুর মাকে আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে রেখো, অভাগিনীকে সাধ্যমত সান্ত্বনা দিও।" মঞ্জুলা চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মধুর মাকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া লইয়া যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দৃঢ়পদে নৌকায় উঠিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে দিকে বিজয়ার বাজনা শোনা যাইতেছিল, সেইদিকের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী, মাগো—"

[সমাপ্ত]

শিশুকে অযত্ন করিও না

কারণ

সে তোমার বার্দ্ধক্যের ভরসা, জাতির আশা, সংগ্রামের শক্তি!

স্তন-দুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য!—রুগ্না মাতার দুধ দিও না, বার্লি ও জল মিশাইয়া গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইও। দুধ খুব বেশী জ্বাল্ দিও না; নচেৎ কমলা লেবু প্রভৃতি ফলের রস কিছু মিশ্রিত করিয়া লইও। পেটেণ্ট্ ফুড ও বিলাতী দুধে অনেক সময় বাছার সর্ব্বনাশ করে।

শিশুর খাদ্য যেন টাট্‌কা ও প্রতিবারে অল্প হয়। দিনে চারিবার, রাত্রে দুইবারের বেশী দুধ দিও না। রাত্রি বারোটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কাঁদিলেও মাই খাওয়াইও না। এক বৎসরের পর আর মাই খাওয়ান উচিত নয়; আঠারো মাস বয়স হইতে একবেলা করিয়া ভাত খাওয়ানো অভ্যাস করিবে। মুক্ত বায়ু ও মৃদু সূর্য্যতাপ শিশুর শ্রেষ্ঠ সালসা!

রৌদ্র-চিকিৎসা।

আলপস্ প্রদেশের হেইসিন গ্রাম

ডাক্তার রোলিয়রের রৌদ্র-চিকিৎসালয়।

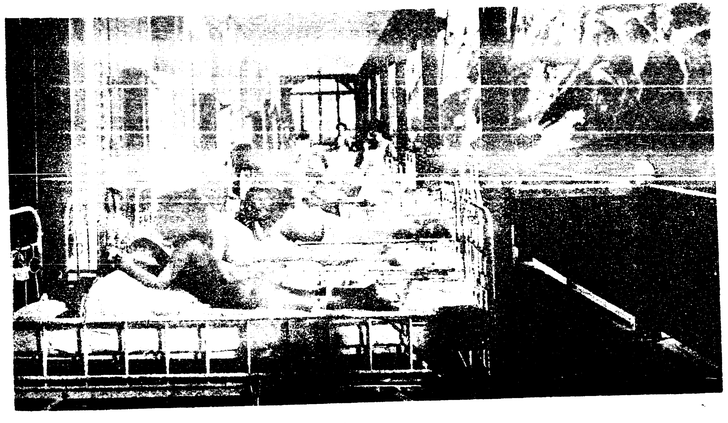

যক্ষ্মা রোগীদের হাসপাতাল।

সিপাহী সঙ্গে লইয়া অবতরণ করিল। মধুর মা অদূরে 'আছাড়-পিছাড়ি' খাইয়া কাঁদিতেছে, মঞ্জুলা তাহাকে অনেক কষ্টে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চিতাগ্নি-উত্তাপে জ্ঞানেন্দ্রের অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছে, তিনি নির্ব্বাসিত-প্রায় অগ্নির দিকে শূন্যমনে তাকাইয়া আছেন; দারোগার কথায় তাঁহার চমক ভাঙিল—"জ্ঞানবাবু, আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে!"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অপরাধ?"

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দারোগা গণ্ডদ্বয় ফুলাইয়া ততোধিক নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ, শান্তিভঙ্গ, দাঙ্গাহাঙ্গাম, অবৈধ জনতা এবং পূজার পাঁঠা চুরী—"

"ওঃ আচ্ছা, কি কর্ত্তে হ'বে? হাতকড়ির দরকার হবে কি?"—বলিয়া জ্ঞানেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলেন।

দারোগাবাবু বলিলেন, "কিছু দরকার হবে না, আপনার উপর সে বিশ্বাস আছে। এখনই আমাদের সঙ্গে নৌকায় উঠে থানায় যেতে হবে। মাপ করবেন—এ আমাদের ডিউটি!"

"চলুন" বলিয়া জ্ঞানবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবেন, এমন সময় একজন কর্ম্মী দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রতিমা বাহির হবার পর থেকেই নিকুঞ্জবাবুর ভয়ানক ভেদ বমি হচ্ছে, তিনি একেবারেই নির্জ্জীব হয়ে পড়েছেন। পাশের গাঁয়ের ডাক্তারটি তিন ক্রোশ দূরে একটা ডাকে গিয়েছেন—তাঁকে পাওয়া যায়নি। অবস্থা বিপজ্জনক!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যথাবিদ্ধ স্বরে বলিলেন, "এ্যাঁ সেকি? তোমরা শীগ্গির ছুটে আমার বাড়ীতে যাও; আমার ওষুধের বাক্স থেকে কর্পূরের আরক, ডায়ারিয়া ট্যাবলেট্ প্রভৃতি নিয়ে সেখানে দৌড়াও। গ্রাম্য ডাক্তারের চেয়ে তোমরা ঢের ভাল চিকিৎসা কর্ত্তে পার্ব্বে। সাবধান! সেবা-শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তোমাদের প্রাণ দিয়েও নিকুঞ্জবাবুকে বাঁচানো চাই—"

আগন্ত যুবক ছুটিয়া চলিয়া গেল। তারপর মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া অভয়প্রদ মৃদু হাস্যে বলিলেন, "ভাবনা কি? সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে। মধুর মাকে আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে রেখো, অভাগিনীকে সাধ্যমত সান্ত্বনা দিও।" মঞ্জুলা চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মধুর মাকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া লইয়া যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দৃঢ়পদে নৌকায় উঠিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে দিকে বিজয়ার বাজনা শোনা যাইতেছিল, সেইদিকের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী, মাগো—"

[সমাপ্ত]

শিশুকে অযত্ন করিও না

কারণ

সে তোমার বার্দ্ধক্যের ভরসা, জাতির আশা, সংগ্রামের শক্তি!

স্তন-দুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য!—রুগ্না মাতার দুধ দিও না, বার্লি ও জল মিশাইয়া গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইও। দুধ খুব বেশী জ্বাল্ দিও না; নচেৎ কমলা লেবু প্রভৃতি ফলের রস কিছু মিশ্রিত করিয়া লইও। পেটেণ্ট্ ফুড ও বিলাতী দুধে অনেক সময় বাছার সর্ব্বনাশ করে।

শিশুর খাদ্য যেন টাট্‌কা ও প্রতিবারে অল্প হয়। দিনে চারিবার, রাত্রে দুইবারের বেশী দুধ দিও না। রাত্রি বারোটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কাঁদিলেও মাই খাওয়াইও না। এক বৎসরের পর আর মাই খাওয়ান উচিত নয়; আঠারো মাস বয়স হইতে একবেলা করিয়া ভাত খাওয়ানো অভ্যাস করিবে। মুক্ত বায়ু ও মৃদু সূর্য্যতাপ শিশুর শ্রেষ্ঠ সালসা!

রৌদ্র-চিকিৎসা।

আলপস্ প্রদেশের লেইসিন গ্রাম

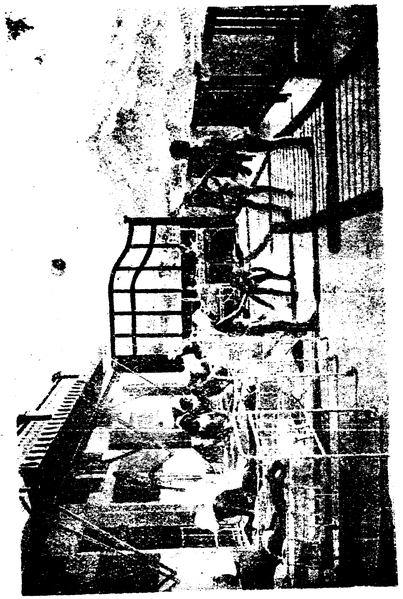

ডাক্তার রোলিয়ারের রৌদ্র-চিকিৎসালয়।

যক্ষ্মা রোগীদের হাসপাতাল।

সিপাহী সঙ্গে লইয়া অবতরণ করিল। মধুর মা অদূরে 'আছাড়-পিছাড়ি' খাইয়া কাঁদিতেছে, মঞ্জুলা তাহাকে অনেক কষ্টে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চিতাগ্নি-উত্তাপে জ্ঞানেন্দ্রের অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছে, তিনি নির্ব্বাসিত-প্রায় অগ্নির দিকে শূন্যমনে তাকাইয়া আছেন; দারোগার কথায় তাঁহার চমক ভাঙিল—"জ্ঞানবাবু, আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে!"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অপরাধ?"

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দারোগা গণ্ডদ্বয় ফুলাইয়া ততোধিক নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ, শান্তিভঙ্গ, দাঙ্গাহাঙ্গাম, অবৈধ জনতা এবং পূজার পাঁঠা চুরী—"

"ওঃ আচ্ছা, কি কর্ত্তে হ'বে? হাতকড়ির দরকার হবে কি?"—বলিয়া জ্ঞানেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলেন।

দারোগাবাবু বলিলেন, "কিছু দরকার হবে না, আপনার উপর সে বিশ্বাস আছে। এখনই আমাদের সঙ্গে নৌকায় উঠে থানায় যেতে হবে। মাপ করবেন—এ আমাদের ডিউটি!"

"চলুন" বলিয়া জ্ঞানবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবেন, এমন সময় একজন কর্ম্মী দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রতিমা বাহির হবার পর থেকেই নিকুঞ্জবাবুর ভয়ানক ভেদ বমি হচ্ছে, তিনি একেবারেই নির্জ্জীব হয়ে পড়েছেন। পাশের গাঁয়ের ডাক্তারটি তিন ক্রোশ দূরে এক ডাকে গিয়েছেন—তাঁকে পাওয়া যায়নি। বিপজ্জনক!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যথাবিদ্ধ বক্ষ বলিলেন, "এ্যাঁ সেকি? তোমরা শীগ্গির ছুটে আমার বাড়ীতে যাও; আমার ওষুধের বাক্স থেকে কর্পূরের আরক, ডায়ারিয়া ট্যাবলেট্ প্রভৃতি নিয়ে সেখানে দৌড়াও। গ্রাম্য ডাক্তারের চেয়ে তোমরা ঢের ভাল চিকিৎসা কর্ত্তে পার্ব্বে। সাবধান্! সেবা শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তোমাদের প্রাণ দিয়েও নিকুঞ্জবাবুকে বাঁচানো চাই—"

আগন্তু যুবক ছুটিয়া চলিয়া গেল। তারপর মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া অভয়প্রদ মৃদু হাস্যে বলিলেন, "ভাবনা কি? সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে। মধুর মাকে আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে রেখো, অভাগিনীকে যথাসাধ্যমত সান্ত্বনা দিও।" মঞ্জুলা চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মধুর মাকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া লইয়া যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দৃঢ়পদে নৌকায় উঠিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে দিকে বিজয়ার বাজনা শোনা যাইতেছিল, সেইদিকের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "দুর্গতি-নাশিনী, মাগো—"

[সমাপ্ত]

শিশুকে অযত্ন করিও না

কারণ

সে তোমার বার্দ্ধক্যের ভরসা, জাতির আশা, সংগ্রামের শক্তি!

স্তন-দুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য!—রুগ্না মাতার দুধ দিও না, বার্লি ও জল মিশাইয়া গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইও। দুধ খুব বেশী জ্বাল্ দিও না; নচেৎ কমলা লেবু প্রভৃতি ফলের রস কিছু মিশ্রিত করিয়া লইও। পেটেণ্ট্ ফুড ও বিলাতী দুধে অনেক সময় বাছার সর্ব্বনাশ করে।

শিশুর খাদ্য যেন টাট্‌কা ও প্রতিবারে অল্প হয়। দিনে চারিবার, রাত্রে দুইবারের বেশী দুধ দিও না। রাত্রি বারোটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কাঁদিলেও মাই খাওয়াইও না। এক বৎসরের পর আর মাই খাওয়ান উচিত নয়; আঠারো মাস বয়স হইতে একবেলা করিয়া ভাত খাওয়ানো অভ্যাস করিবে। মুক্ত বায়ু ও মৃদু সূর্য্যতাপ শিশুর শ্রেষ্ঠ সালসা!

রৌদ্র-চিকিৎসা।

আলপ্‌স্ প্রদেশের লেইসিন গ্রাম

ডাক্তার রোলিয়ারের রৌদ্র-চিকিৎসায়।

যক্ষ্মা রোগীদের হাসপাতাল।

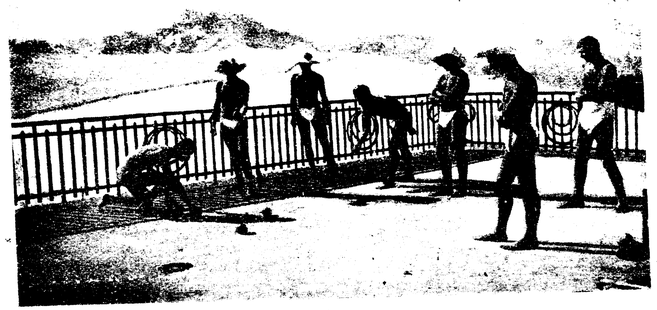

চিকিৎসালয়ের ক্রীড়াক্ষেত্র।

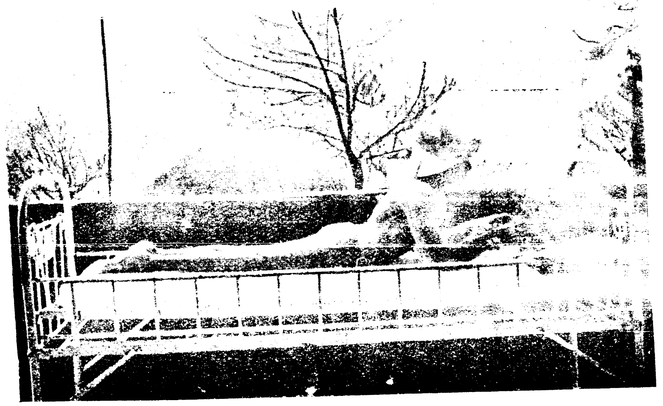

মুক্তস্থানে রৌদ্র সেবন।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩২ সাল { ৭ম সংখ্যা

শিশুর আত্মকথা

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

তোমরা কিসে উচ্চ হবে, মোদের যদি তুচ্ছ কর ?
মোরাই তোমার ভাবী পিতা—ছোট হলেও সবার বড়!
এক লহমার খেয়ালেতে আন্‌ছ মোদের ধরায় টেনে ;
বংশ রক্ষা কর্‌তে তোমরা মর্‌ছ কত দেবতা মেনে।
কিন্তু বল কি সুখেতে ধরার ধূলায় আস্‌ব নেমে ?
স্বর্গলোকের ফুলের কুঁড়ি, ছিলাম ডুবে অতল প্রেমে।
গড়্‌গড়িয়ে দুধ গিলিয়ে, যখন-তখন চুমো খেয়ে,
ইচ্ছামত ঘুম পাড়িয়ে মাসীপিসীর গান্‌টী গেয়ে,
কিম্বা নিজের মর্জ্জিমত জুতো জামায় আটক্ করে',
ভাবছ বুঝি তোমরা মোদের বড়ই যত্নে তুল্‌ছ গড়ে' ?

জন্ম হ'তে কইতে কথা—বল্‌তে ব্যথা পারি নাকো ;
সেই সুযোগে কত কষ্টেই তোম্‌রা মোদের সদাই রাখো।
কান্না শুনেই মুখের ভিতর অম্‌নি ধর স্তনের বোঁটা ;
ক্ষুধায় কাতর হই বা না হই, নাই বা থাকুক্ দুধের ফোঁটা।
কান্‌ছি হয় ত গরম লেগে কিম্বা মশার কামড় খেয়ে ;
সে কষ্ট ত ঘুচ্‌বে নাগো মায়ের বুকের পীযূষ পেয়ে।

এই ত সে দিন্ একটি শিশু দোলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল,
শেষের তলায় বিছা ছিল, হঠাৎ তারে কাম্‌ড়ে দিল ;
জেগে উঠে কাঁদ্‌ল শিশু, কর্ম্মরতা মাতা রেগে—
দুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল দোলা, হায় রে কপাল, বিষম বেগে ;
দোলন্-চাপে ক্রুদ্ধ বিছা ছোবল্ দিল ক্রমাগত ;
বিষের জ্বালায় কান্না তাহার থাম্‌ল চিরদিনের মত !

সময়েতে পাই না খেতে, আলো হাওয়ায় পাই না যেতে ;
ছোট্ট-ঘরে এক বিছানায় সাত্‌টা মানুষ ঘুমাই রেতে।
মায়ের স্তনে দুধ ঝরে না, বাপের আদর ভুলেই আছি ;
বার্লি-জল আর "ফুডের" কৃপায় গেছি মরার কাছাকাছি।
রোগে ভুগি সাধ করে' কি ? বৈদ্য বলে—বাপের দোষে ;
ধচ্ছে ঠেসে পিলে, জ্বরে, হাম্, আমাশা, পাঁচ্‌ড়া, খোসে।
কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, অত্যাচারের মধ্য দিয়ে ;
নিত্য মোদের যমের ঘরে কোন্ প্রাণে গো দাও পাঠিয়ে ?

স্বরাজ নামে পাগ্‌লা হয়ে' কোমর কসে' মিটিং কর ;
পরের দোরের ময়লা টেনে আপন ঘরে কচ্ছ জড়ো।
স্বদেশ-গাছের আম্‌রা কোরক্, জলের ঝারি হেথায় ঢালো ;
লক্ষ চিত্ত-গন্ধী-আশু দেখ্‌বে এ দেশ কর্‌বে আলো।
গার্গী, খনা, সীতা, সতীর হবে নাকো অভাব কভু ;
টাকার পিছেই ছুট্‌ছ মিছে, চিন্‌বে না গো মোদের তবু।
আঁতুড় ঘরের মধ্যে থেকেই শিশুর তরে সাজাও চিতা ;
পালন করার মর্ম্ম বুঝে মেনো সৃজন-ধর্ম্ম, পিতা।
তা'রা যেন হয় নাকো মা, আছে যারা মোদের দলে ;
সাধ না করে' সাধ্য বুঝে নামিও মোদের ধরাতলে !

রৌদ্র-চিকিৎসা

আমাদের দেশে শিশুর জন্ম হইলে তাহাকে তৈল মাখাইয়া দিবসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে রাখা হয়। শিশুপালনের এই প্রথাটি বড় সুন্দর। আজ-কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক বাঙ্গালী জননী আর এ প্রথা পালন করিতে চান না। কারণ, সূর্য্য-কিরণের যে কত গুণ তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা মনে করেন, এই প্রাচীন প্রথা কুসংস্কার মাত্র। তাঁহাদের ধারণা, যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই বর্জ্জনীয়। কিন্তু তাঁহারা যদি আজকালকার প্রতীচ্য চিকিৎসা-জগতের খবর রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতেন, তাঁহারা কতবড় ভ্রম করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিতেন, যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই মন্দ নয়, তাহার মধ্যে ভালও আছে।

প্রতীচ্য চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যকিরণের এই মহৎ গুণের সন্ধান পাইয়া চিকিৎসা-ক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়া, অঘটন ঘটাইতেছেন, চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ইয়োরোপের স্থানে স্থানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজীতে এই চিকিৎসা-প্রণালী Heliotherapy নামে পরিচিত।

ইয়োরোপীয় চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরা যে বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রতীচ্য চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বায়ু চিকিৎসার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর সূর্য্যকিরণ এখনও সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই—মাত্র কয়েক-জন চিকিৎসক অল্প কয়েক বৎসর ইহার উপকারিতা জানিতে পারিয়া ইহার সাহায্যে চিকিৎসা চালাইতেছেন। তাঁহারা সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া, তন্মধ্য হইতে চিকিৎসা কার্য্যের উপযোগী বিশেষ কিরণ-বর্ণটি বাছিয়া লইয়াছেন। যেখানে সূর্য্যকিরণ সুলভ নহে, সেখানে তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যালোক উৎপাদন করিয়া সূর্য্যালোকের অভাব মিটাইতেছেন। এই কৃত্রিম সূর্য্যালোকের যে অংশ চিকিৎসা-কার্য্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে ultra-violet light বা তীক্ষ্ণ বেগুনী আলো বলা হয়। সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া সাতটী মূলবর্ণ এবং আরও কয়েকটি মিশ্রবর্ণ পাওয়া যায়। রামধনু উদিত হইলে সূর্য্যকিরণের বর্ণ-বিন্যাস কিরূপ তাহা বুঝা যায়। ঐ বর্ণ সমুদায়ের মধ্যে যে কিরণ-রেখা তীব্র বেগুনী আলো প্রদান করে, তাহাই রোগ নিরাময় করিতে পারে।

সূর্য্যকিরণ যে জীবাণু বিনাশ করিতে সমর্থ তাহা অনেক কাল পূর্ব্বেই লোকে জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু গভীর ক্ষত, যেখানে সাধারণতঃ ঔষধ পৌঁছিতে পারে না, সে সব স্থলে সূর্য্যকিরণ পৌঁছিয়া জীবাণু বিনাশ করিতে সমর্থ, এই তত্ত্বটুকু কয়েক বৎসর হইল বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের ফলে নিশ্চিতরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণ মানবদেহের চর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহার রক্তকে এমন তেজসম্পন্ন করিয়া তুলে যে, রক্তের স্বাভাবিক রোগ-বীজাণু-নাশক ক্ষমতা বহুশত গুণ বাড়িয়া যায়। অস্ত্র-চিকিৎসা-সাধ্য যক্ষ্মা রোগ ও রিকেট্‌স রোগ আরাম করিবার পক্ষে সূর্য্যকিরণের অদ্ভুত ক্ষমতা। ক্ষত-চিকিৎসার্থও সূর্য্যকিরণ প্রয়োগ করিয়া সফলতা লাভ হইয়া থাকে। তাছাড়া দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে রৌদ্র অতীব হিতকর। এখন আবার অন্যান্য রোগে সূর্য্য-কিরণ প্রয়োগের ফল কিরূপ দাঁড়ায় সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইতেছে। এই পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

Heliotherapy বা Sun Cure বা রৌদ্র-চিকিৎসার ব্যাপারে প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কত-দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিরূপ সুব্যবস্থিত প্রণালী

অবলম্বন করিয়া তাঁহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে বিরূপ ফল লাভ করেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ডাক্তার এ, রোলিয়ার (Dr. A. Rollier) একজন সুইজার্ল্যাণ্ডবাসী বিশেষজ্ঞ রৌদ্র-চিকিৎসক। ইনি ১৮ বৎসর ধরিয়া এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। সুইজার্ল্যাণ্ডের Leysin প্রদেশে সুউচ্চ আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের উপর তাঁহার চিকিৎসাগার (Clinics) স্থাপিত। ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্তরের বায়ু ততটা বিশুদ্ধ নহে ; তাহাতে ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এবং ইয়োরোপ মহাদেশে সূর্য্য কিরণ ততটা সুলভ নহে। এই দুই কারণে ডাক্তার রোলিয়ার আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পৃষ্ঠে উচ্চ স্থানে তাঁহার চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। কারণ, এখানে ঐ দুইটী পদার্থই অপেক্ষাকৃত সুলভ। এরূপ উচ্চ স্থানে চিকিৎসাগার স্থাপনের আরও একটা প্রবল কারণ আছে। সূর্য্য হইতে রৌদ্রের পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিতে অনেকটা বায়ু-স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। এই বায়ু-স্তর সূর্য্যকিরণের কতকটা খাইয়া ফেলে। সেইজন্য সমতল ভূপৃষ্ঠে যে সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ ultra-violet rays সবটা থাকে না। কিন্তু উচ্চ স্থানে আসিতে সূর্য্যকিরণকে অপেক্ষাকৃত কম বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় বলিয়া তথায় ঐ বিশেষ কিরণটি একটু বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবল ধূলিকণা নয়, বায়ু অনেক সময়ে আর্দ্র থাকে। সেই শীকর-সংপৃক্ত বায়ুও কিয়ৎ পরিমাণে সূর্য্যকিরণ শোষণ করিয়া লয়। আবার লোকালয়ের বায়ু আর একটা কারণে অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সেটা হইতেছে ধূম। এই সকল পদার্থ সূর্য্যকিরণের কিয়দংশ খাইয়া ফেলিলে বাকীটা মাত্র মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের ভোগে আসে। এই সমস্ত উপদ্রব হইতে সূর্য্য কিরণকে যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য উচ্চ স্থানে রৌদ্র-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া থাকে। চিকিৎসালয়ের স্থানের উচ্চতা ও বায়ুর বিশুদ্ধতার উপর রৌদ্রের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

ডাক্তার রোলিয়ারের বিশ্বাস এইরূপ যে, উচ্চস্থানে রৌদ্র-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা-সাধ্য যক্ষ্মারোগ—তা সে শরীরের যে-কোন স্থানেই হউক না কেন, এবং যত দিনের পুরাতন রোগই হউক না কেন,—নিরাময় করা যায়।

পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা মনে করিতেন, অস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য যক্ষ্মারোগ স্থানীয় ব্যাধি, অর্থাৎ উহা শরীরের যে অংশে হয় কেবল সেই অংশই পীড়িত হইয়া থাকে। অধুনা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বলে জানা গিয়াছে যে, ঐ ধারণা সত্য নয়। কোন স্থানে রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীর সাধারণভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে রোগও প্রবল হইয়া থাকে। অতি শৈশব কাল হইতেই যক্ষ্মা রোগের বীজাণু মানবদেহে বর্ত্তমান থাকে। শরীরের যে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধ-শক্তি আছে, তাহারই দরুণ, এই বীজাণুগুলি শান্ত সংযত থাকে, প্রবল হইতে পায় না। কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আর তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। কাজেই রোগ প্রবল হইবার সুযোগ পায়। সংক্রামক রোগসমূহের মধ্যে যক্ষ্মারোগ শারীরিক সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। অতএব ইহার প্রকৃত চিকিৎসা করিতে হইলে কেবল স্থানিক চিকিৎসা করিলে চলে না, শরীরে সাধারণভাবে বলাধান করিয়া তাহার রোগপ্রতিষেধ শক্তি আরও বাড়াইয়া লইতে হয়। উপযুক্ত ভাবে এবং যথোচিত মাত্রায় রৌদ্র প্রয়োগ করিয়া এই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে সুসাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়। রোগীর সমগ্র উলঙ্গ দেহে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যরশ্মিপাতে এবং বিশুদ্ধ গিরি-পার্ব্বত্য বায়ু সেবনে তাহার স্বাস্থ্যের সমূহ উন্নতি হয়। সূর্য্যকিরণ কেবল যে বেদনা হ্রাস করে তাহা নয়, ইহা জীবাণু-নাশক ও রোগ-প্রশমকও বটে। ডাক্তার রোলিয়ারের চিকিৎসালয়ে বারো মাসেই চিকিৎসা চলিতে পারে এমন সুব্যবস্থা আছে।

মানুষের গাত্রের চর্ম্ম একটী অদ্ভুত জিনিস। ইহা যে কেবল শরীরের ময়লা লোমকূপের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া লয় তাহা নয় ; ইহা বাহির হইতে নানা বস্তু শোষণও করিয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজান, এবং জলকণা চর্ম্ম দ্বারা শরীরে শোষিত হয়। বায়ুতে আর একটী পদার্থ আছে—তেজ, energy। চর্ম্ম এই atmospheric energyও শোষণ করে। এই জিনিসটি যে কি তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই ; তবে ইহা আছে, এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। মুক্ত বায়ুতে অবস্থিতি করিয়া এই তেজ শোষণ করিয়া বহুদিনের শয্যাগত রোগী অচিরে বলবীর্য্য লাভ করিয়া থাকে। লেইসিন গ্রামে ডাক্তার রোলিয়ারের চিকিৎসাগারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে এইরূপে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

সকল রোগী একই ভাবে এই চিকিৎসা সহ্য করিতে পারে না। ইহা সওয়াইয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন রোগীর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সময় লাগে। ডাক্তার বিবেচনা করিয়া, কাহাকে কতক্ষণ কি পরিমাণে সূর্য্য কিরণ খাওয়াইতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

একেবারে সমগ্র দেহে সমস্ত দিন ধরিয়া রৌদ্র লাগানো হয় না। প্রথমে শরীরের সামান্য একটু অংশ অনাবৃত রাখিয়া সামান্য ক্ষণের জন্য রৌদ্র লাগানো হয়। ক্রমে ক্রমে দেহের বেশী বেশী অংশ অনাবৃত করিয়া বেশীক্ষণ সময় রৌদ্র পোহানো হয়। যে রোগী সমতল ভূমিতে বহুকাল শয্যাগত ছিল, সে এখানে আসিয়া কয়েকদিন বিশুদ্ধ বায়ু ও রৌদ্র উপভোগ করার পর তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, রক্তের তেজ বৃদ্ধি হয়, রক্তের শোণিমা (হিমগ্লবিনের) সংখ্যাধিক্য ঘটে। শরীরে বেদনা আর থাকে না।

সুবিবেচক চিকিৎসক মহাশয় রোগীদের মানসিক খাদ্যেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। নানা রকম খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্তও আছে। এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে প্রকাশিত চিত্রগুলি দেখিলেই তাহা কতক বুঝা যাইবে। ছেলেদের জন্য আবার একটী স্কুলও আছে।

রৌদ্র কেবল রোগ আরোগ্যই করে না, ইহা রোগ নিবারণও (prevention) করিয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগের বীজ প্রায় বাল্যকালেই শিশুদেহে সংক্রামিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার সময়ে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই দেহে যথেষ্ট পরিমাণে যক্ষ্মারোগের বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি ও শরীরে বলাধান করিয়া ইহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য দেহে সামর্থ্যের সঞ্চার করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু ও রৌদ্র-স্নান এ পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

সূর্য্যালোক।

সূর্য্যালোক কি ? তাহার এই রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল ? সূর্য্যালোক সমগ্র সৌরজগতের আলোকের একমাত্র উপাদান। উহা প্রকৃত পক্ষে একটা তেজ মাত্র। ইথারের মধ্য দিয়া এই তেজের তরঙ্গ আসিয়া আলো রূপে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। এই তেজ আবার ইলেক্‌ট্রণের কম্পন হইতে উদ্ভূত। জড়বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন—ইলেক্‌ট্রণ। একটী কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ইলেক্‌ট্রণগুলি থাকিয়া কম্পিত হয়। ইলেক্‌ট্রণের সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়। ঐ কেন্দ্রটি পজিটিভ তাড়িত ও ইলেক্‌ট্রণগুলি নেগেটিভ তাড়িত-গুণসম্পন্ন। কাজেই উহাদের সমবায়ে ইলেক্‌ট্রণগুলি নিয়ত কম্পিত হইতেছে। কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে কম্পনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এবং বস্তুটি শীতল হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোন ধাতুকে উত্তপ্ত করিলে তাহা লাল হয় ও তাহা হইতে আলো উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ উহা হইতে তেজের তরঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য ও কম্পনের গতিবেগ বিভিন্ন প্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গগুলি বেতার বার্ত্তাবহের কাজে লাগে। যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম, তাহার কম্পন-বেগ

তত বেশী। দৈর্ঘ্যে যে তরঙ্গ দ্বিতীয়, তাহার নাম হার্টজিয়ান তরঙ্গ। তৃতীয় তরঙ্গ তাপ উৎপাদন করে। চতুর্থ তরঙ্গ আলোর সৃষ্টি করে। আর কেবল এই তরঙ্গগুলিই মানুষের চোখে ধরা পড়ে। সূর্য্যের কিরণ এই সকল তরঙ্গ সমবায়ে উৎপন্ন। তন্মধ্যে যেগুলি আলোক উৎপাদক তরঙ্গ, যাহা আমরা দেখিতে পাই, বৈজ্ঞানিকেরা যাহাদের luminous rays বলিয়া থাকেন, তাহারা কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। একটী ত্রিকোণাকার কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ দর্শন করিলে এই বর্ণগুলি দেখা যায়। রামধনুও এই বর্ণ-সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়। উক্ত কাচখণ্ডকে spectrum বলে। ইহার মধ্যে যে সকল বর্ণ দেখা যায়, তন্মধ্যে এক প্রান্তের বর্ণ infra-red rays ও অপর প্রান্তের বর্ণ ultra-violet rays। লাল বর্ণ-টি তাপজনক। আর তীব্র বেগুনী বর্ণটি রাসায়নিক বর্ণ। আলোক-রেখাটিই ফটোগ্রাফের প্লেটে রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে চিত্র উৎপাদন করে। এই আলোক শরীরের তন্তু বা টিশুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

ঋতুভেদে সূর্য্য-কিরণের উপাদানের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তনের ফল মানবদেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ঋতুভেদে রৌদ্রের উপাদানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের শরীরে যে ductless glands আছে, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের ক্রিয়া ভাল হয়। গোরুর thyroid gland এ শীতকালের অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে আয়োডিনের পরিমাণ অধিক দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে দেহের রক্তে চুণ ও ফসফরাসের ভাগ বেশী থাকে। রক্তে এই দুই পদার্থ কমিয়া গেলেই শিশু rickets রোগে আক্রান্ত হয়। সূর্য্য কিরণ সম্পাতে এই দোষ শীঘ্রই কাটিয়া যাইতে পারে।

উদ্ভিজ্জগতের উপরও সূর্য্য কিরণের প্রভাব অল্প নহে। বস্তুতঃ রৌদ্র না পাইলে গাছপালা প্রায় বাঁচে না। যদিই বাঁচে, তথাপি রুগ্ন অবস্থায় কোনরূপে প্রাণটুকু মাত্র ধারণ করিয়া রাখে। উদ্ভিজ্জ আমাদের অন্যতম খাদ্য। উদ্ভিদ খাদ্যের সহিত আমরা সূর্য্য কিরণ ভক্ষণ করি। যে শাকসব্জি বা তরকারী যথে পরিমাণে সূর্য্য কিরণ ভোগ করিতে পায় নাই, সেরূ উদ্ভিজ্জ বস্তু আহার করিলে আমরাও আহারের সম্যক ফ প্রাপ্ত হই না—আমাদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

সূর্য্য কিরণ যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের ভোগে আসে না, রৌদ্র সেবন করিয়াও যে ক্ষেত্রে আমরা উপকার পাই না, সে সব ক্ষেত্রে খাদ্যে রৌদ্র খাওয়াইয়া সেই খাদ্য ভক্ষণে প্রভূত উপকার লাভ করা যায়। ইন্দুর-শাবকের উপর সূর্য্য কিরণের এই বিশে গুণটির চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

সূর্য্যোপাসনা।

প্রাচীন কালের লোকেরা সূর্য্য কিরণের এই মহ গুণের কথা জানিতেন। সেই জন্য অতি প্রাচীন কা হইতে সূর্য্যোপাসনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছি এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে।

মেক্সিকো ও পেরুদেশে মেগাস ও আজটেক্স নাম প্রাচীন জাতিদ্বয় সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বাইবে লিখিত আছে যে, ইস্রেলাইটস, ইজিপ্সিয়ান্স, আস জাতি, চালডিয়ান্স, সীরিয়ান ও রোমান জাতি পূ কালে সূর্য্যোপাসনা করিতেন। বর্ত্তমান কালে পার্শী সূর্য্যোপাসনা করেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু উষাস্নান সা "জবাকুসুম সঙ্কাশং" মন্ত্র জপ না করিয়া জল গ্র করেন না। খৃষ্টানদের রবিবার বা সূর্য্যবার প দিবস বলিয়া গণ্য। প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা Ae culapius সূর্য্য, ঔষধ ও সঙ্গীতের দেবতা ছিলে তাঁহার উদ্দেশে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোস (Co দ্বীপে একটী স্বাস্থ্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পুরোহিতেরা চিকিৎসক ছিলেন। নিরাময় কল্পে বাতাস, আলো ও জল এখানে ব্যবহৃত হইত।

এখন বিংশশতাব্দীর সভ্যতালোকে সূর্য্য সেবা মত না হউক, অন্য ভাবেও মানুষের পূজ্য বটে।

ঘণ্টা বাঁধিবে কে ?

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

শেষ পর্য্যায়।

সভ্যতার তিনটী মাপকাঠির (three standards of civilisation) কথা আমরা পাশ্চাত্য সমালোচকদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকি। তাঁহারা বলেন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধনবত্তার প্রাচুর্য্য অপ্রাচুর্য্যের উপরেই জাতির উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। যে জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কম, মৃত্যুহার অধিক ও ধনবত্তা (assets) কম, সে জাতি বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। এই মাপকাঠিতে আমাদের দেশের অবস্থা পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায়, জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু অতি সন্নিকট।

কর্ণেল ইউ, এন্, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালী জাতি ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া যে দিন প্রচার করিলেন, সে দিন আমাদের অনেকের মনে হইয়াছিল কথাটা একটু বেশী বলা হইয়াছে।—আমরা নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম যে, আমরা সজীব জাতি। আমাদের এই প্রমাণ-প্রচেষ্টা সাধু ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের জাতীয় মৃত্যুর দিন যে আগত-প্রায়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু কারণ নাই। এখনও বাংলা দেশে শতকরা ১০টী লোকও শিক্ষিত নন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ২ জনেরও কম। আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যেও শতকরা ৭০ জন শিক্ষিত; অথচ আমরা মহামান্য ইংরাজ শাসনে থাকিয়াও শিক্ষার গর্ব্ব করিতে পারি না।

স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ইউরোপের কোন দেশেই গড় পরমায়ুর হার ৪০ বৎসরের কম নহে—আমাদের দেশে মাত্র ২২ বছর। বিলাতে যেখানে হাজারকরা ৭০টী শিশু মরে, আমাদের কলিকাতা সহরে সেখানে মৃত্যুর হার ৩০০ শত। অথচ প্রভুরা আদর করিয়া সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—Calcutta is London of the East.

ধনবত্তার অবস্থার কথা ভাবিলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon) সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবাসীর জন-প্রতি বাৎসরিক আয় ৩০৲ টাকা। সে দিন অর্থনৈতিক কনফারেন্সে সার বিশ্বেশ্বরায়া বলিয়াছেন, আমাদের সমস্ত গরু বাছুর সানকী বদনা বিক্রয় করিলে জন-প্রতি asset দেখা যায় ১৮০৲ টাকা। আমেরিকায় ৬০০০৲ হাজার টাকা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধনের এই অসম্ভব প্রাচুর্য্য দেখিলে সত্যই মনে হয়—

"বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলির চেয়ে।"

যিনি পল্লীসংগঠন-কামী হইবেন, তাঁহাকে দেশের এই নগ্ন মূর্ত্তিটী চোখের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম ও ভাবুকতার প্রশংসা করি; কিন্তু দেশ-প্রেম যেন আমাদিগকে বাস্তবতার কথা ভোলাইয়া না দেয়। অন্ধ দেশপ্রেম সত্যলাভের অন্তরায় যেন না হয়। Sir Visveswaraya বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অবস্থাকে যে দুইটী শব্দে প্রকাশ করা যায়, উহা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। (Condition of India may be summed up in two words—poverty and ignorance)।

এক বিরাট হাহাকার দেশে উঠিয়াছে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আনন্দ উৎসব সব লোপ পাইয়াছে; লোকের রুচি ও মতি-গতি ফিরিয়া গিয়াছে। পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, চুরি, ডাকাতি সবই দারিদ্র্যেরই ফল। যতই দেশ দরিদ্র হইতেছে, ততই লোকের জীবনের আনন্দ-রস শুকাইয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই শোনা যাইতেছে, বাঙ্গালী হইয়া জন্মান বিধাতার অভিশাপ। যুবকের

চোখে আনন্দ-দীপ্তি নাই—প্রৌঢ়ের কাছে পুত্র-পরিজন ভীতির বস্তু। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সাহস পায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পল্লীগ্রামটাকে আবৃত করিয়া ফেলে, মনে হয় মৃত্যুর কাল যবনিকা পাত হইয়াছে, আর যেন জাগিতে না হয়। বাঙ্গালী-জন্মের উপর ধিক্কার আসিয়া গিয়াছে।

কর্ম্মী, আজ তোমাকে এই মৃত্যুর হাত হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। দুই শত বৎসর কেবল শুনিয়াছ—আমরা মিথ্যুক, আমাদের ইতিহাস নাই, সজীব ধর্ম্ম নাই, উন্নত আদর্শ নাই। তোমাকে আজ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে—

বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম,
বিফল নহে এ প্রাণ।

যদি জাতিকে অবসন্নতার হাত হইতে বাঁচাইতে চাও, তবে প্রাণের ভিতরে প্রথম অনুভব কর, আমরা বাঁচিবই বাঁচিব। তবে অন্যকে বাঁচাইবার বাণী তোমার প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাইবে। বিশ্বকে ডাকিয়া বল, আমি বাঙ্গালী হইয়া জন্মিয়াছি—এই আমার গৌরব—এই আমার আনন্দ। বল ভাই, আমি ইংরাজ নই,—ফরাসী নই, আমি বাঙ্গালী! তবে প্রাণের মধ্যে শক্তি আসিবে—কর্ম্মস্পৃহা জাগিবে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন "আমার মনে হয় বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি।" আমাদিগকে আজ সেই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালী দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, দেশ-সেবার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। দরিদ্র কৃষককে ডাকিয়া বল, তুমি আমার ভোটের দিনের সঙ্গী মাত্র নও,—তুমি আমার ভাই, আমার রক্ত। প্রতিবাসীকে ভালবাসিলে সেবার মধ্য দিয়া তার হৃদয় জয় করিতে পারিবে। পল্লী-সংগঠনকামীকে এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

যদি চাও প্রাণ, যদি চাও মান
আগে প্রাণ কর দান।

যুদ্ধের জন্য যেমন sinews of war—জনবল ও অর্থবল দরকার, পল্লী-সংগঠনের জন্যও তেমনি কর্ম্ম উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক। পল্লীসংগঠনও একপ্রকার যু বলিতে হইবে। পুঞ্জীভূত অভাব, দুঃখ ও দৈন্যে পূ জীবন জর্জ্জরিত, অসংখ্য দুর্নীতিতে পল্লী-সমাজ কলঙ্কি এই অবস্থার সঙ্গে কর্ম্মীকে যুদ্ধ করিতে হইবে। সে কর্ম্মীর দিক দিয়া কি কি অত্যাবশ্যক তাহার কিছু উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কর্ম্মীর প্রথমতঃ চাই পল্লীবাসীর নিকট কৃত কর্ম্মের জন্য প্রশংসা লাভ ত কথা—অনেক সময় তাঁহাকে তিরস্কৃত হইতে হই সেই অভিমানে যিনি সরিয়া পড়িবেন, অথবা দুঃখে যিনি মুসড়িয়া পড়িবেন, পল্লী-সংগঠন তাঁর নয়। "বারে বারে নিভ্‌ল বাতি—হয়ত জ্বলবে না। কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চলবে আমি অনেক স্থানে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কাজ করিয়া গ্রামবাসীর সহানুভূতির আশায় এবং সহানুভূতির পরিবর্ত্তে নিন্দালাভ করিয়া হন। এরূপ বিরক্তি অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু নাই। পল্লীজীবন এমনই দূষিত হইয়াছে যে, কার্যকে সৎ কার্য হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য উদার চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন, লোকে তাহাও হারাইয়া পল্লীবাসীর এই মানসিক অবনতির কারণ কি, বিষয়টীও তলাইয়া দেখা দরকার।

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পল্লী, village community ছিল ভারতের বিশিষ্ট এই পল্লী-মণ্ডলীগুলি এমনই কৌশলে গঠিত ছিল রাজ্য বিপ্লব অথবা অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ও নষ্ট হইত না, অথবা জন সাধারণের জীবন-যাত্রার ব্যাঘাত হইত না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, যদি রাষ্ট্রশক্তি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে দেশের সর্ব্বনা উপস্থিত হয়; আমাদের দেশে যদি সমাজ পঙ্গু হয়, দেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাও এই বিষয়টী করিয়াছেন যে, যখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অন্তর্বিপ্লবে দেশ বিপন্ন, তখনও পল্লী-মণ্ডলী

অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। মুসলমানেরা যখন বাংলার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—রাজধানী যখন বিপন্ন, তখনও নিভৃত পল্লীতে বসিয়া জয়দেব কোমল-কান্ত পদাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। এমনই সুকৌশলে গঠিত ছিল পল্লী-জীবন; সার জন সালিভন বলিয়াছেন—Considering the incessant wars and revolution in which they had been engaged for a full century after the Moghul empire broke up, it is quite a wonder that there was any Government at all. Yet in the midst of incessant fightings the civil institutions were undisturbed and almost everywhere the country was flourising.

পল্লী-মণ্ডলীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রমূলক রাজ্যের মত ছিল। পল্লীবাসীর জীবনের সমস্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সেখানে মিলিত। প্রতি পল্লীর রজক, ক্ষৌরকার, তৈলিক ও কুম্ভকার ছিল; প্রতি গ্রাম স্বরাট অর্থাৎ—Self contained ছিল। Sir Charles Metcalf লিখিয়াছেন:—The village communities are little republics having really everything they want within themselves. Dynasty after dynasty tumbles down; revolution succeeds to revolution but the village communities remain the same. The union of village communities each one forming a little separated State in itself, has, I conceive, contributed more than any other cause to the preservation of the people of India through all revolutions and changes which they have suffered and it is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of great portion of freedom and independence,

পল্লী সমাজের এই সংহতি শক্তি অথবা solidarity ভারতকে রক্ষা করিয়াছিল; প্রতি গ্রামবাসী অপরের জন্য নৈতিক দায়িত্ব বোধ করিতেন; একের অভাব ও অস্বাচ্ছন্দ্য অপরকে সহ্য করিতে হইত। প্রত্যেকে পরের জন্য বেদনা অনুভব করিত। আজ আমরা পল্লীবাসী স্ব-স্ব-প্রধান ও আত্মসুখান্বেষী হইয়াছি বলিয়া যে দুঃখ করি তার জন্য দায়ী কে? সমাজের সেই গঠন আর নাই—এক মহা বিপ্লবে ভারতীয় সমাজতন্ত্র ভগ্ন হইয়াছে। সে প্রীতির বন্ধন আর নাই—সে সামাজিক দায়িত্ব-জ্ঞান লোকের লোপ পাইয়াছে—পল্লীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়া দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। Mr. G. Adams C.S. তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ East and Westএ লিখিয়াছেন যে, সমাজের প্রতি লোকের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পাওয়ার ফলেই স্বার্থত্যাগ করিবার মত উদার মনোবৃত্তিও লোকের আর নাই। মিঃ এডামস্ লিখিয়াছেন—

In the earlier days each member of the commune was bound up by his own self interest to subordinate his personal desires to the general interest of the community. In the new days he began to assert his own private desires and interests because he has nothing to gain by suppressing them. The joint and united action of the community was no longer necessary for his protection from outside enemies and he no longer felt himself dependent on the good will and sympathy of his neighbour, so he was less and less inclined to give in to them individually or as a body in any matter on which his private interests were opposed to theirs." এইরূপে গ্রামবাসীর মধ্যে ঈর্ষা, দলাদলি ও স্ব-স্ব-প্রাধান্য আসিয়া দেখা দিল। দলাদলি

আসিল—হিংসা দ্বেষে পল্লী-সমাজ দূষিত হইল। জাতীয় জীবনের প্রতি মমত্ব বোধ গেল—উচ্চ ও মহান্ প্রবৃত্তিগুলি একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। আজ আমরা তাই পল্লী সমাজে একদল লোক দেখিতে পাই, তাহারা পরস্পর একত্র বাস করিলেও মনের মধ্যে তাহাদের কাজে অপরের প্রতি প্রীতি ও সদ্ভাব নাই। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, পল্লী সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়া একদল স্ব-স্ব-প্রধান লোক দেখা দিয়াছে—তাহারা একত্র বাস করিলেও কেহ কাহারও প্রতি মমত্ব-বোধ-সম্পন্ন নহে ঃ—The village organism has disintegrated into a multitude of disunited individuals living, it is true, in mutual proximity but unconscious of their common interests.

এ কথা সকলেই জানেন যে উদার মনোভাব পরাধীন জাতির মধ্যে থাকিতে পারে না। দারিদ্র্যের ফলে চিত্তবৃত্তিগুলি নীচ হইয়া যায়—দাদাভাই নৌরজী বলিয়াছেন—With material wealth go also the wisdom and experience of the country. জীবনযাত্রার কঠোরতা ও দুর্ম্মূল্যতা যত বাড়িতেছে, আয়ের পথ যতই সংকীর্ণতর হইতেছে, জাতির মধ্যে ঘুষ লওয়ার প্রবৃত্তি অথবা ঠকাইবার ইচ্ছা ততই বাড়িতেছে। "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ ও অনশনে তনু ক্ষীণ এই বুভুক্ষু জনসাধারণের নিকট উচ্চ, মহান ও উদার মনোবৃত্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র। এখনও সদাচারী লোকের অভাব হয় নাই, সে আমাদের জাতির পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। এই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ও বিদেশী শাসনে উচ্চ মনোবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক নহে। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে—পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ ও মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। যাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের ও বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনি ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। জাতীয় গুণের হইতেছে না।"

তাহা হইলে দেখা গেল যে, পল্লীবাসীর সংকীর্ণ পরস্পরে বিশ্বাসের অভাব ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে নানা কারণে এই মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। দুঃখ করিয়া কি হইবে যে, আমাদের সৎকাজেও দোষ ধরে। আমাদিগকে আজ ধীরে ধীরে গ্রামবা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের কর্ম্ম, চরি মাহাত্ম্য ও সর্ব্বোপরি আমাদের কর্ম্ম-নিষ্ঠার সহিত তাহারা পরিচিত হইবে তখন এই অবিশ্বাসের তাহাদের থাকিবে না। তাই বলিতেছিলাম যে, ধৈর্য্য চাই—কাজে লাগিয়া থাকা চাই।

অনেকে বলেন যে কর্ম্মীদের মধ্যে আত্মত্ প্রয়োজন। কর্ম্মীরা নাকি ঠিকমত তৈরী হন তাই কাজও অগ্রসর হইতেছে না। কথা প্রণিধান-যোগ্য।

আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, আত্মম্ভরিতা ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা অ সময় কার্য্য পণ্ড করিয়া দেয়। ভারত যদি উদ্ধার আমার দ্বারাই হোক্ নতুবা ভারত রসাতলে যাউ এরূপ মনোভাব আমাদের অনেকের মধ্যেই অ আছে। গ্রামে কাজ করিতে যাইয়া আমরা অ সময় অভীষ্ট কাজ নিজের স্বভাবের দোষে নষ্ট ক দিয়া থাকি। যদি কেহ আমাদের কথায় আপত্তি অথবা যদি কোন ভাবে আমরা দেখি যে, আমাদের থাকিল না, অমনি অগ্নিশর্ম্মা হই—গ্রামের লো নিমকহারাম বলি। বামুন কায়েতেরে, কায়স্থও কথামত কাজ করিতে লজ্জা ও অপমান বোধ শুধু তাহাই নহে; অনেক সময় রীতিমত বাধা একত্র কাজ করিবার মত উদারতা আমাদের বড় কথায় কথায় মন কষা-কষি, কথায় কথায় আরম্ভ ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমরা সবাই অপরকে বুদ্ধিহীন মনে করি—এই ভাব আমাদের মজ্জাগত। আপনি বিশেষজ্ঞ হইয়াও যদি একটা কথা বলেন, একদল পল্লীতে আছেন তাহারা ফুৎকারে সব উড়াইয়া দিয়া বলিবেন—এ সব বুজরুগী। আত্মম্ভরিতা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে—ক্ষমতাপ্রিয়তা আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যেও এত বেশী যে, কেহ একটু বাধা দিলেই অসহিষ্ণু হই—মনোভঙ্গ হই এবং কাজ ছাড়িয়া দিয়া বলি—"ইহাদের জন্য কাজ করা মূর্খতা।" শুধু ইহাই নহে—দল পাকাইয়া অনেক সময় নিজের সাধের কাজটিকে মাটি করিয়া দিতেও আমরা দ্বিধা বোধ করি না। একদিকে ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা ও অপর দিকে দলগত প্রাধান্য লাভের চেষ্টা—উভয়ই পল্লীতে লক্ষ্য করিয়া থাকি। যদি বা সৌভাগ্যক্রমে গ্রামে একটী দল গড়িয়া উঠে, কিছুদিন পরেই দেখা যায়, তাহারা এতই ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, অন্যে তাহাদের কার্য্যে যোগ না দিলে তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধ দলকে তাচ্ছিল্য করে, সময় অসময়ে টটকারী দেয়, তাহাদের মূর্খ, স্বার্থপর ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। এই মুরুব্বিয়ানার ভাব আমাদের মধ্যে বড় প্রবল। লোকে যদি তোমার কার্য্যকে গৌরবের চক্ষে না দেখে, অথবা জানিয়া শুনিয়াও তোমাদের বাধা দেয়, তাহাতে যদি তুমি অসহিষ্ণু হও, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ কর, তাহাতে ত কেবল শত্রু সৃষ্টি হইবে—তোমার বিপক্ষে একটী দল গড়িয়া উঠিবে। অনেক গ্রামে দেখা যায় যে, যদি একদল লোক সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া একটা স্কুল করেন, এবং অন্য দলকে না ডাকিয়া তাচ্ছিল্যভরে তাহাদের মতামত অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সেই অবমানিত দল আগুন দিয়া স্কুলঘর পোড়াইয়া দেয়—বেনামী চিঠি দিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য বন্ধ করিতে অনুরোধ করে। এইরূপে সংগঠন-কামীর অসহিষ্ণুতা, সংসারানভিজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা কত গ্রামে কত আরব্ধ ও শেষপ্রায় কার্য্য পণ্ড করিয়া দিয়াছে, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই জানেন। পল্লীসংগঠন-কামী যেখানেই দেখিবেন যে তাঁর মতামত কেহ পছন্দ করিতেছেন না, তখনই তিনি সরিয়া দাঁড়াইবেন; ব্যক্তিগত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া দেশ কল্যাণের জন্য নিজেকে দূরে রাখিবেন। কাহাকেও আকারে ইঙ্গিতে তাচ্ছিল্য করিবার প্রয়োজন নাই। কার্য্য-মাহাত্ম্যে যদি গ্রামবাসী আকৃষ্ট না হয়, ধীরে ধীরে কাজ করিয়া যাইতে হইবে; একদিন না একদিন সকলে একত্র হইবেই।

আর একটী দুর্ব্বলতা আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। সেটী সর্ব্বদা পর-প্রত্যাশা ও পরের মুখের দিকে সাহায্যের জন্য চাহিয়া থাকা। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যে পল্লীবাসীর সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করাও যেমন ভুল ও অসঙ্গত, তেমনি আরব্ধ কার্য্যে সরকার অথবা ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড ও ইউনিয়ন-বোর্ড সাহায্য না করিলে কাজ চলিবে না, এরূপ মনোভাবও ঠিক নহে। গ্রামবাসীকে ধীরে ধীরে দলভুক্ত করিতে হইবে—তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদের দ্বারাই কাজ করাইয়া লইতে হইবে।

অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, কর্ম্মীরা চালাকী দ্বারা বড় বড় কাজ করিতে চান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, চালাকী দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। মনে প্রাণে বিবেচনা পূর্ব্বক, নিজের সামর্থ্য ও শক্তির পরিমাণ অনুমান করিয়া কাজে নামিতে হইবে। আন্তরিকতার সহিত কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে; যে বিষয় আমার নিজের জানা নাই অথচ অন্যের সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে, সে সব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাহায্য লইতে হইবে। এরূপ আশা করা অন্যায় যে আমি একাই সব কাজের যোগ্য। আর যোগ্যতা থাকিলেই বা কি? গ্রামের দশজনকে ন্যায্য কাজ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার আমাদের কি যুক্তি আছে? সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, একা একা সকলকে উপেক্ষা করিয়া অথবা সকলের সাহায্য না লইয়া গ্রাম সংগঠনের চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠান কখনও গ্রামে স্থায়ী হইতে পারে না, যাহার ভিত্তি সাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, গ্রামের জমিদার গ্রামবাসীর জন্য অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, অথচ গ্রামবাসী উহার

সুযোগ ও সুবিধা লইতে অনিচ্ছুক। ইহার কারণ কি? যে জিনিসটী আমার নিজের আগ্রহে ও সহযোগিতায় তৈরী হয় নাই, উহা কখনও আমার প্রাণের বস্তু হইতে পারে না; উহার উন্নতির জন্য আমার বাস্তবিক আন্তরিক আগ্রহ থাকাও সম্ভব নহে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, জনসাধারণকে বাদ দিয়া যে সব প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়া হইয়াছে, তাহার কোনটীই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। আমি অনেক যায়গায় দেখিয়াছি যে, কোন মহাপ্রাণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বেশ ভাল ভাল কাজ করিয়া দিয়া যান; অথচ তার কোনটীই ঐ কর্ম্মচারীর স্থান ত্যাগের পর বাঁচে না। ইহার একমাত্র কারণ জনসাধারণ ঐ প্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে না। আবার অনেক যায়গায় দেখা যায়, কর্ম্মী একাই অর্থ সংগ্রহ ও কাজের ব্যবস্থা সব করিয়া একটা অনুষ্ঠান করেন, অন্যকে ডাকেন না। ঐ অনুষ্ঠানটী কর্ম্মীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত দাঁড়ায়। গ্রামের লোকে সর্ব্বদাই বলে, এটা সরকারদের স্কুল, ওটা বাঁড়ুয্যেদের ঔষধালয়, অর্থাৎ তাহাদের উহা কিছুই নয়।

জনসাধারণের অর্থে—তাহাদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় যে কর্ম্মের সূচনা হয়—জনসাধারণের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া উঠে, সেই সকল অনুষ্ঠান কখনও সহজে নষ্ট হয় না। যে সকল অনুষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের অর্থে ও ইঙ্গিতে চলে, তাহা কখনও সাধারণের বস্তু হইতে পারে না। আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাই বলিয়াছেন—"এক পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গভর্ণমেণ্টের আফিসে গড়া হইতে চলিল। যদি ফল বিবেচনা করা যায়, তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃ প্রদত্ত নহে, যাহা গভর্ণমেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎ পদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে। এইরূপে যে পঞ্চায়েৎ গ্রামের বলস্বরূপ ছিল, সে পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে।" এ কথাগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও যেমন খাটে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে গ্রামবাসী আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করার কথা শুনিলেই, প্রথমে অবিশ্বাস, পরে বিদ্রূপ করে ও শেষে বাধা দেয়। ইহার কারণ এই যে, আমরা বহুবার তাহাদের বিশ্বাস করিয়াছি। আমরা অনেক কাজ আরম্ভ করি শেষ করি না—বহু কাজ পরস্পরের মনোমালিন্যের করিয়া ফেলি, সাধারণের অর্থের হিসাবপত্র দিতে পারি না। কাজেই জনসাধারণও আজ বিশ্বাস করে না। দোষ তাহাদের ততটা নয়—আমাদের।

আজ যিনি এই বিরাট কাজে নামিবেন, তাঁকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ধীর হইতে হইবে। কর্ম্মী হওয়া শক্ত পরীক্ষার কথা। নেতা অনেক পাওয়া যায়, কর্ম্মীর বড় অভাব। নেতা হওয়ার আশা—নাম প্রভৃতির আশা কর্ম্মীকে ছাড়িতে হইবে। নেতা হওয়া দুঃখ,—নেতা হওয়ার বড় গভীর দায়িত্ব; তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"যিনি হুকুম তামিল করিতে পারেন তিনিই করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।

"শিরদার ত সারদার"—মাথা পেতে দিতে নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা চাই, তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

নেতা কি বানাতে পারা যায়? নেতা লিডারি করা বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—লোকের মন যোগান। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা আদৌ না, তবে লিডার।"

কর্ম্মীর প্রথমতঃ চাই—আন্তরিকতা। গুরুগোবিন্দের মত তাঁহাকে বলিতে হইবে

"এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।"

কর্ম্মী যেদিন দেখিবেন তাঁর নিজের ভিতরে ডাক আসিয়াছে, সে দিন বাহির হইয়া পড়িবেন। কর্ম্মীর দ্বিতীয়তঃ চাই নির্ভীকতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় তাঁহাকে বলিতে হইবে—যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধি আবশ্যক তাহা আমার নাই।" নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান করিয়া বিপদ ও দুঃখকে ভ্রূকুটি দেখাইয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কর্ম্মীর হৃদয়বত্তা চাই—কৃতকর্ম্মতা চাই। কাজ করিতে করিতেই কার্য্যশক্তি বাড়িবে। পরের জন্য ও দেশের জন্য কাজ করিতে গেলে নিজের চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইবে। ধীরে ধীরে লোকে কার্য্য-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া দলভুক্ত হইবে। একদিন যাহারা বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল; তাহারাই প্রশংসা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ কর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিয়াছেন—

"দুইটী জিনিস হইতে বিশেষ সাবধানে থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।"

আমরা যখন দেশের জন্য কাজ করিতে যাইব, তখন আমাদিগকে নিস্পৃহ চিত্তে কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে। বাধা বিপত্তি পদতলে দলিত করিয়া কর্ম্মপথে চলিতে হইবে। গ্যারিবল্ডীর সেই অমর বাক্য সকলকে প্রাণে প্রাণে স্মরণ করিতে হইবে—যখন কর্ম্মী নেতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—এই কার্য্যের জন্য তুমি আমাদিগকে কি দিবে? নেতা উত্তর করিবেন কি দিব? দিব—দুঃখ, দিব—অনাহার, দিব—শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, দিব—তৃষ্ণা, দিব—বিনিদ্র রজনী, দিব—দীর্ঘ অভিযানে ক্ষত বিক্ষত পদতল, দিব—সীমাতীত, সংখ্যাতীত ক্লেশরাশি, আর দিব মহৎ কার্য্যের ফল—বিজয়-গৌরব।

"What will you offer?" they asked. Offer! I offer you hardship, hunger, rags, thirst, sleepless nights, footsores in long marches, privations innumerable and victory in a noble cause.

দেশ-সেবার পুরস্কার দেশ-সেবা। সত্যপ্রিয়তা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত আমাদিগকে কর্ম্মে অবতীর্ণ হইতে হইবে—দুঃখ দৈন্য, নিন্দা প্রশংসা, জয় পরাজয় পথিমধ্যে বহুবার ভীতি প্রদর্শন করিবে, তথাপি লাগিয়া থাকিতে হইবে। সকল কর্ম্মীকে কবির কথায় বলিতে হইবে—

(মোরা) মঙ্গল কাজে প্রাণ,
আজি করিব সকলে দান;
(মোরা) লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য-গান।
জয় জয় মঙ্গলময়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু অশুভ চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু অশুভ কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময়।

[লেখক প্রণীত পুস্তক "পল্লী-সংগঠন" পাঠে পাঠক অনেক জ্ঞাতব্য কথা পাইবেন। প্রাপ্তিস্থান—স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ। মূল্য চারি আনা।—সম্পাদক]

স্বাস্থ্যচর্য্যা

[শ্রীচক্রধর সাহা]

আমরা ইচ্ছা করিলে জীবনকে সুদীর্ঘ ও সুখপূর্ণ করিতে ও জরা, মৃত্যুকে পিছাইয়া রাখিতে পারি। চেষ্টা করিলে, ইচ্ছা থাকিলে, শরীর, মন ও আত্মা নিয়ত স্বভাবের শুভ পরিবেষ্টনের মধ্যে, যথাসম্ভব সাত্ত্বিক বাতাবরণের শান্তিময় হিল্লোলে অমৃতধামের যাত্রীরূপেই জীবন-পথে পরিচালিত হইতে পারে। আর যদি প্রতি নরনারী সতত যত্নের সঙ্গে তাহারই সুব্যবস্থা করিতে পারে, তবে রোগ, জরা ও মৃত্যুকে বাধা প্রদান করতঃ বহু পশ্চাতে রাখিতে পারে। সর্ব্বদা শুভবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণায় জীবনকে সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে স্থির ও দৃঢ় পদে পরিচালনা করা, অর্থাৎ দেব ভাবের মধ্যে জীবন যাপন করাই মানুষের প্রকৃত নিয়তি। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রতা, আমিত্বের ভ্রান্ত জ্ঞান এবং দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত হিংসা, বিদ্বেষ, আলস্য, জড়তা প্রভৃতি যখন আমাদের জীবনের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠে, তখন আমরা সেই সমস্ত পশুভাবের বিরুদ্ধে সবলে দণ্ডায়মান হইতে চাহিলেই মানসিক ও শারীরিক শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। তখনই আমাদের দেবভাব সমূহ আমাদের সহায় হয়। সেই মুহূর্ত্তে সবলে শারীরিক ও মানসিক কর্ম্মশীলতার সঙ্গে দৃঢ় পদে যদি আমরা বাধা প্রদান করিতে না পারি, তবে আমাদের পরাজয় অর্থাৎ দেবভাবের হ্রাস ও পশু-ভাবের প্রাধান্য আসিয়া পড়িবে। সঙ্কট কালে আমাদের মানবভাবকে যদি দেবভাবের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া লইতে পারি, তবে আমরা জয়ী হইব। এটী পরীক্ষিত সত্য। জীবনে কার্য্যতঃ যাহা ঘটে, ধীর চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে তাহাই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ অথবা ত্যাগ করিয়া মৃত্যু ও অমৃতের সংঘর্ষের মধ্যে অমৃতকেই বরণ করিতে, এবং অমৃতেই জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট থাকিলে, আমরা নিশ্চিতই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ ও জগতে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব।

শারীরিক স্বাস্থ্য অব্যাহত না থাকিলে মানুষ সংসার কিম্বা সমাজ কিছুরই সেবা করিতে সমর্থ হয় না। অসুস্থ দুর্ব্বল-দেহ লোকেরাও সংসার পালন ও সমাজ সেবা করিয়া থাকে ও করিবে। কিন্তু সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া জীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করিতে পারিলে, অতি অল্প সময়ে ও অল্পায়াসে মানুষ বহু কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং দেহ সুস্থ ও সবল রাখার একটী লাভ এই যে, কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা অবলীলাক্রমে বেশী পরিমাণ খাটিতে ও সফলতা লাভ করিতে পারিব, অসুস্থ ও দুর্ব্বল দেহে তাহা পারিব না। বরং আমাদের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। রোগ-বীজ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, বা দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাথা তুলিবার সুযোগ পাইলে ভোগাভোগ নূতন ভাবে আরম্ভ হইয়া হয় তো চিরদিনের জন্য কর্ম্মীকে অক্ষম করিয়া রাখিবে। তখন তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ তো পড়িয়া থাকিবেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে রোগারোগ্যের জন্য অর্থব্যয় ও পরমুখাপেক্ষী করিতে হইবে। পরিবারবর্গের গৃহ-কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। সকলেই রোগীর সেবায় অল্পাধিক সময় দান না করিয়া পারিবে না।

পক্ষান্তরে, যাহারা সুস্থদেহ, তাহারা অনায়াসে নিজের হস্ত, পদ ও বুদ্ধির সাহায্যে খাটিতে পারিলে, যেমন কাজও অল্পায়াসে ও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইতে থাকিবে, পরিবারের অন্য কাহাকেও তাহার জন্য বিব্রত থাকিতে হইবে না। আপনাপন পথে সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিয়া পরস্পরের সহকারিতায় সংসার ও সমাজের বলাধান সাধন করিতে পারিবে। রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ ও অর্থ দ্বারা পারিশ্রমিক প্রদানে তাহার সন্তোষ উৎপাদন চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে

হইবে না। সেই অর্থে অত্যাবশ্যক পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যে সাহায্য দান করিতে পারিলে সকল দিকেই শুভ ফল ফলিবে।

সুস্থ দেহেই যে সুস্থ মনের বাস, এটি একটী চিরাগত অবিসম্বাদিত সত্য। সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে স্বাস্থ্যের সময়োচিত চর্চ্চায় ও সুস্থতার সংরক্ষণে আমাদের সতত প্রবল সচেষ্ট হইতে হইবে। যাহাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও সার্ব্বজনীন কল্যাণ, তাহা না করিয়া গতানুগতিকের ন্যায়, আলস্য ও কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনের অপব্যবহার করা, জীবনকে দুঃখময় ও ভারবহ, কলুষিত ও বিষবৎ অস্পৃশ্য করিয়া তোলা মানুষের পক্ষে পুরুষকার তো নহেই, বরং তদ্রূপ ব্যবহার অতিশয় নিন্দনীয়।

সুস্থ দেহ মন লইয়া মানুষ তাহার নিয়তির পথে প্রতি মুহূর্ত্ত ও প্রতি সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যাস না করিলে, আপনা হইতে আকাশ হইতে স্বাস্থ্য-সৌভাগ্য বর্ষিত হইবে না। প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ যাহার উদ্দেশ্য, তাহাকে সেই উদ্দেশ্যের উপায়ানুসরণে সদা অবহিত, সযত্ন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে। সঙ্কল্প বিকল্পের সংঘর্ষের মধ্যে তাহাকে স্থিরচিত্ত থাকিয়া একই নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্মুখে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা বিঘ্ন আসিবে, তাহাকে মহাবীর শাক্য সিংহের ন্যায় সিংহ-বিক্রমে আপনার গতি-পথ হইতে অপসারিত করিতে হইবে। তাহার কোন প্রকার আপাত-মধুর প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া কঠোর আত্ম-সংযম ও অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে অগ্নিদগ্ধ ধাতুর ন্যায় বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বলতর হইতে হইবে। অবশ্যই এ কথা সত্য যে, মানুষ বিজ্ঞানের খুঁটীনাটী ধরিয়া নিয়ত ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিলে আপাতদৃষ্টিতে দূর হইতে দেখা যায় যে তাহার উন্নতির গতি অতি মৃদু ও মন্দ। কিন্তু যদি প্রকৃত পথ ধরিয়া দৃঢ় পদে প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়াস থাকে, এবং একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথও না রাখিয়া জীবনকে কেবলই অমৃতের উদ্দেশ্যে অমৃতের পথেই সিদ্ধির জন্য পরিচালিত করা যায়, তবে ঐ ধীর ও মৃদু গতিতেও এক দিন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিতে পারিবে, "হে বিশ্ববাসিন্, আমি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি!" সুতরাং আমাদের প্রয়াস ও সাধনার প্রধান মন্ত্র হইবে এই যে, আমরা অতি ক্ষুদ্র সত্যকেও উপেক্ষা করিব না। বিন্দু বিন্দু করিয়া বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার সমবায়ে বিপুলা পৃথিবীর সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলিকেও আমরা উপেক্ষা করিব না। স্বাস্থ্য অর্জ্জন, রোগ প্রতিষেধ প্রভৃতি কার্য্যে অতি ক্ষুদ্র নীতিকেও আমরা যেন অবজ্ঞা ভরে কার্য্যে পরিণত করিতে ত্রুটী না করি। তাহা হইলেই আমরা অজেয় ও অজর হইতে পারিব।

এই স্বাস্থ্য-সুখ লাভের জন্য মন হইতে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার অসার ভোগ-স্পৃহা সমূহকে সর্ব্বপ্রযত্নে নিয়ত বিদায় করিয়া দিতে হইবে। আলস্য, ব্যসন ও বিলাসের বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া, যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু শুভ ও শ্রেয়ঃ তাহাই গ্রহণ করিতে, আত্মস্থ করিতে হইবে। সত্যকে, শ্রেয়ঃকে জীবনের উপাদান, অবিভাজ্য অঙ্গ-রূপে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। শ্রেয়ঃ বিষয়েই নিয়ত আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আজ এই একটী মন্দ ও ক্ষুদ্র অভ্যাসকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না, অথবা ইহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিবার জন্য বেশী কিছু অধ্যবসায়ের সাহায্য লইলাম না, তাহাতে কি? ভবিষ্যতে অবশ্যই ইহাকে পরাজয় করিব, অথবা ইহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিব, এরূপ দীর্ঘসূত্রিতার হিসাবেও তো আমরা অনেক সময় আত্ম-প্রতারিত হইয়া থাকি। আজ যাহা ত্যাগ বা যাহা গ্রহণের সুযোগ আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, অথবা আজ আমার শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মনের শক্তি ও সঙ্কল্প যতটা দৃঢ় ছিল, কাল হয় তো স্বভাবের কোন নিয়মেই আমার পক্ষে সে সব অনুকূলতা থাকিবে না। সুতরাং সে কর্ত্তব্য আমার পক্ষে হয় তো সম্ভবপর হইবে না।

স্বাস্থ্য-সুখ লাভের জন্য আমাদের যে সমস্ত বিষয়ে

নিয়ত অবহিত থাকিতে হইবে, তাহার মধ্যে পান ভোজনই প্রধান ও অত্যাবশ্যক বিষয়। এই জগদ্ব্যাপী দুর্দ্দিনে আমাদের দৈনিক আহার পানে অধিকতর সংযত ও মিতাচারী হইতে হইবে। অন্যথা আমাদের অভ্যাস ও আমাদের আর্থিক সংস্থানের মধ্যে প্রায়শঃই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। কেবল সুমিষ্ট ও সুস্বাদ খাদ্যই যে সদা স্বাস্থ্যপ্রদ ও হিতপ্রসূ, তাহা নহে। তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তুও অনেক সময় আমাদের জীবনের পক্ষে অধিকতর হিতকর। মূল্যবান অথচ দুষ্পাচ্য আহার্য্য বা পানীয় গরীবের তো উপযোগী নহেই, ধনবানের পক্ষেও তাহা স্বাস্থ্যনীতি ও ধর্ম্মনীতি-বহির্ভূত। ভুরি ভোজন আজকাল আমাদের জাতির একটা অতি কু-অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। আহারের অব্যবহিত পরে প্রায় সকল লোকেই একটু বিশেষভাবে বিশ্রাম, আলস্য বা নিদ্রাসুখের আস্বাদন না লইয়া পারে না। কিন্তু ভোজন লঘু হইলেই এই দায়িত্বটা আমরা এড়াইতে পারি। আমাদের পাকযন্ত্রের পক্ষে কোন্ খাদ্যটি উপযোগী ও কোন্টা উক্ত যন্ত্রে সহজে পরিপাচ্য, তাহার বিচার না করিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাপ্রকার রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য আকণ্ঠ ভোজন দ্বারা পাকযন্ত্রসমূহকে দুর্ব্বল, অক্ষম ও রুগ্ন অবস্থায় আনিয়া আমরা যে দিন দিন ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে একান্ত মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রায় সকলেই আহার সম্বন্ধে ক্রমশঃ অত্যধিক অমিতাচারী ও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিতেছে! শিশু ও বৃদ্ধদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যুবক যুবতী ও সু-শিক্ষিত প্রৌঢ় ও প্রবীণ উপার্জ্জনক্ষম অথবা উপার্জ্জনে অক্ষম বা ভগ্নমনোরথ ভদ্রসন্তানের মধ্যেও আহারের অত্যাচার ও অনাচার এবং কেবলমাত্র রসনা পরিতৃপ্তির জন্যই উন্মাদনা দেখা যায়। গরীব ও মধ্যবর্ত্তী অবস্থার লোকের মধ্যেও অতিভোজনের দৃষ্টান্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদের অবস্থাকে দিন দিন অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। যে পরিমাণে আহার করিলে, যে দ্রব্য আহার করিলে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া দেশের মুখ ফিরাইয়া দিতে পারে, মাতৃভূমির দুর্দ্দশা ও দৈন্য দূরীভূত করিতে পারে ও মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদক করিতে পারে, তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণের, গৃহের ও সমাজের অশেষ অনর্থ আনয়ন করা হইতেছে।

আহার বিষয়ে আমাদের ভারতীয় ঋষি ও মনীষিগণ অতি শুদ্ধাচার ও মিতাচার প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্ত-মান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় ঋষিগণের প্রচারিত ও আচরিত আ[...] বিজ্ঞান সরল ও নিরপেক্ষ বিচারের সঙ্গে অধ্যয়[ন] করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতের আহা[র] নীতির পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। সাত্ত্বিক ও লঘু আহা[রে] পরিতৃপ্ত, ও গৃহ প্রস্তুত মোটা কাপড়ে দেহ আ[...] করিয়াও তাঁহারা উচ্চ চিন্তায় সদা নিরত থাকি[য়া] বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির চর্চ্চা ও তত্ত্বাবিষ্কারে জগতে[র] এত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন যে, আজ পাশ্চাত্য খ[...] গণও তাহার সমর্থন করিতেছেন। আর আমরা কি[...] আমাদের জাতীয় গৌরব ভুলিয়া আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা[র] অসারাংশ ও বিকৃত বুদ্ধির পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া [...] আমাদের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ঘো[র] অশুভ অশান্তি আনয়ন করতঃ আত্মার, আত্মীয়ের [ও] সমাজের কতই ক্ষতি করিতেছি। আমাদের দৃষ্টা[...] সুকুমারমতি বালক-বালিকা ও নিরক্ষরা মহিলাগণ দি[ন] দিন অধঃপাতের গভীর আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে[...] আজ সর্ব্বত্রই দেখিতেছি কিসে রসনার পরিতৃপ্তি[...] অতিভোজনের পরে জড়ের মত নিদ্রালস চক্ষে[...] জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে দিন রাত্রি কাটাইয়া দি[তে] পারা যায়, তাহারই চেষ্টা। মরণের শেষ মুহূর্ত্ত[...] দেখিয়া কেহই নিবৃত্ত নহে। এই যে দারিদ্র্য, [...] যে অধীনতা, এই যে অধঃপাত, এ সকলই তো আম[াদের] নিজকৃত অনাচার ও অপরাধের ফল। যাঁহারা ভা[...] দেখিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা [...]

বৃহৎ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অবহেলার জন্যই আপনার ও সমাজের কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছি ও করিতেছি। যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল গৃহকর্ত্তা আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও শ্রেয়ঃ সংকল্পের দৃষ্টিতে সংসারকে দেখিতে ও স্ত্রীপুত্রদিগকে দেখিতে শিখাইতে সচেষ্ট হন ও প্রকৃত শুভ কামনা ও শুভ বুদ্ধির দ্বারা অপর সাধারণের ও আপনার গৃহের নিরক্ষরা মহিলা-বৃন্দের সম্মুখে নিজের সদ্দৃষ্টান্ত ধরিতে থাকেন, তবে অতিবড় নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ লোকও আপনাপন স্বার্থবুদ্ধির খাতিরেই অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের শুভ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। একটা দুটা করিয়া লোকের মতি গতি ফিরাইতে পারিলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের উচ্চশিক্ষার সার্থকতা দেখিয়া দেশ মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইবে।

এত দিনে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অবশ্য-পাঠ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে চলিল, ইহা অতি সুখের বিষয়। কিন্তু সুখের সঙ্গে একটু দুঃখের আশঙ্কাও বিদ্যমান। স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যপদেশে সরকারী সাহায্যে অথবা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের নিজ হস্তে যে সমস্ত বহ্বারম্ভ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সকল সময়ে আমাদের দেশের ও জাতির উপযোগী নহে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতি বড় আয়োজনে মশক দমনের জন্য কামান পাতিয়া যে স্বাস্থ্য সংগ্রামের অভিনয় হইয়া থাকে, তাহার ফলে প্রায়শঃই অতি অধিক মূল্যে অতি অল্প স্বাস্থ্য ক্রীত হইয়া থাকে। সে স্বাস্থ্য ক্রয় অপেক্ষা তাহা ভোগ করাই অধিক দুরাশার বিষয় হইয়া পড়ে। খাইয়া বাঁচিবার পয়সাগুলি কর স্বরূপ দিয়া খালিপেটে স্বাস্থ্য সুখ ভোগ বোধ হয় আমাদের দেশবাসীর খুব স্পৃহনীয় হইবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল ও স্থূল বিষয়গুলির সাধারণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বেশ করিয়া অভিনিবেশসহকারে ও সুস্থ চিত্তে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়া যদি সহজ ভাষায় ও সোজা কথায় গ্রাম্য পাঠশালা ও নিম্ন স্কুলের বালকদিগকে ও কথকতা প্রভৃতি উপায়ে গ্রাম্য মেলা স্থান ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আমোদ প্রমোদের সময় যাত্রা অথবা নাটকা-ভিনয় প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণকে শিখাইয়া লওয়া যায়, তবে যে সকল বিষয়ে কেবল জ্ঞানের অভাব হেতু সাধারণ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে, সে সকল বিষয়ে জনসাধারণ অনেকটা সতর্ক ও সফল হইতে পারিবে।

সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিয়মে বৃহত্তর উপায়াবলম্বনে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতির নিবারণ ও দূরীকরণ ব্যাপারও চলিতে পারে। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি মারিভয় হেতু স্থানে স্থানে সময় বিশেষে যে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহা ছাড়া আমাদের দৈনিক পানাহার,-স্নান, ব্যায়াম, নিদ্রা, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা অবিরাম যেরূপ রোগমুখে পতিত হইয়া থাকি, তাহার সময় অসময় বা আর কোন বিচার বিতর্ক নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই শরীর চেষ্টা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সুপ্রয়োগে আমাদিগকে অবহিত ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি হইয়া চলিতে হইবে।

মানুষের শরীরাভ্যন্তরে পাকস্থলী একটী প্রধান যন্ত্র। তাহার সুস্থতা অসুস্থতা কেবলই খাদ্য ও পানীয়ের মাত্রা ও গুণাগুণের উপরেই অধিক নির্ভর করে। এই পাকস্থলী রুগ্ন বা অক্ষম হইলে তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম ও আরোগ্য ব্যতীত পান ভোজনের সুফল আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারিব না। বরং দুর্ব্বল ও বিকল পাকস্থলীতে নিয়মিত দৈনিক খাদ্য পানীয়ও বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শরীরের রক্তকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিবে। বস্তুতঃ আমাদের দেশের অনেক লোকেরই যে সেই সঙ্কটাবস্থা নিয়ত বর্ত্তমান, তাহা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও অন্যান্য লোকের দৃষ্টান্ত হইতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা খুব দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দান করিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি সুস্থদেহ ও সুস্থমন না হইলে সমাজদেহ সুস্থ ও সবল হইতে পারে না, জাতিও গড়িয়া উঠিতে পারে না। বরং অধঃপতনের গতি ক্রমশঃ দ্রুততর হয়। সেজন্য জনসাধারণের মধ্যে বাল্যকাল হইতে অতি ক্ষুদ্র ও স্থূল স্বাস্থ্যবিধিসমূহের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার ও ব্যবহারিক জীবনে সেই সকল বিধির যথাসম্ভব প্রয়োগের জন্য শিক্ষিত দেশবাসিগণেরই পথ-প্রদর্শক হইতে হইবে।

চরিত্র-গঠন

"Spare the rod and spoil the child"—সন্তানের চরিত্র-গঠনে এই নীতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। শিশুর স্বভাব ভাল হওয়া বা খারাপ হওয়া তাহার স্বাস্থ্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। শিশুর স্বাস্থ্য আবার তাহার জনক-জননীর বিশেষতঃ জননীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর চরিত্র আদর্শ ভাবে গঠন করিতে হইলে তাহার জন্মের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার জননীর স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং ভাবী জননীকে সন্তান-পালন-বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হয়। তার পর শিশু জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার স্বাস্থ্যচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নীতি-শিক্ষা দিয়া তাহার চরিত্র-গঠনের চেষ্টা করিতে হয়। এ বিষয়ে শিশুর জননীই তাহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয় শ্রেণীর লোকের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সদসৎ চরিত্র-গঠনে তাহার জননীর চরিত্র-প্রভাবই প্রধানতঃ কাজ করিয়াছে। জননী নিজে সৎ-স্বভাবা হইলে তাঁহার সন্তানও তাঁহার শিক্ষা-গুণে সৎ-স্বভাব হইয়া উঠে। আর জননী যদি নিজে সুশীলা না হন, তিনি যদি দুঃশীলা, কলহপরায়ণা, কুটিলা, মন্দ-স্বভাবা হন, তবে তাঁহার সন্তানও দুশ্চরিত্র হইবেই। অবশ্য শিশুর চরিত্র-গঠনে তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থাও কতকটা পরিমাণে সাহায্য যে করে না, তাহাও নহে। কিন্তু জননী যদি দৃঢ়-চরিত্রা রমণী হন, তবে তিনি মন্দ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কতকটা কাটাইয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু শিশুর স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হইলে পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাহার স্নায়ু-মণ্ডলীর উপর কার্য্য করিয়া তাহার চরিত্র বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। আবার শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিলে, তাহার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে, যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যের কিরণ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করিলে এবং তাহাকে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করি[...] অভাস করাইলে, সে যাহাতে দিবসের মধ্যে অধিক[...] খোলা বাতাসে থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করি[...] তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, সে[...] মহৎ গুণের অধিকারী হইতে পারে।

ছেলেপুলেরা ইদানীং যে তাদের পিতা মাতার মনে[...] মতন, কিম্বা সমাজের উপযুক্ত সন্তান হইয়া উঠিতে[...] না, তাহার আরও কারণ থাকিতে পারে। তাহাদে[...] লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যতটা যত্ন করা হয়, তাহাদে[...] স্বাস্থ্যের প্রতি যে যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া হ[...] তাহাদের নৈতিক চরিত্র-গঠনের জন্য ততটুকুও চে[...] করা হয় না। ছেলে মেয়েদের নীতিশিক্ষা দে[...] কতকটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। এদিকে আমাদের এখ[...] দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই হয়। মনস্তত্ত্বের বিষয়ে বি[...] বিদ্যালয়ে সবে অধ্যাপনা সরু হইয়াছে, মাসিক[...] সাময়িক পত্রে ইহার সামান্য ভাবে আলোচনাও আর[...] হইয়াছে; কিন্তু উহা এখনও সাধারণের আয়ত্তা[...] হয় নাই।

সচ্চরিত্রতা জন্মগত হইতে পারে, কিন্তু সে[...] দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তবে ইহা শিক্ষা ও অভ্যা[...] সাপেক্ষ। সমাজবদ্ধ মানুষের কতকগুলি স[...] থাকা অপরিহার্য্য। সেগুলি না থাকিলে সে সমা[...] দশজনের একজন হইয়া থাকিবার অযোগ্য। এ[...] লোককে সমাজ প্রায়ই সহ্য করিতে পারে না—অব[...] সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তাহাকে সমাজ হইতে বিতা[...] করিতে বাধ্য হয়। যাহার এই সকল গুণ স্বভা[...] নহে, শিক্ষা পাইলে, অভ্যাস করিলে সে সেই সকল[...] অর্জ্জন করিতে পারে।

এই সকল গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটী প্রধান গু[...] এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম গুণ—ক[...] পালন। যে যে-কাজেই নিযুক্ত থাকুক, তাহার ক[...]

সুশৃঙ্খলে পালন করিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা করে, তাহাতে তাহার শুধু ব্যক্তিগত হিতাহিত নয়, সমাজেরও হিতাহিত নির্ভর করে। কেহ তাহার কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে কেবল সে নিজে নয়, সমাজও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়।

সেইরূপ নিঃস্বার্থপরতা একটী গুণ। সমাজে বাস করিতে হইলে এ গুণটিও অভ্যাস করিতে হয়। সততা আর একটী গুণ, যাহা মানব মাত্রেরই পক্ষে অপরিহার্য্য। রাজ্যের আইন মান্য করিয়া চলা সামাজিক লোক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অহমিকতা মানব মাত্রেরই বর্জ্জনীয়। সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকা একটী মহৎ গুণ। সহিষ্ণুতা গুণ থাকিলে মানুষ পরিণামে জয়যুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের দেশে একটী প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে—যে সয়, সে-ই রয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাও একটী মহৎ গুণ। এই গুণের অনধিকারী ব্যক্তির দুঃখের সীমা থাকে না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে নাগরিকোচিত এই সকল গুণ অভ্যাস করাইতে হয়। কেবল সুমাতাই এই কার্য্যটি দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতে পারেন। Child is the father of the man. শিশু-চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া উঠে, পরিণত বয়সেও মানুষ সেইরূপ চরিত্রেরই লোক হইয়া উঠে। বাল্য শিক্ষা ও বাল্য অভ্যাস পরিণত বয়সেও পরিবর্ত্তিত হয় না। শিশু বাল্যাবস্থা হইতে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইলে তাহার আর চরিত্র-সংশোধনের সুযোগ উপস্থিত হয় না। কাঁচায় নয়না বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁস ট্যাস্। বুড়ো নয়না পড়ে না। পরিণত বয়সে কি মানুষ, কি পশু পক্ষী—বাল্যকালের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া নূতন কিছু শিখিতে পারে না। বাল্য অভ্যাস কখনও ভোলাও যায় না। অতএব পিতামাতা সন্তানকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন, আঁতুড় ঘর হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। শৈশব হইতে স্বাস্থ্য-রক্ষায় উদাসীন হইলে বার্দ্ধক্যে শত ঔষধেও কেহ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। শিশুর চিত্ত কোমল থাকিতে থাকিতে তাহাকে সকল প্রকার সদ্‌গুণ অভ্যাস করাইয়া দিতে হইবে।

শিশু-চিত্তের গতি, তাহার হাসি-কান্না, তাহার অঙ্গভঙ্গী, হস্ত চালনা প্রভৃতি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, শিশুর চরিত্রগঠনে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। শিশু যাহাতে আনন্দ পায়, পুনঃ পুনঃ তাহাই করিতে ভালবাসে। আর সে যাহাতে দুঃখ পায়, বেদনা বোধ করে, তাহা সে স্বভাবতই এড়াইবার চেষ্টা করে। এই জন্য শিশুর চারিদিকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হয়, যে সে সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাসে আনন্দ লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে সে নিজের অজ্ঞাত-সারেই ঐ সকল সদ্‌গুণ অর্জ্জনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। শিশু সাধারণতঃ যাহা দেখে তাহাই শিক্ষা করে। তাহার জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতামাতার আচার ব্যবহার তাহার আদর্শ হইয়া পড়ে। সে পিতা-মাতার আচার ব্যবহার অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকে। অতএব শিশুকে সচ্চরিত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার চরিত্রবান হওয়া আবশ্যক।

পিতা মাতার পর শিশুর জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনী বা আত্মীয় স্বজন প্রায় তাহার আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। তার পর দাস দাসী, এবং সর্ব্বশেষে পাড়া প্রতিবাসী—বিশেষতঃ শিশুর সমবয়স্ক বালক বালিকারা। এই আদর্শ ভাল হইলে শিশুও সৎ হয়, আর মন্দ হইলে শিশুও প্রায় মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

অত্যধিক স্নেহশীল পিতামাতা সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ শিশুকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় শিশুর পরনির্ভরশীল না হইয়া গত্যন্তর থাকে না—সে কোন ক্রমেই আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখে না—সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পরের সাহায্য বা পরের পরামর্শের অপেক্ষা করিয়া থাকে। স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে বা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে সে শিখে না।

কিন্তু স্নেহান্ধ পিতামাতা শিশুকে যতটা অল্পবুদ্ধি বা অসহায় মনে করেন, বাস্তবিক সে ততটা নয়। শিশু যখন প্রথম হাঁটিতে শিখে তখন তাহার অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এইটী বেশ বুঝা যায়। দেখা যায় যে, হাঁটিবার ইচ্ছায় সে পদ সঞ্চালন করিতেছে। যেরূপ ভাবে পদ সঞ্চালন করিয়া সে বিফল হইতেছে—হাঁটিতে না পারিয়া পড়িয়া যাইতেছে, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছে। এইভাবে শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দিলে সে পরিণত বয়সে স্বাবলম্বী হইবেই। তা' নয় ত, হাঁটিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মা কিম্বা বাবা কি ভাই বোন কিম্বা অপর কেহ যদি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হাঁটিতে সাহায্য করে, তবেই শিশুর মাথাটি একেবারে খাওয়া হইল— প্রত্যেক কাজেই সে পরের সাহায্য খুঁজিবে।

শিশুর কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা হইলে সে কাঁদিয়া অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। যদি অসুবিধা নিতান্ত ক্লেশদায়ক বা ক্ষতিজনক না হয়, তাহা হইলে শিশু কাঁদিবামাত্র তাহাকে সাহায্য করিতে যাইতে নাই। কারণ, কাঁদিবামাত্র তাহার সকল অসুবিধা দূর হইলে তাহার এই শিক্ষা হইবে যে যখনই তাহার কোন কিছুর দরকার হইবে, তখনই, সে তাহার ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহার সুবিধা আদায় করিবে। এরূপ অভ্যাস একবার দাঁড়াইয়া গেলে,—তাহার চরিত্র সকলের পক্ষেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে।

শিশুকে যখন তখন আদর করা, কোলে লওয়া, চুমা খাওয়া শিশু চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। কিম্বা কাঁদিলেই তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। এমনভাবে পালিত ছেলে পুলে বড় হইয়া-দশজনের একজন হইতে পারে না—তাহার চরিত্র বিগড়াইয়া যায়।

ইতর প্রাণীরা যাহা কিছু করে, তাহা তাহাদের [illegible] করিয়া থাকে—তাহাদের কাজে কর্ম্মে, চলা ফেরায়, আচারে ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। শিশুর অবস্থাও কিছু দিনের জন্ম এইরূপই থাকে—তাহারা যাহা কিছু করে তা[illegible] তাহাদের অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকে। এই অবস্থা[illegible] তাহাদের পশুবৎ সংস্কারের অবস্থা।

ক্ষুধা পাইলে শিশুরা কাঁদে। তাহার কান্না শুনি[illegible] তার মা আসিয়া তাহাকে মাই দেন। অমনি শি[illegible] কান্না থামিয়া যায়। মা যদি নিকটে না থাকেন, কি[illegible] কার্য্যে ব্যস্ততা বশতঃ আসিতে না পারেন, তাহা হই[illegible] হয় ত শিশুর কোন ভাই ভগিনী তাহাকে আদর ক[illegible] ভুলাইবার জন্ম তাহার চুমা খাইতে গেলে তাহার [illegible] যদি শিশুর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে, তবে শিশু ঐ নাকটি[illegible] মার মাই মনে করিয়া চুষিতে আরম্ভ করে, এবং তখন[illegible] মত কাঁদিতে ভুলিয়া গিয়া চুপ করে। কিন্তু তা[illegible] যদি যথার্থই প্রবল ক্ষুধা পাইয়া থাকে, তবে নাক চু[illegible] দুধ না পাওয়ায় তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না ব[illegible] সে আবার কাঁদিয়া উঠে। আবার শিশু যদি এ[illegible] থাকে, তবে অনেকক্ষণ কাঁদিয়াও মাকে না পাই[illegible] নিজের হাতই চুষিতে আরম্ভ করে, এবং একটু[illegible] সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করে। শিশুর এই যে সব[illegible] —এ সকলই তাহার সংস্কারের ফল। বয়স্ক ব্য[illegible] ক্ষুধা পাইলে সে কখনও আহারের শূন্য পাত্র কামড়া[illegible] ক্ষুধা শান্তির চেষ্টা করে না। কিন্তু শিশু ক্ষুধার[illegible] হাতের কাছে যা পায়, তাই খাইবার চেষ্টা ক[illegible] ক্ষুধাশান্তির প্রয়াস পায়। সেইরূপ, তাহার শ[illegible] কোন স্থানে বেদনা বোধ হইলে, তাহার হাত [illegible] অজ্ঞাতসারেই সেই বেদনার স্থানে গিয়া উপস্থিত[illegible] শিশুদের প্রায়ই কাণ কট-কট করে, তাহার [illegible] প্রায় সর্ব্বদা সেইখানে থাকে। অবশেষে [illegible] শান্তি হইলে শিশু আর কাণে হাত দেয় না। [illegible] সকল কাজই স্বতঃই (automatically) [illegible] থাকে। শিশুর এই কাজগুলি করিবার শক্তি [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই লব্ধ—উহা কোনরূপ বুদ্ধি-বিবেচ[illegible] বিচার-বিতর্কের ফল নহে। ঘড়িতে দম দিয়া[illegible] লামটী দোলাইয়া দিলে তাহা যেমন আপনি [illegible] থাকে, শিশুর কাজ-কর্ম্মও প্রায় সেইরূপ ভাবে চ[illegible]

কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার কথা আছে। শিশু, জীব-জন্তু এমন কি বয়স্ক মানবের মধ্যে আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তিটি খুব স্বাভাবিক। ইহা কাহাকেও শিখাইতে বা বুঝাইতে হয় না। এ বিষয়ে শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তির অবস্থা প্রায় সমান। শারীরিক বিপদের আশঙ্কা দেখিলে সকলেই স্বতঃই, নিজের অজ্ঞাতসারেই আত্ম-রক্ষার্থ প্রস্তুত হয়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটি না থাকিলে কত অসংখ্য প্রাণী ও মানুষ যে অকালে প্রাণ হারাইতে বাধ্য হইত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আরও কতকগুলি বিষয়ে ইতর প্রাণী, মানব-শিশু ও পূর্ণ বয়স্ক মানব প্রায় একই প্রণালীতে কাজ করে। যেমন ভয় পাইলে পলায়নের প্রবৃত্তি, কৌতূহল, ক্ষুধা, ক্রোধ, স্ত্রী-সঙ্গম প্রভৃতি। এ সকলেরই মূল কিন্তু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি; এমন কি, বংশ-বৃদ্ধিরও। কারণ, বংশ-বৃদ্ধি আর কিছুই নয়—পুত্র পৌত্রাদিতে নিজেকেই বজায় রাখা। কারণ, এই আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তিটি না থাকিলে বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী। বংশেই মানুষ এবং জীবজন্তু অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সংস্কারের উপর অনুকরণ প্রবৃত্তিকেও এই সংস্কারের তালিকায় ফেলা যায়। অনুকরণ-প্রবৃত্তি অনেকটা বংশগত; তার পর জাতিগত। কারণ, প্রাণীরা শৈশবে নিজ নিজ পিতামাতার, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজ নিজ জাতির অনুকরণ করিয়া থাকে।

মানব-শিশুরা শৈশবে আপন আপন সংস্কারানুসারে কাজ করে। তার পর বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তির যেমন বিকাশ হইতে থাকে, তদনুসারে তাহার কার্য্য করিবার ধারারও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ঠিক এই সময়টিতে পিতামাতার সন্তানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন সে কুশিক্ষা না পায়, এবং কুঅভ্যাস করিতে না শিখে। তাহার হৃদয়ে যাহাতে সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, এমনিভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতে হয়। এই সময় হইতে পিতামাতার ব্যবহার ও আচরণ শিশুর আদর্শ হইয়া উঠে। সে পিতামাতাকে যাহা করিতে দেখে, নিজেও তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। পিতামাতা যদি সদাচারসম্পন্ন হন, তাহা হইলে সন্তান তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া অনায়াসে সদাচারসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। "Example is better than precept," এক্ষেত্রে বড় সত্য ও সমীচীন কথা। সন্তানের চরিত্র-গঠনে সদাচার-সম্পন্ন পিতামাতার চরিত্রের দৃষ্টান্ত যে কতখানি শক্তি-সম্পন্ন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু পিতামাতা যদি নিজে সদাচারপরায়ণ না হন, তাহা হইলে কেবল সদুপদেশ দিয়া সন্তানকে সচ্চরিত্র করিয়া গড়িয়া তোলা কঠিন, এমন কি, অসম্ভব বলিলেও চলে। অবশ্য দুশ্চরিত্র পিতামাতার পুত্র কন্যা যে একেবারেই চরিত্রবান হইতে পারে না, তাহাও নয়। কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, বরং তাহাকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা চলে।

জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন নানা কাজ করিবার তাহার ইচ্ছা হয়; এবং সে সকল কাজেই হাত দিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপ চেষ্টার ফলে কোন্ কাজে সে সুখ পায়, কোন কাজটা দুঃখের মূল, তাহা সে অল্প দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়া ফেলে। তখন সে যাহাতে সুখ, আনন্দ পায়, সেই কাজগুলি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। আর যাহাতে দুঃখ পায়, সেগুলি সযত্নে পরিহার করিয়া চলে।

শিশুর এই বয়সটা তাহার জননী বা ধাত্রীর পক্ষে অতি সঙ্কট কাল। সন্তান-পালনে অনভিজ্ঞ জননীরা এই সময়ে সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে, সে ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। এ সময়ে ছেলের কাজে উৎসাহ দেওয়াও যেমন দোষের, বাধা দেওয়া ততোধিক দোষের। এ বয়সে শিশুর কর্ম্মোৎসাহ খুব প্রবল। কিন্তু যদি সে কোন কু-কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হয়, তবে তাহাকে উৎসাহ দিলে তাহার ফল যে কি ভীষণ হইতে পারে, সে কথা না বলিলেও চলে। তাহাকে কুকর্ম্ম করিতে নিবারণ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে বাধা দেওয়াও নিরাপদ নহে।

কারণ, বাধা দিতে গেলে শিশু সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সেই কাজটি করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইবে। তাহাকে এই কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিবার জন্য যদি কঠোর শাসন বা তাড়না করা হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশ্যে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সাহস না করিলেও, গোপনে করিবার চেষ্টা করিবে এবং ছলনা কপটতা করিতে শিখিবে। লুকাইয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে শিখিলে, তাহার কাজ পিতামাতার কাছে গোপন করিতে শিখিলে, সে ছেলে ভয়ানক কুটিল হইয়া পড়িবে। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নহে।

তবে এক্ষেত্রে উপায় কি? উপায় অবশ্যই আছে। সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাধা পাইয়া উত্তেজিত হইয়া শিশু দ্বিগুণ উৎসাহে গোপনে কু-কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে একটু সুবিবেচনা, একটু কৌশল সহকারে কাজ করিতে হইবে।

এই সময় শিশু যে সব কাজ করে, তাহা প্রায় ঝোঁকের মাথায় করে। সে সকল কাজের ভাল মন্দ ফলাফলের কথা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। সেইজন্য, যে কাজ করিলে শিশুর অহিত হইবে বলিয়া পিতা মাতা বুঝিতে পারেন, সেই কাজ করিতে শিশুকে নিষেধ করিলে, সে মনে করিবে, পিতা মাতা অন্যায় ভাবে তাহাকে নিষেধ করিতেছেন।

মনে করুন, বাড়ীতে একটী পোষা বিড়াল আছে। সেই বাড়ীতে একটী শিশুও আছে। শিশু বিড়ালের সঙ্গে খেলা করিতে চায়। বিড়াল শিশুর অত্যাচার সহিতে চায় না, পলাইয়া যায়। শিশু তাহাকে ধরিতে ছুটে। পলায়মান বিড়ালের লাঙ্গুলের নাগাল ধরিতে পারিয়া শিশু তাহাই ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। বিড়াল তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপ টানাটানিতে শিশু বিলক্ষণ আমোদ পাইল। সে যখন তখনই বিড়ালের ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া খেলা করিতে লাগিল। শিশুকে যদি এই খেলা হইতে নিবৃত্ত না করা যায়, তবে পরিণামে সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে। তাহাকে সোজাসুজি নিবারণ করিতে গেলে, সে অধিকতর উৎসাহে বিড়ালের ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকিবে। অথবা বিড়াল নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দুই একবার আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিলে শিশু এই নিষ্ঠুর আমোদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু সেটা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব শিশু যাহাতে বিড়ালের নাগাল না পায়, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরে সে আপনিই এই খেলা ভুলিয়া গিয়া নূতন নূতন খেলায় আকৃষ্ট হইবে।

অনেক জননী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানকে নিতান্ত শিশু, অসহায় ভাবিয়া থাকেন। তিনি শিশুর সকল কাজে সাহায্য করিতে ছুটিয়া যান। সামান্য সামান্য কাজও শিশু করিতে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য অপর লোকের উপর ভার দেন। বস্তুতঃ কিন্তু শিশু এতটা অসহায় নয়। বয়োবৃদ্ধি সহিত তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও স্ফূরণ হইতে থাকে, এ কথাটি অতিরিক্ত সন্তান-বাৎসল্যবশতঃ অনেক শিশু জননী ভুলিয়া গিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা করা উচিত নয়। শিশুকে নিজের বুদ্ধিতেই চলিতে দেওয়া উচিত, তবে তাহার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন সে কুপথে না চলে। তাহার ভুল হইতে দেখিলে তাহার সংশোধন করিতে হইবে।

শিশু আপন খেয়ালে কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে অক্ষম বিবেচনায় জননী তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা ঠিক কাজ হয় না। শিশুকে কাজ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর সকল কাজে বাধা দিতে গেলে, সে সকল বিষয়ে পরনির্ভরশীল হইয়া উঠিবে। তবে কোন কাজটা ভাল, কোনটা মন্দ, তাহা তাহাকে কাজ করিতে দিয়া, ঐ কাজের ভাল মন্দ ফল প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ করাইয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হয়। ইহাই পাকা রকমের শিক্ষা। এই শিক্ষা চিরকাল তাহার মনে থাকিবে। তবে এমন কাজ অনেক আছে, যাহার অব্যবহিত ফল আনন্দদায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। এ

ক্ষেত্রে অবশ্য তাহাকে নিবারণ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে নিবারণ করা সম্ভব না হইলে, শিশুর মন বিষয়ান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে যুক্তি দেখাইয়া কোন কিছু বুঝানো সম্ভব নহে। তাহাকে ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া যতটুকু নিবারণ করিতে পারা যায়, সে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতে ফল না ফলিলে বিষয়ান্তরে তাহার মনোনিবেশ করানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহাকে দু'ঘা চড় কসাইয়া দিয়া তখনকার মত তাহাকে নিবারণ করা গেলেও, সে তাহার গোঁ সহজে ছাড়িবে না, এবং সুযোগ পাইলেই, পুনরায় সেই কাজ করিয়া বসিবে।

ছোট ছোট শিশু তাহার মাকেই বেশী জানে। কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে সে তাহার সমাধানের জন্য মায়ের কাছে যায়। এই সময়ে জননীর ব্যবহার এমন হওয়া উচিত, যাহাতে শিশুর সমস্যার সমাধান হয়, সে আনন্দ লাভ করে। মা যদি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, কিম্বা তাহাকে ধমক দেন, তাহা হইলে সে নিজেই সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়, এবং জননীর প্রতি তাহার আস্থা কমিয়া আসে। সে আর মায়ের কাছে সমস্যার মীমাংসার জন্য যায় না, এমন কি সে মায়ের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে পারে। এরূপ করিতে গিয়া যদি সে বাধা পায়, তখন সে গোপনতা, মিথ্যাচরণের আশ্রয় লইতে শিখে।

এই সময়ে শিশুর প্রকৃতি খুব চঞ্চল থাকে। সে সকল কাজই করিবার চেষ্টা করে। জনক জননীর এ সময়ে শিশুকে কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত। জনক জননী সুবিবেচনাপূর্ব্বক—যাহাতে শিশুর কোন ক্ষতি না হয়, এবং তাহার সামর্থ্যে কুলায়, এমন কাজ নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে করিতে দিলে, কেমন করিয়া সেই কাজ করিতে হয় তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিলে, এবং তাহার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলে, শিশু আনন্দের সহিত সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়। বলা বাহুল্য, জনক জননীর এইরূপ আচরণের ফল খুব ভালই হইয়া থাকে।

শিশু চরিত্রের একটা বিশেষ দিক—তাহার অনুকরণ প্রবৃত্তি। শিশুদের দিকে নজর রাখিলে দেখা যায়, তাহারা পিতামাতার চালচলন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছে। এজন্য শিশুর সামনে নিজ নিজ আচরণে পিতামাতাকে ত সাবধান হইতেই হইবে; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। শিশু অপরের নকলও করিয়া থাকে। প্রায় দেখা যায়, ছোট ভাই সকল কাজে বড় ভাইয়ের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। অন্য আত্মীয় স্বজন বা বাড়ীর অপরাপর লোকদের আচরণও শিশুর মনোযোগ এড়ায় না। অতএব কেবল পিতামাতা সাবধান থাকিলেই চলিবে না। অপর লোকদেরও সাবধান থাকিতে হইবে। তাহা সম্ভব না হইলে শিশুকে যথাসাধ্য তাহাদের নিকট হইতে তফাতে রাখিতে হইবে। শিশুর প্রায় সকল কাজই অনুকরণ প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশুর আচরণে কোন দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে হইবে, শিশু কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিতে গিয়া সেই অপ্রিয় আচরণ করিতে শিখিয়াছে। অমনি সে বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে হইবে, এবং সতর্কতা সহকারে তাহার সঙ্গ হইতে শিশুকে তফাতে রাখিতে হইবে। শিশু যত দিন অনভিজ্ঞ থাকে, যত দিন না তাহার বিচারশক্তি পরিস্ফুট হয়, তত দিন শিশুর এই অনুকরণ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহাকে পালন করিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। তখন তাহার সামনে নিজেরা সদাচরণ করিলেই যথেষ্ট হয়। এই সময়ে বিশেষ করিয়া শিশু তাহার জননীর কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, সামান্য ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুকে বেশী দিন এই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, তাহা হইলে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে না, তাহার বিচারবুদ্ধি সম্যক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; বেকায়দায় পড়িলে সে নিজে বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিতে

সমর্থ হয় না। সর্ব্বদা পরের পরামর্শ, উপদেশ, ইঙ্গিত, পরিচালনার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহার চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি, এবং সাধারণ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যেন সে অপরের অনুকরণ না করিয়া নিজে বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে কাজ ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। এইভাবে নিজের বিবেচনানুসারে কাজ করিতে করিতে—সকল সময় সফলতা লাভ না হইলেও—যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহার মূল্য বড় কম নয়। এই স্বযত্নলব্ধ অভিজ্ঞতা তাহার পরিণত জীবনে তাহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাতে জীবনের সব কাজে তাহার আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা হয়। সঙ্কটকালে কাহারও সাহায্য না লইয়া সে আপনা আপনি কোন না কোন উপায় করিয়া লইয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

বয়স অনুসারে মানব-জীবন বহু স্তরে বিভক্ত। মোটামুটি আমাদের দেশে মানব-জীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়—শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য। এই এক একটা স্তর আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে বিভক্ত। শাস্ত্রীয় হিসাব মত ২৫ বৎসর বয়সে আমাদের দেশে যৌবন আরম্ভ হয়। কিন্তু লোক-ব্যবহারে ষোড়শ বর্ষ যৌবনারম্ভ কাল। তদনুসারে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব, তৎপরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর। কিন্তু আবার চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিতেছেন—লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষাণি পুত্রমিত্র-বদাচরেৎ। এখানে আবার পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত এক ভাগ, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত আর এক ভাগ, আর ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ।

পুরাণে কথিত আছে, মাণ্ডব্য নামক একজন মহাতেজা ঋষি ছিলেন। তিনি যখন নিজ আশ্রমে তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মৌনী ছিলেন, সেই সময় একদল চোর গৃহস্থ বাড়ী চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়া তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লয়। চোরেদের অনুসরণ করিয়া গৃহস্থ ও নগরপালের লোকেরাও সেই আশ্রমে আসিয়া চোরদের ধৃত করে এবং চোরদের সহচর মনে করিয়া মুনিকেও ধরিয়া লইয়া যায়। রাজ-বিচারে চোরেরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদের প্রতি শূল-দণ্ডাদেশ হয়। এ যাবৎ মাণ্ডব্য মুনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন—এত যে কাণ্ডকারখানা হইয়া গেল, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহাকে শূলে দেওয়া হইল, তখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। ক্রমে তাঁহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িলে রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন, যে, একে নিরপরাধ, তায় অমন তেজস্বী মুনি—তাঁহার এই দণ্ড! মুনি যদি রুষ্ট হইয়া শাপ দেন, তাহা হইলে রাজাকে সবংশে লয় হইয়া যাইতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ মুনির দেহ হইতে শূল খুলিয়া লইবার আদেশ দিলেন, এবং মুনিবরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মুনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শূল খোলা গেল না। তখন অগত্যা শূলের যতটুকু অংশ মুনির দেহের বাহিরে ছিল, তাহাই কাটিয়া ফেলা হইল; অবশিষ্টাংশ মুনির দেহের মধ্যেই রহিয়া গেল।

বিনা দোষে তাঁহার কেন এই দুর্দ্দশা হইল—মুনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বিধাতার সূক্ষ্ম বিচারে পাপ না হইলে দণ্ড হয় না। এ ক্ষেত্রে মুনির কোন্ পাপে এই দণ্ড হইল, মুনি কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার প্রতি অবিচার হইয়াছে মনে করিয়া ক্রুদ্ধ মুনি কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য যম রাজার দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামুনিবরকে নিজ আদালতে উপস্থিত দেখিয়া যমরাজ ভটস্থ হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির সংবর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহার এই অনুগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি শূলের বিবরণ বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কোন্ পাপে তাঁহার এই গুরুদণ্ড হইল। যমরাজের আদেশে পাপ পুণ্যের হিসার-রক্ষক চিত্রগুপ্ত খাতা-পত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আবিষ্কার করিলেন যে, শৈশবে মাণ্ডব্য মুনি এক ফড়িং ধরিয়া তাহার উদরে খড়কে বিদ্ধ করিয়াছেন। এই নিষ্ঠুরতার ফলে ফড়িঙ্গ বেচারীর প্রাণ বিয়োগ ঘটে। সেই পাপে মুনিকে শূলদণ্ড ভোগ করিতে হইল। মুনি বলিলেন, তখন আমি অত্যন্ত শিশু—পাপ-পুণ্যের কি জানি! ধর্ম্মরাজ কহিলেন, তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণের সূক্ষ্ম বিচারে উহা পাপ বলিয়াই গণ্য, এবং উহার দণ্ড ভোগও অপরিহার্য্য। মুনিবর তখন নিয়ম করিয়া দিলেন যে, পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানব-শিশুর হিতাহিত পাপ-পুণ্যের বোধ জন্মে না। ঐ সময় পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত ভাল মন্দ কোন কার্য্যের জন্যই শিশু দায়ী নহে। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু যতই অন্যায় কাজ করুক না কেন, তাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, এবং সেজন্য তাহাকে কোন দণ্ডভোগও করিতে হইবে না। সেই মহর্ষির প্রবর্ত্তিত নিয়ম একাল পর্য্যন্ত হিন্দু মানিয়া আসিতেছে। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা সকল পাপ পুণ্যের অতীত।

এই পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, এতদ্দেশে পাঁচ বৎসর বয়সের সময় হইতে শিশুর বুদ্ধির উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয়। সেজন্য ঐ বয়স হইতে শাসনা এবং বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তবে সকল শিশুর পক্ষেই যে এই নিয়ম নিখুঁতভাবে খাটে, তাহাও নয়। কোন কোন শিশুর পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেই বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। আবার কাহারও কাহারও বা বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরও বেশী সময় লাগে। যাহা হউক, গড়পড়তা পাঁচ বৎসর বয়স এদেশে বুদ্ধির বিকাশারম্ভের কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে চারি বৎসর বয়সেই শিশুর বুদ্ধির বিকাশ আরম্ভ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

হিতাহিত জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাল-মন্দ কাজের পার্থক্য ও তাহাদের ফলাফলও কতক কতক বুঝিতে পারে। হঠাৎ কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং যথাসম্ভব বিবেককে সংযত রাখিবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে, কোন ভাল কাজ করিলে সে বিলক্ষণ আনন্দ ও

আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। এখন হইতে তাহার সকল কাজই ভাল মন্দ হিসাবে আনন্দ ও বিষাদের কারণ হইয়া থাকে। এই সময় হইতে শিশুর সকল কাজ ভাল কিম্বা মন্দর দিকে যায়। যদি ভালর দিকে যায় (সব কাজই যে সব সময়েই ভালর দিকে যাইবেই, তাহা অবশ্য সম্ভব নহে। তবে অধিকাংশ কাজ যদি ভালর দিকে যায়) তবে ভবিষ্যতে সে ব্যক্তি দেবতুল্য মহা-পুরুষ হইয়া উঠে। আর যদি মতি-গতি মন্দর দিকেই বেশীর ভাগ ধাবিত হয়, তাহা হইলে পরিণামে সে যে মহা পাপী হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ছেলের মতি গতি যদি মন্দর দিকেই যাইতে দেখেন, ত পিতামাতা চেষ্টা করিলে তাহাকে কতকটা ভালর দিকেও ফিরাইতে পারেন। এরূপ লোক ভবিষ্যতে দোষে গুণে জড়িত হইয়া থাকে; এবং সংসারে এরূপ লোকের সংখ্যাই বেশী। তবে অভ্যাস করাইলে কতক লোককে যে ভালর দিকে ফিরাইতে পারা যায়, তাহাও সিঃসন্দেহ। যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে শিশুর মন ভালর দিকে যায়, সে ক্ষেত্রে সে ত স্বভাবতই ভাল লোক হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। ইহা কতকটা বংশানুক্রম, কতকটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ফল। অনেক সময়ে মনের স্বাভাবিক গতি মন্দর দিকে হইলেও, লজ্জা ভয় প্রভৃতি মানুষকে সংযত রাখিতে পারে। সাধুতা সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক না হইতে পারে; সে ক্ষেত্রে সমাজ-শাসন, লোকাচার, মানসিক দুর্ব্বলতা লোককে সদাচার পরায়ণ করিয়া তুলিতে পারে; অন্ততঃ সে মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতেও পারে।

কোন বালক কোন একটা ভাল কাজ করিয়া যদি মাতার কিম্বা অপর কাহারও আছে প্রশংসা পায়, তাহা হইলে তাহার মনে খুব আনন্দ হয় নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই সঙ্গে একটু গর্ব্ব, একটু আত্মম্ভরিতার ভাবও আসিয়া থাকে। তখন তাহার মনে হয়, এই রকম কাজ করিলে সকলে তাহাকে প্রশংসা করিবে। এইরূপ বিবেচনার ফলে সে ঐ ধরণের কাজে এতই প্রমত্ত হইয়া

উঠে যে, শেষকালে তাহা বাড়াবাড়িতে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্। কোন কাজেরই অতি কখনও ভাল হয় না, তা সে যতই ভাল কাজ হউক। কারণ, বাড়াবাড়ি হইতে দিলে শিশুর মনে অহঙ্কার প্রভৃতি দোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার কোন মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ভাল বটে, কিন্তু ইহারও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কারণ, তাহার ফলে শিশু মনমরা, বিমর্ষ হইয়া থাকিবে; মনে যে একটু অভিমানের ভাবও থাকিবে না এমন নয়। তাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হওয়াও অসম্ভব নয়। এই দুই দিকের দুই 'অতি'র মাঝামাঝি অবস্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাধারণ লোকের অবস্থা এইরূপই। তবে ইহার কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। ভাল কাজে কতখানি উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং কোনখানে তাহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা, কিম্বা মন্দ কাজের জন্য অনুতাপের মাত্রা নির্দ্দেশ করা সহজ কথা নয়, এমন কি, অসম্ভব বলিলেও চলে। কারণ, প্রত্যেক শিশুরই নিজ নিজ বিশিষ্টতা আছে এবং উৎসাহ ও অনুতাপের মাত্রার অনুপাতও তদনুরূপ হওয়া চাই। তবে শিশু-শিক্ষার ভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের একটা মধ্য-পন্থা নির্দ্দেশের চেষ্টা করা উচিত।

শিশুর মনে উচ্চাভিলাষের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহার স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়া, যে পথে অগ্রসর হইলে ভাবী জীবনে তাহার গৌরব লাভের সম্ভাবনা, সেই বিষয়ে পরিমিত মাত্রায় তাহাকে উৎসাহিত করিতে থাকিলে, তাহার মনে উচ্চাভিলাষ জাগ্রত হইয়া মহত্ত্বের পথে তাহাকে পরিচালিত করিতে পারিবে। সৎ কাজের জন্য পুরস্কার ও অসৎ কাজের জন্য তিরস্কার মন্দ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু এই তিরস্কার পুরস্কারের ব্যাপারের ভিতর প্রতিযোগিতা বা অপদস্থ হওয়ার ভাব আমদানী করার ফল ভাল হয় না। যে যখন যে কোন ভাল কাজ করিবে, তখনই তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য—এই পুরস্কারটা তাহার নিজেরই meritএর উপর নির্ভর করিবে। অপর কাহারও কোন তা কাজের বিচার বিবেচনা এ ক্ষেত্রে করা উচিত সে বিবেচনা অপর শিশুর বেলা স্বতন্ত্রভাবে ও ব্যক্তি ভাবে করিতে হইবে। একজনের অপেক্ষা আর এক বেশী ভাল কাজ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে পু দেওয়া হইতেছে, এরূপ ভাব শিশুদের মনে দেওয়া ভাল নয়। ইহাতে শিশু ভাল কাজ কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই তাহার মনে গর্ব্ব, অহঙ্কার, অপরের শক্তির উপর হিংসা প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে পারে। ফলে, যথার্থ আত্মোন্নতির দিকে তাহার যতটা লক্ষ্য আর নাই থাকুক, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত ইচ্ছাটা তাহার মনে প্রবল হইবে, এবং এই অসৎ পন্থার আশ্রয় লওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব না। এই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব মনের একটা স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি। ইহাকে সংযত করিয়া প্রশ্রয় দিলে আনুষঙ্গিকভাবে আরও অনেক প্রবৃত্তি মনে প্রবল হইয়া মনুষ্যত্ব নাশ করিয়া আবার কাহাকেও তিরস্কার করিবার সময় তা যাহাতে অপদস্থ না হইতে হয় সে দিকেও লক্ষ্য কর্ত্তব্য। মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার করার সংশোধন করা, এবং একের দৃষ্টান্ত দিয়া অপরকে কাজে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু কোন মন্দ কাজের জন্য ঘটা করিয়া আরও শিশুকে জড় করিয়া তাহাদের সকলের অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ায় তাহার সংশোধনের খুব কমিয়া যায়, এবং সকলের কাছে তাহাকে করিবার ভাবটাই প্রবল হয়। ইহাতে অপরাধীর উপকার হয় না—চরিত্র সংশোধনের কথা তাহার উদয় হয় না। তাহার মনে কেবল অপমানের জাগিয়া থাকে,—হিংসা, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা মনে প্রবল হয়। আর অপরাপর বালকেরাও কোন উপকার পায় না। তাহারা নিজেরা করিলে ঐরূপভাবে শাস্তি পাইবে, অতএব তা

রূপ অন্যায় কাজ করা উচিত হইবে না—এই শিক্ষাটুকু তাহারা লাভ করিতে পারিবে না। অপরাধীর শাস্তি দেখিয়া প্রথমতঃ তাহারা মনে মনে বিলক্ষণ আমোদ পাইবে। তারপর অপরাধীর হীনতা, অপমান, এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ভাব মনে হইয়া তাহাদের মনে অহঙ্কার জন্মিবে। ফলে, দণ্ড-পুরস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অন্যায় কাজের জন্য বেত্রাঘাত, অপমান অপেক্ষা অনুতাপই সমুচিত দণ্ড, এবং একমাত্র ইহাই যথার্থ ফলপ্রদ। অপরাধী নিজের কাজে নিজে লজ্জিত হইলে তাহার সংশোধনের যথার্থ আশা থাকে। অপরের সামনে তাহাকে লজ্জা দিলে সে আশাটুকু নষ্ট হইয়া গিয়া তৎস্থলে ক্রোধ, জিঘাংসা, বিদ্রোহ প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, অন্যায় কাজের জন্য সাধারণের কাছে নিন্দিত হইবার ভয়টাই যথার্থ সংযমের রশ্মি; কিন্তু সাধারণের কাছে অপ্রস্তুত, অপদস্থ, লজ্জিত করিয়া সে ভয়টা একবার কাটাইয়া দিলে, অপরাধ সংশোধনের বাহিরে চলিয়া যায়, আর তাহাকে সংযত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। তবে অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে বা অপর কাহারও ক্ষতি করিলে তাহাকে দণ্ড দিয়া নিবারণ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই দণ্ড অপরাধের অনুপাতে পরিমিত মাত্রায় হওয়া উচিত। এবং অপরাধীকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, ন্যায় বিচারানুসারে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। দণ্ড দান কালে দণ্ডদাতা ক্রুদ্ধ হইবেন না, তাঁহার মনে যেন হিংসার কিম্বা প্রতিশোধের ভাব না থাকে। অপরাধী বালক যদি অপর কাহারও পরামর্শে কিম্বা উত্তেজনায় অপরাধ করিয়া থাকে, তবে পরামর্শদাতাকেও দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। তবেই ইহা ন্যায়বিচারমূলক দণ্ড হইবে। আর দণ্ড এমনভাবে দিতে হইবে, যেন বালক পুনরায় ঐ অপরাধ না করে। কারণ, বারবার অপরাধ করিলে, এবং বারবার দণ্ড দিতে হইলে দণ্ড দেওয়া নিরর্থক হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা—শিশুকে উত্তমরূপে লালনপালন করা। জনক-জননী বা ধাত্রী যদি শিশুদের ভাল করিয়া লালন পালন করিতে পারেন, তাহাদের অধিকারের গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে শিশুরা স্বতই অপরাধে বিরত থাকে, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ কোন দোষ করে, তবে তাহা উপেক্ষা করা উচিত নয়। উপেক্ষা করিলে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়াই যাইবে। আবার দণ্ডের মাত্রা ন্যায়-বিচার-মূলক না হইলে, দণ্ডের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে, শিশু তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিবে যে, তাহার প্রতি সুবিচার হয় নাই। অবিচার হইয়াছে বুঝিলেই দণ্ডের ও দণ্ড-দাতার প্রতি তাহার আর শ্রদ্ধা থাকিবে না, সে বিদ্রোহী হইবে, দণ্ড গ্রাহ্য করিবে না। ক্রমে সে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান অত্যধিক আদরে প্রায়ই বহিয়া যায়। তবে একমাত্র পুত্রকে যিনি সৎ বালকে পরিণত করিতে পারেন, তিনি সুজননী ও সুগৃহিণী। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল। একমাত্র পুত্রের জননী যদি কড়া শাসক হন, তাহা হইলেও ছেলের মঙ্গল হয় না, আর যদি বেশী মাত্রায় আদর দেন, তাহা হইলেও ছেলের আর কোন ভরসা থাকে না। ছেলের উপর নজর রাখিতে হইবে, কিন্তু ছেলে যেন জানিতে না পারে যে তাহার উপর নজর রাখা হইতেছে। সৎ কাজে তাহাকে উৎসাহ দিতে হইবে, এবং অসৎ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে বটে, কিন্তু সেটা কেবল হুকুম তামিল করার হিসাবে নয়। শিশু যেন বুঝিতে পারে যে, এটা ভাল কাজ তাই এটা করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; এবং এটা মন্দ কাজ তাই তাহাকে নিবারণ করা হইতেছে। শিশু যেন বুঝে যে ভাল মন্দ কাজই তাহার অধিকার অনধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে—পিতামাতার হুকুম মাত্র নয়।

অনেক জনক-জননী আছেন, যাঁহারা ছেলেপুলেকে সংসারের কোন কাজেই হাত দিতে দেন না। সর্ব্বদাই

নিবারণ, সর্ব্বদাই না—না—না। ইহার ফলও ভাল হয় না। ছেলেপুলেরাও সংসারের অঙ্গ। সংসারের কাজে তাহাদেরও একটা অধিকার আছে। সন্তানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস—তাহারা সংসারের কাজে হাত দিলে তাহার ফল ভাল হইবে না এইরূপ ধারণা হইতে ঐ ধরণের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। কিন্তু শিশু শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে মাতার আশঙ্কা অমূলক এবং যে কাজ তাহাকে করিতে বারণ করা হইতেছে, সেই কাজ বাড়ীর অপর লোকে কিম্বা স্বয়ং জননী করিলেও কোন ক্ষতি হয় না—কেবল তাহার বেলাই যত দোষ। শিশুর মনে এই ধারণা জন্মিলে সে আর নিষেধ মানিবে না। শিশুর নবোন্মেষিত কর্ম্মোৎসাহ একেবারে দমাইয়া না দিয়া তাহাকে কিছু কিছু কাজ করিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সে কাজও শিখিবে, এবং একটা কাজে নিবিষ্ট থাকায় অন্যায় কাজে মন যাইবে না।

ছেলেদের ভূতের ভয়, জুজুর ভয়, হ্যাজকোলার ভয়, হুতুমতুমোর ভয়, কাবুলীওয়ালার ভয়, বর্গির ভয় দেখানো উচিত নয়। এই সকল কাল্পনিক ভয় শিশু-চিত্তকে এমন অভিভূত করিয়া রাখে যে, সে কাপুরুষ না হইয়াই পারে না। অন্ধকারে কঙ্ক-কাটা, মুস্কিল আসান, জটে-বুড়ী প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া বাপ-মা, চাকর-দাসী ছেলে-পুলেদের শাসনে রাখিতে, বশীভূত রাখিতে, বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহার পরিণাম কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। ইহাতে কত যে অনিষ্ট হয়, তাহার কল্পনা করিবারও ইঁহাদের ক্ষমতা নাই।

আবার শিশুর কৌতূহলের মাত্রা এত অধিক, পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এতই প্রবল যে, তাহারা প্রথম প্রথম নিষেধ-বিধি মানিয়া চলিলেও উহার অযাথার্থ্য বুঝিতে তাহাদের বেশী দিন বিলম্ব হয় না। তখন তাহাদিগকে সামলাইয়া রাখা কঠিন হয়। ফলে শিশুর অবাধ্যতা অদম্য হইয়া উঠে।

শিশু পালনের ভার যাঁহাদের লইতে হয়, তাঁহাদিগকে এই কয়টা প্রশ্নের উত্তর আগে নিজের মনে স্থির করিয়া লইতে হয়—

(১) যে শিশুর পালন-ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে, তাহাকে অপর শিশুরা পছন্দ করে কি? অপর শিশুদের সঙ্গে তাহার বনিবনাও কিরূপ?

(২) সে সত্য কথা বলে কি না, অপর শিশুর সুখ-দুঃখের কথা সে ভাবে কি না?

(৩) সে সর্ব্বদা বাধ্য কি না?

(৪) ঘর গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজ সে করিতে পারে কি না? ঘরের কাজে তাহার উৎসাহ আছে কি না, কিম্বা সে কাজ করিতে বিরক্তি বোধ করে কি না?

(৫) সে নিজেই আনন্দলাভ করে কি না, কিম্বা অপরের তাহাকে আনন্দ দিতে হয় কি না?

(৬) তাহার ন্যায়ান্যায় বোধ আছে কি না?

(৭) সে স্বার্থপর কি না, কিম্বা অপরের অধিকার অনধিকারের কথা বিবেচনা করে কি না? খাদ্য জিনিষ, খেলনা প্রভৃতি পাইলে একলা ভোগ করিতে চায় কি না, কিম্বা অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া কি না?

(৮) অন্ধকারে সে ভয় পায় কি না?

(৯) সে স্বেচ্ছায় খাবার-দাবার খায়, না তাহাকে উপরোধ, অনুরোধ, জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইতে হয়?

(১০) তাহার প্রতি তোমার নিজের মনের ভাব কি রকম? তাহাকে তুমি অপরের তত্ত্বাবধানে দিয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার কি না, কিম্বা সর্ব্বদা তাহাকে তোমার নিজের চোখে চোখে রাখা দরকার বিবেচনা কর কি না?

(১১) তাহাকে শাস্তি দিতে হয় কি না? এক রকম অপরাধের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ শাস্তি দিতে হয় কি না?

এই প্রশ্নগুলি এবং এরূপ ধরণের আরও নানা প্রশ্ন নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের মনে তাহাদের যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া লইয়া সেই আলোকে শিশু-চিত্ত অধ্যয়ন করিলে শিশুপালন অনেক সুসাধ্য হইয়া উঠিবে, এবং তাহার ফলও খুব ভাল হইবে।

দাঁতের কদর

[শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল]

দাঁতের উপকারিতা ঃ—

দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি না। ডাক্তার অসলার (William Osler) বলিয়াছেন—"If I were asked whether more physical deterioration was produced by Alcohol or by defective teeth, I would say unhesitatingly:—"Defective Teeth." "আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন মদ কি খারাপ দাঁত এই দুইটীর কোনটাতে মানুষের স্বাস্থ্য অধিকতর নষ্ট করিয়াছে, আমি ইতস্ততঃ না করিয়া বলিতাম "খারাপ দাঁত"। সাধারণতঃ দাঁতের দ্বারা আমরা তিনটী উপকার পাই—

(১) প্রধান উপকার—দাঁত আমাদের খাদ্যগুলি চর্ব্বণ করিয়া সহজপাচ্য করে। খাদ্য রীতিমত হজম হইলে অধিকাংশ রোগ নিকটে আসিতে পারে না। নীরোগ শরীর কার্য্যে উৎসাহ দেয় ও জীবনে শান্তি আনয়ন করে। অপর পক্ষে রুগ্ন শরীর যন্ত্রণাদায়ক ও অকেজো।

(২) দাঁত আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কথা বলিতে সাহায্য করে। যাহাদের কতক দাঁত নাই, তাহাদের কথা অস্পষ্ট হয় ও শ্রুতি-মধুর হইতে পারে না। কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য অন্যকে সন্তুষ্ট রাখা ও নিজ মতে আনয়ন করা। দন্তহীন লোকেরা এই দুইটী কাজের কোনটীতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

(৩) মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাও দাঁতের একটী কাজ। কোন দাঁত পড়িয়া গেলে মুখখানা বিশ্রী দেখায়।

শতকরা কয় জনের দাঁত খারাপ তাহা সঠিক ভাবে বলা অসম্ভব। অনেকে মনে করেন, পরীক্ষা করিলে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের দাঁতে নানা প্রকার ত্রুটী বাহির হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একবার ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মন দিয়াছিলেন এবং এক কমিটী (Students' Welfare Committee) গঠন করিয়া তাহা দ্বারা অনেক ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। দাঁত পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁহাদের ফল কি আমরা ঠিক জানি না। যাহা হউক, দাঁত দ্বারা যখন আমরা এত উপকার পাই, তখন আমাদের কর্ত্তব্য দাঁতের খুব যত্ন লওয়া।

দাঁতের সাধারণ বিবরণ ঃ—

দাঁত আমাদের জীবনে দুইবার উঠে। শৈশবে একবার উঠে, তাহাদিগকে দুধে দাঁত বলে। শিশুর বয়স যখন ৬।৭ মাস, তখন হইতে দুধে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উঠে। এই দাঁতগুলির মোট সংখ্যা ২০টী, প্রত্যেক সারিতে দশটী করিয়া। এই দাঁতগুলি সাধারণতঃ দেখিতে খুব সুন্দর ও ছোট ছোট। স্থায়ী দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত এই দাঁতগুলি থাকিবে।

৬।৭ বৎসর বয়স হইতে দুধে দাঁত পড়িতে থাকে ও স্থায়ী দাঁত উঠে। স্থায়ী দাঁতের মোট সংখ্যা ৩২টী, অর্থাৎ প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টী করিয়া। এই দাঁতগুলি দুধে দাঁত হইতে বড় হয়। এই দাঁতের মধ্যে কয়েকটিকে বলে আক্কেল দাঁত। তাহা ১৭ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বাহির হয়। এই দাঁতগুলি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকার কথা।

সব দাঁতগুলি দেখিতে এক প্রকার নয়। কোনগুলি ধারাল, কোনগুলি চোখা, কতকগুলির উপরিভাগ প্রশস্ত ইত্যাদি। প্রত্যেক রকম দাঁতের পৃথক পৃথক নাম আছে। দাঁতের নানা রকম কাজ করিতে হয় বলিয়া দাঁতও নানা ধরণের। কতকগুলি দাঁতের দ্বারা খাবার জিনিস কর্ত্তন করিবার সুবিধা হয়, কোনগুলি শক্ত খাদ্য

নিবারণ, সর্ব্বদাই না—না—না। ইহার ফলও ভাল হয় না। ছেলেপুলেরাও সংসারের অঙ্গ। সংসারের কাজে তাহাদেরও একটা অধিকার আছে। সন্তানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস—তাহারা সংসারের কাজে হাত দিলে তাহার ফল ভাল হইবে না এইরূপ ধারণা হইতে ঐ ধরণের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। কিন্তু শিশু শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে মাতার আশঙ্কা অমূলক এবং যে কাজ তাহাকে করিতে বারণ করা হইতেছে, সেই কাজ বাড়ীর অপর লোকে কিম্বা স্বয়ং জননী করিলেও কোন ক্ষতি হয় না—কেবল তাহার বেলাই যত দোষ। শিশুর মনে এই ধারণা জন্মিলে সে আর নিষেধ মানিবে না। শিশুর নবোন্মেষিত কর্ম্মোৎসাহ একেবারে দমাইয়া না দিয়া তাহাকে কিছু কিছু কাজ করিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সে কাজও শিখিবে, এবং একটা কাজে নিবিষ্ট থাকায় অন্যায় কাজে মন যাইবে না।

ছেলেদের ভূতের ভয়, জুজুর ভয়, হ্যাজঝোলার ভয়, হুতুমতুমোর ভয়, কাবুলীওয়ালার ভয়, বর্গির ভয় দেখানো উচিত নয়। এই সকল কাল্পনিক ভয় শিশু-চিত্তকে এমন অভিভূত করিয়া রাখে যে, সে কাপুরুষ না হইয়াই পারে না। অন্ধকারে কঙ্ক-কাটা, মুস্কিল আসান, জটে-বুড়ী প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া বাপ-মা, চাকর-দাসী ছেলে-পুলেদের শাসনে রাখিতে, বশীভূত রাখিতে, বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহার পরিণাম কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। ইহাতে কত যে অনিষ্ট হয়, তাহার কল্পনা করিবারও ইঁহাদের ক্ষমতা নাই।

আবার শিশুর কৌতূহলের মাত্রা এত অধিক, পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এতই প্রবল যে, তাহারা প্রথম প্রথম নিষেধ-বিধি মানিয়া চলিলেও উহার অযাথার্থ্য বুঝিতে তাহাদের বেশী দিন বিলম্ব হয় না। তখন তাহাদিগকে সামলাইয়া রাখা কঠিন হয়। ফলে শিশুর অবাধ্যতা অদম্য হইয়া উঠে।

শিশু পালনের ভার যাঁহাদের লইতে হয়, তাঁহাদিগকে এই কয়টা প্রশ্নের উত্তর আগে নিজের মনে স্থির করিয়া লইতে হয়—

(১) যে শিশুর পালন-ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে, তাহাকে অপর শিশুরা পছন্দ করে কি? অপর শিশুদের সঙ্গে তাহার বনিবনাও কিরূপ?

(২) সে সত্য কথা বলে কি না, অপর শিশুর সুখ-দুঃখের কথা সে ভাবে কি না?

(৩) সে সর্ব্বদা বাধ্য কি না?

(৪) ঘর গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজ সে কি করিতে পারে কি না? ঘরের কাজে তাহার উৎসাহ আছে কি না, কিম্বা সে কাজ করিতে বিরক্তি বোধ করে কি না?

(৫) সে নিজেই আনন্দলাভ করে কি না, কিম্বা অপরের তাহাকে আনন্দ দিতে হয় কি না?

(৬) তাহার ন্যায়ান্যায় বোধ আছে কি না?

(৭) সে স্বার্থপর কি না, কিম্বা অপরের অধিকার অনধিকারের কথা বিবেচনা করে কি না? খাদ্য জিনিষ, খেলনা প্রভৃতি পাইলে একলা ভোগ করিতে চায় কি না, কিম্বা অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া খায় কি না?

(৮) অন্ধকারে সে ভয় পায় কি না?

(৯) সে স্বেচ্ছায় খাবার-দাবার খায়, না তাহাকে উপরোধ, অনুরোধ, জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইতে হয়?

(১০) তাহার প্রতি তোমার নিজের মনের ভাব কি রকম? তাহাকে তুমি অপরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার কি না, কিম্বা সর্ব্বদা তাহাকে তোমার নিজের চোখে চোখে রাখা দরকার বিবেচনা কর কি না?

(১১) তাহাকে শাস্তি দিতে হয় কি না? এবং রকম অপরাধের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ শাস্তি দিতে হয় কি না?

এই প্রশ্নগুলি এবং এরূপ ধরণের আরও নানা প্রশ্ন নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের মনে মনে তাহাদের যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া লইয়া সেই আলোকে শিশু-চিত্ত অধ্যয়ন করিলে শিশুপালন অনেক সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে, এবং তাহার ফলও খুব ভাল হইবে।

দাঁতের কদর

[শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল]

দাঁতের উপকারিতা ঃ—

দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি না। ডাক্তার অসলার (William Osler) বলিয়াছেন—"If I were asked whether more physical deterioration was produced by Alcohol or by defective teeth, I would say unhesitatingly:—"Defective Teeth." "আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন মদ কি খারাপ দাঁত এই দুইটার কোনটাতে মানুষের স্বাস্থ্য অধিকতর নষ্ট করিয়াছে, আমি ইতস্ততঃ না করিয়া বলিতাম "খারাপ দাঁত"। সাধারণতঃ দাঁতের দ্বারা আমরা তিনটী উপকার পাই—

(১) **প্রধান উপকার**—দাঁত আমাদের খাদ্যগুলি চর্ব্বণ করিয়া সহজপাচ্য করে। খাদ্য রীতিমত হজম হইলে অধিকাংশ রোগ নিকটে আসিতে পারে না। নীরোগ শরীর কার্য্যে উৎসাহ দেয় ও জীবনে শান্তি আনয়ন করে। অপর পক্ষে রুগ্ন শরীর যন্ত্রণাদায়ক ও অকেজো।

(২) দাঁত আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কথা বলিতে সাহায্য করে। যাহাদের কতক দাঁত নাই, তাহাদের কথা অস্পষ্ট হয় ও শ্রুতি-মধুর হইতে পারে না। কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য অন্যকে সন্তুষ্ট রাখা ও নিজ মতে আনয়ন করা। দন্তহীন লোকেরা এই দুইটী কাজের কোনটীতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

(৩) মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাও দাঁতের একটা কাজ। কোন দাঁত পড়িয়া গেলে মুখখানা বিশ্রী দেখায়।

শতকরা কয় জনের দাঁত খারাপ তাহা সঠিক ভাবে বলা অসম্ভব। অনেকে মনে করেন, পরীক্ষা করিলে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের দাঁতে নানা প্রকার ত্রুটী বাহির হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একবার ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মন দিয়াছিলেন এবং এক কমিটী (Students' Welfare Committee) গঠন করিয়া তাহা দ্বারা অনেক ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। দাঁত পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁহাদের ফল কি আমরা ঠিক জানি না। যাহা হউক, দাঁত দ্বারা যখন আমরা এত উপকার পাই, তখন আমাদের কর্ত্তব্য দাঁতের খুব যত্ন লওয়া।

দাঁতের সাধারণ বিবরণ ঃ—

দাঁত আমাদের জীবনে দুইবার উঠে। শৈশবে একবার উঠে, তাহাদিগকে দুধে দাঁত বলে। শিশুর বয়স যখন ৬।৭ মাস, তখন হইতে দুধে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উঠে। এই দাঁতগুলির মোট সংখ্যা ২০টী, প্রত্যেক সারিতে দশটী করিয়া। এই দাঁতগুলি সাধারণতঃ দেখিতে খুব সুন্দর ও ছোট ছোট। স্থায়ী দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত এই দাঁতগুলি থাকিবে।

৬।৭ বৎসর বয়স হইতে দুধে দাঁত পড়িতে থাকে ও স্থায়ী দাঁত উঠে। স্থায়ী দাঁতের মোট সংখ্যা ৩২টী, অর্থাৎ প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টী করিয়া। এই দাঁতগুলি দুধে দাঁত হইতে বড় হয়। এই দাঁতের মধ্যে কয়েকটিকে বলে আক্কেল দাঁত। তাহা ১৭ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বাহির হয়। এই দাঁতগুলি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকার কথা।

সব দাঁতগুলি দেখিতে এক প্রকার নয়। কোনগুলি ধারাল, কোনগুলি চোখা, কতকগুলির উপরিভাগ প্রশস্ত ইত্যাদি। প্রত্যেক রকম দাঁতের পৃথক পৃথক নাম আছে। দাঁতের নানা রকম কাজ করিতে হয় বলিয়া দাঁতও নানা ধরণের। কতকগুলি দাঁতের দ্বারা খাবার জিনিস কর্ত্তন করিবার সুবিধা হয়, কোনগুলি শক্ত খাদ্য

দ্রব্য সহজে ছিঁড়িতে পারে, আর কতগুলি ভক্ষ্যদ্রব্য সহজে পিশিতে পারে। দাঁতগুলির উপরিভাগ সমতল নহে, তাহাও কাজের সুবিধার জন্য। শারীর-বিধান-তত্ত্ব সম্পর্কীয় পুস্তকে (ফিজিওলজি) দাঁতের গঠন ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

দাঁত রক্ষা :—

দাঁতগুলি রীতিমত ব্যবহার না করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরিষ্কারের দরুণ দাঁতের গায়ে এক প্রকার পাথরের ন্যায় শক্ত জিনিস জন্মে, তাহাও দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর। অনেকে বলেন, দাঁত দিয়া যে রক্ত পড়ে, ইহাই তাহার কারণ। দাঁত রীতিমত পরিষ্কার না করিলে খাদ্য দ্রব্যের টুক্‌রা দুই দাঁতের মধ্যে থাকার দরুণ দাঁত ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। দাঁত রক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি কথা নিম্নে বলা হইবে। আশা করা যায় তাহা অনেকের উপকারে আসিবে।

(১) শিশুকাল হইতেই ছেলে-মেয়েদিগকে দাঁত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করাইতে হইবে। এইটী মা'র কাজ। Habit is second nature। একবার অভ্যাস হইলে দাঁত পরিষ্কার করিতে কোনও ক্রটী কি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। শৈশবে অনেকের দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস না থাকায়, বড় হইয়াও তাহারা দাঁতের প্রতি মনোযোগী হইতে পারে না ; ফলে অল্প বয়সে দাঁত নষ্ট হইয়া যায়।

(২) যখন দুধে দাঁত পড়িয়া স্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে, তখন মাতা ছেলে-মেয়েদের দাঁতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দাঁত নড়িলে যাহাতে যথা সময়ে উঠান হয় তাহা করিতে হইবে। অনেক ছেলে-মেয়ে বেদনার ভয়ে যথা সময়ে নড়া দাঁত উঠায় না, ফলে দুধে দাঁত থাকার অবস্থায়ই স্থায়ী দাঁত উঠে ; ইহাতে মুখ দেখিতে বিশ্রী ও দাঁতগুলি বেঁকাতেড়া হয়। পরে চেষ্টা করিলেও এই দাঁতগুলি পরিষ্কার করা যায় না।

(৩) খুব গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিবে না, কারণ উভয়ই দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর।

(৪) নিম, বট প্রভৃতি গাছের কোমল শাখাগ্রে ব্রাসের মতন করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে। ব্রাস ব্যবহার করিলে খুব শক্ত ব্রাস ব্যবহার করিবে।

(৫) দাঁতন বা ব্রাস দ্বারা দাঁতের বাহির ভিতর ও মাড়ির সমস্ত স্থানই মার্জ্জনা করিবে। মাড়ি হইতে রক্ত বাহির হইলে ভীত হইবে না ; আরও দৃঢ়তা সহিত মার্জ্জনা করিবে।

(৬) দাঁত মাজিবারও নিয়ম আছে। উপরের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে মাজিবে। নীচের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে মাজিতে থাকিবে। এইরূপ দাঁত মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয়। অন্যভাবে মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয় না। এইরূপ দাঁত মাজার অভ্যাস হইলে কয়েক দিন পরে কোনই কষ্ট অনুভব হইবে না।

(৭) দিনে দুইবার দাঁত মাজিবে। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া একবার, আর রাত্রে খাওয়ার পর শয়নের পূর্ব্বে একবার। আমরা সাধারণতঃ প্রাতে দাঁত মাজি, রাত্রে প্রায় কেহই দাঁত মাজি না। দুই দাঁতের মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর খাদ্য দ্রব্যের টুক্‌রা থাকে, তাহা রাত্রে পচিয়া দাঁতগুলির অনিষ্ট করে। ঘুমাইবার পূর্ব্বে দাঁত পরিষ্কার করিলে খাদ্যাবশিষ্টগুলি বাহির হইয়া যায় ও রাত্রে দাঁতের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

(৮) দাঁত মাজিবার জন্য মূল্যবান দন্তমঞ্জনের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। সামান্য একটু লবণ ও ফট্‌কিরির মিহি-গুঁড়ার সহিত পরিষ্কার চকের গুঁড়া দ্বারা মাজিলেই চলে।

(৯) কোন দাঁত নষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা উঠাইয়া ফেলিবে ; কিম্বা তাহার ছিদ্রগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পূরণ করিয়া ফেলিবে। কখনও তাহা ডাক্তারকে দেখাইয়া রাখিবে না ; বেদনা না থাকিলেও ডাক্তারকে দেখাইবে।

(১০) দাঁত পড়িয়া গেলে কি উঠাইয়া ফেলিয়া কৃত্রিম দাঁত বসাইয়া লইবে ; ইহাতে বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

(১১) কতকগুলি খাদ্য আছে যাহা সহজে দাঁত পরিষ্কার করে ; যথা, নানা প্রকার শাক, ফল প্রভৃতি। খাবার শেষে এইরূপ দাঁত পরিষ্কারক খাদ্য খাইলে ভাল হয়।

(১২) "মল-মূত্র পরিত্যাগের সময় দন্তে দন্তে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে। যতক্ষণ মলমূত্র নিঃসারণ হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিয়া থাকিলে শীঘ্র দাঁত পড়িবে না এবং বহুকাল কার্য্যক্ষম থাকিবে।" (নিগমানন্দের ব্রহ্মচর্য্য সাধন]

শেষ কথা :—

আমাদের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে এই বিষয়ের গুরুত্ব পুনঃ স্মরণ করাইতেছি। ডাক্তার হার্ম্মাণ ওয়েবার (Dr. Hermann Waber, M.D., F.R.C.P.) বলেন—"As proper mastication is one of the most powerful and beneficial means of maintaining health, it is self evident that the organs of mastication especially the teeth and the jaws ought to be carefully attended to from early life to old age.

"যখন পরিষ্কার বুঝা যায় যে, স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে, খাদ্য উপযুক্তরূপে চর্ব্বণ খুব কার্য্যকরী উপায়, তখন চর্ব্বণযন্ত্র বিশেষতঃ দাঁত ও মাড়ির শৈশব হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যত্ন লওয়া সঙ্গত।

জন্ম সংরোধ।—

কৃত্রিম উপায়ে জন্ম সংরোধ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া বিলাতে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি বিলাতে বিশপ অব উইঞ্চেষ্টারের নেতৃত্বে একটী কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে পাদরী, চিকিৎসক, আইন ব্যবসায়ী, এবং সম্ভ্রান্ত সাধারণ ভদ্রলোকেরা ছিলেন। কমিটির বিচারে স্থির হইয়াছে যে, ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থ সমস্যার দিক হইতে, জন্ম সংরোধ সঙ্গত নহে। উহাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উহা প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। জন্ম সংরোধের উপায় অবলম্বন করিতে হইলে আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয় সংযমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। জন্ম সংরোধের জন্য কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য লওয়া পাপ। কিন্তু জন্ম সংরোধ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে কি না, এ বিষয়ে কমিটি ইচ্ছা করিয়াই কোন মত প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্য বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের কাউন্সিলের একটী বৈঠকে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবকারী বলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম সংরোধ করা স্বাস্থ্যহানিকর কি না—সভা সে বিষয়ে একটা নিশ্চিন্ত মত প্রকাশ করুন। কিন্তু

অন্য কোন কোন সদস্য আপত্তি করিয়া বলেন যে, সভা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না। জন্ম সংরোধের কৃত্রিম উপায় স্বাস্থ্যহানিকর কি না এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অনেকে ইহা নির্দ্দোষ বিবেচনা করেন; আবার অনেকে ইহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। উভয় পক্ষই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ মতের সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল মত গঠন করিতে পারেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের নিকট পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন এ বিষয়ে প্রতিকূল বা অনুকূল এমন কোন মত প্রকাশ করিতে পারেন না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ, এবং বিশেষ করিয়া চিকিৎসক সম্প্রদায় আদর্শ মতবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এমন একটা যুক্তির পর সভা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই।

মাতৃ-হাসপাতাল।—

অস্থায়ী বড়লাট-মহিষী লেডী লীটন সাহেবা সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করিয়া লেডী ডফারীণ হাসপাতালের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভারতবাসীদের নিকট হইতেই তিনি সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়াছেন, কারণ, তিনি বলেন, ভারতবাসিনীদের জন্যই এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সুখ সুবিধা যখন ভারতবাসীরা একলা ভোগ করে, তখন ইহা পরিচালনের ব্যয় ভারতবাসীদেরই দেওয়া উচিত। গত ইংরেজী বর্ষের (১৯২৪ সালের) ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে হাসপাতালের আয় হইয়াছিল ৫১৮৫৯ টাকা। তন্মধ্যে ভারতবাসীরা মাত্র ২৭৪ টাকা চাঁদা দিয়াছে। প্রায় ৫২ হাজার টাকার সঙ্গে তুলনায় প্রায় তিনশত টাকা যথার্থই অতি নগণ্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং ইহা ভারতবাসীদের পক্ষে অতি লজ্জার বিষ ও বটে। কিন্তু ভারতবাসী ছাড়া ভারতের বাহিরের লোকেরা কত টাকা চাঁদা দিয়াছে, তাহা যখন প্রকাশ নাই, তখন ভারতবাসীর অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব কতখানি তাহা ভাল বুঝা গেল না। সে যাহাই হউক, উক্ত ৫২ হাজার টাকার মধ্যে ১১০০০ টাকা কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত। এই টাকা কাহাদের দেওয়া তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? ভারতবাসী প্রত্যক্ষ চাঁদা হিসাবে বেশী টাকা দিতে না পারুক, কর্পোরেশনের দান কি প্রকারান্তরে ভারতবাসীরই দেওয়া নয়? তা ছাড়া, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময় যিনি যত টাকা দিয়াছিলেন, তাহা ঐ হাসপাতালের দেওয়ালের গায়ে মার্ব্বেল পাথরের দান-তালিকায় উৎকীর্ণ আছে। ভারতবাসী না টাকা দিয়াছে, ভারতবাসী নয় এমন অন্য লোকে বা কত টাকা দিয়াছে, তাহাও সেই তালিকায় দেখা আছে। তাহাতে ভারতবাসীর দানের পরিমাণ কি এতই নগণ্য ও নিন্দার্হ? সে যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস, ভারতবাসীদের কাছে বোধ হয় ঠিকমত চাঁদা চাওয়া হয় না। চাহিলে বোধ হয় তাহারা আরও বেশী চাঁদা দিতে পারিত। লেডী লীটন সাহেবার আবেদন পত্র আমরা ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রে দেখিলাম। দেশী বা ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে এই আবেদন পত্রখানি আমাদের নজরে পড়ে নাই। তাই আমাদের মনে হয় ভারতবাসীদের নিকট হইতে রীতিমত চাঁদার তাগাদা করা হয় না।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল | ৮ম সংখ্যা

টাকা কোথায়?

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

পণ্ডিতেরা বলেন :—

অর্থানাং অর্জ্জনে দুঃখং অর্জ্জিতানাং চ রক্ষণে
আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং কষ্ট সংশ্রয়ম্।

অর্থ উপার্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, রোজগারেও গলদ-র্ম্ম হইতে হয়, আবার উহার ব্যয়েও কষ্ট হয়। অতএব অর্থকে ধিক্।

পণ্ডিত মহাশয়েরা যতই 'ধিক্' 'ধিক্' করুন্ না কেন, 'অর্থ বিনা গতিরন্যথা।' বাঁচিতে হইলে—মনুষ্যের মত থাকিতে হইলে—টাকা চাই। টাকার জোরেতে কত জনশূন্য স্থান জনাকীর্ণ হইয়াছে, কত স্বাস্থ্যহীন দেশ স্বাস্থ্যবান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে টাকা চাই; কারণ ম্যালেরিয়ার মুখ্য কারণ দারিদ্র্য—"malaria is a hunger disease". দেশের নৈতিক স্বাস্থ্য উন্নত হইতেছে না; তারও কারণ জনসাধারণের মর্ম্মগত দারিদ্র্য। দারিদ্র্য জীবনের রস শুকাইয়া দেয়—Poverty freezes the genial current of the soul. দারিদ্র্যের ফলে মনের বৃত্তিগুলি হীন হইয়া যায়। পণ্ডিত কাশীদাসেরও নাক ঘরে চা'ল না থাকিলে কবিতা জমিত না। কবিরা তাই বলেন "দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি নাশী।" দাদাভাই নৌরজী মহাশয় বলেন—আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ফলে জাতীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ পায় "with material wealth go also the wisdom and experience of the country। তাই বলিতেছিলাম টাকা চাই।

চৈত্র বৈশাখে যখন 'দে জল' 'দে জল' রব উঠে, তখন স্বদেশী বক্তৃতার অপেক্ষা টিউব ওয়েলের (tube-well) প্রয়োজন বেশী; এ কথা বক্তারাও স্বীকার করিবেন। পল্লীগ্রামে যখন 'মালোয়ারী জ্বরে' 'এই পরিবার কুইনাইন সেবন করে না'র ছবির মত বাস্তব

চিত্র ঘরে ঘরে প্রকট হয় তখন 'আনোফিলিস' 'কিউ-লেক্সে'র সূক্ষ্ম প্রভেদ লইয়া প্রবন্ধাদি না লিখিয়া ঘরে ঘরে কুইনাইন দিলে যে বেশী কাজ হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জনসাধারণ যখন তারস্বরে বলে "ময় ভূখা হুঁ" আমরা তখন বলি, অপেক্ষা কর—'দিন আগত ঐ'। গণমঙ্গল অর্থ ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা (To the masses, the problem is one of bread and salt)। এ কথা ভুলিলে চলিবে না—মনকে চোখ ঠারিয়া লাভ কি ? কথাটা দাঁড়াইল এই যে টাকা চাই ; কিন্তু টাকা কোথায় ?

টাকার কথা উঠিলেই বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, কেন, টাকার অপ্রতুল কি ? Government's money is people's money. সরকারী তোষাখানা—ও ত আমাদেরই। আসুন দরখাস্ত করি—agitation করি—আবেদন ও নিবেদন চালাই—টাকা আসিবেই।

অপেক্ষাকৃত অল্প বিজ্ঞেরা অর্দ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান যথা District Board, local boardএর দিকে তাকাইয়া দিনাতিপাত করেন। অর্থ না মিলিলে অভিমান করেন।

'রায়ত বন্ধুরা' জমিদারের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেদের আত্ম প্রবঞ্চনা করেন—জমিদার প্রজার বাকী খাজনার বহরের উল্লেখ করিয়া বলেন, আমারই দিন চলে না ; প্রজার দিকে তাকাইলে আমার উপায় কি হইবে ?

এইরূপে কখনও সরকারের নিকট কখনও জমিদারের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া আমরা দিনাতিপাত করিতেছি, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি। অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিরাট এই ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়াস না করিয়া অর্থ স্বষ্টির চেষ্টা করিলে আমরা এতদিন অর্থের মুখ দেখিতাম।

এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি—'যেমন তেমন চাকরী দুধ ভাত।' দুধ ত সহরে পাওয়াই যায় না—চাকরী করিয়া দুবেলা দুই মুঠো ভাতও অনেকের জুটিতেছে না—ইহা ত প্রত্যহ দেখিতেছি। চাকরীর মোহ আমাদে যায় নাই তবে চাকরী না জোটাতে অনেকে গত্যন্তরে কথা—অর্থস্বষ্টির কথা ভাবিতেছেন। ইহা শুভলক্ষণ।

অর্থস্বষ্টির কথা মনে হইলেই আমাদের Bible Talentএর গল্পটী মনে হয়। কৃষক-পুত্রেরা যে নিরাশ হইয়া আবিষ্কার করেন যে, Talent মাটি নীচে পোঁতা নাই—উহা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে,—আমরাও যতদিন না বুঝিব কোন গৌরীসেন অর্থদান করিয়া আমাদিগকে বাঁচাই পারিবে না—আমরাই অর্থস্বষ্টি করিয়া বাঁচিব, তত মুক্তি নাই। প্রথম কথাটী হইতেছে—ভিক্ষায়াং নৈব চ।

অর্থস্বষ্টি করিতে হইবে। সে জন্য উদ্যম চাই—চেষ্টা চাই। "ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" কেবল উদ্যমেই হইবে না—বিষয়বুদ্ধি চাই tact চাই। এই বাংলায় আমরা কেরানীগিরি করি মরি আর মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ক্রোড়পতি হয়—ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ভিন্ন আর কি বলিব ? আমরা যখন Scheme করি—ভাবনা চিন্তা করি— তখন মাড়োয়ারী কাজে নামিয়া পড়ে। কাজে নামিয়া একটা ধাক্কা আমরা নুইয়ে পড়ি। তখনও দেখি মাড়োয়ারী বাংলার সুদূর পল্লীতে তার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী লইয়া আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। অর্থস্বষ্টির জন্য উদ্যম ও বিষয়বুদ্ধি চাই।

নিন্দুক তখনি বলিয়া উঠিবেন—ম'শায়, অর্থ ত আপনি করিতেছেন—ক্ষেত্র কোথায় ? হাওয়ায় ব্যবসা ফাঁদিতে পারি না—তাতে যে Alnascarএর অবস্থা হইবে। তাঁহাদের নিকট আমার একটা কথা—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোণা।

আমরা কৃষিকাজ জানি না—তাই সোণা ফলে না ক্ষেত্র আছে।

(ক্রমশঃ

বাংলার মাটী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার]

২। জমির রাসায়নিক উপাদান—সাধারণতঃ মাটিতে আমরা নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত হই।

মৃত্তিকায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত রূঢ় পদার্থগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে থাকে ; যথা—

১।	অক্সিজেন	৪৪	...	৪৮
২।	সিলিকন্	২৪	...	৩৬
৩।	য়্যালুমিনিয়ম	৫	...	১০
৪।	লৌহ	২	...	১০
৫।	ক্যালসিয়াম্	১	...	৬
৬।	ম্যাগ্নেসিয়াম	১	...	৩
৭।	সোডিয়ম্	১	...	৩
৮।	পোটাসিয়াম্	১	...	৩
৯।	অন্যান্য পদার্থ	১	...	১
				১০০

৩। মৃত্তিকার রস সঞ্চালন :—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জগৎ পর্য্যন্ত দেখা যায়, সকলের শরীর মধ্যে রক্ত বা রস সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। সেই রস সঞ্চালনের পথ কোন প্রকারে রুদ্ধ হইলে, জীব হউক বা উদ্ভিদ হউক—অধিকক্ষণ সতেজ না জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের লোপকূপগুলিকে কোন রং অথবা তৈল দ্বারা একেবারে লেপিয়া দিলে সে কতক্ষণ বাঁচিতে পারে ? উদ্ভিদের পত্রদলকে ঐরূপে প্রলিপ্ত করিয়া দিলে উদ্ভিদও বাঁচিতে পারে না। মৃত্তিকার রস-সঞ্চালনের শক্তি আছে। রস গ্রহণের ও বর্জ্জনের পথ আছে। অধিক কি প্রাণীদিগের ন্যায় জীবনও আছে। জীবনীর শক্তি বা কার্য্যকারিতা- উদ্ভিদ শরীর দ্বারা প্রকাশিত হয়।

মনুষ্য বা জীব দেহে যেমন শোণিত সঞ্চালনের (circulation of blood) ব্যবস্থা আছে, মৃত্তিকার মধ্যেও সেইরূপ রস সঞ্চালন (circulation of moisture) ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। উক্ত সঞ্চালনী শক্তির মূলে উত্তাপের কার্য্য দেখা যায়। জীব শরীরে যতক্ষণ উত্তাপ থাকে, ততক্ষণ তাহাতে শোণিত সঞ্চালিত হয়। কিন্তু যেমন উহা উত্তাপবিহীন হয়, অমনই সঞ্চালন ক্রিয়া স্থির হয়। মরণোন্মুখ ব্যক্তির হস্ত পদাদি ক্রমে ক্রমে অবশ বা স্থির হইয়া আসে। তখন সেই সকল অঙ্গে আর উত্তাপ পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, সঞ্চালন ক্রিয়াই উত্তাপের মূল। উত্তাপই সঞ্চালনের মূল। মাটির মধ্যে যে রস থাকে, তাহা সূর্য্যোত্তাপে সঞ্চালিত হয়। সূর্য্যোত্তাপ যখন না থাকে, তখন ভূগর্ভস্থিত রস স্থির থাকে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের অভাব বশতঃ মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ রস অল্লাধিক জলহীন ভাবে অবস্থান করে। তবে সামান্য পরিমাণ সঞ্চালন থাকে ; তাহা ভূগর্ভস্থিত উত্তাপের ফলে।

যাহা হউক, মৃত্তিকা মধ্যে কিরূপে রস সঞ্চালিত হয়, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। গৃহস্থ যখন কটাহে করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিয়া থাকেন, তখন যদি সেই কটাহের ভিতরে লক্ষ্য রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দুগ্ধ যত গরম হইতে থাকে ততই তাহা উলট পালট হয় ;—নিম্নের দুগ্ধ উপরে, উপরের দুগ্ধ নিম্নে যাইতে থাকে। সুপরিষ্কৃত কটাহে জল রাখিয়া যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট দেখা যায়। নিম্নের জল যত গরম হইতে থাকে ততই উপরে ঠেলিয়া উঠে ; উপরের জল কাজেই নিম্নে চলিয়া গিয়া আবার উত্তপ্ত হয়। সেই প্রণালীতে

সূর্য্যোত্তাপে ভূমির উপরিভাগ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে মৃত্তিকার অণুপরমাণুসমূহ দ্বারা বাহিত হইয়া সেই উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেই ভূগর্ভ মধ্যে রস সঞ্চালিত হয়।

৪। সারের প্রয়োজনীয়তা ঃ—ভারতের মৃত্তিকা চিরকাল সুফলা বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই। এই জন্য অতি অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে ভারতীয় কৃষকগণ স্বীয় অভাবোপযোগী ফসল প্রাপ্তি মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকে। পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণ কৃষকের এখনও বোধগম্য হয় নাই। যত দিন কৃষকগণ সার বিষয়ে ঈদৃশ হতাদর প্রদর্শন করিবে এবং তাহার উপকারিতা বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, তত দিন তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে এবং ক্ষেত্রেরও উর্ব্বরতা স্থায়ী হওয়া অনিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত কথা লইয়া বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সারের সহিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের কতদূর নিকট সম্বন্ধ। একখণ্ড অব্যবহৃত ও পতিত জমি লইয়া বৎসরের পর বৎসর বিনা সারে আবাদ করিলে নিশ্চিত বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রথম আবাদ হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই ফসলের পরিমাণ ও গুণ হ্রাস হইয়া আসে। প্রথম বৎসর যে প্রকার ফসল আদায় হয়, পরবর্ত্তী বৎসরে কখনই সেরূপ হয় না, কিন্তু সাধারণ কৃষকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কিম্বা করে না। তাহার কারণ এই যে, কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগে জমির উর্ব্বরতা সাধিত হয় এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ষাকালে যে সমুদায় ক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, তাহাতে অন্য স্থান হইতে পলিরূপে অনেক সার স্বতঃই আসিয়া পড়ে ও স্থানীয় উদ্ভিজ্জাদি পড়িয়া সারে পরিণত হয়। এইরূপ স্বাভাবিক কারণে জমির কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ক্ষেত্রে সার পদার্থ সঞ্চিত হয়; দ্বিতীয়ত,— উল্লিখিত স্বাভাবিক উপায়ে যে যে পদার্থ আসিবার তাহাও আসিয়া থাকে।

জমিতে একবার ফসল হইলে তাহার সহিত ... অনেক সার চলিয়া যায়। জমিতে যদি সেই ... কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত করা না যায়, তাহা ... ক্ষেত্রের সার বরং আরও হ্রাস পাইয়া থাকে। ... জন্য বিনা সারে একই ক্ষেত্রে বারম্বার আবাদ ক... জমি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অব... একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পাঠক যাহাতে বু... পারেন, এজন্য এস্থলে একটী উদাহরণ দেওয়া যা... পারে। কয়েক বৎসর হইতে একখণ্ড জমিতে গ... আবাদ হইত। তাহাতে কোন রূপ সার ক... দেওয়া হয় নাই বা হইত না। সুতরাং উক্ত জ... পরিণাম কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত উহার ... আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই ব... রাখিতেছি যে, সেই জমি উচ্চতল ও বর্ষায় ডুবিয়া ... না। অথবা অন্য স্থানের জল আসিয়া তথায় পড়ে ... যাহা হউক, প্রথম বৎসর দেখা গেল, গহমার গাছ... ৮.৯ হাত দীর্ঘ হইল এবং তাহার শ্রীও সুন্দর হই... দ্বিতীয় বৎসর—তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হই... আর দুই বছর পরে যাহা হইবে পাঠক তাহা বু... লউন। একেই ত গহমার গাছ ইক্ষুর ন্যায় জমি... এক বছরেই সার হীন করিয়া ফেলে, তাহাতে বা... বিনাসারে উহার আবাদ হইলে যে উহার সা... একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তাহাতে স... কি ? সকল ফসল সমভাবে জমির সার পদার্থ অপ... করে না। কোন ফসল অধিক পরিমাণে, কোন ফ... অল্প পরিমাণে জমির সার শোষণ করিয়া থাকে। ... সম্বন্ধে বাংলা গভরমেণ্টের কৃষি বিভাগের ভূত... সহকারী ডিরেক্টার বাবু নৃত্য গোপাল মুখোপাধ্যা... মত উদ্ধৃত করা গেল।

এক বিঘা জমিতে যদি ৮ মণ ধান হয়, তবে ... ধান ও তাহার খড় পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিলে ... ছাইয়ের ওজন আন্দাজ অর্দ্ধ মণ হইবে। এক ... জমিতে ৫০ মণ আলু হইলে প্রায় দশ ... নাইট্রোজেন জমি হইতে খরচ হইয়া যায়; কিন্তু ...

...মণ ধান্য দ্বারা কেবল ... সের নাইট্রোজেন খরচ হয়। ঐ রূপ ধান্য ফসল দ্বারা বিঘা প্রতি /৪ সের আন্দাজ পটাস খরচ হয়। কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা বিঘা প্রতি ...ড় দেড় সের। কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা /৪ সের চুণ খরচ হইয়া যায়।

জমি হইতে যেমন ফসল লওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই অংশ পূরণ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। গাভীকে না খাওয়াইলে উহা দুধ দিতে পারে না। মধু ভাণ্ড হইতে যে পরিমাণ মধু বাহির করিয়া লওয়া যায়, সেই পরিমাণে উহা পূর্ণ করিয়া না দিলে শীঘ্রই ভাণ্ড শূন্য হইয়া পড়ে। গাভীকে অনাহারী রাখিয়া নিত্য দোহন, মধু ভাণ্ডকে পুনঃ পূরণ না করিয়া ক্রমাগত মধু আহরণ এবং বিনাসারে একক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদ করা একই কথা। মৃত্তিকা মধ্যে যে সার বস্তু আছে তাহাকে আমরা মূলধন মনে করি। সেই মূলধনের যাহা উপস্বত্ত্ব, তাহাই ব্যবহার করা বিচক্ষণতার কার্য্য। ক্ষেত্র হইতে ফসল লইয়া তাহাতে সার প্রদান না করিলে মূলধন খরচ হইয়া থাকে। কিন্তু পুনরায় যদি যথা পরিমাণে উপযুক্ত সার দ্বারা ক্ষেত্রের অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উপস্বত্ব ভোগ করা যায়। এই কথাটী বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত। এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে ক্ষেত্রের সারবস্তু কখনই নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার উর্ব্বরতাও চিরদিন সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইহা দ্বারা লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা স্থায়ীভাবে এক স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষরূপে এ কথাটী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা নিতান্ত উচিত।

আমাদের দেশে সারের প্রথা তাদৃশ প্রচলিত না থাকায় দেশের প্রায় সমুদায় সার নষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশের সার নষ্ট হওয়া অলক্ষণের বিষয়। আমরা দেখিতে পাই, কি সহরে কি পল্লীগ্রামে, যাবতীয় উদ্ভিজ্জের আবর্জ্জনা এবং পুরিষাদি সমুদায় সার—প্রায় অপচয় হইয়া থাকে। বড় বড় সহরের যাবতীয় আবর্জ্জনা গাড়ি বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু এ সকল যদি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের কত যে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং মিউনিসিপালিটীগণও প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

জাপানবাসী প্রায় বিনা সারে কোন ফসলের আবাদ করে না। তাহাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস যে without continuous manuring there can be no continuous production. A small portion of what I take from the soil is replaced by nature (atmosphere and rain), the remainder I must restore the ground." অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে সার প্রদান ব্যতীত বারোমাস ফসল জন্মিতে পারে না। ক্ষেত্র হইতে যাহা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার কিয়দংশ প্রকৃতি হইতে সঞ্চিত হয়, অবশিষ্ট অংশ আমাকে দিতে হইবে। এই কয়টী কথা অমূল্য সত্য এবং প্রত্যেক কৃষকেরই তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। অনুর্ব্বরা জমি হইলে সার ত দিতেই হইবে, আর উর্ব্বরা জমি হইলে, তাহাতে যথা পরিমাণে সার প্রদান করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত সার হ্রাস না হইয়া সমভাবেই থাকে।

সার প্রয়োগ দ্বারা যে ক্ষেত্রের কেবল উর্ব্বরতা রক্ষিত হয় তাহা নহে। ক্ষেত্রে সার দিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। সার দ্বারা ফসলের পরিমাণ, পুষ্টি, আকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সার প্রয়োগ দ্বারা সাধারণতঃ ফসল মাত্রেই উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বিশেষ সার দ্বারা ফসল বিশেষের প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকার অভাব, ফসলের প্রয়োজন ও সারের কার্য্য না জানিয়া যথেচ্ছ ভাবে সার প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা সার, জমি বা ফসলের দোষে নহে; ক্ষেত্রস্বামীর অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন করাইতে হইলে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে

তাহার রোগ নির্ণয় করিতে হয় এবং ধাতু ও ঔষধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়, ক্ষেত্রে সার দিবার সময় ঠিক সেই প্রকার বিবেচনা আবশ্যক। অম্ল বিশিষ্ট জমিতে (calcarious soil) স্বভাবতঃই চূণের আধিক্য থাকে, কিন্তু তাহাতে চূণের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যদি তাহাতে চূণ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ফসলের অনিষ্ট হয়। আবার ক্ষেত্রে যদি এক মণ চূণ দিলে জমির অভাব পূরণ হয়, তাহাতে দুই তিন মণ চূণ দিলে জমির ক্ষতি হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া অবিমৃষ্য ভাবে সার প্রদান করা হয় বলিয়া সার সম্বন্ধে সময় সময় অনেক গ্লানি শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ চিরকালই সারের প্রয়োজনীয়তা আছে ও থাকিবে। পূর্ব্বে সারের যে গুণ ছিল, এক্ষণেও তাহা আছে; এবং ভবিষ্যতেও তাহা থাকিবে। সকল দিক স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া সার দিতে পারিলে মুষ্টিযোগের কার্য্য হইয়া থাকে।

৫। অক্ষত জমির উর্ব্বরতা ঃ—যে জমি বহুকাল পতিত ও অনাবাদী তাহাকে অক্ষত বা আচোট জমি বলে। আচোট জমিকে ইংরাজীতে (virgin soil) কহে। বাংলা দেশের নানা স্থানে এরূপ পতিত জমি বিস্তর দেখা যায়। ঈদৃশ জমি যে পতিত থাকে, তাহার দুইটী কারণ আছে; প্রথমতঃ স্থানীয় প্রদেশ বা জেলায় লোকাভাব এবং দ্বিতীয় চাষবাসের পক্ষে মৃত্তিকার অনুপযোগিতা!

যে সকল মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠন আবাদোপযোগী অথচ নানা কারণে পতিত থাকিয়া গুল্ম লতাদি দ্বারা বহু দিবস হইতে আবৃত, তাহা সমধিক পরিমাণে উর্ব্বর হইয়া থাকে। একেই ত চাষের আবাদ না হইলে জমির পূর্ব্ব সঞ্চিত বা স্বাভাবিক সার পদার্থ সমূহ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে, তাহাতে আবার বহু দিবসের জঙ্গল থাকায়, সেই জঙ্গলের পাতা, লতা, শাখা-প্রশাখাদি পচিয়া গিয়া জমিতে মজুত থাকে। অনেকে মনে করিতে পারেন, যে ফসলের আবাদ করিলে যেরূপ জমির উর্ব্বতা হ্রাস পায়, তদ্রূপ জঙ্গল জন্মিয়াও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে নষ্ট করে। এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক তাহা নহে, কারণ ক্ষেত্রে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাতেই জমির সারাংশ ন্যূনাধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সমুদায় উদ্ভিজ্জাদি তথায় জন্মিয়া থাকে, তাহা যদি ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া লওয়া না যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের পূর্ব্ব সঞ্চিত সারাংশ নষ্ট না হইয়া রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় ক্ষেত্র মধ্যেই থাকিয়া পায়। অধিকন্তু সেই সকল উদ্ভিদের দ্বারা বায়ুস্থিত পদার্থও ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়। এতদ্ব্যতীত, সেই উদ্ভিদগণ মৃত্তিকার অভ্যন্তর দেশ হইতে নানাবিধ সার পদার্থ উপরিভাগে আনয়ন করিয়া ক্ষেত্রকে সরস রাখে। অক্ষত জমিতে সচরাচর নাইট্রোজন নামক পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে। এই কারণে উহাতে যে ফসল বপন করা যায় তাহাই সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হয়।

জমি যতই অধিক দিনের পতিত হয়, ততই জঙ্গলময় হয়, ততই সারবান হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রের জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহার উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং অনাবশ্যক স্থলে ক্ষেত্রের জঙ্গল কাটিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। আর যদি নিতান্তই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্র মধ্যে পচিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে জমির সার পদার্থ জমিতেই বর্ত্তমান থাকে। অধিকন্তু ঐ সকল উদ্ভিদ সংগৃহীত নানাবিধ সার জমিতে সংযোজিত হয়।

রৈইসবাগ মধ্যে কিয়দংশ জমি বহুকাল হইতে অনাবাদী ছিল এবং তাহাতে এতই উলুঘাস ও জঙ্গলাদি জন্মিত যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। গত ১৮৯২ সালে উপরিউক্ত জমির জঙ্গল মুক্ত করতঃ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, তিন চারি মাস তদবস্থাতে ফেলিয়া রাখা হয়। তদনন্তর তাহাতে পাটের তৎপর সরিষার আবাদ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, আবাদ ক্ষেত্র অপেক্ষা নূতন ক্ষেত্রে প্রায় ত্রিগুণ অধিক ফসল হইয়াছিল এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার ও কোপাইবার খরচাদি বাদে দুই ফসলে বিঘা প্রতি ২৫ টাকা লাভ ছিল।

যে সকল জমি লবণ, ক্ষার, চূণ প্রভৃতির আতিশয্য বশতঃ অনেক দিবসাবধি পতিত আছে, তাহাও সারবান সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সকল জমিতে সমধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযোজিত করিলে তাহা অধিকতর সারবান হইয়া উঠে, নতুবা তদবস্থাতেই চাষ করিলে গুরু পদার্থের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাদৃশ আশাজনক ফসল উৎপন্ন হয় না। তবে ইহা স্থির যে, যে কোন প্রকার জমিই হউক, আবাদী অপেক্ষা পতিত জমির উর্ব্বরতা অধিক।

৬। উদ্ভিদের আহার ঃ—মনুষ্য ও জীব-জন্তুর যেমন আহারের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদেরও তেমনি আহার্য্য আবশ্যক। মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প উদ্ভিদের এই চারিটী অঙ্গ থাকে। উদ্ভিদের মূলই তাহার মুখ। মূল মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করে, কাণ্ড তাহা বহন করিয়া পত্রে লইয়া যায়, পত্রে সেই ভুক্ত পদার্থের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের আহারোপযোগী সার প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন নাইট্রোজেন-প্রধান, ফস্ফরাস-প্রধান, পটাস-প্রধান ও চূণ-প্রধান সার। পোটাসিয়াম নাইট্রেট, আমোনিয়ম ক্লোরাইড প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, রক্ত-রক্ত প্রভৃতি জান্তব পদার্থ, খৈলাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ, ইহাতে উদ্ভিদেরা আহারোপযোগী নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

হাড়চূর্ণ, হাড়ভস্ম অথবা এপেটাইট ও সুপার প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কিম্বা ওয়ানো হইতে উদ্ভিদ ফস্ফরাস সংগ্রহ করে। গোময়, কাষ্ঠ, কিম্বা চারা গাছ ভস্ম অথবা কাইনাইট পোটাসিয়াম সলেফট বা মিউরিয়েট প্রভৃতি ধাতব পদার্থই পটাস প্রাপ্তির উপায়। এদেশের মৃত্তিকায় চূণও অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তাহাদের নিজ প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করে। অনাহার বা অল্পাহারে মানুষের যেমন কষ্ট হয় উদ্ভিদেরও সেইরূপ হয়। অল্পাহারে তাহারা ক্ষীণ হয় এবং অনাহারে মরিয়া যায়।

কিন্তু কি প্রকারে উদ্ভিদ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মূল দ্বারা তাহারা আহার করে। মনুষ্য ও অধিকাংশ জন্তু যেমন মুখ দ্বারা তাহাদের খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করে ও লালা মিশ্রিত করিয়া লয়—উদ্ভিদ তাহা পারে না। উদ্ভিদ মূল দ্বারা কেবল মাত্র মৃত্তিকাস্থিত রসাকর্ষণ করিতে সমর্থ। সুতরাং উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সমুদায় খাদ্য এই রসে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। জলই উদ্ভিদের খাদ্য সমূহ দ্রব করে। জল দ্বারা দ্রব না হইলে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং জলই উদ্ভিদের আহারের প্রধান সহায়। মৃত্তিকার কঠিন পদার্থ উদ্ভিদের শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না; উদ্ভিদ প্রথমে সেগুলি জলের সাহায্যে তরল করিয়া পরে গ্রহণ করে। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায়—জল না পাইলে উদ্ভিদ প্রায়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে, শেষে মরিয়া যায়।

ধান, যব প্রভৃতি গুচ্ছমূলধারী শস্যের মূল মৃত্তিকার নিম্নে অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের ভাসা শিকড় জল না পাইলে শীঘ্র মরিয়া যায়। বড় লম্বা মূলধারী উদ্ভিদ মৃত্তিকার খুব নীচে প্রবেশ করিয়া জল সংগ্রহ করে, তাই অতি রৌদ্রেও মরিয়া যায় না। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ মূল দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করে। মূল এবং কাণ্ড অসংখ্য কোষে গঠিত। উহা কোষ সমষ্টি মাত্র। বায়ু মূলানুকোষে প্রবেশ করিয়া কোষ হইতে কোষান্তরে নীত হয়। অবশেষে কাণ্ডের নবজাত অংশ পথ বাহিয়া পত্রে বিস্তৃত হয়।

উদ্ভিদ মানুষের ন্যায় মূল দ্বারা আহার গ্রহণ করে, পত্রের দ্বারা তেমনি শ্বাস প্রশ্বাস লয়। বায়ুস্থিত অক্সিজেন শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ না করিলে কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। প্রচুর আহার সত্ত্বেও জলাভাবে যেমন প্রাণী বাঁচে না, বায়ু অভাবেও তেমনি

বাঁচে না। বিশুদ্ধ অক্সিজেন কিন্তু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী নহে। অক্সিজেন সকল বস্তুকে দগ্ধ করে, কিন্তু অক্সিজেন বাষ্প বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া উহা প্রাণী মাত্রেরই গ্রহণোপযোগী থাকে। পত্রান্তর্গত রস ও পত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অক্সিজেন বাষ্প এতদুভয়ের মিলনে উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মাণের উপাদান সমূহ উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর ন্যায় উদ্ভিদ জীবনে আর একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের প্রয়োজন। সেটী সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোক দ্বারাই উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উহার পত্রকোষে এক প্রকার হরিদ্বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি দ্বারা উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহার অভাবে পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে। সূর্য্যালোকের অভাব হইলে হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি সাদা হইয়া যায়, তখন সেগুলিতে পরিপাক কার্য্য হয় না। সূর্য্যালোকেই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির জন্ম এবং তাহাতেই তাহার কার্য্যকারিতা।

প্রাণী মাত্রেই কেবল জীবিত থাকিয়া সন্তুষ্ট নহে নূতন জীব সৃষ্টি করিতে ব্যগ্র। উদ্ভিদে এইগুণ বিদ্যমান। সেইজন্য তাহারা তাহাদের অঙ্গ বিশেষে পুষ্টিকর পদার্থসমূহ সঞ্চিত রাখে। ধান, যব, গম, মটর, মসুর প্রভৃতি ও অধিকাংশ ফলের গাছের বীজে এই পুষ্টিকর অংশ সঞ্চিত থাকে এবং তাহা হইতে আবার গাছ হয়। কতকগুলি মূলজ খন্দর যথা— গোলআলু, লাল আলু, মূলা, শালগম, বীট গাজর প্রভৃতির পুষ্টিকর পদার্থ মূল কিম্বা কাণ্ডে সঞ্চিত হয়।

উদ্ভিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইলে মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহারোপযোগী কি কি পদার্থ আছে তাহা দেখিব। কোন উদ্ভিদের কি খাদ্য তাহারও বিচার করিব। জমিতে রসাভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব এবং জল সেচনের ব্যবস্থা করিব। ক্ষেতে বা বাগানে কখনও বায়ু চলাচলের পথ রোধ না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব। এবং উদ্ভিদ কখনো সূর্য্যালোকের অভাব অনুভব না করে—তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিব। কিম্বা ছোট গাছগুলিকে প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছায়া প্রদান করিব। তবেই উদ্ভিদের পরিপাক ও পোষণ সম্পূ হইবে, তবেই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হইবে এবং যথোপযু ফল ফুল প্রদান করিবে।

৭। পটাস্ সারের উপকারিতা ঃ—পটা অথবা পটাস্ সারের উপকারিতা অনেকটা জমির উপ নির্ভ করে। কাদা জমিতে প্রায়ই পটাস্ থাকে এ এরূপ জমিতে পটাস দিয়া বড় একটা উপকার দর্শেনা এরূপ জমিতে বরং পটাস বিহীন সার দিলে জ অপরাপর উপাদান উদ্ভিদের শোষণযোগ্য হয়। ক্ষা যুক্ত সার (যেমন সোডা, চূণ প্রভৃতি) অদ্রব সিলিকেসমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া পটাসকে মুক্ত করি দেয়। নাইট্রেটসমূহ ব্যবহার করিলে উদ্ভিদের শি মৃত্তিকার অনেক দূর প্রবেশ করে এবং তজ্জন্য আব রস শোষণ করিবার অনেক স্থান প্রাপ্ত হয়।

নাইট্রোজেন ব্যবহারে উদ্ভিদের আয়তন বৃদ্ধিপ্রা হয় এবং ফস্ফেটে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাকে। পক্ষান্ত পটাস্ উদ্ভিদের উৎকর্ষতা সাধন করে। দৃষ্টান্ত স্ব গোধুমের কথা বলা যাইতে পারে। এ স্থলে নাইট্রো জেন ও ফস্ফেটে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কি পটাস দ্বারা শস্য মোটা ও উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত হয়। শুঁ জন্য যে সকল ফসল চাষ হয়, যেমন চীনের বাদা ছোলা প্রভৃতি কিম্বা পাতা ফসল (তামাক, বাঁধাক প্রভৃতি) অথবা মূল ফসল যাহা শ্বেত সারের জন্য করা হয় (আলু, মেটে আলু প্রভৃতি) এই সম ফসলে পটাস প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফল গাছে পটাস সার দিলে ফলের রং এবং স্বাদ উৎকৃ ভাল হয়, টক্ স্বাদযুক্ত ফলে পটাসের উপকারি বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গ দেশের কৃষকে কদলীর জন্য কাঠের ছাই উৎকৃষ্ট সার বলিয়া বিবে করে। চুরুটের তামাকে যে পটাস প্রয়োগে তাম পাতা ভাল হয় তাহা অনেকেই জানেন। ধান, প্রভৃতি গাছে পটাস সার দিলে ডাঁটা শক্ত হয়; ইহা

শস্য ভাল হয় এবং পশু খাদ্য হিসাবে ডাঁটার মূল্য বৃদ্ধি পায়। পটাস সারের আর একটী উপকারিতা এই যে ইহার প্রয়োগে গাছের ছত্রক রোগ কম হয়। গমের রষ্ট নামক রোগ পটাস সারে উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। তিন প্রকারের পটাস সার প্রধানতঃ পাওয়া যায়। ক্রাইনাইট, ফসফেট অব পটাস ও পটাস ক্লোরাইড। প্রথমোক্ত সার জার্ম্মাণ দেশ হইতে আমদানী হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সকল সারের এতদ্দেশে অধিক চলন হয় নাই। এখানে ছাইই পটাস সার রূপে সমধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। গোরু ও পশুমূত্র কিন্তু মূল্যবান পটাস সার এবং উহাদের অধিক প্রচলন হওয়া আবশ্যক।

৮। গোবর সার ঃ—ঘোড়া গরু ভেড়া প্রভৃতি কৃষি ক্ষেত্রের পালিত পশুর মল মূত্রকে আমরা গোবর রূপে বর্ণনা করিব। সকল পশুর গোবর একরূপ নহে। খাদ্য, বয়স ও স্বাস্থ্য অনুসারে পশুদিগের গোবরের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার মলের মধ্যে, ঘোড়ার মল অধিক সারবান, কারণ ঘোড়া অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। অল্প বয়স্ক বর্দ্ধনশীল বা কৃশাঙ্গ পশুর পুরীষ অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত বা স্থূলকায় পশুর পুরীষ অধিক মূল্যবান। ইহার কারণ এই যে, বর্দ্ধনশীল বা কৃশাঙ্গ পশুর দেহ গঠনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণে সার পদার্থের প্রয়োজন হয়; এবং শেষোক্ত পশুদিগের খাদ্যের প্রায় সমস্ত সার পদার্থ মল মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। জিড়াস বলদ এবং ঠারা গাইয়ের গোবর পরিশ্রমী বলদ এবং দোয়াস গাভীর গোবর অপেক্ষা উত্তম সার। পরিশ্রমী বলদের খাদ্যের শত করা ৯০—৯৫ ভাগ সার পদার্থ নিঃসৃত হয়। কিন্তু বর্দ্ধনশীল পশু ও দোয়াস খাদ্যের ৫০—৭৫ ভাগ সার পদার্থ মল মূত্রের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। মূল কথা যাহাদের জীবন ধারণ করিতে অল্প মাত্রায় পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন তাহারাই অধিক সারবান জিনিষ মল মূত্রের সহিত পরিত্যাগ করে।

মল মূত্র রক্ষার ব্যবস্থা এদেশে একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোময়াদি সাধারণতঃ গোশালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। তথায় রৌদ্র বৃষ্টিতে ইহার অনেক সার পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। বিলাতের রাজকীয় কৃষি সমিতির সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডাক্তার ভোলকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ৯ মাস মধ্যে, এইরূপ রক্ষিত সারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সুব্যবস্থামত সার রক্ষা করিলে ইহার এক পঞ্চমাংশের অধিক নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হইতে পারে না। অন্য দিকে তাজা গোবর জমিতে দিলে ইহা শীঘ্র পচিয়া দ্রবনীয় হয় না; এমন কি, এঁটেল মাটিতে ইহার কতকাংশ বহু বৎসর পর্য্যন্ত অদ্রবনীয় ভাবে অবস্থিতি করে।

গোয়ালের মূত্র রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ শুষ্ক মাটী, শুষ্ক পাতা বা ঘাস ছড়াইয়া দিতে হয়। চারি বা পাঁচ মাস অন্তর এই সকল পদার্থ জমীতে দেওয়া যাইতে পারে।

সার রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে, ইহা জমিতে প্রয়োগ করিয়া কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। গোময় সার প্রয়োগ করিলে, এঁটেল এবং বেলে উভয়বিধ মৃত্তিকারই প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া সুচাষোপযোগী হয়।

তাজা গোবর প্রয়োগে গাছের ডালপালা ও পাতারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু বীজ উৎপন্ন করিবার শক্তি ইহার বড় নাই। উত্তম তামাক ও আলু ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

তাজা গোবর প্রয়োগে ভূমিতে অনেক কীটের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং আলু প্রভৃতি দুর্ব্বল গাছে তাজা গোবর কখনও দেওয়া উচিত নয়। তাজা গোবর দ্বারা জমিতে আগাছারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বেলে মৃত্তিকায় গোবর সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রস্তুত সার শস্য বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

তাজা সার শস্য বপনের প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিত।

৯। **চুণ সার** ঃ—জমিতে চুণ প্রয়োগ করিতে হইলে দুই তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে—

(১) খুব আটাযুক্ত এঁটেল মাটিতে চুণ বিশেষ ফলপ্রদ।

(২) নরম বেলে মাটিকে চাষের উপযুক্ত করিতে হইলে চুণই একমাত্র উপায়।

(৩) অম্লরস বিশিষ্ট বোদ মাটির (humsis) সংস্কার চুণেই হয়। নিতান্ত আটাল এঁটেল মাটি চাষের উপযুক্ত নহে। সেই মাটি সহজে গুঁড়া হয় না বা তাহার ভিতর সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। চুণ কিম্বা চূর্ণাত্মক ক্ষার ব্যবহারে ঐরূপ জমির মাটীর দোষ বিনষ্ট হয় এবং তখন উহা কর্ষণ দ্বারা গুঁড়া করিয়া চাষের উপযুক্ত করা যাইতে পারে। তখন উহাতে জল প্রবেশের সুবিধা হয়।

উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থবিশিষ্ট বোদ মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে; কিন্তু যতক্ষণ না সেগুলি পচিয়া খাদ্যের উপযুক্ত হয়, ততক্ষণ কার্য্যতঃ তাহাদের দ্বারা কোন উপকার হয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, এই বোদ মাটিতে অম্লরসের প্রাচুর্য্য থাকায় জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পচনকারী জীবাণুগণ তথায় থাকিতে পারে না, বা থাকিলেও কোন কাজ করিতে পারে না। চুণ জমির এই অম্লরস নাশ করিয়া উদ্ভিদ্ শরীর পোষণে সহায়তা করে। চুণ দ্বারা উদ্ভিদ শরীর পোষণের কোন কার্য্য না হইলেও ইহা যে কৃষি কার্য্যের একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় সার, তাহা চাষীরা বা সাধারণে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। এদেশের মাটীতে চুণের অভাব নাই, সেই জন্য কোন চাষী জমিতে চুণ সার না দিলেও কিছু ক্ষতি হয় না।

এদেশের অধিকাংশ লোকের জমিই একমাত্র ভরসা; সুতরাং তাহাদের জমির সদ্ব্যবহার জন্য সারের ব্যবহার শিখিতে হইবে। সুতরাং চাষীদের আটাল এঁটেল মাটি, নরম অকেজো মাটীকে চুণ দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। জলা অকেজো জমিতে চুণ ছিটাইয়া জলজ উদ্ভিজ্জ সমূহ পচাইয়া উহা ধান চাষের উপযুক্ত করিতে হইবে। কোন কোন ধান্য ক্ষেত্রে এক প্রকার ঝাঁজি কিম্বা সেওলা জমিয়া উহাকে অকেজো করে। চাষীরা কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না; তাহারা যদি চুণের ব্যবহার জানিত, তবে শুষ্ক অবস্থায় সেই জমিতে চুণ ছিটাইয়া বারম্বার মাটি ভাঙ্গিয়া শেওলা বা ঝাঁজি মূল সমেত পচাইয়া ফেলিত। ধান্য ধারী শস্যের পক্ষে চুণ উত্তম সার; ফস্‌ফরাস ও পটাসের ন্যায় চুণও গাছের ফুল ও ফল প্রসবে সহায়তা করে।

এই বার চুণের দোষের কথাও বলিতে হইবে। বৃক্ষাদিতে সদ্যোজাত চুণ কদাপি ব্যবহার করা উচিত নহে। গাছ উহা সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য চুণো পাথর পোড়াইয়া ব্যবহার না করিয়া অদগ্ধ অবস্থায় ব্যবহারে অনেক উপকার হয়। চুণ ব্যবহার না করিয়া চূর্ণপ্রধান সার, জিপসম খড়িমাটি বা মার্ব্বেল পাথর চূর্ণ ব্যবহার করিলে উপকার হয়। এ সকলে যথেষ্ট চুণ আছে। কিন্তু চুণের তেজ নাই। নূতন চুণ অপেক্ষা পুরাতন চুণ দিলে তেমন ক্ষতি হয় না। চুণের তেজ সহজে যায় না, সেই জন্য পুরাতন চুণ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু নিতান্ত এঁটেল মাটিকে নরম করিতে কিম্বা অম্ল রসাত্মক বোদ মাটিকে সংস্কার করিতে কিম্বা জল জমির পুনরুদ্ধার করিতে সদ্যোজাত তেজস্বী চুণ চাই। চুণ প্রয়োগে ভূমিতে সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ খাদ্য সমূহ উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় ঘন ঘন চুণ দিলে ভূমির উর্ব্বরতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য তিন চারি বৎসর অন্তর চুণ ব্যবহার করা উচিত।

জমিতে চুণ ছড়াইবার একটী পরিমাণ ঠিক করা বড় সহজ নহে। কোন জমিতে কত চুণ আবশ্যক তাহা ঠিক করিতে হইলে সেই জমির মাটিতে কি পরিমাণ চুণ আছে তাহা ঠিক করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ চাষীর পক্ষে জমির বিশ্লেষণ কঠিন ব্যাপার। ইহার এক সহজ উপায় আছে। জমি হইতে কিছু মাটী আনিয়া জলে গুলিতে হয়; এবং ক্ষণকাল একটী কাঠির দ্বারা তাহাকে নাড়িয়া মাটি বেশ গুলিয়া গেলে এই জল আধ ঘণ্টা থিতাইতে দিলেই সমুদায় মৃত্তিকার স্থূল অংশ জলের তলায় পড়ে; এইবার জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা একখানা ছুরির ফলা দিয়া উঠাইয়া একখণ্ড সবুজ "লিটমস" কাগজ দ্বারা ৪।৫ মিনিট চাপিয়া রাখিবে; যদি সে মাটিতে চুণের ভাগ থাকে, তবে সবুজ "লিটমস" লাল হইবে। এইরূপে অম্লাক্ত বা লবণাক্ত জমি চিনিয়া লওয়াও যায়। অম্লের বা লবণের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে সেই কাগজ লাল "লিটমস" কাগজে চাপিতে হইবে; ইহাতে কাগজ সবুজ হইবে। লিটমস (Litmus paper) বাজারে দুষ্প্রাপ্য নহে। যে জমিতে চুণ নাই তাহাতে কত চুণ দিতে হয়, কিন্তু কতখানি চুণ দিতে হয় তাহা বিশ্লেষণ ব্যতীত জানা যায় না। মৃত্তিকা বিশেষে প্রতি বিঘায় দুই হইতে ছয় মণ চুণ দিতে হয়। চুণ মাটির উপর সমভাবে ছিটাইয়া চাষ দিতে হয়। উহা না করিলে কোথাও অল্প কোথায় বেশী পড়িয়া ক্ষতি হয়।

যদি দেখ যে নাইট্রোজেন-প্রধান গোময়াদি সার পাইয়া বৃক্ষগণ একবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে জল পালা ছাড়িতেছে, ফল ফুল প্রসবের নামটি নাই—একটু চুণ বা সাধারণ লবণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে শীঘ্র ফল ফুল ধরিবে। চুণ যে প্রত্যক্ষ ভাবে সকল স্থলে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। ফস্‌ফরাস-প্রধান সারেও চুণের ন্যায় ফল ফুল বাড়ায়। হাড় চূর্ণ রোন সুগার, জান্তব কয়লা ও এপেটাইট নামক খনিজ পদার্থে চুণের পরিমাণ শত করা ৩০।৪০ গুণ অধিক বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যে সকল শস্যে এই সকল সার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চুণ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

চুণের সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা উচিত। পোড়া চুণের দাম অধিক। তৈয়ারী সিলেট চুণের দামও অনেক। কাজেই এই সব চুণ অপেক্ষা ঘুটিং চুণ (unburnt lime stone) বা চুণা পাথর ব্যবহারে অনেক অল্প খরচে অনেক বেশী কাজ হয়। পোড়া চুণ অপেক্ষা চুণা পাথরের দাম কম, ইহার তেজও কম এবং মাটীতে ধীরে ধীরে কার্য্য করে। এই প্রকার চুণ ব্যবহারে মাটী শীঘ্র নিস্তেজ হইয়াও পড়ে না।

পাথর গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া দেওয়াই উচিত। যেখানে আশু কোন কার্য্য সারিতে হইবে বা পতিত জমির উদ্ধার করিতে হইবে সেখানে পোড়া চুণ দেওয়াই উচিত।

দরিদ্র কৃষকদের জন্য এই প্রথা ব্যবস্থেয়ঃ—গোভাগাড় হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজ ক্ষেত্রে পচাইয়া পরে চূর্ণ করিয়া তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে একটী প্রধান ফস্‌ফরাস বিশিষ্ট সার ব্যবহার করা হইল; সঙ্গে সঙ্গে চুণের কার্য্যও হইল। শামুক চূর্ণেও চুণের কাজ বেশ হয়।

চুণের আরও দু'একটী বেশ গুণ আছে ঃ—জমি হইতে শামুক গেঁড়ি গুগলি তাড়াইতে হইলে চুণের মত আর কিছুই নাই। চুণে পচা দুর্গন্ধ যুক্ত জল পরিষ্কৃত হয়। জলে চুণ দিলে ম্যালেরিয়ার জীবাণুসমূহ মরিয়া যায়। চুণের দ্বারা যেমন চাষের উন্নতি হয় তেমনি ম্যালেরিয়াও নষ্ট হইয়া যায়।

অম্লকে ক্ষারে পরিণত করিতে হইলে চুণই একমাত্র উপায়। চুণ কি পদার্থ তাহা জানিয়া রাখা উচিত। ইহা একপ্রকার ধাতু; কিন্তু ইহা বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কার্ব্বনিক এসিডের সহিত মিলিত ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘুটিং, শামুক, খড়িমাটি চূণাপাথর প্রবাল মুক্তা ইত্যাদি দগ্ধ করিয়া চুণ হয়। ক্যালসিয়ম উদ্ভিদের খাদ্য। ইহা আবার ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্য রক্ষা করিতে পারে। ক্যালসিয়ম বিশিষ্ট জমির নাইট্রোজেন ও ফসফরাস রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। এই দুইটী উদ্ভিদের খাদ্য। ধান, গম প্রভৃতির ভস্মে শতকরা ৬ ভাগ চুণ থাকে।

পাকা ঘর বাড়ী যখন নির্ম্মাণ করিতে হয় তখন বালির সহিত যে চুণ দেওয়া হয়, তাহার একমাত্র কারণ ইহার আল্‌গা ভাব নষ্ট করা। চুণের দ্বারা উহাকে জমাট

বাঁধান হয়। চূণ বিহীন এটেল মাটীতে জল দিলে উহা সেই জল টানিতে পারে না ; কিন্তু উহার সহিত অল্প চূণ মিশাইলে সেই কঠিন ভাব দূর হয় এবং এটেল মাটি জল শোষণ ও ধারণক্ষম হয়। মৃত্তিকাতে চূণের অস্তিত্ব হেতু উদ্ভিদগণ উহা আহরণ করিয়া নিজ শরীরে সঞ্চার করে। এই সমস্ত উদ্ভিদ শরীর বা তৎ প্রসূত ফল শস্যাদি জীবগণ উদরস্থ করে বলিয়া চূণ তাহাদেরও শরীরে স্থান পায়।

চূণ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় :—প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ প্রকারের প্রস্তর ও ঘুটিং বা কঙ্কর হইতে, দ্বিতীয়তঃ শামুক গুগলি হইতে। যে পাথর হইতে চূণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে চূণা পাথর (Lime stone) বলে।

চূণের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম। ইহা একপ্রকার ধাতু বিশেষ। কার্ব্বনিক এসিডের সহিত মিলিত হইলে ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট্‌রূপে ঘুটিং পাথর, প্রবাল, মুক্তা, প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে। ঘুটিং পাথর বা শামুক পোড়াইলে কার্ব্বনিক এসিড উড়িয়া গিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সাধারণ চূণ। ইহাই ক্যালসিয়ম অকসাইড। যাহাতে শত করা ৫ ভাগের অধিক চূণ আছে তাহাই চূণ সার। সেই হিসাবে চূণ শামুক ঝিনুক ঘুটিং চূণসার মধ্যে পরিগণিত।

চূণের সহিত ফস্ফরিক এসিড মিশ্রিত হইয়া আর একটী প্রধান সার উৎপন্ন করে। সেটী ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। ইহা জমির প্রধান সার। হাড়ে প্রায় শত করা ৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট আছে। ইহা এসিডে দ্রব হয়। সোরা কিম্বা গরম জলে ইহা কথঞ্চিৎ দ্রব হয়। হাড়ের গুঁড়াকে সহজে উদ্ভিদের কার্য্যে লাগাইতে হইলে সুগার প্রস্তুত করাই শ্রেয়ঃ। হাড়ের গুঁড়া প্রথমতঃ জলে আর্দ্র করিয়া ইহাতে অল্পে অল্পে সল্‌ফিউরিক এসিড যোগ করিতে হয় ; হাড়ের গুঁড়ার পরিমাণ যত তাহার প্রায় একতৃতীয়াংশ এসিড মিলাইতে হয়।

সদ্যোজাত চূণ বড়ই উত্তাপ সংযুক্ত ; এজন্য উহা ভাটি হইতে আনিয়াই জমিতে না দিয়া কোন স্থানে পাতলা ভাবে ছড়াইয়া রাখিলে, বায়ু মণ্ডল হইতে ও কার্ব্বনিক এসিড উহাতে প্রবেশ করিয়া উত্তাপের হ্রাস করে ও স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। ইহাতে উহার দহন শক্তিও কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য, চারি দিবসের অধিক ঐরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। কারণ অধিক দিবস অনাবৃত থাকিলে শিশিরে চূণে জমাট বাঁধিতে কিম্বা বৃষ্টি লাগিলে সমস্ত চূণই ডেলা বাঁধিয়া যাইতে পারে। ডেলা বাঁধিয়া গেলে উহার শক্তি ও কার্য্যকারিতা হ্রাস পায়। এই অবস্থায় উহা ক্ষেত্রে দিলে বিশেষ ফল হয় না।

বর্ষাকালের এক মাস আগে বা বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে যখন মৃত্তিকার আর্দ্রতা না থাকিবে, এরূপ সময় ক্ষেত্রে চূণ দিতে হয়। আর্দ্রাবস্থায় চূণ দিলে মাটি ও চূণ মিলিত হইয়া কঠিন ডেলা বাঁধিয়া যায়। চূণ প্রধান জমিকে হালকা এবং বায়ু-প্রধান জমিকে অপেক্ষাকৃত সরস করে। চূণের স্বভাবই এই যে, উহা কালক্রমে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে তলাইয়া যায়। ক্ষেত্রে চূণ দিবার একটী বিশেষ প্রণালী আছে। ক্ষেত্র যখন শুষ্ক থাকিবে, তখন উহার উপরে আস্তে আস্তে চারিদিকে সম পরিমাণে চূণ ছড়াইতে হইবে। চূণ দেওয়া হইলে গেলে উহাকে মৃত্তিকার সহিত সমভাবে ও সূক্ষ্মরূপে মিলিত করিবার জন্য বারম্বার জমিকে চষিয়া দেওয়া দরকার। এক দিন বারম্বার লাঙ্গল না দিয়া চারি দিন অন্তর লাঙ্গল দেওয়া উচিত।

চূণের সাক্ষাৎ অপেক্ষা পরোক্ষ ক্রিয়াই অধিক। মাটির মধ্যে এমন অনেক পদার্থ থাকে, যাহা হইয়াও উপকারে আসে না। তাহারা চূণের প্রভাবে উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয়।

হিউমস্ (Humus) নামক মৃত্তিকায় যে পদার্থ থাকে—তাহাও চূণের অভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। বরং যেখানে হিউম্যাসের আতিশয্য থাকে অথচ চূণের অভাব থাকে সে স্থলে পদার্থের অম্লপ্রাচুর্য্য বশতঃ জমির ও উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। এই অম্ল প্রধান জমিকে অম্ল জমি (Sour

land) কহে। অম্লাক্ত জমিতে চূণ দিলে, জমির অম্লদোষ কাটিয়া যায়।

মৃত্তিকায় চূণ সংযুক্ত হইলে তন্মধ্যস্থিত অনেক যৌগিক পদার্থকে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। সুতরাং প্রথম প্রথম ইহার দ্বারা চাষের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু সেই জমি অল্প দিন মধ্যে (দুই চারি বছর) এমন ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে তখন উহাতে কোন রকম পোষণোপযোগী শক্তি থাকে না।

চূণের তীক্ষ্ণতা বা উগ্রতা এবং প্রয়োগের পরিমাণ অনুসারে বিশ বছর পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারিতা থাকে। এই জন্য চূণ প্রয়োগে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। চূণের তীব্রতা থাকিতে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারে না। তবে যদি আবাদ করিবার পূর্ব্বে অধিক সময় পাওয়া যায়, তবে তীব্র চূণ দিতে আপত্তি নাই। বরং ইহা দ্বারা আরও উপকার হয়, মাটিতে যে সমস্ত কীট থাকে তাহা মরিয়া যায়।

১০। সবুজ সারের উপকারিতা—শন, ধইঞ্চা, জয়ন্তি প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের সারকেই সবুজ সার বলে। ইহা অনায়াস লভ্য এবং অল্প খরচায় কৃষকেরা ব্যবহার করিতে পারে। ধান পাট ইক্ষু ও আলুর ক্ষেতে উক্ত শস্য সমূহ লাগাইবার পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি ২ সের বীজ (শিম্বী জাতীয়) ছিটাইয়া ১ হাত পরিমিত গাছগুলি উঁচু হইলে উহা জমির সহিত চাষ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কোন কোন স্থলে আউশ ধানের সহিত এই উদ্দেশ্যেই অরহড়ের (শিম্বী জাতীয়) গাছ লাগান হয়। কচি কচি শিম্বী জাতীয় বৃক্ষের ডাল পাতা জমির সহিত মিলিত হইয়া গোল জমির যেমন উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে উক্ত ধঞ্চে বা জয়ন্তী ও অরহড় প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় গাছ জমির উপর জীবিত থাকিলেও উহাদের পাদমূলে বায়ুমণ্ডল হইতে ও সূর্য্যকিরণ হইতে নাইট্রোজেন সার সংগৃহীত হয়। তাই আমরা ধঞ্চে ও জয়ন্তী গাছে পিপুলের লতা উঠাইয়া দিয়া বিঘা প্রতি আড়াই শো তিন শো টাকার পিপুঁল পাইয়া থাকি। যেখানে হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খৈল, ও গোবর সার দুষ্প্রাপ্য—সেই খানেই আমরা কৃষকগণকে সবুজ সারের জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করি। আর ইহার কার্য্যকারিতাও হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খৈল ও গোবর অপেক্ষা কম নহে।

ক্ষেতে সার পরীক্ষার নিয়ম :—আমরা দেখাইয়াছি যে শস্যের পুষ্টির জন্য চারিটী বস্তু ফাস্‌রূপে প্রয়োগ করা স্থলভেদে দরকার হয়, যথা—নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্‌ফরাস্ এবং চূণ। পরীক্ষা স্বরূপ অল্প পরিমাণ জমিতে অল্প পরিমাণ এই সকল বস্তু প্রয়োগ করিয়া ফসল সম্বন্ধে তাহার ফল দেখিয়া সেই শস্যের জন্য সেই জমিতে কোন্ কোন্‌টী ফাস্‌রূপে ব্যবহার করা উচিত তাহা স্থির করা যায়। মনে কর তোমার জোত হইতে তুমি এক বিঘা জমি পাটের ফাস পরীক্ষার জন্য পৃথক করিয়া লইলে। সেই জমিটী সমানভাবে ছয়টী অংশে বিভক্ত কর। প্রথম অংশে বিনা ফাসে পাটের চাষ কর। দ্বিতীয় অংশে ওজন করিয়া অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন খৈল রূপে, অল্প পরিমাণ পটাস সাধারণ ছাই রূপে এবং অল্প পরিমাণ চূণ প্রয়োগ কর। চতুর্থ অংশে পটাস বাদে বাকী ৩টী প্রয়োগ কর। এবং ষষ্ঠ অংশে চূণ বাদে বাকী ৩টী প্রয়োগ কর। চাষ, বীজবপন, জল সেচন প্রভৃতি সম্বন্ধে সব অংশে সমান রূপে ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক অংশের শস্য পৃথক পৃথক ওজন কর। ফসলের পরিমাণের তুলনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে তোমার জমিতে কোন বস্তুর অভাব এবং কি ফাস দিতে হইবে। মনে কর প্রথম অংশে ২০ সের দ্বিতীয় অংশে ৪০ সের তৃতীয় অংশে ২৫ সের, চতুর্থ অংশে ৪০ সের, পঞ্চম অংশে ৩৫ সের এবং ৬ষ্ঠ অংশে ৩৫ সের পাট হইয়াছে। প্রথমাংশে ফাস না দিয়া ফসল মাত্র ২০ সের হইল ; অতএব ফাস দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় অংশে চারি প্রকারের বস্তুই—প্রয়োগ করিয়া ফসল পাইলাম ১ মণ। চতুর্থ অংশে পটাস না দিয়া পাইলাম ১ মণ। অতএব পটাস দিবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার ৬ষ্ঠ অংশে চূন দিলাম না ; তাহাতেও

১ মণ ফসল পাইলাম। অতএব চুণ দিবার প্রয়োজন নাই। আবার পঞ্চম অংশে ফস্‌ফরাস্ দিলাম না, ফসল /৫ কমিয়া গেল, অতএব ইহা দিবার প্রয়োজন আছে। সেই রূপ তৃতীয় অংশে নাইট্রোজেন দিলাম না। ফসল ১৫ সের কমিয়া গেল। অতএব উহা দিবার প্রয়োজন আছে। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন হইল যে পাটের জন্য জমিতে নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরাস্ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা কৃষক অল্প ব্যয়েই আপনার জমির জন্য কোন শস্যের কি ফাস দেওয়া প্রয়োজন স্থির করিতে পারেন। আবার ফাস ঠিক হইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তাহা ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারেন কোন শস্যের জন্য কোন জমিতে কি পরিমাণ ফাস্ ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদের দেশে কৃষকদের জন্য ফাস ঠিক করিবার এই উপায়ই প্রশস্ত।

১১। নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার :—মটর, সীম, অরহড় প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে কতিপয় জীবাণু দৃষ্ট হয়। এই সকল জীবাণু নাইট্রোজেন সঞ্চয় করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। জীবাণু দ্বারা নাইট্রোজেন সঞ্চয়ের বিষয় বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিজ্ঞাত না হইলেও এতদ্দেশে এবং ইয়োরোপে ইহা কার্য্যতঃ জানা ছিল। আমাদের দেশে সাধারণ কৃষকসমূহের শস্য পর্য্যায়ের পদ্ধতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারাও শিম্বী ফসলের উপকারিতা কতক পরিমাণে অবগত আছে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বোসিগো প্রমাণ করেন যে জমি হইতে মূল দ্বারা শোষাই উদ্ভিদের নাইট্রোজেন সংগ্রহের একমাত্র উপায়। তাঁহার সিদ্ধান্ত বিলাতে সুপ্রসিদ্ধ কৃষিক্ষেত্রে—বথামেষ্টেডে ও লস্ ও গিলবার্ট এবং পিউর পরীক্ষাবলী দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় শিম্বী জাতীয় বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি কিন্তু উক্ত theory দ্বারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হেলরিগেল মত প্রকাশ করিলেন যে উক্ত জাতীয় উদ্ভিদ নিশ্চয়ই বায়ু মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। দুই বৎসর পরে তিনি এবং ... ফ্রোথ প্রমাণ করেন যে, শিম্বী জাতীয় গাছ এক... নাইট্রোজেন বিহীন মৃত্তিকায় জন্মিতে পারে। ... উহাদের মূলে গুটিকা সদৃশ স্ফীতাংশ—যাহাকে ... ভবিষ্যতে গুটি বলিব—বহু দিবস হইতে ... বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিচিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ... তত্ত্ববিদ্ ম্যাসাপিস্থি সর্ব্বপ্রথমে উহার উল্লেখ ... এবং তাঁহার দ্বারা ইহা রোগ সম্ভূত বলিয়া বি... হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রুষীয় ওরোনীস সর্ব্ব ... এই সমুদায় গুটির গঠন বর্ণনা করেন এবং ... ক্রমে বলেন যে এই গুটী সমূহে এক প্রকার জী... দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত গুটিসমূহ যে জীবাণু দ্বারা গঠিত হয় ... নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুবি... উদ্ভিদ্ রোগবিৎ মার্সাল ওয়ার্ড নানাবিধ পরীক্ষা ... প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সীম গাছের মূলে গুটি জী... দ্বারা গঠিত হয়; মৃত্তিকা অথবা বালি পূর্ব্বে গরম ... করিয়া তাহাতে সীম-বীজ পুঁতিলে একমাসের মধ্যে ... দেখা দেয়, (২) পূর্ব্বে গরম করা কোন প্র... উপাদানে (মৃত্তিকা, জিলাটিন প্রভৃতিতে) গুটি ... (৩) মূলাণু সমূহের মধ্যে পুরাতন গুটি রাখিয়া ন... গাছের মূলে গুটি উৎপাদন করিতে পারা যায়। ... জীবাণুর কাণ্ড তন্তুকে (hypha) মূলাণু বাহিয়া ... প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজারনিক গুটি হইতে জীবাণু পৃ... করিয়া উহার নাম দেন ব্যাসিলাস র্যাডিসিকোলা (Bacillus Radicicola)। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে... দ্বারা এইরূপ থাকে জীবাণু পৃথকীভূত হয়। ... অবশেষে প্রমাণ হয় যে শিম্বী জাতীয় উদ্ভি... উপকারিতার প্রধান কারণ এই যে উহাদের মূলে ... সকল নাইট্রোজেন সঞ্চয়কারী জীবাণু বাস করে। ... জন্যই যে সকল জমিতে যুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন ... থাকার জন্য অপর জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে ... সেরূপ স্থলে শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে পা...

...প্রত্যেক বৎসরে বহু পরিমাণ নাইট্রোজেন এই সমস্ত ...র দ্বারা সংগৃহীত হয়।

নাইট্রোজেন জীবাণু দ্বারা জমির দুই প্রকার উপকার ...ত হইতে পারে। প্রথমতঃ শিম্বী জাতীয় ফসল ... কোন প্রকার নাইট্রোজেনযুক্ত সার গ্রহণ না ...য়া জন্মিতে পারে; এবং দ্বিতীয়তঃ যে জমিতে উক্ত ফসল জন্মে, সে জমিও সার বহুল হইয়া উঠে। কি ...রে এই জীবাণু নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, তাহা ...নও সবিশেষ জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ...সিলাস্ রেডিসিকোলা—অথবা Pseudomonas ...dicicola—ইহার নূতন নাম—ও উদ্ভিদের সহিত ... বিষয়ে কয়েকটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা ...) মূল জীবাণুযুক্ত মৃত্তিকার সহিত সংস্পৃষ্ট হওয়া ...ক (২) জমিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রেট থাকিলে ...বে না, সোরার আধিক্যে জীবাণুগুলি পরিপুষ্টি ...বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই তাহা দেখা গিয়াছে, (৩) লবণ, ...ফেট ও পটাস উপযুক্ত পরিমাণ থাকা আবশ্যক, ...) জমি উত্তমরূপে বায়ুমুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়।

নাইট্রোজেন জীবাণু বিষয় অনুসন্ধান করিতে ...য়িতে অনেক পণ্ডিতের মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত ...য়। তাহা এই, এক জাতীয় জীবাণুই সকল প্রকার ...ম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে গুটি উৎপাদন করে, কিম্বা ...ভিন্ন জাতীয় শিম্বী ফসলের বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ...য়াছে।

জীবাণুজ সারের বিশেষত্ব এই যে, ইহার বীজ প্রস্তুত ...করিয়া ইহার দ্বারা অনুর্ব্বর মৃত্তিকাকে টীকা দেওয়া ...য়মে। শিম্বী ক্ষেত্র হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া নূতন ...বাদী জমিতে টীকা দিয়া ব্রেননের মুর কালচার এক্স-পেরিমেণ্ট ষ্টেষনে সবিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার দুইটি অসুবিধা আছে,—প্রথমতঃ এক স্থান ...হইতে অন্য স্থানে বহু পরিমাণ মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার মৃত্তিকার সহিত অনেক জাতীয় পোকা ও উদ্ভিদ রোগ চলিয়া যাইতে পারে।

এই জীবাণুসার অনেক প্রকারে প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিশুদ্ধ culture, নাইট্রোজিন (Nitrogin)। জার্ম্মাণ সওদাগর হষ্ট ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে সুফল না হওয়ার নব্ এবং হিলনার নামক পণ্ডিতদ্বয় উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন আকারে বাহির করেন। ইহা দৃঢ়ীভূত জিলটিনের দ্বারা প্রস্তুত। জার্ম্মাণীর অনেক স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ১৯০৪ সালে মার্কিন কৃষি বিভাগের মূর সাহেব কোন প্রকার দ্রাবণে জীবাণুর চাষ করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া উক্ত তুলা শুষ্ক করতঃ বিভিন্ন স্থানে টিকা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এইরূপে শুষ্ক করায় জীবাণুর তেজ অনেক কমিয়া যায়। তজ্জন্য সকল সময় উত্তম ফসলও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি মার্কিন কৃষি বিভাগ এই প্রথা পরিত্যাগ করিয়া দ্রব অবস্থায় জীবাণুর বীজ প্রেরণ করিতেছেন।

বিলাতে লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক বটমলি মূর সাহেবের প্রস্তুত দ্রাবণের ন্যায় নাইট্রোব্যাকটিরিস নামক একপ্রকার দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও বিলাতে অনেক স্থলে পরীক্ষা হইতেছে। আমরা এস্থলে তৎসমুদায়ের ফলাফলের একটা মোটামুটী হিসাব দিলাম।

নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার সম্বন্ধীয় পরীক্ষাবলীর মধ্যে বিলাতের সুবিখ্যাত রয়েল হর্টিকালচারাল উইসলি উদ্যানের পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই পরীক্ষা অধ্যাপক বটমলির নাইট্রোব্যাকটিরিস সাহায্যে পরিচালিত হয়। এস্থলে নাইট্রোব্যাকটিরিস সম্বন্ধে কয়েকটী অত্যাবশ্যক বিষয় বিবৃত করা আবশ্যক। নাইট্রোব্যাকটিরিসের সহিত একটি পুস্তিকা গ্রাহকের নিকট প্রেরিত হয়। উহার সারাংশ নিম্নরূপ,—যে স্থলে স্বভাবতঃ প্রচুর পরিমাণে শিম্বী ফসল উৎপাদিত হয়, সেরূপ স্থলে নাইট্রোব্যাকটিরিস প্রয়োগে কোন ফল হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাইট্রোব্যাকটিরিস চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে তিনটী পুরিয়া থাকে।

প্রয়োগের সময় একটী টব বিশেষরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে পরিষ্কৃত জল রাখিতে হয়। বৃষ্টির জল ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইলে ভাল হয়। তৎপরে ১নং পুরিয়ার চূর্ণগুলি উক্ত টবে ফেলিয়া দিয়া গলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। তাহার পর দ্বিতীয় নম্বর পুরিয়া সাবধানের সহিত খুলিয়া উহার মধ্যস্থিত তুলা এবং চূর্ণ টবে ফেলিয়া বেশ করিয়া নাড়া আবশ্যক। ইহার পর একটি আর্দ্র তোয়ালে দ্বারা টব ঢাকিয়া গরম স্থানে উহা রাখিয়া দিতে হইবে। উনুনের ধারে টব রাখিয়া দিতে পারা যায়; কিন্তু উত্তাপ ৭৫° ৮০° ডিগ্রি ফারেন্‌হিটের অধিক হইলে বীজ খারাপ হইয়া যাইতে পারে। ২৪ ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় থাকার পর ৩নং পুরিয়া স্থিত চূর্ণ টবে দিয়া আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে। ক্রমশঃ জল ঘোলা হইয়া যায়। উত্তাপ উপযুক্ত পরিমাণ হইলে ২৪—৩৬ ঘণ্টার মধ্যে জল ঘোলা হইয়া যাইবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে জল ঘোলা না হয় তাহা হইলে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। জীবাণু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিলেই জল ঘোলা হয়। এস্থলে তিনটী পুরিয়াতে কি কি দ্রব্য থাকে তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা যাইতে পারে যে, ১ নং পুরিয়াতে অল্প মাত্রায় ইক্ষু শর্করা, পটাসিয়ম সলফেট্ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম সলফেট থাকে। ২ য় পুরিয়াতে মৃত্তিকার কণাবৎ পদার্থ তুলার সহিত জড়িত থাকে। ঐ কণাগুলিতেই জীবাণু অবস্থান করে। ৩ নং পুরিয়াতে কেবল সলফেট অব্ অ্যামনিয়া থাকে।

জমির টিকা দিতে হইলে পূর্ব্বে বায়ুতে মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া উক্ত মৃত্তিকা পূর্ব্বোক্ত জীবাণুদ্রাবণের সহিত সমান পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সিক্ত করিয়া লইতে হয়। এই মৃত্তিকা পুনর্ব্বার আরও কতক পরিমাণ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিতে হয় এবং তৎপরে কোদালি দ্বারা বেশ করিয়া ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। বীজ টিকা দেওয়া আবশ্যক হইলে একটি চালুনির উপর বীজ রাখিয়া উক্ত চালুনি দ্রাবণে ডুবাইয়া... বীজ গাত্র দ্রাবণ দ্বারা আর্দ্র হইয়া যায়। সামান্য... দ্রাবণ সংস্পর্শে রাখিয়া উহাদিগকে তুলিয়া শুষ্ক ক... হয়। শুষ্ক করিবার সময় একেবারে শুষ্ক করাই... কারণ আলোক লাগিলে জীবাণুসমূহের ক্ষতি হয়।

উইসলি উদ্যানে কয়েক জাতীয় মটর দ্বারাই প... নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। পরীক্ষার জন্য একখণ্ড ... জমি ও একখণ্ড আবাদি জমি নির্ব্বাচিত হয়। ... পরীক্ষা সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব... অনাবশ্যক; কিন্তু মোটের মাথায় রয়েল হর্টিকাল... সোসাইটির উদ্যান পরিদর্শক চিটেনডেন সাহেব যে... সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেগুলি ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। ... মতে নাইট্রোব্যাকট্রিসে বিশেষ কোন ফল হয় ... বিলাতের অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁহার সিদ্ধান্ত... ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে জমিতে নাই... ব্যাকটিরিস প্রয়োগ করেন, তাহাতে স্বভাব... নাইট্রোজেন জীবাণুর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে ... সুতরাং সেরূপ জমিতে সুফল না হইবার কথা। কিন্তু... প্রকার জমি ছাড়িয়া দিলে তিনি যে আর একখণ্ড... বিহীন জমিতে নাইট্রোব্যাকটিরিসের পরীক্ষা ক... তাহা হইতে আশাজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ... প্রকার জমিতে বৃদ্ধির মাত্রা শত করা ১৫ ... বিলাতে সুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব রিভিউজ্ পত্রি... সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব ১৯১৮ সালে তদ্দেশে নাই... ব্যাকটিরিস সম্বন্ধে যে সমুদায় পরীক্ষা হয় তাহার ফল... সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় ... শতকরা ৬৭ ভাগ পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, এই সমুদায় পরী... সকল রকমের জমিতে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল ... অনেকেই সর্ব্ব প্রথমে এই সার ব্যবহার করিয়াছি... এতদ্ভিন্ন বিলাতের সুপরিচিত বীজ ও গাছ বিক্রে... কার্টার এণ্ড কোম্পানি কয়েক জাতীয় সিম্ মটর প্রে... ও ভেচ্ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহার ফলে ... ফসলের পরিমাণ শতকরা ৬০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

এই সমুদায় পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারা যায় যে ...নাইট্রোব্যাকটিরিস ভবিষ্যতে সার জগতে নবযুগ ...বর্ত্তন করিবে। বিঘা প্রতি বিলাতে ৭॥০ টাকার ...াদির মল আবশ্যক হয়। সেই স্থলে ।৵০ আনার নাইট্রোব্যাকটিরিস হইলে সমান অথবা অধিক ...পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। আবার নাইট্রোব্যাকটিরিস ...শিম্বী জাতীয় ফসলের জন্য নহে, অপরাপর ফসলেও ...দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের ...শেও এই নাইট্রোব্যাকটিরিসের পরীক্ষা চলিতেছে। ...যে সকল স্থানে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন জীবাণুর ...সংখ্যা অধিক, সেইরূপ স্থলেই পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হওয়ার ...ফল উত্তম রূপে বুঝা যায় না। যদি অনাবাদি ও ...বতঃ অনুর্ব্বর জমিতে পরীক্ষা হয় তাহা হইলে ...র গুণাগুণ সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

১২। বাংলার কয়েকটী ফসলের সারের ...লিকা।—(ক) ধানের সার—বিঘা প্রতি ১৭ মণ ... অথবা /২ সের ধঞ্চে বীজ বুনিয়া সারে পরিণত ...রা পরীক্ষার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ।

(খ) পাটের সার—বিঘা প্রতি ৩৩/ মণ গোবর ...৩/ মণ রেড়ির খৈল। পাটের সহিত কলাই বা ...পালটী চাষ বিশেষ ফল জনক।

(গ) আলুর সার—বিঘা প্রতি ৭ মণ রেড়ির খৈল অথবা ৬০ মণ গোবর ও ১/ মণ সুপার ও ॥০ অর্দ্ধমণ সোরা উত্তম সার।

(ঘ) ইক্ষুর সার—৬৫ মণ গোবর ও ২॥ মণ রেড়ির খৈল বিঘা প্রতি প্রযুজ্য।

(ঙ) তুলার সার—বিঘা প্রতি ১॥ মণ সোরা ও ২/ মণ হাড় চূর্ণ বা ১॥ মণ খৈল ছাই ২ মণ ও সোরা গোবর ১২ মণ।

(চ) পেঁপের সার প্রতি গাছে একসের ছাই এক-সের জলের তলের পচা মাটি চূর্ণ ও পচা পাতা চূর্ণ এক সের চূণ ৵ ছটাক প্রতি বর্ষে।

(ছ) কলাগাছের সার—প্রতি গাছে /২ সের মাছের আঁইস বাটা বা পচা মাছ গোড়ায় পুঁতিয়া দিবে।

(জ) আদার সার—বিঘা প্রতি ১০ মণ ছাই ৫ মণ পচা পাতা বা /২ সের ধঞ্চা বীজ ছড়াইয়া গাছ হইলে চাষ করিয়া দিবে।

(ঝ) হরিদ্রার সার—বিঘা প্রতি চূণ /২ সের হাড়ের গুঁড়া অর্দ্ধমণ গোবর ১০ মণ রেড়ির খৈল ২ মণ এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জমি চাষের সময় দিবে।

(ঞ) তামাকের সার—বিঘা প্রতি ১০ মণ গোবর বা ৫ মণ সবুজ সার। অন্যান্য সারের বিষয় বাংলার শস্য নামক পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সামাজিক প্রহসন

সামাজিকতা এখন আমাদের দেশে প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। পুত্র-কন্যার বিবাহ একটা মস্ত বড় সামাজিক ব্যাপার ছিল; কিন্তু কাল-ধর্ম্মে এখন তাহা ব্যবসাদারীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেনা-পাওনার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আগেকার মত এখন আর পুত্র কিম্বা কন্যার বিবাহ দিবার সময় ভাবী পুত্রবধূ বা জামাতার কুল, শীল, বংশ প্রভৃতির পরিচয় লওয়া হয় না, ঠিকুজী-কুষ্ঠিরও কেহ অনুসন্ধান করেন না। যাহাদিগের বিবাহ-সংস্কার হইবে, তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবাহিত জীবনের অনুকূল হইবে কি না, তাহার অনুসন্ধান লওয়াও কেহ আবশ্যক মনে করেন না। পুত্রের বিবাহ দিবার সময় পিতা এখন কেবল ভাবেন

যে, কন্যা পক্ষ হইতে যথেষ্ট বরপণ—নগদ টাকা, অলঙ্কার, বরসজ্জা, আভরণ প্রভৃতি পাওয়া যাইবে কি না। আর কন্যার বিবাহ দিবার সময় তিনি দেখেন, ভাবী জামাতার কয়টি ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রি আছে, এবং সস্তায় সারিতে পারিবেন কি না। আজকাল আর সে বিজ্ঞ, বহুদর্শী কুলাচার্য্যগণকে দেখা যায় না; তাঁহাদের স্থলে এখন এক শ্রেণীর পেশাদার ঘটক ও ঘটকীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের জাতি-বর্ণের কোনই ঠিক-ঠিকানা নাই। প্রায়শঃ ইহারা ঝি বা চাকর শ্রেণীর লোক। ইহাদের বাক্‌চাতুরী অসাধারণ। হয়কে নয় করিতে, সত্যকে মিথ্যা করিতে ইহাদের নিপুণতা অদ্বিতীয়। ইহারা বরপক্ষের অতিরঞ্জিত ঐশ্বর্য্যের ও গুণের বর্ণনা করিয়া কন্যাপক্ষকে মোহিত, মুগ্ধ ও বশীভূত করে, এবং vice versa। ফলে, ইহাদের পাল্লায় পড়িয়া কুটুম্বিতা করিয়া পরিণামে উভয় পক্ষকেই আপশোষ করিতে হয়।

এই যে আমাদের একটী সুন্দর, সুচিন্তিত, বহুদর্শিতাসিদ্ধ প্রথা ছিল, আমরা হেলায় তাহা উপেক্ষা করিতেছি, আর পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসক ও পণ্ডিত সমাজের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা যতই বাড়িতেছে, ততই তাঁহারা সমাজে এই প্রকার প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে একবার এই বিষয়ে আলোচনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম। কিন্তু সমাজের দিক হইতে এখনও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া গেল না। এক্ষণে আবার পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজের চোখের সামনে ধরিতেছি। আজকাল পাশ্চাত্যের ছাপ না পড়িলে হতভাগ্য বঙ্গসমাজের কোন বিষয়েই সাড়া পাওয়া যায় না। দেখি, এবার সমাজ কি বলেন।

বিলাতে যৌবন-বিবাহ প্রথা প্রচলিত। সেখানে যুবক যুবতীরা স্বয়ং নিজ নিজ স্ত্রী বা স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু সামাজিক হিসাবে, জাতি হিসাবে তাহার ফল সকল সময়ে আশানুরূপ হয় না; অনেক সময়েই অযোগ্য যৌন সম্মিলনের ফলে সমাজের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তা ছাড়া, অপরিণত-বুদ্ধি যুবতী বা যুবক নিজের বা তাঁহার জীবন-সহচর বা জীবনসঙ্গিনীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। সামাজিক হিসাবে ইহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা শুভকর না হওয়ায় চিকিৎসক-মণ্ডলী ও চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী পণ্ডিতবর্গ বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সার্টিফিকেট লইবার প্রথা সমাজের সমক্ষে উপস্থাপন করিয়াছেন, এবং এই বিষয়ে বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আইনের আবশ্যকতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা এমন একটী আইন চান যে, বিবাহার্থী যুবক যুবতী তাহাদের স্বাস্থ্য যে উত্তম, এই বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট না লইলে এবং সেই সার্টিফিকেট বিবাহের রেজিষ্ট্রার ও পাদরী সাহেবকে দেখাইতে না পারিলে তাঁহারা বিবাহ দিবেন না।

বিলাতী সমাজপতিদের যুক্তি এই যে, বিবাহার্থী যুবক বা যুবতী কাহারও গণোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি যৌন রোগ থাকিলে, তাহাদের যৌন সম্মিলনের ফলে তাহাদের সুস্থদেহ mateও (জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী) ঐ রোগে আক্রান্ত হইবে, এবং তাহাদের পুত্র কন্যাও ঐ রোগ সংক্রামিত হইবে। কিম্বা যদি বর বা কন্যা কাহারও মানসিক বিকৃতি রোগ থাকে, তবে তাহাদের দাম্পত্য জীবন দুঃখময় হইবে। ইংল্যাণ্ডে, ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় কিছুদিন ধরিয়া এই বিষয়টির আলোচনা চলিতেছে। আমেরিকার সাতটি রাজ্যে "Eugenic Marriage Law" নামে একটী আইনও প্রচলিত হইয়াছে। আরও চৌদ্দটি রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশ সদস্য আপত্তি করায় আইন পাশ হয় নাই। যে সকল রাজ্যে আইন পাশ হইয়াছে, সে গুলিতে কিন্তু ইহার কাজ ভাল চলিতেছে না। সে যাহাই হউক, আইন হউক আর নাই হউক, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার স্বাস্থ্য পরীক্ষার আবশ্যকতা সকলেই একবাক্যে

স্বীকার করিতেছেন। তবে কি ভাবে আইন রচনা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যায়, অথচ লোকের ঘর সংসার পাতিয়া সুশৃঙ্খলে সুখে স্বচ্ছন্দে গতিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে ব্যাঘাত না ঘটে, তাহাই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না, এই যা কথা। অনেকের বিবেচনায় বাধ্যতামূলক আইন রচনা না করিয়া বিবাহার্থী যুবক যুবতীগণকে ও তাহাদের অভিভাবকগণকে এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইয়া, তাহাদের নিজেদের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। কারণ, বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে গেলেই দেখা যায় এই আইনের সার্থকতা দেখা যায়। অথচ, ঐ সব দেশে বিবাহ না করিয়াও শত শত যুবক যুবতী পরস্পরের সম্মতি অনুসারে যৌন সম্মিলনে মিলিত হইবার সুযোগ পায়, অথচ, তাহাদের উপর আইন খাটানো যায় না। এরূপ স্থলে যৌন রোগ এক দেহ হইতে অপর দেহে সংক্রামিত হওয়া নিবারণ করা যায় না। আইন এখানে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আইনসঙ্গত ভাবেই হউক, অথবা সামাজিক ভাবেই হউক, বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যে খুবই আবশ্যক তাহাতে লেশ মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর বা কনে কাহারও কোন সংক্রামক রোগ থাকিলে, ঐ রোগ যদি দুরারোগ্য হয়, তবে রোগগ্রস্থ ব্যক্তির বিবাহ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। যদি ঐ রোগ চিকিৎসাসাধ্য হয়, তবে চিকিৎসার দ্বারা তাহাকে নিরাময় করিয়া তবে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত। আর যাহারা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই—তাহাদের বিবাহ করা ঘোর সামাজিক পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। দাম্পত্য জীবনের একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে। সন্তানের জন্মদান, নূতন নূতন জীবসৃষ্টি বড় সহজ কথা নাহে। সুস্থদেহ সন্তানের জন্ম দিতে না পারিলে সমাজের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। অতি প্রাচীন কালেও এক সময়ে সমাজ রক্ষার্থ স্পার্টানরা আইন করিয়াছিল যে, কাহারও রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মিলে, সে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পাইবে না—ঐরূপ সন্তানকে মাংসাশী পক্ষিগণের ভোজনার্থ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে ফেলিয়া দিয়া আসিতে হইবে।

বিবাহার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনেক উপকার আছে। পরীক্ষায় স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া বুঝা গেলে, সে চিকিৎসা করাইয়া ও সাবধানে থাকিয়া পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ও নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে। সামান্য একটা জীবন-বীমা করাইতে গেলে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করাইলে চলে না। তাহা হইলে বিবাহের মতন এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো আরও কত বেশী দরকার বলুন দেখি! আমরা আশা করি, পুত্র কন্যার ভাবী জীবন যাহাতে দুঃখময় না হয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অভিভাবকেরা অতঃপর তাহাদিগকে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাইবেন। নচেৎ বিবাহ-সংস্কারের ন্যায় পবিত্র সামাজিক প্রথা প্রহসন মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল]

প্রফুল্লতা ভগবদ্দত্ত গুণ। আনন্দময় অবস্থা লাভ করাই প্রত্যেক জীবনের চরম উদ্দেশ্য। নীতি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে কোন নিয়মই কর্ত্তব্যবোধে আমরা প্রতিপালন করি—আমাদের আত্মা সংসারে যাহার জন্য ছুটাছুটি করে, আনন্দ লাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিক আনন্দলাভ হইলে

আমাদের কোন অভাব, আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। মানব-জীবনের চরম সার্থকতা বা ভগবদবস্থা লাভ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্বাস্থ্যের সহিত প্রফুল্লতার কতটুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাই আমরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বাস্থ্যের সহিত প্রফুল্লতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; স্বাস্থ্যের উপর ইহার প্রভাব কত বেশী তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। সুকুমার শিশু হইতে যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাই। যে শিশু সদা কলহাস্য পূর্ণ, সদা প্রফুল্ল, সে দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে থাকে; তাহার লাবণ্য, কান্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়· অন্য পক্ষে যে শিশু ক্রন্দনপর, বিমর্ষ, তাহার দৈহিক অবনতি অতি দ্রুত হয়, এবং সে রুক্ষ মেজাজের ও রোগপ্রবণ হইয়া থাকে। যুবক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই ঐ কথা। আমরা চারিদিকেই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। উপযুক্ত খাদ্য পরিচ্ছদাদি না পাইয়াও এই প্রফুল্লতার গুণে অনেকের স্বাস্থ্য কত সুন্দর থাকিতে দেখা যায়। অন্য পক্ষে যথোচিত খাদ্যাদি খাইয়া এবং স্বাস্থ্যের অন্য নিয়ম পালন করিয়াও এই প্রফুল্লতার অভাবে অনেকের স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে। এইজন্য মনে হয়, ইহা যেন ঔষধ অপেক্ষাও ঔষধের কাজ করে। আমাদের দেহের সহিত শরীরের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহা আমরা অনেকেই জানি। সুতরাং এই মনের সুস্থ, সুন্দর, প্রফুল্ল অবস্থা হইতে যে শরীরের উন্নতি বিধান হইবে, ইহাতে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যখন মন নির্ম্মল ও প্রফুল্ল থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় যন্ত্রে ও রক্তের মধ্যে এমন এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের গতি প্রবল হয় এবং মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিশিষ্ট পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। ইহা আমাদের রক্তের শ্বেতকণা সমূহকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়া আমাদের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু বর্দ্ধিত করে। ইহা অনুমান মাত্র নহে,—সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। একটু মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা সকলেই অল্পবিস্তর উপল[ব্ধি] করিতে পারেন।

যখন দুশ্চিন্তা দ্বারা হৃদয় অবসন্ন, শরীর নিস্তেজ, ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল বোধ হয়, তখন যদি হঠাৎ প্রফুল্ল হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয়, বা যত্ন পূর্ব্বক মনকে প্রফুল্ল করিতে পারি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিব আমাদের হৃদয়-যন্ত্র ও মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন এক প্রশান্ত ভাব বোধ হইতেছে, অন্য একরূপ রক্তের ক্রি[য়া] হইতেছে; এবং তখনই শরীরের গ্লানি ও অবসন্নতা দূ[রী]ভূত হইবে। এই আনন্দ অবস্থা যত নির্ম্মল, প্রশা[ন্ত] ও উন্নত রকমের হইবে, রাসায়নিক ভাবে আমাদের শরীরের সমুদায় যন্ত্রের ও রক্তের উপর ততই তাহা[র] প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবে।

আমাদের সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ই প্রফুল্ল থাকি[তে] হইবে। তন্মধ্যে আহার, ব্যায়াম ও নিদ্রা এই তিন সময়ে প্রফুল্লতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই তিনটী সম[য়] প্রফুল্ল থাকিলে স্বাস্থ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইবে। যথা নিয়[মে] কিছুদিন চলিলে সকলেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আহারের সময় মন সরস ও প্রফুল্ল থাকিলে রক্তের গতি ও রাসায়নিক ক্রিয়া হিসাবে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের অনুকূল ও সমধিক পুষ্টি সাধনোপযোগী হয়। অন্যপক্ষে বিষণ্ণ মনে বা ক্রোধ, ভয় ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন অবস্থায় আহার করি[লে] অমৃত তুল্য খাদ্যও উদরে গিয়া বিষবৎ ক্রিয়া করি[য়া] থাকে। এইজন্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে প্রশান্ত মনে ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, নীরবে আহারের ব্যব[স্থা] আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সনাতন নিয়[ম] অনেকেই বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি না। আহারের সময় মন হইতে হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষাদি অসৎ প্রবৃত্তি সকল দূর করিয়া দিবে, মন শান্ত সুন্দর ও প্রফুল্ল রাখিবে, এবং আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক "ভোজ্যদ্রব্য যাহাই হউক না কেন তাহাই আমার পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করিবে, আমার পরম মঙ্গলের হইবে" ইত্যাদি ভাবি[য়া] ভাবিতে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে শাক ভাত যাহাই খাই না কেন তাহাই অমৃ[ত] [তু]ল্য কাজ করিবে। প্রফুল্লতা ও ইচ্ছাশক্তির এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা!

আহারের ন্যায় ব্যায়ামের সময় প্রফুল্ল থাকাও একান্ত আবশ্যক। ব্যায়ামের সময় সর্ব্বাঙ্গে রক্তের গতি দ্রুত হইতে থাকে; পেশী ও স্নায়ু সমূহের পরিচালনা হয়; সুতরাং এসময় প্রফুল্ল থাকিলে রক্তের অবাধ, স্বাধীন গতি হয় এবং উহা রাসায়নিক উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার কাজ করিয়া থাকে। এই জন্য যে ব্যায়ামশীল ব্যক্তি প্রফুল্ল ভাবে নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই আশাতীত ফল লাভ করিবেন। পরন্তু বিষণ্ণ মনে ও অন্যমনস্ক অবস্থায় যদি ব্যায়াম করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা রক্তের ও স্নায়ু প্রভৃতির তেমন উৎকর্ষতা লাভ হয় না এবং উহাদের স্বাধীন চালনা অনেকটা প্রতিহত হয়। এইজন্য পরিশ্রমের দ্বারা শরীর ক্ষয় মাত্রই হইয়া থাকে, বিশেষ কোন ফললাভ হয় না। বরং অনেক সময় ক্ষতিই হইয়া থাকে। ব্যায়ামের সময় মনে করিবে "আমি আমার সমগ্র শক্তি ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতেছি। আমার মাংসপেশী, স্নায়ু প্রভৃতি সম্যক পুষ্টিলাভ করিতেছে। আমার দেহের প্রত্যক্ষ উন্নতি হইতেছে।" এইরূপ অন্যান্য বিষয় ভাবিবে, যাহাতে মানসিক তেজস্বিতা ও স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে ততক্ষণ ঠিক মনের এই অবস্থা রাখিতে হইবে। এইরূপ স্ফূর্ত্তি ও ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্যায়াম করিলে ব্যায়ামের অভূতপূর্ব্ব ফল পাইবে, ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

বিশ্রাম আনন্দজনক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিদ্রার সময় যাহাতে মন সুস্থ ও প্রফুল্ল অবস্থায় থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রফুল্ল মনে গাঢ় নিদ্রা হইলে শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দূরীভূত হয় এবং নিদ্রার পর যেন পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়া থাকে।

শয়নের সময় মন হইতে সকলবিধ চিন্তা দূর করিয়া দিয়া প্রশান্তভাবে ভগবানের ধ্যান করিবে এবং ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে শেষচিন্তাটীও যেন সেই দিকেই থাকে তাহাতে লক্ষ্য রাখিবে। এই ভাবে কাজ করিলে আমাদের শান্তিপূর্ণ সুনিদ্রা হইবে, কোন দুঃস্বপ্নাদি ঘুমের সময় কোন বিঘ্ন বিড়ম্বনা ঘটাইতে পারিবে না। গাঢ় ও শান্তিপূর্ণ নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং নিদ্রার সময় মন যাহাতে স্থির প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

সেকালের খাদ্য-তালিকায় মধু

আমাদের দেশে এইরূপ একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, একদা রাণী ভবানীর ভবনে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে বসিয়াছেন। রাণী ভবানীর বিষয়-সম্পত্তির ম্যানেজার মহাশয় রাণীর প্রতিনিধি-স্বরূপ গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের স্থলে উপস্থিত থাকিয়া, কাহার কি চাই তাহার তদারক করিতেছেন। নিকটে চিকের অন্তরালে স্বয়ং রাণী ও অন্যান্য পুরমহিলারা উপবিষ্ট থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের ভোজন দর্শন করিতেছেন।

ভোজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথামত ম্যানেজার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কাহারও কিছু চাই কি? সেকালে সামাজিক ভোজের একটু বিশেষত্ব ছিল। রাণী ভবানীর ন্যায় সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহে ভোজের আয়োজন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধারণ গৃহস্থ গৃহেও ভোজে

যথেষ্ট আড়ম্বর করিতে হইত। আর একটি নিয়ম এই ছিল যে, কর্ম্মকর্ত্তা বা তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা যখন ভোজে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে, কাহারও কিছু চাই কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন ভোক্তাদের মধ্যে কেহ কোন কিছুর প্রার্থনা করিলে গৃহস্বামী যদি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত ও অপদস্থ হইতে হইত। তবে এ কথা অবশ্য সত্য যে, ভোক্তারা, গৃহস্থের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব, এমন কোন দুর্লভ পদার্থ প্রার্থনা করিত না।

রাণীর ম্যানেজার ভোজের শেষ অবস্থায় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আর কাহারও কিছু চাই কি না, তখন সকলেই একবাক্যে ভোজের আয়োজনের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এমন উত্তম ভোজ্য পদার্থ তাঁহারা জীবনে কখনও খান নাই, এবং সকলেই তৃপ্তি-পূর্ব্বক আহার করিয়াছেন, আর কাহারও কিছু প্রার্থনীয় নাই। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, চাক চুষিয়া মধু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। এই কথা শুনিয়া চিকের অন্তরালে রাণী প্রমাদ গণিলেন—সমস্ত আয়োজন বুঝি বা পণ্ড হয়! অপমানেরও শেষ থাকে না; কারণ, সামাজিক প্রথানুসারে, উক্ত ব্রাহ্মণের প্রার্থনা মত মধু-চক্র কেবল ঐ ব্রাহ্মণকে আনিয়া দিলে চলিবে না—সমবেত সকল ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। রাণী ভাবিলেন, তাঁহার ভাণ্ডারে এক আধটা মধু-পূর্ণ মধুচক্র থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু এই সমবেত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে দিতে পারা যায় এত মধুচক্র থাকা অসম্ভব। কিন্তু রাণীর ম্যানেজার বিলক্ষণ সপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে, এখনি আনাইয়া দিতেছি।" বলিয়া তিনি একজন পরিবেশনকারীকে ভাণ্ডারের চাবি দিলেন, এবং সকল ব্রাহ্মণের জন্য এক একটী করিয়া মধুচক্র আনিবার আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ মধুচক্র আনীত হইল, সকল ব্রাহ্মণকে এক একটী করিয়া মধুচক্র দেওয়া হইল। সেই পূর্ণাহারের পর সেই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ চাক চুষিয়া মধু খাইয়া রাণীর জয় জয়কার করিতে করিতে ভোজন দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিল। এই অপূর্ব্ব ভোজের বিবরণ দেশবিদেশে রটিয়া গেল।

ভোজ শেষ হইলে রাণী ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ম্যানেজার আসিলে রাণী বলিলেন "আজ আমার মান রক্ষা করেছ বাবা! তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করব, ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি এত মধু পেলে কোথায়?" ম্যানেজার সবিনয়ে কহিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে আর আপনার পুণ্যবলে আমার অক্ষয় ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব হতে পারে না। এ সকলই আপনার পুণ্যবলে সংগৃহীত হয়েছে।" বস্তুতঃ দূরদর্শী ম্যানেজার ভোজের আয়োজন নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই।

বহুকালের প্রাচীন এই জনশ্রুতির সত্য মিথ্যা এতকাল পরে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু উপাখ্যানটি হইতে এই কথাটী বেশ বুঝা যায়, তখনকালে মধু আমাদের সাধারণ খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণটী মধু খাইতে চাহিত না এবং ম্যানেজারও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের আহারোপযোগী মধুচক্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না। কিন্তু, আজ কাল এ প্রথা দেখা যায় না। মধু আমাদের খাদ্য-তালিকা হইতে আজকাল বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

বস্তুতঃ, মধু অতি উপাদেয় খাদ্য। মানবের খাদ্য-তালিকায় ইহার স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষ মধুমক্ষিকাগণের বহু পরিশ্রম ও সযত্নে সঞ্চিত মধু অপহরণ করিয়া নিজেদের ভোগে লাগাইয়া আসিতেছে। দেশ-বিদেশের কাব্যে, সাহিত্যে মধুর বহু গুণকীর্ত্তন দেখা যায়।

মধু যে কেবল তাহার মিষ্ট আস্বাদের জন্যই মানবের প্রিয় খাদ্য তাহা নয়। মধু অতি পুষ্টিকর পদার্থ। ইহা নানাবিধ ঔষধ-গুণসম্পন্নও বটে। আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধের অনুপান হিসাবে মধু ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেন। সে যে কেবল তিক্ত ঔষধকে মিষ্টত্ব দিয়া তাহা সহজে সেবনযোগ্য করিবার জন্য তাহা নয়; অনুপানরূপে ব্যবস্থিত মধু ঔষধের গুণ-কারিতা বৃদ্ধি করিয়াও থাকে। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে, আমাদের দেশে নবজাত শিশুকে অল্পপরিমাণে মধু খাওয়ানো হয়। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মধুও কিছু দিন শিশুর প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ খাদ্যরূপে মধুর ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। যাঁহারা কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করেন, তাঁহারাই কেবল ঔষধের অনুপান-রূপে সামান্য পরিমাণে মধু সেবন করেন। তাহা এত সামান্য যে, তাহাকে কোনরূপেই খাদ্য বলা যায় না। অথচ মধু অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে বন-জঙ্গলে মধু যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্নও হয়। তথাপি কেন যে উহার খাদ্যরূপে ব্যবহার পরিত্যক্ত হইল, তাহার কারণ ভাল বুঝা যায় না। হয় ত আমাদের রুচির বিকার ঘটিয়াছে; কিম্বা হয় ত কৃত্রিমতার প্রতাপে মধুর গুণ ও স্বাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; অথবা কষ্ট-সাধ্য বলিয়া মধু যথেষ্ট পরিমাণে হয় ত সংগৃহীত হয় না; আবার রপ্তানীর দরুণ মূল্য বৃদ্ধিও হয় ত ইহার ব্যবহার সঙ্কুচিত হইবার অন্যতম কারণ হইতে পারে। যে কারণেই হউক, আমরা আপাততঃ একটী প্রাচীন, পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যানুমোদিত স্বদেশী খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এদিকে অন্য দেশে মধুর আদর যথেষ্টই বাড়িতেছে। একখানি ইংরেজী স্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িক পত্রে মধুর বিষয়ে একটী সুন্দর আলোচনা পাঠ করিলাম। লেখক একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক। তিনি মধুর ব্যবহার সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহার গুণবর্ণনায় শত-মুখ হইয়াছেন।

তিনি বলেন, স্মরণাতীত কাল হইতে মধু পৃথিবীর নানা দেশে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বাইবেলে মধু পানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। প্রাচীনদের খাদ্যতালিকায় মধু প্রধান স্থান অধিকার করিত। ভ্রমণ-কারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাঠ করা যায় যে, প্যালেষ্টাইনে এক সময়ে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধু উৎপন্ন হইত। আরব দেশের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়গুলিতে এখনও প্রচুর মধু উৎপন্ন হয়। মধুমক্ষিকাদের দ্বারা উৎপন্ন মধু ছাড়া, আরও কয়েক প্রকার পদার্থ এই সকল দেশে মধু নামে ব্যবহৃত হইত। এই সকল পদার্থ অনেকাংশে মধুরই অনুরূপ। আরব দেশে আঙ্গুর ফলের রস হইতে একপ্রকার কৃত্রিম মধু উৎপন্ন হইত। গুণে ও স্বাদে তাহা মধুর অনুরূপ বলিয়া সীরিয়ানদের মধ্যে ইহার খুব আদর ছিল। মেসোপটেমিয়া দেশের সিনাই উপদ্বীপে একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস মধুরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম মধু অবশ্য মধুচক্র হইতেই পাওয়া যাইত।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে মধু হইতে নানা বস্তু পাওয়া যায়; যথা, ডেক্সট্রোজ, লেভুলোজ, ডেক্সট্রিণ, প্রোটিন, মোম, তৈল, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি। ইক্ষু চিনি গাঁজাইয়া মধুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সহজ-পাচ্য।

প্রাচীনেরা প্রচুর পরিমাণে মধু পান করিতেন। তৎকালে ইহা অন্যতম প্রধান মিষ্টান্ন ছিল বলিলেই হয়। ঔষধার্থও ইহার ব্যবহার অল্প ছিল না। মধু হইতে নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত হইত। তাহাদের মধ্যে কয়েকটী মাদকতা-গুণসম্পন্ন ছিল। আরবেরা আজও মধু মাখাইয়া রুটী খায়। আমরা বাল্যকালে মুড়ির সহিত মধু মাখিয়া খাইতাম। সে বড় উপাদেয় খাদ্য ছিল।

অনেক স্থানে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে চিনির পরিবর্ত্তে মধু ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে মধু চিনির অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম লাগে। বিলাতী খাদ্য-তালিকায় মধুযুক্ত বহু খাদ্যের নাম পাওয়া যায়। মধুতে ডুবাইয়া অনেক স্থলে নানাবিধ ফল ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ দীর্ঘকাল অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়। এইগুলিকে মোরব্বা বলাও যাইতে পারে।

বিলাতী বৈদ্যশাস্ত্রে টাটকা মধু বিরেচক গুণসম্পন্ন। পুরাতন মধুর গুণের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। ঔষধকে সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য বিলাতী ঔষধে অনেক সময় মধু মিশ্রিত করা হয়। গলা জ্বালা করিলে লেমনেডের সহিত মধু মিশাইয়া পান করিলে জ্বালার উপশম হয়।

ইয়োরোপে মধু তেমন সুলভ নয়, অথচ তাহার ব্যবহার যথেষ্ট। এই কারণে খাঁটি মধুর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম মধু প্রস্তুত করিবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাংশে খাঁটি মধুর অনুরূপ নকল মধু এ যাবৎ কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। এই জন্য মধুতে কোন ভেজালও চলে না। মধু খাঁটি কি না, তাহার সাক্ষী মৌমাছি। মৌমাছি কৃত্রিম মধু কখনও স্পর্শও করিবে না।

মৌমাছিরা যে ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, তদনুসারে, মধুর স্বাদ ও গুণের বিভিন্নতা ঘটে। মধু-মক্ষিকারা ফুল হইতে মধু আহরণ করে বটে, কিন্তু, তাহাদের দ্বারা মধুর অনেক পরিবর্ত্তন হয়। অনেক ফুলে স্বাভাবিক অবস্থায় মধুর ন্যায় একপ্রকার মিষ্ট স্বাদযুক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা স্বাদে, বর্ণে বা গন্ধে মধু হইতে অনেকটা বিভিন্ন। মধু-মক্ষিকারাও ইহাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত মধু তাহারাই উহা হইতে প্রস্তুত করিয়া লয়। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও ফুলের মধু হইতে চাকের মধু প্রস্তুত করিতে পারে নাই; কখনও পারিবেও না।

কোন স্থানে কোন ফুলের গাছ প্রচুর পরিমাণে থাকিলে মধুমক্ষিকারা কেবল সেই ফুল হইতেই মধু সংগ্রহ করে। তাহাদের সংগৃহীত মধুও ঐ ফুলের নামেই পরিচিত হয়। যথা, কমলার মধু, পদ্ম মধু, মহুয়ার মধু প্রভৃতি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গুণের যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। যেখানে একপ্রকার ফুলের গাছ বহু পরিমাণে থাকে না, নানাপ্রকার ফুলের গাছ থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্য মৌমাছিরা সকল প্রকার ফুল হইতেই মধু সংগ্রহ করিয়া চাকে সঞ্চয় করে। এইপ্রকার মধুর কোন বিশেষ ফুলের নামে নামকরণ হয় না, এবং বিশেষ কোনপ্রকার ফুলের নামে বিশিষ্ট মধুর গুণও ইহাতে বর্ত্তে না। ইহারা সাধারণতঃ মধু নামেই পরিচিত, এবং সাধারণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়।

শিশুর কৃত্রিম খাদ্য

[ডাক্তার—শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

মাতৃস্তন্যই শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য। তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত খাদ্যই শিশুর কৃত্রিম খাদ্য নামে অভিহিত করিলে বোধ হয় দোষের কথা হয় না। এদেশে দিনে দিনে নানাবিধ কৃত্রিম খাদ্যের আমদানী এবং তাহার ব্যবহার ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

এদেশে দরিদ্র ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যেই শিশুর কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এই শ্রেণীর অনেক লোকে মনে করে—তাহারা খুব সুশিক্ষিত ও সভ্য; এবং সাহেবিয়ানা ধরণে চলা ফেরা করার ইচ্ছাও তাহাদের বেশী। অথচ জ্ঞান ও অর্থের অভাব জন্য প্রকৃতভাবে বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় কৃত্রিম খাদ্যকে আরো কৃত্রিম করিয়া সুব্যবস্থা কুব্যবস্থা করিয়া বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়া বসে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রদিগের মধ্যে এখনও শিক্ষায় অভিমান নাই। বিলাসিতার প্রবৃত্তি আসে নাই। তাহারা সভ্যতার স্পর্দ্ধা করে না। সুতরাং স্তন্য দুগ্ধ অভাবে স্বদেশজাত সদ্য গো দুগ্ধ, ছাগ দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ, গর্দ্দভ দুগ্ধ, তাহার অভাবে ভাত, ভাতের মাড়, চিঁড়ের মাড় ইত্যাদি শিশুকে যত্ন করিয়া খাওয়ায়। সে জন্য তাহাদের মধ্যে শিশু-মৃত্যু সংখ্যা কম। অথবা মৃত্যু হইলেও খাদ্যদোষে তাহাদের মধ্যে শিশু কম মরে। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বিলাসিতার আধিক্য হওয়ায় মাতৃগণ সন্তান পালনে শিক্ষাহীনা এবং অধিকাংশই পীড়াগ্রস্তা। তাহাদের পাচক শিশুখাদ্য প্রস্তুত করে; অপরিষ্কার ভেজাল খাদ্য সংযুক্ত আহার্য্য তাহারা প্রস্তুত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাহা সুসিদ্ধও হয় না। সেই খাদ্যই শিশু মাতা স্বচ্ছন্দে শিশুকে আহার করাইয়া থাকেন। তাহা খাইয়া যে শিশু রোগগ্রস্ত হয় তাহা শিশু মাতার ধারণাই নাই। অধিকাংশ অবস্থাপন্ন মাতারাই আলস্যপরায়ণা রোগগ্রস্তা, দুগ্ধহীনা অথবা স্বল্প বিকৃত দুগ্ধ যুক্তা। এই সকল গৃহে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রসূতির মৃত্যু হইলে, আর সে শিশুর স্তন দুগ্ধ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না; অথবা পালন কর্ত্রীর অভাবে কৃত্রিম খাদ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। দেশে অনেক সুপথ্য থাকিলেও বিদেশী খাদ্যের পক্ষপাতী ডাক্তার বাবুরা সেই খাদ্যেরই ব্যবস্থা করিয়া বসেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এদেশে শিশুর সুখাদ্য মোটেই নাই বা হইতেই পারে না। তাহার ফলে মৃতকল্প শিশু, চিররুগ্ন, পেট রোগা, ক্রমে বড় হইলে অজীর্ণ রোগ হয়। তাহাদের যকৃত দূষিত থাকে, এবং সামান্য অনিয়মেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বার বার বিদেশী উত্তেজক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবহারে ক্রমে শৈশব কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপস্থিত হইলে, তখন আর কতকগুলি দুষ্ট প্রবৃত্তি ও বন্ধু আসিয়া যোগ দেয়। সুতরাং আর হৃষ্ট, পুষ্ট, মেধাবী ও সুশ্রী হইতেই পারে না। ক্রমে প্রৌঢ়ে অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া পীড়াগ্রস্ত হয়। ও অকালে ভবলীলা শেষ করে। এই কারণেই শৈশবে চঞ্চলতা, কৈশোরে দুষ্টু, যৌবনে প্রফুল্লতা, শক্তি, সামর্থ্য প্রৌঢ়ে সাহস, অধ্যবসায় একাগ্রতা হারাইয়া ভীরু ও কাপুরুষরূপে আখ্যাত হয়। আর পল্লীবাসী দরিদ্র নিরক্ষর, অসভ্য চাষা, চাঁড়াল, ধীবর, শিশু, যুবা, প্রৌঢ় লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তাহারা দৃঢ়কায়, শক্তিশালী, কর্ম্মপটু, সাহসী, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী। তাহাদের শিশু খাদ্য স্বদেশজাত, স্বভাবজ বিশুদ্ধ। তাহাদের শৈশব জীবন নিয়মিত। কিন্তু তাহারা তবু চাষা!

সহজ প্রাপ্য যে সকল কৃত্রিম খাদ্য আমাদের হাটে বাজারে মুদির দোকানে ও ঔষধের দোকানে আমদানী

হইয়া আমাদিগকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিতেছে তন্মধ্যে মিষ্টযুক্ত গাঢ় দুগ্ধ একটা। এই টিনবদ্ধ বিলাতী দুগ্ধ বায়ু রোধক টিন কৌটায় বিক্রয় হয়। ইহা ক্ষীরের মত ঘন। জলের সহিত সহজে মিলিত হয়। ডাক্তার ডেলি বলেন (ল্যানসেট ১৮৭২।২রা নবেম্বর) "ইহার উপাদান

ছানা	১৪'৩৩
মেদ	১০ ৮০
দুগ্ধ শর্করা	১৪'৫০
ইক্ষু শর্করা	২৭'৪৩
ভস্ম (Ash)	২'৪০
ফস্‌ফরিক এসিড	'৭০
জল	৩০'০৭

ইহার মধ্যে শর্করা অধিক পরিমাণে থাকাতে শিশুর শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে, বলক্ষয় হয়। শরীরের সঞ্জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয়; সে জন্য শিশু রোগপ্রবণ হয়। ইহা সেবনে শিশু মোটা হয় বটে কিন্তু মাংসপেশী নিস্তেজ হয়। সে জন্য শিশু শীঘ্র হাঁটিতে পারে না। দাঁড়াইতে পারে না, পেটটী বড় হয়, মস্তকাস্থির মধ্যস্থিত ফাঁক শীঘ্র জোড়া লাগে না। প্রায়ই পেটের পীড়া হয়। অধিক মিষ্ট না দিলে অন্য খাদ্য খাইতে চায় না।"

ডাক্তার কমেরণ সাহেব বলেন—মিষ্টযুক্ত গাঢ় দুগ্ধ, সুলভ মূল্য, দীর্ঘকাল রক্ষা করা যাইতে পারে (এ দেশে বিশেষতঃ গরমের দিনে নহে) এবং প্রয়োগ জন্য সহজে প্রস্তুত করা যায়। চা চামচের এক চামচ পূর্ণ এই দুগ্ধের সহিত তিন আউন্স জল মিশ্রিত করিলে তাহাতে শতকরা—

মেদ	১ ভাগ
প্রে টীন	১ ভাগ
শর্করা	৫ ভাগ

বর্ত্তমান থাকে। দুই মাস বয়স্ক শিশু অনেক স্থলে গাভী দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। অধিক মেদময় পদার্থ পরিপাক করিতে না পারাই তাহার কারণ, এইরূপ স্থলে

শিশু দুগ্ধ পানের পর যে বমি করে তাহাতে বমিত পদার্থ মধ্যে সংযত খণ্ড খণ্ড আকারে দুগ্ধ নির্গত হয়। কিন্তু মেদময় পদার্থের পরিমাণ অল্প ও শর্করার পরিমাণ অধিক হইলে তাহা বেশ পরিপাক করিতে পারে এবং তদ্রূপ পরিমাণের দুগ্ধ পান করিলে, শিশু অল্প সময় মধ্যে বেশ পরিপুষ্ট হয়। কেবল এইরূপ স্থলেই অধিক শর্করা যুক্ত গাঢ় দুগ্ধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ দুগ্ধ পান করানোর কিছুদিন পরেই শিশুর উদরাধ্মান যুক্ত অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয়। শিশুও মিষ্ট দুগ্ধ খাইতে অভ্যস্ত হওয়ায় অধিক মিষ্ট না দিলে, অন্য দুগ্ধ খাইতে চায় না। মিষ্ট অধিক ও মেদের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস হওয়ার ফলে শেষে শিশু রিকেট পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মিষ্ট বিহীন গাঢ় দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে, তাহার উপাদান সমূহ সাধারণ গো দুগ্ধের পরিমাণেরই অনুরূপ হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অল্প সময় মধ্যেই তাহা নষ্ট হইয়া পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মিষ্ট গাঢ় দুগ্ধ অধিক পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকা হেতু শীঘ্র পচিতে পারে না ; সেজন্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া দীর্ঘকাল তাহা মুক্ত বাতাসে খোলা না থাকিলে, তাহার পচন হয় না। সেই জন্যই তাহা পান করানয় আমাদের দেশে আপত্তি হয় না। কিন্তু ঐ দুগ্ধের কৌটা বার বার খুলিয়া দুগ্ধ বাহির করায় তাহার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়া প্রথমে মৃদু পচন ও পরে দ্রুত পচন জন্মায়। এতদ্ব্যতীত জগতের সমস্ত দ্রব্যই পরিবর্তনশীল, সকল দ্রব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে পচন ক্রিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং বিদেশী শর্করাযুক্ত জমান দুগ্ধেও যে দীর্ঘ দিনে কিছু পরিবর্ত্তন হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তারপর আমরা মৃদু পচনযুক্ত পদার্থের পচন বুঝিতে না পারিয়া তাহাই ব্যবহার করিয়া নিয়ত অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া ফেলি। ইত্যাদি কারণে ঐ দুগ্ধ যদ্যপি বিদেশজাত না হইয়া অন্ততঃ এদেশজাত হয় তাহাও মন্দের ভাল। কিন্তু “তিন নকলে আসল খাস্তা” সাধারণতঃ হইয়া থাকে ; সুতরাং বিশেষরূপ বিপন্ন না হইলে বা নিরুপায় না হইলে কদাচ কেহ যেন এই দুগ্ধ ব্যব[hা]র না করেন।

নিম্নলিখিতরূপে আমরা আমাদের দেশে স[দ্য] গো দুগ্ধ সংরক্ষা করিতে পারি।

দুগ্ধ সংরক্ষা।

১। একটী পরিষ্কার বোতল সদ্য গো দুগ্ধ [দ্বারা] পূর্ণ করিয়া তাহা কোন একটী গরম জলের পাত্র ম[ধ্যে] রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। যখন দুগ্ধ ফুটিতে আ[রম্ভ] হয়, তখন একটী ভাল ছিপি দিয়া বোতলের মুখ [বন্ধ] করিতে হইবে। এবং ছিপির উপর গালা, মোম [বা] রজন লাগাইয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। ঐ [দুগ্ধে] একটু চিনি দিলে আরো ভাল হয়। যদি বোত[লের] পরিবর্ত্তে টিন পাত্রে দুগ্ধ ফুটান যায় এবং তাহ[া] রাংঝালা দিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করা যায় তবে এই দুগ্ধ বহুকাল ভাল থাকে। রাংঝালা সম্পূর্ণ বায়ুরো[ধক] হওয়া ও ঐ টিন পাত্র শুধু রাং ঝালা দিয়া প্রস্তুত [হওয়া] কর্ত্তব্য। এইরূপ দুগ্ধ রেল ষ্টিমার বা দূর [দেশ] যাতায়াতে ব্যবহার করা সুবিধাজনক, অথচ অধি[ক ব্যয়] জনক নহে।

২। দুগ্ধ গরম করিয়া তাহার মধ্যে একটু কার্ব্বনে[ট] অব সোডা ও চিনি দিয়া উত্তমরূপে বোতলে ছি[পি] বন্ধ করিয়া রাখিলে বা ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখি[লে] ৮।১০ দিন সদ্য অবস্থায় থাকে।

৩। দুগ্ধ প্রথমে উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে সোড[া] ওয়াটারের কল দিয়া অঙ্গারাম্ল বায়ু উহাতে দ্রব করি[য়া] উত্তমরূপে বোতলের মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করি[য়া] রাখিলে অনেক দিন দুগ্ধ ভাল থাকে।

৪। দুগ্ধ মৃদু তাপে বা গরম বাষ্পে ঘন করি[য়া] তাহাতে চিনি দিয়া একটী টিনপাত্র উষ্ণ করতঃ তাহ[ার] মধ্যে ঐ ঘন দুগ্ধ পূর্ণ করিয়া টিন পাত্র টিন ঝালা দি[য়া] বন্ধ করিয়া রাখিলে এই ঘন দুগ্ধ বহুকাল পর্য্যন্ত উ[ত্তম] অবস্থায় থাকে।

যে স্থলে শিশু মেদময় খাদ্য পরিপাক করিতে অ[ক্ষম] অথচ যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা পরিপাক করিতে পারে, অধিক পরিমাণে শর্করা সেবনে তেমন অসুস্থতার লক্ষণ উপস্থিত হয় না অথচ মেদের পরিমাণ অধিক হইলেই শিশুর অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থলেই সুমিষ্ট গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহা টাট্‌কা ও স্বদেশজাত গাভী দুগ্ধের হইলেই ভাল হয়।

কি প্রকারে দুগ্ধ কৃত্রিম হয়।

১। গো দুগ্ধ দোহনের পর বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে, তাহা সমক্ষারাম্ল বা ক্ষার গুণ বিশিষ্ট থাকে না। তাহা বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প শোষণ করিয়া ল্যাকটিক এসিড ও অন্যান্য অম্ল উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে অঙ্গারক বাষ্প নির্গত হইয়া উহার ছানা জমিয়া যায়। উদ্ভিদ, জন্তু অথবা খনিজ বস্তু হইতে প্রস্তুত অম্ল মিশ্রিত হইলেও দুগ্ধ জমিয়া যায়। বিশেষ প্রকার যবক্ষারীয় পদার্থ—পেপসিন বা পাকরসেও দুগ্ধ সংযত হয়। দুগ্ধ অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে আপনা হইতেই জমিয়া যায়, এজন্য যে সকল পাত্রে দুগ্ধ রাখা হয় তাহা ভাল করিয়া ধৌত না করিয়া পুনরায় তাহাতে নূতন দুগ্ধ রাখিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে দুগ্ধের ভাঁড় শুধু ধৌত করে এমত নহে, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রাখে। দুগ্ধের ভাঁড়ে ধূম দিলে তাহাতে দুগ্ধ অনেক ক্ষণ রাখিলেও নষ্ট হয় না ; কারণ কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে যে ধূম নির্গত হয় তাহাতে ক্রিয়েজোট ও এসিটিক এসিড কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকে। এই দুইটী বস্তু উত্তম পচন নিবারক। এজন্য দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হয় না। কিন্তু দুগ্ধ ধূম গন্ধ বিশিষ্ট হয়। তাহা পানে অনেকের ন্যাক্কার উপস্থিত হইতে পারে। উষ্ণতা রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সহায় বলিয়া উষ্ণ স্থানে দুগ্ধ রাখিলে শীঘ্র নষ্ট না হইলেও সেই দুগ্ধের পোষকতা গুণ কম হয় এবং সে দুগ্ধ পানে শিশুর অজীর্ণ পীড়া জন্মে।

২। দুগ্ধ দোহনের পর তিন ঘণ্টা বা এক প্রহর কাল সে দুগ্ধ ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বা গরম করিয়া রাখিলে ভাল থাকে ; নতুবা তাহাতে লবণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সে দুগ্ধ পান করিলে শিশুর পেটের পীড়া জন্মে।

৩। তামা, সীসা, দস্তা, পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু পাত্রে দীর্ঘ সময় দুগ্ধ রাখিলে, বা জ্বাল দিলে, ঐ ধাতুর কতকাংশ দুগ্ধে দ্রব হইয়া দুগ্ধ কলঙ্কিত ও বিষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। শিশু-খাদ্য দুগ্ধ সেরূপে রক্ষা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পাথরের পাত্র বা মাটীর পাত্রে দুগ্ধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪। ঝড় বৃষ্টি হইলে বায়ুতে অধিক বিদ্যুৎ পরিচালিত হয়, তাহাতে বায়ুর কতকাংশ এক প্রকার বিশেষ অবস্থা (ওজন) প্রাপ্ত হয়। ঐ বায়ুতে দুগ্ধ থাকিলে দুগ্ধ অম্লীকৃত হয়। এজন্য ঝড় বৃষ্টির দিনে দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৫। অল্প দুগ্ধ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই তাহা প্রথমে অম্ল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। আরো অধিকক্ষণ রাখিলে তাহাতে এক প্রকার নীচ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্ জীবাণু (ফাঙ্গাস্) উৎপন্ন হয় ও দুগ্ধের বর্ণ নীলাভ হয়। এই প্রকার দুগ্ধ শিশু পান করিলে, অজীর্ণ, পাকস্থলীর নানাপ্রকার পীড়া, শূল বেদনা, কোষ্ঠ কাঠিন্য অথবা অতিসার ও ওলাউঠা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই প্রকার দুগ্ধ পানে শিশুদের মুখে ও জিহ্বায় এক প্রকার সাদা সাদা ঘা হয়।

৬। অস্বাভাবিক অবস্থায় (ফুকা দিয়া) দুগ্ধ দোহন করিলে, দুগ্ধের গুণ অনেক পরিবর্ত্তিত হয়।

৭। দুগ্ধ বিক্রেতারা যথা তথার জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অত্যধিক লাভের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। বাজারের দুগ্ধ বা অন্য স্থানের দুগ্ধ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করা উচিত। যে স্থানে বা গ্রামে, ওলাউঠা, বসন্ত, হাম, আমাশয় প্রভৃতি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বা যাহার গৃহে বা যে পাড়াতে উক্ত পীড়া থাকে সেরূপ স্থানের দুগ্ধ বিষবৎ জ্ঞান করা উচিত।

৮। অনাবৃত দুগ্ধ, বায়ুর অম্লজান বা অন্যকীট

পতঙ্গাদির মলমূত্রযুক্ত বা তাহাদের সংস্পৃষ্ট এবং বিড়াল কুকুরের ভুক্তাবশিষ্ট দুগ্ধ বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

৯। গাভী দুর্গন্ধময় স্থানে বাস ও পচা গলিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, এবং অপরিষ্কার থাকিলে, নিশ্চয়ই দূষিত দুগ্ধ উৎপাদন করে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে দুগ্ধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১০। জাতি, শরীরের বর্ণ, আকার, শৃঙ্গারাদির অবস্থা ভেদেও গো দুগ্ধের গুণ ও তাহার উপাদানের তারতম্য হয়। কালবর্ণ গাভীর দুগ্ধই উত্তম।

১১। প্রসবের পরেই গাভীর যে দুগ্ধ নির্গত হয় তাহা অত্যন্ত পাতলা। তাহাকে (কলষ্ট্রম) "গাদ্ড়া" কহে। ইহা কখন কখন আঠাল পীতাভ ও অধিক অস্বচ্ছ হয়। এই দুগ্ধে ছানা অপেক্ষা অণ্ডলালের পরিমাণ অধিক থাকে; এজন্য উষ্ণ করিলে জমিয়া যায়। গো দুগ্ধ ন্যূনাধিক এক মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। ইহার গন্ধও বিশেষ প্রকার এবং পান করিলে উদরাময় হয়। সচরাচর আমাদের দেশে গাভী প্রসব হইবার পর ২১ দিন পর্য্যন্ত গো দুগ্ধ দোহন ও তাহা ব্যবহার করে না। বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধের দুর্ম্মূল্যতা হেতু এরূপ দুগ্ধও বাজারে বিক্রয় হয়। ক্রেতাগণের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দুগ্ধ ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

১২। গো দুগ্ধের শতকরা ১৪ অংশ কঠিন পদার্থ; অবশিষ্ট জল আছে। তন্মধ্যে—

যবক্ষার জান ঘটিত	৪ ১
মেদময় পদার্থ	৩ ৯
দুগ্ধ শর্করা	৫ ২
বিবিধ লবণ	০·৮
	১৪
অবশিষ্ট জল	৮৬
মোট	১০০

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে, খাদ্য দ্রব্যের গুণ ও তারতম্যানুসারে দুগ্ধ নির্ম্মাণকারী দ্রব্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকিলেও, সাধারণ নিয়মের অধি পরিমাণে ব্যতিক্রমেই তাহাকে কৃত্রিম বলা যাইবে।

১৩। প্রথমে যে দুগ্ধ দোহন করা হয় তদপে শেষের দোহা দুগ্ধে অধিক নবনীত থাকে। ভি ভিন্ন পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিলেই তাহা স্পষ্ট পরী করা যায়।

১৪। প্রাতঃকালের দোহা দুগ্ধ অপেক্ষা বৈকা দুগ্ধে অধিক ছানা ও নবনীত থাকে।

১৫। গাভী পর্য্যাপ্ত খাদ্য না পাইলে দুগ্ধের অনেক কম হয়। শুষ্ক ও উত্তম খাদ্য এবং খাইলে, দুগ্ধে কঠিন পদার্থের পরিমাণ অধিক কাঁচা ঘাস খাইলে, নবনীত অধিক হয়। যে গাভী ফাকা ময়দানে হরিৎ ঘাস খায় তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টিকর।

১৬। খাদ্য দ্রব্যের গুণ ও ধর্ম্ম অনুসারে দুগ্ধ গুণও পরিবর্ত্তিত হয়। মঞ্জিষ্ঠা ও জাফরাণ ভক্ষ দুগ্ধের বর্ণ লাল্‌চে, রেউচিনি ভক্ষণে দুগ্ধ রঞ্জিত, তি ও রেচক গুণ প্রাপ্ত হয়। পিয়াজ ও বান্ধা কপি রসুন ভক্ষণে দুগ্ধে তদনুরূপ গন্ধ হয়। গন্ধক দ্রাব (সালফিউরিক এসিড) সেবনে দুগ্ধের আস্ব বিকৃত হয়। বিষাক্ত ঘাস ও বৃক্ষাদি ভক্ষ তাহার দুগ্ধ বিষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তেঁতুল, টক অ থাইলে দুগ্ধ অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়। আফিং খাইলে বিষাক্ত হয়।

১৭। গাভী ভীত, চকিত, তাড়িত, প্রহারি হইলে তাহার দুগ্ধের গুণের পরিবর্ত্তন হয়।

১৮। দুগ্ধবতী গাভী গর্ভবতী হইলে তাহার দু অত্যন্ত বিকৃত হয়!

১৯। দুগ্ধ বিক্রেতারা অন্যায় লাভের প্রত্যা ছাগ, মেষ গর্দ্দভ ঘোটক প্রভৃতি জন্তুর দুগ্ধ গো দু মিশ্রিত করিয়া অনেক সময় বাজারে বিক্রয় করি থাকে। দুগ্ধের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অনেকেই সে বিষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন না; ফলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত কিন্তু দুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা এরূপ দুগ্ধ সহজেই ধরা যাই

পারে। সেজন্য ঐ সকল জন্তুর দুগ্ধের উপাদান নিম্নে দেওয়া গেল।

	গাভী	ছাগ	মেষ	গর্দ্দভ	ঘোটক
যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ ও অদ্রবনীয় লবণ …	৪·৫৫	৪·৫০	৮·০০	১·৭০	১·৭২
নবনীত …	৩·৭০	৪·১০	৬·৫০	১·৪০	০·২০
শর্করা ও দ্রবনীয় লবণ	৫·৩৫	৫·৮০	৪·৫০	৬·৪০	৮·৭৫
জল …	৮৬·৪০	৮৫·৬০	৮১·০০	৯০·৫০	৮৯·৩৩

এতদ্ব্যতীত ছাগ দুগ্ধে এক প্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত অম্ল আছে। এই দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩২ হইতে ১০৩৬। এই দুগ্ধই গো দুগ্ধের সহিত ভ্যাজালরূপে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয়।

২০। আমাদের দেশে প্রবঞ্চক গোয়ালাগণ দুগ্ধে গরমজল দিয়া, দুগ্ধ আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয়, তাহাতে দুগ্ধ মধ্যস্থ মেদময় পদার্থের অপ্রচুরতা হেতু তদ্দ্বারা পোষণ ক্রিয়া কম হয়। এই মেদ বর্ত্তমান থাকাতেই দুগ্ধ শুভ্র বর্ণ দেখায়। সুতরাং দুগ্ধে মেদের অভাব হইলে দুগ্ধে বর্ণের তারতম্য দেখিয়া তাহা ধরা যাইতে পারে।

২১। দুগ্ধ মধ্যে একপ্রকার চিনি বর্ত্তমান থাকায় দুগ্ধ মিষ্ট লাগে। চিনি সুরোৎসেচক সুতরাং কোন প্রকার জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রণে ঐ চিনি দ্বারা দুগ্ধে সুরা উৎপন্ন হওয়ায় দুগ্ধ অম্লস্বাদযুক্ত হয় ও শেষে দধিরূপে দেখা যায়। এরূপ দুগ্ধ পানে শিশুর উপকার হয় না।

২২। গো দুগ্ধে মনুষ্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছানা ও নবনীত থাকে এবং শর্করা কম থাকে। গো দুগ্ধ কৃত্রিম উপায়ে মনুষ্য দুগ্ধের অনুরূপ করিতে হইলে, ⅓ ভাগ গো দুগ্ধে ⅔ ভাগ গরম জল মিশাইয়া উহার প্রতি সেরে ২ কাঁচ্চা দুগ্ধ শর্করা মিলাইলে অনেকটা মনুষ্য দুগ্ধের অনুরূপ হয়। মনুষ্য দুগ্ধের অভাবে গো দুগ্ধ এইরূপে সদ্যোজাত শিশুকে পান করান যাইতে পারে। গর্দ্দভীর দুগ্ধে মনুষ্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শর্করা ও অল্প নবনীত আছে। এজন্য ইহা মনুষ্য দুগ্ধের ন্যায় ইষ্টকর নহে। সমভাগ গো দুগ্ধ ও গর্দ্দভ দুগ্ধ, মনুষ্য দুগ্ধের প্রায় অনুরূপ।

মনুষ্য দুগ্ধ কি প্রকারে কৃত্রিম ও শিশু খাদ্যের অনুপযোগী হয় তাহা ১৪শ বর্ষের ১ম সংখ্যা স্বাস্থ্য সমাচারে শিশু-খাদ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

হরলিক্‌স মিল্ক ফুড, এলিনবেরিজ ফুড প্রভৃতি খাদ্য বিলাত হইতে আমদানী হইয়া আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে শিশুপথ্য ও রোগীর পথ্যরূপে বহুলভাবে আজ কাল ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলি—কোন উত্তপ্ত ধাতু পাত্রের উপর দুগ্ধ প্রক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ দুগ্ধ শুষ্ক ও চূর্ণরূপে পরিণত হয়। এইরূপ প্রস্তুত দুগ্ধ চূর্ণ সদ্য দুগ্ধের উপাদানেরই অনুরূপ। তবে সদ্য দুগ্ধের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, সদ্য দুগ্ধ মধ্যে নানাপ্রকার জীবাণু যত অধিক বর্ত্তমান থাকে এইরূপ শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ মধ্যে তাহাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে। শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ দীর্ঘ দিন রাখিবার জন্য ইহার সহিত "মাল্‌ট-সুগার" মিশ্রিত করা হয়। ইক্ষু শর্করা কর্ত্তৃক অন্ত্র মধ্যে উৎসেচন ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়; কিন্তু অন্য প্রকার মিল্ক সুগার, শ্যাকারিণ প্রভৃতি শর্করায় তাহা কম হয়। এজন্য যে সকল দুগ্ধ চূর্ণে ইক্ষু শর্করা মিশ্রিত থাকে তাহা সেবন করাইলে শিশুর পেটের পীড়া জন্মে ও স্কার্ভি রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রকার দুগ্ধ চূর্ণে মেদের ভাগ কম থাকে। যে সকল শিশু মেদময় গাভী দুগ্ধ পান করিয়া পরিপাক করিতে পারে না অথচ শর্করাময় পদার্থ বেশ পরিপাক করিতে পারে সেই সকল শিশুর পক্ষে এরূপ খাদ্যে উপকার হইত দেখা যায়। এরূপ স্থলে সদ্য গো দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া সেবন করাইলেই সেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং গো দুগ্ধ সহজে পাওয়া গেলে এরূপ শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ দেওয়া অবিধেয়। যদি সময় ক্রমে সদ্য গো দুগ্ধ অপ্রাপ্য হয় তাহা হইলে যে কয়েক দিবস সদ্য দুগ্ধ অপ্রাপ্য হয় কেবল সেই কয়েক দিবস মাত্র এইরূপ দুগ্ধ চূর্ণের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

নতুবা শুধু এরূপ দুগ্ধ চূর্ণের উপর নির্ভর করা অনুচিত ও অনিষ্টকর। যে সমস্ত শিশুর বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক ও যাহারা হৃষ্টপুষ্ট তাহাদিগকে এরূপ মেদ হীন ও শর্করাময় দুগ্ধ চূর্ণ খাইতে দিলে অনিষ্টই হয়।

শিশুর সাত মাস বয়সের পূর্ব্বে শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ এই বয়সের পূর্ব্বে শিশুর শ্বেতসারময় খাদ্য পরিপাকের উপাদান তাহার পাকস্থলীতে জন্মে না; সুতরাং তৎপূর্ব্বে শ্বেতসারযুক্ত বিলাতী দুগ্ধ চূর্ণ বা তদনুরূপ কোন খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু নয় মাস বয়স উত্তীর্ণ হইলে শ্বেতসার সংশ্লিষ্ট খাদ্য দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিলাতী অনেক শিশু খাদ্য শ্বেতসার সহ মল্‌ট শর্করা ও ফারমেণ্ট মিলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। এই সকল খাদ্য জল বা দুগ্ধ সহ উত্তমরূপে ফুটাইলে ইহার মধ্যস্থ শ্বেতসারময় পদার্থ শর্করায় পরিণত হয়। এইরূপ শর্করায় পরিণত না হইলে, শিশু তাহা পরিপাক করিতে পারে না সুতরাং অজীর্ণ পীড়া জন্মে। আমাদের একটু কুসংস্কার আছে যে, বিলাতী পথ্য একটু গরম জলে বা গরম দুগ্ধে মিশাইলেই খাদ্যোপযোগী হয়। কিন্তু তাহা যেমন, তেমন, একটু উত্তাপ না দিয়া বেশ ফুটাইয়া লইতে হয়, যেরূপ বিলাতী পথ্য যে যে পদার্থ সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় সেই সেই পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে ও শিশুর পরিপাক শক্তি অনুযায়ী সেই সকল পথ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়; নতুবা সকল বিলাতী শিশুখাদ্যই সকল শিশু পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতে এক দিকে অর্থ অন্য দিকে জীবন নষ্ট হয়।

অনেক শিশুর পাকাশয়িক উৎসেচন জনিত পেটের পীড়ায় সবুজ বর্ণ জলের ন্যায় দাস্ত হইতে থাকে। বমন, পেটে বেদনা, পাছায় ঘা ও অনিয়মিত জ্বর হইয়া থাকে। সেরূপ স্থলে অনেক ডাক্তার বাবুই শর্করাযুক্ত বিলাতী পথ্যই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই অধিক হয়; কারণ এই শিশুর শর্করা পরিপাক করার শক্তি নাই বা শর্করা সেবনেই পেটের পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে। তদুপরি ঐ বিলাতী শর্করাযুক্ত পথ্য দিয়া রোগোৎপত্তির সহায় করা হইল। এরূপ স্থলে ঘোলের জল, ছানার জল পথ্য দিলে শিশু তাহা পরিপাক করিতে পারে।

অনেক শিশুর পিপাসায় জল না দিয়া বিলাতী শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ চূর্ণ পথ্য দিয়া তাহার পিপাসা শান্তি করিতে চেষ্টা করা হয়; ফলে তখন তখন পিপাসা শান্তি হইলেও উক্ত শর্করাযুক্ত খাদ্যে অতিসার, বমি ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়া, শরীর হইতে জলীয় পদার্থ বহির্গত হইয়া পিপাসা আরো অধিক হয়।

আমরাও সদ্য গো দুগ্ধ হইতে এদেশে অসময়ের জন্য বিলাতী শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধচূর্ণের অনুরূপ দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি। একটু আয়াস স্বীকার করিলেই এরূপ খাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকিতে পারে। প্রথমে সদ্য গো দুগ্ধ হইতে কিয়ৎ পরিমাণ মাখন অস্তরিত করিয়া কোন জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে অন্য কোন পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া জাল দিলে, ঐ দুগ্ধ ক্রমে ঘন ও পরে শুষ্ক হইয়া গেলে তৎসহ শ্যাকারিণ, মল্‌ট শর্করা অথবা মল্‌ট শর্করা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া দিলে দীর্ঘকাল তাহা অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এবং অসময়ে সদ্য দুগ্ধ প্রাপ্তির অভাব হইলে মহৎ উপকার সাধন করিতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার—কোন লৌহ নির্ম্মিত পাত্রের মধ্যে দুগ্ধ রাখিয়া তাহার মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করতঃ বহুসংখ্যক নলের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করিলে দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া নলের গাত্রে লাগিয়া যায়। তাহা উত্তমরূপে বাহির করিয়া তৎসহ দুগ্ধ শর্করা শ্যাকারিণ বা মল্‌ট শর্করা অথবা গোধূম চিনি মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে বায়ু রোধকারক রাখিলে, দীর্ঘ দিন ভাল থাকে ও অসময়ে মহৎ উপকার সাধন করে।

যেরূপ স্থলে শিশুর মেদময় খাদ্য পরিপাক হয় ও পেটের পীড়া, বমন ইত্যাদি উপসর্গ হয় সেরূপ স্থলে ঘোল বা মাঠা অর্থাৎ মেদ রহিত দুগ্ধ পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইয়োরোপে ম্যালেরিয়া কনফারেন্স :—

ইয়োরোপের স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টায় ইয়োরোপ হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় দূরীভূত হইয়াছে; ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থান সকল স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে; লোকে সেই সকল স্থানে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে নিরাপদে বাস করিতেছে। তথাপি ইয়োরোপ সন্তুষ্ট নয়। যাহাতে ইয়োরোপে ম্যালেরিয়ার চিহ্নমাত্র না থাকে, ইয়োরোপ এখনও সেই চেষ্টা করিতেছে। ইয়োরোপকে সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়াশূন্য করিবার জন্য এখনও তথায় ম্যালেরিয়া কনফারেন্স বসিতেছে, ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বনের পরামর্শ হইতেছে। ইয়োরোপ কেবল পরামর্শ করিয়াই ক্ষান্ত নয়। তাহারা কাজের লোক। পরামর্শের ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে সকল উপায় অবিকৃত হইতেছে, সেগুলি তথায় তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ইয়োরোপের গবর্ণমেণ্ট সকল ম্যালেরিয়া বিতাড়ন করিবার জন্য নিজেরা ত অর্থ ব্যয় করিতেছেনই; অধিকন্তু চিকিৎসক, কর্ম্মী ও জনসাধারণকে নানারূপ উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্য দান করিতেছেন। ফলে ইয়োরোপ অচিরে সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়াশূন্য হইবে, এমন সম্ভাবনা হইয়াছে।

আর আমাদের ভারতবর্ষ? এখানে প্রতি বৎসর দশ বারো লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরে মরিতেছে। কিছু অর্থব্যয় করিলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় সকল অবলম্বন করিলে, এই নিবার্য্য ব্যাধির প্রকোপ অনেকটা পরিমাণেই হ্রাস করা যাইতে পারে; প্রতি বৎসর বহু লোককে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভিশপ্ত ভারতবর্ষে কার্য্যতঃ সেরূপ কোন চেষ্টাই হইতে দেখা যায় না। এদেশের গবর্ণমেণ্ট যেমন উদাসীন, দেশের জনসাধারণ আবার ততোঽধিক। জনসাধারণ একেবারে নির্ব্বিকার! আর গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট আপিসে কুইনাইন বিক্রয়ের হুকুম দিয়াই নিশ্চিন্ত। সে কুইনাইনও আবার সব সময়ে পোষ্ট আপিসে পাওয়া যায় না বলিয়া অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ যেন এ পৃথিবীর কোন দেশ নয়—পৃথিবীর কোন দেশের কোন নিয়মই এখানে খাটে না। আর কত কাল এরূপ অবস্থা চলিবে?

পল্লী সংগঠন :—

রাজনীতির মোহ হইতে আপনাদের কোন রকমে উদ্ধার করিয়া কতকগুলি লোক পল্লী সংগঠনে মন দিয়াছেন; কিছু কিছু কাজও আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। পল্লী-সংগঠন বড় সোজা কাজ নয়। ভারতের প্রকৃত জীবন পল্লীতেই অবস্থিত। ভারতের শতকরা ৯৫ হইতে ৯৮ জন পল্লীতে বাস করে। পল্লীই ভারতের প্রাণ। কিন্তু, যে কোন কারণেই হউক, পল্লী একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—পল্লীজীবন মুমূর্ষপ্রায়। এই ভাঙ্গা পল্লীকে প্রায় নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

পূর্ব্বকালে পল্লীরক্ষার প্রধান উপায় ছিল পল্লীসমাজ। সেই পল্লী সমাজ এখন নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা

পল্লী সমাজের সমাজপতি শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহারা এখন নানা প্রলোভনে পড়িয়া সহরবাসী হইয়াছেন। তাঁহারা পল্লীবাসে ফিরিবেন কি না, তাহা জানি না। তাঁহাদের পল্লীবাসে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা বা আশা আছে কি না, তাহাও অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায়, যাহারা এখনও পল্লীতে পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। কিরূপে এই কাজ কিয়ৎপরিমাণে করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সমাচারে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এবং সেই প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া সংস্কৃত, এবং কোন কোনটা পুনর্লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি "স্বাস্থ্য সমাচার" পুস্তক বিভাগে পাওয়া যায়। পল্লী-সংগঠন-কামী কর্ম্মীরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রবন্ধগুলি পল্লীগ্রামে এই সংগঠনমূলক বহু-বৎসরব্যাপী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

পল্লী সংগঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করার অপেক্ষা সমবায় প্রণালীতে কাজ করা অধিকতর সুফলপ্রদ উপায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রথমতঃ পল্লীবাসীদের পল্লীসংগঠন কার্য্যের উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করাইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, পল্লী-বাসীদের মনে কাজ করিবার জন্য একটা স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মিবে। কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিতে গেলে, পল্লীবাসীর ঔদাসীন্য ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না, এবং তাহার ফলও তাদৃশ সুন্দর হইবে না। পল্লী সংগঠনকারীদের সুতরাং প্রধান কাজ হইবে—পল্লীবাসীদের মনে সংগঠন কার্য্যে একটা interest create করা। এই আগ্রহটি জন্মাইয়া দিতে পারিলে কাজ কতকটা automatically অর্থাৎ স্বয়ং-চালিত ভাবে চলিবে এবং কর্ম্মীরা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবে হইবে। সর্ব্বাগ্রে পল্লীবাসীদের জড়তা দূর ক আবশ্যক—এইটী মনে রাখিয়া কর্ম্মীগণকে কর্ম্মক্ষে নামিতে হইবে।

কালাজ্বর কনফারেন্স—

কয়েক দিন ধরিয়া লাট প্রাসাদে কালাজ্বর ক ফারেন্সের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। লা সাহেব এই কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন। পরে স্বা বিভাগের ডাইরেক্টার মহাশয় সভায় কালাজ্বরে সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করেন। কনফারেন্স বেসরকারী কনফারেন্স হইলেও সদাশয় গবর্মেণ্ট ক ফারেন্সকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বা দিয়াছেন। কালাজ্বরের ইতিহাস, দেশময় ইহা বিস্তৃতি, আসামের কালাজ্বর, বাঙ্গলার কালাজ্ব কালাজ্বরে অসংখ্য লোকক্ষয় প্রভৃতি বহুবিষয়ের আলো চনা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট কনফারেন্সকে আশ্ব করিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় কালাজ্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, ইহার ফলে চিকিৎসা-প্রণালী ও ঔষধাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে গবর্মেণ্ট এইবার বেসরকারী চিকিৎসকগণকে কালা জ্বরের চিকিৎসাপ্রণালী শিখাইয়া দিবেন, এবং সরকারের সংগৃহীত তথ্য সকল তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিবেন। তারপর দেশ হইতে কালাজ্বর তাড়াইবার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু গবর্মেণ্টের সকল কাজেই যেরূ দীর্ঘসূত্রিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে, কত দিনে যে সরকারের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কালা জ্বরের ত একরকম ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল কিন্তু ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে? তাহার কি কোন প্রতিষেধক উপায় অবলম্বিত হইবে না?

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩২ সাল | ৯ম সংখ্যা

স্বাস্থ্যকর গৃহ ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য

সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘায়ু হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে ব্যক্তিগত ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার ব্যবস্থা করা যেমন দরকার, সেইরূপ, যে গৃহে বাস করা যায়, সে গৃহের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের অপরাপর ব্যক্তিগণের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার ব্যবস্থা করা তদপেক্ষা একটুও কম প্রয়োজনীয় নহে। 'স্বাস্থ্য সমাচারে' ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কথার প্রায়ই আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু বাসগৃহের স্বাস্থ্য রক্ষার কথার যথোচিত আলোচনা হয় না; অথচ ইহা খুবই আবশ্যক।

সহর অঞ্চলে বাসগৃহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মিউনিসি-প্যালিটীর কড়া আইন আছে। তদনুযায়ী সহরের বাসগৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ স্থলে মিউনিসিপ্যালিটীও নাই, যেখানে আছে; সেখানেও স্বাস্থ্যকরভাবে বাসগৃহ নির্ম্মাণ সংক্রান্ত আইন কোন কঠোরভাবে পরিচালন করা হয় না। সুতরাং যাহার যে ভাবে ইচ্ছা ও সুবিধা, সে সেই ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করে। তার পর নূতন নূতন প্রয়োজনের খাতিরে নূতন নূতন অংশ পুরাতনের সঙ্গে সংযোজিত হইয়া থাকে। এই ভাবে পল্লীগ্রামে বাসগৃহের যেরূপ পরিণতি ঘটিয়া থাকে, তাহার ফলে পরিণামে বাস-গৃহগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবার খুবই সম্ভাবনা।

উন্নতিশীল দেশসমূহে কি সহরে কি মফঃস্বলে স্বাস্থ্য-সম্মত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে লোককে বাধ্য করিবার জন্য অনেক কঠোর আইনকানুন প্রচলিত আছে; এবং সেই সকল আইন কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। আইনের সহস্র বিধি নিষেধের দরুণ লোকে ইচ্ছামত ও সুবিধামত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু পরিণামে দেখা যায়, কঠোর আইনের ব্যবস্থার ফলে সমাজের মঙ্গলই হইয়া থাকে। আইন পরিচালিত হইবার পূর্ব্বে যত্র তত্র যেমন তেমন ভাবে

গৃহ নির্ম্মাণের ফলে সাধারণের মধ্যে বিবিধ রোগে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ ছিল, আইন পরিচালিত হইবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা যায় যে, সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে; মৃত্যু সংখ্যাও যথেষ্ট কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতে ১৮৭১-৮০ সালে হাজার করা ২১ জনের মৃত্যু হইত; ১৯২৪ সালে ঐ সংখ্যা হাজার করা ১২ দাঁড়ায়। সেইরূপ, ১৮৭১-৮০ সালে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারকরা ৪০, ১৯২৪ সালে দাঁড়ায় ৭৫। এ সকলই আইন পরিচালনের সুফল বলিতে হইবে। অন্যান্য রোগেও মৃত্যু সংখ্যা এই অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে।

এই আইন অনুসারে প্রধানতঃ বাসগৃহের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। গৃহের আয়তন, প্রত্যেক গৃহের লোক সংখ্যা, জল সরবরাহ, জল নিকাশ, আবর্জ্জনা স্থানান্তর করা, খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধিতা রক্ষা, সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র করা প্রভৃতি বিষয়ে আইনে বিশেষ রকমের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া, প্রসূতি ও নবজাত শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এবং যৌনরোগ ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি রাখাও আইনের অন্তর্গত বিষয়।

প্রত্যেক মানুষের দেহের মধ্যেই রোগ-প্রতিষেধক একটা বিশেষ এবং স্বাভাবিক শক্তি আছে। সেই শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সেই শক্তি ক্ষুণ্ণ হইলে অর্থাৎ কমিয়া আসিলে শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের এই অবস্থাটিকে অস্বাস্থ্যের পূর্ব্ব সূচনা বলিতে হইবে। মানব-দেহের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা তাহার বাস-গৃহের স্বাস্থ্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। অর্থাৎ বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর হইলে ঐ শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। আর বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হইলে ঐ শক্তিও কমিয়া যায়।

কিরূপ গৃহকে স্বাস্থ্যকর বলা যায়? যে গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা আছে, যথায় সূর্য্যকিরণ বাধা পায় না, যে গৃহে বিশুদ্ধ জল ব্যবহৃত হয়, যে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যে গৃহের আসবাবপত্র সুশৃঙ্খল সুন্দরভাবে সজ্জিত, যেখানে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহৃত হয়, তাহাই স্বাস্থ্যকর গৃহ। যে গৃহ সুনির্ম্মিত, গৃহের মেঝে বা দেওয়াল ভিজা স্যাঁৎসেঁতে নয়— খট্‌খটে, যে গৃহে মশা মাছি পোকা মাকড়ের উপদ্রব নাই, যে গৃহের জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে, তাহাকেই স্বাস্থ্যকর গৃহ বলা যাইতে পারে। যে গৃহের চারিদিকের আবেষ্টনী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আবর্জ্জনা-ধূলিবর্জ্জিত, যেখানে যাতায়াতের পথঘাট সুনির্ম্মিত, যথায় বর্ষাকালে জল জমে না, আগাছা, গুল্ম বা বৃহৎ বৃক্ষ যে গৃহে বায়ু ও আলোক প্রবেশের বাধা জন্মায় না, তাহাই আদর্শ বাসগৃহ।

বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় অনেক দিকে রাখিতে হয়, অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে আবার সকল সময়ে নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া করিবার সুবিধা হয় না;—পূর্ব্বে নির্ম্মিত গৃহ অবস্থায় পাওয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় গ্রহণ বাধ্য হইতে হয়। এরূপ স্থলে এই সকল তৈরী স্বাস্থ্যকর কি না, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োজন সংস্কারাদি করিয়া লইতে হয়। কলিকাতার মতন অল্প পরিমিত স্থানে অনেক লোককে বাস করিতে হইতে হয়। এখানে নানা কারণে বাড়ীঘর খরিদ-বি হইয়া থাকে। তা ছাড়া অনেক ভাড়াটে আছে। যাঁহারা কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া করেন, তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বাড়ী বদলাইতে জমি কিনিয়া নূতন বাড়ী তৈয়ার করিয়াও অনেকে করেন। তবে সহরে বাসগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী পরিমাণ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। খালি আর নাই বলিলেই হয়। আর, থাকিলেও পরিমাণে এত কম যে, স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ মত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা খুব কম। বাসগৃহগুলি যেমনভাবে পাওয়া যায়, সেইভাবে করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

প্রায়ই দেখা যায়, বাড়ী কিনিয়া বা ভাড়া

বাস করিতে গেলে নূতন গৃহস্থকে প্রথম প্রথম কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বাসিন্দা—তিনি বাড়ীর মালিকই হউন কিম্বা ভাড়াটিয়াই হউন, পরবর্ত্তীর বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া যাইবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বাড়ীর স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন হইয়া পড়েন। হয় ত কোণে বা উঠানে অথবা সিঁড়ির নীচে স্তূপাকার আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে। হয় ত ড্রেন আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে। হয় ত ছাদের নর্দ্দমা এমনভাবে বুজিয়া গিয়াছে যে, একটু বৃষ্টি পড়িলেই ছাদে জল দাঁড়ায়। হয় ত দেওয়ালে অশ্বত্থ জন্মিয়া দেওয়ালগুলিকে ভিজা স্যাঁৎসেঁতে করিয়া ফেলিয়াছে। নূতন বাসিন্দাকে প্রথমে এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া গৃহখানিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে হইবে, তবে তিনি সেই বাড়ীতে বাস করিতে পারিবেন। নচেৎ তাঁহার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। যদি আইনের বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কলিকাতা সহরের অধিকাংশ বাড়ীই আইনানুমোদিত ভাবে স্বাস্থ্যকর নহে। বাসগৃহের অবস্থা স্বাস্থ্যকর কি না, তাহা পরিদর্শনের ভার যে সকল কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত আছে, সেই সকল স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ, অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা যদি কোন বাড়ী পরিদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, অধিকাংশ বাড়ীই একেবারে বাসের অযোগ্য। আবার, এই সহরে এমন অনেক পুরাতন বাড়ী আছে, গৃহস্বামী সযত্নে তাহার বাহ্য আবরণ বালি ধরাইয়া চুণকাম করাইয়া এমনভাবে সুদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন যে, বাহির হইতে তাহার কোন ত্রুটি সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু সেই বাড়ীতে নূতন কোন পরিবার বাস করিতে আসিলে, দুই চারি দিনের মধ্যেই সেই বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বাড়ীগুলি কেবল যে অস্বাস্থ্যকর, তাহা নয়—বিপজ্জনকও বটে। কোন কোন বাড়ীর অবস্থা এমন যে, কখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এরূপ বাড়ীতে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতে হয়। সময় সময় এমন অবস্থা ঘটে যে, বড় রাস্তা দিয়া যে সকল ভারী মোটর লরী রাস্তা কাঁপাইয়া যাতায়াত করে, তাহাদের সেই কম্পনের ফলে ঐ রাস্তার ধারে কোন কোন পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। আবার, বর্ষাকালে উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন একটু চাপিয়া বৃষ্টি পড়িলেই অনেক বাড়ী পড়িয়া যায়। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছাড়া, এই সকল বাড়ীতে স্বাস্থ্য-হানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়। কারণ, এইরূপ পুরাতন বাড়ীতে উই, ইঁদুর, আরশুলা, মশা, মাছি, ছারপোকা, পিপীলিকা, বিছা এবং সময়ে সময়ে সর্পেরও উপদ্রব হইয়া থাকে। কীটপতঙ্গাদি অসুবিধার কারণ ত বটেই, অধিকন্তু ইহারা অনেক রোগেরও বাহন। আবার পুরাতন বাড়ীর ড্রেন প্রায় ভাল অবস্থায় থাকে না। ফলে টাইফয়েড, ডিপ্‌থিরিয়া, বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বীজ ড্রেনের ভিতর মৌরসী পাট্টা লইয়া বসবাস করে। নূতন পরিবার এরূপ বাড়ীতে বাস করিতে আসিলে প্রথম প্রথম তাঁহাদের রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অধিক থাকে। এই বাড়ীতে acclimatized হইতে অর্থাৎ সেই বাড়ীর আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে তাঁহাদের কিছু সময় লাগে।

তা ছাড়া, অল্প স্থানে অধিক সংখ্যক লোক বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় বাড়ীগুলি বড় ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া নির্ম্মিত। আলো ও বায়ু প্রবেশের স্থান নাই বলিলেই হয়। বাড়ীতে উঠান প্রায় থাকে না,—থাকিলেও, অতি ছোট। কাজেই ঘরগুলি অন্ধকার ও বায়ু চলা-চলের অভাবে ড্যাম্প বা স্যাঁৎসেঁতে। সহরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, ইহার প্রতিকারের জন্যই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সহর কতকটা পরিষ্কার ও খোলা হইয়া আসিয়াছে। তথাপি, এখনও বহু সংখ্যক বাড়ী স্বাস্থ্যানুমোদিত অবস্থায় নাই। বাড়ী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া সুবিধাজনক নহে। সুতরাং বাড়ীগুলি যেমন অবস্থায় আছে, উহারই মধ্যে যতটা পারা যায়, উহাদের

যথাসাধ্য সংস্কার করিয়া এবং স্বাস্থ্যানুমোদিত ব্যবস্থা করিয়া ঐগুলিকে বাসযোগ্য ও নিরাপদ করিয়া তুলিতে হইবে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাজ ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। সহরের অনেক ঘন বসতি পূর্ণ পল্লীর অস্বাস্থ্যকর বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় সহরের মধ্যভাগ কতকটা ফাঁকা হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বাড়ীতে পূর্ব্বে যাহারা বাস করিত, তাহারা সহরের উপকণ্ঠে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাহিরে অনেক বাগান ও বাগান বাটী ছিল। এখন সে সকল উদ্যানের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। প্রায় সেই সব স্থলে নূতন নূতন কোটা বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। আজকাল অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব নূতন যায়গায় লোকে যে সকল বাড়ী তৈয়ার করিতেছে তাহা কতকটা স্বাস্থ্যানুকূল হইলেও, যাহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে, তাহাদের পূর্ব্বস্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তাহারা সেই অল্প কিঞ্চিৎ জমিতে বহু পরিবারের বাসোপযোগী আলো-বাতাস-শূন্য ক্ষুদ্র অপরিসর অনুচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে, কলিকাতার ন্যায় প্রধান সহরে নূতন যে সকল বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, সেগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, যেন বৎসর কয়েক পরেই, সেগুলি আবার অস্বাস্থ্যকর না হইয়া পড়ে যাহাতে দ্বিতীয় ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এখন এমন ভাবে বাড়ী তৈয়ার করিবার অনুমতি দিতে হইবে, যেন ছোটই হউক আর বড়ই হউক প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে যথেষ্ট খোলা জমি থাকে এবং জমির আয়তনের অনুপাতে ঘরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে। বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে ইয়োরোপীয়ানদের রুচি সুন্দর ও স্বাস্থ্যানুকূল! তাই সহরের সাহেবপাড়ার বাড়ীগুলির চারিদিকে কিছু না কিছু খোলা জমি থাকে, ঘরগুলিও বড় বড়, তাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক জানালা দরজা থাকে, এবং বায়ু ও আলো ভালরকমই খেলে। ইহাদের সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত।

কলিকাতা নগর অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। নানাসূত্রে দেশের সকল স্থান হইতে লোক আকৃষ্ট হইয়া সহরে বাস করিতে আসিয়াছে, তাই কলিকাতা সহর যদৃচ্ছাক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই জন্য এখানে বাড়ীগুলি অত্যন্ত গায়ে গায়ে নির্ম্মিত, খোলা জায়গার অত্যন্ত অভাব, এবং অল্প স্থানে অনেক বেশী লোক বাস করিতে বাধ্য হয়। বিদেশে কলিকাতা ছাড়া আরও অনেক সহর আছে, সেই সকল সহরের বাড়ীগুলি এত ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে নির্ম্মিত নহে। প্রায় বাড়ীর চারিদিকে কিছু খালি জমি বা বাগান থাকে। তবে এই সকল স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে বাড়ীগুলি তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। যথা অভাবে বাগানগুলি প্রায় জঙ্গলে পরিণত। জল নিকাশের সুব্যবস্থার একান্ত অভাব। আবর্জ্জনা প্রভৃতি বাড়ীর নিকটেই নিক্ষিপ্ত হয়; সেগুলি স্থানান্তরিত করিবার সুব্যবস্থা নাই। যে সকল সহরে অবৈতনিক অল্পবিত্ত মিউনিসিপ্যালিটী আছে, সেই সকল মিউনিসিপ্যালিটী অর্থ লোভে সহরের আবর্জ্জনা গৃহস্থদিগের বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ আবর্জ্জনা ক্রেতারা সংলগ্ন উদ্যানে জমির সার রূপে ব্যবহৃত হয়। আবর্জ্জনার বাহুল্য, আবর্জ্জনা সার হিসাবে যতই মূল্যবান হউক, বাসগৃহের নিকটস্থ উদ্যানে তাহা সার রূপে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যদি আবর্জ্জনার সার ব্যবহার করিতেই হয়, তবে তাহা লোকালয় হইতে দূরে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সহর অঞ্চলের বাসগৃহগুলি দুই কারণে অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে। প্রথম, গৃহনির্ম্মাণের দোষে। দ্বিতীয়, বাটীর স্থায়ী বা অস্থায়ী অধিবাসীদের অবজ্ঞা, অযত্ন, উপেক্ষা, অনভিজ্ঞতা, অভাব প্রভৃতি কারণে। প্রথম দোষটী নানাকারণে প্রায় অপরিহার্য্য। অল্প স্থলে যদি তাহা সংশোধিত করিবার সুযোগ থাকে, তবে নচেৎ সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

বাড়ীর বাসিন্দাদের ব্যবহারের দোষে যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহা সংশোধনাতীত নহে, এবং তাহাদের সংশোধন না হওয়াই অন্যায়। গৃহস্বামীর মূর্খতা বা অজ্ঞতার দরুণ বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হইলে, তাহাকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর আচার ব্যবহার পালন না করার দরুণ তাহাদের নিজেদেরই যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহারা নিজেরাই সংশোধন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা তাহারা করিতে না চাহিলে আইনের দ্বারা তাহাদিগকে বাধ্য করা আবশ্যক। মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে মধ্যে সহরের বাড়ীগুলি পরিদর্শন করিয়া অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য বন্ধু ভাবে গৃহের অধিবাসীদের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হইবে না; ত্রুটি সংশোধনের উপায় আবিষ্কার করিয়া তাহাও গৃহস্বামীকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং তাহা যত অল্পব্যয়সাধ্য হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহস্বামীর আচার ব্যবহারের ত্রুটিতে তাহার স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিলে গৃহস্বামী সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু খরচ পত্র করিয়া ভবিষ্যতে প্রচুর ডাক্তার ও ঔষধের খরচ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

আমাদের দেশে সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারের উপর গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। অবরোধ প্রথার অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরমহিলাগণকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য, যাহাতে সূর্য্যও পুরস্ত্রীবর্গকে দেখিতে না পান এমনভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। সেই জন্য অন্তঃপুরিকাগণের একটী বিশেষণেরই সৃষ্টি হইয়াছে যে তাঁহারা "অসূর্য্যম্পশ্যরূপা"। সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকাণ্ড ইমারত মহা আড়ম্বর সহকারে নির্ম্মাণ করেন বটে, এবং গৃহ নির্ম্মাণে ও তাহার সাজসজ্জায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল অট্টালিকাকে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল কোন ক্রমেই বলা চলে না। জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একজনের গৃহ দুই দশ বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত; দেউড়ী, কাছারী, বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, সদর মহল, অন্দর মহল, ঠাকুরবাটী প্রভৃতি অসংখ্য অট্টালিকা পাশাপাশি বা কাছাকাছি নির্ম্মিত হয়। মহলের পর মহল, সারি সারি কক্ষশ্রেণীর পর কক্ষশ্রেণী। কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ও যথেচ্ছ পরিমাণে সূর্য্যকিরণ ও বায়ু প্রবেশের অধিকার থাকে না।

মফস্বলে ধনী সম্প্রদায়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট জমির অভাব নাই। সুতরাং তথায় কক্ষ ও প্রকোষ্ঠগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইতেও পারে। কিন্তু বিলাসিতার আকর্ষণে সহরের প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহারা যখন পল্লীবাস ছাড়িয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও তাঁহারা পরিবারবর্গের আবরু বজায় রাখিয়া এবং পদোচিত মর্য্যাদা ও আশ্রিত এবং আত্মীয় স্বজনগণের বাসোপযোগী বহু কক্ষ সমন্বিত অট্টালিকা সকল সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হওয়ায় সহরের অট্টালিকাগুলি আরও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। সহরের বাটীর কক্ষগুলি ক্ষুদ্র, প্রাঙ্গণ ও অঙ্গন অতি সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার উপর ত্রিতল চৌতল পঞ্চতল অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হওয়ায় বায়ু ও আলোকের আরও অভাব হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বকালে, যখন লোকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিত না, কেবল অবরোধ প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিত, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিত, ভবিষ্যতের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া দেখিত না, কোনরূপ বিচার বিবেচনা করিত না, সেরূপ ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকিত যুগে আর চলিতে পারে না। এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে সকল গৃহ এখনও বর্ত্তমান আছে, সেগুলিকে যতদূর সম্ভব এখনকার

কালের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। যেগুলি খুব পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। অধুনা প্রায় সকল সহরেই এবং কোন কোন বড় গ্রামেও মিউনিসিপ্যালিটী আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে কতকগুলি স্বাস্থ্যকর নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এই সকল মিউনিসিপ্যাল আইনও আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়; কারণ তাহা হইলে কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি সহর এত অস্বাস্থ্যকর হইত না, এবং ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টেরও প্রয়োজন হইত না। তা ছাড়া, কেবল নির্ম্মাণ করিবার দোষেই যে বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হয় তাহাও নয়। বাড়ী পুরাতন হইয়া গেলে, যথা সময়ে তাহার উপযুক্তরূপ সংস্কারাভাবেও বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং গৃহস্বামীকে অন্যান্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাসগৃহের এইরূপ কতকগুলি ত্রুটি আমরা নিম্নে দেখাইয়া দিতেছি। এগুলির সংশোধন না হইলে বাড়ীর লোকদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না, অসুবিধারও সীমা থাকে না—

উঠান।—অনেক বাড়ীর উঠানের স্থানে স্থানে সিমেণ্ট, কঙ্ক্রিট প্রভৃতি উঠিয়া গিয়া স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়াছে। উঠান ধুইবার সময় কিম্বা বর্ষাকালে এই সব গর্ত্তে জল জমিয়া থাকে; ঝাঁটা দিয়া ঝাঁটাইয়া এই জল সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। সেই জল বসিয়া উঠান ও ঘরের মেঝে স্যাঁতসেঁতে হইয়া পড়ে। ক্রমে সেখানে পাঁক জমে এবং নানা রোগের বীজ তথায় আশ্রয় লইয়া থাকে। এইগুলি মেরামত করিতে হইবে—স্বাস্থ্যের জন্যও বটে, অসুবিধার প্রতিকারের জন্যও বটে। কারণ, এই সকল গর্ত্তে পা পড়িয়া সময়ে সময়ে আঘাত লাগিতেও পারে।

ছাদ।—ছাদ ফাটিয়া কিম্বা ছাদের কঙ্ক্রিটের খোয়া উঠিয়া গিয়া অথবা টালি আলগা হইয়া কিম্বা ছাদের কড়ি বরগা পচিয়া গিয়া বর্ষাকালে ছাদ দিয়া জল পড়িয়া ঘরের জিনিস পত্র বিছানা ইত্যাদি ভিজিয়া যাইতে পারে। ইহা কেবল যে অসুবিধাজনক ও অস্বাস্থ্যকর, তাহা নহে—বিপজ্জনকও কম নয়। অল্পস্বল্প ফাটা হইলে পিচ গরম করিয়া ঢালিয়া দিয়া ফাট মেরামত করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশী রকম ফাট ধরিলে উত্তমরূপে মেরামত না করিলে চলে না। পচা কড়ি বরগা না বদলাইলে কোন্ দিন ছাদ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়ে তাহার কিছুই ঠিক নাই। বালির চাপ যখন তখনই মাথায় পড়িতে পারে।

দেওয়াল।—দেওয়াল পুরাতন হইয়া গেলে তাহার বাহিরের ভিজা বায়ুর গতি রোধ করিবার শক্তি থাকে না। অনেক সেকেলে বাড়ীর দেওয়াল মাটীর গাঁথুনি। এ সকল দেওয়াল সহজেই বায়ুমণ্ডল হইতে জল টানিয়া ভিজিয়া উঠে। তা' ছাড়া পুরাতন দেওয়াল বিছা, ইন্দুর, সর্প ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের আশ্রয়। এরকম দেওয়াল বদলাইয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল। অন্ততঃ ভিতরে বাহিরে উত্তমরূপে বালি ধরাইয়া চুণকাম করাইয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঘরের মেঝে।—উঠানের ন্যায় অনেক ঘরের মেঝেতেও গর্ত্ত হয়। ইহাও কম অস্বাস্থ্যকর নয়। তা ছাড়া অসুবিধাও বিস্তর। চলাফেরার অসুবিধা ত আছেই, তাহার উপর ঘর নিয়ত অপরিষ্কার থাকে। যতই ঝাঁট দাও বা ধোও ধূলা বালি কাদা জমিয়া থাকিবেই, কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা যায় না। মেরামত না করিলে এ ঘরে বাস করিতে অনেক দুঃখ পাইতে হয়।

সিঁড়ি। বহুদিনের ব্যবহারে সিঁড়ির গাঁথুনির ইঁট প্রায় অর্দ্ধেক ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে অনেক সময় পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিতে পারে। সিঁড়ির ধারে যদি রেলিং থাকে তবে তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে শিশুদের পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা।

জানালা। জানালার চৌকাট বা কপাট পচিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে জানালা ভাল করিয়া বন্ধ করা যায় না। যদি খড়খড়ি হয় তবে হয় ত তাহার পেনেল ভাঙ্গিয়া কিম্বা সার্সির কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে অথবা কপাটের কব্জা ভাঙ্গিয়াছে। এগুলা দেখিতে যেমন বিশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্যহানিকর ও অসুবিধাজনক।

দরজা। দরজার চৌকাটের নীচের দিকের কাঠ প্রায়ই পচিয়া ক্ষইয়া গিয়া কপাট এমন ভাবে নামিয়া যায় যে, কপাট প্রায় বন্ধ করা যায় না। কব্জা ও খিলও প্রায় ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

রান্নাঘর। আমাদের দেশে রান্নাঘরের বড় দুর্দ্দশা। ধূম নির্গমনের জন্য চিমনীর ব্যবস্থা প্রায় কোন গৃহস্থ ঘরেই থাকে না। উনুনে আগুন দিলে সেই ধোঁয়া ঘরের ভিতর জমিয়া দেওয়ালগুলি বিশ্রী কালো হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সেই কালো বিশ্রী ঝুল ভিজিয়া ঈষদারক্ত জল খাদ্য দ্রব্যের উপর পড়িয়া খাদ্য দূষিত হয়। দুধ ত প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন বাড়ীতে রান্নাঘরের ধূম বাহির হইবার জন্য ছাদের নীচে দেওয়ালের গায়ে ঘুলঘুলি থাকে। কোন বাড়ীতে ছাদের উপরই ধূম নির্গমনের পথ থাকে। এরূপ ব্যবস্থা ভাল। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় যে ঘরটা রান্নাঘররূপে ব্যবহার করিবার জন্য এইরূপ ধূম নির্গমনের পথ রাখা হইয়াছিল, কালক্রমে প্রয়োজনানুরোধে সেই ঘর অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, এবং রান্নাঘর অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, যেখানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। এরকম রান্নাঘরের ঝুল ও ময়লা নিয়মিত ভাবে মধ্যে-মধ্যে ঝাড়িয়া ফেলা উচিত।

নর্দ্দমা। অনেক পুরাতন বাড়ীর নর্দ্দমার গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া, ক্ষইয়া কিম্বা অন্য কারণে জল নিকাশ ভালরূপ হয় না। এ সকল বাড়ী ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের খনি। নর্দ্দমা সর্ব্বদা মেরামত অবস্থায় রাখা আবশ্যক। বিলাতী মাটি দিয়া উত্তমরূপে পলস্ত্রা করিয়া না রাখিলে সে বাড়ীর গৃহস্থকে অনেক দুঃখ পাইতে হয়। রোগ সে বাড়ীতে লাগিয়াই থাকে।

পায়খানা। এখন কলিকাতায় প্রায় সকল বাড়ীতেই ড্রেনের পায়খানা হইয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকিবার কথা। কিন্তু পায়খানা ঠিক মেরামত অবস্থায় থাকা চাই। ট্যাঙ্ক হইতে রীতিমত জল যেন বাহির হয় ও রোজ যেন ধোওয়া হয়। মফস্বলের সহরে এখনও খাটা পাইখানা আছে। সেগুলা প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। গামলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নর্দ্দমা বুজিয়া গিয়াছে; দেওয়ালের বালি খসিয়াছে, কিম্বা ছাদ দিয়া জল পড়ে। এগুলি মেরামত করা দরকার।

গা-নল। বৃষ্টির জল বা ঘরের ব্যবহৃত ময়লা জল বাহির হইবার গা-নল ঠিক মেরামত অবস্থায় রাখা আবশ্যক। ভাঙ্গিয়া গেলে, বদলাইয়া ফেলা উচিত।

ইক্ষু (Sugarcane)

[শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার]

শর্করা (চিনি)—Saccharum officinasum নানা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়। আরবী ও পারসীতে চিনির নাম শক্কর, গ্রীকে সাকেরণ (Sakcharon), সংস্কৃতে শর্করা; এবং ইংরাজীতে সুগার (Sugar) নাম শর্করারই অপভ্রংশ। সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে ইক্ষুচিনির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে চীন, পারসীক, আরব ও রোমান জাতিরা ইহার তথ্য অবগত হয়। কথিত আছে, মহাবীর অলীকসুন্দরের (Alexander) দিগ্বিজয়

কালে গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিলে সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষদণ্ডের (ইক্ষুদণ্ড) মধ্যে মধুর ন্যায় মিষ্ট রস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সম্রাট নিরোর রাজত্বের অনেক পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জাতীয়েরা চিনির ব্যবহার করিত, কিন্তু বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরাজেরা চিনির অধিক ব্যবহার করিত না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিসই (Venice) ইয়ুরোপের প্রধান চিনির বন্দর ছিল।

ইক্ষু, বিট, খর্জ্জুর, তাল, আরেঙ্গা (Aranga), ক্যারিওটা (Caryota), নারিকেল, মহুয়া, মেপ্‌ল্, (Acer), ভুট্টা, নীল এবং নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ হইতে চিনি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাদিক্রমে চিনির উৎপন্নের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে ক্রমশঃ অল্প। অধুনা, ইক্ষু পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মিতেছে; তন্মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (West Indies), জামেকা (Jamaica), দক্ষিণ আমেরিকা (South America), ডেমারারা (Demarara), ফিজি (Fiji), জাভা (Java), প্রণালী উপনিবেশ (Strait Settlement), মরিসাস (Mauritius), প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক ধনী কোম্পানী ব্যবসায় হিসাবে ইহার প্রচুর চাষ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ, পারস্য (Persia), মিশর (Egypt), গ্রীস (Greece), ইতালি (Italy) ফ্রান্স (France), স্পেন (Spain), আমেরিকা (America), জাপান (Japan), চীন (China), ব্রহ্ম (Burma) প্রভৃতি দেশে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়ই তত্তৎ দেশীয় অধিবাসীদিগের ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়, অন্য কোন দেশে অধিক পরিমাণ রপ্তানী হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে আজকাল ইহার বিপরীত হইতেছে। ফ্রান্স (France), জার্ম্মানী (Germany), নেদারল্যাণ্ড (Netherland) ও অষ্ট্রীয়াতে (Austria) প্রচুর পরিমাণ বিট চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে ইক্ষু ব্যতীত খর্জ্জুর, তাল, নারিকেল বৃক্ষ হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে খর্জ্জুর চিনির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; মহুয়া এবং নিম্ব হইতে চিনি বাহির হইলেও তাহার পরিমাণ সামান্য। কেবল মাত্র মদ্য ও ঔষধের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এ দেশের খর্জ্জুরের ন্যায় ক্যারিওটা ইউরেন্স্ (Caryota urens) এবং ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আরেঙ্গা স্যাকারী (Arenga Saccharifera) নামক তাল জাতীয় প্রকার এবং আমেরিকা ও জাপানে মেপল (Maple, Acer) নামক উদ্ভিদ হইতেও চিনি উৎপন্ন থাকে। ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় মেপ্‌ল কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাদের ভিতর হইতে চিনি করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এই সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন চিনির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। এজন্য ব্যবসা হিসাবে ইহাদের চাষ লাভজনক নহে।

সর্ব্বপ্রকার চিনির মধ্যে ইক্ষু চিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দোষ, ও স্বাস্থ্যের কোনরূপ হানিকর নহে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইক্ষুরস, গুড় (মৎস্যণ্ডিকা), পাটালি, ফানিত (বাতাসা), খণ্ড, শর্করা, সিতোপলা (মিছরি) প্রভৃতি এই কয়েকটী ইক্ষু-বিকার উত্তরোত্তর গুণাধিক, পিত্ত নাশক ও বলকর। চিনি বলিলেই আদিম উপায়ে প্রস্তুত শুভ্র দলুয়া চিনিই বুঝিতে হইবে। আমরা আজকাল যে সকল শুভ্র দানাদার বিলাতী আমদানী বিট বা ইক্ষু চিনি ব্যবহার করি, তাহার মিষ্টত্বও কম, অধিকন্তু তাহা শরীরের পক্ষে অপকারক। আধুনিকেরা আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না, সুতরাং বিলাতী প্রমাণই উদ্ধৃত হইল, পাঠক তদ্দৃষ্টে দানাদার চিনির অপকারিতা বুঝিতে পারিবেন; H. Drury (ড্রুরি সাহেব) তাঁহার গ্রন্থে লিখিতেছেন—"Sugar when simply sucked from the canes is highly nutritious. The alimentary properties of sugar are much lessened by crystallisation. The common brown sugar is more nutritious than what has been refined.—To persons disposed to dyspepsia and bilious habits sugar in excess becomes more hurtful than otherwise." এ স্থলে, Brown sugar অর্থে খাঁড় গুড় ও শৈবালাদি পরিষ্কৃত শর্করাই বুঝিতে হইবে; দন্ত-নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস পানই সর্ব্বাপেক্ষা বলকারক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-পাদ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বীয় আবশ্যক মত চিনি উৎপাদন করিয়াও অতিরিক্ত অংশ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। কিন্তু বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে বিদেশী সুলভ চিনি আমদানী হইয়া, দেশীয় চিনিকে বাজার হইতে বিতাড়িত করতঃ দেশীয় ইক্ষুর চাষ ও চিনির ব্যবসায় লোপপ্রায় করিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—

১। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও সৌখীন হইয়াছি; দেশীয় দোলো বা খাঁড় গুড়ে আমাদের তৃপ্তি হয় না; সুতরাং দানাদার সাদা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। ইক্ষুদণ্ড হইতে রস নিষ্পীড়ন, এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুত কালে পূর্ব্বতন অনুন্নত উপায়াবলি অনুসৃত হওয়ায় অনেক পরিমাণ চিনি নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য চিনির পরিমাণ অল্প হয় অথচ খরচা অধিক পড়ে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায়, রসে চিনির ভাগ নষ্ট হইতে পায় না; সুতরাং চিনি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ যন্ত্রবলে বৈদেশিক চিনির কারখানা চালিত হওয়ায় খরচা কম পড়ে, এজন্য স্বল্পমূল্য বৈদেশিক চিনির আমদানী বাড়িতেছে।

৩। জার্ম্মানীর রহিত-শুল্ক ও রাজসাহায্য প্রাপ্ত—(Bountyfed) বিট চিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হওয়াতে, ভারতের চিনি ত গিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে মরিসাসের ইংরাজী চিনির ব্যবসাও অবসন্ন হইয়াছে। তবে লর্ড কার্জ্জনের নূতন শুল্ক নিয়ম (Countervailing duty) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জার্ম্মানীর বিট চিনির আমদানী রোধ হইলেও আবার মরিসাস ও জাভা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরং এস্থলে

স্বল্পমূল্য বিট চিনির আমদানীতে ভারতের কিছু লাভ আছে; কিন্তু এই নূতন শুল্ক নির্দ্ধারণে ভারতের ক্ষতিই হইয়াছে। যদি মরিসাস বা জাভা চিনির উপর অতিরিক্ত মাশুল বসে, তবেই ভারতীয় ইক্ষুর চাষ ও চিনির কারবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, নচেৎ নহে।

৪। বৈদেশিক চিনি মাত্রই কোমলদণ্ড, স্থূল ও মিষ্টরসবহুল ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং অল্পব্যয়ে অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতীয় চিনি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। শামসাড়া, হেমজা, পুণ্ড্রী প্রভৃতি দেশীয় ইক্ষু এইরূপ মিষ্ট ও রসবহুল। সম্ভবতঃ ইহাদের চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেশীয় চিনির ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

আজকাল একটী জল্পনা উঠিয়াছে যে, ভারতীয় ইক্ষু বিদেশীর তাড়নে অবসন্নপ্রায় হইয়াছে, ইহার চাষ লোপের বিলম্ব নাই; সুতরাং বিদেশ হইতে নূতন বীজ আনাইয়া চাষ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত বিগত ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে নানা জাতীয় বিদেশী ইক্ষু পরীক্ষিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা এখনও সফল হয় নাই, কদাচিৎ ২।১টী জাতি কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু উন্নত উপায়ে চাষ করিতে পারিলে বিদেশী ইক্ষুর সমকক্ষতা করিতে পারে, বিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্য মধ্যে এমন অনেক জাতীয় উৎকৃষ্ট ইক্ষু আছে। আমাদিগকে কেবল উক্ত কয়েকটী কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইক্ষুর উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কিছু সখের মায়াও কাটাইতে হইবে। তাহা হইলে আর আমাদিগকে অমেধ্য বিলাতী চিনির জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না, অপিচ আমরা বিদেশে চিনি পাঠাইতেও সমর্থ হইব। কীট, পতঙ্গ, উই, হাজা, শুকা, নানাবিধ রোগ ও অসাত্ম্য ভূমিতে রোপণ প্রভৃতি বিবিধ কারণে বিদেশী ইক্ষুর চাষ এ দেশে সফল হয় নাই, পরীক্ষা করিতে করিতে যদি কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় বৈদেশিক ইক্ষু এ দেশ সাত্ম্য হইয়া যায়, তবে

তদ্দ্বারা উপকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশীর আশা বৃথা। যদি কিছু হয় ত দেশী হইতেই হইবে।

ইক্ষু শর, খাগড়া ইত্যাদির ন্যায় জলাভূমির উদ্ভিদ। শত ভাগ সরস ইক্ষুদণ্ড শুষ্ক করিলে ২৫ ভাগ দৃশ্যমান সৌত্রিক পদার্থ (Arborous matter) পাওয়া যায়। এ জন্য ইহার চাষে জলই প্রধান আবশ্যক বুঝিতে হইবে। ইক্ষুর সফল চাষ করিতে হইলে বৃহৎ জলাশয়, নদী বা বিল বা ইন্দারা প্রভৃতি সমীপে স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। জলাভাব ঘটিলে রোপণের দিবস হইতে ১৬ ভাগ জলের মধ্যে ৩।৪।৫।৪ ভাগ জল প্রতি তিন মাস অন্তর আবশ্যক মত সেচন করিতে পারিলে ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। ইক্ষু জলাভূমির গাছ হইলেও মানব ইহার মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া ইহাকে ইচ্ছানুযায়ী নানা দেশে ও নানা অবস্থায় চাষ করিয়া প্রচুর উন্নতি প্রাপ্ত করাইয়াছে। কোথাও কোথাও বিশেষ উন্নত প্রণালী মতে উৎপাদিত হইয়া ইহা এরূপ রূপান্তরিত হয়, যে তখন আর ইহাকে পূর্ব্বতনদিগের বংশধর বলিয়া জ্ঞান হয় না। তখন সে তাহার আদি জন্ম স্থানে আর কোনরূপে জন্মিতে চাহে না। জন্মিলেও সহসা দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া ইহার মৃত্যু হয়। এই কারণ বশতই বিদেশী ইক্ষুর চাষ এ দেশে সফল হয় নাই। মরিসাস, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও জাভার ইক্ষু ভারতবর্ষজাত হইলেও, বিগত ২০০শত বৎসরের মধ্যে তত্তৎ স্থানে এরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, এ দেশের জল বায়ু এখন তাহাদের অসহ্য। তবে বিভিন্ন প্রকৃতি, ঋতু ও স্থানীয় অবস্থায় ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও কালে ইহাদের চাষ সফল হইতে পারে। মানব ইহাকে আবার এরূপ প্রকৃতি-দ্বন্দ্বসহ করিয়াছে যে, কি উচ্চ, কি নিম্ন, কি সরস, কি নীরস, কি এঁটেল (clay), কি চিক্কণ (Deep loam), কি দোয়াঁশ, কি বালীয়াঁশ সকল প্রকার ভূমিতে নানা জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত সরল ও নিম্ন হইতে উচ্চ ও মধ্যম নীরস ভূমির উপযোগী ভেদে ইক্ষু সাধারণত দুই প্রকার। ইহারা কোমল ও দৃঢ়ত্বক ভেদেও তদ্রূপ দ্বিবিধ। শুষ্ক ভূমিতে ইক্ষু স্বতই কঠিন, স্বল্পকায় ও স্বল্পরস হইয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন এরূপ জাতীয় ইক্ষুতে চিনির অংশ অধিক থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইক্ষু যতই কোমল বা দৃঢ়ত্বক হউক না কেন, রসে শর্করার পরিমাণ উভয়েরই প্রায় সমান। এজন্য সে জাতি হইতে অধিক পরিমাণ রস পাওয়া যাইবে তাহা হইতেই অধিক চিনি জন্মিবে। এবং যাহার ত্বক যত কোমল সে ততই রসপূর্ণ। স্থূলকায় বৃহৎকায় ইক্ষু আবার কীট এবং রোগাদি কর্ত্তৃক অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় ইক্ষু এরূপ কোমল ও বৃহৎকায় যে, তাহাতে জলের অংশ অত্যন্ত অধিক, মিষ্ট সামান্য মাত্র; সুতরাং ইহারা ফলমূলাদির ন্যায় খাইবার উপযুক্ত। যে জাতীয় ইক্ষু কোমলত্বক ও স্থূলকায় এবং যাহার অভ্যন্তরে ছিবড়া ভাগ (fibrous matter) অল্প, তাহা হইতেই অধিক পরিমাণ রস পাওয়া যায়। অর্থাৎ ছিবড়া যত অধিক থাকিবে রসও সেই অনুপাতে অল্প হইবে। ওটাহিটি (Otaheite) ও দেশীয় ইক্ষুর বিশ্লেষণে এই কথা বিলক্ষণ প্রমাণিত হয়। ইহাতেই বুঝা যায় বৈদেশিক ইক্ষু হইতে চিনি কেন অধিক জন্মে।

	ওটাহিটীয় ইক্ষু	দেশীয় ইক্ষু
জল (water)	৭২	৩৩
চিনি (sugar)	১৮	১৭½
ছোবড়ার ভাগ (fibrous matter)	১০	১৬½
	১০০	১০০

দৃঢ়ত্বক ও ছিবড়াবহুল ইক্ষুর রস কিছু অল্প হইলেও ইহারা সাধারণতঃ কঠিন প্রাণ, স্বল্পরোগ ও অল্প কীটপ্রবণ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে যাহা অধিক রসপূর্ণ ও কোমল চড়াইলে স্বল্পায়াসেই যাহা হইতে অধিক রস নির্গত হয় তাহাই লাভজনক চাষের উপযোগী বুঝিতে হইবে। কারণ কোমলত্বক্ ইক্ষু রোগ ও কীটপ্রবণ হওয়ায় অনেক সময় ক্ষেত্রের গাছ উজাড় হইয়া যায়।

অনেকে দল করিয়াও চুরি করে। তাহার উপর শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক, হাতী প্রভৃতি বন্য জন্তুর উপদ্রব আছে, সুতরাং চাষে বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু দৃঢ়ত্বক জাতিতে এসকল কোন দোষ না থাকায়, চাষে অল্প ক্ষতি হয়, লাভ সমানই থাকে, অথচ পরিশ্রম বা ব্যয়বাহুল্য নাই, এজন্য অনেকে দৃঢ়ত্বক্ জাতীয় ইক্ষু রোপণের পক্ষপাতী।

ভারতবর্ষে বহুজাতীয় ইক্ষু জন্মে। তাহাদের মধ্যে বহু পরিমাণ রস উৎপাদনকারী দৃঢ়ত্বক জাতীয় ইক্ষুও বিস্তর দেখা যায়। চিনির ব্যবসায়ে উন্নতি ও বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, চাষের নিমিত্ত আমাদিগকে এই সকল বিশিষ্ট জাতির পরিচয় লইতে হইবে; পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে ভারতবর্ষীয় ও প্রসঙ্গক্রমে বিদেশীয় নানাবিধ উৎকৃষ্টজাতীয় ইক্ষুর বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চাষের বিশেষ উপযোগী বুঝিতে হইবে।

১। কাজলা—শুষ্ক দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে, চাষে জলসেচনের আবশ্যক হয়। এই জাতীয় ইক্ষু রেঙ্গুনেরংএর, দৃঢ়ত্বক বটে, কিন্তু শামসাড়া অপেক্ষা কিছু কোমল ও ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক; ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় উৎপন্ন হয়। নীলের সিটী, গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জসারে ইহা ভাল জন্মে। নদীয়া, যশোহর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিস্তর কাজলা আখের চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ গুড় উৎপন্ন হয়।

২। কাজলী—রাজসাহী জেলায় এই ইক্ষু জন্মে। নাম কাজলী খাগড়া। বর্ণ লালচে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরুজাতীয়; দৈর্ঘ্যে ৪ হস্ত। সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। রাজসাহী জেলার অনেক স্থানে বিনা সারেই এই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১৪।১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহা কাজলারই প্রকারভেদ। দক্ষিণ বিহার অঞ্চলেও উচ্চ ভূমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

৩। খড়ি—এই জাতীয় ইক্ষু বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—উভয়ত্রই জন্মে ও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প রোগপ্রবণ। বর্ণ সবুজের উপর সাদাটে, পাকিলে ফিকা হরিদ্রা বর্ণ। কঠিনপ্রাণ (Hardy)। ঈষৎ সুস্থকায় ও শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক বলিয়া সহজে রোগ বা কীটাক্রান্ত হয় না। ৪।৫ বৎসরকাল সমভাবে ফলিয়া থাকে এবং উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। ইহার রসে মিষ্টতা অধিক, বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ও লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। ধলসুন্দর—কেহ কেহ ঢালাসুন্দরও বলিয়া থাকেন; যশোহর, খুলনা, বরিশাল, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে অল্পবিস্তর চাষ হইয়া থাকে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। সাদাটে বর্ণ। সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। ইহা হইতে উত্তম গুড় উৎপন্ন হয়।

৫। ইখড়ী—ফরিদপুর অঞ্চলে জন্মে। বর্ণ শ্বেতাভ হরিৎ। অত্যন্ত কঠিনত্বক; দুই হাত জলে বুড়িয়া থাকিলেও গাছ মরে না। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ বালির দানার ন্যায় শুষ্ক গুড় পাওয়া যায়।

৬। খাগী—পূর্ব্ব বঙ্গে ইহা নিম্ন জলাভূমিতেই জন্মিয়া থাকে।

৭। কুলোড়—বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পূর্ব্বে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইত। সরস ও অত্যন্ত নিম্ন ভূমিতেই ভাল জন্মে। বর্ণ মেটে খড়ি রং, গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও সরু জাতীয় এবং ঘন সন্নিবিষ্ট গ্রন্থিপূর্ণ। বিঘা প্রতি ৮।১০ মণ উত্তম গুড় পাওয়া যায়।

৮। শামসাড়া—উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। ফিকা হরিদ্রা বর্ণ, মোটা জাতি, দৃঢ়ত্বক। ত্বকের কোন অংশ এক প্রান্ত হইতে টানিলে সমস্তটী গাঁট শুদ্ধ সহজেই উঠিয়া আইসে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। পুড়ী ইক্ষুর ন্যায় ইহা হইতে প্রচুর রস পাওয়া যায়। রসে মিষ্টতা অধিক।

উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় জন্মে। রেড়ীর খইল, গোময় ও গোমূত্র সারে ইহার ফলন অধিক হয়। প্রথমে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করিতে হইবে। পশ্চাৎ যেমন গাছ বাড়িতে থাকিবে, ততই নিড়ানি করিয়া প্রত্যেক নিড়ানির সময় চূর্ণিত খইল গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া দিয়া আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হইবে। 'কৃষক' পত্রে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন—যে তিনি বিঘা প্রতি শামসাড়া ইক্ষুর পাকী ৬০ মণ গুড় পাইয়াছেন; বস্তুতঃ শামসাড়া যদি এতাদৃশ অধিক ফলন হয়, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু; কারণ, বৈদেশিক রসবহুল ইক্ষু হইতে গড়ে একার প্রতি ৬ টনের উপর গুড় পাওয়া যায় না (এক একার প্রায় তিন বিঘা জমি; এক টন ২৭৯ মণ)। এত পরিমাণ ফলন না হউক সাধারণতঃ সার দিয়া রীতিমত চাষ করিতে পারিলে শামসাড়ায় বিঘা প্রতি ৪০ মণের উপর গুড় পাওয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক; আমাদের দেশে শামসাড়ার নিম্নে কাজলা ও খড়ি ইক্ষু পরিগণিত হয়।

৯। পুড়ী—শাস্ত্রে ইহার নাম পৌণ্ড্রক্ষু; বঙ্গ দেশের মধ্যে সব্জী চাষে পুঁড়োদের ন্যায় কেহ উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না। সম্ভবত মালদহের পুঁড়ো (পৌণ্ড্রক) জাতিরাই ইহার উন্নতিসাধন কর্ত্তা। এজন্য ইহার পুঁড়ী নাম হইয়াছে। রং ফিকা হরিদ্রা, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। ত্বক অত্যন্ত কঠিন নহে। স্থূলকায় ও রস বহুল এবং প্রচুর সারযুক্ত সরস ভূভাগেই ভালরূপ জন্মে। বিঘা প্রতি ২০ মণেরও উপর গুড় পাওয়া যায়। সাহারাণপুর অঞ্চলে, এই জাতীয় পুরী বা পুণ্ড্রা নামক একপ্রকার ইক্ষু জন্মে, তাহা সাধারণতঃ ৮ হস্তের উপর দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। অনেকে এই জাতীয় ইক্ষু গুড় অপেক্ষা খাইবার নিমিত্ত মনোনীত করেন।

১০। পুরাকুছিয়া—আসামে সাদা ও লালচে বর্ণের এতন্নামক দুই প্রকার ইক্ষু জন্মে। ইহারা কোমলত্বক ও স্থূলকায়। কাঁচা খাইবার পক্ষে বিশে উপযোগী। সাধারণতঃ বাড়ীতে লোকে সখ করি রোপণ করে; সরস দোয়াঁশ মাটিতে ভাল ও একই ভূমিতে একাদিক্রমে ১০।১২ বৎসর থাকে। এই জাতীয় ইক্ষু ১২ হস্তের উপর হয়। পাব ৬।৭ ইঞ্চ দীর্ঘ ও অত্যন্ত স্থূল, ব্যাস ২½ ইঞ্চি।

১১। বোম্বাই—ইহা শামসাড়ারই মত, কিছু স্থূলকায়, কোমলত্বক এবং কীট ও রোগাদি শীঘ্র আক্রান্ত হইয়া পাড়ে; দোয়াঁশ মাটিতে জন্মে। এ দেশে সাধারণতঃ কাঁচা খাইবার জন্য ব্যবহার হয়।

১২। সাঁচকুশর—কেহ কেহ সাঁচবোম্বাই বলিয়া থাকেন। ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে জাতীয় ইক্ষুর অল্পবিস্তর চাষ হয়। বর্ণ সোণালী, মধ্যমরূপ দৃঢ়ত্বক, মোটা জাতীয় ও রসপূর্ণ। গাছ ৩।৩½ হস্তের উপর লম্বা হয় না। দোয়াঁশ ও মেটেল জমিতে সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। মিষ্টতা অধিক ও অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় দানাদার উৎপন্ন হয়।

১৩। লাল ইক্ষু—আসামে এই জাতীয় ইক্ষু অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও কঠিনপ্রাণ। ইহাতে রসের পরি ও মিষ্টতা অধিক ও উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। প্রকার ইক্ষু অপেক্ষা ইহা নিম্নভূমিতে ভাল জন্মে।

১৪। ফেতারী—বিহার হইতে সাঁওতাল পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই ইহার অল্পবিস্তর হইয়া থাকে। গাছ ৩।৪ হাতের উপর দীর্ঘ বর্ণ ফিকা হরিদ্রাভ সব্জা। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক, প্রাণ ও অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা কিছু স্থূল। রস পরিমা জন্মিলেও মিষ্টতা অধিক ও উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহার রস স্বল্পায়াসেই হয়। উচ্চ এঁটেল দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল ইহার চাষে লাভ আছে।

১৫। খোলোই—অত্যন্ত স্থূলকায় এবং রং। রস প্রচুর কিন্তু মিষ্টের ভাগ অল্প। অত্যন্ত বিলম্বে বৃদ্ধি পায়। নাগপুর অঞ্চলে ইহার চাষ হয়।

১৬। পানশাহী—গাছ ৪।৫ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না। বর্ণ সাদাটে, সরু জাতীয় ও অত্যন্ত কঠিন-প্রাণ। অত্যন্ত উর্ব্বরা ও উচ্চ ভূমিতেই ভাল জন্মে। বিঘা প্রতি ১৫।১৬ মণ গুড় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকী গুড়ের জন্য ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে; ইহার চাষে লাভ আছে। বাদশাহদিগের পানের নিমিত্ত ইহার চাষ হইত, এজন্য পানশাহী নাম হইয়াছে।

১৭। রেণ্ডা—গাছ ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ হয়। হরিদ্রা বর্ণ, পাকিলে পাঁশুটে রং ও অপেক্ষাকৃত মোটা জাতীয়; উচ্চ দোয়াঁশ ভূমিতে ভাল জন্মে। বিহারের পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশসমূহে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সার গুড় প্রস্তুত হয়। ইহার চাষ লাভজনক।

১৮। মাঙ্গা—ত্রিহুতের পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর চাষ হয়। গাছ ৪।৫ হস্ত উচ্চ হয়। মধ্যম কোমলত্বক ও মোটা জাতীয়; উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে এবং নিতান্ত নীরস ভূমিতেও সহজে মরে না। কিন্তু সহজেই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা দানাদার চিনি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়।

১৯। ভূর্লী—বিহার অঞ্চলে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত রেণ্ডা ও পানশাহীর মত; তবে দৈর্ঘ্যে আরও বর্দ্ধিত হয়। পত্রও কিছু বৃহত্তর ও কঠিন-প্রাণ। উচ্চ চিকণ মৃত্তিকাতে সুন্দর জন্মে এবং প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। এতদুৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২০। লাল গেণ্ডা—গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রক্তবর্ণ, কোমলত্বক ও স্থূলকায়; কিন্তু তত দৃঢ়প্রাণ নহে। বেতিয়া, চম্পারণ অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে সুন্দর গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে গুড় অপেক্ষা কাঁচা খাইবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

২১—২২। ধাউর ও মাতনা—এই দুই জাতীয় ইক্ষু সাজাহানপুর অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও কঠিনপ্রাণ; এঁটেল মাটীতে ভাল জন্মে। প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহার রসে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২৩। দিক্‌চর—সাজাহানপুর অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয়; স্থূলকায় ও কোমলত্বক; এজন্য কীটাদি কর্ত্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে।

২৪। শিবারি—গোরক্ষপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। এঁটেল নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। বর্ণ ফিকা সব্জা হলুদে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরু জাতীয়। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ রস পাওয়া যায় এবং উৎকৃষ্ট শুষ্ক গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

২৫। ধানী—উত্তরপশ্চিম ও সাজাহানপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। গাছ দীর্ঘকায়, দৃঢ়ত্বক ও সরু জাতীয়; এঁটেল অথচ নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক এবং উৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২৬—২৭। হালকাভূ (Grass cane) এবং হলুদে উখ (Straw cane)—বোম্বাই অঞ্চলে জন্মে। ইহারা দৃঢ়ত্বক, কঠিনপ্রাণ ও সরুজাতীয়; এঁটেল নিম্নভূমিতেই ভাল জন্মে। জলে প্লাবিত হইলেও গাছ মরে না। গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২৮—২৯। রেস্তানি, পুটপুটি—মান্দ্রাজ ও মহীশুর অঞ্চলে এই দুই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। উর্ব্বরা দোয়াঁশ ভূমিতেই সুন্দর উৎপন্ন হয় ও গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়। এতদ্ব্যতীত কটেকবো ও মারাকেবো নামক আরও দুই জাতীয় ইক্ষু জন্মে; ইহাদের চাষ সুবিধাজনক নহে।

৩০। চীনা (China)—বিদেশী ইক্ষুর মধ্যে ইহাই এদেশের জলবায়ু-সাম্য হইয়া গিয়াছে। অত্যধিক বৃষ্টি

বা শুকায় ইহার কোন হানি হয় না; যেখানে কোন জাতীয় ইক্ষু জন্মে না, তথায় ইহা সুন্দর জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক বলিয়া কীট বা শৃগালাদি পশু কর্ত্তৃক ইহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ইহা প্রচুর রসপূর্ণ। বিঘা প্রতি ২০০ শত মণ পীড়নযোগ্য ইক্ষুদণ্ড পাওয়া যায়। বিহারের নীলকরেরা এই জাতীয় ইক্ষুর চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হয়।

৩১। হেমজা—গোরক্ষপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশেও ইহা জন্মিতে পারে। বিঘা প্রতি ২৫ মণের উপর গুড় পাওয়া যায়। ইহার চাষ তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

৩২। কেন্নার—দেহলী (Dehli) অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট পাকা চিনি প্রস্তুত হয়।

৩৩। কোচীন—দাক্ষিণাত্যের কোচীন প্রদেশে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। ইহা অত্যন্ত স্থূলকায়, ৮।১০ হস্ত দীর্ঘ ও অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। পাবের ব্যাস প্রায় ৮ ইঞ্চি। রসে মিষ্টতা অল্প, গুড় বা চিনির জন্য, ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে। কাঁচা খাইবার উপযোগী। বিশেষতঃ এরূপ বিপুলকায় ইক্ষু দর্শনীয় দ্রব্যও বটে।

৩৪। বর্ম্মা—ইহা কোচীন ইক্ষুরই মত; তবে অনেক সূক্ষ্মকায়; কিন্তু দেশীয় সকল ইক্ষু অপেক্ষা স্থূল। সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। অত্যন্ত ভঙ্গুর এজন্য কলে পীড়নের সুবিধা হয় না। রসে মিষ্টতা অল্প; সুতরাং গুড় বা চিনি অপেক্ষা কাঁচা খাইবার অধিক উপযোগী।

৩৫—৩৬। বোরবোঁ (Bourbon) এবং ওটাহিটী (Otaheite)—জ্যামেকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এই দুই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। এ দেশে ইহারা ভাল জন্মে না। উপরোক্ত স্থান সমূহে অসংখ্য ইক্ষু চিনির কারখানা আছে।

৩৭। মরিসাস্ (Mauritius) প্রধানতঃ মরিসাস দ্বীপেই এই জাতীর ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে বোরবোঁ জাতীয় বলিয়া থাকেন; কিন্তু অনেকের মতে মালাবার উপকূল প্রদেশ হইতেই প্রথমে মরিসাস দ্বীপে নীত হয়। পশ্চাৎ তথায় অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ইক্ষু বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল ও অত্যন্ত মিষ্টরসপূর্ণ। এদেশে ইহার চাষ নিষ্ফল হইয়াছে।

৩৮।৩৯।৪০।৪১। ইয়োলো ভায়োলেট (Yellow violet), পার্পল ভায়োলেট (Purple violet), ষ্ট্রাইপড্ রিবণ (Striped ribon cane) এবং শিঙ্গাপুর (Singapore) নামক কয়েক জাতীয় ডোরাকাটা ইক্ষু জাভা, ফিজি, মালয়, শিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহারা ভারতবর্ষজাত ইক্ষু বটে, কিন্তু বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকালকার আমদানী জাভাচিনি ও ব্রাউনসুগার (Brown sugar) এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত সুক্ষ্মকায় ইক্ষু সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; সম্ভবতঃ চেষ্টা করিলে ইহাদের চাষ এদেশে সফল হইতে পারে।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিদেশীয় ইক্ষু আদৌ ভারতবর্ষজাত ইক্ষু হইতে উৎপন্ন হইলেও, দেশান্তরে গিয়া ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু অত্যন্ত স্থূলকায়, কোমলত্বক, দীর্ঘাকার ও প্রচুর মিষ্টরসপূর্ণ। এজন্য ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ দেশে ইহারা শীঘ্রই কীট ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে; বহু চেষ্টাতেও ইহাদের চাষ সফল হয় নাই। সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ সমূহেই ইহাদের চাষ হয়; কিন্তু এ দেশে সমুদ্র হইতে বহু দূর অন্তবর্ত্তী ভূভাগেই ইহাদের চাষ হইয়াছে; এজন্য জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বশতঃ সম্ভবতঃ ইহাদের চাষ বিফল হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ইহাদের সফল চাষের আশা করা যায়।

এতদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বারখা, রেওড়া, নিবাড়, কেবাহী, ধাবী প্রভৃতি নানা জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। এগুলি তত বিখ্যাত বা ইহা হইতে উৎপন্ন গুড় তত ভাল নহে। সমগ্র ভারতবর্ষজাত ইক্ষুর সংখ্যা একশতেরও উপর হইতে পারে; কিন্তু সবগুলিই যে পরস্পর বিভিন্ন জাতি, এরূপ নিশ্চয় বলা যায় না। দেশ ভেদে এবং উৎকৃষ্ট কর্ষণপদ্ধতি অনুসারে পুষ্টিনিবন্ধন একই ইক্ষু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রূপান্তরতি হইয়া বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। আবার একই ইক্ষু বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষু সাধারণতঃ রক্ত, রক্তাভকৃষ্ণ, সুবর্ণ, পীত, হরিত, রাজীমন্ত (ডোরাকান্ত), শ্বেতাভ পীত ও হরিতাভপীত এই কয়েক বর্ণের দেখা যায়।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত; কিন্তু বিট ও মরিসাসের চিনির আমদানী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গত ৪০ বৎসরের মধ্যে দেশীয় চিনির কারখানা লোপের সহিত ইক্ষুর আবাদও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এখন যশোহর ও নদীয়া জিলায় সামান্য ২।৪ টা চিনির কারখানা দেখা যায়। বঙ্গের তুলনায় ত্রিহুত, বিহার ও উত্তর পশ্চিমে ইক্ষুর চাষ যেরূপ অপর্য্যাপ্ত, চিনিও তদ্রূপ প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাশী, গাজীপুর, গোরক্ষপুর ও অযোধ্যা এই দেশী চিনির প্রধান বাণিজ্য-স্থান। এই চিনি অতি উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম ভাবে চূর্ণিত। চিনি বা গুড় মাত্রই বর্ষকালে একটু গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু গোরক্ষপুরের চিনির এ দোষ মাত্রই নাই। এজন্য ইহার আদর অধিক। সমগ্র যুক্তপ্রদেশ বিহার এবং বঙ্গদেশের ভাগলপুর মালদহ ও রাজসাহী জিলায় এই চিনির অল্পাধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। অধুনাতনকালে ভারতবর্ষের আর কোথাও এত চিনি উৎপন্ন হয় না।

চিনির কারবারের উন্নতি ও বিদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; যথা—

১। ভূমি সার প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে চাষের উপযোগী হইলেও, ভূমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করা সাধ্যাতীত; কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু হইতে ভূমি ও স্থানীয় জল বায়ুর উপযোগী জাতি নির্ব্বাচন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত।

২। জাতি বিশেষে ইক্ষুর রসে মিষ্টতার সামান্য তারতম্য থাকিলেও জাতি বিশেষে কাহারও অধিক কাহারও বা অল্প রস নির্গত হইয়া থাকে। এ জন্য যে সকল জাতীয় ইক্ষু অধিক মিষ্ট ও বহু রসপূর্ণ-আমাদিগকে সেইগুলির চাষ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৩। যে জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে, তাহা কোমল বা দৃঢ়ত্বক, স্বল্পপ্রাণ (lelicate) বা দৃঢ়প্রাণ (hardy), কলে চড়াইলে সহজেই সমস্ত রস নির্গত হয়, বা বহুক্ষণে অতি কষ্টে অপেক্ষাকৃত অল্প রস নির্গত হয় এটীও—নিরূপণ করা আবশ্যক।

৪। গুড় ও চিনি প্রস্তুতের জন্য উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যেন প্রস্তুত কালে কোন অংশ নষ্ট না হয়।

৫। যেরূপ মিষ্টরসবহুল ইক্ষুর কাজ বাড়াইতে হইবে, নানাবিধ সহজ উপায়ে যাহাতে গুড়ে মাত অপেক্ষা সারের ভাগ বেশী জন্মে তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। কলে যেরূপ চিনি প্রস্তুত হইবে, চিনির পরিত্যক্ত অংশ হইতে সেইরূপ মাতগুড়, চিটা, মিথাইলেটেড স্পিরিট, (Methylated Spirit), ভিনিগার (Vinegar), রম (rum), প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কলের লাভ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৭। কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় ইক্ষু একাদিক্রমে ৫।৭ বৎসরকাল চাষ করিলে ভূমি যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইক্ষু ও তদ্রূপ অপকর্ষ ভাব প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত ৪।৫ বৎসর অন্তর নূতন ভূমিতে ভূমির উপযোগী নূতন ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে বা পুরাতন বীজ পরিত্যাগ করতঃ তাহাই অন্য কোন দূরস্থান হইতে আনাইয়া চাষ করিতে হইবে।

৮। যে স্বল্প স্থানে প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়, তথায়

সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কল বসাইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৯। বিট চিনির উপর যেরূপ শুল্ক (Countervailing duty) বসিয়াছে, মরিসাস, জাভা প্রভৃতি দ্বীপজাত ইক্ষু চিনির উপরও যাহাতে সেইরূপ শুল্ক বসে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভূমি—জাতি বিশেষে ইক্ষু সর্ব্ববিধ ভূমিতেই জন্মিতে পারে এবং ইহার চাষে প্রচুর জলের আবশ্যক হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া ইক্ষুক্ষেত্র যে সর্ব্বদাই জলে প্লাবিত করিয়া রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এজন্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়া অতিরিক্ত জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জাতিভেদে ইক্ষু সকল প্রকার ভূমির উপযোগী হইলেও, উচ্চ, সরস ও অত্যন্ত উর্ব্বরা দোয়াঁশ মৃত্তিকায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জন্মে। অত্যন্ত শুষ্ক, কঠিন এবং বালুকাশূন্য এঁটেল মাটিতে ইক্ষু সুবিধাজনক ভাবে জন্মে না। অভাব পক্ষে ইহাতে আবশ্যক মত বালুকা, গোময়াদি পশু বিষ্ঠা, উদ্ভিজ্জ সার প্রভৃতি মিশ্রিত ও প্রচুর জল সেচন করিয়া চাষ করিতে হইবে। এরূপ ভূমি সর্ব্বদা সরস থাকা আবশ্যক, যেন কোনমতে শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া না যায়। লবণ চূর্ণ এবং ক্ষার ইক্ষুর নিমিত্ত সামান্য প্রয়োজনীয় হইলেও ইহারা এবং সোডা (Soda) ম্যাগনেসিয়া (Magnesia) প্রভৃতি মৃত্তিকাতে প্রচুর বিদ্যমান থাকিলে ইক্ষুর চাষ করা বৃথা; উসর মৃত্তিকা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ফসল ত ভালই হয় না, অধিকন্তু উৎপন্ন গুড় ও চিনি লবণ বা ক্ষার স্বাদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে সকল ভূমিতে ভাদুই ধান, তামাক, আলু, অড়হর, তিসি, গোধূম, বুট, কলায়, সীম প্রভৃতি ফসল জন্মে, তাহাতে ইক্ষুর চাষ হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ এপ্রকার ভূমি সর্ব্বদা কর্ষিত হওয়ায় ইক্ষু সুন্দর জন্মে। ছায়াযুক্ত স্থানের ইক্ষুরস মিষ্টও অল্প হয় এবং গাছও বেশী তেজ করে না। এজন্য ক্ষেত্রে যাহাতে অব্যাহত ভাবে বাতাতপের প্রবেশ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সকল ভূমি সর্ব্বদা সরস ও শিথিল ভাবাপন্ন, তাহাতে চৈত্র বৈশাখ মাসে সামান্য জল সেচনের আবশ্যক হইলেও, অন্য সময়ে আদৌ জলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল ভূমি এরূপ অবস্থাপন্ন নহে, তাহাতে জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্থূলতঃ ইক্ষু ভূমি সর্ব্বদা সরস থাকিলেও, যাহা দিবা ভাগে রৌদ্রতাপে শুষ্ক ও প্রাতে আর্দ্র বোধ হইবে, তাহাতে ইক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বর্দ্ধিত হয়।

ভূমি প্রস্তুত—চৈত্রের ফসল উঠাইয়া লইবার পর নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে অন্য কোন শস্য বপন করা উচিত নহে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার হিসাবে হলকর্ষণ করতঃ মৃত্তিকা উত্তমরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলে, বায়ু ও জলের সারভাগ গ্রহণ করতঃ ক্ষেত্র স্বভাবতঃই উর্ব্বরা হইয়া উঠে এবং জঙ্গলাদি আগাছা মাসে মাসে উৎপাটিত হইয়া বর্ষার জলে পচিয়া যাওয়ায় সারের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে জঙ্গল জন্মিবারও সম্ভাবনা থাকে না। বৃষ্টির জলের অন্যান্য সারভাগ যাহাতে বহির্গত হইতে না পারে এজন্য ভূমির চতুর্দ্দিকে আল বাঁধিয়া জল ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল ভূমি নিম্নতাবশতঃ সর্ব্বদা জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও পরিষ্কার করিতে অত্যন্ত খরচ পড়ে, আমন ধান্যের ভূমি প্রস্তুতের ন্যায়, ভাদ্র মাসে বরাবর প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলে, সে সকল ভূমি কর্ষণ জলের উপরই উত্তমরূপ কর্ষণ করতঃ ঘনকাদার মত করা যায়, তাহা হইলে তাহার জঙ্গল মরিয়া যায় ও ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া উঠে। পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রথাকে "গজর" বলে। আশ্বিন মাস বরাবর আকাশ মেঘ-শূন্য, ভূমি শুষ্ক ও রৌদ্র তেজ প্রবল হইলে, যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার চারিভাগের দুই ভাগ সমস্ত ক্ষেত্রে সমভাবে ছড়াইয়া—৫।৭ দিবস কাল উত্তমরূপ শুষ্ক করতঃ অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৪।৫ বার গভীরভাবে কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণিত ও সমতল করিতে হইবে। ইহার পর সমস্ত পৌষ মাস (অর্থাৎ, বীজ বপনের একমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

ভূমিকে বিশ্রাম দিতে হইবে, কোনরূপ কর্ষণ, সার প্রয়োগ বা নাড়াচাড়া করিবার আবশ্যক নাই। অবশিষ্ট যে দুই ভাগ সার থাকিবে তাহাই ইক্ষু রোপণকাল হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে ব্যবহারের জন্য রাখিতে হইবে। কোথাও কোথাও ভাদোই ফসল উঠাইয়া সার প্রয়োগে কথিত উপায় মত ভূমি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ প্রথাও সুন্দর; কিন্তু ইক্ষু চাষে প্রচুর সারের আবশ্যক হয়। এজন্য মধ্যে একটি ফসল উৎপাদন করতঃ সারভাগ না কমাইয়া সম্বৎসর পতিত রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত।

সার—ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে সারভাগ গ্রহণ করিয়া ভূমিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এজন্য সার প্রয়োগ আবশ্যক; কিন্তু সার অধিক দিলেই যে গুড় বা চিনি অধিক জন্মিবে এরূপ কোন কথা নাই। তবে সার প্রয়োগে গাছ সতেজ হয় ও মাতিয়া উঠে, ইক্ষু পর্ব্বের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়; এজন্য গুড়ের পরিমাণ অধিক হয়। যাহা হউক, ইক্ষু ক্ষেত্রে পরিমিত সার প্রয়োগ করাই নিয়ম, অতিরিক্ত সার প্রয়োগ বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। এদেশের কোন কোন জেলাতে বিনা সারেও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। যদি বিনা সারে বিঘা প্রতি ১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়—তবে পঞ্চাশ টাকা সারের জন্য ব্যয় করিয়া ২৫ মণ গুড় পাইবার জন্য সার খরচ না করাই উচিত। বিঘা প্রতি ক্ষার (ছাই) ৫।৭ মণ ও গো মহিষাদির বিষ্ঠা ৭০।৮০ মণ বা অশ্ব বিষ্ঠা ৪০ মণ বা খৈড়ী ও সর্ষপ খইল ২০।৩০ মণ বা অস্থি চূর্ণ ১০ মণ বা সোরা ৫।৬ মণ বা নীলের সিটী ৪০ মণ বা পচা মহুয়ার ১০ মণ বা তুলাবীজ চূর্ণ ৩০ মণ প্রয়োগ করিলে সুন্দর ইক্ষু জন্মে। ইক্ষুতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণ সৌবর্চ্চলজনের (Nitrogen) প্রয়োজন হয়, বায়ু ও ক্ষারেরও সেইরূপ আবশ্যক হইয়া থাকে; বিঘা প্রতি আধমণ সৌবর্চ্চলজন দিবারই নিয়ম, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিগলিত অবস্থায় বর্ষার জলের সহিত বাহির হইয়া বা ভূমির নিম্নে চলিয়া যাওয়ায়, মূলকর্ত্তৃক আকর্ষিত না হইবার জন্য গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে না। এজন্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ পরিমাণে ইহার প্রয়োগ আবশ্যক। মৃত্তিকা জমিয়া কঠিন হইলে মূলে বায়ু-সঞ্চার রোধ বশতও গাছের বৃদ্ধি হয় না। ইক্ষুর চাষে গো, মেষ, মহিষাদির বিষ্ঠা বিশেষ সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার। কারণ ইহাতে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষুর প্রাণধারণ ও বর্দ্ধনোপযোগী সৌবর্চ্চলজন বিদ্যমান আছে। ইহাদের প্রয়োগে ভূমি শিথিল ও বায়ু-প্রবেশশীল হইয়া উঠে। সুতরাং ভূমির অবিগলিত কঠিন পদার্থ সকল দ্রবীভূত ও বৃক্ষ মূল দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তাহার বর্দ্ধনের সহায়তা করে। গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও বৃক্ষপত্রাদি অর্দ্ধবিগলিত (আধ পচা) অবস্থায় প্রয়োগ করিলে সারভাগ পচিয়া গাছের উপযোগী হইতে বিলম্ব লাগে; সুতরাং সারগত সৌবর্চ্চলজন (Nitrogen) ভূমির নিম্নে বা অপর কোন দিক দিয়া বহিয়া যাইতে সক্ষম হয় না, ধীরে ধীরে গাছ সমস্ত অংশই গ্রহণ করে। আপাং, তিলডাঁটী, কলাবাসনা, কুমড়াডাঁটী, নারিকেল বা অপর কোন লতা পত্র ভস্মাদি বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্ষার প্রয়োগেও ভূমি শিথিল ও বায়ুপ্রবেশশীল হইয়া উঠে; অধিকন্তু ভূমি ও সারের অদ্রবনীয় পদার্থ সকল বিগলিত হইয়া গাছের সদ্য ব্যবহারোপযোগী হয় এবং কীটাদির উপদ্রবের অল্পতা ঘটে। উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে নীলের সিটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু যথায় পাইবার সুবিধা আছে, তথায় ইহা শুদ্ধ বা গোময়াদির সহিত বা আধাআধিভাবে প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফসল জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের ন্যায় ইক্ষুর উপযোগী ব্যয়স্বল্প উৎকৃষ্ট সার দেখা যায় না। গো-মহিষাদির বিষ্ঠা ৬ হইতে ৯ মাসের মধ্যে পচিয়া সার হয়; কিন্তু অশ্ব বিষ্ঠা দেড় বৎসরের পুরাতন না হইলে প্রয়োগ করা উচিত নহে; ইহা অপেক্ষা অল্প দিনের হইলে সারের তেজে গাছ ঝান খাইয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র এবং উত্তর পশ্চিমেও কোথাও কোথাও বিঘা প্রতি ২০০ শত মণ হিসাবে নরবিষ্ঠা ইক্ষুর সাররূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা

অমেধ্য প্রয়োগ না করাই উচিত, কারণ গবাদি পশু বিষ্ঠা ইহা অপেক্ষা শত গুণে উপকারী ও স্বাদবর্দ্ধক। খৈল, সোরা, অস্থিচূর্ণ, পচা মৎস্য প্রভৃতি ইক্ষুর উপযুক্ত সার হইলেও ব্যয়াধিক্য আছে। এগুলি উপরিউক্ত সারগুলির সহিত আধাআধি পরিমাণে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ব্যয় অল্প পড়ে। রেড়ী ও সরিসার খৈল ইক্ষু মাত্রেরই পক্ষে উপকারক। রেড়ীর খৈলে শামসাড়া ইক্ষুর সুন্দর ফলন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ খৈল প্রয়োগে গাছের শিকড়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় গাছ অত্যন্ত বলবান হয় ও ঝাড় বান্ধে এবং ঝড়ে বা বাতাসে সহজে পড়িয়া যায় না। সূক্ষ্ম চূর্ণিত সোরা বর্ষার শেষ বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ভাল হয়। ভূমি শুষ্ক থাকিলে সোরা দেওয়ার পর জল সেচন করিতে হইবে; নচেৎ সোরা শীঘ্র উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয় না। অস্থি স্থূল ও সূক্ষ্ম চূর্ণ ভেদে দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে; মরিসাস প্রভৃতি স্থানে অস্থিচূর্ণই ইক্ষুর প্রধান সাররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ (bone dust) গাছের গোড়ায় বরাবর দিতে পারিলে শীঘ্রই বৃক্ষোপযোগী আহারে পরিণত হয়; কিন্তু স্থূল অস্থি চূর্ণ (bone meal) বিলম্বে কার্য্য সাধক; এজন্য চাষের সময় হইতেই জমিতে ছিটাইয়া চাষ করিতে হইবে। ইক্ষুর মূল জমির অধিক নিম্নে যায় না; এজন্য মূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে সার প্রয়োগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবেই সারের সার্থকতা হইতে পারে। খৈল, সোরা, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার মূল্যবান। যদি গবাদি পশু বিষ্ঠা ও উদ্ভিজ সার অর্দ্ধ পরিমাণে দিয়া জমি প্রস্তুত করতঃ গাছ রোপণের পর পাইট করিবার সময় অর্দ্ধ পরিমাণ খৈল, অস্থি চূর্ণ প্রভৃতি বারে বারে অল্প পরিমাণে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারে অল্প খরচ পড়ে, অথচ ইক্ষু সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া পুরা ফসল প্রদান করে। সারের মধ্যে সোরা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; সুতরাং ইহার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। ২।৩ মণ সোরা ও ৮।১০ মণ রেড়ীর খৈল একত্র মিশাইয়া আশ্বিন মাস বরাবর গাছে গোড়ায় দিতে পারিলে ফলন ভাল হইয়া থাকে। সোরা একক অপেক্ষা অন্য সারের সহিত মিশ্রিত ভাবে প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে। অস্থি চূর্ণ প্রয়োগে জমি ক্ষয়িত ফস্ফরাস, চূণ, ক্ষার প্রভৃতি পদার্থের পূরণ হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৭০ মণ গোবর ও ৩০ মণ খৈল এই উভয় সার প্রয়োগ করিয়া ৩০ মণেরও অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল সারের মধ্যে খৈল ও গোময়াদি পশুবিষ্ঠা বা খৈল, গোময় ও অস্থি চূর্ণ বা তুলাবীজ, সোরা ও অস্থি চূর্ণ একত্র প্রয়োগে ইক্ষু সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ইক্ষুক্ষেত্রে যত পরিমাণ সার দিতে হইবে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ হলকর্ষণকালে এবং অবশিষ্টভাগ বপনকাল হইতে, বর্ষার পূর্ব্বে যত দিন না গাছ নিজে তেজ করে তত দিন ৩।৪ বারে সামান্য পরিমাণ প্রতিবার নিড়াইবার সময় গাছের গোড়ায় মৃত্তিকা সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ফল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ইহার পর বর্ষায় গাছ জোর করিতে থাকিলে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ এ সময়ে শিকড় নাড়াচাড়া করিলে গাছের হানি হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ আশ্বিন কার্ত্তিক বরাবর গাছের গোড়ার মাটী আল্‌গা করিয়া দিয়া বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ রেড়ী বা সরিষার খৈল দিয়া থাকেন। ইহাতে রসের গাঢ়ত্ব হয় ও দানাদার চিনি জন্মিয়া থাকে। পচা গো মূত্র সঞ্চিত থাকিলে তাহা মিশাইয়া এ সময়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে গাছের ফলন বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। কারণ গো মূত্রে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজন বিদ্যমান আছে। গোময়াদি পশু বিষ্ঠা এবং ধঞ্চে ভুরা প্রভৃতি কাঁচা উদ্ভিজ্জাদি একত্রে ক্ষেত্রে দিলে ইক্ষুর আবশ্যকীয় সৌবর্চ্চলজন প্রযুক্ত হয়ই, তদ্ব্যতীত জমি এরূপ শিথিলভাবাপন্ন বায়ুপ্রবেশশীল হয় যে অন্য সার দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু জমি শুষ্ক ও উচ্চ দোয়াঁশ হইলে জল ধারণশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ধঞ্চে জমির

সর্ব্বাপেক্ষা সারবতী করিয়া তুলে; কারণ শিম্বিজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ধঞ্চেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার সঞ্চয়কারী। ইক্ষুর চাষে নাইট্রোজেন সার অত্যাবশ্যক। এজন্য ক্ষেত্রে ধঞ্চে জন্মাইয়া পশ্চাৎ ইক্ষুর চাষ করিলে অনেক সময়ে বিনা সারেই ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। শণ ও অড়হরও জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু ধঞ্চের মত নহে।

কীট ও রোগ নিবারক ঔষধ—ইক্ষু অত্যন্ত রোগ-প্রবণ। তদ্ব্যতীত ক্ষেত্রে উই ও নানাবিধ কীটাদির উপদ্রব আছে। শৃগালাদির ত কথাই নাই। নির্দ্দোষ ইক্ষুবীজ রোপণ করিলেও সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, ক্ষেত্রটী কীট বা উই বা পিপীলিকাক্রান্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নীরস জমিতে বিশেষতঃ গাছের কল বাহির হইবার সময় উইয়ের উপদ্রব বেশী হয়। গাছ সতেজ ও সরস অবস্থায় থাকিলে সহসা রোগাক্রান্ত হয় না। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রটী গভীররূপে ৫।৬ বার লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করতঃ মৃত্তিকা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিলে উই বা পিপীলিকা সমূহ মরিয়া যায় বা অন্যত্র পলায়ন করে। বপনের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত ঔষধ-গুলিতে ইক্ষুখণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে কীট ও রোগ অনেক সময় নিবারিত হইয়া থাকে।

১। লবণ ৪ সের, হেনরো (স্বল্প মূল্য হিং) আধপোয়া এবং সূক্ষ্ম চূর্ণ সেঁকো বিষ ২॥ তোলা এবং আবশ্যক মত জল।

২। হেনরো আধপোয়া, সরিসার খৈল ৮ সের, পচা মৎস্য ৪ সের, বচ বা আকন্দমূল চূর্ণ ২ সের সমস্ত একত্রে আবশ্যক মত জলে মিশাইয়া তরল পঙ্কবৎ করতঃ অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ইক্ষুদণ্ড তাহাতে ডুবাইয়া পরে ভূমিতে রোপণ করিতে হইবে।

৩। শাখা পত্রাদি সহিত বাসক (বাকস) পত্র সিদ্ধ করতঃ তাহাতে সরিসার খৈল মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য।

৪। সেঁকোবিষচূর্ণ ১ তোলা, খানিকটা ময়দা ও গুড় একত্রে মিশাইয়া বড় বড় গুলি পাকাইয়া নারিকেলের মুচিতে ভরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলে গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট কীটাদি তাহা খাইয়া মরিয়া যায়; উই ও পিপীলিকা নিবারণের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

৫। ঘোল, হেনরো এবং অধিক পরিমাণ সরিসার খৈল একত্র জল মিশাইয়া ঘন লেহবৎ করতঃ ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে উই নিবারিত হয়; মধ্য ভারতবর্ষে এখনও এই আদিম উপায় প্রচলিত আছে।

৬। তুতিয়া ।০ পোয়া, হিং ২॥০ তোলা, সূক্ষ্ম সেঁকো বিষ ।৵ পোয়া, মুসব্বর ।১০ পোয়া, ঝুল ।১ সের, ছাই ।২ সের, চূণ ।॥০ আধসের, চূর্ণ সরিসার খৈল ১।॥ দেড়মণ ও জল ২।মণ একত্র মিশ্রিত করতঃ ইক্ষুখণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে সর্ব্ববিধ কীট নিবারিত হয়। ইহাতে ৪।৫ বিঘা জমির রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। খৈল সংযোগ বশতঃ ইহা শীঘ্র নষ্ট হয়, অতএব ইহার সদ্য ব্যবহার করা উচিত।

৭। এই মিশ্রিত দ্রব্য হইতে সেঁকো বাদ দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোচড়া লাগাইলে ধোসা পোকা নিবারিত হয়। ধোসা পোকা লাগিলে ইক্ষুদণ্ডে পিপীলিকা আশ্রয় করতঃ ফোপরা করিয়া ফেলে। এজন্য আক্রান্ত ঝাড়গুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহা আর অন্য ঝাড়ে সংক্রামিত হইতে পারে না। ধোসা আক্রান্ত ইক্ষুগুলির বৃদ্ধির হ্রাসের সহিত রসও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ধোসা পোকা নিবারণের জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে অড়হরের বেড়া দিবার প্রথা আছে; ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে সীম, ধঞ্চে, কলাই প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করিলেও এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

৮। সোডা (Soda Bicarb)এর জল দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোচড়া লাগাইলে ধোসা ও অন্যান্য কীট নিবারিত হয়।

চারা প্রস্তুত করণ—বিছনের নিমিত্ত রোগগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ড কোনরূপেই গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহা কোনপ্রকারে কীট ভক্ষিত বা যাহার পত্র শুষ্ক হইয়া

উই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বা যে ইক্ষুর অভ্যন্তরস্থ মাংসভাগে লালচে দাগ পড়িয়াছে বা যে সকল জাতি সহজেই কীটাক্রান্ত হয়, বীজের নিমিত্ত তাহারা গুরুভার, বীজের নিমিত্ত তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত চারিটী নিয়মে ইক্ষুর চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; আমাদের দেশে কর্ত্তিত অগ্রভাগ রোপণেরই প্রথা দেখা যায়।

১। সরস অথচ ছায়াময় স্থানে আবশ্যকমত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং ১ বা ১॥ হস্ত গভীর গহ্বর কাটিয়া পুরাতন গোবর ও জল মিশাইয়া ঘন কর্দ্দমের মত করতঃ ইক্ষুর অগ্রভাগগুলি তাহাতে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসাইয়া উপরে লতা পাতা বা বিচালি বা চাটাই দিয়া আবৃত করিতে হইবে; এই উপায়ে ১৫।২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে কল ও নূতন শিকড় বাহির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাই নিয়ম।

২। অগ্রভাগ ব্যতীত সমগ্র ইক্ষুদণ্ড হইতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে; যাহাতে কল (Bud) গুলি কোনরূপে নষ্ট না হয় এবং মধ্যে ৩।৪টী কল মুক্ত গ্রন্থি থাকে, এইরূপ ভাবে ইক্ষুদণ্ডগুলি ১ ফুট আন্দাজ দীর্ঘে খণ্ড খণ্ড কাটিতে হইবে; পরে দীর্ঘে প্রস্থে তিন হস্ত ও দুই হস্ত গভীর একটী গহ্বর কাটিয়া নিম্নে ভিজা খড় ও ছাই একস্তর বিছাইয়া তদুপরি কর্ত্তিত খণ্ডগুলি ঘন ভাবে পাতিয়া ভিতরে প্রবেশ হয় এইরূপ ভাবে ছাই ছড়াইয়া উপরে আবার ভিজা খড় ও ছাই চাপা দিতে হইবে; যতক্ষণ না গহ্বরটী পূর্ণ হয় এইরূপে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি ঘন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; এই উপায়ে ১০।২০ দিনের মধ্যে ইক্ষুর নূতন কল ও শিকড় বাহির হইয়া ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হইয়া উঠে।

৩। ইক্ষুদণ্ড ১ হস্ত পরিমাণ ২ খণ্ড কাটিয়া একেবারেই ভূমিতে রোপিত হইতে পারে; এইরূপ ভাবে রোপিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষেত্রটী একবার সেচ দিয়া উত্তমরূপ ভিজাইয়া লইয়া ইক্ষুখণ্ড মৃত্তিকার ভিতর ৩।৪ ইঞ্চ গভীরভাবে বসান কর্ত্তব্য। নতুবা সরস গ্রন্থি হইতে কল বাহির হয় না। ইক্ষুর গ্রন্থি হইতে কল ও শিকড় বাহির হইলেই অবিলম্বে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৪। মরিসাস, জামেকা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন করিয়া চাষ হইয়া থাকে; অনেকের মতে বীজোৎপন্ন চারা রোগশূন্য হয়; ইক্ষু বীজ অনেকটা যব গোধূমের আকৃতিবিশিষ্ট,—গোড়া জাতীয় বীজ ছোট, কোনটী বা বড়। ভারতবর্ষে বীজোৎপন্ন ইক্ষুর চাষ প্রায় দেখা যায় না। দক্ষিণ প্রদেশের কোথাও কোথাও বীজ হইতে ইক্ষুর চারা হইতে দেখা যায়।

রোপণকাল—মাঘমাসের শেষ বরাবর একটু উষ্ণ ভাব উপস্থিত হইলেই ইক্ষু রোপণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্বাদশ মাসের মধ্যেই ইক্ষু পরিপক্ক হয়; এবং শীত যত দিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন উৎকৃষ্ট গুড়ও জন্মে। এ জন্য মাঘ মাসের শেষ বরাবর গাছ রোপিত হইলে সতেজে বর্দ্ধিত হইবার সময় পায় এবং পরবর্ত্তী শীতের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া উঠে বলিয়া অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট গুড় পাওয়া যায়। জলাভাব বা ভূমি প্রস্তুতের বিলম্ব নিবন্ধন কোথাও কোথাও এই বপন ক্রিয়া ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পিছাইয়া পড়ে। ইহাতে দোষ এই হয় যে, গাছ ভাল বাড়িবার সময় পায় না এবং গ্রীষ্মকালে ইক্ষু পরিপক্ক হয় বলিয়া গুড়ও ভাল জন্মে না। রাজসাহী জেলার ভূমির রস থাকিলে আশ্বিন, কার্ত্তিক হইতেই ইক্ষু রোপণ হইয়া থাকে। ফলে অন্য ইক্ষুর যখন বাল্য মধ্যাবস্থা, ইহার তখন পূর্ণাবস্থা। সুতরাং পরবর্ত্তী কার্ত্তিকের মধ্যে নূতন গুড় বাজারে দেখা দেয় এবং দামেও বিক্রয় হয়। এজন্য অগ্রেই ইক্ষুর রোপণ উহার পরে কিছু নয়; এবং মাঘী চাষই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি উচ্চ ও সরস হইলে এবং জল নির্গমের বন্দোবস্ত থাকিলে, সম্বৎসর ধরিয়াও ইক্ষু চলিতে পারে।

রোপণ ও চাষ—সমস্ত ক্ষেত্রে লম্বালম্বি ভাবে দুই হস্ত অন্তর কোদাল দ্বারা মুটম হাত চওড়া ও ৯ ইঞ্চ গভীর নালা কাটিয়া মৃত্তিকা দুই পার্শে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে এবং পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত অবশিষ্ট সারের তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ নালার মধ্যস্থ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিলিত করতঃ শিকড় শুদ্ধ কল বাহিয়ান এক এক খণ্ড ইক্ষু ১৫ ইঞ্চ অন্তর বসাইয়া যে মৃত্তিকা উভয় পার্শ্বে উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাই ৩।৪ ইঞ্চ পুরু করিয়া চাপা দিয়া ঈষৎ দাবিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা উভয় নালার মধ্যস্থ ভূমি ভাগে ছড়াইয়া দিতে হইবে। রোপণকালে ভূমি শুষ্ক থাকিলে আবশ্যকমত জল সেচনে সরস করা কর্ত্তব্য, নতুবা উই লাগিয়া চারা নষ্ট করিতে পারে।

স্বাস্থ্য-পঞ্চক

[ডাঃ শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা]

১

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুষ্ক উচ্চ স্থান।
আবর্জ্জনা রাশি হ'তে স্থিত ব্যবধান॥
রহে চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপ্ত বিমুক্ত প্রান্তর।
এ হেন গৃহস্থ বাটী স্বাস্থ্যের আকর॥

২

হ'ক গঙ্গোদক কিম্বা মহাতীর্থ জল।
পান পূর্ব্বে যেবা করে সুসিদ্ধ সকল॥
হিন্দু বৌদ্ধ হ'ক কিম্বা যবন খ্রীষ্টান্।
মানবগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান॥

৩

উদয়াস্ত গৃহে যার সূর্য্যরশ্মি পশি।
করে দূর মশা মাছি, নাশে তমোরাশি॥
নিশীথে সুধাংশু রশ্মি স্পর্শে শয্যাস্থান।
গৃহস্থগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান॥

৪

অহোরাত্র গৃহে যার দেব সমীরণ।
কল্যাণ প্রসাদ সুখে করি বিতরণ॥
আনন্দ-উজ্জ্বল আয়ু করি যায় দান।
গৃহস্থগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান॥

৫

খুলি' গৃহদ্বার কিম্বা দাঁড়া'য়ে অঙ্গনে।
সীমাহীন নভ নীল নেহারে নয়নে॥
প্রকৃতির কোলে বসি শুনে কলতান।
গৃহস্থগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান্॥

৬

ক্ষিতি অপ তেজ আর মরুৎগণ।
এই পঞ্চ জড়ভূতে দেহের গঠন॥
শুদ্ধ দেহে এর সাথে যোগ রাখে যেই,
স্বাস্থ্যরত্ন অধিপতি ভাগ্যবান্ সেই॥

টাকা কোথায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করা (diagnosis) যেমন চিকিৎসকের পক্ষে অত্যাবশুক, তেমনি কি করিয়া এই "সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" দেশে এমন মর্ম্মভেদী দারিদ্র্য উপস্থিত হইল, তাহাও জানা দরকার। কবি বলিয়াছেন—'অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল' আর এখন ?

"সূঁচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দেয়াশলাইর কাঠি তাও আসে পোতে
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটী জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

কেন এমন হইল ? এই নদীমাতৃক দেশে জলাভাবে শস্য ক্ষেতে পুড়িয়া যায়, দুগ্ধের অভাবে শিশু শুকাইয়া মরে, চাকরী চাকরী করিয়া বাঙ্গালীর ছেলে পাগল হইয়া যায়। সায়েস্তা খাঁর সময়ে টাকায় আটমণ চাল হইয়াছিল ইতিহাস বলে, আর "এখন বিকায় পশারি'। পূর্ব্বে নাকি ২৲ টাকার চাকরী পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন; আর এখন হাজার টাকা মাইনের বাবু অথবা হাজার টাকা আয়ের জমিদারও 'মায়ের পূজা' করিতে সাহস করে না। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একবার হিসাব বাহির করিয়াছিলেন যে ২৷৷৵০ তে নাকি দুর্গোৎসবের "পূজার বাজারের ফর্দ্দ" আগে হইত এবং তাহারা সেই আয়োজনে ইতর ভদ্র সকলকে ভোজন করাইতেন। সে সব দিন কোথায় গেল, কেন গেল ?

এখন বিলাতে 'বেকার সমস্যা,' ভারতে বেকার সমস্যা (unemployment problem), জগৎব্যাপী এক রব উঠিয়াছে—টাকা কোথায় ? অন্যান্য দেশের লোকের আয়ের ও assetsএর সহিত তুলনা করিলে কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় যে, আমরা কি করিয়া বাঁচিয়া আছি। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে জার্ম্মানীর মাথা পিছু বার্ষিক আয় ৩৬০৲ ফ্রান্সের ৬৩৫৲ আমেরিকার ৫৮৫ আর ভারতবর্ষের কত জানেন ? ৩০৲ মাত্র। ঐ ৩০৲ বাৎসরিক আয় হইতে রাজস্ব, জমিদারের খাজনা, পূজা পার্ব্বণ, মেয়ের বিবাহ, ছেলের পড়ার খরচ সব চালাইতে হইবে। ৩০৲ আয়ে ভদ্রস্থতা রক্ষা ত দূরের কথা, প্রাণধারণ করাই কঠিন। তাই এই দেশের এক পঞ্চমাংশ লোক একবেলা খাইয়া থাকে, এক-তৃতীয়াংশ লোক রোগ হইলে ডাক্তার কবিরাজের সাক্ষাৎ পায় না, নীরবে মরিয়া যায়। ম্যালেরিয়ার কারণ 'দারিদ্র্য,' শিশু-মৃত্যুর কারণ 'দারিদ্র্য,' চুরি-ডাকাতির কারণ 'দারিদ্র্য,' জাতীয় নৈতিক চরিত্র-হানিরও কারণ এই আত্মঘাতী দারিদ্র্য। এক দিন যে জাতি বলিয়াছিল, "অর্থ অনর্থ"—এক দিন যে জাতি বলিয়াছিল "যেনাহংমৃতং নাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম"—এক দিন যে জাতির মধ্যে বুনো রামনাথ পণ্ডিত তেঁতুল ও ভাত খাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে টোলে সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাবে নিজের প্রাচুর্য্যের গর্ব্ব করিয়াছিল, আজ সেই দেশে এমন 'টাকা কোথায়' রব উঠিল কেন ? আমরা কি হঠাৎ অভাব বাড়াইয়াছি; না, বাস্তবিকই প্রয়োজন বাড়িয়াছে ? আজ দেখিতে হইবে এই হাহাকারের ও অভাবের মূল কোথায়।

ইংরেজ যখন এ দেশে আসিলেন, তখন দেখিলেন, প্রতি গ্রামে রজক, ক্ষৌরকার, তৈলিক, কুম্ভকার আছে। প্রতি গ্রামে মন্দির পান্থশালা আছে; তাহারা সমস্বরে বলিলেন যেন—The Indian village community is a little republic। কিন্তু কিছু কাল এ দেশে বাস করার পর তাঁহারা দেখিলেন, কর্ম্ম-চারী চাই, দোভাষী (interpreter) চাই। এইরূপে কেরাণীকুলের সৃষ্টি হইল। পরে ইংরেজের জাত-ভাই

ব্যবসার এই উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করিয়া দলে দলে আসিলেন, সরকারের তরফ হইতেও চেষ্টার ত্রুটি হইল না; শিল্পপ্রধান এই দেশ চাষী ও চাকুরীজীবী-প্রধান দেশে পরিণত হইল—জাত-ব্যবসা ছাড়িয়া সকলে কেরাণী হইল, তাঁতশালা, ঘানি বন্ধ হইল। ঠুনকো বিলাতী দ্রব্যসম্ভারে গৃহস্থালী পূর্ণ হইয়া গেল। লোকের কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি হইল। জাত-ব্যবসা যাওয়াতে

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার"

এই কবিতাও কবিকে লিখিয়া দেশের অবস্থা বোঝাইতে হইল।

আজ দেশে আমরা কি দেখিতেছি ? বাংলাদেশে প্রতি সহস্রের মধ্যে ৭৮৭ জন কৃষি দ্বারা, ৭৮ জন খনি-জ কারখানা প্রভৃতি প্রভূত শ্রমসাধ্য ব্যবসা দ্বারা, ৷ জন সাধারণ ব্যবসা দ্বারা এবং ২৩ জন উকীল ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসা ও সরকারী চাকরী দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

কোথায় বা গেল,

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ"—

সমস্ত জাতি চাকরীতে মাতিয়া উঠিল—

চাকরী তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
এই আফিসের কাজটী যেন বজায় রেখে মরি।

গা, চুরুট হইতে চাকরী পর্য্যন্ত সকলই একদিন ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে আমরা সখ করিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলাম—এখন উহা জগদ্দল পাথরের মত বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পল্লীগৃহ ঠুনকো কাঁচের জিনিষে ভরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের মত ভাল কাঁসার, পিতলের অথবা রূপোর বাসন আজকাল খুব কম গৃহস্থের বাড়ীতেই পাওয়া যায়। একদিকে আর্থিক অসঙ্গতি অপর দিকে বিলাসিতার দায়ে এই রুচি বিপর্য্যয় হইয়াছে। টাকার অভাবই যে এই দুর্গতির একমাত্র কারণ নহে—এজন্য বিলাসিতার মোহও দায়ী। গরিব চাষীর ছেলে যে জাত ব্যবসা ছাড়িয়া পেয়াদাগিরি করে উহার কারণ আর্থিক অনটন নহে, সহর বাসের লোভও আছে। চাষী চাষবাস দেখিলে যা আয় হইত, পেয়াদাগিরিতে তার বেশী হয় না; অথচ নিত্য মনিবের চোকরাঙানীও সহ্য করিয়া পেয়াদা সহরেই থাকে। তার কারণ সেখানে ইয়ারকির সুবিধা আছে, বিলাসিতার মোহ আছে। জাতব্যবসা অনেকেই এমনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। ইংরাজ সহর পত্তন করিলেন—দেশীয়েরা মহানন্দে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া সহুরে হইলেন। কোথায় ভাসিয়া গেল পৈতৃক ব্যবসা, কোথায় বা গেল বাস্তুভিটার মোহ। সহরবাস আর্থিক অসঙ্গতির জন্য দায়ী—এ কথা বলিলেই চতুর ও বিজ্ঞজন বলিবেন, ম'শায় সহর আছে বলিয়াই দুমুঠা করিয়া খাইতেছি, পল্লীতে থাকিলে উপবাস করিতে হইত। তাহাদের এই সহর বাসের স্বপক্ষ-যুক্তি খুব বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। সহর যে পল্লীর আয়েই চলে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন কি না জানি না। বড় বড় পিতলের লেবেল মারা কোম্পানী যে পল্লীগ্রামের কাঁচা মালেরই ছাপ দিয়া ব্যবসা করিতেছেন মাত্র তাহা ত বালকেও জানে। সহর সৃষ্টির ফলে ও চাকুরীর লোভই আর্থিক এই দুর্গতির কারণ। অধ্যাপক বেইলী (Prof. Bailey) মহাশয় বলেন—

The city sits like a parasite, running out its roots into the open country and draining it of its substance. The city takes everything to itself—materials, money, men—gives back only what it does not want.

সহর সৃষ্টির পরই কাঁচা টাকা আমরা এত ভাল-বাসিতে শিখিয়াছি; কারণ, সহর বাস করিতে হইলেই নিত্য নূতন অর্থ চাই।

আমাদের দেশে এক জাতীয় লোক আছেন—তাঁহারা বলেন, সভ্যতা মানুষের অভাব বাড়াইয়া থাকে এবং সভ্যতার অন্য নাম বেশী রোজগার করা এবং বেশী খরচা করা। তাঁহাদের যুক্তি এই যে অভাব বোধ না আসিলে মানুষ কোন দিন নিজে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখে না এবং ফলে জাতীয় ধনও বৃদ্ধি পায় না। ইঁহাদের এই যুক্তি একেবারে অকাট্য বলা চলে না।

প্রথমতঃ বিলাসিতা আমাদের যত বাড়িবে—বিদেশী বণিকের তত লাভ হইবে—জাতীয় ধন বাড়িবে না। আমরা ত এখন লক্ষ লক্ষ বিলাতি জিনিষের ব্যবসা করিতে শিখিয়াছি, কৈ কয়টা জিনিষ আমরা তৈরী করিতে নিজেরা পারি? আমরা কাপড়ের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের দিকে, ছুরী কাঁচির জন্য সেফিল্ডের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকি। আমাদের পাট বিলাতে যাইয়া রং হইয়া যখন আসে তখন আমরা উহার আলোয়ান গায় দিই, আমাদের সিল্ক বিলাতে রং হইয়া finished হইয়া আসিলে উহা বিলাসিনীদের পোষাকে ব্যবহৃত হয়। অভাব ত সহস্র সৃষ্টি করিয়াছি, কৈ উদ্ভাবনী শক্তি ত বড় দেখা যাইতেছে না। পাশ্চাত্য পরিদর্শক বিলাতের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী Ramsay Macdonald মহাশয়ের চোখে এই বিসদৃশ চিত্রটী পড়িয়াছে। তাঁর কথার সার মর্ম্ম এই যে লোকে অভাব সৃষ্টি করিয়া কেবল নিঃশেষ হইয়াই যাইতেছে—সভ্য হইতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন—

The people's wants—too many of them debased—are becoming more costly to meet. As evidence of increased prosperity I place little reliance on them. They simply show that people are running after cheap luxuries, that their sources of satisfaction are changing, that they are spending more money upon themselves. Better clothes are being worn, cigarettes are taking the place of the hooka, alcohol is being more widely consumed, shoes are more general, umbrellas are becoming more common.

তাই বলিতেছিলাম যে, অভাব বোধ আমাদের নিঃশেষই করিতেছে—শ্রীসম্পন্ন করিতেছে না। আমরা প্রতি পদে কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া "হা টাকা কৈ টাকা" করিতেছি। কেবল নিজের অভাব বাড়াইয়া—অতৃপ্তি বোধ করার কোন সার্থকতা নাই। দেশব্যাপী এই হাহাকার থামাইতে হইলে চাল-চলনও কি... বদলাইতে হইবে—কাল্পনিক অভাবগুলির মাত্রা ... কমাইলে এই অভাববোধ 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বেশ... বাড়িয়াই যাইবে; লোকের জীবনভার অধিকতর দুঃস... হইয়া উঠিবে। তাই আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'। জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী... কল্পনিক অভাবই বেশী—ভাত কাপড়ের অভাবও এখন... মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ দেখা দিয়াছে। কিন্তু অনেক... জায়গায়ই দেখা যাইতেছে যে ভাত কাপড়ের জোগাড়... করার অপেক্ষা মানুষকে কাল্পনিক অভাবগুলির তাড়নায়... বেশী অস্থির হইতে হয়। অভাবগুলি একটু কমাইলে... শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। অভাব যত বাড়িবে... বিদেশীর পকেট তত ভরিয়া উঠিবে—আমরা মনে... ধনে নিঃশেষ হইয়া যাইব। তাই কবি বলিয়াছেন—

মোটা খাব ভাইরে পরবো মোটা
চাইনে ল্যাভেণ্ডার চাইনে অটো।

অনেকেই বলিবেন, ম'শায়, এই 'বৈষ্ণব-সুলভ মনো-বৃত্তিই' আমাদের পরাধীনতার কারণ। আমরা কি... এই বিশ্বের আন্দোলনের বাহিরে থাকিব? আমরা... কেন নিজেকে বঞ্চিত করিব? 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—আমরা বীরের মত উপার্জ্জন করিব এবং মুক্তহস্তে ব... করিব। টাকার অন্বেষণে আমরা পাগল হইব—কবি... মত আমাদেরও মন্ত্র হইবে—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে মগার মত পড়ি... থাকিব না—"আগে চল আগে চল ভাই।"

ইহাদের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত... ইহারা বিশ্বময় তোলপাড় করিতে প্রস্তুত। আম... কিন্তু বলি—বাহিরে যাইতে হইবে না—আমার ব... মায়ের মাটিতেই সোণা আছে—ক্ষেত্রও আছে। অ... খানেই অর্থ সৃষ্টি করিতে হইবে। বিশ্বময় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ান খুব সাধু ও মহান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আগে 'ঘর সামলান'ই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ। বাংলায় জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে, চাষী নাই; শিল্প আছে শিল্পী নাই; ক্ষেত্র আছে মানুষ নাই—ফলন নাই। গ্রামে গ্রামে শিল্প অর্থাভাবে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে। গোজাতি লোপ পাইতে বসিয়াছে। জাঁতা, ঘানি বন্ধ হইয়া গেল। আমরা টাকা টাকা করিয়া নগর হইতে নগরে ছুটিতেছি; কিন্তু টাকা যে গৃহ কোণেই লুকাইয়া আছে, ইহা জানিয়াও জানিতে চাহিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম—'তোরা ঘরের পানে তাকা'

(ক্রমশঃ)

অজীর্ণ রোগের কারণ ও প্রতিকার

অজীর্ণ রোগের সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্য সমাচারে কত সহস্রবার যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই রোগ এত বহুবিস্তৃত, এত অসংখ্য লোক এই রোগে ভুগিতেছে, যে, ইহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

কেবল আমাদের দেশে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ত এই রোগে কষ্ট পাইতেছে। এক মাত্র আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে ইহার প্রসার কতখানি, তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমেরিকার এক পেটেন্ট ঔষধের কারখানার মালিকরা কেবল মাত্র অজীর্ণ রোগের পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের জন্য বৎসরে ৪ লক্ষ ডলার খরচ করেন। এক ডলার আমাদের প্রায় সওয়া তিন টাকার সমান। সুতরাং ইহাদের কারবার কত বড়, অজীর্ণ রোগের ঔষধের কাট্‌তি কেমন, কত রোগী এই পেটেন্ট ঔষধটি ব্যবহার করে, তাহা আপনারা মনে মনে একটা আনুমানিক হিসাব করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন।

অজীর্ণ রোগ হয় কেন?

এত লোকে যে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়, তাহা শুধু নিজেদের বুদ্ধির দোষে। একটু হিসাব করিয়া চলিলে, খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু বিবেচনা করিয়া চলিলে এই রোগ কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না। মানুষ নিজের শরীরের উপর যত রকম অত্যাচার করিতে পারে, তাহার মধ্যে পাকস্থলীর উপর অত্যাচারের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অজীর্ণ রোগটা আর কিছু নয়—যাহা আহার করা যায়, পাকস্থলীতে তাহা জীর্ণ হয় না, পাকস্থলী তাহা পরিপাক করিতে পারে না। কাজেই পাকস্থলী অযথা ভারাক্রান্ত, শ্রান্ত হইয়া পড়ে। জীবনে কখনও অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায় নাই—পৃথিবীতে এমন লোক একজনও নাই বলিলেও বোধ হয় বেশী বলা হয় না।

অজীর্ণ রোগের লক্ষণ।

পেট ভার-ভার, পেট-ফাঁপা, উদরে বায়ুর প্রকোপ, অপান বায়ুর উৎপত্তি, চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা, বুকজ্বালা, উদ্গার, গলনালীতে অম্লস্বাদের অনুভূতি, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা ময়লা ও জিহ্বায় জড়তা, প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখে বিশেষতঃ দন্তে দুর্গন্ধ, পেটব্যথা, পেট কামড়ানো, মেরুদণ্ডে কোমরের কাছে বেদনা, গা-বমি-বমি করা প্রভৃতি অজীর্ণ রোগের কতকগুলি লক্ষণ। এই সকল লক্ষণই যে একেবারে দেখা যায়, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে একটী, দুইটী বা কয়েকটী একসঙ্গে দেখা দিতে পারে; এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখা যাইবে—অজীর্ণতাই তাহাদের মূল কারণ।

চিকিৎসার দুরবস্থা।

কিন্তু লোকে তাহা বোঝে না। উপরিউক্ত লক্ষণগুলির কোন একটী বা দুইটি দেখা দিলে, তাহাকে একটী স্বতন্ত্র রোগ ভাবিয়া লোকে কেবল সেই লক্ষণটির বা লক্ষণগুলির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়,—নানা ঔষধ সেবন করিতে থাকে। অথচ, কিয়ৎক্ষণের জন্য যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ হ্রাস ছাড়া স্থায়ী কোন উপকার পায় না। কাজেই এক ঔষধের পর আর একটা ঔষধ এই ভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু উপকার পাইবে কোথা হইতে? চিকিৎসা হয় শুধু একটা লক্ষণের; রোগের মূল কারণে হাত পড়ে না। কাজেই কোন উপকারও হয় না।

আবার, রোগী যত, বৈদ্য তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী। একজনের দেহে অজীর্ণ রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার পরিবারের প্রত্যেক লোকে, তাহার প্রত্যেক পরিচিত লোক, তাহার প্রত্যেক বন্ধু-বান্ধব একটা না একটা ঔষধের নাম করিয়া তাহা ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিবেই। সংসারে এইরূপ সবজান্তা লোকেরও যেমন সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ বিশেষ ঔষধেরও সংখ্যা করা যায় না। আর রুগ্ন ব্যক্তির অবস্থা তখন "Any port in the storm"। কোন ঔষধেই উপকার পায় না বলিয়া, রোগের যন্ত্রণায়, যে যা ঔষধ ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেয়, সেও বিনা বিচারে তাহাই সেবন করিয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, এই সকল ধন্বন্তরির প্রেসক্রিপ্সনে কোন উপকার ত হয়ই না, পক্ষান্তরে, তাহাতে অপকার যথেষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তারী মতে অজীর্ণ স্থলে আফিম, oxalate of cerium, বিসমাথ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধে কিয়ৎক্ষণের জন্য রোগের যন্ত্রণা হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ইহা হইতে, রোগের উপশম হইয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল। ঐ সকল ঔষধ ক্ষণকালের জন্য পাকস্থলীকে অসাড় করিয়া ফেলায় রোগের যন্ত্রণা কিয়ৎক্ষণের জন্য অনুভূত হয় না মাত্র। আসল অজীর্ণ রোগ বা তাহার কোন লক্ষণের উপশম করিবার ইহাদের একটুও সামর্থ্য নাই। পুনঃ পুনঃ এই ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে পাকস্থলী অবশেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং রোগ পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর আরোগ্য লাভের কোন আশাই থাকে না।

অবসাদক ঔষধ ব্যবহারে যখন আর কোন উপকারই পাওয়া যায় না, তখন 'উত্তেজক' ঔষধ, যথা আসেনিক, নক্স ভমিকা, কিম্বা ষ্ট্রীকনাইন প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তখন রোগীর অবস্থা দাঁড়ায় ঠিক- "from the frying pan to the fire"। অবসাদক ঔষধ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করার ফলে পাকস্থলী ও তদানুষঙ্গিক যন্ত্রাদি যখন অবসন্ন, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখনই কি না এই সকল বিষগুণসম্পন্ন ঔষধ ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়! ইহার ন্যায় অবিবেচনার কার্য্য আর কি হইতে পারে? উত্তেজক ঔষধে ক্ষণকালের জন্য শারীর যন্ত্রগুলি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা ত অজীর্ণ রোগের ঔষধ নয়; কাজেই রোগ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে; তাহার উপর পাকস্থলীকে অযথা উত্তেজিত করায় যখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন রোগীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুস্থ শরীরেই এই সকল উগ্রবীর্য্য ঔষধ জীর্ণ করা কঠিন। তাহার পরিবর্ত্তে এখন রুগ্ন, দুর্ব্বল, কাহিল অবস্থা!

অজীর্ণ রোগের তৃতীয় শ্রেণীর ঔষধগুলি ক্ষারগুণসম্পন্ন, যথা, সোডা, ম্যাগনেশিয়া প্রভৃতি। যেখানে অজীর্ণতার ফলে অম্লোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়, তথায় ক্ষারগুণসম্পন্ন ঔষধে অম্লনাশ করে বটে, কিন্তু এই সকল ক্ষারধর্ম্মী ঔষধগুলিকে জীর্ণ করিবার জন্য আরও অধিক পরিমাণে অম্লধর্ম্মী পাচক রস বাহির হইয়া আসে। ফলে হিতে বিপরীত অবস্থা ঘটে। খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জে, এফ, কেলগ পরীক্ষা দ্বারা এই সত্যটি অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পেটেণ্ট ঔষধ।

ইহার পর রোগী হতাশ হইয়া পড়ে। তখন সে যে কোন পেটেণ্ট ঔষধের খবর পায়, তাহাই কিনিয়া আনিয়া সেবন করিতে থাকে। পেটেণ্ট ঔষধের লিষ্টের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতে পারিবেন যে, এই সকল পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিবার মশলাগুলি অতি সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস। কোনটা হয় ত কিঞ্চিৎ খড়ির গুঁড়া, কিঞ্চিৎ পুরাতন গুড়ো কালো মাতগুড়, কিম্বা ঐরকম কোন কিছু। এই সব ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যয় দুই এক পয়সার বেশী কিছুতেই নহে, অথচ, ইহারা একটাকা দেড়টাকা দামে স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যায় কেবল সুদৃশ্য শিশি বা কৌটা, সুদৃশ্য লেবেল ও মনমজানো বিজ্ঞাপনের জোরে। যদি গুণের জোরে এই সকল ঔষধকে বাজারে চলিতে হইত, তাহা হইলে দুইচারি দিনের মধ্যে ইহাদের বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইত। কোন ঔষধ কিছু দিন চলিবার পর যদি তাহার বিক্রয় কমিয়া আসে, তবে সেই জিনিসই নূতন নামে, নূতন ধরণের লেবেলে সজ্জিত হইয়া ভিন্ন ঠিকানা হইতে বাহির হয়, এবং এইভাবে আরও কিছু দিন চলিয়া থাকে। ইহাদের নামগুলি এমন গালভরা ও শ্রুতিসুখকর যে, স্থায়ী অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের কর্ণে ইহা মধু বর্ষণ করে। ইহাদের লেবেলের নক্সাও অতি সুন্দর। এবং বিজ্ঞাপনে ইহাদের গুণ বর্ণনা বঙ্কিম বাবুর আয়েসার রূপ বর্ণনাকেও হারাইয়া দেয়।

অজীর্ণ রোগের সুচিকিৎসা।

অজীর্ণ রোগীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ একই কারণে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং একই ঔষধে সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ আরাম হইতে পারে না। অথচ, পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে ঔষধের গুণ এমন ভাবে বর্ণনা করা হয়, যেন তাহা ব্যবহার করিলে "জুতা গড়া হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত" সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ আরাম হইতে পারে; এমন কি, গোরু হারাইলেও পাওয়া যায়।

অজীর্ণ রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে শুধু লক্ষণগুলির চিকিৎসা করিলে কোন উপকার পাওয়া যায় না—একেবারে গোড়া ধরিয়া টান দিতে হয়; অর্থাৎ যে স্থলে যে কারণে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থলে সেই কারণ সর্ব্বাগ্রে নিবারণ করিতে হয়। অতএব প্রথমে দেখিতে হইবে, অজীর্ণ রোগ হয় কেন? তার পর তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে।

অজীর্ণ রোগের মূল কারণ—পাকস্থলীর উপর অযথা অত্যাচার। যা' তা' ঔষধ খাওয়াও পাকস্থলীর উপর একটা অত্যাচার বটে। এই অত্যাচার দমন করিতে হইবে—প্রথমেই খাদ্য বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। সুবিবেচনা পূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিলে কিছু দিনের মধ্যেই অজীর্ণ রোগ অনেকটা উপশম হইয়া আসিবে।

অজীর্ণ রোগের কারণ

একটা নয়—অনেক। সকল লোকেরই ঠিক একই কারণে অজীর্ণ রোগ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। অতএব অজীর্ণ রোগের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে রোগীকেই তাহা করিতে হইবে। আহার্য্য দ্রব্য, আহারের নিয়ম, আহারের সময়, পাকস্থলীর বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং ইহার ফলাফলও লক্ষ্য করিতে হইবে। চিকিৎসক মোটামুটি কয়েকটি উপদেশ দিতে পারেন। তদনুসারে চলিলে অজীর্ণ রোগের কারণ সহজেই ধরিতে পারা যাইবে। তখন উহার প্রতিকারও সহজসাধ্য হইয়া আসিবে।

খাদ্য গ্রহণের প্রণালী—

১। তাড়াতাড়ি আহার।

আফিসের কেরাণীবাবু, স্কুল কলেজের ছাত্র, ডেলি-প্যাসেঞ্জার প্রভৃতি শ্রেণীর লোককে বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে আহার করিতে হয়। সময়ের তাড়া না

থাকিলেও অনেকে আবার স্বভাব-দোষে তাড়াতাড়ি আহার করে। খুব গরম ভাতে খুব গরম ডাল বা ঝোল খানিকটা ঢালিয়া লইয়া সপ্‌সপে করিয়া মাখিয়া এক এক গ্রাস মুখে তুলে এবং একটু গরম তরকারী টাক্‌না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভাতের গ্রাস গিলিয়া ফেলে—মোটেই চিবায় না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—গম যেমন যাঁতায় কিম্বা রোলার মিলে ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া আটা ময়দা প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্রূপ ভাতও সূক্ষ্মভাবে গুঁড়াইয়া না লইলে তাহা তাড়াতাড়ি উদরস্থ করিলেও পরিপাক করা যায় না। আমাদের যে দুই পাটী সুদৃঢ় দন্ত আছে, তাহাকে যাঁতা বলিতে পারা যায়। সেই যাঁতায় ভাতগুলিকে পিষিয়া সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। তবে ভাত জীর্ণ করিবার উপযোগী হয়। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিলে, উহা প্রকৃতপক্ষে খাদ্যে পরিণত হয় না। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ কালে, মুখের ভিতর যে রস সঞ্চার হয় তাহা শুধু যে খাদ্যকে তরল করিয়া গলাধঃকরণের উপযোগী করে, তাই নয়—কার্ব্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে উহা কতকটা জীর্ণ করিয়া ফেলে। বিনা চর্ব্বণে খাদ্য গিলিয়া খাইলে উহা পাকস্থলীতে গিয়া পাচক রসে জীর্ণ হইতে পারে না।

আমাদের এই দেহটী একটী প্রকাণ্ড রসায়নাগার বা ল্যাবরেটরী। এখানে নিয়ত রাসায়নিক যোগ-বিয়োগ চলিতেছে। খাদ্য পাচক রসের সহযোগে জীর্ণ হইয়া রূপান্তরিত হইয়া শরীর-পোষণের উপাদান সৃষ্টি করিতেছে। মানব-দেহে কি ভাবে রাসায়নিক কার্য্য চলে, তাহা একটা দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন।

আপনি এক টুক্‌রা খয়ের লউন। আর এক ডেলা শুষ্ক চূণ লউন। দুইটী জিনিস পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করুন। তার পর দেখুন, উহাদের কোন রূপান্তর হইল কি না। দেখিবেন, কোনই রূপান্তর হয় নাই। আপনি ইচ্ছা করিলেই খয়েরের ডেলা ও চূণের ডেলা পৃথক করিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি যদি খয়েরের ডেলাটীকে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া লয়েন, এবং চূণের ডেলাটিকেও জলে ভিজাইয়া চূণের জল প্রস্তুত করিয়া লয়েন, তাহা হইলে খয়েরের জল ও চূণের জল পরস্পর মিশ্রিত করিলেই চূণ ও খয়ের রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন আর আপনি ইচ্ছা করিলেই চূণ ও খয়েরকে পৃথক করিয়া লইতে পারিবেন না। পানে চূণ মাখাইয়া তাহার এক টুক্‌রা খয়ের ও কিঞ্চিৎ সুপারি দিয়া পান সাজিয়া রাখা হইল। ইহাতে চূণ বা খয়েরের কোন রূপান্তর হইল না। ইচ্ছা করিলেই পান খুলিয়া খয়েরের ডেলা তুলিয়া লইতে পারা যায়; এবং পান হইতে চূণটুকু মুছিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু পানটী মুখে পুরিয়া কিছুক্ষণ চর্ব্বণ করিলে খয়েরের ডেলা চূর্ণ হইয়া লালার সহিত মিশিয়া চূণের সঙ্গ রাসায়নিক ভাবে মিশিয়া হইয়া রূপান্তরিত হইবে—লাল টুক্‌টুকে হইয়া উঠিবে।

খাদ্য সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা। চর্ব্বণ করিয়া লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার যথোচিত রূপান্তর ঘটাইয়া উহাকে পাকস্থলীতে প্রেরণ না করিলে পাকস্থলীর পাচক রসগুলি উহাকে জীর্ণ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া শরীরকে অযথা পীড়িত ও উৎপীড়িত করিবে মাত্র। অবশেষে উহা যথাকালে মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপ অচর্ব্বিত খাদ্য শরীর পোষণে কোনই সহায়তা করে না, অধিকন্তু, পাচক রস উহাকে জীর্ণ করিতে অপারগ হওয়ায় অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন করে। এখন বুঝিয়া দেখুন, এরূপ অবস্থায় ঔষধ কেমন করিয়া অজীর্ণ রোগ নিবারণ করিতে পারে? এই কারণে যাহার অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, সে যদি ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, বিনা চিকিৎসায় তাহার অজীর্ণ রোগ আপনা আপনি আরাম হইয়া আসিতেছে।

২। গুরু ভোজন।

পেটুক ব্যক্তিরা লোভে পড়িয়া বেশী খাইয়া পরিণামে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হয়। পাকস্থলীতে

সীমাবদ্ধ, পাচক রসের পরিমাণ এবং হজমী শক্তিও সীমাবদ্ধ। কিন্তু পেটুকেরা সর্ব্বদা ইহার অধিক খাদ্যে পাকস্থলী বোঝাই করিয়া রাখে। কাজেই তাহা হজমও হয় না। সুতরাং রোগও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত খাদ্য জীর্ণ করিবার চেষ্টায় অতিরিক্ত পরিশ্রমে পাকস্থলী অবসন্ন, নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বেশী পরিমাণে খাওয়া যেমন দোষের, খুব ঘন ঘন খাওয়া ঠিক সেই রকম দোষের। একবারে গৃহীত খাদ্য জীর্ণ হইয়া শরীরে শোষিত হইবার পর পাকস্থলীকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিতে হয়। তা না দিয়া তৎপূর্ব্বে পুনরায় ভোজন করিলে অজীর্ণ উৎপন্ন না হইয়া যায় না।

কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন সাধারণ নিয়ম স্থির করা যায় না। আবহাওয়া, ঋতু এবং আরও অনেক আনুষঙ্গিক অবস্থার উপর খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং একজনের পক্ষে যাহা লঘু আহার, অপর একজনের পক্ষে তাহাই হয় ত গুরু আহার হইয়া পড়িতে পারে। তবে সকলের পক্ষেই যে নিয়ম সমানভাবে খাটিতে পারে তাহা এই যে, কিছু ক্ষুধা থাকিতে আহারে নিবৃত্ত হওয়া। আহার শেষ হইয়া আসিবার সময়, যখন মনে হইবে আরও কিছু খাইতে পারা যায়, এমনি সময় আহার বন্ধ করিতে হইবে। তবে অবশ্য পেটুকদের কথা স্বতন্ত্র। পূর্ণ আহার করিবার পর, যখন পেটে আর এককণা খাদ্য ধারণেরও স্থান নাই, এমন অবস্থাতেও তাহারা মনে করে যে, তাহাদের পেট সম্পূর্ণ ভরে নাই—আরও কিছু পাইলে ভাল হয়। এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে কোন নিয়মই খাটে না। কিছু ক্ষুধা থাকিতে আহারে নিবৃত্ত হওয়ার নিয়ম সাধারণ লোকের পক্ষে। কোন খাদ্য খুব রুচিকর হইলেও লোভে পড়িয়া বেশী খাইতে নাই; এ লোভ সম্বরণ করিতেই হইবে।

৩। বহুবার খাওয়া।

দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদের খাদ্য নিয়ম করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। বালক ও যুবকদের দিন চারবার খাইলেই যথেষ্ট—সকালে জলখাবার, মধ্যাহ্নে পূর্ণাহার, অপরাহ্নে জলখাবার ও রাত্র লঘু মাত্রায় পূর্ণাহার। বয়স্ক ব্যক্তিদের দুইবার—মধ্যাহ্নে ও রাত্রে—পূর্ণাহার যথেষ্ট। ইহার অধিকবার আহার করা অজীর্ণ রোগকে ইচ্ছা করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনা মাত্র। অনেকের অভ্যাস আছে—যখন তখন খাওয়া। খাদ্য জুটিলেই কোন বিষয় বিবেচনা না করিয়া খাওয়া। বলা বাহুল্য, এইরূপ ভোজনের ফল—পাকস্থলীকে অতিশ্রমে ক্লান্ত করিয়া ফেলা।

৪। দুষ্পাচ্য খাদ্য।

সকলের দেহে সকল খাদ্য সহ্য হয় না। সাধারণতঃ পুষ্টিকর বলিয়া পরিচিত খাদ্যও অনেকে হজম করিতে পারে না। কোন কোন খাদ্যে কাহারও কাহারও পাকস্থলীর একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা দেখা যায়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ খাদ্য তাহার সহ্য হয় না। এরূপ লোকের খাদ্য নির্ব্বাচন সাবধানে করা কর্ত্তব্য। যাহা তাহার সহ্য হইবে না, সে খাদ্য গ্রহণ না করাই ভাল। আবার কোন কোন খাদ্য সকলের পক্ষেই সমান দুষ্পাচ্য। এরূপ খাদ্য কাহারও গ্রহণ করা উচিত নহে। রন্ধনের দোষে খাদ্য দুষ্পাচ্য হইয়া পড়িতে পারে। অধিক মশলা দেওয়া, অর্দ্ধ সিদ্ধ, অপক্ক খাদ্য সকলের পক্ষেই দুষ্পাচ্য। খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য বেশী মশলা দেওয়ার অন্য অসুবিধাও আছে—লোভে পড়িয়া গুরু ভোজন করিতে হয়। যাহারা নিত্য দুষ্পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া অজীর্ণ রোগে পীড়িত হয়, তাহাদের খাদ্য সংস্কার না করিয়া, হাজার চিকিৎসা করিলেও কোন ফল ফলিবে না। দুষ্পাচ্য খাদ্য খাইতে থাকিলে, দেহটিকে ডিসপেপ্সারীতে পরিণত করিয়াও অজীর্ণ রোগের হাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না।

৫। বিরুদ্ধ ভোজন।

অজীর্ণ রোগের আর একটি কারণ—বিরুদ্ধ ভোজন। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী খাদ্য একসঙ্গে ভোজন করিলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। কয়লা, গন্ধক ও সোরা যতক্ষণ আলাদা আলাদ থাকে, ততক্ষণ তাহারা নিরাপদ। কিন্তু চূর্ণ আকারে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রিত হইলে গান্ পাউডার বা বারুদরূপে ভয়ানক বিপদজনক বস্তু হইয়া উঠে। সেইরূপ, অনেক খাদ্য আছে, যাহা উদরস্থ হইয়া মিশ্রিত হইলে, এবং তাহাতে পাচক রস সংযুক্ত হইলে বারুদের ন্যায় বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে। আবার, আরও এক রূপে খাদ্য পরিপাক হওয়ার বিরোধী হইয়া উঠিতে পারে। যে খাদ্য যখন ভোজন করা যায়, তখন সেই খাদ্য জীর্ণ করিবার উপযোগী পাচক রস নিঃসৃত হয়। মনে করুন, মাংস ভোজন করিলে তাহা জীর্ণ করিবার জন্য একপ্রকার পাচক রস নিঃসৃত হয়। আবার দুগ্ধ পান করিলে প্রথমোক্ত পাচক রসের ঠিক বিপরীত ধর্ম্মী আর একপ্রকার পাচক রস নির্গত হয়। এই দুইপ্রকার পাচক রসের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য হয় না। কাজেই মাংস ও দুগ্ধ একত্র ভোজন করা নিষিদ্ধ; করিলে, শরীরের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

কোন্ কোন্ খাদ্য এক সঙ্গে ভোজন করিলে বিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রকাশ পায়. তাহার তালিকা অতি দীর্ঘ—বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়, এবং সুবিধা হইলে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে।

অাহারকালে কদভ্যাস।

আহারের সময় অত্যধিক জল পান করায় পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। আমাদের অধিকাংশ খাদ্যই তরল; সেই খাদ্যে যে পরিমাণ জল থাকে পরিপাকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তাহার উপর আহার কালে শুধু জল আর পান না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। খুব গরম গরম খাবার খাওয়া, গরম খাদ্য খাইবার অব্যবহিত পরেই বরফ দেওয়া জল পান করা—এ সকলই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনক, এবং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

পরলোকে স্যাণ্ডো

(Eugen Sandow)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

অকালে—মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে—বীর স্যাণ্ডো গত ১৪ই অক্টোবর তারিখে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শরীর-চর্চ্চার বিশেষ ক্ষতি হইল।

স্যাণ্ডোর জীবন-কাহিনী অতীব বিস্ময়জনক। রাইট অনারেবল টি, পি, ওকোনার এম-পি, (Right Honorable T. P. O'conner M. P.) মহাশয় তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ লিখিয়াছেন— His life was a romance. He was of mixed parentage: Russian on the father's and German on the mother's side. জাতিতে জার্ম্মাণ এই বীর কিরূপে ইংলণ্ডের এবং পরিশেষে সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কাহিনী একাধারে শিক্ষাপ্রদ ও চমকপ্রদ।

বাল্যে স্যাণ্ডো কৃশকায় ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি নিজে পরবর্ত্তী জীবনে বলিয়াছিলেন যে, "I was a pale and even a weakly child." স্যাণ্ডোর পিতা

তাঁহাকে রোমে আনয়ন করেন; সেখানে একটী গ্রীক্ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ পুষ্ট, সুদর্শন ও শক্তিশালী হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পরে ক্রমাগত শরীর-চর্চ্চা ও সাধনার ফলে এই কৃশকায় বালক বীর স্যাণ্ডো হন। আমাদের এই শক্তিহীনের দেশে বীর স্যাণ্ডোর জীবন-কথা প্রচারিত হইলে, শরীরের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্মিতে পারে, এই আশায়ই এই জীবনী-আলোচনা।

অতঃপর স্যাণ্ডো শারীর বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কি করিয়া স্যাণ্ডো ইংলণ্ডে পরিচিত হইলেন সে কাহিনীও অতীব বিস্ময়কর।

তখন প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে কুস্তিগীরদিগের প্রতিযোগিতা হইত। ইংলণ্ডে তখন সামসনের (Samson) এর খুব নাম। সামসন ও তাঁর শিষ্য Cyclops তখন নূতন প্রদর্শনীতে প্রতি রজনীতে তাঁহাদের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় জ্ঞাপক ব্যায়ামাদি দেখাইতেন। এক দিন Samson গর্ব্বভরে সকলকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কে আছ যুবক, আমার সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হও।" বিরাট জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ—কাহারো মুখে শব্দ নাই! এমন সময় এক বলিষ্ঠ, সুদর্শন, ভীমকান্তি যুবক, রঙ্গভূমে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সহিত লড়িব।" দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিল। পরে যথা সময়ে—নির্দ্দিষ্ট দিনে স্যাণ্ডো বীর সামসনকে সশিষ্য পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডে ও জগতে সুপরিচিত হইলেন।

স্যাণ্ডো একবার ভারতে আগমন করেন। কলিকাতায় তাঁহার অদ্ভুত ব্যায়াম দেখিবার জন্য লোকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। তদনুসারে "থিয়েটার রয়ালে" (Theatre Royal) একাধিক রজনীতে তিনি সমগ্র ভারতের পালোয়ানদিগের সমক্ষে নিজ শৌর্য্যের পরিচয় দেন। তাঁহার ও তাঁর স্ত্রীর আদর্শ লইয়া বহু বাঙ্গালী সেই দিন হইতে শরীর-চর্চ্চায় মন দেন। অতঃপর এই দেশে স্যাণ্ডো-আবিষ্কৃত Spring Dumbellsএর খুব প্রচলন হয়।

স্যাণ্ডো পেশাদার সার্কাসওয়ালা ছিলেন না। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। শারীর-বিজ্ঞানে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি নিজে এক বিশিষ্ট ব্যায়াম-প্রণালী আবিষ্কার করেন। উক্ত প্রণালী সর্ব্বসাধারণের উপযোগী এবং অল্পব্যয়সাধ্য। ঘরে বসিয়া বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও যুবতী সকলেই স্যাণ্ডোর প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে ব্যায়াম করিতে পারেন। স্যাণ্ডো পরবর্ত্তী কালে একটী শরীর-সাধনার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে সস্ত্রীক উহাতে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাত্র ও ছাত্রী বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষালাভ করেন।

স্যাণ্ডো সর্ব্বদা বলিতেন যে, স্বাস্থ্যবানের দেহে রোগের এক্তিয়ার নাই—Healthy body is non-conductor to disease আমাদের দেশের কোটর-গতচক্ষু, "মাথায় ছোট, বহরে বড়" বাঙ্গালী বীরেরা স্যাণ্ডোর এই সার বাক্য গ্রহণ করিয়া শরীর চর্চ্চায় মন দিলেই স্যাণ্ডোর যথার্থ স্মৃতিপূজা হইবে।

স্বাস্থ্য নিবাসের স্বাস্থ্য।—কঠিন রোগে, কিম্বা চিকিৎসায় তেমন ফল দেখা না গেলে, চিকিৎসকগণ অনেক সময় রোগীকে হাওয়া বদলাইতে অর্থাৎ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছু দিন বাস করিতে পরামর্শ দেন। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীতও অনেক লোকে সখ করিয়া বা অসুস্থ শরীর

সারাইবার জন্য কিম্বা স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় কিছু দিন বিশ্রাম করিবার জন্য "চেঞ্জে" গিয়া থাকেন। এইভাবে দার্জিলিঙ, দেওঘর, রাঁচি, নৈনিতাল, মধুপুর, সীমুলতলা, ওয়ালটেয়ার, গিরিডি, পুরী প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্য নিবাসে (health resort এ) পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা স্বাস্থ্য লাভার্থ এই সকল স্থানে যান, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন, কেহ বা মারাও গিয়া থাকেন। সুস্থ শরীরে কেবল বিশ্রাম লাভার্থ যাঁহারা হাওয়া বদলাইতে যান তাঁহাদের কথা ধরি না, কিন্তু এমন অনেক রোগী স্বাস্থ্য নিবাসে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়া আসেন, যাঁহাদের রোগ সংক্রামক রোগের তালিকাভুক্ত, যেমন যক্ষ্মা রোগী। এই ধরণের রোগী যে সকল স্থানে কিছু দিন বাস করেন, তাঁহারা নিজেরা সুস্থ হইয়া উঠিলেও, সেই স্থানটি তাঁহাদের দেহ পরিত্যক্ত রোগবীজে দূষিত হইয়া উঠে। তার পর তাঁহারা সেখান হইতে চলিয়া গেলে হয় ত অপর কোন সুস্থ লোক সেই বাড়ী ভাড়া লইয়া কিছুদিন বাস করিতে করিতে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন, এবং খুব সম্ভব হয়েনও। স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিকরা প্রায়ই স্থানান্তরে বাস করিয়া থাকেন। হয় ত তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারী কিম্বা কোন প্রতিবাসী ঐ বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায়, কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন বাড়ীতে কিছু দিন বাস করিয়া রোগবীজ সংক্রামিত করিয়া চলিয়া যাইবার পর ঐ সকল বাড়ী রীতিমত ধৌত ও ঔষধাদির দ্বারা বিশোধিত হয় কি না সন্দেহ স্থল। এরূপ প্রবাসে অস্থায়ী ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলির উপর সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত আইনের প্রভাব কতখানি, এবং সে প্রভাব রীতিমত পরিচালিত হয় কি না, তাহাও বিবেচ্য। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এবং স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত—একজন ভাড়াটিয়া উঠিয়া গেলে বাড়ীখানি রীতিমত সংশোধিত করাইবার জন্য এবং সম্ভব হইলে একবার কলি ফিরাইবার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করা। এবং স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিদের উচিত—পূর্ব্ববর্ত্তী ভাড়াটিয়া কোনরূপ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ছিল কি না, এবং সে উঠিয়া যাইবার পর বাড়ী সংশোধিত হইয়াছে কি না তাহার খোঁজ লওয়া এবং বিনা সংশোধনে এরূপ বাড়ীতে বাস করিতে না যাওয়া।

পর্দ্দার নিন্দা।—

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সুযোগ পাইলে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের নিন্দা না করিয়া জল গ্রহণ করে না। নিন্দা করা উহাদের স্বভাব—উহারা নিন্দক। কাজেই তাহাদের কথায় প্রতিবাদ না করিলেও হানি ছিল না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদ না করাই অন্যায়। কলিকাতা কর্পোরেশনের তরফ হইতে দুই একটা ক্ষয়রোগের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। একদল লোক এই প্রস্তাব বলিতেছেন, পর্দ্দানশীন মেয়েদের জন্য কোন ব্যবস্থা হইতেছে না—ইহা বড় দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁহারা যে পর্দ্দা প্রথার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন যেখানে একটী যুবকের যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হয়, সেখানে এই রোগে পাঁচটি যুবতী মারা গিয়া থাকে। এবং অনুপাতে এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? না পর্দ্দা প্রথা! কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভুল—একেবারে ভুল। এই ১:৫ হিসাবে মৃত্যু কেবল সহর অঞ্চলেই ঘটিয়া থাকে—মফস্বলে অবস্থার সন্ধান লইলে হিসাবে অনুপাত ঠিক উল্টাইয়া যাইবে। অথচ পর্দ্দা প্রথা কেবল সহরে প্রথা নয়—উহা সমগ্র দেশব্যাপী—সমগ্র সমাজব্যাপী প্রথা। এই প্রথাটাই যদি রোগের কারণ হইত, তাহা হইলে রোগে সর্ব্বত্রই মৃত্যুর অনুপাত একই রকম হইত। কিন্তু তাহা ত নয়। সুতরাং মৃত্যুর কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে অর্থাৎ সহরের ঘনবসতিই এই রোগের জন্য দায়ী। এই ভাবে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো হয় বলিয়াই প্রকৃত পক্ষে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না—সমস্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সদনুষ্ঠান গোলে হরিবোল দিয়া কাটিয়া যায়। সহরের ঘনবসতি কেবল যক্ষ্মার কারণ তাহা ত নয়—আরও অনেক রোগের (যেমন প্লেগ) কারণ। নচেৎ ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গড়িয়া সহর ভাঙ্গিয়া সহরবাসীকে উদ্বাস্ত করিতে হইত না।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৩২ সাল { ১০ম সংখ্যা

শক্তির অপব্যবহার

[শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল]

কর্ম্মময় জীবন আমাদের। মুহূর্ত্তমাত্র আমাদের কর্ম্ম না করিয়া থাকার উপায় নাই। যখন আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া অলসভাবে কালযাপন করিতেছি, যখন আমরা স্থির, নিশ্চল, মনে হয় কোন কাজই করিতেছি না, তখনও আমাদের অজ্ঞাতে আমরা কত কাজ করিতেছি—তখনও আমাদের কত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। দৈহিক কাজ হইতে যখন আমরা বিরত থাকি, তখনও আমরা নিষ্কর্ম্মা থাকি না, মানসিক কাজ অর্থাৎ চিন্তার কার্য্য সততই চলিতে থাকে। এইজন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আমাদের জীবনের চারি ভাগের তিন ভাগ কাজই এই চিন্তা-জগতের মধ্যে। দৈহিক কাজ যখন চলিতে থাকে, তখনও আমাদের মন নিশ্চেষ্ট থাকে না। পরন্তু যখন দৈহিক কাজ হইতে বিরত থাকি, তখন মনের কাজ আরও দ্রুতভাবে হইতে থাকে। সুতরাং জীবন-সংগ্রামে যে শক্তি আমাদের অহরহ ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তাহা দৈহিকভাবেও যেমন মানসিকভাবেও তেমনি। কিন্তু হায়! দৈহিক কাজ ও শক্তি ব্যয়ের কথা যদিও আমরা সময়ে সময়ে চিন্তা করিয়া উহার সদ্ব্যবহারের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু মানসিক শক্তিব্যয় ও চিন্তা-জগতের কাজের কথা, যাহা দৈহিক অপেক্ষাও অনেক গুণে বেশী, তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই একেবারে উদাসীন।

দৈহিক কাজ অপেক্ষা মানসিক কাজের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। কোন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন—"All that we are, is made up of our thoughts ; it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts." আমাদের চিন্তা দ্বারাই আমরা গঠিত, চিন্তার উপরে আমরা প্রতিষ্ঠিত, চিন্তাই আমাদের জীবন। সুতরাং এই চিন্তাশক্তি ব্যয়ের সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে

সত্যই বিস্মিত হইতে হইবে যে, কত অপরিমিত শক্তিই আমাদের এক একটী জীবনে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। যদি ইহার সদ্ব্যবহার হইত, যদি যথাবিচারে মূল্যবান কাজে সেই শক্তি ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ কত সাফল্যে মণ্ডিত করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! নিষ্ফল চেষ্টাতে, বৃথা কাজেই সে শক্তির অধিকাংশ এবং অনেকের জীবনে প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হয়; শেষে যখন পরিণত অবস্থায় সংসার হইতে চিরবিদায়ের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হই, তখন অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনুতাপে ও অবসাদে আমাদের সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উঠে। কিন্তু তখন আর সেখান হইতে ফিরিবার বা প্রতীকারের কোন উপায় থাকে না, আদর্শভ্রষ্ট ব্যর্থ জীবন লইয়াই সংসার রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইতে হয়।

আমাদের জীবন-কাল যত ক্ষুদ্র ও যত সীমাবদ্ধই হউক না কেন, তদনুযায়ী আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে তাহা যে যথেষ্ট নয়, তাহা নহে। চাই শুধু জীবনীশক্তির বা কাজের সদ্ব্যবহার করা। জীবনের আদর্শ বা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন এই কার্য্যের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে। আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; এবং প্রত্যেক কার্য্যটী একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিয়া করিলে সকলেই দেখিতে পাইব, কত কাজ বা শক্তির অপব্যবহার রহিত হইলে আমাদের জীবন কত সাফল্যময়, কত মধুময় হইতে পারে।

সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐকান্তিকভাবে ও সম্যক ইচ্ছাশক্তির সহিত সংকল্পিত কার্য্য পরিচালিত না হইলে, সেই কার্য্যে ও কার্য্যশূন্য অবস্থাতে বড় বেশী তফাৎ হয় না। শক্তির অপব্যবহার তাহাকেই বলা যায়। আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ও অন্যবিধ উন্নতিসাধনের জন্য কিছু কিছু দৈহিক কাজ সকলকেই করিতে হয়; কিন্তু এই সকল কাজ আমরা পূর্ণ ইচ্ছার সহিত ও মনঃসংযোগ করিয়া করি না। অধিকাংশ কাজই আমরা করিতে হয় বলিয়া করি, অথবা অভ্যাসবশে কোনমতে করিয়া যাই। তাহার ফল এই হয় যে, ঐ কাজ তেমন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না, অভিপ্সিত ফলও পাওয়া যায় না এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার অভাবে ঐ শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হইতে থাকে। অতি তুচ্ছ কাজও যখন আমরা করি, তখনও আমাদের তাহাতে পূর্ণ মনঃসংযোগ প্রয়োজন। তাহা হইলে একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে এবং ক্রমশঃ শক্তিমান হইয়া আমরা নূতন নূতন কাজে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিব। কাজের গুরুত্ব একটু কম বোধ হইলে এবং কাজ অনায়াসসাধ্য হইলে আমরা তাহা অনেক সময় অন্যমনস্ক ও উদাসীন ভাবেই করি; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ছোট কাজে একাগ্র ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে না পারিলে বড় কাজে আমরা তাহা করিতে পারিব না; সুতরাং আদর্শ হইতে আমাদিগকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হইবে। একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির উন্নতি সর্ব্বতোভাবে অভ্যাসসাপেক্ষ এবং দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজের উপরই তাহার সাধনা নির্ভর করে। একই কর্ম্মক্ষেত্রে একজন উন্নতির চরমস্তরে উপনীত হয়, অন্যজন কিছুই করিতে পারে না, ইহার কারণও এই মনঃসংযোগ ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের তারতম্য। কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি ব্যবসাক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ও অন্যান্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

কোন একটি কাজ করিতে গিয়া যখন আমরা ক্লান্ত ও বিফল-মনোরথ হই, যখন কাজটী ছাড়িয়া ছাড়িব ভাবিতেছি, তখন যদি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভাবিতে পারি "এই কাজের মধ্যে মহাসত্য আছে, ইহা আমাকে করিতেই হইবে, এবং আমি অমৃতের সন্তান, অনন্ত শক্তি আমাতে প্রতিফলিত, আমি অনায়াসেই ইহা করিতে পারিব" তাহা হইলে, পূর্ব্বে যাহা অসাধ্য মনে হইয়াছিল, তাহাও অনায়াসসাধ্য হইবে—একাগ্রতার শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব। ক্ষুদ্র মহৎ সকল কাজেই ইহার পরীক্ষা

আমরা সর্ব্বদা করিতে পারি। তাহা হইলে, এই মাপকাঠিতে যদি এখন আমাদের জীবনের কাজ সকল বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব, কত কাজ আমরা হেলায় নষ্ট করিতেছি, জ্ঞানের অভাবে কত শক্তি আমাদের অপব্যবহৃত ও নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা অনেক সময়ে নিশ্চেষ্ট ও অলসভাবে হাস্য-পরিহাস, বাজে গল্প ও পরচর্চ্চা করিয়া মূল্যবান সময় অতিবাহিত করি। এটা যেন একটা নেশার মত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, সকলেই অল্পাধিক এ দোষে দুষ্ট। সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া গতানুগতিক ভাবে যা তা কাজে মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করি। জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা—কত মহৎ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ইহা কি যথেষ্ট পরিতাপের বিষয় নহে? সুদুর্লভ মনুষ্য জীবন কি নিরর্থক ভোগব্যসনের জন্য? কোন সৎ ও কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা উঠিলে অনেকের মুখেই শুনিতে পাই—"আমার সময় নাই" "ও সব এখন হইয়া উঠে না"। কিন্তু কত সময় আমাদের বৃথা কাজে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। প্রতিদিন ২০ মিনিট করিয়া দৈহিক ব্যায়াম করিলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা মাঠে বা নদীর ধারে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে, এক ঘণ্টাকাল সঙ্গীতাদি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কত রোগ বিড়ম্বনার হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতে পারি। প্রত্যহ এক ঘণ্টা শিল্প বা হস্তকার্য্য অভ্যাস করিলে, একটা জীবনের কত অর্থ-সমস্যার সমাধান হয়। নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ আধ ঘণ্টা মাত্র ভগবানের ধ্যানে নিয়োজিত করিলে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে কত উন্নতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু হায়, শতকরা কয়জনের জীবনে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। "মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ" এটা জানার নামই সত্যবিষয়ক জ্ঞান নহে। যখন মিথ্যা বলা পাপ, সর্ব্বতোভাবে সত্য কথাই বলা উচিত, প্রাণের পরতে পরতে ইহা অনুভব করিব, সুতরাং তদনুযায়ী ইচ্ছা ও কার্য্য স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট হইবে, তখনই বুঝিব যে, সত্য-মিথ্যা ভেদ জ্ঞান আমার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে নহে। আমরা জ্ঞানের অভিমান, শিক্ষার অভিমান কতই করি; কিন্তু যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে পারি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—এই চতুর্ব্বিধ উন্নতি সাধনই মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব, আর ইহার অন্যথাই ঐহিক, পারলৌকিক অশেষবিধ কষ্টের কারণ, যদি এই সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রাণময় হইয়া উঠে, তাহা হইলে এমন এক ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইবে যাহাতে তদনুযায়ী কার্য্য করা একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু হায়, ঠিক সেই জ্ঞানের মত জ্ঞান কয়জনের আছে? জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের কাজকে সেই মাপকাঠিতে অতি নিপুণ ভাবে বিচার করিতে হইবে এবং প্রতি কার্য্যটি ঠিক সেই ভাবে মিলাইয়া করিয়া যাইতে হইবে। এইভাবে বিচার করিয়া কাজ করিলে দেখিবে দৈনন্দিন কার্য্যসমূহের চারিভাগের তিনভাগ কাজই নিরর্থক ও অসার, যাহা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত আমাদের চিন্তার মধ্যেই আসে না এবং যাহা যথারীতি পরিচালনা করিতে আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে সাবধান ও সচেষ্ট হইতে হইবে। তখন দেখিব, সর্ব্বদাই মনের অভ্যন্তরে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। যে কোন দুইটী কার্য্যকে লইয়া বিচার করিতে বসিলে জ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম পরিচালনার প্রয়োজন হইবে এবং এইখানেই আমরা আমাদের নিজত্ব, স্বাধীন ইচ্ছা ও আভ্যন্তরীণ ভগবদ্ শক্তি একত্র উপলব্ধি করিতে পারিব।

তারপর চিন্তা-জগতের কথা। আহারের সময়, শয়নের সময়, রাস্তায় ভ্রমণাদি নানা সময়ে আমাদের চিন্তা-স্রোত অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। আমরা ঐ সব সময় বৃথা স্বার্থ-চিন্তা—হিংসা দ্বেষাদির চিন্তা—অথবা পারিপার্শ্বিক জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির সম্মুখে

যে কোন নৈসর্গিক বিকাশ ধরিয়া দেয় তদনুযায়ী চিন্তা নির্ব্বিচারে করিয়া যাই। কখনও যদিও কোন সুচিন্তা আইসে তাহাও স্থায়ী হয় না, একটী চিন্তা হইতে অন্য চিন্তা Laws of association দ্বারা আমাদিগকে বহুবিধ নিরর্থক চিন্তার ধারার মধ্যে লইয়া যায়। এই চিন্তাতে আমাদের সামান্য শক্তি ক্ষয় হয় না; সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই চিন্তা-স্রোতকে সংযত করিতে হইবে। আহার, ভ্রমণ, শয়নাদি সময়ে, শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষার চিন্তা করিতে পারে, স্বাস্থ্যকামী তাহার স্বাস্থ্যবিষয়ক সংকল্প চিন্তা করিতে পারে,। অর্থ-কামী তাহার অর্থোপার্জ্জনের উপায় ভাবিতে পারে। সকল শ্রেণীর সকল লোকেই ধর্ম্ম-জগতের কথা ভাবিয়া পরম পুণ্যলাভ ও অনাবিল শান্তি উপভোগ করিতে পারে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। কোন বিষয়ে সফলকাম হইতে হইলে সর্ব্বদা আমাদিগকে সেই চিন্তা করিতে হইবে। এই চিন্তা হইতেই সংকল্প ও কৌশল আসিবে এবং সিদ্ধি আমাদের আয়ত্তাধীন হইবে। চিন্তাই কর্ম্মের জন্মদাতা; অবস্থা ও ঘটনাক্রমে মানুষ কর্ম্ম করিবার সুযোগ সকল সময় না পাইতে পারে; কিন্তু তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা বা চিন্তা ঠিক যদি তদনুযায়ী থাকে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মফলের পুরস্কারই চিন্তার ফলে লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য কোন প্রসিদ্ধ নীতিবিদ্ বলিয়াছেন, "The happiness of your life depends upon the quality of your thought."—তোমাদের চিন্তার গুণাগুণের উপরই সুখের তারতম্য নির্ভর করে। বাস্তবিক আমরা যে কার্য্যে বিফল-মনোরথ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র আমাদের চিন্তাশক্তির অপব্যবহার। সকল সাধনা সকল শক্তির মূলই এই চিন্তা। অলস চিন্তার সময় ঘণ্টায় দু'মিনিট করিয়াও সেই সকল চিন্তার মূলাধার সর্ব্ব-শক্তিমানকে একমনে যদি চিন্তা করি, আমাদের অভাব আবেদন জানাই, তাহা হইলেও আমাদের জীবনের অনেক সমস্যাই সহজ হইয়া আইসে এবং ঐহিক, পারমার্থিক কত নির্ম্মল আনন্দ আমরা অনুভব করিতে পারি।

যক্ষ্মারোগ কি নিবার্য্য ব্যাধি?

মানব-সমাজ হইতে যক্ষ্মারোগ দূর করা যায় কি না, যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে মানব-জাতিকে রক্ষা করিতে পারা যায় কি না—ইহাই এখন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক-মণ্ডলীর প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। চিকিৎসক-সমাজ অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, বহু রোগের প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন, অনেক লোকক্ষয়কর ব্যাধির টীকা, ভ্যাক্সিন, সেরাম, এন্টিটক্সিন প্রস্তুত করিয়া রোগের প্রভাব কমাইয়া মানুষকে কতকটা নিরাপদ করিতে পারিয়াছেন। যক্ষ্মারোগের সম্বন্ধে এখনও তেমন কোন আশ্বাসপ্রদ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয় নাই।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। আজি হইতে শত বর্ষ পরে মানব-সমাজে স্বাস্থ্যের অবস্থা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবস্থা, কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিত্য যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ছেলে-খেলা বলিয়াই মনে হয়। অতি প্রাচীন কালে রোগ নিরাময় করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত, বর্ত্তমানকালের তুলনায়, সে সকল কথা স্মরণ করিলে হাসি পায়। তথাপি বলিতে হয়, চিকিৎসক রোগ নিবারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলেও, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কোন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন না। তাহার কারণ, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, নিত্য এত নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতেছে যে, অল্প দিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত তথ্য সকলও উল্টাইয়া কিম্বা বদলাইয়া যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিককে কত যে আয়াস সহকারে, কত সতর্কতা সহকারে যে এক একটী সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, সাধারণে তাহার ধারণাও করিতে পারিবে না। কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে তাহার সকল সম্ভাবিত প্রতিকূল যুক্তির খণ্ডন করিতে হয়, সকল প্রকার অসাফল্যের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় দুর্গ রচনা করিতে হয়, সিদ্ধান্তগুলি কালসহ হইবে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়; তবে একটী সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এক অবস্থায় যাহা সত্য, অন্য অবস্থায় তাহা মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভবনা থাকায়, প্রত্যেক সত্যকে বিভিন্ন এবং পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্য দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হয়। প্রতিষ্ঠিত সত্য যাহাতে কোন তর্ক যুক্তিতেই খণ্ডিত হইতে না পারে, এমন ভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। তবে সে একটী সত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত, সম্মানিত, গৃহীত হয়। হস্তী যেমন অগ্রসর হইবার সময়, প্রত্যেক পদক্ষেপে, তাহার পায়ের নীচের মাটী দৃঢ় কি না, তাহার প্রকাণ্ড শরীরের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ কি না, কোথাও কোন ক্রমে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তবে পদক্ষেপ করে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, বৈজ্ঞানিককেও সেইরূপ সত্যের রাজ্যে সত্যের সন্ধানে অতিরিক্ত সতর্কতা সহকারে প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি পরীক্ষা করিয়া তাহার দৃঢ়তা সম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তবে অগ্রসর হইতে হয়। গন্তব্য পথ প্রকৃত পথ কি না, সেই পথে চলিলে নিশ্চিত লক্ষ্যস্থলে পৌছান যাইবে কি না, পথ-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে কি না, এ সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা না করিয়া বৈজ্ঞানিক এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারেন না। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, বৈজ্ঞানিকের কাজ বড় সহজ বা সরল নহে। প্রতি পদে তাঁহার অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা। তথাপি কি তাঁহার নিস্তার আছে? আজ তিনি যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন, কাল হয় ত নূতন সত্যের আলোকে তাঁহারই আজিকার আবিষ্কৃত সত্য মলিন, এমন কি মিথ্যা হইয়াও যাইতে পারে। আজ যে পন্থা তিনি সরল বলিয়া অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতেছেন, কাল তাহা জটিল বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর সরল পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

তথাপি, একটু ভবিষ্যদ্বাণী যে একেবারেই করা না যায়, তাহা নহে। অতীত কালে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিলে, তাহার সমস্তটাই যে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে, এমন নাও হইতে পারে। আজ কেবল মাত্র যক্ষ্মারোগ আমাদের আলোচনার বিষয়। সেই জন্য আমরা অন্যান্য রোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু কেবল যক্ষ্মারোগের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহাই বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

যক্ষ্মারোগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। এই রোগ কোন্ কোন্ সূত্রে মানব শরীরে সংক্রামিত হয়, কি ভাবে ইহার বৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটে, কিরূপ অবস্থায় এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভের আশা থাকে, এবং কিরূপ অবস্থায় থাকে না, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে অনেক কথাই জানা গিয়াছে। অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা, অনুসন্ধান

ও হিসাবের ফলে জানা গিয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই রোগের বিশেষ বিশেষ পরিণতি ঘটে, এবং কোন যক্ষ্মারোগীর সেরূপ কোন অবস্থা ঘটিলে, তাহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহাও অনেকটা বলা যায়, এবং তাহা প্রায় ঠিকই হয়। বহুকাল ধরিয়া যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করিয়া বুঝা গিয়াছে যে, কোন কোন চিকিৎসা-প্রণালী একেবারেই নিষ্ফল, আর কোন রকমেই সেই বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালী কোন ক্ষেত্রেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং সেইরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি পরিত্যজ্য। আবার যক্ষ্মারোগের কোন কোন অবস্থা একেবারেই অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। সেরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ ফলাফল একেবারে অনিশ্চিত। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না ; এবং এ সকল স্থলে নূতন নূতন পরীক্ষার যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। আরও অনেক পরীক্ষা হইলে এই সকল অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত অবস্থার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে সফল চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বনের যথেষ্ট সুবিধাও হইতে পারে।

প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রিচার্ড মর্টন নামক এক ব্যক্তি যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনুমান করেন যে, যক্ষ্মারোগের প্রকৃতি এবং প্রকার যেরূপ, তাহাতে বোধ হয়, মানব শরীরে যক্ষ্মারোগের একটা স্বাভাবিক প্রতিষেধক শক্তি আছে। তাহা না হইলে এত দিনে মানবজাতি উজাড় হইয়া ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত। এখন তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রতিষেধক শক্তির কতকটা স্বাভাবিক ; আর কতকটা অর্জ্জিত। যক্ষ্মা-রোগের বীজাণুর সংশ্রবে আসিয়া মানুষের দেহের তন্তুগুলি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। স্বাভাবিক প্রতিষেধক শক্তির পরিমাণ তেমন বেশী নয়—খুব বেশী সংখ্যক যক্ষ্মাবীজাণু একেবারে মানব-দেহে প্রবেশ করিলে, এই শক্তি তাহাদের বাধা দিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। কিম্বা যদি অবস্থা বিশেষে যক্ষ্মারোগ-বীজাণু কোন লোককে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে, তবে প্রতিষেধক শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শেষে একেবা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে রোগবীজাণু সংখ্যায় কম কিম্বা দুর্ব্বল হইলে, অর্জ্জিত প্রতিষে শক্তি বাড়িয়া গিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাই প্র প্রতিষেধক শক্তি। এই তত্ত্বটুকু অবগত হ চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরা বিচার করিতে বসিলেন যক্ষ্মারোগ একেবারে নিবারণ করা বাঞ্ছনীয় কি না কারণ, অল্পমাত্রায় রোগ সংক্রামণ না থাকি উত্তেজনার অভাবে প্রতিষেধক শক্তিও নিস্তেজ হই পড়িয়া শেষে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাই পারে। তখন যদি হঠাৎ কোন ব্যক্তি প্রবলভা যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অ সুস্থকায় লোকের দেহে যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হই এবং প্রতিষেধক শক্তির অভাবে তাহারা সকলেই ম যাইবে। এইরূপে এক একটী মানব-সমাজের অ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। আশ্বাসের কথা এই যে, যক্ষ্মারোগ একেবারে নিবা করা অসম্ভব। একটু আধটু সংক্রামণের সম্ভা থাকিয়া যাইবেই ; এবং তাহার ফলে রোগ প্রতিষে শক্তিও একেবারে বিলুপ্ত হইবে না।

ব্যাধি নানাপ্রকারে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হ কতক স্থলে মানুষের মধ্যবর্ত্তিতায় এবং কতক মানুষ ছাড়া অন্য উপায়ে। এই শেষোক্ত উপায়ে সকল স্থলে রোগ সংক্রামিত হয়, সে সকল চিকিৎসা-বিজ্ঞান রোগ নিবারণের ও রোগ নিরাময়ের অনেক কৃত্রিম ও সফল উপায় আবিষ্কার করিয়াছে সান্নিপাতিক জ্বর প্রধানতঃ এই রোগবীজ-দুষ্ট জ কিম্বা দুগ্ধের সহায়তায় সংক্রামিত হয়। জল শোধি করিয়া লইলে কিম্বা দুগ্ধ কিছুক্ষণ ধরিয়া ঈষৎ উত্ত করিলে অর্থাৎ পাস্তুরীত করিলে সান্নিপাতিক জ্ব সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা তিরোহিত হয়। দুগ্ধ পালিত পশু অর্থাৎ গো-মহিষাদির মধ্যস্থতায় য রোগ সংক্রামিত হয়। এই উপায়ে প্রধানতঃ দুগ্ধপো

শিশুরাই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এস্থলে দুগ্ধ শোধিত করিয়া লইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। মশক বংশ ধ্বংস করিলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হয়। ইন্দুর বংশ ধ্বংস করিলে বিউবোনিক প্লেগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু যক্ষ্মারোগ যখন মানুষের দ্বারা মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তখনই উহা বড় গুরুতর, এমন কি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, মানুষের গতিবিধি সংযত ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সহজ ব্যাপার নহে—একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক মানুষের একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—তাহার আহার স্বাধীনতা—তাহার চলাফেরার স্বাধীনতা—সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের স্বাধীনতা আছে। যদি এই সকল স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাইতে পারা যায় তাহা হইলে যক্ষ্মারোগের সংক্রামকতাও অনেকটা হ্রাস করা যায়। কিন্তু মানুষ তাহার এই সকল অধিকার যে সহজে ছাড়িতে সম্মত হইবে, এমন সম্ভাবনা আদৌ নাই ; এমন কি মানব-সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও নয়। ফলে যক্ষ্মা-রোগে লোকে মরেও তেমনি।

তবে উপায় কি ? মানুষের দ্বারা যে সকল ক্ষেত্রে রোগ সংক্রামিত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে কোন কৃত্রিম উপায় কার্য্যকর হয় না। মানুষ নিজে সংযত না হইলে সংক্রামণ নিবারণ করা অসম্ভব। তবে কি কোনই আশা নাই ? আছে—একটা আশা অবশ্যই আছে। সেটী—লোকশিক্ষা। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংশ্রব হইতে আত্মরক্ষা, নিজে রোগাক্রান্ত হইলে সুস্থ-দেহ লোককে সংশ্রবে আসিতে না দেওয়া, যাহাতে রোগবীজ সংক্রামিত না হইতে পারে এমন উপায় অবলম্বন করা—এই সকল বিষয় প্রত্যেক নর-নারীর, বালক-বালিকার, বৃদ্ধ ও শিশুর অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় হওয়া চাই।

কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শিক্ষা প্রচার করা বড় কঠিন। এখন কাহারও কোন সংক্রামক ও কঠিন রোগ হইলে তাহার আত্মীয়-স্বজনরা তাহাকে দেখিতে যায়, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ইহা সামাজিক প্রথা—আত্মীয়তা-রক্ষা। যদি কেহ সংক্রামিত হইবার ভয়ে রুগ্ন আত্মীয়কে দেখিতে না যায়, কিম্বা যাইয়াও তফাতে থাকে বা আত্মরক্ষার চেষ্টায় সাবধান হয়, তাহা হইলে তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিয়া রোগীর পরিজনবর্গ তাহার নিন্দা করিবে। এই নিন্দার ভয়ে আত্মীয়েরা দেখিতে না গিয়া পারিবে না, এবং নিজ-দেহে রোগ সংক্রামিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে ও অপরের দেহে রোগ-সংক্রামণের কারণ হইয়া উঠিবে। কিন্তু লোককে রোগ সংক্রামণের ও তাহা নিবারণের গূঢ় তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিতে পারিলে, রোগী কিম্বা তাহার বাড়ীর লোকেরা সুস্থ আত্মীয়কে কাছে আসিতে নিষেধ করিবে—পাছে সেও রোগে আক্রান্ত হয়। এরূপ ব্যাপকভাবে শিক্ষা দান সহজ-সাধ্য নহে ; এরূপ শিক্ষা গ্রহণও শক্তিসাপেক্ষ—সকলের মানসিক সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সংক্রামক রোগ মানব-সমাজ হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভবপর নহে। ইহার একটা সুবিধা এই যে, সংক্রামিত হইবার অল্পস্বল্প সম্ভাবনা থাকায় রোগ-প্রতিষেধক শক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে। সেটা একটা লাভ বলিতে হইবে। বাকীটুকু কৃত্রিম উপায়ে সাধন করিতে হইবে।

যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে সেই সকল কৃত্রিম উপায়ের মধ্যে কয়েকটির এখানে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম উপায়—যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘন বসতিপূর্ণ লোকালয় হইতে দূরে কোন স্যানাটোরিয়া বা রোগনিবাসে স্থানান্তরিত করা। দ্বিতীয় উপায়—টিকা। চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন, বসন্ত রোগের ন্যায় যক্ষ্মা রোগেরও টীকা দিয়া সংক্রামকতা নিবারণ করা খুবই সম্ভব। তবে এযাবৎ এদিকে বিশেষ কোন সফলতা এখনও লাভ করিতে পারা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত যতগুলি যক্ষ্মা রোগের টিকা বাহির হইয়াছে,

তাহারা এখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, সুতরাং নির্ব্বিবাদে নিশ্চিন্তে গ্রহণযোগ্য এখনও হয় নাই। পরীক্ষায় ফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে এখনও বিলক্ষণ দশ-বিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু যক্ষ্মারোগ এমন ব্যাধি যে তাহার কোন প্রতিষেধক টিকা বাহির হইতে পারে, এমন আশা করিতে সাহস হয় না। কারণ যে সকল রোগের ফলপ্রদ প্রতিষেধক টিকা বাহির হইয়াছে—যক্ষ্মা রোগের প্রকৃতি তাহাদের প্রকৃতি হইতে অনেক বিভিন্ন। তবে একেবারে নিরাশ হইবার মত অবস্থাও এখনও ঘটে নাই।

যক্ষ্মা রোগের এমন কোন ঔষধ বা সেরামও এখনও বাহির হয় নাই, যাহাকে অব্যর্থ বলা যায় এবং যাহা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করা যায়। ঔষধ আবিষ্কারকেরা অবশ্য নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই—প্রতি বৎসরই বহু-সংখ্যক নূতন নূতন যক্ষ্মা রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু তাহাদের কোনটিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যক্ষ্মা রোগের বীজাণুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা কোন রকমেই বাগ মানিতে চায় না—কোন ঔষধকেই তাহারা আমল দেয় না। আবার, এই রোগের বীজাণু একবার মানব-দেহে প্রবেশ করিলে শরীরা-ভ্যন্তরস্থ তন্তুগুলি সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত তাহার চারিদিকে এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া বসে যে, সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া ঔষধ তাহার নাগাল পায় না। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিষেধক শক্তিসকল যক্ষ্মারোগ বীজাণুকে ধ্বংস করিতে না পারিয়া ঐরূপ ব্যূহ রচনা করিয়া থাকে। সে ব্যূহ এত দৃঢ় হয় যে, সূচিকা বিদ্ধ করিয়া ঔষধ ইন্‌জেক্ট করিয়া রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াও ব্যূহ ভেদ করিতে পারা যায় না। ব্যূহ মধ্যস্থ যক্ষ্মাবীজাণুকে আক্রমণ করিবার উপায় আবিষ্কারের চেষ্টার কোন্ ত্রুটী হইতেছে না—সফলতা অবশ্য ভবি-তব্যতার হাতে।

যক্ষ্মারোগ নিবারণের কোন কৃত্রিম প্রতিষেধক উপায় যদিই কখনও আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলেও তাহা যে সর্ব্বতোভাবে সফল হইবে, এমন আশা এখনও করা যায় না। বসন্ত রোগের টিকা ত বাহির হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্র ব্যবহৃতও হইতেছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বসন্তরোগ সংক্রামক ভাবে দেখাও দেয়, এবং তাহাতে লোকও যথেষ্ট মরিয়া থাকে। বসন্তরোগ প্রকাশ পাইলে খুব চট্ করিয়া ধরা পড়িয়া যায়। তখন রোগীকে কোয়ারেণ্টাইনে পাঠাইলে অন্য লোক অনেকটা নিরাপদ হইতে পারে। বসন্ত রোগের স্থায়িত্ব কালও দীর্ঘ নয়। কিন্তু যক্ষ্মার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা সহজে ধরা পড়ে না। অ... রোগী দীর্ঘকাল রোগভোগ করে বলিয়া তাহাকে কোয়ারেণ্টাইনে পাঠাইবারও সুবিধা হয় না। অতএব ইহার প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগ পুরাতন হইলে তাহার চিকিৎসা প্রায় সফল হয় না। যক্ষ্মাজীবাণু ফুস্‌ফুস্ বা তন্তুর অনেক অংশ এমনভাবে খাইয়া ফেলে যে কোন ঔষধই সেই ক্ষয় প্রাপ্ত অংশগুলির পুনর্গঠন করিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত যক্ষ্মা রোগের যত ঔষধ বা সেরাম বাহির হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই রোগের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার্য্য। রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে কোন কোন ঔষধে কিছু কিছু ফল পাওয়া যায়। কেবল যক্ষ্মারোগ কেন, অন্যান্য অনেক কঠিন পীড়ার ঔষধের অবস্থাও এইরূপ—অর্থাৎ তরুণ অবস্থায় ফলপ্রদ। ম্যালেরিয়ার স্পেসিফিক কুইনাইন, সিফিলিসের স্পেসিফিক কালভারসান, ডিফথিরিয়ার স্পেসিফিক এণ্টিটক্সিন—এ সকলই রোগের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার করিলে কিছু ফল পাওয়া যায়—রোগ পুরাতন হইয়া গেলে এই সকল ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। কাজেই যক্ষ্মারোগের সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, তাহার তরুণ অবস্থার লক্ষণগুলি আবিষ্কার করিয়া লোককে শিক্ষা দেওয়া, যেন রোগ আক্রমণ করিবামাত্র তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিতে পারে। কারণ এই রোগ এত অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে ও এত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় যে, তাহা ধরা পড়িতে না পড়িতে পুরাতন রোগে পরিণত হয়।

যক্ষ্মা রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে এখনও অনেক বাকী আছে। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ ইহার সম্বন্ধে বিচক্ষণভাবে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। দিন দিন অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। আশা হয় অচির ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অধুনা অজ্ঞাত এমন অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে, যে জ্ঞানালোকের সাহায্যে তাহার সহিত সংগ্রাম করা সহজসাধ্য ও সুফলপ্রদ হইবে। ইতোমধ্যে আমরা যতটা জানিতে পারিয়াছি, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে, যক্ষ্মারোগ অতি ভয়ানক রোগ। অসংখ্য লোকের এই রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান মারাত্মক ব্যাধি সমূহের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। মানব-জীবনের যে অংশ পূর্ণ ভোগের কাল, যক্ষ্মারোগ প্রায় সেই সময়েই প্রবল হইয়া জীবন ব্যর্থ করিয়া দেয়। ভবিষ্যতে যাহা আবিষ্কৃত হইবে তাহার জন্য বসিয়া না থাকিয়া, বর্ত্তমানে যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে যতদূর সম্ভব যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা ও তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আরো মনে রাখিতে হইবে—লোক-শিক্ষাই যক্ষ্মারোগ নিবারণের এবং তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়। যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাধারণকে শিক্ষা না দিলেও চলিবে; মোটামুটি সকল কথা সাধারণকে জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই জ্ঞান এবং আত্মরক্ষার সহজ বুদ্ধি—এই দুইএর সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইবে। জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যক্ষ্মারোগ চোরের মত গুপ্ত ভাবে আসিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে। কাসি, জ্বর, শরীর ফ্যাকাসে হইয়া যাওয়া প্রভৃতি যক্ষ্মা রোগের নিশ্চিত লক্ষণ দেহে প্রকাশ পাইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই রোগ দেহের মধ্যে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়া থাকে। অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করা, শরীরের ওজন কমিয়া যাওয়া—এ সকল মারাত্মক লক্ষণ। গোড়ায় রোগ ধরা পড়িলে, যক্ষ্মা রোগীকে একেবারে নিরাময় করিতে না পারা গেলেও তাহার অকাল মৃত্যুর দিন দুই দশ বছর পিছাইয়া দেওয়া যায়। কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া যক্ষ্মা রোগের প্রথম আক্রমণ বুঝা যায়, তাহাও লোককে শিখাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে লোকে সতর্ক থাকিবে, এবং সেরূপ কোন লক্ষণ দেখিবামাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। যক্ষ্মারোগ যে কত বিশ্বাসঘাতক রোগ তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার প্রথম লক্ষণগুলিকে চিকিৎসকেরাও অন্য রোগের লক্ষণ মনে করিয়া ভুল চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা কত বেশী আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

বাংলার পল্লী

[শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী]

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, নদীমাতৃক এই বাংলা দেশস্থ পল্লীসমূহের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিলে প্রাণবান ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় দুঃখে অধীর হইয়া উঠে। পূর্ব্বে পল্লী যে প্রকৃতই সমৃদ্ধ ছিল, শুধু তাহার অতীত স্মৃতির নিদর্শন রাখিয়া কালের আবর্ত্তনে বর্ত্তমানে সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। যেমন এখন পল্লীতে নদী

নাই—আছে কেবল তাহার রেখাটি, জমিদার বা ধনাঢ্য মহাজন নাই—আছে তাঁহাদের পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকা, জনবহুলতা নাই—আছে উজাড় বাস্তু বা ফৌতি ভিটা, প্রতুলতা নাই—আছে অভাবের তাড়না।

দেশে রেলওয়ে বিস্তারের কল্যাণে শাখা নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায় নদীর উপকূলবাসী জনসাধারণের সুপেয় জলাভাব ঘটিয়াছে। তার পর আবার কচুরী পানার আবির্ভাবে গোদের উপর বিস্ফোড়ার ন্যায় অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নদী মজিয়া যাওয়ায় নদীতে স্রোতবেগ না থাকা হেতু বর্ষার সময় কচুরী পানা দূরে ভাসিয়া গিয়া নদী পরিষ্কারের উপায় হয় না, বা নিরুৎসাহ অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী সমবেত চেষ্টায় উহা পরিষ্কারেরও ব্যবস্থা করে না। ফলে বর্ষার শেষে পানা আবৃত লোহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত জল পান করিয়া নদীকূল-বাসী কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়া অব্যাহতি পায়।

মজা নদীগুলি যখন বন্যার জলে ভরিয়া উঠে এবং কূল ছাপিয়া জল পার্শ্বস্থিত শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন জলের সহিত বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া ধ্বংস-রূপী কচুরীপানা শস্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং হতভাগ্য কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমোৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ আশায় ছাই ঢালিয়া দেয়।

পল্লীর ভিতরে যে দুই একটি পুরাতন পুকুর আছে সে গুলি নামে তাল পুকুর কিন্তু ঘটী ডুবে না। উহার কোন কোনটিতে কচুরীপানা না থাকিলেও অন্য প্রকারের পানা, শৈবাল ও বিভিন্ন প্রকারের জলজ লতা গুল্মাদিতে বার মাস আচ্ছাদিত থাকে এবং তাহার নিম্নস্থ জলের অবস্থাও ঠিক নদীর অনুরূপ। পুকুরের পাড়ে ও জলের ধারে ছোট বড় যে সকল গাছপালা জন্মে, তাহার স্খলিত পল্লবাদি প্রায় সমস্তই পুকুরের জলে পড়িয়া পচে। তার উপর ঐ জলে পল্লীবাসিনী মহিলাদের বাসন মাজা, ক্ষার কাচা, শৌচাদি ও মূত্রাদি কার্য্য অবাধে চলে এবং কদাচিদ্বা গ্রীষ্মকালে কৃষকের গো-মহিষাদি ঐ পুকুরে ডুবিয়া তাহাদের রৌদ্রতপ্ত দে শীতল করে। আবার কোন কোন ধোস পাচ্ আশ্রিত দেহের সাবান ঘর্ষিত অবগাহনও নির্বিবাদে চলে; সুতরাং ঐ সকল পুকুরের জল নামধেয় দ্রবাদিতে প্রকৃত জল যে কতটুকু থ কে, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐ জল পল্লী-বাসীর পানীয়রূপে নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতঃপর পল্লীর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সা গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য একটী করিয়া মেটেল বা ডোবা আছে, উহাও পুকুরের মতই যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হয়; উপরন্তু বাড়ীর যত আবর্জ্জনা ঐ ডোবার পাড়ে স্তূপীকৃত ভাবে ফেলা হয়। কোন কোন ডোবার জল এত দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে, উহার পাড়ের রাস্তা অতিক্রম কালে নাসিকা রন্ধ্রে কাপড় চাপিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উক্ত ডোবা ও তথাকথিত পুকুরে জলে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর বাহন মশককুল ডিম ছাড়িয়া তাহার বংশ বৃদ্ধির বেশ সুবিধা পায়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যার একটু পূর্ব্ব হইতেই দুই একটি করিয়া মশা কুলের অগ্রদূতের দর্শন পাওয়া যায়। তারপর সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি অসংখ্য মশকের তাড়নায় অস্থি করিয়া তুলে। সে এক যম যন্ত্রণা! একে দারুণ গ্রী গলৎ ঘর্ম্ম অবস্থায় একরূপ নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান, উপর সেই অনাবৃত দেহে অসংখ্য মশকের হুল ব্যথা। বিনা মশারীতে নিদ্রা যাইবার ত উপা নাই; পরন্তু বাহিরের কার্য্য গতিকে একটু বসিবার দাঁড়াইবার প্রয়োজন হইলেও মশারীর প্রয়োজনীয় উপলব্ধি হয়।

বসত বাড়ীর চারিধারে কেবল ঘরের ভিটা ছা প্রায় সব স্থানেই পল্লীবাসীর পিতৃ-পিতামহগণ যে সক আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলে সে গুলি এক্ষণে কাল প্রভাবে এক একটি মহীরু পরিণত হইয়া পল্লী-বাসীর পূর্ব্ব পুরুষের ফলো রচনা রূপ সাধু প্রবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবার প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই দুই তিনটি করিয়া

বাড় আছে, ফলে বর্ত্তমান পল্লীবাসী বাড়ীতে মুক্ত সূর্য্য কিরণ ও নির্ম্মল মুক্ত বায়ু আর পায় না। পক্ষান্তরে নির্ম্মল বিশুদ্ধ জল, মুক্ত সূর্য্য কিরণ ও নির্ম্মল মুক্ত বায়ু যাহা মানবের জীবন রক্ষার এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক সেগুলিতে পল্লীবাসী বঞ্চিত হইয়া আছে। মাঠ বা গ্রামের বাহির হইতে দৃষ্টি করিলে পল্লীগুলিকে এক একটি বিশাল অরণ্য বলিয়া অনুমিত হয়। উহার ভিতর যে মানবের আবাস আছে বা থাকিতে পারে তাহা কল্পনায় আনা যায় না।

কলেরা, ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কালা জ্বর প্রভৃতি রোগে বহু পল্লীবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পল্লীর জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন পল্লীতে জনসংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কালা-জ্বর নামক ব্যাধিটি পল্লীতে একরূপ অপরি-চিতই ছিল; কিন্তু এখন পল্লীর অনেকেরই গৃহে উহার দর্শন পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থায় কুলায় তাহারা আধুনিক আবিষ্কৃত ইন্‌জেক্‌শান করাইয়া আরোগ্য লাভ করে, অশক্ত রোগী পল্লীর হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

পল্লীতে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার প্রচলনই অধিক। তাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে রোগ আরোগ্য হ'ক বা না হ'ক জটিলতার বৃদ্ধি পায় ভাল। কিন্তু পল্লীবাসী তাহা বুঝিবার অবকাশ পায় না; যে হেতু তাহারা দরিদ্র, অল্প খরচে চিকিৎসিত হইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, নিকটে অল্প পয়সায় যাহাকে পায় তাহাকেই ডাকিতে যায় হয়। পল্লীর ডাক্তার বাবুর জ্ঞান-ভাণ্ডারে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আদৌ না থাকিলেও তাঁহার ডাক আসিলে তিনি গিয়া তাঁহার চিকিৎসারূপ মৃত্যুবাণ ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। প্রকৃতির অনু-কম্পায় রোগী আরোগ্য হইলে, ডাক্তার বাবুর খুব খ্যাতি রটে, কিন্তু রোগীর মৃত্যু হইলে রোগীর অদৃষ্টই নিন্দিত হয়। এই ছদ্মবেশী ডাক্তারদের চিকিৎসা যে পল্লীর জনসংখ্যার হ্রাসের অন্যতম গূঢ় কারণ নহে তাহা কে বলিবে?

পল্লীর বালকগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও নৈরাশ্য দ্যোতক। কৃষক-প্রধান গ্রামগুলিতে ত উহার কোন বালাই নাই; তবে যে গ্রামে দুই দশ ঘর নিঃস্ব ভদ্রলোক এখনও না মরিয়া বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের ক্ষীণ উৎসাহে উদ্যোগে জীর্ণ ঘরে নামে মাত্র দুই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দর্শন পাওয়া যায়। বালকগণ বর্ণ পরিচয়ের সহিত পরিচয় অন্তেই প্রায় সরিয়া পড়ে এবং পিতা মাতার ঔদাস্য প্রযুক্ত সে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কদাচিদ্বা কেহ কেহ বর্ণ পরিচয়ের পরবর্ত্তী ২।১ খানি পুস্তকের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হয়।

নীতি শিক্ষার অভাবে পল্লীর যুবকবৃন্দের নৈতিক অবনতিও মর্ম্মস্পর্শী চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে দুই একটি করিয়া গাঁজার আড্ডা থাকিতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ভাবে ঐ আড্ডায় গ্রামের নিষ্কর্ম্মা, লম্পট, গাঁজাখোর ব্যক্তি-গণ যোগদান করতঃ গঞ্জিকা প্রসাদে উন্মত্ত হইয়া অনেক কল্পনাতীত কু-কর্ম্ম, কদাচিদ্বা তাহারই জল্পনা কল্পনা করিয়া তাহাদের সান্ধ্য সম্মিলন উদ্‌যাপিত করে। বর্ত্তমান নারী হরণের প্রাদুর্ভাব ও আধিক্য ঐ সম্মি-লনের অক্ষয় কীর্ত্তি।

কৃষকের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ায়, তাহারা চাষ আবাদের জন্য গরু মহিষ খরিদ করিতে পারে না, সেই কারণে মাঠে বহু অকর্ষিত জমি পড়িয়া থাকে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ইহাও অন্যতম কারণ। পল্লীবাসী কৃষকগণ অন্নাভাবে শীর্ণ ও রোগ ভোগে জীর্ণ দেহ লইয়া কোনরূপে জীবন্মৃতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। পল্লীর কৃষক-কুল প্রকৃত পক্ষে দেশের অন্নদাতা। তাহা-দের সমৃদ্ধি ও সুখ দুঃখের সহিত দেশের ইষ্টানিষ্ট অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত; সুতরাং তাহাদের এই দৈন্য-

নাই—আছে কেবল তাহার রেখাটি, জমিদার বা ধনাঢ্য মহাজন নাই—আছে তাঁহাদের পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকা, জনবহুলতা নাই—আছে উজাড় বাস্তু বা পোতি ভিটা, প্রতুলতা নাই—আছে অভাবের তাড়না।

দেশে রেলওয়ে বিস্তারের কল্যাণে শাখা নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায় নদীর উপকূলবাসী জনসাধারণের সুপেয় জলাভাব ঘটিয়াছে। তার পর আবার কচুরী পানার আবির্ভাবে গোদের উপর বিস্ফোড়ার ন্যায় অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নদী মজিয়া যাওয়ায় নদীতে স্রোতবেগ না থাকা হেতু বর্ষার সময় কচুরী পানা দূরে ভাসিয়া গিয়া নদী পরিষ্কারের উপায় হয় না, বা নিরুৎসাহ অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী সমবেত চেষ্টায় উহা পরিষ্কারেরও ব্যবস্থা করে না। ফলে বর্ষার শেষে পানা আবৃত লোহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত জল পান করিয়া নদীকুল-বাসী কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়া অব্যাহতি পায়।

মজা নদীগুলি যখন বন্যার জলে ভরিয়া উঠে এবং কূল ছাপিয়া জল পার্শ্বস্থিত শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন জলের সহিত বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া ধ্বংস-রূপী কচুরীপানা শস্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং হতভাগ্য কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমোৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ আশায় ছাই ঢালিয়া দেয়।

পল্লীর ভিতরে যে দুই একটি পুরাতন পুকুর আছে সে গুলি নামে তাল পুকুর কিন্তু ঘটী ডুবে না। উহার কোন কোনটিতে কচুরীপানা না থাকিলেও অন্য প্রকারের পানা, শৈবাল ও বিভিন্ন প্রকারের জলজ লতা গুল্মাদিতে বার মাস আচ্ছাদিত থাকে এবং তাহার নিম্নস্থ জলের অবস্থাও ঠিক নদীর অনুরূপ। পুকুরের পাড়ে ও জলের ধারে ছোট বড় যে সকল গাছপালা জন্মে, তাহার স্খলিত পল্লবাদি প্রায় সমস্তই পুকুরের জলে পড়িয়া পচে। তার উপর ঐ জলে পল্লীবাসিনী মহিলাদের বাসন মাজা, ক্ষার কাচা, শৌচাদি ও মূত্রাদি কার্য্য অবাধে চলে এবং কদাচিদ্বা গ্রীষ্মকালে কৃষকের গো-মহিষাদি ঐ পুকুরে ডুবিয়া তাহাদের রৌদ্রতপ্ত দে[illegible] শীতল করে। আবার কোন কোন খোস পাচড়া আশ্রিত দেহের সাবান ঘর্ষিত অবগাহনও নির্ব্বিবাদে চলে; সুতরাং ঐ সকল পুকুরের জল নামধেয় দ্রব্যটিতে প্রকৃত জল যে কতটুকু থাকে, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐ জল পল্লী-বাসীর পানীয়রূপে নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতঃপর পল্লীর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য একটী করিয়া মেটেল বা ডোবা আছে, উহাও পুকুরের মতই যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হয়; উপরন্তু বাড়ীর যত আবর্জ্জনা ঐ ডোবার পাড়ে স্তূপীকৃত ভাবে ফেলা হয়। কোন কোন ডোবার জল এরূপ স্পাকারোদ্দীপক দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে, উহার পাড়ের রাস্তা অতিক্রম কালে নাসিকা রন্ধ্রে কাপড় চাপিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উক্ত ডোবা ও তথাকথিত পুকুরের জলে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর বাহন মশককুল ডিম ছাড়িয়া তাহার বংশ বৃদ্ধির বেশ সুবিধা পায়। গ্রীষ্মের সময় সন্ধ্যার একটু পূর্ব্ব হইতেই দুই একটি করিয়া মশক কুলের অগ্রদূতের দর্শন পাওয়া যায়। তারপর সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি অসংখ্য মশকের তাড়নায় অস্থির করিয়া তুলে। সে এক যম যন্ত্রণা! একে দারুণ গ্রীষ্মে গলৎ ঘর্ম্ম অবস্থায় একরূপ নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান, [illegible] উপর সেই অনাবৃত দেহে অসংখ্য মশকের হুল ফুটা[illegible] ব্যথা। বিনা মশারীতে নিদ্রা যাইবার ত উপায় নাই; পরন্তু বাহিরের কার্য্য গতিকে একটু বসিবার [illegible] দাঁড়াইবার প্রয়োজন হইলেও মশারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

বসত বাড়ীর চারিধারে কেবল ঘরের ভিটা ছাড়া প্রায় সব স্থানেই পল্লীবাসীর পিতৃ-পিতামহগণ যে সকল আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন সে গুলি এক্ষণে কাল প্রভাবে এক একটি মহীরুহে পরিণত হইয়া পল্লী-বাসীর পূর্ব্ব পুরুষের ফলোদ্যান রচনা রূপ সাধু প্রবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আবার প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই দুই তিনটি করিয়া

ঝাড় আছে, ফলে বর্ত্তমান পল্লীবাসী বাড়ীতে মুক্ত সূর্য্য কিরণ ও নির্ম্মল মুক্ত বায়ু আর পায় না। পক্ষান্তরে নির্ম্মল বিশুদ্ধ জল, মুক্ত সূর্য্য কিরণ ও নির্ম্মল মুক্ত বায়ু যাহা মানবের জীবন রক্ষার এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক সেগুলিতে পল্লীবাসী বঞ্চিত হইয়া আছে। মাঠ বা গ্রামের বাহির হইতে দৃষ্টি করিলে পল্লীগুলিকে এক একটি বিশাল অরণ্য বলিয়া অনুমিত হয়। উহার ভিতর যে মানবের আবাস আছে বা থাকিতে পারে তাহা কল্পনায় আনা যায় না।

কলেরা, ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কালা জ্বর প্রভৃতি রোগে বহু পল্লীবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পল্লীর জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন পল্লীতে জনসংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কালা-জ্বর নামক ব্যাধিটি পল্লীতে একরূপ অপরি-চিতই ছিল; কিন্তু এখন পল্লীর অনেকেরই গৃহে উহার দর্শন পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থায় কুলায় তাহারা আধুনিক আবিষ্কৃত ইন্‌জেক্‌শান করাইয়া আরোগ্য লাভ করে, অশক্ত রোগী পল্লীর হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

পল্লীতে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার প্রচলনই অধিক। তাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে রোগ আরোগ্য হ'ক বা না হ'ক জটিলতার বৃদ্ধি পায় ভাল। কিন্তু পল্লীবাসী তাহা বুঝিবার অবকাশ পায় না; যে হেতু তাহারা দরিদ্র, অল্প খরচে চিকিৎসিত হইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, নিকটে অল্প পয়সায় যাহাকে পায় তাহাকেই ডাকিতে বাধ্য হয়। পল্লীর ডাক্তার বাবুর জ্ঞান-ভাণ্ডারে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আদৌ না থাকিলেও তাঁহার ডাক আসিলে তিনি গিয়া তাঁহার চিকিৎসারূপ মৃত্যুবাণ ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। প্রকৃতির অনু-কম্পায় রোগী আরোগ্য হইলে, ডাক্তার বাবুর খুব সুখ্যাতি রটে, কিন্তু রোগীর মৃত্যু হইলে রোগীর অদৃষ্টই দোষী হয়। এই ছদ্মবেশী ডাক্তারদের চিকিৎসা যে পল্লীর জনসংখ্যার হ্রাসের অন্যতম গূঢ় কারণ নহে তাহা কে বলিবে?

পল্লীর বালকগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও নৈরাশ্য দ্যোতক। কৃষক-প্রধান গ্রামগুলিতে ত উহার কোন বালাই নাই; তবে যে গ্রামে দুই দশ ঘর নিঃস্ব ভদ্রলোক এখনও না মরিয়া বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের ক্ষীণ উৎসাহে উদ্যোগে জীর্ণ ঘরে নামে মাত্র দুই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দর্শন পাওয়া যায়। বালকগণ বর্ণ পরিচয়ের সহিত পরিচয় অন্তেই প্রায় সরিয়া পড়ে এবং পিতা মাতার ঔদাস্য প্রযুক্ত সে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কদাচিদ্বা কেহ কেহ বর্ণ পরিচয়ের পরবর্ত্তী ২।১ খানি পুস্তকের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হয়।

নীতি শিক্ষার অভাবে পল্লীর যুবকবৃন্দের নৈতিক অবনতিও মর্ম্মস্পর্শী চরম সীমায় পৌছিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে দুই একটি করিয়া গাঁজার আড্ডা থাকিতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ভাবে ঐ আড্ডায় গ্রামের নিষ্কর্ম্মা, লম্পট, গাঁজাখোর ব্যক্তি-গণ যোগদান করতঃ গঞ্জিকা প্রসাদে উন্মত্ত হইয়া অনেক কল্পনাতীত কু-কর্ম্ম, কদাচিদ্বা তাহারই জল্পনা কল্পনা করিয়া তাহাদের সান্ধ্য সম্মিলন উদ্‌যাপিত করে। বর্ত্তমান নারী হরণের প্রাদুর্ভাব ও আধিক্য ঐ সম্মি-লনের অক্ষয় কীর্ত্তি।

কৃষকের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ায়, তাহারা চাষ আবাদের জন্য গরু মহিষ খরিদ করিতে পারে না, সেই কারণে মাঠে বহু অকর্ষিত জমি পড়িয়া থাকে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ইহাও অন্যতম কারণ। পল্লীবাসী কৃষকগণ অন্নাভাবে শীর্ণ ও রোগ ভোগে জীর্ণ দেহ লইয়া কোনরূপে জীবন্মৃতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। পল্লীর কৃষক-কুল প্রকৃত পক্ষে দেশের অন্নদাতা। তাহা-দের সমৃদ্ধি ও সুখ দুঃখের সহিত দেশের ইষ্টানিষ্ট অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত; সুতরাং তাহাদের এই দৈন্য-

জাত এই অধোগতি প্রকৃতই দেশের অশুভ লক্ষণ রূপে গণনীয়।

জমিদার ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা পল্লীর আশা ভরসার স্থল, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান মার্জ্জিত রুচির অনুযায়ী দ্রব্যাদি ও বিলাস-ব্যসন-সঞ্জাত ভ্রান্তিমূলক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পল্লীতে না পাওয়ায়, এবং কেহ কেহ বা চাকুরী ও ব্যবসায়ের মোহে সহরবাসী হইয়াছেন এবং এই পল্লীর জন্য, এই জন্মভূমির জন্য, তাঁহাদের ন্যায়ত কোন কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মত কোন দায়িত্ব আছে কি না তাহাও তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না। এখন এই পল্লীর সমূহ সঙ্কট কালে তাহার দিকে করুণামাখা আঁখিতে মুখ তুলিয়া চাহিবার আর কে আছে? সরকার বাহাদুর ত পল্লীতে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ করি[illegible]ছেন। সম্প্রতি স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের [illegible] পল্লী সংস্কার নামে যে একটি আন্দোলনের [illegible] উঠিয়াছে তাহার বিস্তৃতি ও আনুকূল্য বাংলার [illegible] সুদূর পল্লীতেও যে অনুসৃত হইবে, তাহারই বা [illegible] কি? সুতরাং বড়ই মর্ম্ম-বেদনায় ও নিরাশার [illegible] শ্বাসের সহিত পল্লীবাসীকে সেই কবির [illegible] বলিতে হয়:—

যদি কেও না আসে তোমার ডাকে
তবে একলা চলরে।
(ও ভাই) পথের কাঁটা রক্ত-মাখা চরণ তলে
তুমি একলা দলরে॥

স্বাস্থ্যকর গৃহ ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গতবারে আমরা সহরের বাড়ীগুলির স্বাস্থ্যের কথার আলোচনা করিয়াছিলাম; এবার পল্লী-গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার কথার আলোচনা করিব।

ঘর-গৃহস্থালীকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের কয়েকটি অতি সরল সহজপ্রাপ্য জিনিস দরকার—বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রন্ধন করা খাদ্য, বিশুদ্ধ জল ও সুনির্ম্মিত বাসগৃহ।

সহরের নূতন ও পুরাতন গৃহ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সহরের বাড়ীগুলি প্রায় কোটা বাড়ী। মধ্যে মধ্যে ক্বচিত দুই একখানা খোলার বাড়ী দেখা যায়। খোলার বাড়ীগুলির ফ্রেম প্রায় বাঁশ ও গরাণের দ্বারা নির্ম্মিত। আর দেওয়াল প্রায় মাটীর। কোথাও কোথাও মাটীর-গাঁথনি ইটের দেওয়ালের উপর খোলার চালও দেখা যায়।

খোলার বাড়ীগুলিতে আলোকের ও বায়ুর অভাব বেশী দেখা যায় না। তাহার কারণ, খোলার ঘরগুলি সারির পর সারি ভাবে নির্ম্মিত হয় না। একটী ছোট উঠানের চারিদিকে একসার ঘর তৈয়ার করা হয়। কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে শুধু এক সারি ঘর থাকে। কোথাও উঠানের তিনদিকে বা দুইদিকে মাত্র ঘর থাকে, বাকী [illegible] দিয়া ঘেরা থাকে। এই কারণে আলো ও বাতাস খেলিবার যথেষ্ট জায়গাও থাকে। তবে [illegible] যেখানে অল্প জায়গায় অনেক লোকের বাসের জন্য অনেক ঘর তৈয়ার করিতে হয়, সেখানে ঘরগুলি ছোট ছোট, অন্ধকার, আলোক ও বায়ুহীন হওয়া বিচিত্র নহে।

খোলার ঘরের মেঝে প্রায় মাটীর। [illegible] ড্যাম্প বা স্যাঁতসেঁতে। তবে কলিকাতার [illegible] বড় সহরে পুরাতন বাড়ীভাঙ্গা রাবিশ দুষ্প্রাপ্য [illegible] হওয়ায় অনেকে ঘরের মেঝে রাবিশ দিয়া শক্ত [illegible] [illegible] লইতে পারে। তাহার উপর এক পোঁচ [illegible] পলস্তারা লাগাইয়া লইলে স্যাঁতসেঁতে [illegible] অনেকটা দূর হইতে পারে। উঠানটিও [illegible] পিটিয়া বিলাতী মাটী দিয়া বাঁধাইয়া জল [illegible] জন্য ড্রেনের দিকে ঢালু করিয়া নির্ম্মাণ [illegible] এবং পাকা ড্রেন থাকিলে খোলার বাড়ী অস্বাস্থ্যকর হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে বাড়ী-[illegible] জীর্ণ সংস্কার করাইয়া লওয়া অতীব আবশ্যক।

কিন্তু বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। [illegible]গ্রামের অধিকাংশ গৃহই মাটীর দেওয়ালের উপর [illegible] চাল। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও দুই একখানা [illegible]টাবাড়ী দেখা যায়।

পল্লীগ্রামের ভূমির অবস্থা সর্ব্বত্র সমান নহে। [illegible] জমি উঁচু—বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত; [illegible] জমি নীচু—বাসগৃহ নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ [illegible]যোগ্য; অথচ বাধ্য হইয়া লোককে ঐ সকল স্থানে [illegible] নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হয়।

পল্লীর লোকদের অবস্থা এতই দরিদ্র, এতই হীন [illegible] অনেকেই খড়ের ঘরও ঠিক উপযুক্তভাবে নির্ম্মাণ [illegible]তে পারে না। সেইজন্য বহু লোককে সামান্য [illegible]-বেড়ার ঘরে বাস করিতে হয়। যাহাদের [illegible] উহারই মধ্যে একটু ভাল, সে মাটীর [illegible]য়ালের উপর খড়ের চাল নির্ম্মাণ করিয়া বাস [illegible]তে পারে। দেওয়াল তুলিবার জন্য মাটী প্রায়ই বাস্তুজমিরই [illegible] না কোন অংশ হইতে লওয়া হয়। এক হাত [illegible] দেড় হাত চওড়া করিয়া মাটী স্তরে স্তরে জমাইয়া [illegible] তোলা হয়। যাহার অবস্থা কিছু ভাল, [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে দুই তিন হাত উঁচু পোতা [illegible] করিয়া তাহার উপর দেওয়াল তুলে। কিন্তু [illegible] সে সামর্থ্য নাই, সে জমি যেমন অবস্থায় পায়, [illegible] উপর ঘর তুলিয়া থাকে। ইহাদের দুরবস্থা [illegible]। বর্ষাকালে তাহাদের ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত [illegible] মেজে, উঠান প্রভৃতি জলে ডুবিয়া যায়। এমন কি বেশী বৃষ্টি হইলে এই জলে দেওয়াল গলিয়া গিয়া ঘর পড়িয়া যায়।

যাহারা উচ্চ পোতা নির্ম্মাণপূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জল খুব বেশী হইলেও এবং তাহাদের বাড়ীর উঠান জলে ডুবিয়া গেলেও ঘরের ভিতর প্রায় জল দাঁড়ায় না। তবে জলপ্লাবনকালে অবশ্য স্বতন্ত্র অবস্থা। সে সময়টা জাতীয় বিপদ—ধনী-দরিদ্র সকলের ভাগ্যই প্রায় সমান দাঁড়াইয়া যায়।

পল্লীগ্রামের খড়ের ঘরের মাটীর মেঝে এবং দেওয়ালের কিয়দংশ প্রায় বারমাসই কিছু না কিছু স্যাঁৎসেঁতে থাকে। তবে উচ্চ জমিতে গৃহনির্ম্মাণ করিলে ড্যাম্পের পরিমাণ কিছু কম হয়। এই স্যাঁৎসেঁতে অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় ঘরের মেঝে হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে দেওয়াল হইতে একটু তফাতে মাচা নির্ম্মাণ করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করা। জল নিকাশের পাকা রকম বন্দোবস্ত করিতে পারিলে নীচু জমিও কতকটা শুষ্ক রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু জলনিকাশের সুব্যবস্থা করাই কঠিন। পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের বাস করিবার জমির পরিমাণ এত কম এবং এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত যে, একজন গৃহস্থের বাটীর জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইলে অপরের জমির উপর দিয়া ভিন্ন ড্রেন নির্ম্মাণ করা যায় না। অধিকাংশ গ্রামেই মিউনিসিপ্যালিটী নাই, সাধারণের যাতায়াতের পথ নাই, সকলের ব্যবহার্য্য সাধারণ ড্রেন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার সুবিধাও পাওয়া যায় না।

পল্লীগ্রামের খড়ের ঘরগুলির প্রধান দোষ এই যে, ঘরের দেওয়ালে জানালা রাখিবার প্রথা নাই। প্রায় প্রত্যেক ঘরে একটীমাত্র দ্বার থাকে। দ্বিতীয় দ্বার বা জানালা প্রায়ই থাকে না। তবে খুব সৌখিন লোক হইলে হয় ত আধ হাত চওড়া ও একহাত লম্বা একটী গবাক্ষ মাত্র থাকে। দরজাও এত অপ্রশস্ত যে, সাধারণতঃ সেই দরজা দিয়া যাতায়াতের সময়

মাথা নীচু করিয়া না গেলে চৌকাটে মাথা ঠুকিয়া যায়। এরূপ গৃহে অন্ধকারের অবাধ রাজত্ব এবং বায়ুর প্রবেশ নিষেধ। এই কারণে গৃহগুলি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কক্ষে জানালা না রাখিবার কারণ, কতকটা অবরোধ প্রথা, কতকটা জানালা রাখা ব্যয়বহুল বলিয়া। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে অবরোধ প্রথা একটু সঙ্কুচিত না করিলে চলে না। এবং মানুষের প্রাণের অপেক্ষা অর্থ নিশ্চয়ই বড় নহে ; এইটী বিবেচনা করিয়া জানালা নির্ম্মাণে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরিবারের লোক সংখ্যার অনুপাতে কক্ষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থ প্রায় স্বাস্থ্যরক্ষার এই অতি অবশ্য পালনীয় নিয়মটী মানিয়া চলিতে পারে না। একই ঘরে বহু লোককে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহার উপর আবার ঘরগুলিতে জানালা দরজা খুব কমই থাকে। এরূপ ব্যবস্থা যে কোন মতেই স্বাস্থ্যানুমোদিত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এক একটী কক্ষে দুই তিন জনের বেশী লোককে শয়ন করিতে হইলেই স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবেই। যেখানে নিতান্ত নিরুপায়, ঘরের সংখ্যা কম, পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী, সে স্থলে ঘরে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিতেই হইবে, এবং দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় জানালা দরজা খুলিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ পরস্পরের শ্বাস-প্রশ্বাসে ও শরীরের গরমে ঘরের বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া সকলেরই স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিবে। আর, শয়ন-কক্ষে আসবাবাদির উপদ্রব যত কম থাকে, ততই ভাল। সঙ্কীর্ণ গৃহে আসবাবে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া থাকিলে, লোকের বাস করিবার যেমন অসুবিধা, ঘরের বায়ু দূষিত হইবার সুযোগও তত বেশী।

আবার আসবাব বেশী থাকিলে, ঘর রীতিমত পরিষ্কার রাখা যায় না। তা ছাড়া, মশা মাছি কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় বিছা প্রভৃতি আসবাবের আসে-পাশে ও পিছনে লুকাইয়া থাকিবার সুবিধা পায়।

যদি এক কক্ষে অনেক লোককে থাকিতে [...] তবে ঘরের আয়তন বড় করিলে ততটা অসুবিধা [...] হইতে পারে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান লোকের [...] ১০০০ ঘন ফিট বায়ু হইলেই যথেষ্ট হয়। এই অনু[...] লোকসংখ্যা বুঝিয়া কক্ষের আয়তন নির্দ্ধারণ ক[...] একরকম করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া বাস করা [...] পীড়িত লোকদের জন্য অবশ্য ইহার অপেক্ষা বেশী [...] তনের বায়ু আবশ্যক হয়। তবে আমাদের পল্লীগ্রা[...] কুটীর ও সহরের খোলার বাড়ীগুলির দেওয়াল ও চা[...] মাঝে প্রায়ই কিছু না কিছু অবকাশ থাকে, এই [...] রক্ষা। এরূপ স্থলে এরূপ গৃহে প্রত্যেক লোকের [...] অন্যূন ৪০০ ঘন ফিট বায়ু হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা [...] না। মেঝে হইতে ছাদের উচ্চতা ৮ ফিটের [...] হইলে সে কক্ষ অস্বাস্থ্যকর। উচ্চতা দশ বার [...] হইলে অবশ্য ভালই হয়। পল্লী কুটীরগুলির চা[...] শীর্ষদেশ যথেষ্ট উচ্চ থাকায় তাহার ফল ভালই হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে [...] অতীব আবশ্যক ব্যাপার, এ কথা এ দেশের আপা[...] সাধারণ, ইতর ভদ্র সকলেই জানে। নিত্য ঘর [...] দেওয়া, ছড়া ঝাঁট দেওয়া, জঞ্জাল পরিষ্কার করা [...] বাড়ীতেই প্রায় অনুষ্ঠিত হয়। সহরে এই [...] জঞ্জাল বাড়ীর বাহিরে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, [...] মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লার গাড়ী আসিয়া প্র[...] তাহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া লোকালয় হইতে বহু [...] স্থানান্তরিত করে। পল্লীগ্রামে যে সব [...] মিউনিসিপ্যালিটী আছে সেখানে আঁস্তাকুড়ের [...] স্থানান্তরিত হয় বটে, কিন্তু নিত্য নহে। [...] প্রত্যহই আবর্জ্জনা লোকালয় হইতে দূরে [...] পারিলে উত্তম হয়। যে সকল স্থলে মিউনিসিপ্যা[...] নাই, সেখানে কিন্তু গৃহস্থের বাড়ীর বাহিরে বা[...] কিম্বা পুকুরধারে এই সকল আবর্জ্জনা দিনের [...] দিন ধরিয়া জমিয়া জমিয়া স্তূপাকার হইতে থাকে। [...]

[...] অব্যবস্থা গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অন্তরায় [...]। যথাসম্ভব এই আবর্জ্জনা গ্রামের বাহিরে [...] কৃষিক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য-[...] ও হইতে পারে, জমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে [...]। আবর্জ্জনা স্থানান্তর করিতে যদি কিছু [...] পড়ে, তবে গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া চাঁদা [...] এই ব্যয়ভার বহন করিলে কাহারও গায়ে [...] না, অথচ একটা মহৎ জনহিতকর কার্য্যও [...] পারে। পালা ক্রমে এক একজন [...] ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করাইলে [...] ষোল আনা উসুল হইয়াও আসিতে [...]।

[...] সহরের ন্যায় পল্লীগ্রামে ভূমি ততটা দুর্লভ নহে। [...] নে ধনী দরিদ্র সকলেই ইচ্ছা করিলে বাস গৃহের [...] একটু বাগানের মত করিতে পারে। এই [...] নে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় শাকসব্জি উৎপাদন [...] লে গৃহস্থের সংসার খরচ কতকটা কমিতে পারে। [...] গৃহস্থ উদ্বৃত্ত শাকসব্জি বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু [...] ভও করিতে পারে। শাকসব্জি ছাড়া কিছু [...] ফুলের গাছও লাগানো যাইতে পারে। শশা, [...], লাউ, কুমড়া, লঙ্কা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুণ [...] প্রয়োজন বুঝিয়া উৎপাদন করা যায়। বেল, [...], গোলাপ প্রভৃতি ফুলের চাষ করিলে বায়ুর [...] রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের চিত্তবিনোদনের [...] তাও হয়। পেয়ারা, আতা, ডালিম প্রভৃতি যে [...] ফলের গাছ খুব বড় হইয়া বায়ু বা আলোকের [...] গতির বাধা জন্মায় না, সেই সকল ফলের [...] গৃহ সংলগ্ন জমিতে লাগানো যায়। তবে [...] গাছ কিছু দূরে লাগাইতে হয় ; কেন না, কলা [...] ভূমি আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে থাকে। আর আম, [...] প্রভৃতি বড় গাছ, যাহার দ্বারা আলো ও [...] গতি রোধ হয়, বাড়ীর কাছ হইতে সুদূরে [...] রোপণ করা কর্ত্তব্য। ভিটা সংলগ্ন জমিতে বড় গাছের [...] নিম ও বেল প্রভৃতি দুই একটী গাছ রোপণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না ; বরং এই সকল গাছে বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

সহরে আজকাল জলের কল হওয়ায় জলাভাব অনেকটা নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে জলাভাব পল্লীবাসিগণের একটা মস্ত অভিযোগ। প্রায় গ্রামে পানীয় জলের, স্নানের, রন্ধনের উপযোগী জলাশয়ের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছে। সেকালে ধনী লোকেরা জন-সেবার উদ্দেশ্যে পুণ্য ও ধর্ম্মলাভের প্রলোভনে পুষ্করিণী, বৃক্ষ, মন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিতেন। কালধর্ম্মে লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন নূতন জলাশয় বেশী খনিত হয় না, পুরাতন জলাশয় সংস্কার ও যত্নাভাবে মজিয়া গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। খাল বিল ক্ষুদ্র নদী প্রভৃতি জলাশয়ের অবস্থাও ভাল নয়। অথচ, জলের অভাবে মানুষের এক দিনও চলিতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল ও রন্ধনার্থ জল সঞ্চয়ের জন্য অন্ততঃ একটী করিয়া রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থাকা আবশ্যক। স্নানের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী থাকা চাই। অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম, ঘর দোর ধোওয়া, গৃহপালিত পশুদিগের স্নান প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী রাখা আবশ্যক। গ্রামের জমিদারেরই গ্রামের জলসংস্থানের ভার লওয়া কর্ত্তব্য। জমিদার এই কার্য্যে উদাসীন হইলে, প্রজারা সম্মিলিত ভাবে নূতন পুষ্করিণী খনন বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া লইতে পারে ; এবং ঐ সকল পুষ্করিণীতে মাছের চাষ করিয়া পুষ্করিণী খনন বা তাহার পঙ্কোদ্ধারের ব্যয় যথাসাধ্য তুলিয়া লইতে পারে। পুষ্করিণী খনন অসাধ্য হইলে ইন্দারা খনন করানো চলে। অথবা টিউব ওয়েল বসাইয়া লইলেও জলাভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। এ বিষয়ে জেলাবোর্ড বা লোক্যাল বোর্ড গ্রামবাসীদের কতকটা সাহায্য করিতে পারেন।

জলসংস্থান বিষয়ে আমাদের পল্লীবাসীদের একটী বড় বদ্ অভ্যাস আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুটীর নির্ম্মাণের সময় দেওয়াল তুলিবার জন্য বাস্তু সংলগ্ন জমি

হইতেই ম'টী তুলিয়া লওয়া হয়। এইরূপে প্রায় প্রতি পরিবারের বাস্তুর নিকটে এক একটী ছোট ডোবার মত গড়িয়া উঠে। বর্ষাকালে এই ডোবায় জল সঞ্চিত হয়। যত দিন না ডোবার জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়, তত দিন এই ডোবার জলে গৃহ-কর্ম্ম এমন কি স্নান, রন্ধন এবং পান কার্য্য চলে। আবার ঘর দোর ধোওয়া জল এই ডোবায় আসিয়া সঞ্চিত হয়। পর্দ্দানশীন পরিবারের কুলনারীদের এই ডোবার জলই এক মাত্র অবলম্বন বলিলেও চলে। তাঁহাদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য বাড়ী ঘেরাও করিবার সময় ডোবাটিও পাঁচিল দিয়া কিম্বা দরমা বা ছিটা-বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া লওয়া হয়। তাঁহারা এই ডোবার জলে স্নান করেন, মূত্র ত্যাগ করেন, বাসন মাজেন, এবং প্রায় সকল রকম গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। অথচ এই ডোবার জল সাক্ষাৎ বিষ বলিলেই হয়। গৃহস্থের আবর্জ্জনার অধিকাংশ এবং পরিত্যক্ত যাবতীয় জল এই ডোবায় আসিয়া সঞ্চিত হইয়া ইহাকে নানা রোগের আকর করিয়া তুলে। আবার ম্যালেরিয়াবাহী মশকের ইহাই জন্মভূমি—বিহারক্ষেত্র—breeding ground! এই ডোবাগুলি যে কত শত শত লোকের অকাল-মৃত্যুর কারণ, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পল্লী-বাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এই ডোবা খননের প্রথা বন্ধ করিতেই হইবে। যে সকল ডোবা আছে, সে গুলি অচিরে ভরাট করিয়া ফেলিতে হইবে; এবং নূতন ডোবা খনন রহিত করিতে হইবে। গৃহ নির্ম্মাণের মাটী সংগ্রহ করিবার জন্য ডোবার পরিবর্ত্তে কূপ খনন করিলে চলিতে পারে। বেশী মাটীর দরকার হইলে কূপ গভীর করিয়া খনন করা যাইতে পারে; অথবা একাধিক কূপ খনন করা যায়। কূপে বারো মাস জল পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে গৃহ-কার্য্যের জন্য জলাভাব বহু পরিমাণে দূর হইতে পারিবে; অথচ ডোবায় যে ক্ষতির সম্ভাবনা, কূপ হইতে সে আশঙ্কা ততটা থাকিবে না। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণের সময় কূপের জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে, মধ্যে মধ্যে পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ ব্যবহার করিয়া সে আশঙ্কা অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যাইবে।

অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে গোরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, হাঁস প্রভৃতি পোষা হয়। গৃহপালিত পশু পক্ষীর বাসস্থান বাসগৃহ হইতে যথাসম্ভব দূরে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্ততঃ গোয়াল বাসগৃহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ভিটার অপর কোন অংশে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। আর গোয়াল-ঘর প্রত্যহ রীতিমত পরিষ্কার ও ধৌত করা আবশ্যক, যেন গোবর বা চোনা গোয়ালের মধ্যে পচিবার অবসর না পায়।

পল্লীবাসে মশামাছির উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। মাদুর আবর্জ্জনা প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। বাড়ী পরিষ্কার রাখিলে এই উপদ্রবের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিলে এবং ঝাড়িয়া লইলে ছারপোকার উপদ্রব থাকে না।

ফল কথা, বাসগৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী জানা না থাকার দরুণ আমাদের দেশে অকালমৃত্যুর পরিমাণ অনেক বেশী। জেলাবোর্ড, লোক্যালবোর্ড, মিউনিসি-প্যালিটী প্রভৃতির নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীদের বাসগৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী তাহাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া এবং তাহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে গো জাতির অধোগতি

[শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী, এম্-আর-এ-এস]

বঙ্গদেশে গো-জাতির যেরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দুগ্ধ মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, এবং জল মিশ্রিত দুগ্ধ অবাধে থরিদ বিক্রয় হইতেছে। খাঁটি দুগ্ধ পল্লীগ্রামেও মেলা দুর্ঘট—মিলিলেও ইহার মূল্য প্রতিসেরে চারি বা পাঁচ আনা; কদাচ দশ পয়সা বা তিন আনায় নামে। কলিকাতার ন্যায় সহরের আরও শোচনীয় দুরবস্থা। টাকায় আড়াই সের করিয়া খাঁটি দুগ্ধ বিক্রয় হয়। এমন দুর্ম্মূল্য দুগ্ধ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই। অন্যান্য প্রদেশের পল্লীগ্রামে, এবং অধিকাংশ সহরে, দুগ্ধের মূল্য টাকায় আট সের হইতে ষোল সের; কিন্তু বঙ্গদেশে এমন দুরবস্থা কেন ঘটিল, তাহার আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে গাভীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক অধিক, তাহা নিম্নস্থ তালিকা দেখিলে প্রতীয়মান হইবে।

প্রদেশ	গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	মহিষ গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	মোট লক্ষ
বঙ্গদেশ	৮১	৩	৮৪
বিহার ও উড়িষ্যা	২০	১০	৩০
আগ্রা	৪১	২৫	৬৬
অযোধ্যা	২০	১০	২০
পঞ্জাব	২৭	২৪	৫১
বোম্বাই	১৬	১০	২৬
মাদ্রাজ	৫৭	২৫	৮২

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাই যে, গাভীর সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে অধিক; লোক সংখ্যার হিসাবেও বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা গাভীর সংখ্যা কম নহে। তথাপি বঙ্গদেশে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গলার গাই উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ দেয় না।

ইয়োরোপে, আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ অসংখ্য গো বধ করা হইলেও, তথায় দুগ্ধ সুলভ, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে তিন পোয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে; আমরা কিন্তু গড়ে অর্দ্ধ ছটাক দুধও পাই না। ইয়োরোপে সহরের বাহিরে দুগ্ধ টাকায় অন্যূন ৮ সের ও সহরে ৪ সের। তাহারা গো-খাদক হইলেও গরুর যত্ন করিয়া থাকে। আর আমরা হিন্দু, অন্ধ বিশ্বাসে গাভীকে মাতৃজ্ঞানে এবং ষাঁড়কে পিতৃজ্ঞানে পূজা করিলেও, উহাদিগকে যত্ন করি না, ও উপযুক্ত পরিমাণে আহার দিই না। আহার অভাবে বাঁটের দুগ্ধ শুষ্ক হয়, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, ও প্রতিকারের চেষ্টা করি না।

বঙ্গদেশে দুগ্ধ সঙ্কটের দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাঙ্গলার গরু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ দৈনিক অর্দ্ধ হইতে একসের দুগ্ধ প্রদান করে। পাঁচটা গাভীও এক পরিবারের দুগ্ধ যোগাইতে সমর্থ হয় না। ইয়োরোপের এক একটী গাভী সাধারণতঃ ৫০ জনকে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের একটি গাভী ১০ জনকে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, কিন্তু বাঙ্গলার গাভী হইতে একজন লোকেরও উপযুক্ত দুধ পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদিগের মতে বেহারের ও বাঙ্গলার গরু একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আকৃতি ও দুগ্ধের কথা বিবেচনা করিলে, উহারা যে একই শ্রেণীভুক্ত, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইবে না। বাঙ্গলার গরুর অধঃপতনের প্রধান কারণ দুইটি—একটী খাদ্যের অভাব, অন্যটী ষাঁড়ের অভাব। ইহাদের মধ্যে কোনটী প্রধান, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে দুইটীই প্রধান

[বাঙ্গালার গাই]

এবং দুইটাই সমতুল্য। খাদ্যাভাবে বলিষ্ঠ জীবজন্তু দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। অপুষ্টিকর অখাদ্য খাইয়া কোন জাতি কোন কালে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না; তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। জীব জন্তুর আহারের অভাব না থাকিলেও, বলিষ্ঠ সুপুষ্ট সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত সুবীজের প্রয়োজন। কোন সারবান ক্ষেত্রেও অপক্ক কিম্বা নষ্ট বীজ অঙ্কুরিত হয় না; অপক্ক বীজ অঙ্কুরিত হইলেও উহা নিস্তেজ হইবে ও অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে, নতুবা উহার বীজে জীবনীশক্তি থাকিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য কথা। বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে ষাঁড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরিণত বয়স্ক ষাঁড় দ্বারা পাল রক্ষা হইতেছে। এই অপক্ক বীজ দ্বারা উৎপন্ন বাঙ্গলার গো-জাতি শীর্ণ খর্ব্বাকৃতি হইয়া ধ্বংস মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।*

উৎকৃষ্ট গাভী হইতে নিকৃষ্ট ষাঁড় দ্বারা নিকৃষ্ট বংশ উৎপন্ন হয়; অন্যদিকে নিকৃষ্ট গাভীও উৎকৃষ্ট ষাঁড় দ্বারা উৎকৃষ্ট বংস প্রদান করিয়া থাকে। নিকৃষ্ট ষাঁড় দ্বারা প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীর বৎসা তেমন দুগ্ধবতী হইবে না।

[বাঙ্গালার অপরিণত বয়স্ক বৃষ]

* বাঙ্গলায় গোরুর যে কি ঘোর দুরবস্থা, তাহা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। দেশে দেশে বাঙ্গলার গোরুর দুর্নাম রটিয়াছে যে, বাঙ্গলার গোরু দুধ দেয় না। ইহাতে গোরুর একটুও দোষ নাই। দোষ সম্পূর্ণ তাহার, যে গোরু পোষে, অথচ তাহার পালনে অবহেলা করে। আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন দোষ কার—গোরুর, না, যে পালে তাহার।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এক দিন দেখিলাম, একজন কৃষক ও তাহার একটী কিশোর বয়স্ক পুত্র একটী পাশুটে রঙের গোরু ও তাহার একটী সাদা বাছুর লইয়া আমাদের বাড়ী দিয়া যাইতেছে। এদোর, ওদোর ঘুরিয়া সে আমাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, গোরু কিনবেন? আমরা গোরু পুষিতাম না, কিনিবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু ব্যক্তি বড় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কথায় কথায় শুনিলাম, সে সকাল হইতে গোরু লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। কৃষকটি, তাহার পুত্র, গোরুটি ও তাহার বাছুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছে বোঝা গেল। আমার মন ভিজিল, আমি গোরু কিনিতে রাজী হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দুধ দেবে? সে বলিল, গোরু আড়াই সের করিয়া দুধ দেয়। আমি ভাবিলাম, যখন কৃষক বলিতেছে যে, গোরুটি রোজ আড়াই সের করিয়া দুধ দেয়, তখন প্রকৃত পক্ষে পাঁচ পো আশা করিতে পারা যায়। তার পর দর জিজ্ঞাসা করিলাম। সে প্রথমে কত দর বলিয়াছিল, তাহা আমার মনে নাই। সম্ভবতঃ যাহা বলিয়াছিল, তাহা বেশী বোধ হওয়ায় এবং আমার গোরু পুষিবার তেমন ইচ্ছা না থাকায়, আমি তাহার দর বেশী মনে করিয়া কিনিতে অস্বীকৃত হই। অবশেষে অনেক কষাকষির পর গোরুটির দর স্থির হয় পোনেরো টাকা। বোধ হয় লোকটি খুব দুরবস্থায় পড়িয়াছিল—টাকার তাহার বড় দরকার, তাই সে ঐ পনেরো টাকায় গোরু ও বাছুরটি আমাকে বিক্রয় করিল। আমি তাহাকে টাকা দিলাম। সে যাইতে উদ্যত হইলে, আমি তাহাকে বসাইয়া তাহাকে ও তাহার পুত্রকে ভাত খাওয়াইলাম। যাইবার সময় সে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গেল। গোরু আড়াই সের দুধ দেয়,—তাহার এই আশ্বাসে আমি সন্দেহ প্রকাশ করায় সে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিল, গোরুটি রোজই আড়াই সের করিয়া দুধ দেয় বটে। কিন্তু তাহার কথা যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ ছিল না, কেন না, সেদিনকার সকাল বেলার দুধ দোহা হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, আমার মন হইতে সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হইল না। আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া গোরু কিনিলাম। আমার মনে বিশ্বাস ছিল যে, যদি গোরুটি বাস্তবিকই আড়াই সের করিয়া দুধ দিত, তাহা হইলে কৃষক কখনই পনেরো টাকায় গরু ও বাছুর বিক্রয় করিতে রাজী হইত না।

যা হোক, গোরু ত কিনিলাম। আগে গোরু কখনও পুষি নাই—গো পালন সম্বন্ধে আমার কিম্বা বাড়ীর অপর কোন লোকের কোন অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। আমাদের পাশের বাড়ীর এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গোরু ছিল। তাঁহাদের পরামর্শানুযায়ী গোরুর সেবার ব্যবস্থা হইল। দুধ দুইবার জন্য একজন গোয়ালাও তাঁহারাই ঠিক করিয়া দিলেন। সেই দিন বৈকালে দোহন করিয়া সামান্যই দুধ পাওয়া গেল।

পল্লীগ্রামে গো-পালনের সুবিধা অসুবিধা কিরূপ তাহা আমরা কিছুই জানিতাম না—আমরা চির দিন কলিকাতাবাসী—সহুরে। কলিকাতায় গোরু পোষার অসুবিধা বিস্তর, এবং তাহা বিলক্ষণ ব্যয় সাধ্যও বটে। আর আমরা ধনী নই—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। এবং কলিকাতায় বিনামূল্যে একগাছি তৃণও পাওয়া যায় না। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও যখন গোরুটি কেনা হইয়াছে, তখন যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে লাগা গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে কোন মাঠ বা খোলা যায়গা ছিল না, যেখানে গোরু চরিতে ও ঘাস খাইতে পারে। ভরসার মধ্যে খড়, খোল, ভুসি ও রন্ধনশালার তরকারীর খোসা ও ভাতের ফেন। যাহা জুটিত, তাহা আমরা তাহাকে আদর করিয়া পেট ভরাইয়া দিতাম।

যে দিন গোরু কেনা হয়, সে দিন দুধ বিশেষ পাওয়া যায় নাই। পর দিন দুই বেলা দুধ দোহন করিয়া দেখা গেল, বিক্রেতা ঠকায় নাই—মিথ্যা কথা বলে নাই—গোরুটি যথার্থই আড়াই সের করিয়া দুধ দেয় বটে।

গোরুটির চেহারা রোগা ছিল—বেশ বুঝিলাম, কৃষক তাহাকে রীতিমত খাইতে দিত না, কিম্বা দিতে পারিত না। বাছুরটির বয়স বেশী নয়; খুব হৃষ্ট পুষ্ট না হইলেও নিতান্ত রোগাও ছিল না—বোধ হয় কিঞ্চিৎ মায়ের দুধ পাইত বলিয়া; কারণ সে তখনও জাব খাইতে শিখে নাই।

যাহা হউক, গোরু পুষিতে লাগিলাম, ও যথাসাধ্য যত্নও করিতে লাগিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে গোরুর চেহারা ফিরিতে আরম্ভ করিল, গায়ে মাংস গজাইতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল, দুধেরও পরিমাণ একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে। দুই তিন মাসের মধ্যে গোরু দৈনিক পাঁচ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতে লাগিল। তাহার দুধ খুব মিষ্ট ছিল। গোয়ালার কাছ হইতে যে দুধ আগে আমরা কিনিয়া খাইতাম, তাহাতে কখনও এতটা মিষ্টতা দেখি নাই। দুধ জ্বাল দিবার পর তাহার উপর বেশ পুরু পীতবর্ণের একটী সর পড়িত; দুধের রঙও ঈষৎ পীত ছিল। গোরু ও বাছুর দুইই কিছু দিনের মধ্যেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া প্রতিবেশীগণের দৃষ্টি ও বাহবা অর্জ্জন করিয়াছিল।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাঙ্গলার গোরুর দোষ কি এবং কোথায়? মিছামিছি দেশ বিদেশে তাহার এত দুর্নাম রটে কেন? কলিকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে নানা অসুবিধার মধ্যে গোরু পুষিয়া ও সমস্ত জিনিস কিনিয়া খাওয়াইয়া এবং অতি সামান্য মাত্র যত্ন করিয়া যখন এমন সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তখন পল্লীগ্রামে খোলা মাঠে চরিতে পাইলে, রীতিমত খাইতে পাইলে, এবং যথোচিত যত্ন পাইলে, বাঙ্গলার গোরু সাধারণতঃ যে পরিমাণ দুধ দেয়, তাহার অপেক্ষা আরও অনেক বেশী দুধ যে দিতে পারে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এখন বুঝিয়া দেখুন, যাহাদের গোরু আছে, প্রধানতঃ তাহাদের অযত্নেই বাঙ্গলার গোরু দুর্দ্দশার চরম শিখরে উঠিয়াছে

এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন কোন বিশেষত্ব থাকে; ঐ বিশেষত্ব নানা কারণে ঘটিয়া থাকে। একই পিতা মাতার সন্তান একই স্থানে লালিত পালিত হইলেও, তাহাদের মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। উত্তম ষাঁড় নির্ব্বাচন দ্বারা পালের উন্নতি হইবে, ইহাতে ভুল নাই। নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বন করিয়াই ইয়োরোপের গো জাতির অসীম উন্নতি ঘটিয়াছে। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের কোন জাতীয় গাভী দৈনিক ৪।৫ সেরের অধিক দুগ্ধ প্রদান করিত না। বর্ত্তমানে তথাকার গাভীগণ দৈনিক গড়ে ২০ হইতে ৩০ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। যে গাভী হইতে অর্দ্ধ মণের অধিক দুধ পাওয়া যায় না, সে গাভী তাহারা পালন করিবে না এবং ইহার বংশ রক্ষা করিবে না।—যে ষাঁড়ের বাচ্চা দুগ্ধবতী গাভীতে পরিণত হইবে না, সেই ষাঁড় এবং তাহার বাচ্চা

ষাঁড় কখনও পালরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইবে না। যথা বিহিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ষাঁড় নির্ব্বাচন করিলে, আমরা এখনও অধঃপতিত বাঙ্গালার গো জাতির উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ। কিন্তু বাঙ্গালার গরুর এত অধঃপতন হইয়াছে যে, এই শ্রেণী হইতে উপযুক্ত ষাঁড় সংগ্রহ করা দুরূহ হইবে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেহার ও বাঙ্গলা দেশের গরু একই শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং বেহার হইতে ষাঁড় আমদানী করিয়া আমরা সহজে বাঙ্গলা গরুর উন্নতি করিতে পারি।

বাঙ্গলার গরুর বিশেষত্ব এই যে, এই দেশের বলদ লাঙ্গলে খুব মজবুত। অন্য প্রদেশের বলদ বাঙ্গলার বলদের ন্যায় জল বৃষ্টিতে লাঙ্গল টানিতে সমর্থ হইবে না। গাড়ী টানিতেও এই শ্রেণীর বেহারের বলদ বিখ্যাত। এই শ্রেণীর গাভী দুগ্ধের জন্য শ্রেষ্ঠ নহে। বলা বাহুল্য, বেহারের গাভী বাঙ্গলার গাভী অপেক্ষা উত্তম। বেহারের গাভী দৈনিক ৪।৫ সের দুগ্ধ দেয়। ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাবের মণ্টোগোমারী (মুলতানী) গাভী দুগ্ধের জন্য শ্রেষ্ঠ। আকৃতিতে ইহারা খুব বৃহৎকায় নহে। ইহারা বাংলার জল বায়ুও সহ্য করিতে পারে। গাড়ী ও লাঙ্গল টানিতেও এই শ্রেণীর বলদ মন্দ নহে; সুতরাং মণ্টোগোমারী ষাঁড় ব্যবহার দ্বারা বাঙ্গালার গাভী-বাচ্চার যেমন দুগ্ধের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইবে, সেইরূপ উহাদের বলদ দ্বারা লাঙ্গল ও গাড়ীর কাজও চলিবে। কলিকাতা সহরে আমরা আর এক জাতীয় বৃহৎ গাভী দেখিতে পাই। ইহাদিগকে নাগড়া গাভী বলা হয়। দিল্লি হইতে এই সকল গাভীর আমদানী হয়। এই জাতীয় গাভী দেশী গাভীর ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু। অযত্নে এই গাভী যেরূপ ভাবে পালন করা যায়, মণ্টোগোমারী গাভী সেইরূপ ভাবে বাঁচিবে না। মণ্টোগোমারী গাভীকে উত্তম পরিষ্কার ঘরে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যহ মাঠে চরাইতে হইবে। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে জলে ধৌত করা আবশ্যক। নাগড়া গাভীকে এত তদ্বির করিতে হয় না। এই জন্য

[মণ্টোগোমারী গাই]

কলিকাতার প্রধানতঃ পশ্চিমা গোপেরা দেশী ও নাগড়া গাভী পালন করে। এই গোপগণ গরুদিগকে উত্তম খাদ্য প্রদান করে বলিয়া তাহারা মণ্টোগোমারী গাভী হইতে দৈনিক ১৪।১৫ সের, নাগড়া হইতে ৯।১০ সের ও দেশী গাভী হইতে ৪.৫ সের দুগ্ধ লাভ করিয়া থাকে।

আইন দ্বারা গোবধ বন্ধ করিলেই গোজাতির উন্নতি হইবে ও দুগ্ধের অভাব দূর হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। গো-জাতির উন্নতির জন্য খাদ্য ও জনন প্রণালীর উন্নতির ব্যবস্থাই কেবল সফলযোগ্য। এই বৃহৎ কার্য্য সমাধা করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন! এতদুপলক্ষে ইয়োরোপের ধনীগণ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আমাদের দেশের ধনীগণ নীচ তামাসায় অসংখ্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশের সাধারণ উন্নতির জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতে তাঁহাদিগকে বড় একটা দেখা যায় না। ভয় পাইলে বা ঘরে বসিয়া শুধু জল্পনা কল্পনা করিলে চলিবে না। প্রকৃত স্বদেশভক্ত কর্ম্মী লোকের সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায়ই অর্থাভাব ঘটে না। মহাত্মা গান্ধী আমাকে এই কথাই বলিয়াছেন।

কথা বলা আমাদের যথাতিরিক্ত হইয়াছে, এখন কাযে অগ্রসর হওয়া চাই! গো-জাতির উন্নতি না হইলে বাঙলার শিশুর উন্নতি নাই, শিশুর উন্নতি ব্যতিরেকে জাতির উন্নতি অসম্ভব! আজ জীর্ণশীর্ণ উপেক্ষিতা গোমাতার উন্নতিকল্পে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে চান্ কয়জন!

কি না। এবং হিসাব করিয়া দেখুন, যে পরিমাণ দুধ বাঙ্গলার গোরু হইতে স্বচ্ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা না পাওয়ায় আমাদের কতটা জাতীয় ক্ষতি হইতেছে। গোরুকে রীতিমত খাইতে দিলে ও যত্ন করিলে এই ক্ষতি নিশ্চয়ই নিবারিত হইতে পারে।

সহকারী সম্পাদক—"স্বাস্থ্য সমাচার"।

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সপ্তাহ

[শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় এম-এ]

এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও উপকারিতার বিষয়ে প্রায়ই ...র সমালোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। সমালোচকেরা ...লিয়া থাকেন, ইহাতে দেশের বিশেষ কোনরূপই ...কার হইবে না, ইহা কেবল একটা হুজুগ মাত্র এবং ...অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, উহা তাহার চেয়ে ...নেক ভালরূপ ব্যয়িত হইতে পারিত। এই সকল প্রশ্নের ...রূপে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি বলা ...ইতে পারে যে, যে সকল অনুষ্ঠানে মানবজাতির মঙ্গল ...তাহা একেবারে হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে ...। যখন আমরা বাঙ্গলা দেশে মাতৃমৃত্যুর ও শিশু-...মৃত্যুর হার আলোচনা করি, তাহাতে দেখিতে পাওয়া ...যে বাঙ্গলা দেশে ৬০০০০ হইতে ৭৫০০০ মাতার ...কালীন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ও প্রায় ২০০০০০র উপর ...শিশুমৃত্যু ঘটে। ইহার কারণ খুঁজিয়া দেখিলে দেখা ...যে, প্রসবের সময় দুর্ঘটনা, আঁতুড় ঘরে জ্বর, ধনুষ্টঙ্কার ...তিকা রোগই প্রসূত ও প্রসূতির মৃত্যুর বিশেষ কারণ ...হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ইহা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ ...আছে, যাহাতে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া ...। ঘটনা মাত্রেরই হেতু উপস্থিত থাকে; তন্মধ্যে ...কয়েকটি অনিবার্য্য ও কয়েকটি নিবার্য্য। অনিবার্য্য ...গুলির উপর আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না; কিন্তু ...নিবার্য্য হেতুগুলি জানিয়া শুনিয়া যদি আমরা দেখিয়াও ...না দেখি, তাহা হইলে সে দোষ আমাদেরই, অপরের ...। অপরাপর সভ্যজাতি এ বিষয়ের উদাহরণস্থল। ...লেডী লিটন একস্থলে বলিয়াছেন যে, ২৫ বৎসরের ...মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল বিষয়ক অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার মাতৃ-...মণ্ডলীকে জানানই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ইহা হইতে ...দেখা যায় যে ইংলণ্ডেও ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ...মত শোচনীয় অবস্থা ছিল; কিন্তু উপর্য্যুপরি চেষ্টায় ও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা নিবার্য্য কারণগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি আমরা মাতা ও শিশুদের অকালমৃত্যু হইতে বাঁচাইতে চাই, তবে সে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। অপরাপর কারণের উপর যতই জোর দিই না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, যত দিন আমাদের মাতাগণ তাঁহাদের মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবেন, তত দিন অকালমৃত্যু তাঁহাদের ও তাঁহাদের শিশুদের গ্রাস করিবেই। নোংরা অশিক্ষিত দাই, অপরিষ্কার আঁতুড় গৃহ ও তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কুসংস্কার ও কিয়ৎপরিমাণে বাল্যবিবাহ প্রায় ৩০০০০ মাতা ও ১৫০০০০ লক্ষ শিশুর মৃত্যুর কারণ। এই হেতুগুলি নিবার্য্য। যদি এইগুলির উপরে আমাদের একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে ও সেইগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে আমরা এতগুলি প্রাণীহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখনই এই কথাগুলি বলিতে চেষ্টা করা হয়, তখনই একদল সমালোচক তাঁহাদের কূট তর্ক দ্বারা অনিবার্য্য কারণগুলিকে সম্মুখে আনিয়া খাড়া করেন ও ভীষণ তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন। অবস্থা ঠিক যেন "ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা"। যেটি সম্ভব সেটিকে ছাড়িয়া, যেটি পারিব না সেইটি লইয়া তর্ক করা। মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠান মাতা ও শিশুদের জন্য না হইয়া, আমার মনে হয় যে, যদি শিশুদের পিতাদের শিক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে বিশেষ ফললাভ হইত; কারণ যাঁহাদের হাতে এই মাতাদের ও সদ্যপ্রসূত শিশুদের ভার ন্যস্ত, তাঁহারা অতিশয় উদাসীনভাবে এই নোংরা আঁতুড় ঘরের কথা কিংবা অশিক্ষিতা ধাত্রীর নিয়োগের কথা বলিলেই বলেন যে, ওটা মেয়েদের কাজ—আমাদের উহাতে হস্তক্ষেপ করা ভাল দেখায় না।

অথচ অন্য সকল সাংসারিক বিষয়ে তিনিই হাকিম হইয়া কাজ করেন। যেখানে কোন একটি রীতি বা কুসংস্কার বদলাইতে হইবে সেইখানেই আমাদের পুরুষত্ব গর্জ্জন করিয়া বলে, ওঃ, ওটা মেয়েলী কাজ, আমাদের নয়। কোনরূপে মনকে আঁখি ঠারা। যদি আজ সকল গৃহস্থের পুরুষ অভিভাবক এই নারকীয় আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে কি আজ এতগুলি মাতার ও সদ্যপ্রসূত শিশুর মৃত্যু ঘটিত? এই অনুষ্ঠানের একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই,—আমাদের মাতারা ও ভাবী মাতারা যাহাতে তাঁহাদের নিজেদের ও তাঁহাদের শিশুদের কল্যাণকর বিষয়গুলি জানিতে ও বুঝিতে পারেন ও সুস্থ ও সবল শিশুজাতিকে উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন ও তাঁহাদের অপরাপর অশিক্ষিতা ভগ্নীদিগকে প্রসবকালীন কুসংস্কারের বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন, এবং যাহাতে পিতৃস্থানীয় পুরুষেরা তাঁহাদের এই কুসংস্কার অপনোদনে সহায়তা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে বলা বিশেষ প্রয়োজন নাই; কারণ, যদি প্রত্যেক বৎসর গ্রামে গ্রামে এইরূপ অনুষ্ঠান হয়, অশিক্ষিত ও গরীব মাতারা যাঁহারা ঘোর কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, দেখিয়া শুনিয়া বুঝিবেন যে, তাঁহাদের কি করা আবশ্যক ও মধ্যে মধ্যে সাধারণ চেষ্টা দ্বারায় (baby clinic) শিশুরোগ চিকিৎসালয় খোলা হইতে পারে, যাহাতে গরীব মাতারা, আসিয়া প্রসবকালীন অথবা তৎপরে শিশুসহিত সাহায্য পাইতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের ফলে কলিকাতায় প্রায় ৫টী এইরূপ Baby clinic ও ঢাকায় একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, যে অর্থব্যয়ে এই মাতৃমঙ্গল কার্য প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠিত হয়, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া মাতা ও সদ্যঃপ্রসূত শিশুদের প্রাণরক্ষা করিয়া তাহার সুদ ও আসল শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

"সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি"

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

আমরা সম্প্রতি "বঙ্গলক্ষ্মী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পাইয়াছি: "বাংলা দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য "সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি" নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই মুখপত্র স্বরূপ "বঙ্গলক্ষ্মী" বাঙ্গলার নারী সমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত" হইতেছে। আমরা "বঙ্গলক্ষ্মী"র তিন সংখ্যা—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ—"সূচনা"য় দেখিতেছি, "বঙ্গলক্ষ্মী"তে বাঙ্গলার মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারী শিক্ষার অবস্থা এবং নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

আজকাল বাঙ্গলা সংবাদপত্রে এই নারীমঙ্গল সমিতির কথা খুব বেশী পরিমাণে আলোচিত হইতেছে। ইহা কেবল ফাঁকা আওয়াজ নহে—এই সমিতির দ্বারা প্রকৃত কাজও কতক কতক হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যুধ্যমান দেশসমূহের সমর্থ পুরুষমাত্রেই এই যুদ্ধে চলিয়া যাওয়ায় পুরুষদের কাজ সব নারীদিগকেই করিতে হইয়াছিল। কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া নারীরা তাঁহাদের শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করেন। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে নারীরা কেবল নারীজনোচিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু জাতীয় বিপদের দিনে বাধ্য হইয়া যখন তাঁহারা পুরুষোচিত ও পৌরুষব্যঞ্জক কার্য্যগুলিও করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের দিব্যনেত্র খুলিয়া গেল। এত দিন তাঁহারা প্রায় সকল কাজেই পুরুষদিগের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। এখন হইতে তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। তখন হইতেই বিশ্বময় একটা নারীজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া নারীজাতি আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতবর্ষের উপকূলেও আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। শতাধিক বৎসর ইংরেজ শাসনাধীন থাকিয়া ভারতের নারীজাতি যে সামান্য শিক্ষার আলোক পাইয়াছিলেন, সেই অল্পমাত্র আলোকের স্বাদ পাইয়া তাঁহারা তাহাতে তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, আরো আলো আরো আলোর (Light ! Light ! more Light !) জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই জ্ঞানালোক লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে বঙ্গদেশে কয়েকটি নারী-সমিতি স্থাপিত হইল, এবং সহরে ও মফস্বলে অনেকগুলি নূতন বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। "সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি" সেই দেশব্যাপী নারী-জাগরণেরই একটী অভিব্যক্তি।

এখন, যাঁহার নামে এই মহদনুষ্ঠানের সূচনা, সেই সরোজ নলিনী কে? এই মহিয়সী মহিলা আমাদের [illegible] গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের পত্নী। রাজকার্য্যের গুরুতর পরিশ্রমের পরেও দত্ত মহাশয় অবসর পাইলেই বহু জনহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেইরূপ অনুষ্ঠানের বিবরণ মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন স্বামী, পত্নীও তদ্রূপ। ইনি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন (কিছুদিন পূর্ব্বে সরোজনলিনী লোকান্তরিতা হইয়াছেন)। স্বামীর প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যেই তিনি সহযোগিতা করিতেন। সমগ্র বঙ্গে বহু সংখ্যক নারী সমিতি গঠনের কল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রসূত। বঙ্কিম বাবু তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে বলিয়া গিয়াছেন—হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে

রাখিবে? স্বর্গীয়া সরোজনলিনীও বুঝিয়াছিলেন—নারীর মুক্তি সাধনের ভার নারী না লইলে কে লইবে? "তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি' নামে একটী কেন্দ্র সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।" নারীদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। নারী-শিক্ষা বিধানের জন্য এই সমিতি হইতে সুবিজ্ঞ বক্তাদিগকে ম্যাজিক লণ্ঠন সহ মফঃস্বলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বক্তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, খাদ্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বুঝাইয়া দিবেন। কলিকাতার কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গলা দেশে মাত্র ৮।৯টি মহিলা সমিতি ছিল। কেন্দ্রীয় সমিতির কয় মাসের চেষ্টায় ৪০।৪২টি স্থানে মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গে এখন মহিলা সমিতির সংখ্যা ৪৯টি। এই সকল মহিলা সমিতির মধ্যে কোন কোনটির চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কোথাও চরকা চলিতেছে। কোথাও কোথাও বা সেলাইয়ের কাজও হইতেছে। কোন কোন সমিতি শিল্পাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক খদ্দর প্রস্তুত ও বিক্রয় করাইতেছেন।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' প্রবন্ধে বাঙ্গলার নারীজাতির শোচনীয় দুর্দ্দশার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নারীজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য "কে অগ্রসর হইবে?" বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশ্ন করিবার পর চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, অথচ, এই মহান্ কার্য্য সাধনের জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। স্বর্গীয়া সরোজনলিনী আজ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, বলিয়াছেন, নারীজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য নারীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথাগুলি এই—"আমি তাই আমাদের দেশের মা বোনদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন—প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন

করুন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন। তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন্, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।” সরোজনলিনী যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর চেষ্টায় আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের শান্তি-পূর্ণ গণ্ডীবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার বিলক্ষণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়াছে; আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-ধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভগ্ন সমাজ-দেহ হইতে এখনও নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে নাই; কারণ, ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তত সহজ নহে। কাজেই, ভবিষ্য বাঙ্গালী সমাজ কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে, তাহা এখনও বলা যায় না। অতীত আমাদের হস্তচ্যুত; অনাগত সমাজ-ব্যবস্থার উপরও এখন কোন প্রভাব পরিচালনের সামর্থ্য আমাদের নাই। বর্ত্তমান সমাজ লইয়াই আমাদের কারবার। সমাজের অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, এই অবস্থাতেই যথাসাধ্য সমাজ-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া, সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে, সুখে না হউক অন্ততঃ স্বচ্ছন্দে, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এবং যাহাতে অচির-ভবিষ্যতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাই এখন সমাজের মঙ্গলকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার তীব্র ও উজ্জ্বল আলোকে আমাদের স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাচীন সভ্যতালোকের দীপ্তি ম্লান হইয়া লোকের চক্ষে একটা ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে। আমরা একটা মস্ত বড় দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছি—প্রাচীন পন্থার অনুসরণ করিয়া চলিব, না, নব্য পন্থা অবলম্বন করিব? দেশকাল পাত্রের উপযোগী করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে, সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, ইহা ঠিক। সেই জন্য, এ দেশে যেমন যুগে যুগে সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তদনুযায়ী করিয়া সমাজেরও মতি গতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছে; তাই আমাদের সমাজ এখনও টিকিয়া আছে।

আজ আবার একটা নূতন সমাজ-বিপ্লবের সূ... আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুদূর প্রতীচ্য ভূমি হইতে এক অতি তেজস্বী জড়বাদী নব সভ্যতালোক ... শিক্ষালোক আসিয়া আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা... প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতেছে। পূর্ব্বতন যুগগুলিতে ... আমরা এইরূপ আঘাত খাইয়াছি; এবং তাহা ... করিতেও পারিয়াছি। বাহির হইতে যাহা আসিয়াছি... তাহাকে আমাদের নিজস্ব করিয়া লইয়া, আমাদের ... সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া মিশাইয়া লইয়া, এক... রফা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি। বর্ত্তমান প্রতী... সভ্যতাকেও কি আমরা সেই ভাবে নিজস্ব করি... লইতে পারিব, না একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িব? ... প্রশ্নের উত্তর একমাত্র মহাকালই দিতে পারে। ... এই জটিল প্রশ্নের উত্তর সেই মহাকালের জন্য রাখি... দিয়া, আমরা কেবল বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই আলোচনা করিব।

প্রাচীন কালে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির কর্ম্ম বিভা... ছিল। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বাহিরে, নারীর ছি... শুদ্ধান্তঃপুরে। উভয়েই উভয়ের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিত। ... প্রতীচ্য ভূমিতে এই শ্রেণীর কর্ম্মবিভাগ নাই—... বাহিরের কোন পার্থক্য নাই; সদর অন্দরের ভে... ভেদ নাই। প্রতীচ্য ভূমিতে পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষে... এখন অনেকটা এক্ই। পূর্ব্বে যদিই কিছু পার্থক্য থাকিয়া থাকে,—নারীরা আন্দোলন করিয়া সে পার্থক্য টুকু রহিত করিয়াছেন। যেটুকু বাকী ছিল, ... ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ সেটুকুও শেষ করিয়া দিয়াছে।

কতকটা প্রতীচ্য সমাজ ও সভ্যতার দৃষ্টান্তে, এবং কতকটা বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার ফলে আমাদের সমাজের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ফলে সেকালের রীতিনীতি এবং কর্ম্ম-বিভাগের আদর্শ নিখুঁত ভাবে মানিয়া চলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

জীবন-সংগ্রাম ক্রমে প্রবল হইতেছে। জীবিকার্জ্জন ও সংসার প্রতিপালন পূর্ব্বে একমাত্র পুরুষের কার্য্য ছিল। এখন পুরুষ একা আর সেই ধাক্কা সম্পূর্ণরূপে সামলাইতে পারিতেছে না—সে ধাক্কা পুরুষকে অতি-ক্রম করিয়া নারী-সমাজকেও স্পর্শ করিতেছে। অর্থাৎ অনেক স্থলে জীবন-সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে নারীরও যোগ দেওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সেকালে যখন দেশে লোক সংখ্যা কম ছিল, টাকার মূল্য বেশী ছিল, প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইত এবং তাহার মূল্যও সস্তা ছিল, তখন কেবল মাত্র পুরুষের পরিশ্রমের ফলে পরিবারের জীবিকা উপার্জ্জিত হইত, এবং তাহাতে এক রকম স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইত। এ দেশের এক নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত; অন্যান্য জিনিসপত্রও তদনুপাতে সুলভ ছিল। এখন সব চেয়ে নিরেশ চাউলের মণও ৮ টাকার বেশী। উৎকৃষ্ট চাউল ১০।১২ টাকার কমে পাওয়া যায় না। এমন অবস্থায় একা পুরুষের উপার্জ্জনে একটা পরিবার আর সুশৃঙ্খলে চলিতেছে না। সেইজন্য অনেক স্থলে মহিলাদিগকেও পুরুষদের অর্থোপার্জ্জন ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইতেছে। নহিলে দিন চলে না।

কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র কোথায়? তাহাও যে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আর পুরুষদের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র যদিও কিছু কিছু মিলিতে পারে, কিন্তু নারীর কার্য্য ক্ষেত্র পূর্ব্বেও যেমন ছিল না, এখনও তেমনি নাই। তাহা তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। নারীদের নূতন কার্য্য-ক্ষেত্র হইবে—সহজ সহজ অনায়াসসাধ্য, অল্পশ্রমসাধ্য শিল্প। দেখিয়া সুখী হইলাম, সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি এই দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। সমিতির মুখপত্র বঙ্গলক্ষ্মী মাসিক পত্রিকাখানিতে এ বিষয়ে রীতিমত আলোচনা হইতেছে। সমিতির তত্ত্বাবধানে একটী নারী-কুটীর-শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার কাজও বেশ ভালই চলিতেছে।

কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্যই যে শিল্প-চর্চ্চা করা দরকার, তাহা আমরা মনে করি না। যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল, শিল্প কার্য্য করিয়া যাঁহাদের অর্থো-পার্জ্জনের কোনই প্রয়োজন নাই, তাঁহাদেরও কিছু কিছু শিল্প কার্য্য শিখিয়া রাখা ভাল মনে করি। এবং সেলাইএর কাজ শিখিলে নিজেদের গৃহস্থালীর যেমন উপকার হয়, তেমনি দুস্থ পাড়াপড়শীরও অনেক উপকার করা যায়। প্রত্যেক পল্লীতেই যেমন সচ্ছল অবস্থায় লোক আছেন, তেমনি অতি দরিদ্র লোকও আছেন। স্বচ্ছল সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহিণী বা মহিলারা যদি নিজেদের ব্যবহৃত জামা, ইজের, পেন্টুলান প্রভৃতি কাটিয়া সেলাই করিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপযোগী জামা প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া গরীব প্রতিবাসীদের ছেলে মেয়েদের দান করেন, তবে সামান্য পরিশ্রমে তাঁহারা কতই না পরোপকার করিতে পারেন। এইরূপ নানা কার্য্যে তাঁহারা জনহিত সাধন করিতে পারেন। ইহাতে সময়ের সদ্ব্যবহারও হয়। আর এরূপ কোন কাজ হাতে না থাকিলে পুরমহিলাদের পর চর্চ্চা, পর নিন্দা বা তাস খেলা করিয়া বা বাজে উপন্যাস পড়িয়া সময় অতিবাহন করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

মহিলা সমাজের আরও একটী সু-মহৎ কর্ম্ম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে না গিয়া, অন্তঃপুরে থাকি-য়াই তাঁহারা এই কাজ করিতে পারেন। সেকালের গৃহিণীরা যেমন সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, দয়ার্দ্রচিত্তা, ও পরহিতপরায়ণা ছিলেন, আজকালকার পুরমহিলারা এই সকল গুণ তেমন অর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা বিলাসপরায়ণা, উপন্যাস-পাঠরতা, লঘুচিত্তা হইয়া উঠিতেছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞা। ছেলেপুলেদের সামান্য সামান্য অসুখ হইলেও তাঁহারা শিক্ষার অভাব বশতঃ নিজেদের অত্যন্ত নিরুপায় ভাবিয়া ব্যাকুলা হইয়া পড়েন। নিকটে ডাক্তার বৈদ্য না থাকিলে তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কোনই প্রতিকার করিতে

পারেন না। সন্তান পালন এবং সামান্য সামান্য অসুখ বিসুখের টোটকা চিকিৎসা প্রণালী জানা থাকিলে অঙ্কুরেই যে সকল ব্যাধি নিবারণ করিতে পারা যায়, চিকিৎসা বা প্রতিষেধকের অভাবে তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে দুশ্চিকিৎস্য বা চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়িতে পারে। ছেলেপুলেরা প্রায় দুষ্ট ও দুরন্ত হইয়া থাকে। ফলে দুর্ঘটনা প্রায় ঘটিয়া থাকে। First aid বা আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা জানা থাকিলে অনেক সময় মহাবিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা না হইলে হয় ত তাহা সাংঘাতিক হইয়া পড়িতে পারে, এবং পড়িয়াও থাকে। পুরমহিলারা এ সকল কাজ ত করিতে পারেনই, তা ছাড়া অল্পবয়স্ক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার এবং চরিত্র গঠনের ভারও তাঁহারা লইতে পারেন। এই সব কাজ করিতে হইলে তাঁহাদের নিজেদের প্রথমে শিক্ষালাভ করা দরকার। আলোচ্য বঙ্গলক্ষ্মীর সংখ্যাত্রয়ে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কেন্দ্রে মহিলাগণের সেলাই ও কাটিং শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে দেখিতেছি। আমাদের মনে হয়, সন্তান পালন, স্বাস্থ্যরক্ষা, গর্ভবতী নারীর তত্ত্বাবধান, আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা ও কর্ত্তব্য, দুর্ঘটনার (কাটাকুটি, আগুনে পোড়া, জলে ডোবা প্রভৃতি, এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গাদির বা বিছা প্রভৃতির দংশন যন্ত্রণা নিবারণ ইত্যাদি) প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ক্লাস খুলিলেও খুব ভাল হয়। মফঃস্বলে মহিলা সমিতিগুলির মধ্যে বরিশাল মহিলা সমিতি এই বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন দেখিতেছি। অন্যান্য মহিলা সমিতিগুলিতেও অচিরে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা "বঙ্গলক্ষ্মী" মাসিক পত্রিকাখানির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই অবসর গ্রহণ করিব। বাঙ্গালা দেশে মহিলামঙ্গল কল্পে "বামাবোধিনী পত্রিকা" স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের সুপরিচালনে বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গমহিলার সেবা করিয়া একনিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাবে লোকান্তরিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে আরও দুই একখানি মহিলাপাঠ্য পত্র ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ঢাকা হইতে বঙ্গমহিলা নামে একখানি পত্রও এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল; এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। কলিকাতায় মাতৃমন্দির নামে একখানি মাসিক পত্র কিছুদিন ধরিয়া চলিতেছে। তার পর তিন মাস হইল "বঙ্গলক্ষ্মীর" আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে গল্প উপন্যাস না থাকিলেও, মহিলাগণের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের আলোচনা ইহাতে হয় এবং বিভিন্ন স্থানের মহিলা সমিতির মাসিক কার্য্য বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মহিলাগণকেও যখন জীবন সংগ্রামে পূর্ণমাত্রায় নামিতে হইয়াছে, তখন এই মাসিক পত্রিকাখানি তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

খাদ্য বিচার

জীব যতদিন মাতৃ-জঠরে থাকে, ততদিন প্রত্যক্ষ ভাবে ভ্রূণ-দেহ মাতৃ-রক্ত হইতে তাহার গঠনোপাদান সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু, পরোক্ষভাবে, গর্ভিণী যাহা খায়, তাহারই কিয়দংশ রক্তে পরিণত হইয়া ভ্রূণদেহের গঠন ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে খাদ্যই শিশু-দেহ-গঠনের একমাত্র উপাদান। তা, সে খাদ্য মাতৃ-স্তন দুগ্ধ, গো-দুগ্ধ বা কোন কৃত্রিম খাদ্য—যাহাই হউক না কেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খাদ্যেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। দন্তোদ্গমের সহিত শিশুকে সামান্য সাধারণ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত করানো হয়। পরে যেমন শিশুর বয়স বাড়ে, তাহার খাদ্যের তেমনি প্রকার ভেদ হয়, পরিমাণেও তাহা বৃদ্ধি পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—মানুষ যেরূপ খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহার দেহও সেইভাবে পরিণতি লাভ করে।

প্রকৃত পক্ষে, শরীর গঠনের জন্য যাহা কিছু উপাদান আবশ্যক হয়, খাদ্যই সেই সমস্ত উপাদান সরবরাহ করে। দেখিতে গেলে, প্রধানতঃ খাদ্যই আমাদের দৈহিক, মানসিক, এমন কি নৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। খাদ্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া শরীর ও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো যায়। মানুষকে যেমন ভাবে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা, তাহাকে সেইভাবে খাদ্য সরবরাহ করিলে সে বেটিও ঠিক সেইভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

দেহের উপর যখন খাদ্যের প্রভাব এত বেশী, তখন দেহকে সুগঠিত, স্বাস্থ্যপূর্ণ, রোগ প্রতিষেধক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, খাদ্যের গুণাগুণ, প্রকৃতি, পরিপাক প্রভৃতি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেহ গঠনের দিক দিয়া মানুষের খাদ্য বিচার করিয়া দেখা হয় না। সাধারণতঃ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এবং বিশেষতঃ রসনার তৃপ্তিসাধন জন্য খাদ্য গ্রহণ করা হয়। যে খাদ্যে এই দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই খাদ্য—তা তাহাতে শরীর গঠনের উপাদান যেমনই থাকুক না কেন—সচরাচর গ্রহণ করা হয়। কিন্তু হিসাব মত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রকৃত ভিত্তির উপর গঠিত হইলে আমরা আগে খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া তবে খাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতাম; এবং কোন খাদ্য শরীরের উপর কিরূপ ফলোৎপাদন করিবে, তাহা আগেই বলিয়া দিতে পারিতাম। তাহা করি না এবং করিতে পারি না বলিয়াই আমাদিগকে এমন সব অসুখে ভুগিতে হয় যাহা নিতান্তই অনর্থক ও অনাবশ্যক।

খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্য একটু আধটু পরীক্ষা করিলেই উপরিউক্ত সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। কেবল মাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি বা রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, খাদ্যের হিতাহিত গুণ বিচার পূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

সভ্যতার একটা অর্থ 'কৃত্রিমতা' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতেছে, ততই সে সর্ব্ব বিষয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে—প্রকৃতির ব্যবস্থা হইতে ততই সে দূরে গিয়া পড়িতেছে। খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে তাহার কৃত্রিমতা চরমে উঠিয়াছে। খাদ্য গ্রহণকালে তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মেরও শাসন মানে না, নিজের বিচার বুদ্ধিরও অনুসরণ করে না।

খাদ্য গ্রহণকালে একটুও বিচার বিতর্ক করিয়া দেখা হয় না। যাহা মুখে ভাল লাগে তাহাই মানুষ খায়। কিম্বা যাহার যাহা জুটে, সে তাহাই খায়। কিম্বা যে যাহা পছন্দ করে, সে তাহাই খায়। যে খাদ্য রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, সে খাদ্য রন্ধন করিতেও রীতিমত যত্ন লওয়া হয় না। আবার, খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে গতানুগতিকতার প্রভাবও কম নয়। একজনের দেখাদেখি আর একজন যেমন খাদ্য খায়, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদের আচরণের অনুসরণ করিয়াও মানুষ তাহার খাদ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে।

হিন্দু আমরা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা খাদ্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিচার করিতেন। প্রায় সকল প্রকার খাদ্যের গুণাগুণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছিলেন। যে খাদ্য যাহার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া তাঁহারা বুঝিতেন, তাহার জন্য সেইরূপ খাদ্যই তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেন। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন, উপবাস, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, তিথি, বার হিসাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণ বা বর্জ্জন, এ সকল নিয়ম খুব সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত নিয়ম ছিল। সেই জন্য তাঁহারা দীর্ঘজীবীও হইতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা খাদ্য-বিচার পরিত্যাগ করিয়া, যখন তখন যা'তা' আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়াই, আমাদের আয়ু দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। যাহারা অনিয়মিত ভাবে আহার করিয়া করিয়া ক্রমাগত

রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া জব্দ হইয়াছে, তাহাদিগকেই পরিণামে খাদ্য বিষয়ে কিছু কিছু সংযম অবলম্বন করিতে দেখা যায়। নচেৎ, যত দিন না দেহটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তত দিন পর্য্যন্ত লোকে আহার বিষয়ে সাবধান হইতে, এবং খাদ্যের লোভ সংবরণ করিতে চাহে না।

খাদ্যের গুণাগুণ বিষয়ে সকল চিকিৎসক সংবাদ রাখেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, চিকিৎসা বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না। তবে ইদানীং চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে খাদ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে সামান্য মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহা অতি যৎ-সামান্য। খাদ্যের গুণাগুণ চিকিৎসা বিষয়ক অন্যান্য পাঠ্যর ন্যায় প্রধান পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত।

উপযুক্ত রূপ খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে, যা তা খাদ্য গ্রহণে বিরত হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার যে কতখানি সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। খাদ্য বিষয়ে অসংযমের মূল আমাদের সভ্যতা। সভ্যতা মাত্রেই কৃত্রিমতা—প্রকৃতির সহিত বিরোধ। অথচ, খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীর রক্ষা করা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রকৃতি দেবী প্রাণীমাত্রকেই খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচনের একটা সহজ স্বাভাবিক সংস্কার দিয়াছেন। সেই সহ-জাত সংস্কারের অনুসরণ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলে খাদ্যের দোষে কখনও শরীর অসুস্থ হইতে পারে না। তা যদি হইত, তাহা হইলে জীবরাজ্য এত দিনে প্রাণি-শূন্য হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। কারণ, মানুষ ছাড়া, কোন জীবকে কোনরূপ সভ্যতা খাদ্য নির্ব্বাচনে সহা-য়তা করে না। মানবেতর প্রাণীরা নিজেদের সংস্কার বশে তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য মাত্রই গ্রহণ করে, যাহা তাহার শরীর রক্ষার উপযোগী নহে, তাহাও সেই সংস্কার বশেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তাহার সহজাত সংস্কারই তাহার একমাত্র উপদেষ্টা—অপর কাহারও দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয় না।

ডারউইন সাহেবের বিবর্ত্তনবাদ থিয়োরীটি যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বানর জাতিকে
মানুষের নিকটতম আত্মীয় প্রাণী বলিয়া স্বীকার
করিতে হয়। সেই বানরদের মধ্যে মানুষের ন্যায়
সভ্যতায় প্রচার হয় নাই। তাহারা তাহাদের জন্মগত
সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।
তাহারা কি খায়? তাহারা নিরামিষভোজী। তাহারা
মানুষের ন্যায় রন্ধন করিয়াও খায় না। তাহারা প্রধা-
নতঃ ফল মূল, বাদাম ইত্যাদি আহার করিয়া জীবন
ধারণ করে। ইহাতে তাহারা অসুস্থ হয় না, যন্ত্র
তাহাদিগকে ডাক্তার ডাকিতেও হয় না। বানরেরা যে
সকল ফল খায়, তাহা বারো মাসই ফলে না। যখন
ফলে, তখন তাহারা বেশী পরিমাণে খায় এবং খুব মোটা
হয়; অর্থাৎ শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত শক্তি ও তেজ
চর্ব্বির আকারে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ফল যখন কমিয়া
যায় এবং দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন এই সঞ্চিত 'এনার্জি'
তাহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে—তাহারা
বাঁচিয়া থাকে। বানরের ন্যায় অন্যান্য প্রাণী
অবস্থাও এইরূপ। সকল সময়ে তাহাদের খাদ্য
মিলে না। তাই যখন মিলে, তখন তাহারা বেশী
করিয়া খায়; যখন মিলে না, তখন উপবাস করে।
অথচ, তাহারা বাঁচিয়াও থাকে—খাদ্যাভাবে একেবারে
মরে না। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়? ঐ আগে
যাহা বলিয়াছি—খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সময় তাহারা শরীরে
অতিরিক্ত এনার্জি সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং খাদ্য দুর্ল
ও দুষ্প্রাপ্য হইলে তাহাই ব্যয় করে।

ইহার সার মর্ম্ম এই যে, প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া
চলে বলিয়া, ইতর প্রাণীরা যখন ক্ষুধার্ত্ত হয়, তখনই
কেবল খায়। ইহাদের আহারের কোন নিয়ম নাই,
সময়েরও কোন স্থিরতা নাই। ক্ষুধার্ত্ত হইলে এবং
খাদ্য জুটিলে তবে তাহারা খায়। প্রকৃতির নিয়ম
এইরূপ। মানবেরও যথাসাধ্য প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া
চলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত
হইলেই, ক্ষুধার উদ্রেক হউক আর নাই হউক, কেবল
প্রথা মানিয়া চলিবার জন্য খাওয়া কর্ত্তব্য নয়। ইতর
প্রাণীদের আহারের আর একটা প্রাকৃতিক নিয়ম এই

তাহারা এক সময়ে এক প্রকার খাদ্য পেট ভরিয়া
নানান রকম খাদ্য এক সময়ে এক সঙ্গে খাওয়া
প্রথা নয়। ইতর প্রাণীরা যখন যে খাদ্য পায়,
তাহাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকিলে, সেই
খাদ্যেই উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। এটা
ৎ, ওটা কিঞ্চিৎ, সেটা কিঞ্চিৎ এরূপ করিয়া
বিধ খাদ্য এক সঙ্গে উদরস্থ না করায় বিরুদ্ধ
নের ক্লেশ ও অসুবিধা তাহাদিগকে সহ্য করিতে
না। কিন্তু সভ্য মানুষ করে কি? সে নানান
খাদ্যের আয়োজন করিয়া খাইতে বসে। কেবল
যোগ করিতেই তাহার পাঁচ সাত রকম খাদ্য না
চলে না। এক এক রকম খাদ্য জীর্ণ করিতে
এক রকম পাচক রস নির্গত হয়। একই পাচক
কল প্রকার খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না। এক
অনেক রকম খাদ্য ভোজন করিলে, কাজে
ই, পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এক
খাদ্য যদি জীর্ণ হয়, ত অন্য সকল খাদ্য জীর্ণ হয়
কিম্বা এক খাদ্য অপর খাদ্য জীর্ণ করিবার পক্ষে
টায়। ফলে পাকস্থলীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপ-
হইয়া থাকে। সুতরাং এক সময়ে একাধিক
না খাওয়াই ভাল। বড় জোর দুই তিন রকম
এক একবারে চলিতে পারে। তবে এক রকম
ই সর্ব্বোত্তম হয়। ইহা সহজে এবং শীঘ্রই হজম
যায়। একাধিক খাদ্য একসঙ্গে খাইয়া পরিপাক
কে জটিল করিয়া ফেলা হয় মাত্র।

আমরা সাধারণতঃ দিবা রাত্রিতে অনেক বার খাইয়া
তাহাও উচিত নয়; কারণ তাহা প্রকৃতির অনু-
তি নিয়ম নয়। সকাল বেলা অনেকে প্রাতরাশ
য়া থাকেন। তখন অবশ্য ক্ষুধার উদ্রেক হয় না,
খাওয়া অভ্যাস বলিয়া খাওয়া হয়। সেজন্য সে
উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচনের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে
যে দিন যাহা জুটিয়া যায়, সে দিন তাহাই খাওয়া
যাহাদের রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, তাহা-
কেবল অভ্যাসবশতঃ, প্রাতরাশ না খাওয়াই
যুক্তিসঙ্গত। দুই এক দিন প্রাতরাশ খাওয়া বন্ধ রাখিলে দেখা যায়, মধ্যাহ্ন আহারের সময় বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তখন বেশ তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়াও যায়। আর প্রাতরাশ করিলে, যাহাই খাওয়া হউক না কেন, মধ্যাহ্ন আহারের সময় তাহা সম্যকরূপ জীর্ণ হইবার যথেষ্ট অবসর পায় না। একে ত প্রাতরাশের সময়ই যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। তাহার উপর, অক্ষুধার সময় মধ্যাহ্ন আহার করিলে ক্ষুধা আরও কমিয়া যায়। তিথি-নক্ষত্র বিশেষে আমাদের যে উপবাস করিবার নিয়ম আছে, তাহার উপকারিতা ইহা হইতেই উপলব্ধ হইতে পারে। উপবাসের পর যখন পারণ করা যায়, তখন ক্ষুধারও যেমন উদ্রেক হইয়া থাকে, আহারে রুচিও হয় তেমনি। এবং একই জিনিসে উদর পূর্ণ করিয়া পারণ করিলে, তাহা জীর্ণও হয় তেমনি সহজে। পূর্ণ ক্ষুধার সময়, যে খাদ্যে রুচি হয়, এমন একটী মাত্র খাদ্য বাছিয়া লইয়া তাহার দ্বারা পূর্ণাহার করিলে, তাহার উপকারিতা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ অপেক্ষা উপবাস সমধিক ফলপ্রদ চিকিৎসা। চব্বিশ ঘণ্টা কিম্বা প্রয়োজন হইলে ততোধিক সময়, অর্থাৎ পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া, তাহার পর, যে খাদ্যে রুচি হয়, তাহা ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ রোগ অচিরে দূরীভূত হয়, আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এরূপ আহারের ব্যবস্থায় খাদ্য উত্তমরূপে জীর্ণ হয়, শরীরে বলাধানও হয়। অবশ্য এই সঙ্গে আহারের অন্যান্য দুই একটী নিয়মও মানিতে হইবে; অর্থাৎ তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত নয়; ধীরে ধীরে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া খাদ্যের সহিত লালা মিশ্রিত করিয়া তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বা পিষিয়া লইয়া পরে তাহা গলাধঃকরণ করিতে হইবে। আর আহার কালে মনের অবস্থা এমন থাকা চাই, যাহা খাদ্য জীর্ণ করিবার পক্ষে অনুকূল। অর্থাৎ, সে সময়ে মন সম্পূর্ণ প্রসন্ন অবস্থায় থাকিবে। তৎকালে মন যেন কোন প্রকারে উত্তেজিত অথবা রিপুর বশবর্ত্তী

না থাকে। আহারে যেন বেশ রুচি থাকে, এবং বেশ তৃপ্তি পূর্ব্বক যেন আহার করা হয়। যে খাদ্যে রুচি না হয় সেরূপ খাদ্য কখনও খাইতে নাই; কারণ, তাহা কোন মতে জীর্ণ হয় না। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও, যাহারা কেবল অভ্যাস বশতঃ এবং প্রথার অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে খায়, তাহাদের খাদ্যে সকল সময়ে রুচি হয় না। এরূপ ভাবে আহার করিলে খাদ্য জীর্ণ করা কঠিন; অসম্ভব বলিলেও চলে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এবং রুচি পূর্ব্বক আহার করিলে তাহার ফল যে সদ্য সদ্য ভাল হয়, তাহার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, প্রবল ক্ষুধায় সময় আহার জুটিলে মুখে স্বতঃই লালার স্ফুরণ হয়। সেইরূপ, পাকস্থলীতেও স্বতঃই পাচকরস নির্গত হয়। ক্ষুধার সময় যে আহারের ইচ্ছা প্রবল হয়, সেই ইচ্ছাই লালা ও পাচক রসের জননী। এই ভাবে যথেষ্ট লালা ও পাচক রস নির্গত হওয়ায় খাদ্য চর্ব্বণের যেমন সুবিধা হয়, উহা জীর্ণ করাও তেমনি সহজ হয়।

প্রত্যহ কয়বার খাওয়া উচিত? কেহ তিন বার, কেহ চারিবার, কেহ বা আরও অধিকবার আহার করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ দুইবার পূর্ণাহার যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। আমরা এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী।

চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু সচরাচর যে ভাবে চাউল বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হয়, তাহা ঠিক শরীর পোষণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। খরিদদারের মন ভুলাইবার জন্য চাউল খুব সাদা করিতে গিয়া তাহার সার পদার্থটিই বাদ দেওয়া হয়। ধান্য হইতে দুই প্রকারে চাউল প্রস্তুত হয়; এক কলে, অপর ঢেঁকিতে। কলে ছাঁটা চাউলের উপরের আবরণটী থাকে না। ঢেঁকি ছাঁটা চাউলে কতকটা থাকে। সুতরাং খাদ্যের হিসাবে কলে ছাঁটা চাউল অপেক্ষা ঢেঁকি ছাঁটা চাউল অধিকতর পুষ্টিকর। আবার, ধান্যের শস্য হইতে খোসা পৃথক করিয়া চাউল বাহির করিবার জন্য দুইটী প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক, সিদ্ধ করিয়া, অপর সূর্য্যোত্তাপের সাহায্যে। ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে ধান্যে মধ্যস্থ দ্রবণীয় পদার্থ জলের সহিত বাহির হইয়া [illegible] কিন্তু আতপ চাউলে এই পদার্থগুলি পূর্ণ মাত্রায় থাকে। সুতরাং সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল [illegible] উপকারী।

ভোজনের ষোল আনা উপকার খাদ্য প্রস্তুত [illegible] উপর অনেকটা নির্ভর করে। একে আমরা [illegible] ভাগ সিদ্ধ চাউল খাই; তাহার উপর ভাত রাঁধি[illegible] ফেন গালিয়া ফেলা হয়। সুতরাং আমরা যে জিনি[illegible] ভাত বলিয়া আহার করি, তাহাতে সার পদার্থ [illegible] বেশী থাকে না। ভাত খাইয়া সম্যক উপকার [illegible] করিতে হইলে ভাত রাঁধিবার সময় এমন পরি[illegible] বুঝিয়া জল দেওয়া উচিত, যাহাতে ভাতও সুসিদ্ধ [illegible] এবং সমস্ত জলটুকুও মরিয়া যায়—ফেন গালি[illegible] যেন প্রয়োজন না হয়। ধান্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] কার পাওয়া যাইতে পারে খিচুড়ী প্রস্তুত [illegible] খাইলে। কিন্তু তাহাতে মসলা যত কম দেওয়া [illegible] ততই ভাল। আর একপ্রকারে ভাত খাইয়া [illegible] ষোল আনা উপকার আদায় করা যায়—পরমান্ন [illegible] বস্তুতঃ, পরমান্ন যেমন সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য, [illegible] পুষ্টিকারিতা তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দুঃখের বি[illegible] পরমান্ন কালে ভদ্রে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপ[illegible] খাওয়া হয়। উৎকৃষ্ট আতপ চাউলের পরমান্ন [illegible] খাইতে পাওয়া আমাদের দেশে বহু ভাগ্যের ক[illegible] কিন্তু যাহার ভাগ্য সেরূপ সুপ্রসন্ন, তাহার [illegible] তত উত্তম, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর এ[illegible] কথা—খাদ্যের পরিমাণ। সকল লোক একই পরি[illegible] খাইতে পারে না। খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর [illegible] শারীরিক পরিশ্রমের উপর। যাহাকে যে পরি[illegible] দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার খাদ্যের পরিমাণ[illegible] সেই অনুপাতে বেশী বা কম হওয়া উচিত। পরমান্ন[illegible] ন্যায় সুজির পায়েস এবং মোহনভোগ বা হালু[illegible] অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

চাউল ও গোধুম উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও, [illegible]মাত্র তাহাদের উপর নির্ভর করিলে আমাদের [illegible] না। শাকশব্জি বা আনাজ তরকারী খাদ্যের [illegible] অপরিহার্য্য। তবে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত অপেক্ষা [illegible] কি বড় জোর দুইটী তরকারী হইতে বেশী [illegible]কার পাওয়া যায়। যখন যে তরকারী খাইতে [illegible] যায়, তখন সেই তরকারী খাওয়া উচিত। [illegible] একবারে একটার বেশী নয়। পছন্দমত এক [illegible] তরকারী পরিমাণে বেশী খাইলেও ক্ষতি [illegible]। অন্য পাঁচরকম অপেক্ষা এই একটা বেশী [illegible]প্রদ।

কিন্তু রন্ধনের দোষে তরকারী অব্যবহার্য্য হইয়া [illegible]। আলু অতি উৎকৃষ্ট আনাজ; এবং বলিতে [illegible] সর্ব্বপ্রধান আনাজ। কারণ, অপর সকল আনাজ [illegible]রের মধ্যে এক একটা নির্দ্ধারিত সময়ে মাত্র [illegible] যায়; কিন্তু আলু বারো মাসই পাওয়া যায়, [illegible] খাওয়াও হয়। আলু খুব পুষ্টিকর পদার্থও বটে। [illegible] হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকার পাইতে হইলে [illegible] পোড়াইয়া খাওয়াই ভাল। মরা আঁচে উনানের [illegible] আলুগুলি রাখিয়া দিলে ঘণ্টাকয়েক পরে তাহা [illegible]বার উপযুক্ত হয়। যদি আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতে [illegible] তবে এই পরিমাণ জল দেওয়া উচিত, যেন আলুও [illegible] হয় অথচ জলটুকু মরিয়া শুকাইয়া যায়। ভাতের [illegible] গালা যেমন ক্ষতিজনক, আলু সিদ্ধ করিয়া উদ্বৃত্ত জল ফেলিয়া দিতে হইলেও তদ্রূপ ক্ষতি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাপে সিদ্ধ করা চাউল ও আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

পাঠক হড়াপোড়া কখনও খাইয়াছ কি? হড়াপোড়া জিনিসটা কি, তাহা পল্লীগ্রামের পাঠকগণকে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। এই শীতকালে ক্ষেত্রে কড়াইশুঁটির চাষ হইয়াছে। কতকগুলা গাছ শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া এক যায়গায় স্তূপাকার করা হয়। দুই এক দিনের মধ্যেই গাছগুলি শুকাইয়া যায়। তখন সেই স্তূপে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হয়। গাছগুলি অবশ্য পুড়িয়া যায়। এবং শুঁটির ভিতর যে কড়াইগুলি থাকে তাহা বেশ সুসিদ্ধ হইয়া আহারোপযোগী হয়। এই কড়াই লবণ ও সরিষার তৈল সহযোগে যেমন মুখরোচক খাদ্য তেমনি পুষ্টিকর। রন্ধনশালায় হাজার মশলা দিয়া রাঁধিলেও এমন সুখাদ্য প্রস্তুত করা যায় না। সহরবাসী অবশ্য এই হড়াপোড়া জিনিসটা যে কি, তাহার ধারণা করিতে পারিবেন না; কিন্তু পল্লীগ্রামে শীতকালে ইহা একটা উৎসবের মত। সেই অর্দ্ধদগ্ধ ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে কড়াইগুলি বাছিয়া সংগ্রহ করিতে আধপোড়া ছাইয়ে সর্ব্বাঙ্গ কালো হইয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার আমোদেরও তুলনা হয় না। আর ইহার পুষ্টিকারিতার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মোট কথা, ক্ষুধা ও রুচি খাদ্যের প্রধান নিয়ামক।

পরলোকে ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

আমরা দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্তে উদারহৃদয় ও মহাপ্রাণ [illegible] সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানাই[illegible]। গত ২৪শে নবেম্বর তারিখে মাত্র ৫৩ বৎসর [illegible] সত্যশরণ বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। [illegible] মৃত্যুতে তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব একজন অকৃ[illegible] সুহৃৎ হারাইলেন এবং বাংলা দেশে একজন [illegible]বান্ চিকিৎসকের অভাব ঘটিল। আমরা শ্রীভগ[illegible] নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা [illegible]।

সত্যশরণ বাবু ১৮৭২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। [illegible] পিতার নাম রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছোটনাগপুর বিভাগের স্কুল সমূহের পরিদর্শক ছিলেন। সত্যশরণ বাবু হাজারিবাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদিনিবাস চন্দননগর।

১৮৯৬ সালে মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরীতে Pilgrim Hospital এ হাউস সার্জ্জন হন এবং পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে Medical and Surgical Registrar হন। ইহা ছাড়া তিন বৎসর কাল তিনি Asst. Apothecaryর পদেও ছিলেন। সত্যশরণ বাবু ক্যাম্বেলেও শিক্ষকতা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে Pathology প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষকও হইয়াছিলেন। বহু হাসপাতালে কাজ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট

প্রতিপত্তি ও পসারও হইয়াছিল। ইনি একবার নেপালরাজের চিকিৎসাও করিয়াছিলেন।

সত্যশরণ বাবু কেবল বড় চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিতেছি না। বাংলা দেশে সুচিকিৎসকের অভাব নাই, কিন্তু রোগী-অন্ত-প্রাণ দরিদ্রের বন্ধু চিকিৎসকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। সত্যশরণ বাবু রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে অর্থ দান করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার আয়ের এক-দশমাংশ দান করিতেন। আজিকার এই ভোগ-সর্ব্বস্ব যুগে এই দানশীলতার প্রশংসা করিতেই হইবে।

সত্যশরণ বাবু বাংলায় ধারাবাহিক ভাবে Frist aid সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সমাচারে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্যম প্রশংসনীয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে... নীতিগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে... একখণ্ড Pathologyও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন... বইখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই মৃ... বাংলা ভাষার এক মহা ক্ষতি হইল।

সত্যশরণ বাবু স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার... গুণের পরিচয়ে জনসাধারণ মুগ্ধ ছিলেন। ... একাধারে স্বাধীনচেতা ও পরোপকারী ছি... বহু রোগীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে দেখি... শুধু তাহা নহে—তিনি অনেকের পথ্যেরও ... দিতেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি... রিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

আলোচনা

লেডী ডফরিণ হাসপাতাল।—

কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের লাট পত্নী লেডী লিটন সাহেবা সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করিয়া লেডী ডফরিণ হাসপাতালের কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং এরূপ সদনুষ্ঠানে এদেশবাসীর সাহায্য দানে কৃপণতার অভিযোগ করিয়া কিছু নিন্দাও করিয়াছিলেন। আমরা তৎকালে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, এই হাসপাতালটি কাহাদের অর্থ সাহায্যে প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং মিউনিসিপ্যালিটী এই হাসপাতালে বাৎসরিক যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাও পরোক্ষভাবে প্রধানতঃ দেশীয় লোকদেরই টাকা কি না? সে প্রশ্নের কেহ এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দেন নাই। সে যাহা ... আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, লেডী লিটন সাহেবার ... আবেদন বৃথা হয় নাই। সম্প্রতি এই হাসপাতালের ... অর্থ সাহায্যার্থ যে দানের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে ... তাহাতে দেখা গেল, জনসাধারণ বেশ মুক্তহস্তে ... দান করিয়াছেন, এবং দাতৃগণ প্রধানতঃ ... বাসী, সুতরাং তাঁহারা যে মানবহিতকর সৎকার্য্যে ... অর্থ সাহায্যে উদাসীন, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন ... কেবল তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই ... প্রতিষ্ঠানের অভাব অভিযোগ এবং তাহা দূর ... অর্থ দানের আবশ্যকতা জানাইয়া দিলেই ... হইতে পারে।

“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্”

১৪শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল { ১০ম সংখ্যা

অনন্ত জীবন

জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চাহিয়াছে—অমৃত। এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্পর্শমণি বা পরশ-পাথরের সন্ধানে ফিরিয়াছে। মানুষ চায় অমর হইতে; অন্ততঃ যতদূর সম্ভব দীর্ঘজীবী হইতে। মানুষ আরও চায়—স্পর্শমণি বা পরশ-পাথর, যাহার স্পর্শে বস্তু মাত্রেই সোণা হইয়া যায়, যে সোণা তাহার সকল সুখের, সকল ভোগের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে। এই দুইটী বস্তু তাহার চিরকাম্য—এই অমৃত ও এই স্পর্শ-মণি। এই দুইটী বস্তু লাভের জন্য মানুষ চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। যত কিছু উপায় তাহার মনে হইয়াছে, সে তাহাই অবলম্বন করিয়াছে। সে পৃথিবী তোলপাড় করিয়াছে, শয়তানের উপাসনা করিয়াছে, দেবতার কাছে বর মাগিয়াছে, বিজ্ঞানাগারে মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ করিয়াছে, তপস্যা করিয়াছে, কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছে, পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়াছে, মহাসাগরের তলদেশে অনুসন্ধান করিয়াছে। তথাপি সে তাহার প্রার্থিত বস্তু দুইটী পাইয়াছে কি? না—পায় নাই। অমৃত ও স্পর্শমণি দুইই তাহাকে ফাঁকি দিয়া এখনও লুকাইয়া রহিয়াছে। কেন সে পায় নাই? তাহার এত চেষ্টা বিফল হইল কেন? কারণ, সে এত দিন কেবল ভ্রান্ত পথে—বিপথে চলিয়াছে। যে পথে গেলে তাহার এই দুইটী কাম্য বস্তু মিলিতে পারিত, সে তাহার সন্ধান এখনও পায় নাই।

তবে তাহার চেষ্টায় এখনও বিরাম নাই। বিজ্ঞানাগারে তাহার পরীক্ষা এখনও চলিতেছে। এবং স্পর্শমণির সন্ধান সে এখনও না পাইলেও, সুবর্ণের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয়, তাহার একটু একটু সন্ধান সে যেন পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই কৃত্রিম উপায়ে সুবর্ণ প্রস্তুতের যৎকিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি; কিন্তু অমৃতের সন্ধান এখনও মানুষের অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। লোকে এযাবৎ কেবল ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছে, আসল জিনিস ছাড়িয়া প্রতিবিম্ব ধরিতে

গিয়াছে। তাই তাহার অদৃষ্টে—"যোক্রবানি পরিত্যজ্য অক্রবানি নিষেবতে, ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি" হইয়াছে। সকলেই এমন কোন ঔষধ বা Elixir of Life খুঁজিয়াছে, যাহা সেবন করিলে লোকে অমর হইতে পারে। অথবা এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছে, যদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে গত যৌবন ফিরাইয়া আনা যায়, দেহের পুরাতন অকর্ম্মণ্য কোষগুলির স্থলে নূতন সতেজ তাজা কোষ উৎপাদন করিয়া নিস্তেজ রক্তকে তেজসম্পন্ন করিয়া শরীরকে যৌবনোচিত লঘুত্ব ও ক্ষিপ্রতা প্রদান করা যায়।

একজন চিকিৎসক 'আবিষ্কার' করিলেন যে, যুবা বানরের গ্রন্থি লইয়া মানব-দেহে কলম করিলে, সে বৃদ্ধ হইলেও পুনরায় যৌবন লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু পরীক্ষায় ইহা টিকিল না। বস্তুতঃ এই থিয়োরী-টাই এত অসম্ভব যে ইহার কল্পনা করাই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। জরা বা বার্দ্ধক্য প্রকৃত পক্ষে একটা রোগ মাত্র। শরীর যে ক্ষয় হইয়া হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে—বার্দ্ধক্য তাহারই লক্ষণ মাত্র। দেহগঠনকারী কোষগুলি জীবনীশক্তি হারাইয়াছে, তাই শরীরও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। যৌবনে এই সকল কোষ সজীব সতেজ তাজা ছিল। যুবামাত্রেরই দেহগঠনকারী কোষ সকল জীবিত, সতেজ, কর্ম্মক্ষম। যদি বৃদ্ধকে আবার যৌবন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে দেহের উপাদানভূত কোষগুলিকে আবার বাঁচাইয়া তোলা চাই; অথবা যৌবন কাল হইতে তাহাদিগকে এমন সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, যেন তাহারা জীবনীশক্তি না হারায়। যে সকল কোষ নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে সেগুলিকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের স্থান পূরণের জন্য নূতন নূতন কোষ বা Cell গঠন করিয়া লইতে হইবে। দেহের প্রত্যেক অংশে জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। কি উপায়ে ইহা করা যায়? অতি সহজ উপায়ে। মৃত কোষগুলিকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া, এমন ভাবে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে যেন নূতন নূতন সজীব কোষ গঠিত হইতে পারে। যৌবন রক্ষাই বল আর নব যৌবন লাভই বল—ইহাই তাহার একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাই অমৃত—ইহাই Nectar—ইহাই elixir of life. কেবল মাত্র এই উপায়েই অনন্ত কাল ধরিয়া যৌবন রক্ষা করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে, খাদ্য যখন শরীর পোষণ করে, তখন সাধ্যমত যে যত বেশী খাইতে পারিবে, সে তত সুপুষ্ট, তত বল বীর্য্যশালী হইবে। উপবাস, অনাহার অল্পাহারকে ইহারা বড়ই ভয় করে। ইহাদের বিশ্বাস, খাদ্যের মাত্রা কিছু কম হইলে, কিম্বা কোন দিন খাদ্য না জুটিলে, অথবা বাধ্য হইয়া উপবাস করিতে হইলে, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং দুই চার বার এরূপ হইলেই চক্ষু স্থির! একেবারে পটোল তুলিতে হইবে। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। ইহাপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। দুই এক দিন উপবাস করিলে বা কম খাইলে যদি লোকে মারাই পড়িত, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে অনেক বড় বড় জীবজন্তু কোন্ কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কারণ, মানুষ যদিও ভবিষ্যতের জন্য বা অসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু মানবেতর প্রাণীরা তাহা পারে না। উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীরা চাষ করিতে জানে না; আমিষভোজী প্রাণীরা তাহাদের খাদ্য-জাতীয় প্রাণীকে পালন করিতে জানে না। বুদ্ধিমান মানুষ এত দূরদর্শী ও সঞ্চয়শীল হইয়াও—সকল মানুষ সকল দিন সমান ভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, যাহারা সঞ্চয়শীল নয় এমন মানবেতর প্রাণীদের যে মধ্যে মধ্যে খাদ্যাভাবে উপাবাস করিতে হয়, তাহা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই উপবাসের সময়েরও স্থিরতা নাই। এক দিনও হইতে পারে আবার একমাসও হওয়া অসম্ভব নহে। অবশ্য উপবাসের সময়ের একটা সীমা আছে, যাহার পর মৃত্যু অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে কিছু দিন উপবাস করিবার পক্ষে শরীরের সামর্থ্যও অস্বীকার

করা যায় না। আর মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন উপবাস করিলে ভাল বই মন্দ হয় না। যাঁহাকে কোন না কোন সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া উপবাস করিতে হইয়াছে, তিনি উপবাসের পর যখন পারণ (উপবাস ভঙ্গ বা Break fast) করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, উপবাসের পর যে কোন খাদ্যই খাওয়া যাউক না কেন, তাহাতে প্রচুর তৃপ্তি লাভ করা যায়। কথায় বলে, ক্ষুধার সমান তরকারী নাই। অতি ভোজন, অনিয়মিত ভোজন, এবং খাদ্য ঘটিত অন্যান্য অত্যাচারের ফলে যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, বুক জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা দুই এক দিন উপবাস করিলে তাহার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। অসুস্থতার প্রকৃতি ও অবস্থানুযায়ী পরিমিত সময় উপবাস করিলে, যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক ত হইবেই, তা' ছাড়া আহারে রুচিও হইবে, খাদ্য উত্তমরূপে হজমও হইবে।

বস্তুতঃ, উপবাস করিলেই লোকে মরিয়া যায় না। আমরা যেমন অসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখি, শরীরও তেমনি অসময়ের জন্য কিছু খাদ্য দেহের ভিতরেই সঞ্চয় করিয়া রাখে। শরীর গঠনের অন্যতম উপাদান যে টিসু, সেই টিসু (tissue) যত ক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ টিসুর প্রভাবে অর্থাৎ টিসু আহার করিয়া মানুষ জীবিত থাকিবে। এই টিসু ফুরাইলে অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বা মরিয়া গেলে, মানুষেরও মৃত্যু হইবে। ইতর প্রাণীরা যখন বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন এই tissueই ভিতরে ভিতরে তাহাকে খাদ্য সরবরাহ করে ও জীবিত রাখে। দেহে যতক্ষণ টিসু থাকিবে, দেহীও ততক্ষণ জীবিত থাকিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষ কত দিন উপবাস করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের কোন নিশ্চিত উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বিনা খাদ্যে ৯০ দিন পর্য্যন্ত কোন কোন লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে। ৯০ দিন অনাহারের পরও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সুবিবেচনা সহকারে খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া উপবাসকারীকে পুনরায় সবল সহজ মানুষ করিয়া তোলা হইয়াছে—কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। এই ৯০ দিন উপবাসের ফলে লোকটির দেহের ওজন ৭৫ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল। যখন সে উপবাস আরম্ভ করে তখন তাহার দেহের ওজন ছিল ৩০০ পাউণ্ড; এবং যখন উপবাস ভঙ্গ করে তখন তাহার ওজন হইয়াছিল ২২৫ পাউণ্ড। অর্থাৎ এই ৭৫ পাউণ্ড ওজনের টিসু ক্ষয় করিয়া বা খাইয়া লোকটি জীবিত ছিল। ৯০ দিন উপবাসের পর লোকটির পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ তাহার দেহ, মন নূতন করিয়া যৌবনোচিত তেজ ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, আরও অনেক লোকে সখ করিয়া কিছু কিছু দিন উপবাস করিয়াছে। উপবাসের পর সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া নব যৌবন লাভ করিয়াছে। নিয়মিত উপবাসে যে কোন অনিষ্টই হয় না, বরং শরীর নীরোগ, সুস্থ, সবল, কর্ম্মক্ষম থাকে, এবং উপবাসকারী দীর্ঘ জীবন লাভ করে, আমাদের দেশের নিষ্ঠাবতী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। দীর্ঘ জীবন, এমন কি অনন্ত জীবন ও স্থির যৌবন লাভের এই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ও নিশ্চিত উপায়—নিয়মিত উপবাস এবং উপবাসের পর উপযুক্ত, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। শীতপ্রধান দেশে তথা মেরু সন্নিহিত প্রদেশে শীতকালটা এমন বিশ্রী সময় যে সে সময়ে কোন খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। মানুষ শীতকালের জন্য কিছু খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলেও, অন্যান্য প্রাণীরা তাহা পারে না। ভেক, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণীরা, এমন কি হিম দেশের শ্বেত ভল্লুকেরা খাদ্যাভাবে সমগ্র শীত ঋতু অনাহারে থাকে; তথাপি তাহারা জীবিত থাকে; এবং শীত ঋতু অন্তে যখন খাদ্য মিলে

তখন সেই খাদ্য খাইয়া পুনরায় বল সঞ্চয় করে। যাহা ইতর প্রাণীরা পারে মানুষের তাহা না পারিবার কোন কারণ নাই। শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে সজীব টিস্থ, মাংস, চর্ব্বি থাকিলে মানুষ স্বচ্ছন্দে, অক্লেশে, অনায়াসে কিছু দিন করিয়া উপবাস করিয়া, নূতন করিয়া তেজ সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে পারে। যথেষ্ট সময় উপবাস করিলে শরীরের অতিরিক্ত চর্ব্বি ও মাংসপেশীগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য উপবাস প্রথাকে নবজীবন লাভের প্রণালী বলা যাইতে পারে। উপবাসের ফলে মৃত, ক্ষয়-প্রাপ্ত টিস্থগুলি বাহির হইয়া যায়, তাহাদের স্থলে নূতন সতেজ টিস্থ ও কোষ জন্ম গ্রহণ করে। উপবাসের ফল দেহে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। সমস্ত শরীরটা সতেজ, চঞ্চল, সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

সেই জন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দীর্ঘ দিন উপবাস অভ্যাস করিলে, নব যৌবন লাভ অসম্ভব ব্যাপার নহে। যাহারা উপবাসে অভ্যস্ত, তাহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবে; এবং সে সাক্ষ্য আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল বই প্রতিকুল হইবে না। উপবাসের আশ্চর্য্য সুফল পরীক্ষা করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সকলেই সাধ্যানুসারে দুই এক দিন বা দুই এক সপ্তাহ উপবাস করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন। তবে যাঁহার নব যৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি বানরের গ্রন্থি কিম্বা অমৃতের নিষ্ফল সন্ধানে না ছুটিয়া যদি এই পরিমাণ সময় উপবাস করিয়া থাকিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার দেহের সকল অংশের সমস্ত পুরাতন অকর্ম্মণ্য কোষ শরীর হইতে নিষ্কাশিত করা যায়, এবং তৎপরে উপযুক্ত খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নূতন কোষ গঠন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুরাতন কোষগুলির স্থান পূর্ণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারিবে। এ বিষয়ে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। উপযুক্ত চিকিৎসক বা দেহতত্ত্ববিদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, সম্পূর্ণ উপবাসের সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, সাবধানতা সহকারে তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী উপবাস ব্রত পালন করা আবশ্যক। সম্পূর্ণ উপবাসের কাল ব্যক্তি অনুযায়ী ৩০ দিন হইতে ৭০ দিন কিম্বা ততোধিক সময় হইতে পারে। শরীরের অস্থি বঙ্কালের উপর মাংসের পরিমাণ অনুসারে উপবাসের কাল নির্দ্ধারণ নির্ভর করিবে। নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট কাল উপবাস দ্বারা শরীরকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য মার্কিন দেশের কোন কোন স্থলে যোগ্য দক্ষ বিজ্ঞ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে স্যানিটেরিয়াম বা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। নব যৌবনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সেখানে থাকিয়া কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ মত চলিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন। আমাদের দেশে জ্বর জাড়ির স্থলে ঔষধ পত্র ব্যবহার করিবার পূর্বে প্রথম প্রথম দুই তিন দিন "লঙ্ঘন" বা উপবাস দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক স্থলে কেবল এই উপবাসের ফলেই জ্বরজাড়ি আরাম হইয়া যায়; ঔষধ আদৌ সেবন করিতে হয় না। আমেরিকার স্যানিটেরিয়ামে উপবাস ব্রত পালনের ফলে কেহ কেহ বাত রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন, দেখা গিয়াছে। উপবাসের দ্বারা যথার্থ উপকার পাইতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত উপবাস করা আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইবার পূর্ব্বেই, ক্ষুধায় কাতর হইয়া বা উপবাস ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝখানেই ব্রত ভঙ্গ করিলে বিশেষ কোন ফল লাভের আশা নাই। তবে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল উপবাস করায় অসুবিধা হইলে মধ্যে মধ্যে নিয়মিত ভাবে কিছু দিন করিয়া উপবাস করিলে তাহার ফলও মন্দ হয় না। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—যে খাস ত অল্প খা, অল্প খাস ত বেশী খা। ইহার অর্থ এই যে, যদি দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনকে দীর্ঘকাল সম্যক রূপে উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে মিতাহারী হওয়া চাই, এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসও দেওয়া আবশ্যক। আর যদি শীঘ্র শীঘ্র জীবন উপভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ কর তবে যত ইচ্ছা অবিশ্রান্ত ভাবে খাও—কিছুরই বাছবিচার করিবে না। তাহা হইলে অচিরকাল

মধ্যে তোমার শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং বাসনাও পূর্ণ হইবে।

এই উপবাস ব্রতের ফল এত নিশ্চিত ও এত বেশী যে, ইহা অবলম্বন করিলে জীবনধারণ ও জীবন রক্ষার্থ ঔষধের ব্যবহার বারো আনা ভাগ কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত জীবন যাপন করিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যখন দেখা যায়, বার্দ্ধক্য ও জরা আসিয়া অতর্কিত ভাবে শরীরকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন উপবাস ব্রত আরম্ভ করিলে জরার আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করা যায়—যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে উপরি উপরি দুই দিন, কিম্বা দুই দিন অন্তর একদিন করিয়া, অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিনও নিয়মিত ভাবে উপবাস করিতে অভ্যাস করিলে তাহাও ব্যর্থ হইবে না—তাহার ফলও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইবে।

—— —

টাকা কোথায়?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

ইংরাজ এদেশে আসিবার পর হইতেই একটা ধূয়া আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে, ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। দেশে ম্যালেরিয়া হইল, অমনি বিজ্ঞেরা বলেন, খাদ্য-শস্যের উৎপত্তি বেশী করা দরকার; দেশে 'চাকরী নাই' রব উঠিল, অমনি ভারত-বন্ধুরা উপদেশ দিলেন "যুবকেরা লাঙল ধর।" সকলেই ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, কৃষির বহুল প্রসারেই জাতীয় ধনবৃদ্ধি হইবে। কথাগুলি একেবারে যুক্তিহীন নহে। তবে ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ নহে; অন্ততঃ ইংরাজেরা যখন এদেশে আসিলেন, তখন ছিল না।

পূর্ব্বে প্রতি কৃষক একাধারে শিল্পী ও কৃষক ছিলেন। কৃষিকার্য্য করিয়া যে সময়টুকু বাঁচিত, সে সময়টুকু তাঁহারা আলস্যে না কাটাইয়া কোন প্রকার গৃহশিল্পে নিযুক্ত থাকিতেন। ফলে তাহার গৃহে কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায়, কৃষক অজস্র পরিশ্রম করিতেছে অথচ তাহার ঋণ ঘুচে না। ভারতের কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রমী, তাহার বিলাসিতা নাই, ব্যয়-বাহুল্য নাই, অথচ তাহার অভাব যায় না কেন, ইহা ভাবিবার কথা। ভারতের কৃষকের জয় গান করিয়া বিলাতের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Macdonald) বলিয়াছেন—The people are the most industrious in the world; much of their land is fertile and yields rich crops; whenever a famine comes they are stricken with starvation and die by thousand, whilst millions are shattered in physical vigour. কৃষকেরও পরিশ্রমের অন্ত নাই, ক্ষেত্রও বেশ উর্ব্বরা; তথাপি একটা দুর্ভিক্ষ আসিলেই মানুষ দলে দলে অনশনে মরে কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, দেশের কৃষকের স্বাস্থ্যহানির ফলে চাষবাস পূর্ব্ববৎ চলিতেছে না, ইহা ছাড়া, কেবল কৃষিকার্য্যেও দিন চলা শক্ত। আজ 'টাকা' 'টাকা' রব উঠিয়াছে—কৃষককে আজ গৃহশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; নতুবা এই ক্ষুধা যাইবে না—এই দেশব্যাপী হাহাকারও থামিবে না। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে দেশের কৃষি নষ্ট হইতে পারে। তখন কৃষকের একাধিক আয়ের পন্থা থাকা দরকার।

১৮৮৭ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, উহার অনুসন্ধান সময়ে Famine Commission তাই বলিয়াছেন—A main cause of the disastrous Indian famines is to be found in the fact that the great mass of the people live directly on Agriculture and there is no other industry from which any considerable part of the population derives its support.

গৃহ শিল্পের ক্ষেত্র কত বড়, তাহা আমরা সকলেই জানি ; অথচ এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। নিত্য-ব্যবহার্য্য সব জিনিসই আমরা এখন বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ঐ সকল জিনিস ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। 'টাকা টাকা' করিয়া না বেড়াইয়া আমরা যদি প্রতি গ্রামের বিশিষ্ট গৃহশিল্পটীকে পুনর্জীবিত করিবার প্রয়াস করিতাম, তাহা হইলে জাতীয় ধনবৃদ্ধি বহুল পরিমাণে হইত।

সমগ্র বাংলা দেশে হাজারকরা ৭৮৭ জন চাষাবাদ দ্বারা প্রতিপালিত হয় ; বাকী ২১৩ জন মাত্র নানাপ্রকার কাজে নিযুক্ত থাকে। গৃহশিল্পে হাজারকরা ৫০জনও নিযুক্ত নহে ; অর্থাৎ শতকরা ৫ জনও লোক শিল্পের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নহে। আমাদিগকে আজ কৃষি ও গৃহ-শিল্পকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া আয়ের পথ সুগম করিতে হইবে।

যে কৃষক পাট উৎপাদন করে, সেই যদি পাট হইতে চটও উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা এ দেশে থাকিত। গত ১৯২০ সালে ৭৪ কোটী টাকার পাট ও চট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে ; বাংলার কৃষককে তাহার উৎপন্ন জিনিসের নানাপ্রকার ব্যবহার জানিতে হইবে। যে রেড়ির চাষ করে, সে ইচ্ছা করিলে এবং শিখিলেই, রেড়ির তেল, কাষ্টর অয়েল প্রভৃতি মূল্যবান্ বস্তুও প্রস্তুত করিতে পারিবে।

কৃষকেরাই যে কেবল গৃহশিল্পের উন্নতি করিতে পারেন, এমন নহে। বাংলার যুবকেরও বসিয়া না থাকিয়া কোন না কোন শিল্প-চর্চ্চা করিয়া অর্থাগম করিতে পারেন। এজন্য প্রথমতঃ যুবকদিগকে গ্রামের শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিতে হইবে ; যাহাতে অনবরত জিনিস উৎপন্ন হয় এবং বাজারে সর্ব্বদা উহার কাটতি হয়, সে বিষয় উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমাদের বাঙ্গালী যুবকদের বিষয় বুদ্ধি কম থাকাতে, অনেক স্থলে শিল্পোদ্ধার-প্রচেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। কেবল জিনিস উৎপাদন করিলেই হইবে না, উহার qualityও লোকে দেখিবে। ইহা ছাড়া বাহিরে আসিলেই অন্যের সহিত প্রতিযোগিতাও করিতে হইবে—আবার marketও আছে কি না তাহাও বিচার্য্য। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

বাংলার জঙ্গলে অসংখ্য পলাশ, শাল, কুসুম প্রভৃতি গাছ জন্মে। উহা হইতে লাক্ষা ও তসর হইতে পারে, ইহা বোধ হয় অনেক যুবক জানেনই না। এক কুলগাছে লাক্ষার চাষে বার্ষিক ৬৲ আয় হইতে পারে। ২৫৲।৩০৲ টাকার কেরাণীগিরি অপেক্ষা ইহা সহস্রগুণ ভাল। ১০০টী গাছে বার্ষিক ৬০০৲ আয় অর্থাৎ মাসিক ৫০৲ ; এই আয়ে এক রকম করিয়া একটী পরিবার প্রতিপালন করা যায়।

বাঁশ, বেত ও দড়ির কাজের জন্যও বেশী মূলধন দরকার নাই। বাংলায় বাঁশ ও বেত গাছের অভাব নাই ; পল্লীগ্রামে বাঁশের গাছ কেবল ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি করে ; উহা দ্বারা নিত্য-ব্যবহার্য্য ঝুড়ি, ধামা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে—বাঁশের ও বেতের fancy জিনিসও বিলাসীদের প্রিয় বস্তু। অন্য বিদেশী ব্যবসায়ী উহা ক্রয় করিয়া—একমাত্র middle-man হিসাবেই অজস্র টাকা রোজগার করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি। দড়ির চাহিদা অত্যন্ত বেশী, অথচ বাংলা দেশে খুব কম যায়গায়ই রীতিমত দড়ি প্রস্তুত হইতেছে।

ইহা ছাড়া অনেক গ্রামে পিতল ও কাঁসার কাজ পূর্ব্বে খুব প্রসিদ্ধি ছিল ; ঐ সকল স্থানে এখন সে শিল্পের নাম-গন্ধও নাই। উহাদের বংশধর

খোঁজ করিলে দেখা যায়, হয় তাহারা মুটে-মজুর হইয়াছে, নতুবা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া কেরাণী হইয়াছে। এই হতভাগ্য জাতির মধ্যে চাকরীর নেশা যে কি প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সকলেরই ধারণা "যেমন তেমন চাকরী ঘী ভাত'। চাকরীর মোহ কত বেশী হইয়াছে তাহা আজ ৫০।৬০ বৎসরের পূর্ব্বেকার একটী ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইয়া কোন বিদ্যালয়ের একটী রজক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ বাবা, তুমি বড় হইলে কি করিবে ? বালক উত্তর করিল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইব ; নাপিত ছাত্রটী উত্তর করিল, ডেপুটী হইব। কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকল ছাত্রই বলিল—কেহ মুন্সেফ, কেহ সদরালা, কেহ বা উকীল হইবে ; একটী ছাত্রও নিজের জাত ব্যবসায় লিপ্ত হইয়া বড় হইবে, এরূপ বলিল না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাই বলিযাছিলেন—A nation of munsiffs and deputies cannot survive. বিলাতের প্রধান মন্ত্রীও cobbler পুত্র বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে জাত-ব্যবসা গোপন করিতে পারিলে লোকে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। আমরা vocational education, technical education—কার্য্যকরী ও অর্থকরী শিক্ষার বুলি ধরিয়াছি। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—জাতিকে আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। নতুবা এই দারিদ্র্য যাইবে না। এই বাংলার চীনারা কাঠের কাজ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে মনি অর্ডার করে—আমাদের মিস্ত্রীকুল ত লোপ পাইয়াছে। তাহারা জাত-ব্যবসা করিয়া পেয়াদা হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, অবাঙ্গালীরা প্রতি সপ্তাহে না কি ৪।৫ লক্ষ টাকা মনি অর্ডার করে—ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ত আছেই। এই অর্থ শোষণ বাঙ্গালীকে আজ বন্ধ করিতে হইবে। এজন্য চাই ধৈর্য্য, বিষয়-বুদ্ধি ও পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান। নূতন দৃষ্টিতে দেশকে দেখিতে হইবে। মায়ের পল্লী-গৃহে বহু কাঁচা মাল আছে ; উহাদিগকে finished productএ পরিণত করিয়া অর্থাগম করিতে হইবে। কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবনা না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িতে হইবে। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের কথা শুনিলেই লোকে অশ্রদ্ধা করে—এই গ্লানি দূর করিতে হইবে। জাতীয় ধন বৃদ্ধির উপায় বিদেশীকে গালাগালি করা অথবা ঈর্ষা করা নহে। আমাদিগকে নিজের ঘর সামলাইতে হইবে। কোন জাতিরই এমন ভাবে শিল্পনাশ হয় নাই। বাঙ্গালার কুটীরগুলি চরকার গুণ গুণ শব্দ, তাঁতের ঘর্ ঘর্ এবং মিস্ত্রী, শিল্পীর কল-কোলাহলে যে দিন মুখরিত হইবে, সে দিন এই "হা অন্ন হা অন্ন' রব দূর হইবে। বাঙ্গালীকে আজ তাই মনে প্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে—কৃষি ও শিল্পের মণি কাঞ্চন যোগে সোণা ফলাইতে হইবে। শিল্প ও কৃষির বহুল প্রসারে জাতীয় দুর্দ্দিনের অবসান হইবে।

শিশু-মঙ্গল

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের (Bengal Public Health Department) উদ্যোগে ও অর্থে কয়েক বৎসর যাবৎ "শিশু-মঙ্গল সপ্তাহ" (Baby week) নামক একটী শিশু ও জনস্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। লোক-শিক্ষা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীতে বক্তৃতা ও বায়স্কোপের সাহায্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান প্রচার করা হইয়া থাকে। বাস্তব-প্রায় মডেল ও চিত্রের সাহায্যে —পুত্তলিকা ও মানচিত্রের মধ্য দিয়া আদম সুমারির

দুরূহ সংখ্যা ও তথ্যগুলি জনসাধারণের সমক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও দেখান হইয়াছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল শিশু-কল্যাণ-মন্দিরটী। কেন আমাদের শিশুরা অকালে মরে, এবং তাহার প্রতীকার কি—এ সকল কথাই কর্ত্তৃপক্ষ বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ছবি ও চিত্রগুলি যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় যে আমরা ধ্বংসোন্মুখ জাতি। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ মহিলাদের—ভাবী মায়েদের (স্কুলের বালিকাদের) ও বিদ্যালয়ের বালকদের জন্য বিশেষভাবে যানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রদর্শনী দেখিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। আমরা এই আন্দোলনটীর মঙ্গল ও বিস্তার কামনা করি।

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে—

"হওন মরণ বিয়ে
এ তিন বিধাতার দিয়ে"

অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ এ তিনটীর উপরে মানুষের হাত নাই। বাংলার আবহাওয়াতে এই অদৃষ্টবাদ এমন বদ্ধমূল যে স্কুলের বালককেও যদি বলা হয় শরীরের যত্ন কর, সে অমনি বলিয়া বসিবে—

জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা ভবে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে।

অদৃষ্টবাদের ফলে বাঁচিবার চেষ্টা করাকে পর্য্যন্ত দেশবাসী অনর্থক বলিয়া মনে করেন। আজ যাহারা জাতির উন্নতিকামী তাহাদিগকে অনবরত প্রচার করিতে হইবে — বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম
বিফল নহে এ প্রাণ।

ইংরাজ কবি সত্যই বলিয়াছেন

Life is real, life is earnest.

এই মহাবাক্য দেশে বিদেশে প্রচারিত হইলেই জাতির মধ্যে বাঁচিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই উপায়ও আবিষ্কৃত হইবে—where there is will there is way.

আমাদের অনেকের ধারণা যে ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য নীতির জ্ঞান জনসাধারণের ছিল না। কথাটী ঠিক নহে। যাঁহারা স্মৃতি ও সংহিতা প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন যে কি করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন কাল পর্য্যন্ত চলিতে হইবে তাহার এক ধারাবাহিক routine (তালিকা) স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। শুধু কি তাই? গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী, ... নির্ম্মাণের নিয়ম অথবা রোগীর শয়ন কক্ষের ... সকলই লিপিবদ্ধ আছে। আজিকার মত জীবাণুতত্ত্ব তখনকার সমাজে ছিল কি না জানি না। তবে সংক্রামক ব্যাধির নিবারণার্থই যে স্বপাক আহার অথবা ... আহারাদি নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা নূতনের মোহে বলেন যে আমাদের কিছুই ... না—এবং পিতৃ পিতামহকে old fool বলেন ... দিগকে Pope এর সেই অমর বাক্য স্মরণ করাইয়া ... চাই যে—

"We call our fathers fools
So wise we grow,
Our wiser sons will no doubt call us ...

কে বলিতে পারে যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে ... আরো নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তখন ... বর্ত্তীয়েরা আমাদিগকেই old fool বলিয়া বসিবে ... তাই মনে হয় আত্মস্থ হইয়া ঘরের কথা জানিয়া ... কথা ভাবাই ভাল।

আমাদের প্রাচীনকালের নিজস্ব স্বাস্থ্যনীতি ... ভুলিয়া গিয়াছি। দিন দিন নূতন নূতন রোগ আম... হইতেছে। ডাক্তারের 'থলি' যতই পূর্ণ হইতেছে, ... প্রমাণ হইতেছে যে, জনসাধারণের রোগ বাড়িয়া ... বিলাতী একজন ডাক্তার নাকি বলিয়াছেন যে— ... live upon the ignorance of the peo[ple] ... কথাটী সমীচীন। সত্যই ত, যতই আমরা স্বাস্থ্য ... ভুলিয়া যাইতেছি, অথবা স্বাস্থ্যনীতির অব... করিতেছি, রোগ ব্যাধি ততই আমাদের ... বসিতেছে। আমাদিগকে এখন জনসাধারণের ...

নূতন করিয়া স্বাস্থ্যনীতিটী সহজ ও সরল উপায়ে প্রচার করিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থাদি ...অবশ্য পাঠ্য (Compulsory) না করিলে অথবা ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যবস্থা না করিলে, পরবর্ত্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-মঙ্গল সমিতি (Student Welfare Committee) স্থাপন করিয়া কি ফল পাইবেন? "গোড়ায়ই যে গলদ"—আমাদিগকে প্রাথমিক স্কুলের বালকদিগকে প্রথম শিখাইতে হইবে—কি করিয়া স্বাস্থ্যবান হইতে হয়—

"কঁচায় না নোয়ালে বাঁশ
পাকলে করে টাশ টাঁশ"

এ অতি সত্য কথা।

বালিকাবিদ্যালয়গুলিতে ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি মেয়েদের মধ্যে প্রচার প্রয়োজন। বালিকাই ভবিষ্যৎ-কালে পরিবারের কর্ত্রী হইবেন এবং মা হইবেন। বালিকাদেরও স্বাস্থ্যনীতি জানা অত্যাবশ্যক।

জনসাধারণের জন্য মেলায় হাটে ও উৎসব আনন্দে, পূজা পার্ব্বণে যেখানে অধিক লোক সমাগম হয় সেখানেই স্বাস্থ্য বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন (lantern lecture) ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পুস্তিকা প্রচার, স্বাস্থ্যমূলক অভিনয় ও কথকতার সাহায্যে সংক্রামক রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে আমরা জনমত যত শীঘ্র গঠিত করিতে পারিব, ততই দেশের কল্যাণ হইবে।

আইনেরও প্রয়োজন আছে। Compulsory Vaccination Act হওয়াতে যে টীকা জিনিসটী দেশে প্রসারতা লাভ করিয়াছে, ইহা ত সকলেই জানেন। এইরূপে জঙ্গল কাটা, ডোবা পরিষ্কার করান, পুকুর সংরক্ষণ (Reservation of Tanks) বিষয়েও আইনের কড়াকড়ির প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ বেণ্টলী মহাশয়, Bengal Public Health Act প্রণয়ন করিলে যে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে, তাহা দেশ বিদেশের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

শিশু-মঙ্গল-প্রচেষ্টা বিলাতেও গত ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেই মাত্র আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইতি মধ্যেই সে দেশের আবহাওয়া পর্য্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে।

১৮৯৮ সালে বিলাতে ১০০০ করা ১৫৬টী শিশু মরিত; কিন্তু ২৫ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সে দেশে ১৯২৩ সালে মাত্র ৮০টী মরিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কি করিয়া এই অঘটন সংগঠন হইল তাহার বিবরণ শুনুন—

Nation interest was aroused throughout the country; a demand for legislation arose and the first series of acts which have revolutionised infant welfare in England was passed in 1902. One of the most important landmarks of progress in England was the formation of the National Baby-week Couneil in 1917. This movement has assumed large proportions.

ভারতেও এই আন্দোলন বড়লাট-পত্নী লেডী রেডিং মহোদয়ার আমলে ১৯২৪ সালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রদেশেই আন্দোলনটী ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। বাংলা দেশে মহামান্যা লেডী লিটন মহোদয়ার নেতৃত্বেও এই আন্দোলন আশানুরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে। শিশু-মঙ্গল-প্রদর্শনী তাঁহারই আগ্রহে দিন দিন প্রতিষ্ঠা পাইতেছে।

কলিকাতাতে যে প্রাদেশিক শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা এখন কেবল সহরেই অনুষ্ঠিত হয়। কদাচিৎ দুই একটী গ্রামে উহার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আমদিগকে এই আন্দোলনটীর গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ গ্রামই জাতির প্রাণ—The nation dwells in cottages.

আপনারা জানেন কি?

প্রতিদিন বাংলাদেশে ৩১৯২টী শিশু জন্মে; তন্মধ্যে ৮১৬টী মরে। অথচ অন্যান্য দেশে শিশু-মৃত্যু কত কম! নিউজীল্যাণ্ডে ঐ স্থানে মাত্র ১৭৭ জন মরে।

যেখানে প্রতি ৫৪টী শিশুর মধ্যে ১০টী ১ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বেই অকালে প্রাণত্যাগ করে, সেখানে লণ্ডনে ১৬৬ শিশুর মধ্যে মাত্র ১০টী মরে। আমদের দেশে শিশুমৃত্যু বিলাতের তুলনায় ৩ গুণ অধিক।

অথচ এ কথা সকলেই জানেন যে এই মৃত্যুহার নিবারণ করা যাইতে পারে।

নিবার্য্য ব্যাধির মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার একটী। আপনারা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন যে প্রতি ১৫টী অন্তর একটী করিয়া শিশু ধনুষ্টঙ্কারে মরে। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ হাজার শিশু কেবল নাড়ী কাটার দোষেই প্রাণত্যাগ করে। ধাত্রীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই এই মৃত্যুলীলা বন্ধ হইতে পারে।

প্রসূতি-মৃত্যু অথবা মাতৃহত্যাই কি এদেশে কম হইতেছে? ইংলণ্ডের তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে প্রসূতির অকালমৃত্যু ৫০ গুণ অধিক। বিলাতে ২০০০ প্রসূতির মধ্যে ১টী মরে, কলিকাতায় প্রতি ৪০টী প্রসূতির মধ্যে একটী মরে। অথচ সকলেই জানেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—বাল্যমাতৃত্ব, অন্তঃসত্তা অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা ও ... ইহার কারণ।

আদমসুমারির বিবরণ পাঠ করিলে ... হয়। স্বতঃই মনে হয় ইহার কারণ কি?

অনেকে সমস্বরে বলিবেন, দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ। অন্য কেহ বলিবেন দুগ্ধের অভাব মুখ্য কারণ। ... বলি, তৃতীয় কারণ, অজ্ঞতা ও উদাসীনতা।

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন "ইহা সত্য, যে, দারিদ্র্য, ভাল খাইবার পরিবার ... করিবার সামর্থ্য না থাকা রুগ্নতার ও শিশু-মৃত্যুর ... আধিক্যের প্রধান কারণ। কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম ... জানা ও তাহা না পালন করা এবং সূতিকাগারের ... শোচনীয় অবস্থাও প্রধান কারণ তাহা অস্বীকার ... যায় না। দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ হইলে কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতি ধনী মাড়োয়ারীদের বাসস্থানগুলিতে শিশু-মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত না। দারিদ্র্য ... করিবার চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত; কিন্তু ... সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াইবার ও সূতিকাগৃহের অবস্থার ... করিবার চেষ্টাও হওয়া চাই।"

দলাদলি

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

অবশ্য বলা বাহুল্য যে, "দলাদলি" কথাটা বাঙ্গালার নিজস্ব। নিষ্কর্ম্মা, অর্থশালী লোকের পক্ষে এমন মনের মত কাযও আর নাই! তাই আজ পল্লীগ্রামে কথায়-কথায় দলাদলি, কিন্তু ক্বচিৎ কথায়-কথায় গলাগলি! যেখানে শিক্ষার অভাব, সেই খানেই দলাদলির বাহুল্য, এইটাই অনেকের মত; কিন্তু আমার মনে হয়, শিক্ষার অভাবে দলাদলি করিবার বুদ্ধিটা যতটা মাতিয়া উঠে, ন্যায্য কাযের অভাবে, দলাদলিটা তাহার চেয়েও বেশী করিয়া ও কায়েমী করিয়া ফুটিয়া উঠে। দলাদলি ব্যাপারটা মুখ্যতঃ ও কার্য্যতঃ, সমাজ-শাসনেরই অঙ্গ। কিন্তু হিন্দুর সমাজ যে আজ শব; কাযেই, দলাদলিটা ... শবদেহের পূতিগন্ধ বহন করে।

আজ মৃত, ছত্রভঙ্গ হিন্দুর সমাজে দলাদলির বা... বাড়ি ঘটিলেও, আসলে হিন্দু-সমাজের বাঁধনটা ... মজবুত—তাই আজ সে সমাজের খোলসটাও ... আঁকড়াইয়া খাবি খাইতেছে। হিন্দু-সমাজের ... হইতেছে—অন্যোন্যসাপেক্ষতা; অর্থাৎ, হিন্দু আর ... হউক, মূলতঃ "একোল-ষেঁড়ে" নয়। একটা ... প্রত্যেক চাকার সঙ্গে অপর সকল চাকা সম্বদ্ধ ও ... হওয়ায়, কলের প্রত্যেক চাকা যেমন অন্যান্য ...

... তারে ষোল আনা নির্ভর করে, হিন্দু সমাজ ঠিক্ সেই ভাবেই গঠিত। হাজার জাতি-বিচার থাকুক—হাজার ছুঁৎমার্গের ... জনক বাড়াবাড়ি থাকুক— তবুও এক হিন্দু অপর হিন্দুর সুখে দুঃখে নানা রকমে বিজড়িত।

বেশী দিন নয়—৫০।৬০ বৎসর। পূর্ব্বে, হিন্দুর সমাজে বৈদ্যের প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রামের বা চাকলার জমীদার, ... দ্বারা সেই বৈদ্যের সাংসারিক দুশ্চিন্তা দূর করিতেন। এবং রাজ-সরকারের ব্যয়ে মূল্যবান ঔষধগুলি প্রস্তুত করাইতেন। কাযেই, ব্যারামে, পল্লীর প্রত্যেক ব্যক্তিই, বিনাব্যয়ে, সে বৈদ্যের, ও রাজব্যয়ে প্রস্তুত ঔষধের যুগপৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। কাযেই, ... জমিদার, বৈদ্য ও গ্রামবাসী—পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা থাকিতেন। এখন সে বৈদ্য নাই—যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অধিকাংশই গো-বৈদ্য বা অবৈদ্য; তাঁহারা কেবল এই বচনটুকুই সার করিয়া বসিয়া আছেন—"ত্বয়া ন পঠিত্যং শাস্ত্রং, ময়া নহি চিকিৎসিতং ... কথং গ্রাম ধুমায়তে?" এখন সে জমীদারও নাই; কাযেই, এখন চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এখন আর কেহ "আমি বিলাতি ঔষধ খাইব না—খাইলে জাতি যাইবে," এইরূপ protectionist বা সংরক্ষণবাদীর মত কথা বলেন না। এখন আপনিই সর্ব্বস্ব, আপনার স্বার্থই বড়—স্বজাতির কল্যাণ এখন আর লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না!!

সংস্কৃত ভাষায়, "স্বাস্থ্য-তত্ত্ব" সম্বন্ধীয় কোনও স্বতন্ত্র পুস্তক আছে কি না, অবগত নহি—সম্ভবতঃ, ঐ নামীয় স্বতন্ত্র পুস্তক নাই। তাহা হইতে কোনও দিগ্‌গজ গবেষণাকারী বা প্রত্নতাত্ত্বিক যেন সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন যে, হিন্দুরা ব্যায়াম সারাইতে জানিত; কিন্তু, ব্যারামকে নিরারণ করা যায়, এ বড় কথাটা হিন্দুরা জানিত না! প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ হইতে, রাত্রে সহধর্ম্মিণীর প্রতি কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রত্যেক কাযের নিয়মের শিরায় শিরায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে আছে। শৌচত্যাগ, স্বপাক ভোজন, অশৌচ-বিধি, যাগ-যজ্ঞ, প্রভৃতি হিন্দুর প্রত্যেক কাযেই বর্ত্তমান-স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত উৎকৃষ্ট বিধিগুলিই ছিল ও এখনো আছে। কাযেই, এটা বলা মোটেই অন্যায় নয় যে, হিন্দুর সমাজ ও হিন্দুর দৈনিক জীবনের আচার ব্যবহারের ভিতরে—ভেদনীতি বা দলাদলির এতটুকু গন্ধ ছিল না—বরং প্রত্যেক একজন হিন্দুর সঙ্গে, অপর সকল হিন্দু ও হিন্দুর আচার অঙ্গাদি ভাবে মিশান ছিল! তাই তখন বিলাতী ঔষধ সেবন করিয়া জাতিকে উৎসন্নে দিবার ভয়টাও এতটা প্রবল ছিল! কিন্তু এখন সবই গিয়াছে—পাশ্চাত্য শিক্ষার ফেণিল জলের স্রোতের মুখে!

(১) আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান লোপ পাইয়া, ব্যক্তিগত অহমিকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(২) আত্ম-ত্যাগের পরিবর্ত্তে, ঘোর স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ আসিয়া পড়িয়াছে।

(৩) দেশের প্রতি—দেশের আচার ব্যবহার, সমাজ-প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম কর্ম্ম, রীতি-নীতি, দেশের মানুষ এমন কি দেশের দেবতারও প্রতি—প্রচ্ছন্নভাবে অবিশ্বাস, ঘৃণা জন্মিয়াছে ও মমত্ব-বোধ লোপ পাইয়াছে! তাহার স্থানে, লোক-দেখান, মৌখিক "স্বদেশী" ভাব জাগিয়াছে! এক কথায়, আমরা ইতঃভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হইয়া পড়িয়াছি! আমরা ঘরের ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, পরের কুকুরেরও অনুগ্রহ উপার্জ্জন করিতে পারি নাই।

আমাদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে। আমি অপর কোনও বিষয়ে সে কথাগুলি না লাগাইয়া, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে ঐ কথাগুলির উপযোগিতা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের (অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দুদের)—

(১) দৈনিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, ছিল কি—স্বাস্থ্যানুকূল বিধি-নিষেধ; সেই অনুষ্ঠানগুলি অন্যোন্যসাপেক্ষ ছিল; সে অনুষ্ঠানে আত্মত্যাগের বীজ ছিল; সে অনুষ্ঠানে সংযম শিক্ষা হইত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, গ্রামের বাহিরে শৌচত্যাগ, তৎপরে, প্রাতঃস্নান, পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ

করিতে করিতে পুষ্প চয়ন, শীতাতপকে অগ্রাহ্য করিয়া পূজা, স্বপাক ভোজন, দিবা-নিদ্রা বর্জ্জন, বৈকালে শাস্ত্র চর্চ্চা ও আত্মীয়াদির সহিত মেলামেশা, রাত্রি-কালে লঘু ভোজন ; পূজা পার্ব্বণে পাঁচ জন অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণের সেবা ; অশৌচাবস্থায় সংযম ও বর্ত্তমান কোয়ারাণ্টাইন (quarantine) রক্ষা করা ; কোন্‌টা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল না ছিল ? স্বাস্থ্যই যে হিন্দুর সম্পদ ছিল, এই নর-দেহ যে হিন্দুর দেব-মন্দির স্বরূপ ছিল, সে হিন্দু সেই দেবদুর্লভ দেহকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিবার জন্য কি না করিয়া গিয়াছেন।

(২) হৃদয়বান্ হিন্দু এটা অতি বেশী রকমে বুঝিয়াছিলেন যে, অপর যে কোনও কায়দায় মানুষকে পাইয়া, পয়সা উপার্জ্জন কর না কেন, লোকের ব্যারামে বা মৃত্যু-শয্যায়, অন্ততঃ পয়সা রোজগারের সময় ও স্থান নহে। এই জন্য হিন্দু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, বেদ তুল্য পরম হিতকারী চিকিৎসাশাস্ত্রের পারদর্শী যিনি হইবেন, তিনি রাজানুগ্রহে অর্থচিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, সমাজের কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবেন। আর এখন তাহার স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে কাহারা ? মোটর-বিহারী স্বার্থান্ধ বিলাসী ও মোটা দর্শনী আদায়-কারী যমরাজের টেক্স্ পেয়াদা ! কেন এমনটি হইতেছে জান ? তবে শুন।

(১) আমরা স্বার্থ-সুবিধাবাদের দোহাই দিয়া এবং রাজপুরুষদিগের ঘৃণিত অনুকরণ (aping) করিয়া, যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত রীতিনীতির প্রচলন করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। জুতা পায়ে ভোজন গৃহে প্রবেশ করা, হোটেলে খাওয়া, পাচকের হাতে খাওয়া, দোকানের তৈয়ারী খাবার খাওয়া, একই জামা কাপড় বহু বহু দিন ধরিয়া পর, হেয়ার কাটারের বাড়ীতে চুল কাটান ও দাড়ী কামা, রেলগাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া, থিয়েটার বায়স্কো যাওয়া, অখাদ্য ও বৃথা মাংস ভোজন করা, মদ্য পা করা, বারবণিতালয়ে যাওয়া—আর কত দিব ? দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পাদ বিক্ষেপে অসা স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার, নৈরাকার প্রকট পড়িতেছে !

(২) আজ রাজসরকার মামুলি-ভাবে দুঃখি চিকিৎসার ও সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্বের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভুল এই খানেই। ব্যা রোগ-চিকিৎসা—বতন্ত্র বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয় চিকিৎসকেরা অর্থ লোভী হইয়াছেন। দেশের পণ্ডিতরা জন সাধারণকে এই বিশ্বের সকল শিখাইবার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, তত্ত্ব ভুলিয়াও শিখিতে দেন না ! কাযেই, জনসা স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা এতদুভয় বিভাগের লোকে জোটে সাহায্য, পরামর্শ বা সুবিধা পান রাজ্য-শাসন ব্যবদেশে এই দলাদলির ফলে, সাধারণ, না চিকিৎসক, না সরকার—কেহই উপকৃত হইতেছেন না ! একেই বলে কাল লঙ্কা ভাগ ! এই দলাদলি যত দিন থাকিবে দিন এ দেশে সকল রকমের রোগই চিরস্থায়ী করিতে থাকিবে ! মূলতঃ, এভুল ইংরাজের। আমাদিগকে সজাগ হইয়া, এই ভুলের মূলে কুঠা করিয়া, দলাদলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, যাহাতে জনসা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা ও চিকিৎসক একত্রে হইয়া কায করিতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ

উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতি

অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অকাল মৃত্যু—এই তিনটী আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির প্রধান কারণ—ইহা উপলব্ধি করিয়া, দেশ-মধ্যে স্বাস্থ্য-প্রজ্ঞা (Health conscience) জাগরিত করার জন্য "স্বাস্থ্য-সমাচার" মাসিক পত্র আজ ১৪ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। "স্বাস্থ্য-সমাচার" প্রকাশের পর হইতে দেশে ক্রমশঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ দেখা যাইতেছে ; আলোচনা, বক্তৃতা ও আলোক-চিত্রের দ্বারা সাধারণকে এই সকল বিষয় বুঝাইবার জন্য বহু সমিতি, পরিষদ্‌মণ্ডলী ও সরকারী স্বাস্থ্য-প্রচার বিভাগ উত্তরোত্তর নানারূপ প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা করিতেছেন।

সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত চেষ্টায় স্বাস্থ্য-জ্ঞান দেশের মধ্যে কথঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করিলেও, দরিদ্রতা ও অকালমৃত্যুর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন বিশেষ ধারাবাহিক ও আদর্শ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না ; তার উপর স্বাস্থ্য-জ্ঞানগুলি অশিক্ষিতের নিকট হৃদ্য হইলেও বাস্তব জীবনে গ্রহণীয় হইয়া উঠিতেছে না। সেই জন্য জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু প্রভৃতি নিবারণের উপায়সকল সরল, সুবোধ্য ও সহজসাধ্য ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া এবং "দেশের স্বাস্থ্য ও শক্তি-বৃদ্ধিই যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন" ও "অর্থনৈতিক উন্নতিই যে মুক্তিলাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা"—তাহা নানা নিবন্ধ ও প্রস্তাবের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা" আজ ৪ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। দিন-পঞ্জিকার সহিত জীবনীশক্তি-সঞ্চারক প্রবন্ধ ও কবিতাবলি, পল্লী-উন্নতি, স্বাস্থ্যনীতি, টোট্‌কা চিকিৎসা, তাঁত, চরকা, খাদ্যনির্ব্বাচন, শক্তি-সঞ্চয়, গো-সেবা, দাম্পত্য-বিজ্ঞান, আয়ুঃ-বর্দ্ধন, শিশু-পালন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং দেশ-পরিচায়ক ও জাতীয়তা-ভাবোদ্দীপক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবাদসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়া পঞ্জিকাটি সাধারণে মধ্যে প্রচারার্থ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কথা ও কাজ—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মুখে বক্তৃতা করা, উচ্চ হইতে তুচ্ছ বচনগুচ্ছ রচনা করা বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর জাতিগত সংস্কার, কাজের বেলা বড়ই ঠেকাঠেকি, সেখানে বাঙ্গালী—'মাথাটি করিয়া নীচু, হন সকলের পিছু' !

স্বাস্থ্য-সমাচার ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা এ-যাবৎ কাল প্রথামত কেবল কথা কহিয়াই আসিতেছেন এবং সেইরূপ অন্যান্য মণ্ডলী, সমিতি, সভা ইত্যাদি এখনও করিতেছেন। কিন্তু কথায় আর প্রাণ গলিবে না, কাজ চাই ; ঝড়ের রাতে আলোর অগ্রদূত চাই !

কথাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য "স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ" আজ দেশবাসীর দ্বারস্থ। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় উদ্যোগী মিলিয়া "স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধ" ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে জন-হিতকর কার্য্যে ব্রতী প্রতিষ্ঠানরূপে গত ৬ই মার্চ্চ ১৯২৫ তারিখে যথারীতি গভর্ণমেণ্ট-রেজেষ্টারী করিয়াছেন।

১৩৩১ সালে এই অভিপ্রায় সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াও নানারূপ অপরিহার্য্য বিঘ্ন ও বাধার জন্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায় নাই। এক্ষণে "Delay is dangerous" এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া, নানারূপ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও হৃদিস্থিত হৃষীকেশের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘ এই কার্য্যে অগ্রসর হইল। এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম।

কাজের ধারা ও শিক্ষার স্বরূপ—প্রথমেই বলিয়াছি, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু—এই তিনটি বিপত্তি আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধানতম কারণ জানিয়া, তাহার প্রতিবিধান কল্পে স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ, অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য যাহাতে দেশের মধ্যে সার্ব্বজনীন কার্য্যকরী শিক্ষার বিস্তার হয়, তজ্জন্য সঙ্ঘ প্রথম হইতে বিবিধ বৈধ ও সাধ্য উপায়ে চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কুটীর-শিল্প, গোপালন ও উন্নত প্রণালীর কৃষি দ্বারা ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের নানারূপ সহজ সাধ্য উপায় নির্দ্দেশ করিবে এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন-প্রণালী শিক্ষা দিবে। তৃতীয়তঃ, রোগ ও অকাল-মৃত্যুর নিরাকরণার্থ সামান্য মুষ্টিযোগাদির দ্বারা অথবা রোগ-প্রতিষেধক সাধারণ নিয়ম এবং শাস্ত্র ও বৈদ্য-বিজ্ঞানসম্মত সদাচারসমূহ পালন করিয়া, যাহাতে দেশের আপামরসাধারণ অটুট স্বাস্থ্য ও অনবদ্য সুখের অধিকারী হইয়া, মনুষ্য-জীবনের চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগী হইবে।

মৃতবল্প জাতির এই ত্র্যমৃত-মন্ত্র হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার জন্য "স্বাস্থ্যধর্ম্ম-বিদ্যাপীঠ" নামক একটী বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। প্রথম বৎসরে অকৃত্রিম ও আন্তরিক দেশপ্রেমিক, সচ্চরিত্র, স্বার্থত্যাগী, আত্মনির্ভরশীল ও স্বাস্থ্যবান্ ২০-২৫টি যুবক লইয়া কার্য্যারম্ভ করা হইবে। ইহারাই হইবে আমাদের পতাকাবাহী বালখিল্যের দল! প্রতি বৎসরই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এইরূপে অন্ততঃ আট দশটি যুবকের প্রয়োজন হইবে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ হইবে। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্রদিগকে যথাযোগ্য সার্টিফিকেট, উপাধি বা বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষার্থীরূপে কাহাদের চাই? শিক্ষার্থীদিগের প্রত্যেকের মোটামুটি স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তি-শালী হওয়া চাই, এণ্ট্রান্স্ বা ম্যাট্রিকুলেশন্ পর্য্যন্ত পাঠ সমাপন করা চাই; বয়স অষ্টাদশ হইতে বাইশের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ও অবিবাহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

"বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।"

বিশ্ব-কবির এই প্রার্থনাকে যাঁহারা সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা আসুন।

যাহারা পল্লীবাসীর সেবা, পল্লীর মাটিকে জীবন্ত কাঠি জ্ঞান, কায়মনোবাক্যে প্রকৃতির পূজা দ্বারা পল্লীকে শ্রীমণ্ডিত করিতে নিজ ধন, জন ও যৌবনের মোহকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন, তাঁহারা আসুন।

যাঁহারা লাঙ্গলের ফালের মুখে সোনা-ফলনে বিশ্বাসী, গো-মাতার উন্নতির সহিত মরণোন্মুখ শিশুর জীবন-রক্ষা অভিলাষী, পাথরের বুক চিরিয়া ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-অর্থ মোক্ষ-কাম লাভের প্রয়াসী, তাঁহারা আসুন।

যিনি নামের কাঙ্গাল তিনি আসিবেন না।
" যশের " " " "
" অর্থের " " " "
" বিলাসিতার দাস " " " "
" কদভ্যাসের " " " "
" আলস্যের " " " "

শিক্ষার্থীদের কর্ম্মক্ষেত্র ও ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই কার্য্য করে। সেই জন্য সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশে ভূমিলক্ষ্মী ও গোমাতার সেবা ভিন্ন দেশের জীবিকা-সংস্থান-শক্তি বৃদ্ধির আর

কোন উপায় নাই। ব্যবসায়ী বল, হাকিম বল, উকিল বল, ডাক্তার কবিরাজ বল, সকলেই সমাজ-দেহের জোঁক মাত্র। কোন না কোন প্রকারে তাহারা বিরাট সমাজ-জীবের রক্ত চুষিয়া কেবল আপনাদিগকে ধনশালী করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ সার্ব্বভৌম অর্থবৃদ্ধিকর কার্য্য অথবা দেশের সুখ-শান্তি বিধানের চেষ্টা করিতেছে না। দেশে উন্নত উপায়ে কৃষি ও গো-পালন এবং অবসর সময়ে কুটীর-শিল্প দ্বারা আয় বৃদ্ধি হইবে এবং রোগ প্রতিষেধ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দ্বারা রোগভোগ কমিয়া আসিবে ও ক্রমশঃ দেশের স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু দূরীভূত হইবে।

ছাত্রেরা স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করিয়া পুরাযুগের স্পার্টানদের ন্যায় কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া কৃষি, গোপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার দ্বারা স্বচ্ছল ভাবে আপনার অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। ইহাতে Village exodus আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে, পল্লীর প্রাণ-শক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শিক্ষা-কাল অন্তে যত দিন পর্য্যন্ত না ছাত্র আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হন, তত দিন পর্য্যন্ত সঙ্ঘ তাহার সহিত যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবে।

শিক্ষার্থীদের কর্ম্মক্ষেত্র—বহু জনাকীর্ণ সহরে হইবে না। ইহার অবস্থান নিশ্চয় সুদূর পল্লীতে বাঙ্গালা মায়ের স্নিগ্ধ-শীতল স্নেহ-গভীর কোলের মধ্যে! কর্ম্মীরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ পল্লী আবাসে ফিরিয়া গিয়া সঙ্ঘের আদর্শে কার্য্যারম্ভ করিবে ও একটি ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানের প্রতীক্ সৃজন করিয়া লইবে। সঙ্ঘ প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে প্রয়োজন বোধে কিছু কাল পর্য্যন্ত অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা সাহায্য করিবে। তার পর কর্ম্মীরা প্রত্যেকেই সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনোপযোগী হইয়া উঠিলে, কেবল এই সঙ্ঘের পরোক্ষ ও নামমাত্র অধীনতায় অনেকটা স্বতন্ত্রভাবেই স্বীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতে ও উহার শাখা অনুশাখা বিস্তৃতির চেষ্টা করিতে থাকিবে।

নট-কবি গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ প্রেমের লাভ কৃষ্ণ প্রেম"; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন "দেশসেবার লাভ দেশ-সেবা—আত্মপ্রসাদ মাত্র।" আমাদের উদ্দেশ্য—অকৃত্রিম "দেশ-সেবা-জনিত আত্ম-প্রসাদের সহিত আত্মোদরপূর্ত্তির শান্তিময় স্বাস্থ্যপূর্ণ স্বভাব সুন্দর আয়োজন!"

☞ কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে, কোন উপদেশাদি প্রদান করিবার ইচ্ছা হইলে অথবা এই পীঠে শিক্ষক শিক্ষার্থীরূপে ভর্ত্তি হইবার আকাঙ্ক্ষা হইলে, সম্পাদক, স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন; অথবা প্রাতে (৬-৮) বা অপরাহ্ণে (২-৩) আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

বাঁচিবার পথ

(ক) বিশ্রাম।—দেহ-যন্ত্র এমনি কৌশলে গঠিত যে একটী অঙ্গ দুর্ব্বল অথবা পরিশ্রান্ত হইলে অপর অঙ্গগুলিও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। যদি মস্তিষ্কের অবিশ্রান্ত ভাবে চালনা করা যায়, তবে পেশীসমূহ আপনা আপনি শ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ বিটম্লী-ফার্থ (Bottomley) Firth মহাশয়ের জীবনে দেখা গিয়াছে। বিলাতী বাবু-মহাল ছুটীর দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ান একটা নেশার মত। দেখা গিয়াছে কেহ

কেহ দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর একটুকুও বিশ্রাম না করিয়া ছুটীর দিনে পাহাড়ে চলিয়া যান। Bottomley Firth মহাশয় লণ্ডনের County Council এর একজন সদস্য ছিলেন। ছুটীর দিনেই ক্লান্ত দেহে পর্ব্বতারোহণ করিতে যাইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশেও একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, change of occupation is rest। তাঁহারা এ কথাটি ভুলিয়া যান যে, দেহযন্ত্রের কোন একটী অংশকে চালনা করিলে সমস্ত অংশই চালিত হয়। বিশ্রামের অর্থ অলসতা নহে। একেবারে বিশ্রামহীনতা স্বাস্থ্যনাশ করে।

(খ) ব্যায়াম।—যাঁহারা মস্তিষ্কের চালনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন (Gladstone)এর জীবন ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ Gladstone প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার প্রায় ৯০ বৎসরব্যাপী জীবনে তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন প্রথম Chanc llor of the Exchequer হইলেন, তখন তাঁহাকে প্রত্যহ ১৬ ঘণ্টা করিয়া নিয়মিত ভাবে খাটিতে হইত। তখনও তিনি নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করিয়াছেন। ঝড়, বৃষ্টি, বাদল কিছুতেই তাঁহার ভ্রমণের ব্যাঘাত হইত না। আজকালকার বড়লোকদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করেন Lord Balfour। Ireland-এর সেই ভীষণ অরাজকতার দিনেও তিনি তাঁহার সহকারীকে লইয়া প্রত্যহ ভ্রমণ করিতেন। Mr. Loyed Georgeও নিয়মিতভাবে ভ্রমণ করেন। Parliament এর সদস্য Mr. T. P. O'connor-এর আত্মজীবনীতে জানা যায় যে, তিনি যখন প্রথম Dublin সহরের খবরের কাগজের সংবাদদাতা হইলেন, তখন তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া সংবাদপত্রের আফিসে আসিতেন। Dublin এ গাড়ী খুব সস্তা, কিন্তু তিনি কখনও গাড়ীতে আসিতেন না। Daily Telegraph কাগজের সহকারী সম্পাদক হিসাবে তাঁহাকে রাত্রি ৭টা হইতে ভোর ৭টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত। অবসর পাইলেই তিনি ভ্রমণ করিতেন এবং সে অবসর তাঁহার প্রত্যহই জুটিত। আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যায়ামের সময় পান না বলিয়া অজুহাত দেখান, তাঁহারা কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন কি? O'connor মহাশয় বলেন, তিনি অল্পাহার করেন, অল্প পান করেন, যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ফলে তিনি আজিও বালকের মত হাসিতে পারেন। বার্দ্ধক্যের ও জরার প্রভাব মিতাচারীর নিকট বড় কম।

আমাদের দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চা নাই। স্বামী বিবেকানন্দের ও কেশবচন্দ্রের মত মহাকর্ম্মীরাও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কেবল ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে তিনি রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। এই অল্পায়ুর দেশে সুরেন্দ্রনাথের উদাহরণ ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

তুলসী

[লেখক ডাক্তার শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ]

তুলসী হিন্দু মাত্রেরই পরিচিত, পুণ্য ও পূজার উপকরণ। কাজেই তুলসীর অধিক পরিচয় দিবার প্রায় আবশ্যক হয় না। পরম করুণাময় জগদীশ্বর এই অমূল্য ভেষজটীর যে আদর করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, তুলসী আমাদের মহোপকারী বৃক্ষ। তুলসীর জলদান কালে আমরা বলিয়া থাকি :—

গোবিন্দ বল্লভাং দেবী ভক্ত চৈতন্যকারিনী,
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী

যদিও আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে বাংলার মানুষ সেকেলে মনুষ্যত্ব ছেড়ে বর্ত্তমান ক'লের বিংশ শতাব্দীর নূতন এক অভিনব জীবে পরিণত হইতেছে, তথাপি এখনও পল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে, দরিদ্রের উঠানে, ধনীর দেবমন্দিরের সম্মুখে তুলসী বৃক্ষ স্থাপিত, প্রতি সন্ধ্যায় ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বিশেষতঃ সেকেলে ঠাকুমার দলের মহিলারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তুলসী তলায় দীপ দান ও বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ইহার ভিতর বিশ্বস্রষ্টার আর তাঁর ভক্ত অথবা মানব মঙ্গলকামী ঋষিগণের যে কি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা আজকালের কয়জন বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন? এখনও পল্লী ভূমির নিরক্ষর মায়েরা তাঁহাবা কোলের দুলালের মুখে তুলসীতলার মাটী দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুলসীতলার মাটী-খেকো পাড়'গাঁয়ের ছেলেগুলোর ইন-ফ্যাণ্টাইল লিভার একবারেই হয় না। তুলসীর মৃদুমন্দ গন্ধযুক্ত বাতাস যখন এই পাড়'গাঁয়ের অশিক্ষিত বালকের নাসিকায় অনুভূত হয়—তখনই সে নারায়ণকে ভাবে; আর 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' বলে তাঁকে প্রণাম করে। বলতে পারি না আর কতদিন এমন ভাবে চলবে। অনেকেই হয়ত বল্বেন, আর কিছুদিন—যত দিন না পাড়াগাঁয়ের কৃষকের ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে মাত্রেই অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পড়ে। অনেকে হয়ত ভাববেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা করছি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত ভাইগণ! বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি, আপনাদের মধ্যে কয়জন প্রত্যহ তুলসী-মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন? তবে আশার কথা এই যে, হওয়া আবার ফিরছে; স্বর্ণপ্রসূ বাংলার দিকে বাংলার সন্তান আবার ফিরে দেখছে, দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার সম্বল যুবকগণ ঐ যেন অদূরে বলছে—

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার ফুল, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!

সেই আশাতেই বুক বেঁধে আজ তুলসীর সাধারণ মাহাত্ম্য অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণে তুলসীর উপকারিতার বিষয় বলতে সাহসী হয়েছি।

এ দেশেরই বড়াল-কবি স্ত্রী-বিয়োগের পর "এষা" নামক গ্রন্থে যে দুঃখময় জীবনের নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই এক স্থানে আছে :—

হে পূত তুলসী, বিষ্ণুর প্রেয়সী
বিবর্ণ তোমার দল;
প্রভাতে আসি, প্রণাম করিয়া,
কেবা মূলে ঢালে জল।
সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
কেবা তলে দীপ জ্বালে,
নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি ঝরি—
লূতাতন্তু ডালে ডালে।
বলিত আমায় নমিতে তোমায়
দুগ্ধ পুষ্প তিল দিয়া,
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ব রোগ নাশে
যায় দুঃখ পলাইয়া।

আজ এই বাংলাদেশের মা লক্ষ্মীগণ! কেহ কি তাঁহার স্বামীকে এই ভাবে তুলসী-মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে বলিতেছেন! তুলসীর সেবায় যে সর্ব্ব রোগ নষ্ট হইয়া থাকে!

এই জন্য শ্রীভগবান স্বয়ং সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন —হে সত্যভামে! তুমি স্থির জানিও যে,—

"দারিদ্র্য দুঃখ রোগার্ত্তি পাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসী ক্ষেত্রং রোগানিব হরিতকী॥"

অর্থাৎ এক হরিতকী যেমন রোগসমূহ দূর করে তদ্রূপ তুলসীদেবীও দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, শোক ও সর্ব্ববিধ পাপ আশু ধ্বংস করিয়া দেন।

এই সমস্ত ভেষজের গুণাবলী না জানিয়া ও কেবল মাত্র পরের মুখ চাহিয়া থাকিয়া আমাদের দুঃখের ও কষ্টের অবধি নাই। শাস্ত্রের বিধানের অধিকাংশই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

তুলসীর ইংরাজী নাম ওসাইনাম স্যাঙ্কটেটাম,

পাশ্চাত্য দেশে অনেকে ইহাকে হোলি বেসিল বলেন। ঔষধার্থে ইহার বৃক্ষ, বীজ ও পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুলসীর সংস্কৃত পর্য্যায় :—সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কয়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভী, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেত রাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশ মঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাশ, বৃন্দা, কটিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্প, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেত রাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্য, সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবদুন্দুভি।

ইহাকে বাংলায় তুলসী, হিন্দীতে বরণ্ডা ও তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে তুলসীচে ঝাড়, তেলেগু ভাষায় ক্রুষ্ট, তামিলীতে তুলসী, দাক্ষিণাত্যে তুলসী এবং বোম্বাই প্রদেশে তুলস কহে।

আয়ুর্ব্বেদমতে তুলসীর গুণ ;—ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সুরভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ ও পিত্ত-নাশক, বাতশ্লেষ্মানাশক এবং কাস, ক্রিমি, বমি, কুষ্ঠ, রক্তস্রাব, জীর্ণজ্বর, পার্শ্ববেদনা ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

এলোপ্যাথিক মতে তুলসীর গুণ ;—তুলসী কফ-নিঃসারক ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিবিধ সংক্রামক পীড়া নাশক। সর্দ্দিঘটিত বিবিধ পীড়ায়, কাস, পার্শ্ববেদনা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, এজমা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি পীড়ায় উপকারী ; সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ইহা মহৌষধ, প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস হইলে মূত্র করণার্থ ও স্নিগ্ধ করণার্থ ইহার বীজ প্রয়োজিত হয়।

এই সমস্ত ক্রিয়াদি দেখিয়া ও আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণ'-বলী পাঠ করিয়া এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে তুলসীর বিষয় অবগত হইয়া মনে হয় যে, নিশ্চয়ই তুলসীর সংক্রামক পীড়ার জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। তজ্জন্যই গত ইন-ফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিকের সময় ইহা বিবিধ উপায়ে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, থাইমল, ইউক্যালিপ্টস প্রভৃতি অপেক্ষা তুলসীর শক্তি কম নয়।

আমি নিম্নোক্ত তিন প্রকার প্রয়োগরূপ প্রস্তুত করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীগণকে প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

১। তুলসীর অরিষ্ট (টীংচার ওসাইনাম স্যাং টেটাম বা টীংচার হোলি বেসিল) তুলসীর পত্র ও বী চূর্ণ ২½ আউন্স, শোধিত সুরা ১ পাইণ্ট—এক সপ্তাহ কাল ইহা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ½—১ ড্রাম।

২। তুলসীর ফাণ্ট, (ইনফিউজন ওসাইনা স্যাঙ্কটেটাম বা ইনফিউজন হোলি বেসিল) শুষ্ক তুলসী পত্র ১ আউন্স, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১ পাইণ্ট, অর্দ্ধ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ½—১ আউন্স।

৩। সিরাপ ওসাইনাম স্যাঙ্কটেটাম (তুলসী পাক) তুলসী পাতার রস ১২ আউন্স, বিশুদ্ধ শর্করা ২ পাউণ্ড, পরিশ্রুত জল ৮ আউন্স বা প্রয়োজন। তুলসীর রস ও পরিশ্রুত জল একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সামান্য উত্তাপে ফুটাইবে পরে তাহাতে চিনি সংযোগ করিয়া ক্রমশঃ সিরাপের আকারে পরিবর্ত্তিত করিবে। সর্ব্ব সমেত ৩ পাউ ওজন হইবে। মাত্রা—১—২ ড্রাম।

ছেলেদের সর্দ্দি কাসিতে অধিকাংশ সময়ে আ তুলসীর সিরাপ বা নিম্নোক্ত চাটনী প্রয়োগ করি বিশেষ সুফল পাইয়াছি।

তুলসী পত্রের রস—৪ ড্রাম
বিশুদ্ধ মধু—১ আউন্স
আদার রস—২ ড্রাম
যমানী চূর্ণ—২ ড্রাম

একত্রে মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ৩০—৬০ ফোঁ

ম্যালেরিয়া জ্বরে তুলসী পত্রের রস ১ তোলা ও আদ রস অর্দ্ধ তোলা মধু সহ সেবনে বেশ উপকার হয়।

তুলসীর মূল পাণের সহিত চিবাইয়া খাইলে রক্ত মাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ণশূলে ইহার রস বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রয়োগ করি বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপ্রস্রাব বা হিম্যাচুরিয়া রোগে তুলসীর রস সহ সেবনে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে।

তুলসীপত্রের রস প্রয়োগে প্রসবের পরবর্তী বে আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বর কালীন বমনে জলমিশ্রিত সিরাপ তুলসী অথবা মিছরীর সরবতের সহিত তুলসী পত্রের রস হিতকর।

যমানী ও তুলসী নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে বসন্তকালে প্রয়োগ করিলেও পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

তুলসীর বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে শুক্রমেহ বা স্বপ্নবিকার নিবারিত হয়।

গণোরিয়া বা প্রমেহ রোগে ও প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণার্থ বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছি।

দদ্রু বা দাদ রোগে ইহার পত্র ঘর্ষণে উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে কাগজী বা পাতী লেবুর রসে পিষিয়া দাদে লাগাইতে বলেন।

ছেলেদের হামজ্বরে তুলসীমঞ্জরী ও যোয়ান, ও আদা একত্রে বাঁটিয়া প্রয়োগ করিলে হাম বাহির হইয়া রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে।

তুলসীমঞ্জরী এক আনা, মেথি এক আনা ও কুড় এক পাই ওজন করিয়া কিঞ্চিৎ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই অবশিষ্ট কাথ পান করিলে হামজ্বর নিবারিত হয়।

অনেক সময় তুলসী পত্র উত্তম বায়ু নাশক হইয়া অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি প্রভৃতিতে উপকার করে।

প্রত্যহ প্রাতে তিনটী তুলসী পত্র, তিনটী গোলমরিচ একত্র সেবন করিতে পারিলে প্রায় কোন ব্যাধি আক্রমণ করে না।

বাড়ীর মধ্যে—বেশী পরিমাণে তুলসী বৃক্ষরোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

তুলসী বহু গুণবিশিষ্ট। সকল গুণের বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সর্ব্বশেষে তুলসী গীতায় লিখিত ভগবান মুখ-নিঃসৃত তুলসীর প্রণাম লিখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব।

প্রণাম ;—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ সংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী,
রোগানামভি বন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।

অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাপসমূহ ধ্বংস পায়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে অভিবন্দন করিলে রোগরাশি বিদূরিত হয়, যাঁহার সিক্ত জল গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে অন্তকভয় বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবান কৃষ্ণে প্রত্যাসক্তি জন্মে, যাঁহাকে কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিলে মুক্তিফল লাভ হয়—সেই তুলসী দেবীকে নমস্কার।

ডায়মণ্ডহারবার পঞ্চায়ত সম্মিলনীতে সম্পাদকের অভিভাষণ

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব সরকার।

[ডায়মণ্ডহারবার পঞ্চায়েৎ সম্মিলনীতে সম্পাদকের অভিভাষণের সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল ; আমরা চৈত্র সংখ্যায় '২৪ পরগণায় পল্লী-সংগঠন আন্দোলন" প্রবন্ধে উক্ত জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ে বর্ত্তমান অবস্থা ও অভাব অভিযোগের বিস্তৃত আলোচনা করিব।—সম্পাদক, স্বাস্থ্য-সমাচার]

প্রিয়তম বন্ধুগণ এবং সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ,

আমাদের এই সম্মিলনের আজ দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ আরম্ভ হ'ল। এই আনন্দের দিনে এই উৎসব সভায় আপনাদের শুভাগমন যে শুধু আমাদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করেছে তা নয়, এই সম্মিলন আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আপনাদের স্নেহদৃষ্টির বলে দিনে দিনে শোভায়, সম্পদে দীর্ঘজীবনের পথে অগ্রসর হবে—এ আশা আমরা করছি।

আমাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য আমাদের এই ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিসনের অধিবাসীগণের মধ্যে

পরস্পর মিলন। আমরা দেশের কাজ করিতে চাই।—বড় বড় বক্তৃতা করি, লম্বা লম্বা কথা আওড়াই; কিন্তু কাজের বেলা অষ্টরম্ভা, ঘোল কড়াই কানা—ফলে দেশের কাজ যা হয় তা মা গঙ্গাই জানেন—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

দেশের কাজ করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা এ ভুল বুঝতে পেরেছেন যে সহরে বসে বড় বড় বক্তৃতা করলে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা একটুও দূর হয় না। দেশের প্রাণ পড়ে আছে পল্লীগ্রামে—সেই পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, কলেরার ক্রীড়া-নিকেতন,—রোগে জীর্ণ, দারিদ্র্যে শীর্ণ, বনে বঙ্গলে সমাকীর্ণ;—সেই সব ঝোপ ঝাড় ভেদ করে স্বাস্থ্যকর পবিত্র হাওয়া কোন গ্রামে প্রবেশ পথ খুঁজে পায় না। রোগে ব্যবস্থা দেবার মত ডাক্তার নেই, ঔষধ পথ্য যোগাবার মত অর্থ নেই, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার মত স্কুল পাঠশালা নেই—এই আমাদের পল্লীজননী। এই পল্লীমায়ের বুকের উপর রোগে, শোকে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় জর্জ্জরিত হয়ে কত প্রাণ যে নষ্ট হচ্চে তার আর ইয়ত্তা নেই। এই অশিক্ষা কুশিক্ষার ফলে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি মারতে ইতস্ততঃ করে না, মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়, আর তার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়।

আমাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য দেশের সেবা—সেবা অর্থে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ বুঝি না। আমরা বুঝি দেশের উপকার। দেশের উন্নতিকল্পে কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় যদি আমরা আমাদের সকল অভাব দূর করতে সক্ষম হই, তবে সে কর্ত্তৃপক্ষকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি কি? আমরা চাই পরস্পর বন্ধুভাবে দেশের কল্যাণসূচক কাজে পরস্পরকে সাহায্য করব—এই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই এই সম্মিলনের জন্ম।

দেশের সেবা অর্থে আমরা বুঝি পল্লীর সেবা—পল্লীর উন্নতি চেষ্টা। পথ ঘাটের উন্নতি, পানাপুকুর পরিষ্কার পচা ডোবা বন্ধ করা, বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা, ঝোপ ঝাড় কাটিয়ে বায়ু চলাচলের পথ করে দিয়ে ম্যালেরিয়ার আস্তানা নষ্ট করা, গ্রামে গ্রামে স্কুল পাঠশালা ... করে অজ্ঞানান্ধকার দূর করা, দাতব্য চিকিৎসা... প্রতিষ্ঠা করে দুস্থ গ্রামবাসীকে ব্যাধি যন্ত্রণায় ঔষধ ... দান করা, বাঁচার পথ করা। আজ ঐ যে কণ্ঠে ... শুনতে পাচ্ছি Back to the village—তার ... আর কিছু নয়—যদি বাঁচতে চাও, আগে গ্রামগুলি... বাঁচাও। এই যে বাণী আজ দিকে দিকে প্রচারি... হচ্চে এ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল। যে পথ ... আমরা দেশের সেবা করতে বেরিয়েছিলাম, অভিজ্ঞ... দেখা গেল তাতে প্রকৃত দেশের উন্নতি হয় না। ... রের গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকের চীৎকারে প্র... দেশের কোন কাজই হয় না।

সবার আগে চাই দেশকে প্রস্তুত করা। দেশে... লোকের ভিতর পরস্পরের জন্য মমত্ববোধকে জাগ্র... করতে হবে, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে নিজের দেশে... লোককে ভাই বলে মনে ঠাঁই দিতে হবে, দেশে... কল্যাণের কাছে নিজের তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিয়ে, মনে... সকল সঙ্কীর্ণতা সকল ক্ষুদ্রতা দূর করে প্রকৃত দেশে... হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশের কা... করতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ জ্ঞান ভুলে যেতে হবে... আমি হিন্দু সুতরাং সকল কাজে মুসলমানকে দূরে রে... রেখে নিজের জাত ভাইকে সমর্থন করে যাব, তো... সঙ্কীর্ণতা যদি মনে আসে, তবে আমাকে দিয়ে প্র... দেশের মঙ্গল কাজ হবে না। যেখানে সঙ্কীর্ণতা সেখানে... ক্ষুদ্রতা সেখানেই স্বার্থপরতা, সেখানেই নীচতা... আর এই স্বার্থপরতা থেকেই দেশের ধ্বংস ও সর্ব্বনাশ... আজ যে হিন্দু মুসলমানকে অহিন্দু বলে দূরে ঠে... রাখতে পারে কাল সেই হিন্দুই আবার সে ব্রাহ্মণ ব... ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ঘৃণা করে সরিয়ে দিতে ... মাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ফলে দলাদলি, রেষারেষি... বিদ্বেষ বিতৃষ্ণার সৃষ্টি। তখন কায়স্থ বলবে '... কায়স্থ ছাড়া আর কারো কথা মানি না।'—মাহি... বলবে 'মাহিষ্য ছাড়া আর কারো কথা শুনব না'... পৌণ্ড্র বলবে 'আমার জাতভাইকে ছেড়ে আর কারো...

দিকে হেঁসতে আমি রাজী নই'—ইত্যাদি। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে দেশের কাজ করতে যাবার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই।

আজ এই জাতীয় জীবনের নব অভ্যুদয় দিনে জয় যাত্রার পথে আমাদের প্রধান সম্বল করতে হবে একতার **বীজমন্ত্র**। এরই অভাবে আজ আমাদের ভিতর এত হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা। আজ পরস্পর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক পতাকার তলে দলে দলে সমবেত হতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে এক, আমাদের সাধনা হবে এক, আমাদের মন্ত্র হবে এক, আমাদের উদ্দেশ্য হবে এক। কবির ভাষায়—

> এক সূত্রে গাঁথা হবে সংপ্রটি প্রাণ
> এক সুরে গাওয়া হবে লক্ষ কণ্ঠে গান।

সংহতি শক্তির পরাক্রমের কথা আর উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করে না বললেও চলবে। তবু যে এতটা বললাম সে শুধু পাছে ভুলে যাই বলে।

আমাদের এটা পঞ্চায়েতের সম্মিলন বলে এতে জনসাধারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তেমন ভুল ধারণা কেউ করবেন না। পঞ্চায়েতগণ দেশের জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। আমরা দেশের কল্যাণের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি—আমাদের মনে কোন সংকীর্ণতা নেই। যে কেউ আমাদের মঙ্গল কাজে সহায়তা করতে অগ্রসর হবেন, সাগ্রহে মাথায় করে আমরা তাঁর সাহায্য গ্রহণ করব।

মহৎ কাজ—বড় কাজ করতে গেলে নিজকে ছোট করতে হবে—সকল প্রকার প্রাধান্য গৌরব ভুলে গিয়ে নিজকে অতি সামান্য জ্ঞান করতে হবে—নইলে বড় কাজও করা যায় না—বড় হওয়াও যায় না। ইতর ভদ্র সকলকে ডেকে আজ দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে—দেশ যে দিনে দিনে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে সেই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

গত সেন্সাসে জন্মমৃত্যুর যে তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাঙ্গালাদেশ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার ভেতর এই ২৪ পরগণা জেলায় প্রতি হাজারে ২২ জন লোক জন্মাচ্ছে আর ৩৩ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে—অর্থাৎ হাজারে ১১ জন লোক বেশী মরছে। এই ভাবে যদি জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেড়েই চলে তবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে আমাদের লোপ পেতে আর বেশী দিন লাগবে না।

কিন্তু এর প্রতিকার কি কিছু নেই? আছে বই কি? বাঁচতে হলে এর প্রতিকার করতেই হবে। আর কি করে মানুষের মত বাঁচতে পারা যায় তারও পথ আমাদেরই করতে হবে। মানুষকে বাঁচতে হ'লে তার চাই পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধ পানীয়, নির্ম্মল বায়ু। এসবের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

গরীব চাষীকে রক্ষা করবার জন্য গ্রামে গ্রামে সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সমবায় সমিতির ইতিহাস, উপকারিতা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আজ চাষের ফসল চাষী ভোগ করিতে পায় না কেন? কে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়? কেন? সে সব পথ বন্ধ করতে হবে। চাষের জমী চাষীর হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে—এ তার অপরিণামদর্শিতার ফল। হাতে কাঁচা পয়সা পেলে চাষী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে—বাজারে তখন দুধ মাছ দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠে,—তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিতব্যয়ী করে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করে অল্পায়াসে বেশী লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার অভাবে এদেশে চাষের কোন প্রকার উন্নতিই হতে পারছে না—মান্ধাতার আগের কালে যে পদ্ধতিতে যা কিছু চাষ হয়ে আসছিল, এখনও সেই ভাবেই তা চলছে। জমীর উর্ব্বরতাশক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে রীতিপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক এ বোধ আমাদের দেশের অনেক চাষীর নেই।

আমাদের এ দেশটাই সব রকমে সকলের পিছনে পড়ে আছে। নইলে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক জে... প্রায় প্রতি জমীতেই দু তিনটা ফসলের ... আসছে। মাটিকে যত্ন করতে জানে...

থেকে ফসল পেতে ক্রটী হয় না—মায়ের স্নেহের মতই মাটির স্নেহও অপর্য্যাপ্ত—অপ্রতুল—শুধু আমরা তার সেবা যত্ন করতে জানিনা বলেই তাঁর অজস্র স্নেহ পিযূষধারা হতে আমরা বঞ্চিত—এত হতভাগ্য আমরা।

দেশের কাজের উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের একটু তফাৎ আছে। তাঁরা গবর্ণমেণ্টের কাজের তীব্র সমালোচক এবং সরকারের সহযোগে কাজ করতে নারাজ ; কিন্তু আমরা সরকারের সঙ্গে যোগ রেখে গবর্ণমেণ্ট আমাদের যে সামান্য ক্ষমতা দান করেছেন তারই সদ্ব্যবহার করে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস এই পঞ্চায়েৎ সিষ্টেম, এই ইউনিয়ন বোর্ড, এই লোকেল বোর্ড, ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলিকে যদি আমরা ঠিক মত সঞ্চালিত করতে পারি, যদি সকল প্রতিষ্ঠানে আমাদের সুপরিস্ফুট ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আরো নূতন নূতন ক্ষমতা দিতে বাধ্য হবেন। এইভাবে ক্রমশঃ দেশের শাসন কার্য্যেও আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার এক-দিন পাবই। সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার প্রতি কাজে বাধা জন্মিয়ে, জোর করে কোন দিনই ন্যো... অধিকার আদায় করা যাবে না। প্রতি কাজে প্রতি পদে নিজেদের কর্ম্মপটুতা দেখিয়ে, দেশের কল্যাণ কাজে সরকারের সহায়তা আদায় করে, বন্ধুভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করে, দেশের সুশাসনে তার সাহায্য করতে হবে।

আজ দেশের মুক্তি সরকারের হাতে। সেই মুক্তি আমাদের চাই। কিন্তু সরকারের হাতে আমাদের জীবন বাঁচনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব... থাকলে চলবে না। আমরা যে মানুষ, মানুষের মত বেঁচে থাকবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে, তাই চাই **সমবেত চেষ্টা**, তাই চাই **সংহতি শক্তির সংগঠন**, তাই চাই **সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা**। যারা নিদ্রিত তাদের জাগাতে হবে, যারা দুস্থ তাদের দুঃখ দূর করতে হবে, যারা মরণোন্মুখ তাদের বাঁচাতে হবে, যারা পদদলিত, অন্ধতামগ্ন তাদের উদ্ধার করতে হবে। আমা-দের এই সাধু সংকল্পে দেশবাসী আমাদের সহায় হোন, **গবর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্য করুন।**

স্বাস্থ্যধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যসেবক।

অবতরণিকা।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতি—অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অন্যতম মূলতন্ত্র—জীবে দয়া। হিন্দু ধর্ম্মনীতি অনুসারে অহিংসা ও জীবে দয়া ত পরম ধর্ম্ম বটেই ; তাহার উপর লোক-সেবা হিন্দুর অপরিহার্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠান।

লোক-সেবা বলিতে সর্ব্বপ্রকারের লোক-সেবা বুঝিতে হয়। দরিদ্রের দুঃখ মোচন, অসহায়কে সাহায্য করা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, ক্ষুধার্ত্ত বুভুক্ষুকে খাদ্য দান, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা, আর্ত্তের পরিত্রাণ, বিপন্নের উদ্ধার, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান—এ সকলই নর-নারায়ণ-সেবার অন্তর্গত। হিন্দুর সমাজ এমন ভাবে গঠিত ছিল যে এই সকল জনহিতকর কার্য্য অতি সহজে অনায়াসে স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইত। সামর্থ্য সত্ত্বে কেহ এই সকল কার্য্য করিতে অসম্মত বা বিরক্ত অথবা কুণ্ঠিত হইত না।

কিন্তু নানা কারণে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, সমাজ-গঠনের ব্যতিক্রমে ঘটিয়াছে, সমাজে ...

...রিয়াছে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ; জনসেবাব্রত পালনে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এখন কেবল স্বার্থ-সেবা সকল প্রকার সেবাধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। সমাজে এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের প্রাচীন কালের পুণ্য অনুষ্ঠানগুলি অধুনা উপেক্ষিত হইতেছে। সমাজে দুঃখ-কষ্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহু লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পীড়িতের সেবার ব্যবস্থা না থাকায়, অকাল-মৃত্যু সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

কিন্তু এরূপ অবস্থা ত চলিতে পারে না। সমাজকে রক্ষা করা চাই। সেবাধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা চাই। হিন্দুর সনাতন ও চিরন্তন ধর্ম্ম রক্ষা করা চাই। সেই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাহা গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। এখন নূতন করিয়া, বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার অনুসরণ করিয়া, নব-বিজ্ঞানের সহায়তা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সেই প্রাচীন সেবাধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন কর্ম্মী তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। অমর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে দেশ-সেবার জন্য লোক-সেবার জন্য, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য কর্ম্মী গড়িবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। গীতাপ্রোক্ত ত্যাগধর্ম্মের উপর সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এইরূপ কর্ম্মী গড়িবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘের অন্তর্গত কর্ম্মীদিগকে আপামর সর্ব্ব-সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য তাঁহাদিগকে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী সযত্নে শিক্ষা করিতে হইবে। যে মহৎ কর্ম্মের ভার তাঁহাদের উপর অর্পিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহাদিগকে সম্যক প্রকারে তাহার উপযুক্ত হইতে হইবে। এই যোগ্যতা কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? না, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে শিখিতে হইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, physician heal thyself। চিকিৎসক নিজে যদি রুগ্ন হন, তাহা হইলে তিনি অপর রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করিবার ভার গ্রহণের যোগ্য নহেন। নিজে যিনি স্বাস্থ্যধর্ম্ম সম্যকরূপে পালন করিতে পারিবেন, তিনিই স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘের কর্ম্মী হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। স্বাস্থ্য-ধর্ম্মী লোক-শিক্ষক। তাঁহাকে রুগ্ন, পীড়িত, আর্ত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে স্বাস্থ্যধর্ম্ম রক্ষার উপদেশ দিতে হইবে। তিনি নিজে সুস্থ না থাকিলে তাহা পারিবেন না। তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য-সুন্দর আদর্শ লোকের চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারিলে, এই দৃষ্টান্তে যে সুফল ফলিতে পারিবে, স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত শত উপদেশেও তাদৃশ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। Example is better than precept—ইংরেজী এই প্রবচন এ ক্ষেত্রে যেমন খাটে, এমন আর কিছুতেই নহে। দৃষ্টান্ত উপদেশ অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ—এটী অতি মূল্যবান প্রবচন। স্বাস্থ্য-সেবকগণকে সর্ব্বদা এই মহামূল্য উপদেশটী স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং তদনুসারে কাজ করিতে হইবে। স্বাস্থ্য-সেবক যে উপায়ে নিজে নীরোগ, সুস্থ, বলবীর্য্যসম্পন্ন থাকিতে পারিয়াছেন, তাহা নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা রুগ্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যক্তি বা পরিবারবর্গকে উপদেশ করিবেন, তাহাতে যেরূপ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা, এমন আর কিছুতেই নহে।

এ যাবৎ আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য কেবল শুষ্ক উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া, কিসে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কিসে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। ফলে হয় এই যে, নীরস উপদেশগুলি এক কাণ দিয়া প্রবেশ করে, এবং অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায় ; তাহা শ্রোতার মনের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু যদি শরীর-তত্ত্বানুমোদিত জ্ঞানের উপর উপদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়, শরীরের গঠন-প্রণালী এবং শরীরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কার্য্য-প্রণালী মোটামুটি

ভাবে বুঝাইয়া দিয়া, সেই গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রমে কিরূপে শরীরে অসুস্থ হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে, সেই উপদেশ লোকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। লোকে তখন প্রত্যেক কার্য্যের সময় ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় যে, তাহার ঐ কার্য্য স্বাস্থ্যানুমোদিত কি না, তাহার কার্য্যের দ্বারা প্রকৃতির ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি সে দেখে যে, তাহার কার্য্য স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হইবে না, তবে শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে সে ঐরূপ স্বাস্থ্যবিরোধী কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবে, এবং তাহার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতএব স্বাস্থ্য-সেবকগণকে সর্ব্বাগ্রে এই সকল তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। তবেই তাঁহারা অপরকে শিক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ কর্ম্মীদিগকে প্রথমে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সেবা ব্রতে দীক্ষিত করিয়া লইবেন। অতএব কর্ম্মীগণকে প্রথমে শিক্ষার্থীরূপে স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘে যোগদান করিতে হইবে।

শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রণালী ও নিয়মাবলী হাতে-হেতেরে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবেন। এই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালীর অনুসরণ পূর্ব্বক স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া গেলে তাঁহারা কেবল যে নিজেরাই স্বাস্থ্যবান থাকিবেন, তাহা নহে, এই কার্য্যগত প্রত্যক্ষ লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁহারা অপরকেও সহজেও নিশ্চিতরূপে স্বাস্থ্য ধর্ম্ম-পালন-বিধি সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন।

প্রথম অধ্যায়

সুস্থতা ও স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম

সুস্থ থাকাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। শিশু সুস্থ দেহেই ভূমিষ্ঠ হয়। প্রকৃতির নিয়মের অনুসরণ করিয়া শিশুকে পালন করিলে শিশু সুস্থ থাকিয়া পুষ্টি লাভ করিয়া বড় হয়। প্রকৃতির নিয়ম পালনে অবহেলা করিলে শিশু রুগ্ন হয়, পীড়িত হয়। শিশুকে কিছু কাল অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই নির্ভর কালটায় শিশুর পালনকর্ত্রী জননীর যোগ্যতার উপর শিশুর স্বাস্থ্য বা রুগ্ন অবস্থা নির্ভর করে। বড় হইয়া সে যখন নিজের ভার নিজেই লইতে সমর্থ হয়, তখন সুস্থ থাকা বা পীড়িত হওয়া তাহার নিজের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। সে যদি স্বাস্থ্যবিধি ও প্রকৃতির ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলিতে শিক্ষা করে, তবে সে সুস্থ থাকিবে। নচেৎ পীড়িত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ শরীর ও মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাই স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের অবস্থার কোন ইতর-বিশেষ নাই। কম সুস্থ বা বেশী সুস্থ বলিয়া কোন অবস্থা হইতেই পারে না। সুস্থতা অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা সাধনা-সাপেক্ষ। প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি-পালনই সেই সাধনা। সাধারণ লোকে সাধারণ পীড়ার সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান স্বতঃই লাভ করিয়া থাকে। সর্দ্দি, কাসি, উদরাময় প্রভৃতি সামান্য রোগ কেন হয় তাহা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু জানে। এবং এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও যে তাহারা না জানে এমন নয়। একটু সাবধান থাকিলেই এই সকল পীড়া হইতে পারে না। স্বাস্থ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ শিশু দুই একবার এইরূপ সামান্য অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া এই সকল রোগের কারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। তথাপি, পরিণত বয়সেও মধ্যে মধ্যে লোককে এই সকল রোগ ভোগ করিতে হয়। তাহার কারণ অবহেলা ও উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুপাক খাদ্য ভোজনে পেটের পীড়া হয়, ইহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। তথাপি লোভে পড়িয়া লোকে প্রয়োজন ও সুবিধা মত স্বাস্থ্য রক্ষার এই সাধারণ

নিয়ম ভুলিয়া যায় এবং গুরুপাক খাদ্য ভোজন করিয়া অসুস্থ হয়। লোভ অসংবরণীয় হইলে, ক্রমাগত এই ভুল করিতে থাকিলে, পেটের পীড়ায় ভুগিয়া তাহার পাকস্থলী এমন দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ হইয়া উঠে যে, কারণে অকারণে সামান্য সূত্রেই তাহার পেটের অসুখ হয়। তখন সে নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করে, এবং সুস্থকায় লোকের শুভাদৃষ্টের হিংসা করে। সে এইটুকু ভাবিয়া দেখে না যে, সুস্থ লোকে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না বলিয়াই সুস্থ থাকে, এবং সে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন অভ্যস্ত বলিয়াই পীড়িত হয়। নিবার্য্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে সেই সম্পূর্ণ দোষী, ইহাতে অপর কাহারও কোন দোষ নাই, অপরের হিংসা করিবারও কিছুই নাই।

বিপদে না পড়িলে লোকে ভগবানকে স্মরণ করে না। সেই জন্য কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই বর চাহিয়াছিলেন যে, আমরা যেন চিরদিন বিপদে পড়িয়াই থাকি, তাহা হইলে তোমাকে চিরদিন স্মরণ রাখিতে পারিব। তেমনি যত দিন লোকে সুস্থ থাকে, যতক্ষণ না অসুস্থ হইয়া পড়ে, ততক্ষণ সে স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে না। অসুস্থ হইয়া পড়িলেই স্বাস্থ্যের কথা তাহার মনে হয়। তাই বলিয়া আমরা কুন্তীর মত এমন বর চাহিতে বলিতেছি না যে, স্বাস্থ্যের কথা চিরদিন স্মরণ রাখিবার জন্য চির-রুগ্ন অবস্থার কামনা করিতে হইবে!) তখন, কেমন করিয়া সে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে, এবং কেমন ভাবে চলিলে পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িবে না, তাহাই সে ভাবিতে থাকে। কিন্তু কেবল চিন্তা করিলেই কোন ফল হয় না। পথ চলিতে চলিতে সামনে যদি কোন নদী আসিয়া পড়ে, তবে নদীর তীরে বসিয়া বসিয়া, কেমন করিয়া নদী পার হইব, এই চিন্তা করিতে থাকিলেই নদী পার হওয়া যায় না। নদী পার হইতে গেলে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। হয় সেতু, না হয় নৌকা, অন্ততঃ একটা ভেলার সন্ধানও করিতে হয়, তবেই নদী পার হইবার উপায় হইতে পারে। সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে, কেবল সুস্থ হইবার কথা ভাবিলে চলিবে না। শরীর কেন অসুস্থ হইয়া পড়িল, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, পরে তাহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; তবেই অসুস্থ শরীর পুনরায় সুস্থ হইবার ব্যবস্থা হইবে। নদী পার হইতে গেলে যেমন বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক সেতু বা নৌকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, অসুস্থ শরীরকে পুনরায় সুস্থ করিতে হইলেও সেইরূপ বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করিয়া যথোচিত প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে মনে অতিরিক্ত মাত্রায় আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই; তাহাতে বরং অহিতই ঘটিয়া থাকে। অভিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বৃথা এরূপ আন্দোলন না করিয়া অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার উপায় চিন্তা ও অবলম্বন করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে বৃথা মন খারাপ না করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক, প্রতিকারের যথোচিত উপায় অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্যক্ষেত্রে সহজে বিচলিত হন্ না। কাজ করিতে করিতে নূতন নূতন বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ লোকের মত একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া, তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ, স্বাস্থ্য রক্ষার মূল তত্ত্বগুলি যিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি, যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, এবং কোন অনিবার্য্য কারণে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার প্রতিকারেরও যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

কি উপায়ে শরীর সুস্থ থাকে, স্বাস্থ্য কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, এবং পক্ষান্তরে যে যে কারণে আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এই সকল বিষয়

যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাহাই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। শরীর সুস্থ থাকিতে স্বভাবতই বাধ্য। এই স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের উল্‌টা যাহা তাহাই অস্বাস্থ্য। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মগুলি জানিলেই স্বাস্থ্য কিরূপে ও কি জন্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা জানা গেল। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য—কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার কারণগুলিও ইহাতে আলোচিত হইয়া থাকে।

সভ্য মানব তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিবার জন্য, প্রত্যেক কার্য্যের ক্ষেত্রেই কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা রচনা করিয়া লইয়াছে। সে যখনই যে কোন কাজ করে, তখনই সেই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত-বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ পূর্ব্বক বিবেচনা সহকারে কাজ করিয়া থাকে। এই ভাবে কার্য্য করাকে কলা বা Art বলা যায়। বহুদর্শিতা, পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, গবেষণা, পরীক্ষা ও চিন্তা শক্তির সাহায্যে মানুষ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য অবধারণ করিয়া লইয়াছে। সেই জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালীও কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্যবিধি পালন করাই সেই স্বাস্থ্য কলা। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কাজটা কি, তাহা এতক্ষণে বোধ হয় পরিষ্কার বোঝা গেল। যে নিয়মে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় ও যে অনিয়মে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়াই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কাজ, এবং সেই শিক্ষা, সেই নিয়ম জীবনে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই স্বাস্থ্য-কলা। মানুষ বহু আয়াসে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে, সেগুলি কেবল জানিয়া রাখাই যথেষ্ট নহে—সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করাও আবশ্যক,—কৃপণের ধনের ন্যায় কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখায় কোনই লাভ নাই। বিবেচনা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগেই উপকার পাওয়া যায়। সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কথাগুলি যেমন সত্য, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তাই। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কিসে তাহা ক্ষুণ্ণ হয়,—কেবল এই তথ্যগুলি জানিয়া রাখিলে কি হইবে! দৈনন্দিন জীবনে উহাদের প্রয়োগ করা আবশ্যক; তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা পাইবে। অর্থাৎ বিজ্ঞান সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া কলা-বিদ্যায় সাহায্যে তাহাদের প্রয়োগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুস্থ থাকাই স্বাভাবিক; শিশু সুস্থ শরীরেই জন্ম গ্রহণ করে। তথাপি, স্বাস্থ্য যে ক্ষুণ্ণ হয়, রোগ ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করে তাহার কারণ, স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়ম পালন করা হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন না করিবার কারণ অজ্ঞতাও হইতে পারে, উপেক্ষাও হইতে পারে, অলসতাও হইতে পারে। যে কারণেই হউক, স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়ম পালন করিতে হইলে, নিয়মগুলি জানিতে হইবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে নিয়মগুলি জানিতে পারা যাইবে। তারপর সেই সকল নিয়ম জীবনে পালন করিতে হইবে। স্বাস্থ্য অমূল্য নিধি। অতি যত্ন করিয়া এই নিধি রক্ষা করিতে হয়। ইহা রক্ষা না করিতে পারিলে উপভোগও করিতে পারা যায় না। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা অপেক্ষা, স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কাজ। স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আগেই সাবধান হইতে হইবে, যাহাতে উহা নষ্ট না হয়। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার চেষ্টা অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে না দেওয়া—স্বাস্থ্য রক্ষা করা—অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ এবং তাহাতে আনন্দ, লাভ ও উহা উপভোগের সুখও আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যের কারণ

সভ্য-জগতে প্রাচীন কালে লোকে রোগের অনুসন্ধানে যতটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন,—স্বাস্থ্যের কারণ জানিবার জন্য ততটা অবহিত ছিলেন না। রোগ হইলেই, রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে স্বতঃই ইচ্ছা জন্মিতে পারে; কিন্তু সুস্থ থাকাই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া সুস্থ থাকার কারণ অনুসন্ধান করিবার কথা লোকের মনেই হয় না। কিন্তু একটু ভাবিয়া

দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃতি-দত্ত স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল পন্থা। সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে তাহার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা অপেক্ষা, সঞ্চিত ধন যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে, সে পক্ষে পূর্ব্বে সাবধান হওয়া এবং ধন রক্ষার ব্যবস্থা করাই কি অধিকতর বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে?

স্বাস্থ্যের কারণ প্রধানতঃ শরীরগত ব্যাপার। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কার্য্য নিয়মিত ও স্বাভাবিক ভাবে চলিলেই শরীর সুস্থ থাকে। কেবল বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নয়—শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র তন্ত্র এবং রস, রক্ত, অস্থি, মাংস প্রভৃতি সমুদায় শরীরাংশের অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে থাকা ও কার্য্যক্ষম রাখা চাই; তবেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। টেলিগ্রাফের তারের মত আমাদের শরীরে একটা নাড়ী-সংস্থান আছে। তাহা শরীরের প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। এই নাড়ীগুলি সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম অবস্থায় থাকিবে। আমাদের এই দেহ একটী বিরাট রসায়নাগার। এখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে নিয়ত রাসায়নিক কার্য্য চলিতেছে। এই কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলা চাই। এই রাসায়নিক কার্য্যের ফলেই দেহ খাদ্য হইতে শক্তি ও তেজ সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিভিন্ন শারীর-যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য হইতে শরীর গঠনের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লিষ্ট ও প্রস্তুত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গঠন, বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আবার শারীর যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলেই, শরীরাভ্যন্তরে যে সকল ময়লা ও আবর্জ্জনা উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন দ্বার-পথে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীবন যাত্রা সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে এই সকল কার্য্যই নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলা চাই। শারীর যন্ত্রের এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলাই স্বাস্থ্যরক্ষার কারণ ও উপায়। সুতরাং স্বাস্থ্য সুন্দর ভাবে রক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে (এবং মানুষ মাত্রকেই) শারীর যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী মোটামুটি ভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে সাহায্য করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই স্বাস্থ্যের কারণ, এবং শারীর যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী অব্যাহত রাখাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকলা।

কুপথ্য

[শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

কবিরাজী ভাষায় "কুপথ্য" বলিলে ঠিক্ কি ভাবের পথ্যকে বুঝায়, বলিতে পারি না; কিন্তু, ডাক্তারি মতে, এবং সাধারণ-বুদ্ধিতে, "কুপথ্য" বলিলে দেহের, বয়সের ও অবস্থার অনুপযুক্ত খাদ্যকেই কুপথ্য বলা যায়।

শিশুদিগের পাকস্থলী অতি সুকুমার—এতটুকু খাদ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাহাদের উদরাময় বা জ্বর উপস্থিত হয়। অথচ, সুধু এ দেশে বলিয়া নহে, কাঁচা আম, কষা (অপক্ক) পেয়ারা, কাঁচা কুল, তেঁতুল, গোঁড়ালেবু, বাতাবীলেবু—প্রভৃতি পাইলেই ছেলেরা সুধু খায় না—প্রচুর পরিমাণে খাইতে চায় এবং অধিকাংশ সময়ে ভাল করিয়া না চিবাইয়া খায়। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক প্রেরণার বশেই, ছেলেরা এ রকম খায়।

কেন এমন অদ্ভুত প্রেরণা? ইহার উত্তর বর্ত্তমান বিজ্ঞান দিবেন। অধুনা, "ভাইটামীন্" নামক খাদ্যের একপ্রকার অপরিহার্য্য রসের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই রস টাট্‌কা ফলমূলে ও মাংসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

থাকে। এ পর্য্যন্ত, তিন জাতীয় ভাইটামীন আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাদিগের নাম—এ, বি ও সি। কেহ কেহ ডি নামীয় চতুর্থ ভাইটামীনেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, কাঁচা ফলমূলে, কাঁচা ডাল ও চাউলে (ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলে) ভাইটামীন্ প্রচুর পরিমাণে থাকে—আর এই সব জিনিষই ছেলেরা মুঠামুঠা খাইতে ভালবাসে। তাহা হইলেই, বেশ বোঝা গেল যে, দেহের বৃদ্ধির ও স্বাস্থ্যের অনুকূল পদার্থ ঐ ঐ জিনিষে বেশী আছে বলিয়া, ছেলেরা প্রাকৃতিক প্রেরণাতেই ঐ সকল "কুপথ্য" খাইতে ভাল বাসে।

ইহা ছাড়া আরো কারণ আছে। ছেলেরা কখনো ভাল করিয়া চিবাইয়া কোনও খাদ্য খায় না—বিশেষ করিয়া ফলমূল। ফলমূল ভাল করিয়া না চর্ব্বণ করার ফলে, অন্ত্র মধ্যে যাইয়া, ঐ খণ্ডগুলি মলত্যাগে সহায়তা করে। সহজে ও সুন্দর রূপে কোষ্ঠশুদ্ধি করাণর উদ্দেশ্যই দ্বিতীয় প্রাকৃতিক প্রেরণা। তবে এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাহি যে, ভাল করিয়া চর্ব্বণ না করা, প্রকৃতির উদ্দেশ্য নয়। কারণ, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, ভাল করিয়া না চর্ব্বণ করার সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক। প্রকৃতিদেবী মানুষকে যতটা অসহায় করিয়া—কাযেই, পিতা মাতার যত্নসাপেক্ষ করিয়া—প্রেরণ করেন, তেমন আর কোনও প্রাণীকে করেন নাই। কাযেই, ছেলেরা কাঁচা ফল মূল খাইবার সময়ে, তাহাদিগের পিতামাতার সে দিকে পূর্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ছেলেরা ফলগুলিকে আস্ত-আস্ত আড়ে গিলিবে—প্রকৃতির এরূপ উদ্দেশ্য নয়,—উদ্দেশ্য এই যে, একটু-আধটু কঠিনাংশ থাকে, ত তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে ফলমুল ভোজনের সুফল ছেলেরা যত বুঝে, দুঃখের বিষয়, তাহাদিগের পিতামাতা তেমন বুঝেন না। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে ও ব্যায়াম হইবার ভয়ে প্রায় সকল রকম ফল হইতে পিতামাতারা শিশুদিগকে বঞ্চিত রাখেন।

কাঁচা আমের ঝোল, অথবা সুধু কাঁচা আম, তেঁতুল, কলা, কুল, লিচু প্রভৃতি টক্ রসের জিনিষ গুলি খাইলে জ্বর হইবে,—এই ভয়ে, অধিকাংশ স্থলেই, গৃহস্থ শিশুদিগকে ঐ ঐ মুখ-রোচক, পিত্তনাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক অমৃতোপম খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখেন। ইহার ... আর ভুল নাই।

তাহা ছাড়া, কাঁচা, কঠিন ফল ভক্ষণের সময় দাঁতন কাঠি দিয়া দাঁত ঘষার কায হয়। বাঘ, ... প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুদিগের, ভল্লুক, গবাদি শাকাহারী ভোজী জন্তুদিগের দন্তে পোকাও ধরে না, দাঁতের মাড়ি ফুলে না—অথচ তাহারা দাঁতনও করে না বা টুথ পাউডার বা পেষ্টও ব্যবহার করে না। মাংশাসী জীবদিগের হাড়শুদ্ধ মাংস ও অপর জীবের, আস্ত আস্ত শাকপাতা বা কন্দমূল ভোজনের সময়ে দাঁত ঘষার কায হয়। যদি পশুদিগের পক্ষে এ নিয়ম খাটে, তবে মানবশিশুর পক্ষে এ নিয়ম কতকাংশেও খাটিবে না কেন? ... সুধু কন্দমূল ফলাহারেই মানবশিশু রত থাকিত, ... হইলে বোধ হয় দাঁত মাজিবার প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু ভাতের মত নরম জিনিষ খায় বলিয়াই, শৈশব হইতেই দাঁতমাজা অভ্যাস করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

শিশুমাত্রেই মিষ্ট রসের অতিমাত্রায় প্রিয়। ... কারণ, মিষ্টরস হইতে অতি সহজে ও সত্বর দেহের উত্তাপ রক্ষা ও মেদ সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শিশুদিগের ... এতদুভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু মিষ্ট ভক্ষণের পর ভাল করিয়া মুখ না ধোয়ার ফলে, দাঁত খারাপ হয়। ... অতিমাত্রায় মিষ্টরস সেবনের ফলে, কতকপরিমাণে পেটে আম সঞ্চিত হয়। কিন্তু মিষ্ট ভোজনে ক্রিমি হয়, এ ... একেবারেই ভুল। কচিছেলেদের ক্রিমি হয়—... থাকা অবস্থায় মাটি কাদা ঘাঁটিলে, ক্রিমি হয়—কাঁচা ... বা মূল খাইলে, এবং ক্রিমি হয়—ক্রিমি-ডিম্ব-... পুষ্করিণীর জল পান করিলে। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ক্রিমি- গ্রস্ত মানুষ বা কুকুর, বিড়াল, শৃগাল প্রভৃতি জানোয়ার যে মাঠে বা পুকুরের ধারে মলত্যাগ করে, সে মাঠের ফসল ভাল করিয়া ধুইয়া খাইলে অথবা ... পুষ্করিণীর জল ব্যবহার না করিলে, ক্রিমি হয় ... কাযেই, যদি কোনও শিশুর পেটে ক্রিমি না ... মিষ্ট ভোজনের ফলে, ক্রিমি তাহার পেটে ... যাইতে পারে না। তবে যদি তাহার পেটে ক্রিমি থাকে, তবে অতিমাত্রায় মিষ্ট ভোজনের ফলে, ক্রিমিগুলি ... বাড়িয়া যাইতে পারে। অতএব স্থূল কথা দাঁড়াইতেছে এই:—কচি ছেলেদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্টভক্ষণ করিতে দিতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের দাঁত ও পেটের দিকে খরদৃষ্টি রাখিতে হয়।

এতক্ষণে আমরা মোট কথা কি বুঝিলাম? আমরা বুঝিলাম দুইটি কথা;—(১) ছেলেরা কাঁচা ফল খায় কতকটা ভাইটামীন লাভের জন্য এবং কতকটা কোষ্ঠ-শুদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং কাঁচা ফল ভক্ষণে তাহাদিগের দাঁত ভাল থাকিবার কথা। কাযেই পিতামাতায় ঐ কার্য্যে বাধা না দিয়া, বরং সহায়তা করা উচিত—তবে সবটাই পরিমিতি বা নিয়মের ভিতরে রাখা চাই। (২) ছেলেরা মিষ্ট খায়—সেটাও প্রাকৃতিক প্রেরণায়; সে বিষয়ে ও পিতামাতার কর্ত্তব্য কি, তাহা বলিয়াছি।

মণ্ডা, মিঠাই, লজেনজেষ প্রভৃতির প্রতি আগ্রহ আমরাই সৃষ্টি করি। কিন্তু ছেলেরা অনেক সময়ে ঐ সব ফেলিয়া, চাল কলাই ভাজা, চিনার বাদাম, কাঁচা মটর সুটি প্রভৃতি খাইতে চায় কেন? প্রত্যেক খাদ্যের আস্বাদ কচি ছেলেদিগকে ধরাইয়া শিখাইয়া দিতে হয়—কিন্তু খুব অল্প পিতামাতাই ইচ্ছা করিয়া চাল কলাই খাওয়ান ধরান। এমত অবস্থায়, ঐ জিনিষের প্রতি ছেলেদের আগ্রহের প্রধান কারণ, উহাদের রসনার স্বাদ নহে, বরং ঐ সকল ভক্ষণে দন্ত-সুখানুভবের আশাতেই ছেলেরা ঐগুলি খাইতে চায়। যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যে ব্যক্তি বা জানোয়ার রীতিমত কঠিন দ্রব্য খায়, তাহার দাঁত তত ভাল থাকে! আর, "গলা ভাত ও সিঙ্গি মাছের হলুদ গোলা ঝোল" খাইয়া আমাদের দাঁতের দফারফা হইয়া যাইতেছে! শিশুরা সেই জন্যই, প্রাকৃতিক প্রেরণায়, দন্তের মঙ্গলার্থে, ঐ দন্তসুখভোগের লালসায়, চাল কড়াই ভাজা খাইতে চায়। কিন্তু কয় জন পিতামাতা সে কথা শুনিবেন?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

(১) ফরাসীদেশে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার হইয়াছে। এই চিকিৎসা প্রণালী আশ্চর্য্য ফল প্রদান করিতেছে। সভ্য জগতে প্রতি মিনিটে ২টী, প্রতি ঘণ্টায় ১২০টি, প্রতিদিন ২৮৮০টি, প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ করিয়া লোক যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে। কেবলমাত্র বঙ্গদেশ হইতে প্রতি বৎসর এই ভীষণ রোগে অন্যূন চারি সহস্র করিয়া প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ওই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক।

(২) ইংলণ্ডের চেশায়ার প্রদেশের এক ব্যক্তি একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে অনিদ্রা রোগ সারিয়া যায়। যন্ত্রটী রোগীর শয্যার নিকট একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বসাইয়া যন্ত্র-সংলগ্ন একটি বোতাম টিপিলেই তাহার মধ্য হইতে দ্বাদশ বর্ণের আলোক রশ্মি নির্গত হয়। সেই আলোক-রশ্মিগুলির এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা যে, উহা রোগীর চক্ষুর মণির উপর পতিত হইলেই রোগী নিদ্রিত হইয়া যায়।

(৩) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর-বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ালার মানবের চিত্তবৃত্তি পরিমাণ করিবার এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেই যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসকগণ রোগীর মানসিক ও স্নায়বিক অবস্থার সঠিক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ।

(৩) বার্লিনের অধ্যাপক বুর্গ নামক একজন বৈজ্ঞানিক মস্তকের খুলি প্রভৃতির আকৃতি ও আয়তন হইতে মনুষ্যের নৈতিক চরিত্র মাপিয়া কসিয়া দিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অপরাধীদিগকে বুঝিবার পক্ষে এই যন্ত্রটী হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

(৪) জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ বারগার্ প্লান্‌টোমিটার নামে এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে মানুষের মনের ভাব সমস্ত বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোন লোকের ব্যাধি হইবার আশঙ্কা আছে কি না, আর সে ব্যাধি শীঘ্র কি বিলম্বে হইবে, এমন কি আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত, এই যন্ত্রের সাহায্যে অব্যর্থভাবে জানিতে পারা যায়।

(৬) মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের রেকর্ড করিয়া চিকিৎসকগণ নানা প্রকার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন এবং সফলও হইতেছেন। স্নায়বিক রোগের প্রতিকার এই প্রকারে বহু পরিমাণ হইতেছে। কণ্ঠস্বরের ভাল মন্দের উপরই স্নায়বিক রোগ ধৃত হয়। কথা বলার ধরণ নির্দ্দোষ হইলে প্রমাণ হয় যে, বক্তার কোন প্রকার স্নায়বিক পীড়া নাই, কিন্তু স্নায়বিক পীড়া থাকিলে কথা বলা নির্দ্দোষ ধরণে হয় না এবং উচ্চারণ স্পষ্ট হইবে না—জিহ্বার জড়তা দোষ থাকিবে।

(৭) রেডিও যন্ত্র কোন লোকের বধিরতা দূর করিতে পারে না, তবে খুব জোরে কথা বলিলে যাহারা শুনিতে পায়, তাহাদের কর্ণে দিলে তাহারা সমস্ত কথা শুনিতে পায়। ডাঃ হারল্ড্ বধিরদিগের জন্য এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বধিরগণ সকল কথা বেশ স্পষ্ট শুনিতে পায়।

(৮) সিন্‌সিনাটীর অধিবাসী হার্ব্বার্ট সিলভার্ একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বড় বড় কঠিন অস্ত্র চিকিৎসা ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

(৯) কেশবিরল মস্তক কেশাচ্ছাদিত করিবার জন্য সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা টাকের উপর চুলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে চুল বসাইয়া দিতে পারা যায়।

(১০) ক্লোরোফর্ম্মের চৈতন্যাপহারক শক্তির বিষয় সর্ব্ব প্রথম ডেভিড্ ওয়াল্‌ডির মনে উদিত হয়। ইহার আবিষ্কার ব্যাপারের সহিত তাঁহার নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ১৮৩৫ খৃঃ তিনি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের অগ্রণী। "এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল" গৃহে তাঁহার একখানি পিত্তল-ফলক সংস্থাপিত হইয়াছে।

সম্পাদকের ডাকবাক্স

১। মান্যবর—শ্রীযুক্ত "স্বাস্থ্য-সমাচার" সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু—

সবিনয় নিবেদন, মহাশয়ের ডাক বাক্সে আমার দুইটী প্রশ্ন প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী সংখ্যায় উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি সন ১৩৩২ সন, তারিখ ২৪শে ফাল্গুন।

বিনীত
ডাক্তার শ্রীকালীকুমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন—

১। দদ্রু অতি জঘন্য রোগ। "পারদ বিহীন" "বিনা কষ্টে ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য" "আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব" ইত্যাদি নানা প্রকার কথা সংবাদ পত্রে ও পঞ্জিকা প্রভৃতিতে পেটেণ্ট আবিষ্কার-কর্ত্তারা বহুকাল যাবৎ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ঐ সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ মধ্যে আমার চক্ষে যে কয়েকটী পড়িয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি উহার প্রধান উপাদানই Acid chrysophanic। ঐ সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারে দাদ সারিয়া যাইবার পর ২।১ সপ্তাহ মধ্যেই পুনরাক্রমণ করিয়া থাকে। আমি পুনরাক্রান্ত রোগীদিগকে এসিড ক্লাইসোফেনিক, সালফার প্রিসিপিটেড, বিস্মথ সব-নাইট্রেট, সোডি স্যালিসিলাস, ভেসেলীন সহ মিশ্রিত মলম প্রয়োগ করিয়াও দাদের পুনরাক্রমণের গতি নিবারণ করিতে পরিতেছি না। "চিকিৎসা প্রকাশ*" নামক মাসিক পত্রিকার ২য় বর্ষের ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসের ৪র্থ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে, "দাদ সারিয়া যাইবার পর যদি সোডিয়ম হাইপোফস্ফাইট ২ ড্রাম, ৪ আউন্স জলে দ্রব করতঃ সেই দ্রব প্রত্যহ ৩৪ বার আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তবে আর এ জন্মে সে স্থানে দাদ হয় না।" উক্ত পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১৩১৮ সালের ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ মাসে লিখিত আছে যে, দদ্রুরোগের প্রতিষেধক ঔষধ সোডিয়ম হাইপোসল-ফাইটস ২ ড্রাম, পরিশ্রুত জল ৪ আউন্স একত্র মিশ্রিত যে স্থানে দাদ হইয়াছিল সেই স্থানে প্রত্যহ ৩৪ বার করিয়া তুলি করিয়া লাগাইতে হইবে। উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে যাবজ্জীবনের মধ্যে আর উহা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত উক্ত পত্রিকার ১০ম সংখ্যা মাঘ মাসে ডাঃ ব্রাউণ্টন মহোদয় মেডিক্যাল ক্রনিক নামক পত্রিকায় দদ্রু রোগের পুনরাক্রমণ হইবে না বলিয়া যে প্রেস্‌ক্রিপসন করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত প্রেস্‌ক্রিপসনটী এই, এপিকারিণ ১ ড্রাম, সোহাগার খৈ ৩০ গ্রেণ, জিঙ্ক অক্সাইড ১ ড্রাম, এসিড কার্ব্বলিক ৫ মিনিম, ভেসেলীন ১½ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রযোজ্য।

উপরোক্ত ৩টী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার মত কি? উহা দ্বারা দদ্রু রোগের পুনরাক্রমণের গতি নিবারণ হইবে কি না তাহা জানাইবেন। জনৈক রোগী দ্বারা ঢাকার ৪।৫টী ঔষধালয়ে অনুসন্ধান করিয়াও এপিকারিণ না পাওয়ায় এপিকারিণের পরীক্ষার সুযোগ পাই নাই। আমাদের সে কালের মেটেরিয়া মেডিকায়ও এপিকারিণ পাইলাম না। বর্ত্তমান কালেরও ২।১খানি মেটেরিয়া মেডিকা অনুসন্ধান করিয়া উহা পাওয়া যায় নাই। আশা করি মহাশয় এপিকারিণের প্রয়োগ রূপ এবং উহার মূল্যাদি স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

২। আজ কাল সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে কুইনাইনের নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কবিরাজী কুইনাইনও আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নব আবিষ্কৃত কুইনাইনের ক্রিয়াদি কি প্রকার তাহা নিরীহ অজ্ঞ পল্লীবাসী কিছুই জানে না। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণে নিরুপায় হইয়া দোকানদারদিগের নিকট হইতে অনেকেই ২।৪ পয়সার কুইনাইন ক্রয় করিয়া থাকে। যদিও গভর্মেণ্ট হইতে ডাকঘরে কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু হতভাগ্য পল্লীবাসী এমনই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে, একত্রে এক শিশি কুইনাইন ক্রয় করিবার পয়সা অনেকেরই অনেক সময় জুটিয়া ওঠে না। আবার অনেক সময় ডাক ঘরে কুইনাইন পাওয়াও যায় না। আমার এই কথা শুনিয়া সহরবাসী সম্পাদক মহাশয় অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। আমরা পল্লী-বাসী ক্ষুদ্র চিকিৎসক, আজ পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া পল্লীর যে দুরবস্থা দেখিয়া আসিতেছি, তাহারই সামান্য একটী দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। যাক্ সে কথা, এই সমস্ত কুইনাইনের মধ্যে জার্ম্মানীর নূতন আমদানী

* চিকিৎসা প্রকাশ—মাসিক পত্রিকা ডাঃ ডিঃ এন হালদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পূর্ব্বে নদীয়া আন্দুলবাড়িয়া মেডিকেল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান সময় কলিকাতা ১৯৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেছে।

ডি কুইনাইনের বিষয় আজ কাল অনেক সমব্যবসায়ী বন্ধুবর্গের মুখে শুনিতেছি, এবং কোন কোন মাসিক পত্রে দেখিতেছি, উহা ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আলোচনা হইতেছে। আমি এ পর্য্যন্ত ডি কুইনাইন এবং নব আবিষ্কৃত অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহার করি নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত কুইনাইনের মধ্যে ডি কুইনাইনের একটী রোগী গত বৎসর এবং এবার জে, বি, ডি, মেকারের কুইনাইনের একটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। তাহাদের জ্বর বিরাম অবস্থায় ঐ কুইনাইন যথোপযুক্ত মাত্রায় চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও জ্বর বন্ধ না হইয়া উত্তরোত্তর টাইফয়েড অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। নব আবিষ্কৃত কুইনাইনের মধ্যে কোন্ কোন্ কুইনাইন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারি এবং সর্ব্বসাধারণকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতে পারি তৎসম্বন্ধে আপনার মতামত স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশ করিবেন। ইতি—

উত্তর—

দাউদ অপরিষ্কার রাখার জন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে। স্থানীয় ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইলেও স্থায়ীভাবে আরোগ্য জন্য শরীরের ভিতর ও বাহির দুইই পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিবে। কোনরূপ প্রস্রাবের দোষ থাকিলে তাহার চিকিৎসা করাইবে এবং পরিধেয় কাপড় জামা ইত্যাদি যথা সম্ভব পরিষ্কার রাখিবে।

আপনার ব্যবস্থাপত্রগুলি দ্বারা দদ্রু রোগ উপশম হইয়া থাকে। তবে পুনরাক্রমণ শরীরের ভিতরের ও বাহিরের ময়লা জন্য হইয়া থাকে।

এপিকারিণ নামক কোন ঔষধ Extra Pharmacopiaতেও পাইলাম না। ইহা কোন পেটেণ্ট ঔষধ হইতে পারে। আপনি চিকিৎসা প্রকাশ সম্পাদক ডি, এন, হালদার মহাশয়ের নিকট ইহার সংবাদ পাইবেন। আমার এ ঔষধের ব্যবহার জানা নাই।

২। ব্যবসায়ীরা ভিন্ন ভিন্ন নামে কুইনাইন আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতেছেন এবং এই সকল নাম রেজেষ্টারি করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন। আমরা ফারমাকেপিয়ার নামধেয় কুইনাইন সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকি, কারণ নূতন নামে কুইনাইনে কতদূর উপকার হইবে তাহা জানা নাই।

নবআবিষ্কৃত—(নূতন নাম বিশিষ্ট ও বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারিত) কুইনাইন ব্যবহারে ক্ষতিই হইবে যে হেতু বিজ্ঞাপন ও ট্রেড্‌মার্ক্ জন্য তাহাদের মূল্য অধিক। নবাবিষ্কৃত কুইনাইন ব্যবহার করা নিরাপদ নহে।

২। সম্পাদক মহাশয়—

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত "স্বাস্থ্যধর্ম্ম পত্রিকাতে" কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা পড়িয়া, আপনাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটী উত্তরের জন্য পাঠাইলাম। যদিও প্রশ্নটী কৃষিবিষয়ক, তথাপি স্বাস্থ্য সমাচারে কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া এই প্রশ্নটী উত্তরের জন্য স্থান পাইবে এবং আলোচিত হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

১। উত্তমরূপে আবাদি জমিতে এ বৎসর বরবটি বুনিয়াছিলাম গাছ বেশ সতেজ হইল। ফলও বড় বড় হইল। কিন্তু আঁটী ছোট ও ভিতরের বীজ মুগের ন্যায় ক্ষুদ্র হইল।

প্রশ্ন ঃ—

কি কারণে বীজ পুষ্ট হইল না এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিলে সাধারণে বিশেষ উপকৃত হইবে।

শ্রীহরিচরণ গড়াই।

সাং নিশিন্দিপুর, পোঃ আঃ মোকামপুর।

উত্তর ঃ—

আমরা কৃষিতে বিশেষজ্ঞ নহি। তবে জমির ফসলের আহার্য্যের অভাব হইলে এইরূপ ক্ষুদ্র বীজ উৎপন্ন হয়। জমিতে বিশেষ কোন উপাদানের অভাব এইরূপ হইয়াছিল।

কি প্রকারে জমির রাসায়নিক শক্তি পরীক্ষা করিয়া ফসলের উপযোগিতা স্থির করিতে হয়, তাহা বিশেষজ্ঞ ঠিক করিয়া বলিতে পারিবেন। এই জন্য আমরা বিশেষজ্ঞ দিগকে সহজে জমির উপাদান পরীক্ষা করিবার প্রণালী সেই অনুপাতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। এইরূপ প্রবন্ধ আদরের সহিত স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশিত হইবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩২ সাল | ১২শ সংখ্যা

দেহ-রক্ষার ইঙ্গিত

হিন্দু দার্শনিকেরা মানব-দেহকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মানুষের দেহই ক্ষুদ্রাকারের একটী বিশ্বজগৎ (Miniature universe)। বিশ্বপ্রকৃতির মূল নিয়ম সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। গীতায় শ্রীভগবান, চণ্ডীতে মেধস্ মুনি এই মতেরই আভাস দিয়াছেন। এই বিশ্ব জগতে যেমন নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি, লয় চলিতেছে, মানব-দেহের মধ্যেও ক্ষুদ্রাকারে ঠিক সেই রকম কাজ চলিতেছে। আমরা যাহা আহার করিতেছি তাহা রূপান্তরিত হইয়া নূতন কোষ (cell) সৃষ্টি করিতেছে। স্থিতি-গুণে এই সকল কোষ দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানুষকে নিয়ত অঙ্গ-সঞ্চালন করিতে হইতেছে। তাহার ফলে শরীরের কিয়দংশ নিত্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে—সৃষ্টিতত্ত্বে ইহারই নাম লয়। এই ক্ষয় প্রাপ্ত শেল বা কোষগুলি শরীরের পক্ষে আবর্জ্জনা স্বরূপ। ইহারা শরীর গঠনে বা শরীর পোষণে কোনই সহায়তা করে না। পক্ষান্তরে, শরীরের অনাবশ্যক বোঝা স্বরূপ থাকিয়া ইহারা দেহের অহিতই সাধন করিয়া থাকে।

কেবল যে ক্ষয়-প্রাপ্ত শেলগুলিই দেহের ভিতর আবর্জ্জনার কাজ করে তাহা নয়। আরও নানা প্রকারে দেহের মধ্যে কিছু কিছু আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়। মোট কথা, যাহা দেহের কোন কাজে লাগে না, তাহাই আবর্জ্জনা।

গৃহস্থ বাড়ীতে অনেক আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিস আমদানী রপ্তানী হয়। এই সমস্ত বস্তুই, কিম্বা প্রত্যেক বস্তুর সমস্তটা অংশই গৃহস্থের কাজে লাগে না। অকেজো জিনিসগুলা আবর্জ্জনায় পরিণত হয়। গৃহস্থ প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় এই সকল আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া বাড়ীর বাহিরে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়। এই

হিসাবে, দেহের মধ্যে যে সব আবর্জ্জনা জমে, সেগুলিও বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। নচেৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে। গৃহস্থ ঘরে যেমন নিত্য যে আবর্জ্জনা জমে, এবং নিত্যই যাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়, দেহের আবর্জ্জনা সেরূপ ভাবে নিত্য বাহির করিয়া ফেলিবার সুবিধা না হইলেও, মধ্যে মধ্যে—অর্থাৎ আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া পরিমাণে বাড়িতে বাড়িতে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, সেগুলিকে বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইংরেজীতে একটী কথা আছে, A stitch in time saves nine—সময়ের এক কোঁড় অসময়ের নয় ফোঁড়ের কাজ করিয়া থাকে। দেহের আবর্জ্জনা সময় থাকিতে বাহির করিয়া ফেলিলে অনেক দুর্ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল। রোগ শোক, সুখ দুঃখ বিপদ আপদ সকল প্রকার পার্থিব ব্যাপারের সকল দায়িত্ব তাহারা ভগবানের বা দৈবের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। এই ভগবানের প্রতি নির্ভরশীলতার আমরা নিন্দা করি না। তবে আমরা কেবল এই কথাটি মাত্র স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, ভগবান ভাল মন্দ যাহা কিছু করেন, তাহা মানুষের মধ্যস্থতাতেই করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় থাকিলেই যথেষ্ট হয় না। ঈশ্বরপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও কাজ করিতে হইবে। কেবল আমাদের দেশের লোকই যে অদৃষ্টবাদী, তাই নয়। সকল দেশেই অদৃষ্টবাদ অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অন্য দেশের লোকেরাও কতকটা পরিমাণে সকল দোষ ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা বা অদৃষ্টবাদের অর্থ নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকা নহে। সেইজন্য ইংরেজীতে এই প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে যে, God helps those who help themselves; অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কাজ করে, ভগবান কেবল তাহাদেরই সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও একটী সংস্কৃত প্রবচন আছে—উদ্যোগিনং পুরু... সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরু... বদন্তি। অর্থাৎ উদ্যোগী কর্ম্মী ব্যক্তিরাই লক্ষ্মী... করিয়া থাকে। কেবল কাপুরুষরাই দৈবের উপ... নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে।

তার পর আমাদের দেশে আরও একটী ... আছে—কর্ম্মফল। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। অন্য ... বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবল স্বাস্থ্যের ... কহিব। এ ক্ষেত্রেও কর্ম্মফলের প্রভাব বিলক্ষণ। ... সুস্থ থাকা যেমন কর্ম্মফল, পীড়িত হওয়াও ... কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফলের ভোগকাল ইহ-জীবনে ... ইহার মেয়াদ এই জীবনেই শেষ হয়, পরবর্ত্তী জন্ম ... ইহার জের টানিতে হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষায় অবহেলা ... স্বাস্থ্য-বিরোধী দুষ্কর্ম্মের পরিমাণ অনুসারে, দুঃখ ভোগের পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সে কর্ম্মের পরি... অনুসারে সাদাসিধে জ্বর জাড়ি, সর্দ্দি কাসি, পেটের অসুখ হইতে, যত প্রকার কঠিন কঠিন রোগ, ... কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

খাদ্যের প্রকৃতি, কাজ কর্ম্মের ধারা, জীবন ... নির্ব্বাহের প্রণালী প্রভৃতি অনুসারে শরীরের কোষ ... ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, এবং অন্য নানা উপায়ে শরীর ... মধ্যে যথেষ্ট আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতে পারে। এই ... আবর্জ্জনা যদি নিয়মিত ভাবে রীতিমত পরি... করিয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে গ্রীস দেশের ... রাজার আস্তাবলে সঞ্চিত জঞ্জালের মত দেহের মধ্যে ... এত বেশী আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইবে যে, সেই ময়লা ... করিবার জন্য চিকিৎসককে হারক্যুলেসের মত অমানুষিক বলসম্পন্ন হইতে হইবে।

আপনি এক গেলাস জল আর খানিকটা ... নূন নিন। গ্লাসের জলে গুঁড়া নূন অল্পে অল্পে ... আস্তে ঢালিতে থাকুন। দেখিবেন, নূন গলিয়া ... জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। গেলাসের ... নূন দেখা যায় না—কেবল স্বাদে বুঝা যায় জলে ... মিশ্রিত আছে। ঐ ভাবে নূন ঢালিতে ঢালিতে দেখিবেন, নূন আর জলে গলিয়া যাইতেছে না—তলায় ... জমিতেছে। নূন জলে দিলে গলিয়া যায়, ... আপনি আগেই জানিতেন। এখন গেলাসের জলে নূন মিশাইয়া সেটা প্রত্যক্ষও করিলেন—খানিকক্ষণ নূন জলে গলিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। তার পর আর গলিল না। ইহার কারণ কি! কারণ আর কিছুই নয়—পাঁচ ভাগ জলে এক ভাগ নূন সম্পূর্ণ গলিয়া যাইতে পারে, তার বেশী আর পারে না। গেলাসে যে পরিমাণ জল আছে, তাহার এক-পঞ্চমাংশ নূন সহজেই জলে গলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এখন যে নূনটা অদ্রবীভূত রহিয়াছে, তাহা ঐ এক-পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত অংশ। অবশ্য জল গরম করিয়া লইলে আরও কিছু নূন দ্রবীভূত হইতে পারে, কিন্তু জল শীতল হইলেই ঐ এক-পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত অংশ ... গিয়া আকার ধারণ করিয়া দৃষ্টি-গোচর হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, জলের নূন গলাইবার শক্তি সীমাবদ্ধ।

দেহের মধ্যে আবর্জ্জনা জমিতে জমিতে অবশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন শরীর আর উহা ধারণ করিতে পারে না। তখন শরীর কর্ম্মে অক্ষম হইয়া পড়ে; এবং খোস পাঁচড়া চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগের আকারে ঐ সকল আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। শরীর ক্লান্ত বোধ হওয়া, আলস্য বোধ করা, দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি ঐরূপ অতিরিক্ত আবর্জ্জনা জমিবার বাহ্য লক্ষণ। ... যে যে উপাদান থাকিলে শরীর লঘু, চঞ্চল, কর্ম্মক্ষম, সতেজ থাকে,—তখন সেই সকল উপাদানের পরিমাণ কমিয়া যায়। এ সময়ে কোন কাজ করিতে গেলে বড় ক্লান্তি বোধ হয়। এ সময়ে ক্ষুধা হ্রাস হয়। ...মান লোকেরা এই সময়েই সতর্ক হয়। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত খাদ্য আহারের জন্য ব্যস্ত না হইয়া বরং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত আহার বন্ধ রাখে। কিন্তু আপামর সাধারণ লোকে খাদ্যে বঞ্চিত হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানায় ঔষধ সেবন করিতে যায়। তাহারা ডাক্তারের কাছে গিয়া নানা ছন্দে বলিতে থাকে—কিছু ক্ষিদে হচ্ছে না—যাতে ক্ষিদে হয় এমন কোন ঔষধ দিন। কিন্তু ইহা তাহাদের মহা ভ্রম। স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া সত্ত্বেও যাহারা আহারে বিরত হয় না, তাহাদিগের শরীরে বেশী পরিমাণে আবর্জ্জনা জমিতে থাকে। দেহে আবর্জ্জনার আধিক্যই ক্ষুধামান্দ্যের প্রধান কারণ। তাহার উপর আরও খাইলে আবর্জ্জনার আধিক্য না ঘটিয়াই পারে না। ফলে, উপবাস করিলে যে ক্ষেত্রে অল্প চেষ্টাতেই শরীর পুনরায় সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত, সে ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া গুরুতর পীড়া আহ্বান করিয়া আনা হয় মাত্র।

আহারের দোষগুণ।

গোগ্রাসে কতকগুলা খাবার জিনিস গিলিয়া উদর পূর্ণ করাই আহার করা নহে। আহার ব্যাপার একটা আর্ট; এবং তাহার পিছনে তাহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য একটা বিজ্ঞানও রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া, তাহা উত্তমরূপে পাক করিয়া সুপ্রণালীতে আহার করাই আর্ট।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা বিজ্ঞানসম্মত নহে। খাদ্য এমন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নির্ব্বাচন করা উচিত যাহাতে দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। খাদ্যে শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ না থাকিলে তাহা যত মূল্যবান ও মুখরোচক হউক না কেন, তাহা অখাদ্য। কারণ, তাহাতে খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না; পরন্তু, দেহ অনাবশ্যক ও অনর্থক ভারাক্রান্ত হয়।

খাদ্য খুব নরম হওয়া ভাল নয়। কারণ সে খাদ্য চর্ব্বণ করিবার প্রয়োজন হয় না; কাজেই তাহাতে লালা মিশ্রিত হইয়া হজম করিতে সহায়তা করে না। গোগ্রাসে গেলা গোরুর পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে; কারণ, তাহাদের ভুক্ত খাদ্য রোমন্থন করিবার অভ্যাস আছে। কিন্তু মানুষ যখন ভুক্ত খাদ্য উদর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোমন্থন করিতে পারে না, তখন গোগ্রাসে গেলা মানুষের উপযুক্ত নয়। মানুষকে

খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তবে তাহা উদরস্থ করিতে হয়।

খাদ্য চর্ব্বণ করিবার জন্য মানুষ মাত্রেরই দুই পাটীতে ৩২টা দন্ত আছে। কিন্তু সভ্য-সমাজে খাদ্য দ্রব্য এমন ভাবে তৈয়ার করিয়া লওয়া হয় যে, অধিকাংশ খাদ্যই চর্ব্বণ করিবার প্রায় দরকারই হয় না। খাদ্য চর্ব্বণ করিবার দরকার না থাকায়, ব্যবহারাভাবে অকালে দন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য সভ্য-সমাজে দন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী। দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। দন্ত রোগের বাহুল্যের ইহাই অকাট্য প্রমাণ। এবং নরম খাদ্য ভক্ষণই দন্ত রোগের বাহুল্যের প্রধান কারণ।

আবার খাদ্য নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা যায়। অধিকাংশ খাদ্যেই অস্থি সংগঠনের উপাদানের অভাব। সেই কারণে দন্ত তেমন সুপুষ্ট ও দৃঢ় হইতে পারে না; তাহার উপর চর্ব্বণের আবশ্যকতার অভাব। সুতরাং দন্ত রোগ যে বাড়িয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি। খাদ্য দ্রব্য এমন হওয়া উচিত, যাহা রীতিমত চর্ব্বণ করা ব্যতীত কোন ক্রমেই উদরস্থ করা সম্ভব নহে। তাহা হইলে দন্ত রোগের বাহুল্য অচিরে কমিয়া যায়, দন্ত রক্ষার জন্যও অসাধারণ প্রয়াস পাইতে হয় না। কঠিন খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে কেবল যে দন্তের ব্যায়াম হয় তাহা নহে—দন্ত পরিষ্কারও থাকে। কারণ চর্ব্বণ করিবার কালে মুখের ভিতর স্বভাবতই জীবাণুনাশক রসের সঞ্চার হয়। তাহাই দন্তকে পরিষ্কার রাখে এবং জীবাণু বিনাশ করে।

পীড়িত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া আসন্ন পীড়ার কথা জানিতে পারিলে রোগ নিবারণের, অন্ততঃ তাহার তীব্রতা হ্রাসের যে যথেষ্ট সুবিধা হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। ইহাতে অনেক কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করা যায়। খাদ্যের অপব্যবহার এবং আহার প্রণালীর নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবার লক্ষণ দেখা গেলে দুই এক দিন উপবাস দিয়া গুরুতর পীড়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যা[ইতে] পারে। ইহা কম লাভ নহে।

ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে সকাল বেলা উঠি[য়া] চা কিম্বা প্রাতরাশ ভোজন না করাই উচিত। ক্ষুধার উপর আহার করার অর্থ—পাকস্থলীকে অনাব[শ্যক] ভারাক্রান্ত করা। এবং ইহার ফল কখনও ভাল না। আহার বিষয়ে পাকস্থলীর মত সুপরামর্শদা[তা] আর কেহই নহে। আহারের প্রয়োজন হইলে ক্ষু[ধার] সঞ্চার করিয়া পাকস্থলীই তাহা জানাইয়া দেয়। আহা[রের] প্রয়োজনাভাব থাকিলে পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণে অনি[চ্ছা] জ্ঞাপন করে। বুদ্ধিমান লোকে পাকস্থলীর মহামূল্য উপদেশে কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করে[ন না]। পাকস্থলীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আহার ক[রিয়া] পীড়িত হওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। পাকস্থলী [যখন] খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকে তখন ভাল খাদ্যেও [রুচি] হয় না। সেই জন্য আমাদের দেশে একটী কথা [প্রচলিত] আছে যে, পেট ভার থাকিলে মোণ্ডা তিত লা[গে]। খাইতে বসিয়া যদি তুমি দেখ যে, খাদ্য ভাল লাগি[তেছে] না, তাহা হইলে জানিও, জোর করিয়া খাইলে [তাহা জীর্ণ] না হইয়া যায় না।

খাদ্যে যখন সম্পূর্ণ রুচি হইবে, তখন জানি[বে] পাকস্থলীও খাদ্য গ্রহণ ও জীর্ণ করিতে প্রস্তুত। পূর্ব্বক আহারে যত আনন্দ পাইবে, খাদ্য তত [সু]ভাবে জীর্ণ হইবে। আহার কালীন আনন্দের ফ[লে] যথেষ্ট পরিমাণে পাচক রস বহির্গত হয়। পাচক [রস] যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইলে খাদ্যও যে সুজীর্ণ হ[ইবে] ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

কিন্তু আহারের সময় উপস্থিত হইলে, ক্ষুধার উদ্রে[ক না] হইলেও, বা খাদ্যে রুচি না হইলেও, কেবল প্রথা [রক্ষার জন্য] বলিয়া যদি খাওয়া যায়, তাহা হইলে সে খাওয়ায় [কোন] উপকার ত নাই-ই,—বরং সমূহ অপকার [হইবার] সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণে [ও] জীর্ণ করিতে প্রস্তুত থাকে না। সুতরাং তখন [খাইলে] কি দশা ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়! ঐ [খাদ্য] পাকস্থলীতে পড়িয়া থাকিয়া পেট ভার করিয়া রাখিবে; কার্য্যে কোন উৎসাহ থাকিবে না। এ সময়ে প্রত্যেক কোটা রক্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ থাকে। এই আবর্জ্জনার ফলে শরীর ম্যাজম্যাজ করে, কিছুই ভাল লাগে না। অনিচ্ছায়, শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেই ইহা ঘটিয়া থাকে।

রোগ যাহাতে না আসিতে পারে এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত আহার করিয়ো না। সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য রুচি না জন্মিলে খাইয়ো না।

খাদ্য গ্রহণে অন্যান্য অনেক রকমের ভুলও অনেকের হয়। কেবল পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণে যথার্থ আহার করা হয় না। খাদ্যের মধ্যে এমন বস্তু থাকা দরকার, যাহা হজম হয় না, অথচ নিজের ভারে শরীরের আবর্জ্জনা বহন করিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে রাস্তে খোলসা হইয়া শরীর হাল্‌কা হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে আমিষ খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ খাদ্যই সমধিক উপযোগী। ইহাতে যেমন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, তেমনি বাজে জিনিসও অনেক থাকে। যাহা পুষ্টিকর তাহা শরীরে শোষিত হয়; যাহা বাজে তাহা বাহির হইয়া গিয়া পেট খোলসা রাখে।

রন্ধনের দোষগুণ।

বিলাতের লোক উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে জানে না। তাহারা আলু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দেয়। ঐ জলের সঙ্গে তরকারীর পুষ্টিকর পদার্থ ও সদ্‌গন্ধ বাহির হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ছিবড়ে ও অখাদ্য। তাহারা তাহাই খায়। আমাদের দেশে খাবারের দোকানে আলুসিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া খোসা ছাড়াইয়া আলুর দম রান্না হয়। ইহা অখাদ্য। কিন্তু গৃহস্থ ঘরে আলুর খোসা ছাড়াইয়া ধুইয়া সাঁতলাইয়া আলুর দম রান্না হয়। এই জন্য তাহা অনেকটা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। যদি খোসা না ছাড়াইয়া খোসাশুদ্ধ আলু ভাল করিয়া ধুইয়া একটু খানি চিরিয়া যথানিয়মে আলুর দম রান্না হয়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভাত রান্নার প্রণালী ভাল নয়। অনেক বেশী জল দিয়া ভাত রাঁধিয়া ফ্যান ফেলিয়া দিয়া ভাত খাওয়া ভুল। পরিমাণ মত জল দিয়া ভাত রাঁধিলে ভাতও সিদ্ধ হয়, অতিরিক্ত জলও মরিয়া যায়—ফ্যান ফেলিতে হয় না। সেই ভাতই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুখাদ্য। অন্যান্য তরকারী রাঁধিবার প্রথা আমাদের দেশে বিলাত অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে ঘী-গরমমশলা কম ব্যবহার করিলে ভাল হয়। অনেক রাঁধুনির বিশ্বাস, তরকারীতে যত বেশী ঘী মশলা দেওয়া হইবে, রান্না তত উৎকৃষ্ট হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তরকারীতে ঠিক পরিমাণ মত মশলা ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট। অতিরিক্ত মশলা ব্যবহার অপচয়ও বটে, অনিষ্টকরও বটে। যদি কোন আনাজ তরকারী সিদ্ধ করিয়া লইয়া রাঁধিতে হয়, তাহা হইলে এমন পরিমাণ মত জল দিতে হয় যে, তরকারীও সুসিদ্ধ হয়, অথচ জলটুকুও মরিয়া যায়।

আমাদের দেশে রন্ধনার্থ যে সমস্ত আনাজ তরকারী ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেকটির এক একটী বিশেষ গুণ আছে। সুতরাং যে সময়ের যে তরকারী, সে সময়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। তাহাতে উপকারই হইয়া থাকে।

সাধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস।

সাধারণ লোকে পীড়িত হইলে মনে করে, সে অসুস্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। বস্তুতঃ রোগ তাহার শরীরে অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে। এখন যাহাকে সে রোগ মনে করিতেছে, তাহা তাহার অসুস্থতার একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র। শরীরের ভিতর রোগ প্রতিষেধক যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, সেই শক্তির ক্রিয়ার ফলে রোগ আরোগ্যের প্রয়াসের ফলেই এই লক্ষণের উৎপত্তি। 'তথাকথিত' রোগ (অর্থাৎ প্রকৃত রোগের বাহ্য লক্ষণ) দেখা দিলেই বুঝিতে হইবে, রোগের স্বাভাবিক চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার এবং ঔষধ সেই স্বাভাবিক নিরাময় কার্য্যকে সাহায্য করে মাত্র। শরীরের ভিতর আবর্জ্জনা জমিতে জমিতে যখন তাহার পরিমাণ শরীরের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতি সেই সব আবর্জ্জনা

বাহির করিয়া দিতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে বাহিরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলেই অসুখ করে। অসুখ করিলেই পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘনও বন্ধ করিতে হয়। তখন শরীর পরিষ্কার করার কাজ, ময়লা দূর করার কাজ সহজ হইয়া আসে। তাহা না হইয়া যদি আহার বিহার সমান ভাবেই চলে, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব রোগ বরং আমাদের হিতৈষী বন্ধু। উহা প্রকৃতির সতর্কতার ইঙ্গিত। কারণ, রোগই রক্ত পরিষ্কারের সদুপায়। উহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের জীবন রক্ষক। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে অবশ্য দুই একটা ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও যে ঘটে না এমন নহে। সাধারণতঃ শরীর যখন আপনাকে পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে, তখনই সেই প্রণালী রোগের আকারে বাহিরে দেখা দেয়। শরীর পরিষ্কারের স্বাভাবিক প্রণালীকে ঠিকমত সাহায্য করাই সুচিকিৎসা। তাহার ফলে শীঘ্রই এই কার্য্যটি সাধিত হইয়া যায়। কিন্তু কুচিকিৎসা হইলে, ভুল ঔষধ ব্যবহৃত হইলে, স্বভাবের এই রোগ নিরাময়ের প্রণালীতে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে।

এখন তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, রোগ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার আসন্ন আগমন সংবাদ যাহাতে জানিতে পারা এবং সতর্ক হইতে পারা যায়, এমন ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করা। রোগের লক্ষণ জানিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারা অধিকতর ফলপ্রদ। তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইয়া রোগের আগমন নিবারণ করা যায়; অন্ততঃ তাহার তীব্রতা কমানো যায়।

অনেকে জল খুব কম পান করেন। ইহা ভাল অভ্যাস নয়। যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিলে রক্ত তরল থাকিয়া সহজে প্রবাহিত হয়, এবং শরীরের ময়লাও বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য যথেষ্ট জল পানের অভ্যাস থাকা ভাল। জলের পরিবর্ত্তে প্রচুর তরল খাদ্য তক্ষণেও কতকটা এই কাজ হয়। নানা বিধ ফলের রস এ পক্ষে খুব হিতকর। বিনি ফলের সিরাপ বা সরবৎ পান করিলেও খুব উপকার পাওয়া যায়।

স্থূলতঃ খাদ্যের সুস্বাদ (মশলা সহযোগে কৃত্রিম সুস্বাদ নহে—স্বাভাবিক সুস্বাদ) খাদ্য গ্রহণ প্রণালী নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আমাদের প্রধান পথ প্রদর্শক। যে স্বাভাবিক খাদ্য যতটা সুস্বাদ তাহাই আমাদের পক্ষে পোষণের পক্ষে ততটা হিতকর। সুন্দর ভাবে পাক করা পুষ্টিকর খাদ্য সকল সময়েই সুস্বাদু হইয়া থাকে। নানাবিধ মশলা দেওয়া খাদ্য খাইতে ভাল লাগিলেও এই কৃত্রিম স্বাদ খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সাধনে এগুলি সাহায্য করে না।

অতএব এই কথাগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, (১) ক্ষুধা না থাকে, (২) যদি গা ম্যাজ ম্যাজ করে, আলস্য বোধ হয়, (৩) যদি বাহ্যে ভাল খোলসা না হয়, (৪) যদি মেজাজ রুক্ষ থাকে কিম্বা মনে ইতরভাব থাকে, (৫) যদি সুনিদ্রা না হয়, (৬) যদি মাথা ঘুরে কিম্বা শরীর কি পেট ভার ভার বোধ হয়, তাহা হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবে। ইহার অতি ভোজনের ফলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে আহারে সংযম অবশ্য আবশ্যক। প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস দিলে খুব সুফল পাওয়া যায়। যদি ঐ সকল লক্ষণ জল কম খাওয়ার দরুণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিতে হইবে। যদি মশলাযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া থাকে, তবে শাক সব্জী ও ফলমূল বেশী করিয়া খাইতে হইবে। যদি ব্যায়ামের অভাব এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তবে দীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যসেবক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাস্থ্যজ্ঞান

এখন বেশ বুঝা গেল যে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেও কত বেশী দরকার। স্বাস্থ্যজ্ঞান রীতিমত অর্জ্জন করিতে হইলে মনকে সেই শিক্ষা লাভের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা দরকার; অর্থাৎ স্বাস্থ্যজ্ঞান লাভার্থ মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জন্মানো চাই। মনের এই অবস্থা যে কেবল স্বাস্থ্যজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রেই হওয়া দরকার, তাহা নয়—সকল প্রকার শিক্ষা-ক্ষেত্রেই মনকে এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তবেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায়। নচেৎ শিক্ষার বনীয়াদ দৃঢ় হইবে না। একলব্যের মত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান লাভের গোড়ার কথা—আত্মানুসন্ধান। আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, আজ হউক বা দুই দিন পরেই হউক, আত্মচরিত্রের অনেক ত্রুটি ধরা পড়িয়া যাইবে। স্বাস্থ্যের সম্পর্কে এই অনুসন্ধানের ফলে স্বাস্থ্যগত ত্রুটির কথা জানা যাইবে। কিন্তু কেবল জানিলে বা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করা এই অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কোন্ বিষয়ে স্বাস্থ্য আশানুরূপ উন্নত বা সুন্দর নহে, তাহা জানিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

কাহারও সামনে একটা কল চলিতেছে, বেশ চলিতেছে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধ্যে মধ্যে চলায় গোলমাল হইতে লাগিল। তখন কলের চালক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল—কেন চলার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অনুসন্ধানে স্বপন গোলযোগের কারণ ধরা পড়িল, তখন সে তাহা সংশোধন করিয়া দিল। তখন আবার কল রীতিমত চলিতে লাগিল। শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া যতক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে চলিবে, কোন গোলমাল হইবে না, ততক্ষণ স্বাস্থ্য ঠিক অবস্থায় আছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু যখন দেখা যাইবে যে, শরীর-যন্ত্রের সকল অংশের ক্রিয়া ঠিকমত চলিতেছে না, কোন কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। কল চলিবার সময় যদি কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, নূতন কয়লা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কল চলা বন্ধ হইয়া যাইবে। চরকায় যদি ঠিকমত তৈল না দেওয়া হয়, তবে হয় চরকা চলিবে না, আর না হয় বড় বেশী শব্দ হইবে। তখন চরকায় তৈল দিয়া ঠিক করিয়া লইলে চরকা আবার ঠিকমত চলিবে। শরীররূপ কলের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। শারীর-যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজটি উপযুক্ত ভাবে করিবার জন্য স্বাস্থ্য জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের কলকারখানা।

মানুষ বুদ্ধিবলে কত রকমের কলকারখানা তৈয়ার করিয়াছে। তাহার কোনটা সরল, কোনটা জটিল; কোনটা মোটামুটি ধরণের, কোনটা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু শ্রীভগবান মানুষের দেহরূপ এই যে কলটির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার মত জটিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলের ধারণাও মানুষ করিতে পারে না। শরীরকে কল বলিয়া ধরিয়া লইলে নূতন স্বাস্থ্য-শিক্ষার্থীর অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। মানুষের তৈয়ারী অটোম্যাটিক

কলের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ভগবানের তৈয়ারী এই দেহ-যন্ত্রের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। দেহ-যন্ত্রের স্থূল সূক্ষ্ম অংশগুলি ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে উপযুক্ত অবস্থায় থাকিলে দেহযন্ত্রের কাজ বেশ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেহযন্ত্র ও মোটর গাড়ী।

দেহযন্ত্র কিরূপ অবস্থায় থাকা উচিত, এবং তাহার কাজ কিরূপ ভাবে চলা উচিত, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মোটর গাড়ীর দৃষ্টান্তটিই লওয়া যাউক। মনে করুন, একজনের একখানি মোটর গাড়ী আছে। সে তাহার গাড়ীখানি সর্ব্বদা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। গাড়ীর রং মলিন হইয়া গেলে কিম্বা চটিয়া গেলে আবার নূতন করিয়া রং করাইয়া লয়। মোটের উপর, সে তাহার গাড়ীর কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকেই লক্ষ্য রাখে। গাড়ীর কলকব্জা ঠিক অবস্থায় আছে কি না, কোন অংশ ভাঙ্গিয়া কিম্বা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে কি না, কলকব্জাগুলিতে ঠিকমত তৈল দিয়া কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখা, কলকব্জার ভিতর ময়লা জমিয়া আছে কি না, এ সকল বিষয়ে তাহার কোনই লক্ষ্য নাই।

আর একজনের আর একখানি মোটর গাড়ী আছে। সে তাহার গাড়ীর বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য না রাখিলেও তাহার যন্ত্রতন্ত্রগুলির উপর বিলক্ষণ তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। কোন যন্ত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, মিস্ত্রীখানায় পাঠাইয়া ঐ অকর্ম্মণ্য অংশটির বদলে নূতন অংশ বসাইয়া লওয়া, কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মেরামত করানো বা বদলাইয়া দেওয়া, যন্ত্রগুলি যথাবিহিত ভাবে তৈলসিক্ত করিয়া রাখা, ভিতরে ময়লা জমিলে পরিষ্কার করিয়া ফেলা—প্রভৃতি বিষয়ে সে সর্ব্বদাই খুব অবহিত থাকে। এই দুইজনের দুইখানি গাড়ীর মধ্যে কোন্‌টি বেশী কর্ম্মক্ষম—কোনটী অপরটির অপেক্ষা বেশী দূর দৌড়াইতে সমর্থ—ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। যে কলকব্জা ঠিক অবস্থায় রাখিবে, তাহার গাড়ীই বেশী চলিবে। যে কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য লইয়াই ব্যস্ত আছে, তাহার গাড়ী কখন যে অচল হইয়া পড়ে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

জীবন-যাত্রার পথে মানুষ-গাড়ীরও ঠিক এই অবস্থা। অনেক লোকে খুব সৌখিন। সে কেবল তাহার সাজ-পোষাকের উপর দৃষ্টি রাখে। কিসে তাহাকে ভাল দেখায়, ইহাই তাহার একমাত্র কামনা। এজন্য যাহা কিছু করিতে হয়, সে দিকে তাহার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলির দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। যন্ত্রগুলি ঠিক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় থাকে কি না, তাহা সে গ্রাহ্যই করে না।

আবার আর একজন লোক। সে বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপাসক নহে। সে তাহার শরীরের বাহির ও ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াই সন্তুষ্ট। সৌখিন সাজ পোষাক পরিয়া বাহার দিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। কিন্তু দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলি সর্ব্বদা ঠিক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় থাকে কি না, সে দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি আছে। কোন দেহযন্ত্র একটু বিকৃত হইয়াছে সন্দেহ হইলেই, সে দেহযন্ত্রের মিস্ত্রী ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, কিম্বা মিস্ত্রীখানায় অর্থাৎ হাসপাতালে চলিয়া যায়। বিকৃত দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ মেরামত অর্থাৎ সুস্থ না হইলে সে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। এখন জীবন-যাত্রার পথ-যাত্রী এই দুই ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করুন্। কোন্ ব্যক্তি আপনার সমধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, তাহা কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে! মোটর গাড়ী খানিকে ঠিকমত অবস্থায় রাখিতে হইলে, মোটরের ভিতরকার যন্ত্র-তন্ত্র সম্বন্ধে তাহার অধিকারীর মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাহাতে সে, উহার কোন বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রী লাগাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। মানুষ-গাড়ীকেও জীবন-যাত্রার পথে দীর্ঘপথ ভ্রমণের উপযোগী করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-তন্ত্রাদির ও তাহাদের কার্য্য প্রণালীর সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়

অজ্ঞতার অশেষ দোষ

শারীর-যন্ত্রের সংস্থান, তাহাদের ক্রিয়া, তাহাদের কর্ম্মক্ষম অবস্থা বা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে মানুষকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। শরীরের কোন যন্ত্র বিকল হইলে সে একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা সে নিজে স্থির করিতে না পারিয়া অপরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। এবং যে যাহা পরামর্শ দেয়, তাহাই নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা করে। পরামর্শ ভাল কি মন্দ, তাহাতে তাহার হিত কিম্বা অহিত হইবে—কিছু জানা না থাকায়, সে তাহা স্থির করিতে পারে না। সাধারণতঃ মানুষ এইরূপ অজ্ঞ বলিয়া পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসাটি ভাল চলে। কারণ পেটেণ্ট ঔষধওয়ালারা তাহাদের পেটেণ্ট ঔষধের শতমুখে এমন সুখ্যাতি করিয়া থাকে যে, তাহা পড়িয়া অজ্ঞ লোকের তাহাতে অবিশ্বাস করা খুবই কঠিন হয়। কেবল পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করা নয়—সকল লোকের সকল প্রকার কু-পরামর্শই সে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। সকল লোকে তাহাকে একই রকম পরামর্শ দেয় না বা দিতে পারে না। এই সকল পরামর্শের পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যও থাকে না। সুতরাং আজ হয়ত এক জনের পরামর্শ শুনিয়া সে যে কাজ করিল, কাল অপর লোকের পরামর্শে সে হয় ত ঠিক তাহার উল্টা কাজ করিয়া বসিবে। এইরূপে সে একের পর আর একটা কাজ এমন ভাবে করিয়া যাইতে থাকে যে, তাহার চালচলন প্রায় উন্মাদ লোকের মতন হইয়া দাঁড়ায়।

অষ্টম অধ্যায়

স্বাস্থ্যসেবকের দায়িত্ব।

যাঁহারা রোগীর সেবারূপ মহৎ ব্রত গ্রহণ করিবেন—রোগীর প্রতি তাঁহাদের যেমন দায়িত্ব থাকিবে, নিজের প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থাকিবে। সেই কর্ত্তব্য পালনে যেমন দায়িত্ব আছে, সেইরূপ অসীম আনন্দও আছে। সেবাধর্ম্ম ঠিকমত পালন করিতে হইলে কি করিয়া সেবা করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। কি কি কারণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়া লইতে হইবে। তৎসহ নিজের আচার ব্যবহার ও অভ্যাসগুলিকে সেই অভিজ্ঞতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। তাছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের সেবার দরকার হইবে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থায় কি কি করা দরকার তাহাও তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এই সকল শিক্ষা করিতে কত যে আনন্দ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কত পীড়িত ব্যক্তি সেবকের সেবার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। কত রোগী রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সেবক-সেবিকার প্রতীক্ষা করিবে—যন্ত্রণার একটু লাঘবের জন্য, দুইটা সহানুভূতির, আশ্বাসের মিষ্ট বাণী শুনিবার জন্য। কেবল সময়ে ঔষধ ও পথ্য দেওয়াই সেবকের কাজ নয়। জীবনে হতাশ্বাস রোগীকে আশ্বাস, আশা, ভরসা দেওয়া সেবকের কাজ। কথার কাঙ্গাল রোগীকে গল্প বলিয়া প্রীত রাখিতে হয়। স্বল্প ত্রুটিতে বিরক্ত উগ্র প্রকৃতির রোগী রোগের যন্ত্রণায় আরও খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়া থাকে। তাহার সেবার সময় সেবককে নিজের মন সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিয়া সংযত ভাবে কাজ করিতে হয়। রোগী তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া রোগীর মন যাহাতে প্রসন্ন হয় ও থাকে তাহা করিতে হইবে। বিকারগ্রস্ত রোগী কোন অসম্ভব দাবী করিয়া বসিলে শিশুর ন্যায় তাহাকে নানা উপায়ে ভুলাইতে হয়। সেবককে সর্ব্বাগ্রে নিজেকে এই ভাবে তালিম দিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। তিনি হইবেন প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, সংযত-চরিত্র, সহিষ্ণু, রিপুজয়ী, সহানুভূতিপরায়ণ, উপস্থিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সেবানিপুণ। কেবল অর্থের খাতিরে নহে, কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে নহে—বিশ্বমানবতার খাতিরে—বিশ্বপ্রেমের খাতিরে—

কলের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ভগবানের তৈয়ারী এই দেহ-যন্ত্রের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। দেহ-যন্ত্রের স্থূল সূক্ষ্ম অংশগুলি ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে উপযুক্ত অবস্থায় থাকিলে দেহযন্ত্রের কাজ বেশ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেহযন্ত্র ও মোটর গাড়ী।

দেহযন্ত্র কিরূপ অবস্থায় থাকা উচিত, এবং তাহার কাজ কিরূপ ভাবে চলা উচিত, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মোটর গাড়ীর দৃষ্টান্তটিই লওয়া যাউক। মনে করুন, একজনের একখানি মোটর গাড়ী আছে। সে তাহার গাড়ীখানি সর্ব্বদা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। গাড়ীর রং মলিন হইয়া গেলে কিম্বা চটিয়া গেলে আবার নূতন করিয়া রং করাইয়া লয়। মোটের উপর, সে তাহার গাড়ীর কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকেই লক্ষ্য রাখে। গাড়ীর কলকব্জা ঠিক অবস্থায় আছে কি না, কোন অংশ ভাঙ্গিয়া কিম্বা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে কি না, কলকব্জাগুলিতে ঠিকমত তৈল দিয়া কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখা, কলকব্জার ভিতর ময়লা জমিয়া আছে কি না, এ সকল বিষয়ে তাহার কোনই লক্ষ্য নাই।

আর একজনের আর একখানি মোটর গাড়ী আছে। সে তাহার গাড়ীর বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য না রাখিলেও তাহার যন্ত্রতন্ত্রগুলির উপর বিলক্ষণ তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। কোন যন্ত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, মিস্ত্রীখানায় পাঠাইয়া ঐ অকর্ম্মণ্য অংশটির বদলে নূতন অংশ বসাইয়া লওয়া, কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মেরামত করানো বা বদলাইয়া দেওয়া, যন্ত্রগুলি যথাবিহিত ভাবে তৈলসিক্ত করিয়া রাখা, ভিতরে ময়লা জমিলে পরিষ্কার করিয়া ফেলা—প্রভৃতি বিষয়ে সে সর্ব্বদাই খুব অবহিত থাকে। এই দুইজনের দুইখানি গাড়ীর মধ্যে কোন্‌টি বেশী কর্ম্মক্ষম—কোনটী অপরটির অপেক্ষা বেশী দূর দৌড়াইতে সমর্থ—ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। যে কলকব্জা ঠিক অবস্থায় রাখিবে, তাহার গাড়ীই বেশী চলিবে। যে কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য লইয়াই ব্যস্ত আছে, তাহার গাড়ী কখন যে অচল হইয়া পড়ে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

জীবন-যাত্রার পথে মানুষ-গাড়ীরও ঠিক এই অবস্থা। অনেক লোকে খুব সৌখিন। সে কেবল তাহার সাজ-পোষাকের উপর দৃষ্টি রাখে। কিসে তাহাকে ভাল দেখায়, ইহাই তাহার একমাত্র কামনা। এজন্য যাহা কিছু করিতে হয়, সে দিকে তাহার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলির দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। যন্ত্রগুলি ঠিক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় থাকে কি না, তাহা সে গ্রাহ্যই করে না।

আবার আর একজন লোক। সে বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপাসক নহে। সে তাহার শরীরের বাহির ও ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াই সন্তুষ্ট। সৌখিন সাজ পোষাক পরিয়া বাহার দিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। কিন্তু দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলি সর্ব্বদা ঠিক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় থাকে কি না, সে দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি আছে। কোন দেহযন্ত্র একটু বিকৃত হইয়াছে সন্দেহ হইলেই, সে দেহযন্ত্রের মিস্ত্রী ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, কিম্বা মিস্ত্রীখানায় অর্থাৎ হাসপাতালে চলিয়া যায়। বিকৃত দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ মেরামত অর্থাৎ সুস্থ না হইলে সে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। এখন জীবন-যাত্রার পথ-যাত্রী এই দুই ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করুন। কোন্ ব্যক্তি আপনার সমধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, তাহাও কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে! মোটর গাড়ীখানিকে ঠিকমত অবস্থায় রাখিতে হইলে, মোটরের ভিতরকার যন্ত্র-তন্ত্র সম্বন্ধে তাহার অধিকারীর মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাহাতে সে, উহার কোন বিগড়ি ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রী লাগাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। মানুষ-গাড়ীকেও জীবন-যাত্রার পথে দীর্ঘপথ বহনোপযোগী করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-তন্ত্রাদির ও তাহাদের কার্য্য প্রণালীর সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়

অজ্ঞতার অশেষ দোষ

শরীর-যন্ত্রের সংস্থান, তাহাদের ক্রিয়া, তাহাদের কর্ম্মক্ষম অবস্থা বা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে মানুষকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। শরীরের কোন যন্ত্র বিকল হইলে সে একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা সে নিজে স্থির করিতে না পারিয়া অপরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। এবং যে যাহা পরামর্শ দেয়, তাহাই নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা করে। পরামর্শ ভাল কি মন্দ, তাহাতে তাহার হিত কিম্বা অহিত হইবে—কিছু জানা না থাকায়, সে তাহা স্থির করিতে পারে না। সাধারণতঃ মানুষ এইরূপ অজ্ঞ বলিয়া পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসাটি ভাল চলে। কারণ পেটেণ্ট ঔষধওয়ালারা তাহাদের পেটেণ্ট ঔষধের শতমুখে এমন সুখ্যাতি করিয়া থাকে যে, তাহা পড়িয়া অজ্ঞ লোকের তাহাতে অবিশ্বাস করা খুবই কঠিন হয়। কেবল পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করা নয়—সকল লোকের সকল প্রকার কু-পরামর্শই সে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। সকল লোকে তাহাকে একই রকম পরামর্শ দেয় না বা দিতে পারে না। এই সকল পরামর্শের পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যও থাকে না। সুতরাং আজ হয়ত এক জনের পরামর্শ শুনিয়া সে যে কাজ করিল, কাল অপর লোকের পরামর্শে সে হয় ত ঠিক তাহার উল্টা কাজ করিয়া বসিবে। এইরূপে সে একের পর আর একটা কাজ এমন ভাবে করিয়া যাইতে থাকে যে, তাহার চালচলন প্রায় উন্মাদ লোকের মতন হইয়া দাঁড়ায়।

অষ্টম অধ্যায়

স্বাস্থ্যসেবকের দায়িত্ব।

যাঁহারা রোগীর সেবারূপ মহৎ ব্রত গ্রহণ করিবেন—রোগীর প্রতি তাঁহাদের যেমন দায়িত্ব থাকিবে, নিজের প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থাকিবে। সেই কর্ত্তব্য পালনে যেমন দায়িত্ব আছে, সেইরূপ অসীম আনন্দও আছে। সেবাধর্ম্ম ঠিকমত পালন করিতে হইলে কি করিয়া সেবা করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। কি কি কারণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়া লইতে হইবে। তৎসহ নিজের আচার ব্যবহার ও অভ্যাসগুলিকে সেই অভিজ্ঞতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। তাছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের সেবার দরকার হইবে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থায় কি কি করা দরকার তাহাও তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এই সকল শিক্ষা করিতে কত যে আনন্দ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কত পীড়িত ব্যক্তি সেবকের সেবার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। কত রোগী রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সেবক-সেবিকার প্রতীক্ষা করিবে—যন্ত্রণার একটু লাঘবের জন্য, দুইটা সহানুভূতির, আশ্বাসের মিষ্ট বাণী শুনিবার জন্য। কেবল সময়ে ঔষধ ও পথ্য দেওয়াই সেবকের কাজ নয়। জীবনে হতাশ্বাস রোগীকে আশ্বাস, আশা, ভরসা দেওয়া সেবকের কাজ। কথায় কাঙ্গাল রোগীকে গল্প বলিয়া প্রীত রাখিতে হয়। স্বল্প ত্রুটিতে বিরক্ত উগ্র প্রকৃতির রোগী রোগের যন্ত্রণায় আরও খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়া থাকে। তাহার সেবার সময় সেবককে নিজের মন সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিয়া সংযত ভাবে কাজ করিতে হয়। রোগী তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া রোগীর মন যাহাতে প্রসন্ন হয় ও থাকে তাহা করিতে হইবে। বিকারগ্রস্ত রোগী কোন অসম্ভব দাবী করিয়া বসিলে শিশুর ন্যায় তাহাকে নানা উপায়ে ভুলাইতে হয়। সেবককে সর্ব্বাগ্রে নিজেকে এই ভাবে তালিম দিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। তিনি হইবেন প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, সংযত-চরিত্র, সহিষ্ণু, রিপুজয়ী, সহানুভূতিপরায়ণ, উপস্থিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সেবানিপুণ। কেবল অর্থের খাতিরে নহে, কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে নহে—বিশ্বমানবতার খাতিরে—বিশ্বপ্রেমের খাতিরে—

তিনি মনে-প্রাণে হইবেন সেবক। অনেক বিরক্তিকর ব্যাপারের সংস্রবে তাঁহাকে আসিতে হইবে। সেবা কার্য্যে কোনরূপ ভুলচুক হইলে রোগীরও সর্ব্বনাশ—সেবকেরও সর্ব্বনাশ। সর্ব্বোপরি সেবকের নিজের শরীর সর্ব্বদা সুস্থ রাখিতে হইবে। নিজের শরীর সুস্থ রাখা সেবকের সর্ব্বাপেক্ষা সেবা-দক্ষতার পরিচয়। ডাক্তার রোগীর লক্ষণ দেখিয়া রোগীর শরীর ও রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াই খালাস। কিন্তু রোগীকে বাঁচাইবার প্রকৃত ভার সেবকের উপর। রোগীর শরীর ও মন স্বচ্ছন্দে রাখা তাঁহার কাজ। এই কাজটি যিনি যে পরিমাণ সফলতার সহিত করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে দক্ষ সেবক। কেবল কতকগুলা সেবা-তত্ত্বের শুষ্ক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট সেবক হওয়া যায় না। সেবাধর্ম্ম ও সেবাকার্য্যের অন্তরতম গূঢ় মর্ম্মটি তাঁহার জানা থাকা আবশ্যক। যে অবস্থায় যাহা করা হইতেছে, তাহার কারণ কি—কেন তাহা করা হইতেছে, এটী জানা না থাকিলে, সকল সময়ে সকল কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে করিয়া উঠা যায় না। পুঁথিগত বিদ্যায় যেখানে কুলায় না এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িলে অনভিজ্ঞ সেবক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন; কিন্তু সেবাধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ সেবক সেইরূপ কঠিন অবস্থায়ও একটা না একটা সদুপায় বাহির করিয়া অনেক সময়ে সাংঘাতিক বিপদ কাটাইয়া রোগীর প্রাণরক্ষা ও সেবাধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে পালন করিতে পারিবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, সেবকের দক্ষতার উপরেই রোগীর প্রাণ প্রধানতঃ নির্ভর করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি রোগীর প্রয়োজন বুঝিয়া এমন সুব্যবস্থা করিতে পারেন, যাহাতে রোগী অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সেবকের সেবা কার্য্যের পুরস্কার সেবা। রোগী তাহার প্রাণের জন্য সেবকের সেবা-যত্নের কাছে ঋণী—এই বিশ্বাস ও সন্তোষ সেবকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অর্থের দ্বারা সেবাধর্ম্মের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। চিকিৎসকের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গেলেই সেবকের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না—এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ, রোগীর অবস্থার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। চিকিৎসক সর্ব্বক্ষণ রোগীর কাছে বসিয়া থাকিয়া সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। রোগীর কাছে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে সেবককেই, এবং রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের ধাক্কা প্রধানতঃ তাঁহাকেই সামলাইতে হইবে, এবং প্রয়োজন বুঝিলে চিকিৎসককে সংবাদ পাঠাইতে হইবে। যিনি এই সকল কাজ যতটা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনিই সেই অনুপাতে যোগ্য সেবক।

এই সেবাধর্ম্ম অতি পবিত্র ধর্ম্ম। ইহা সেবার মনুষ্যত্বের সাধনা। রোগ-শোক-আধি-ব্যাধি-পীড়িত এই বিশ্বসংসার। ইহার দুঃখ-দুর্দ্দশা যতটা কমাইতে পারা যায়, ততটাই মানবতার বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি এই বিকাশের সহায়তা করেন, সেই সেবক সর্ব্বজনের নমস্য। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করেন।

নবম অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার তাহার সুপ্রয়োগ করিতে পারিলেই তবে সেই জ্ঞান অর্জ্জন করা সার্থক হয়। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রণালী এমনই অব্যবস্থিত যে, বিদ্যালয়ে বা কলেজে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহার অধিকাংশ শিক্ষিত আমাদের কর্ম্ম-জীবনে কোনই কাজে লাগে না। যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অবসর পাওয়া যায় না, সে শিক্ষা লাভ করা না করা সমান। সে শিক্ষা একেবারেই ব্যর্থ। যে জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সেই জ্ঞান লাভ করাই সার্থক। বস্তুতঃ প্রয়োগের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। যিনি যত্ন করিয়া সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যদি কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ না করেন, তিনি প্রয়োগের অবসর না পান, তাহা হইলে সে শিক্ষা

বৃথা হইয়া যায়। সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিবার পর সেবককে পূর্ণ উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; এবং তাহাতে অসীম আনন্দ লাভ করিবেন। শিক্ষা যে যথার্থই লাভ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা হয় কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগের দ্বারা। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা, দোষ, ত্রুটী, ভ্রান্ত শিক্ষা—এ সমস্তই ধরা পড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)

যৌবন-রক্ষা

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল।]

যৌবনকাল পরম রমণীয়। জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে কোন এক যাদুকরের অজ্ঞাত মোহন দণ্ড প্রভাবে, বিশ্বের সকল দৃশ্য-পট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণোন্মাদক নূতন রঙে সমস্ত জগৎ রঞ্জিত হইয়া উঠে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে হৃদয়তন্ত্রী কি যেন এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠে—অন্তরের যাবতীয় বৃত্তি পরিপূর্ণ গতিতে উদ্দামভাবে বৃদ্ধিতে চায়, এবং নূতন আশা নূতন উদ্যম, নূতন শক্তি লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রাণ অনন্ত বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া কি এক সার্থকতা খুঁজিতে থাকে। মানুষের কামনা সাধনা সকলেরই পরিচালনা ও পরিতৃপ্তির সময় এই। শারীরিক যন্ত্র ও স্নায়ুসমূহের বিশেষ ও শক্তিশালী অবস্থার জন্য এবং মনের বিচিত্রতার নিমিত্ত ভোগ-সুখের তীব্র আস্বাদনের সময়ও যেমন এই, সুনির্দ্দিষ্টভাবে পরিচালিত হইলে তেমনি সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন ও আত্মানুশীলনেরও ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এই শক্তি,—এই অবস্থাটী হারাইলে, মানুষ বড় কিছু করিতে পারে না। যিনি জগতে যত বড় হইয়াছেন, সকলেরই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এই যৌবনে এবং এই সময়েই তাঁহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজসমূহ করিয়াছেন।

সুতরাং এই যৌবনকাল বাঁধিয়া রাখিতে কাহার না প্রাণে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা হয়? কে না ইহার কথা প্রাণের ভিতর তীব্রভাবে অনুভব করে? প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া কে না একবার তৃষিত দৃষ্টিতে ইহার দিকে ফিরিয়া চায়? কিন্তু হায়! আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতাই আছে; কিন্তু কাজ নাই। এবং সে-জাতীয় চেষ্টাও আমরা জানি না। কৃচ্ছ্র-সাধনা বলে বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৌবনকে চিরদিনের মত বাঁধিয়া রাখা যায় কি না, তাহার মধ্যে যদিও কোনরূপ প্রশ্ন থাকে, কিন্তু অধ্যবসায়, জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রভাবে যৌবনকে যে নির্দ্দিষ্টকালের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা এবং কি নিয়মে কাজ করিলে আমরা এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

যৌবনকে স্থির ও অবিকৃত রাখার জন্য মন ও চিন্তাশক্তির প্রভাবই সকলের উপর। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে সর্ব্বদার জন্য এইভাবে তৈয়ারী রাখিবে যে, 'আমি কখনও যৌবন হারাইব না, বৃদ্ধ হইব না। প্রথম যৌবনে আমি যেমন ছিলাম তেমনটীই আছি, আমার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে নাই'। দিন, মাস, বছর চলিয়া যাইবে, কিন্তু নিজের জরা মরণের চিন্তা যেন মুহূর্ত্তের জন্য না আসে। সর্ব্বদা যৌবনোচিত স্ফূর্ত্তি ও সুখভোগ করিতে চেষ্টা করিবে এবং জোরপূর্ব্বক একান্ত মনঃসংযোগ-সহকারে মনের মধ্যে যৌবনের স্ফূর্ত্তি

আনিবে। সর্ব্বদাই যেন এই অটল বিশ্বাস থাকে যে আমার যৌবন কখনও হারাইব না।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" চিন্তা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই যৌবন রক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে অসামান্য তাহা এইভাবে কিছুদিন কাজ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন"Would you always remain young and would you carry all joy and buoyancy of youth into your maturer years? Then have care concerning but one thing—how you live in your thought world." যদি তুমি পরিণত বয়সেও যৌবনোচিত সকল আনন্দ পাইতে ও যুবক থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে একটী কথা মাত্র স্মরণ রাখিবে যে, চিন্তা-জগতের সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইও। সর্ব্বদা কিশোর ও বালকদের সঙ্গে খেলা করিবে ও প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সহিত মিশিবে। যুবকের মত নিজের প্রাণটী সরস ও বালকের মত কোমল রাখিবে। দিনের পর দিন মনে করিবে "আমি ক্রমশঃ পূর্ণযৌবন অবস্থায় যাইতেছি।" শিশু ও বালকদিগকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবে এবং তাহাদের কোলে করিবে; ইহাতে শরীর ও মনের গ্লানি অচিরাৎ দূরীভূত হইয়া প্রাণ এক যৌবনসুলভ নূতন রসে অভিষিক্ত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পবিত্র ও সাত্ত্বিক ভাবে জীবনযাপন করা যৌবন-রক্ষা বিষয়ে প্রধান সহায়। শরীর ও মন পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু ও হীন বৃত্তি সকলের পরিচালনায়, শরীরস্থ রক্তের গতি দূষিতভাবে চালিত হয়। আমাদের মুখমণ্ডলের স্নায়ুআদি সুকুমার তন্তু সকল বিকৃত ভাবাপন্ন করে এবং আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র জরাগ্রস্ত করিয়া তুলে। এই জন্য এই সব দুষ্প্রবৃত্তি যে শুধু আমাদের শ্রী ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে তাহা নহে, অকালে জরা-মৃত্যুও আনিয়া থাকে। ইহা আনুমানিক মত নহে, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। যে লোক সর্ব্বদা হিংসা ক্রোধাদি সম্পন্ন, যাহার জীবন কদর্য্যভাবে পরিচালিত, তাহার দিকে চাহিলেই ইহার সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই সব রিপু ও কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে জীবনকে চালিত করিবে, মনোমধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি স্থান দিবে না। দয়া, ক্ষমা, পরোপকার ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলির সম্যক অনুশীলনে যত্নবান হইবে। এই সব সৎপ্রবৃত্তি অনুশীলনে আমাদের নাড়ী (nerve), শিরা, ধমনী ইত্যাদিতে ও রক্তের ভিতরে এক নূতন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকিবে, যাহাতে আমাদের মুখে, চোখে সর্ব্বাঙ্গে এক নূতন শ্রী, নূতন ভাব, নূতন শক্তি বিকাশ হইতে থাকিবে এবং আমাদের স্বাস্থ্য ও যৌবন শ্রী বহুদিন পর্য্যন্ত অটুট রাখিবে। এই জন্য মিতাচারী ভগবদ্ভক্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের যৌবন ও সৌন্দর্য্য দীর্ঘ যোগসাধনায়ও বহুকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে; এ ইহার সত্যতা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃত জ্ঞানের সহিত আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করি চেষ্টা দ্বারা সকলেই এইভাবে নিজের জীবন গঠি করিতে পারেন; এবং যিনি যতটুকু পারিবেন সেই পরিমাণেই ফলভাগী হইবেন, কাহারও নি হইবার কোন কারণ নাই।

তৃতীয়তঃ, গুরুবাক্য ও যোগশাস্ত্র হইতে কয়ে নিয়ম এখানে উদ্ধৃত করা হইল, যাহা একাগ্র ও যত্নসহকারে পালন করিলে আমরা নিশ্চয়ই স্ব বাম হইব এবং এই সব অমূল্য উপদেশের দি দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব।

১। দিবাভাগে বাম নাসিকায় ও রাত্রিতে নাসিকায় শ্বাস-বহন রাখিতে চেষ্টা করিবে। আমাদের স্বাস্থ্য ও যৌবন বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিবে। এজন্য প্রথম প্রথম দিবাভাগের দক্ষিণ নাসিকা পরিষ্কৃত তুলা দ্বারা বন্ধ করি

৪বার নাসিকায় শ্বাস বহন করিতে চেষ্টা করিবে। এইটু একটু করিয়া এ অভ্যাস করিতে হয় এবং কিছু-দিন এই অভ্যাস করিলে শেষে আপনা হইতেই এইরূপ নিশ্বাস বহিতে থাকিবে। রাত্রিতে বাম পার্শে ফিরিয়া শয়ন করিবে; তাহাতে কিছুক্ষণ বাদেই দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে। এইরূপে সমস্ত রাত্রি বাম দিকে শয়ন করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন করিতে চেষ্টা করিবে। অভ্যাস দ্বারা অনায়াসেই ইহা সহজসাধ্য হইবে। স্বর শাস্ত্রোক্ত ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং সকলেই ইহা ভক্তিসহকারে পালন করিতে চেষ্টা করিবে।

২। প্রত্যহ দুইবেলা আহারান্তে ৮।১০ মিনিট পর্য্যন্ত একটু শক্ত চিরুণীর দ্বারা মাথার চুল জোরে বাঁচড়াইবে। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখিবে এবং অকালে মাথার চুল উঠিবে না বা চুল পাকিবে না।

৩। চোখের জ্যোতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রত্যহ প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মুখের ভিতর সম্পূর্ণরূপে জল দ্বারা পুরিয়া চোখে ৮।১০ বার শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিবে। পরে একবার ঐ জলে কপালটী ডুবাইয়া ফেলিয়া পুনরায় ৭।৮ বার চোখে ঐরূপে জলের ঝাপটা দিবে। প্রত্যহ স্নান করিবার সময় দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের কয়েক ধারে একটু তেল দিয়া পরে অন্যান্য স্থানে তৈল মর্দ্দন করিবে। এতদ্ভিন্ন চোখের অন্যান্য সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিবে। ইহাতে কোনও দিন চোখের জ্যোতি খারাপ হইবে না বা কোনরূপ চোখের ব্যারাম হইতে পারিবে না।

৪। যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিবে ততবারই যতক্ষণ ঐ কার্য্য শেষ না হয় ততক্ষণ দুই পাটি দাঁতে দাঁতে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে; ইহাতে দাঁত নড়িবে না বা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও দাঁতের কোন অসুখ হইবে না। স্বাস্থ্য সমাচারের নিয়মিত পাঠকগণ দন্তরক্ষার অন্যান্য স্বাস্থ্যের নিয়ম অবগত আছেন। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

৫। যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয় চালনায় ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও কার্য্যক্ষম অবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। এই জন্য একটী নিয়ম সর্ব্বতোভাবে সকলে প্রতিপালন করিবে। যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিবে ততবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ বামহস্তের দ্বারা দৃঢ়মুষ্টিতে কোষদ্বয় শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। ইহাতে ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য অকালে কিছুতেই ঘটিতে পারিবে না।

মহাজন মুখনিঃসৃত ও শাস্ত্রোক্ত এই সব নিয়মগুলি মহামূল্যবান এবং ইহার প্রত্যেকটীই পরীক্ষিত সত্য। তবে সর্ব্বদাই আমাদিগকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে একদিনে বা একবারেই কোন একটী কার্য্যের চরমফল লাভ করা যায় না। আমাদের চিত্তের স্থিরতা ও দৃঢ়তার একান্ত অভাব; দু'একদিন কোন কার্য্য করিয়াই তাহার ফল না পাইলে অমনি অধীর হই ও বিশ্বাস হারাই, চিত্তের দৃঢ়তাও থাকে না। সুতরাং কোন বিষয়ে আমরা সফলকামও হইতে পারি না। তার পর সকল কার্য্যের পক্ষে ভক্তি ও বিশ্বাস এই দুটী বড় মূল্যবান জিনিষ। ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং একাগ্রতা হইতেই will force বা ইচ্ছা শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তিই সকল কার্য্যের প্রাণ। এই শক্তির অভাবেই আমরা প্রতিপদে বিফল-মনোরথ হই এবং এই শক্তি যেখানে যে অনুপাতে আছে কার্য্যের ফল সেখানে সেই অনুপাতে অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রোক্ত এই সব স্বাস্থ্যের নিয়মগুলিতে আস্তিক্যবোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া একান্তচিত্তে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলিলে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে ইহার মহিমা ও আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মুগ্ধ হইব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই।

চতুর্থতঃ, ব্রহ্মচর্য্য পালন যৌবন স্থির রাখার প্রধান সহায়। যাহার শুক্রধাতু অবিকৃত ও পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাহার রক্ত, স্নায়ু, মাংসপেশী নাড়ী ইত্যাদি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও সতেজ অবস্থায় থাকে এবং দেহস্থিত যন্ত্র-সমুদায় উপযুক্ত অবস্থায় থাকে, সহসা জরা, ব্যাধি, ইত্যাদি আক্রমণ করিতে পারে না। সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন। সুতরাং সর্ব্ব-

প্রযত্নে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আজকাল, অকালবার্দ্ধক্য, রোগ, মৃত্যুর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে। "যৌবন করিয়া ব্যয় বয়সে কাঙ্গাল" এই বাক্যটি অতি মূল্যবান। যৌবনে সাবধান না হইয়া অত্যাচার করাতেই, আমরা শীঘ্র শীঘ্র যৌবন হারাইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ি। তখন ভবিষ্যতের চিত্র কিছুতেই আমাদের মনে স্থান পায় না। জীবনের সারভূত এই শুক্রধাতু অবৈধ অত্যাচারে অযথা নষ্ট করিলে, অতি শীঘ্রই জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে এবং অকালে বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ আসিয়া দেখা দেয়।

ইহার প্রমাণ চারিদিকে—কোনই অভাব নাই। ব্রহ্মচর্য্যপালন বিবাহিত জীবনেও হয়; সুতরাং সকলেই সর্ব্বাগ্রে এইদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যিনি যে পরিমাণে এই ব্রত সাধন করিবেন তিনি সেই পরিমাণে ফলভোগী হইবেন।

এতদ্ভিন্ন, কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ পালন করিতে হইবে; যৌবনরক্ষার্থে এগুলিও একান্ত প্রয়োজনীয়।

ক। প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করার পরই এক-গ্লাস পরিষ্কৃত শীতল জল নাসারন্ধ্র দ্বারা পান করিবে। এই নাসাপান আয়ুর্ব্বেদ মতে পরম উপকারী। নিয়মিত ভাবে ইহা পালন করিলে ইহা রাসায়নিক কার্য্য করে এবং জরা পলিত অবস্থা ইত্যাদি দূর করিয়া যৌবনসুলভ সামর্থ্য ও শ্রী প্রদান করে। বরাবর এই নিয়মটী পালন করিলে কিছুতেই অকালবার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই নাসাপান অভ্যাস করা কোনই গুরুতর ব্যাপার নহে। একটু একটু করিয়া চেষ্টা করিলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই অনায়াসে ইহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

খ। প্রত্যহ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে শারীরিক ব্যায়াম করিবে। শরীরকে সুস্থ, সুদৃঢ় ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে ব্যায়ামের মতন আর কিছুই নাই। নিয়মিত ব্যায়ামকারীকে সহসা জরা আক্রমণ করিতে পারে না। যৌবনোচিত শক্তি, গঠন ও সৌন্দর্য্য বহুদিন তাহাদের দেহে অব্যাহত থাকে। ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। অশিক্ষিত ইতরশ্রেণী শারীরিক পরিশ্রমের জন্য দীর্ঘ দিন পর্য্যন্তও কেমন সবল ও সুন্দর থাকে, বৃদ্ধবয়সেও শারীরিক সামর্থ্য হারায় না। আর আমরা ভদ্রশ্রেণী এই ব্যায়ামবিমুখ হইয়া অল্পকালের মধ্যেই ভুঁড়িযুক্ত, লোলচর্ম্ম এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। ইচ্ছাশক্তির সহিত নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিলে ইহার ফল অসামান্য, ইহাতে আমাদের যে সময় নষ্ট বা অন্য ক্ষতিও হয় না। কিন্তু হায়, আমাদের এমন শিক্ষা এমনি অভ্যাস এবং আলস্য যে আমরা এই মহামূল্য জিনিষে একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকি। প্রত্যহ মাত্র ১০।১৫ মিনিট ব্যায়াম করিলে আমরা ব্যায়ামের সুফল সম্যক লাভ করিতে পারি এবং কে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্য হইতে এই ১০।১৫ মিনিট কাল ব্যয় করিতে না পারেন? যিনি কর্ম্ম জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে ঐ সামান্য সময় ব্যয় করিয়া শারীরিক ব্যায়াম করিতে কাহারও আটকায় না এবং ইহা দ্বারাই তিনি আশাতীত ফল পাইতে পারেন। তবে এ বিষয়ে চাই শুধু একাগ্রতা, নিয়মনিষ্ঠা ও প্রফুল্লতা।

গ। তৈলাভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে রাখিবে। অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন দ্বারা চর্ম্ম মধ্যে সতেজ, মাংসপেশী, স্নায়ু প্রভৃতি কার্য্যক্ষম থাকে এবং এই জন্য চর্ম্মের লোলতা ইত্যাদি জরাবস্থা সহসা আসিতে পারে না। তৈলমর্দ্দন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে ঘৃতের চেয়ে তৈলের উপকারিতা আরও বেশী, কিন্তু ভক্ষণে নহে—মর্দ্দনে। কিন্তু হায়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অনুকরণের কল্যাণে আমাদের এই প্রথা প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে। আজকাল আর প্রায় কাউকে তৈল মর্দ্দন করিতে দেখা যায় না, অনেকেই ইহা অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিদ্রূপের চোখে দেখিয়া থাকেন।

ঘ। মধ্যে মধ্যে উপবাস ও ফলমূলাদি আহার স্বাস্থ্য ও যৌবনের পক্ষে একান্ত অনুকূল। এজন্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যে একাদশীর উপবাস ও

অন্য অন্য উপবাসাদির ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ উপবাস দ্বারা জঠরাগ্নি দীপ্ত ও শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ সতেজ থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি সাম্যভাবে থাকায় আমাদের স্বাস্থ্যের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ বিধান হইয়া থাকে। যৌবনরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য উপবাস ও মিতাচার প্রধান সহায় বলিয়া মনে রাখিবে। আমরা বর্ত্তমানে অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িয়াছি—এই সব শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্মও বুঝি না বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না এবং ইহারই ফলে অকালে জরাগ্রস্ত ও নানা ব্যাধিযুক্ত হইয়া পড়িতেছি।

ফলমূল আহার একান্ত মঙ্গলজনক। বড় বড় ডাক্তারের মত সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন শুধু ফলমূল খাইয়া থাকিলে স্বাস্থ্য ও যৌবনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়। সুপক্ক টাট্‌কা ফলই প্রশস্ত এবং এই ফলমূল আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান অংশ হওয়া উচিত। শিক্ষার অভাবেই হউক আর বিকৃত রুচির জন্যই হউক আমরা এখন বাজে খাবার পচা তৈল ও ঘৃতে ভাজা বাসি ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি খাইতে অভ্যস্ত হইতেছি; ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ অর্থে উৎকৃষ্ট ফলমূল যে সময়ের যা তাহা অনায়াসে খাইতে পারি এবং উহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

২৪ পরগণায় পল্লী-সংগঠন আন্দোলন।

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম ও বাঁকুড়াকে বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম (most decaying) জেলা আখ্যা দিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলাটীকেও ঐ পর্য্যায়ভুক্ত করিলে কোন দোষ হইত না। কলিকাতার মত বড় সহরের নিকটবর্ত্তী এই জেলাটীর যা কিছু কৃষি ও শিল্পসম্পদ আছে, সমস্তই কলিকাতায় হুবহু চালান হয়। গ্রামে গ্রামে দুধ ও মাছ যেমন অপ্রতুল হইতেছে, দৈনিক যাত্রী (daily passenger) রেলওয়ানীর সংখ্যা তেমনি বাড়িতেছে। আমার কার্য্যোপলক্ষে যাইয়া দ্বিপ্রহরে এমন অনেক গ্রাম দেখিয়াছি যাহাতে পুরুষ একটীও গৃহে নাই—কেবল গ্রাম্য ডাক্তার, নাপিত ও ধোপা এখনও বাস্তুর মায়া ছাড়াইতে পারে নাই অথবা সহরে তেমন বিশেষ সুবিধা নাই তাই বাটী আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। অনেক গ্রামেই বিড়ির ও পানের দোকান দেখিয়াছি—চায়ের দোকানও দেখি নাই বলিতে পারি না। অনেক গ্রামে দেখিয়াছি শনি ও রবিবারে যুবকেরা অনন্যকর্ম্মা হইয়া নাটকের রিহার্সেল দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট দেশ-প্রেমের কথা বলিতে যাওয়া অথবা পল্লীসংগঠনের কথা তোলা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। বহু খাটুনির পর এই দুইটী দিনের তাঁহারা সদ্ব্যবহার করিতে চান। Weekdaysএ ত তাঁহাদের মরিবারও সময় নাই।

কয়েকটী গ্রামের যুবকেরা কিন্তু এমন অরসিক যে তাঁহারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর শনি ও রবিবারে গ্রামের জন্য খাটিতে চান। আমি এরূপ বহু যুবকের কার্য্যকলাপও লক্ষ্য করিয়াছি—ইঁহারা নমস্য।

কেন এমন হয়? ধ্বংসোন্মুখ জাতি আমরা মুখে সবাই বলি, ভাত-কাপড়ের দুঃখের কথাও অনুভব করি; তবু কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না কেন?—জড়তা যায় না কেন?

আমার মনে হয় ইহার প্রধান কারণ এই—আমরা মুখে যা বলি মনে-প্রাণে তা অনুভব করি না। আমরা দেশকে জানি না—তাই স্থায়ী দেশপ্রেম জন্মে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ২৪ পরগণা জেলা সম্বন্ধে মোটামুট

কয়েকটী সংবাদ দিব। আমার মনে হয় ইহাতে, যাঁহারা কাজ করিতে চান তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ও পন্থা নির্দ্ধারণে সহায়তা হইবে। এই প্রবন্ধে বর্ত্তমানে যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠন-কাজ করিতেছেন তাঁহাদেরও উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সহরের প্রত্যেক আন্দোলনের ঢেউ এই জেলাতেও সকলেই অনুভব করে। প্রতি আন্দোলনেরই কিছু না কিছু সার্থকতা আছে। সেই হিসাবে হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসীরা বিশেষ সৌভাগ্যবান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লোক সংখ্যা হিসাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগে এই জেলার প্রথম স্থান। ১৯১১ সালে এখানকার লোক সংখ্যা ২৪, ৩৪, ১০৪ জন ছিল। ১৯২১ সালের আদম সুমারিতে দেখা যায় এখানকার লোক সংখ্যা বাড়িয়া ২৬, ২৮, ২০৫ জন হইয়াছে। লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু জন্মহার বাড়া ত দূরের কথা—বেশ কমিয়াছে। জন্মহার কম হইবার কারণ কি—এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা শক্ত। বাকূলে (Buckle) মহাশয় বলেন যে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের ফলে জন্মহারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হয়। The population does undoubtedly fluctuate with the supply of food, advancing when the supply is plentiful or receding when the supply is scanty. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য জগতে ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। সেখানে লোকের ধনবত্তা বাড়িতেছে কিন্তু জন্মহার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এই সব দেখিয়া মিঃ পেল (Pele) বলিয়াছেন যে জন্মহার বৃদ্ধির কারণ দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা। তাঁহার কথাই এই যে High birthrates are the direct outcome of poverty and misery and falling birthrates are a natural result of increased prosperity. আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে যে গরীবের উপরই মা ষষ্ঠীর কৃপা অধিক হয়। যাহা হউক জন্মহার চব্বিশ পরগণায় কমিয়া গিয়াছে। মৃত্যুহার যদি বাড়িতে থাকে এবং জন্মহার ক্রমাগ[ত] কমে তবে জেলাটী লোকশূন্য হইতে খুব বেশী দি[ন] লাগিবে না।

২৪ পরগণার লোকক্ষয়ের প্রধান কারণ ম্যালেরি[য়া] ও কালাজ্বর। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে বাংলা দেশে প্রতিদিন ১০০০ হাজার লোক কেবল ম্যালেরিয়ায় মরে। ১০০০ লোক যাহারা মরে তাহা দের ত গো-জন্ম কাটিয়াই গেল। কিন্তু যাহারা রোগে ভুগিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা যে কত তাহা গ্রামবাসী মাত্রই জানেন। ম্যালেরিয়ার জন্য ২৪ পরগণায় চাষী চাষ করিতে পারে না, বালক স্কুলে যাইতে পারে না। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া লোকের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-ক্ষীণ ও চরিত্র হীন হইয়া পড়ে। Dr. Pais মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—Distaste towards works of a social character, diminished will power, diminished liking for work, restricted vision towards all the phenomena of life are special characteristics of those with chronic malaria and of the peoples who have long suffered from it. আমরা পল্লীবাসীর কর্ম্মে অনাসক্তি, ক্ষুদ্র-চিত্ততা দেখিয়া দুঃখিত হই—ইহার মূলীভূত কারণ ক্রমাগত জ্বরভোগ ও দুর্দশা।

কেবল ২৪ পরগণা নহে—পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জেলারই প্রতিগ্রামে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিতে লোকেরা জীবনের সমস্ত সরসতা হারাইয়াছে। ডাঃ বেণ্টলী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—The man who is a prey to chronic malaria loses all interest in life ; his energy is sapped and his initiative destroyed ; he becomes lethargic in mind and body and so intensely apathetic that it is with difficulty he can be induced to make an effort even to secure treatment. ম্যালেরিয়ার ফলে রোগী মনে ও প্রাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়ার পরই কালাজ্বরের নাম করা যাইতে পারে। ডাঃ বেণ্টলী মহাশয় বলিয়াছেন—বাংলায় ২ লক্ষ লোক কালাজ্বরে ভুগিতেছে। ডাঃ নেপীয়ার (Dr. Napier) মহাশয় বলেন—প্রায় ১০ লক্ষ লোক কালাজ্বরের রোগী। আমাদের মনে হয় কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার পার্থক্য গ্রাম্য বৈদ্যেরা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই জন্যই এখনও ব্যারামটির সম্যক্ স্বরূপ ধরা পড়িতেছে না। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন যে, ১৯১৫ সালের পূর্ব্বে লোকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পার্থক্যই জানিত না। কাজেই রোগটীর ভীষণ মূর্ত্তি ধরা পড়ে নাই।

১৯২১ সালে	১৫৫২	জন	এই রোগে মারা যায়
১৯২২ ,,	১৫৩১	,,	,, ,, ,, ,,
১৯২৩ ,,	৪৫৬৫	,,	,, ,, ,, ,,

ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, দিন দিন নূতন নূতন রোগী আবিষ্কৃত হইতেছে।

২৪ পরগণার ইতিহাসই দেখা যাক্। ১৯২১ সালে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭৭, কিন্তু নানাস্থানে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণী কেন্দ্র স্থাপিত হওয়াতে ১৯২২ সালে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫৮ জন, ১৯২৩ সালে ১৫৩৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। সকলেই অবগত আছেন যে অধিকাংশ রোগীরই বয়স ১৫ বৎসরের নীচে। কালাজ্বর রোগটীর বিশেষত্বই এই যে ইহাতে বালকেরাই বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ যথার্থই বলিয়াছেন যে, The age incidence of kala-azar is peculiar ; about 80 percent of the cases occuring in children under 15 years of age.

এখন দেখা যাউক, এই দুইটী ব্যাধির নিরাকরণ জন্য সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা ও যত্ন কতটা করা হইতেছে। সমস্যাটী জটিল, যথেষ্ট অর্থ ও কর্ম্মীর প্রয়োজন—এ সকল কথাও যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, আজ সমস্ত জাতি যদি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ না করেন, তাহা হইলে এই ভীষণ ব্যাধিদ্বয় বাংলাদেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিবে।

কালাজ্বর বৈঠকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন যে, বাংলার স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে সরকার ও জনসাধারণকে একযোগে কাজ করিতে হইবে—A problem of so vast a nature is incapable of solution by the efforts of government alone. কোন দেশেই কেবল সরকারী চেষ্টায় সকল ব্যাধি দূরীভূত হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কি করিয়াছেন দেখা যাউক। প্রথমতঃ রোগটীর সম্যক স্বরূপ জানিবার জন্য একটী সার্ভে (Survey) করা হয় ; তৎপর বিশেষজ্ঞগণ রোগের কারণ প্রভৃতি লইয়া গবেষণা (research) করিয়াছেন। কলিকাতার School of Tropical Medicine নামক বিদ্যালয়ে এবং প্রত্যেক জেলায় সিভিলসার্জ্জন ও হেলথ অফিসারের নিকট শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগেরও একজন এসিষ্টাণ্ট তাঁহার ডিরেক্টার ও কর্তৃত্বাধীনে ২১ জন ডাক্তার এই কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর সরকার এজন্য অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান পরিচালক মেজর ষ্টুয়ার্ট মহাশয় বলিয়াছেন—In Bengal the central department is advisory only and the work is carried out by the local bodies aided financially to some extent by the central Govt. Last year Rs. 50000 was given. The central Anti-Malarial Society has this year (192:) already received Rs. 20000/ out of Rs. 30000 allotted for Anti-Malaria work ; part of this sum is devoted for Kala-azar wo k

এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা বাংলা দেশ সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে প্রযুজ্য। ২৪ পরগণার ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর নিবারণ কল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতদূর কি করিতেছেন, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

করেকটী সংবাদ দিব। আমার মনে হয় ইহাতে, যাঁহারা কাজ করিতে চান তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ও পন্থা নির্দ্ধারণে সহায়তা হইবে। এই প্রবন্ধে বর্ত্তমানে যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠন-কাজ করিতেছেন তাঁহাদেরও উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সহরের প্রত্যেক আন্দোলনের ঢেউ এই জেলাতেও সকলেই অনুভব করে। প্রতি আন্দোলনেরই কিছু না কিছু সার্থকতা আছে। সেই হিসাবে হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসীরা বিশেষ সৌভাগ্যবান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লোক সংখ্যা হিসাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগে এই জেলার প্রথম স্থান। ১৯১১ সালে এখানকার লোক সংখ্যা ২৪, ৩৪, ১০৪ জন ছিল। ১৯২১ সালের আদম সুমারিতে দেখা যায় এখানকার লোক সংখ্যা বাড়িয়া ২৬, ২৮, ২০৫ জন হইয়াছে। লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু জন্মহার বাড়া ত দূরের কথা—বেশ কমিয়াছে। জন্মহার কম হইবার কারণ কি—এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা শক্ত। বাকলে (Buckle) মহাশয় বলেন যে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের ফলে জন্মহারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হয়। The population does undoubtedly fluctuate with the supply of food, advancing when the supply is plentiful or receding when the supply is scanty. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য জগতে ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। সেখানে লোকের ধনবত্তা বাড়িতেছে কিন্তু জন্মহার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এই সব দেখিয়া মিঃ পেল (Pele) বলিয়াছেন যে জন্মহার বৃদ্ধির কারণ দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা। তাঁহার কথাই এই যে High birthrates are the direct outcome of poverty and misery and falling birthrates are a natural result of increased prosperity. আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে যে গরীবের উপরই মা ষষ্ঠীর কৃপা অধিক হয়। যাহা হউক জন্মহার চব্বিশ পরগণায় কমিয়া গিয়াছে। মৃত্যুহার যদি বাড়িতে থাকে এবং জন্মহার ক্রমশঃ কমে তবে জেলাটী লোকশূন্য হইতে খুব বেশী দিন লাগিবে না।

২৪ পরগণার লোকক্ষয়ের প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে বাংলা দেশে প্রতিদিন ১০০০ হাজার লোক কেবল ম্যালেরিয়ায় মরে। ১০০০ লোক যাহারা মরে তাহাদের ত গো-জন্ম কাটিয়াই গেল। কিন্তু যাহারা রোগে ভুগিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা যে কত তাহা গ্রামবাসী মাত্রই জানেন। ম্যালেরিয়ার জন্য ২৪ পরগণায় চাষী চাষ করিতে পারে না, বালক যুবক যাইতে পারে না। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া লোকের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-ক্ষীণ ও চরিত্র হীন হইয়া পড়ে। Dr. Pais মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—Distrust towards works of a social character, diminished will power, diminished liking for work, restricted vision towards all the phenomena of life are special characteristics of those with chronic malaria and of the people who have long suffered from it. আমরা পল্লীবাসীর কর্ম্মে অনাসক্তি, ক্ষুদ্র-চিত্ততা দেখিয়া হুঃখিত হই—ইহার মূলীভূত কারণ ক্রমাগত জ্বরভোগ ও যন্ত্রণা।

কেবল ২৪ পরগণা নহে—পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জেলারই প্রতিগ্রামে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি ভুগিতে লোকেরা জীবনের সমস্ত সরসতা হারাইয়া ডাঃ বেণ্টলী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—The man who is a prey to chronic malaria loses all interest in life ; his energy is sapped and his initiative destroyed ; he becomes lethargic in mind and body and so intensely apathetic that it is with difficulty he can be induced to make an effort even to secure treatment. ম্যালেরিয়ার ফলে রোগী মনে ও দেহে পঙ্গু হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়ার পরই কালাজ্বরের নাম করা যাইতে পারে। ডাঃ বেণ্টলী মহাশয় বলিয়াছেন—বাংলায় ২ লক্ষ লোক কালাজ্বরে ভুগিতেছে। ডাঃ নেপীয়ার (Dr. Napier) মহাশয় বলেন—প্রায় ১০ লক্ষ লোক কালাজ্বরের রোগী। আমাদের মনে হয় কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার পার্থক্য গ্রাম্য বৈদ্যেরা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই জন্যই এখনও ব্যারামটির সম্যক্ স্বরূপ ধরা পড়িতেছে না। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন যে, ১৯১৫ সালের পূর্ব্বে লোকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পার্থক্যই জানিত না। কাজেই রোগটীর ভীষণ মূর্ত্তি ধরা পড়ে নাই।

১৯২১ সালে	১৫৫২	জন	এই	রোগে	মারা	যায়
১৯২২ ,,	১৫৩১	,,	,,	,,	,,	,,
১৯২৩ ,,	৪৫৬৫	,,	,,	,,	,,	,,

ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, দিন দিন নূতন নূতন রোগী আবিষ্কৃত হইতেছে।

২৪ পরগণার ইতিহাসই দেখা যাক্। ১৯২১ সালে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭৭, কিন্তু নানাস্থানে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণী কেন্দ্র স্থাপিত হওয়াতে ১৯২২ সালে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫৮ জন, ১৯২৩ সালে ১৫৩৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। সকলেই অবগত আছেন যে অধিকাংশ রোগীরই বয়স ১৫ বৎসরের নীচে। কালাজ্বর রোগটীর বিশেষত্বই এই যে ইহাতে বালকেরাই বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যথার্থই বলিয়াছেন যে, The age incidence of kala-azar is peculiar ; about 80 percent of the cases occuring in children under 15 years of age.

এখন দেখা যাউক, এই দুইটী ব্যাধির নিরাকরণ জন্য সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা ও যত্ন কতটা করা হইতেছে। সমস্যাটী জটিল, যথেষ্ট অর্থ ও কর্ম্মীর প্রয়োজন—এ সকল কথাও যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, আজ সমস্ত জাতি যদি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ না করেন, তাহা হইলে এই ভীষণ ব্যাধিদ্বয় বাংলাদেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিবে।

কালাজ্বর বৈঠকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন যে, বাংলার স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে সরকার ও জনসাধারণকে একযোগে কাজ করিতে হইবে—A problem of so vast a nature is incapable of solution by the efforts of government alone. কোন দেশেই কেবল সরকারী চেষ্টায় সকল ব্যাধি দূরীভূত হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কি করিয়াছেন দেখা যাউক। প্রথমতঃ রোগটীর সম্যক স্বরূপ জানিবার জন্য একটী সার্ভে (Survey) করা হয় ; তৎপর বিশেষজ্ঞগণ রোগের কারণ প্রভৃতি লইয়া গবেষণা (research) করিয়াছেন। কলিকাতার School of Tropical Medicine নামক বিদ্যালয়ে এবং প্রত্যেক জেলায় সিভিলসার্জ্জন ও হেলথ অফিসারের নিকট শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগেরও একজন এসিষ্টাণ্ট তাঁহার ডিরেক্টার ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ২১ জন ডাক্তার এই কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর সরকার এজন্য অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান পরিচালক মেজর ষ্টুয়ার্ট মহাশয় বলিয়াছেন—In Bengal the central department is advisory only and the work is carried out by the local bodies aided financially to some extent by the central Govt. Last year Rs. 50000 was given. The central Anti-Malarial Society has this year (1923) already received Rs. 20000/ out of Rs. 30000 allotted for Anti-Malaria work ; part of this sum is devoted for Kala-azar work

এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা বাংলা দেশ সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে প্রযুজ্য। ২৪ পরগণার ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর নিবারণ কল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতদূর কি করিতেছেন, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়নবোর্ডগুলির কার্য্যালোচনার পর আমরা, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণ কল্পে বাংলার বিখ্যাত সমিতি Co-operative Anti malarial Society ও Bengal Health Association এই জেলায় কি কি কাজ করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিব। ইহা ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে সরকারী সাহায্য-বর্জ্জিত প্রতিষ্ঠানও এই জেলায় কাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির নাম করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অনেক গ্রামে যুবকেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও অনেকস্থলে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যে ভাবে সমিতি গঠিত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই অমানিশার ঘোর কাটিয়া যাইবে।

প্রথমতঃ ২৪ পরগণা জেলা ২ লক্ষ টাকা কালাজ্বর নিবারণ কল্পে খরচের বরাদ্দ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আরো ২৫০০০ হাজার টাকা দেন। বর্ত্তমানে ৩৫ জন নব নিযুক্ত ডাক্তার ও ডিঃবোর্ডের ডিসপেন্সারীর ২২ জন ডাক্তার প্রায় ১৮০টী কেন্দ্রে কালাজ্বর রোগীর রক্ত পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় চিকিৎসা করিতেছেন।

ইহা ছাড়া ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পেও এই জেলাতেই বঙ্গের অধিকাংশ জেলা অপেক্ষা বেশী কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—Our movement has made headway only in the districts near our headquarters, very little has been done in the outlying districts. ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমায় ২২টী, বারাসতে ৩৯টী এবং ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় ১০টী ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে এই জেলাতে জেলাবোর্ড, Central Co-operative Anti malarial Society (কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি) ও Bengal Health Association (বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতি) যে কাজ করিতেছেন, তাহাতে জেলার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

সরোজনলিনী স্মৃতি সমিতিও বারাসত প্রভৃতি স্থানে মহিলা সমিতির মধ্য দিয়া নারীকল্যাণে অবহিত হইয়াছেন।

কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে কেন্দ্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতির কলেরা বিগ্রেড (cholera brigade) এর স্বেচ্ছাসেবকেরা রোগ-প্রতিষেধক বহু ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বাড়ীতে Bleaching powder, Izal, Potassium Permanganate বিতরণ করা, আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা, জলাশয়গুলি বিশুদ্ধ রাখা এবং বক্তৃতা ও সেবার মধ্য দিয়া গ্রামবাসীকে রক্ষা করা ইঁহাদের কাজ। গঙ্গাসাগর মেলাতে ইঁহারা যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার স্থানে স্থানে কলেরা নিবারণ জন্য ঔষধও এবার মজুত রাখা হইয়াছে। ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) ক্লোরোজেন ও আইজল (Izal) কয়েকটি কেন্দ্রবর্ত্তী গ্রামে বিশিষ্ট ও দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ভদ্রলোকের নিকট মজুত রাখা হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ প্রয়োজন হইলেই উহা পাইতে পারিবেন।

কংগ্রেস পরিচালিত দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি বড় বেশী কেন্দ্র এখনও স্থাপিত হয় নাই। কোদালিয়ায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বগ্রামের সমিতি রীতিমত কাজ করিতেছেন দেখিয়াছি।

ইহা ব্যতীত ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বগ্রামে স্বাস্থ্যধর্ম্মসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে একদল যুবক কৃষি, বাণিজ্য ও গোপালন বিষয়ে নিজেরা শিক্ষা লইতেছেন। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে ইঁহারা বহু গ্রামে কেন্দ্র খুলিয়া পল্লীসংগঠন কার্য্য করিবেন।

স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সমিতি কাজ করিতেছে। আশা হয়, ইঁহারা জমাট বাঁধিয়া কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে কাজ করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে।

আমার মনে হয় প্রতি জেলা বোর্ড এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে বাংলার মৃত্যুহার অচিরে কমিয়া যাইবে। বাংলায় ৯০০ ডিসপেন্সারী আছে। প্রত্যেক ডিস্পেন্সারীকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী জনহিতকর সমিতি খোলা যাইতে পারে। বাংলার জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ অবহিত হইলে পল্লীসংগঠন আন্দোলন সহজ ও সফল হইবে।

পল্লীসংগঠন জন্য কি কি প্রতিষ্ঠান চাই, এই কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য একটী প্রতিষ্ঠান-তালিকা দিলাম।

(ক) লোকশিক্ষা—শিক্ষাভাব দূর করিবার জন্য প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয় চাই। আলোক-চিত্র, পুস্তিকা প্রচার ও অভিনয় সাহায্যে জন সাধারণকে স্বাস্থ্য কৃষি, ও সমবায় প্রভৃতির মূল নীতি বোঝান দরকার।

(খ) ধন সমাগম—কুটীর ও গৃহ শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া বিধবা, বেকার ও অলস লোককে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। প্রতি গ্রামের লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। তৈয়ারী জিনিষের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র সহরে ও হাটে বন্দরে স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) স্বাস্থ্যোন্নতি—জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মূল তত্ত্বটী আলোকচিত্র বক্তৃতা ও পুস্তিকার সাহায্যে গ্রামবাসীকে বোঝাইতে হইবে। বসন্তের সময়ে টীকা লওয়ার প্রবৃত্তি লোককে দিতে হইবে। কলেরার সময় রোগ প্রতিষেধক নিয়মাবলীর প্রচার ও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর চিকিৎসা ও নিবারণ সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। শিশুমৃত্যু হ্রাস করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে দাইদিগকে নাড়ী কাটার ও প্রসূতি ও শিশুর কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

এ জন্য কি কি চাই ?

(১) স্থানীয় প্রাণবান কর্ম্মী। বাহিরের লোক আসিয়া আমার গ্রাম ভাল করিতে পারে না।

(২) গ্রামেই অর্থ সৃষ্টি করিতে হইবে—ভিক্ষা করিয়া সমিতি চলে না।

(৩) মুষ্টিভিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। চাঁদা আদায় করা সর্ব্বত্র সম্ভব নয়।

(৪) টাকার হিসাব চাই।

(৫) মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা, নেতৃত্ব মানিয়া চলা ও অনলস থাকিয়া সমিতির জন্য কার্য্য করা চাই।

আজ দেশে সুবাতাস বহিয়াছে। কর্ম্মীও দেখা দিয়াছে। গ্রামকে বাঁচাইবার জন্য আগ্রহ অনেকের হইয়াছে। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, আর দুঃখ বেশী দিন থাকিবে না—"দিন আগত ঐ"!

প্লেগের ইতিবৃত্ত

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

প্লেগ অতি ভীষণ পীড়া। ইহা অতি মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। প্লেগ অর্থে বহু লোক-নাশক ব্যাধি মাত্র বুঝায়। কিন্তু অধুনা প্লেগ শব্দ বিশেষ একটি স্বতন্ত্র বহু লোক-নাশক রোগকেই বলা হয়। ইহার নাম বিউবোনিক প্লেগ অর্থাৎ বাঘীর মড়ক। কারণ বাঘীর স্ফীতি ও বেদনাই এই রোগের নিত্য লক্ষণ।

প্লেগে প্রায় কুচকী অথবা বগলের বাঁচিতে বেদনা হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং লাল বর্ণ হয়। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর জ্বর ও চক্ষু লালবর্ণ হইয়া বিকার উপস্থিত

করে। অবশেষে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়। চব্বিশ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ দিনের মধ্যে প্রায় রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সকল প্লেগে আবার কুচকী বা বগল স্ফীত হয় না—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দেখা যায়। আনুষঙ্গিক জ্বর, সন্ধিসমূহের গ্রন্থি স্ফীতি কিম্বা দুষ্ট ব্রণ এবং অন্য বিষ স্ফোটকোৎপত্তি এই রোগের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ইহার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার অনতি বিলম্বেই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অব্যবহিত পরেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ৩।৪ দিন মধ্যে প্রধান গ্রন্থিসমূহ স্ফীত হয়। রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীরের অত্যন্ত অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য হয়, বুদ্ধির জড়তা, স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল, কোমরে বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও হৃৎপিণ্ড চড় চড় করে। শীত, কম্প, অস্থিরতা, অবসাদ, মাথা ধরা, মস্তক ঘূর্ণন, বমনোদ্রেক, বক্ষস্থলে বেদনা এই সমস্ত রোগের পূর্ব্বাভাস। ইহাতে কথা ভারি ভারি ও এলোমেলো, নয়নদ্বয় আবিল অশ্রুপূর্ণ হয়, এবং শীঘ্র শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দ্রুতগামী অথবা দুর্ব্বল হয়। সময়ে সময়ে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন, অত্যধিক পিপাসা, দুর্গন্ধযুক্ত অতিসার, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও দুর্গন্ধময়, প্রস্রাব অল্প হয়। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রলাপ ও শরীরের খিঁচুনি প্রভৃতি সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস, লিবিয়া, মিশর ও সিরিয়ায় ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। বাইবেল লাক্ত রাজা সলোমনের সময়েও একবার প্লেগ হইয়াছিল। ইহা ইয়োরোপে অনেকবার দেখা দিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিশর দেশ হইতে তুরস্কের কনষ্টাণ্টি-নোপল হইয়া ইয়োরোপে গিয়া তুরস্ক ফ্রান্স ও ইটালী জনশূন্য করিয়াছিল। ৫৪৬ খৃঃ ফ্রান্সে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। তৎপরে ৬৫১ খৃঃ ইটালীতে লোকক্ষয় করে। ৫৯০ খৃঃ ইহা রোমরাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীতে ইয়োরোপে ইহার ভয়ঙ্কর উপদ্রব হয়। ১৩৪৫ খৃঃ ইহা সিমিলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩৪৬ খৃঃ কনষ্টাণ্টিনোপল, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মাণী, সুইডেন ও নরওয়েতে ইহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ১৩৪৮ খৃঃ লণ্ডন সহরে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়, ১৩৬৮ খৃঃ স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৪২ খৃঃ মিশরে আরম্ভ হইয়া ইহা কনষ্টাণ্টিনোপল হইয়া পুনরায় ইয়োরোপে গিয়াছিল। ১৬৬৫ খৃঃ ইংল্যাণ্ডে মহামারীরূপে ইহা আত্ম প্রকাশ করে। তদ্রূপ প্লেগ তথায় আর কখন হয় নাই। লণ্ডন সহরেই লক্ষাধিক লোক মারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার প্রাদুর্ভাবে ইয়োরোপে ভয়ঙ্কর মড়ক হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃঃ রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের পর বৎসর, রুসিয়া দেশে আবির্ভূত হইয়া ইহা বহু লোক ক্ষয় করিয়াছিল। তদবধি ইয়োরোপ ইহার বিশেষ লীলাভূমি। অধুনা মধ্যে মধ্যে ঐ মহাদেশে ইহা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

৫৪২ খৃঃ প্লেগ মিশরদেশে আরম্ভ হইয়া আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছিল। ক্রমে সমগ্র আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়া এসিয়া মহাদেশের চীন, পারস্য ও আর দেশে ইহা আবির্ভূত হয়। ১৮৮২ খৃঃ চীনদেশে ভয়ঙ্কর মড়ক হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃঃ হংকং হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অতি পুরাকালে প্লেগ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। অনেকে বলেন চীনদেশ হইতেই প্লেগ প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের আবির্ভাব প্রমাণিত হয়। ১৩৩৪ খৃঃ দিল্লীর পাঠান নরপতি মহম্মদ তোগলকের সময় ভারতে প্লেগ প্রবেশ করে। ১৩৯০ খৃঃ আফগান সর্দ্দার টাইমুর যখন দিল্লীনগরে নর শোণিত প্রবাহিত করেন, সেই সময় দুর্ভিক্ষের সহিত প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃঃ প্লেগ রোগে প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ১৬১০ খৃঃ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লীতে মহামারীরূপে ইহা দেখা দিয়াছিল। ১৬৮৪ খৃঃ সুরাট বন্দরে আবির্ভাব হয়। ১৬৮৯ খৃঃ বোম্বাই সহরে লীলার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। ১৮১২ খৃঃ কচ্ছ, কাথিয়ার, গুর্জ্জর এবং সিন্ধুদেশে ইহার দৌরাত্ম্য হয়। ১৮১৫ খৃঃ ইহা হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে উৎপাত করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃঃ কুমায়ুনের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রদেশে প্লেগ বহু দিন অবস্থিতি করে। ১৮২৯ খৃঃ দিল্লী, রোহিলখণ্ড ও তৎনিকটবর্ত্তী প্রদেশে ইহার আবির্ভাব হয়। ১৮৩১ খৃঃ মাড়োয়ারের অন্তর্গত পার্শি এবং রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ১৮৩৬ খৃঃ ভারতের পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে প্লেগ আবির্ভূত হইয়া, তথা হইতে রাজপুতানার পালিনগর ধ্বংস করে। সেই সময় এই মহামারী হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে চীনদেশে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ চীনদেশ হইতে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। ১৮৯৬ খৃঃ ইহার আবির্ভাব হইলে ভারতের প্রায় ২৫০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৯৭ খৃঃ বোগদাদ নগর হইতে প্লেগ ষ্টীমারযোগে বোম্বাই সহরে আগমন করে। উক্ত বৎসর প্লেগ কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইয়া ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেই সময় বহু লোক সহর পরিত্যাগ করেন। ঐ বৎসর সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৬০০০ লোক ক্ষয় হয়। ১৮৯৮ খৃঃ ১,১৮,০০০ জন; ১৮৯৯ খৃঃ ১,৩৪,৮০০ জন; ১৯০০ খৃঃ ৯৩,১৫০ জন; ১৯০১ খৃঃ ২,৭৩,৬৭৯ জন; ১৯০২ খৃঃ ৫,৭৫০০০ জন; ১৯০৩ খৃঃ ৮,৫০,০০০ জন; ১৯০৪ খৃঃ ১০,২২,২৯৯ জন; ১৯০৫ খৃঃ ১২,৮৩,০০০ জন; ১৯০৬ খৃঃ ৩,৩২ ০০০ জন প্লেগে মারা পড়ে এবং ১৯০৭ খৃঃ প্লেগ প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রায় ১৫ লক্ষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছে। তদবধি ভারতে প্লেগ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে প্লেগে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দেড় লক্ষের উপর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অধুনা বীরজননী পঞ্চনদ প্লেগের লীলাভূমি। ভারতে প্লেগ আত্মপ্রকাশ করিবার পর হইতে, এই প্রদেশে যত লোকক্ষয় হইয়াছে, তদ্রূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। তথায় প্লেগ এত অধিক পরিমাণে হয় যে, সময়ে সময়ে আদালতের কার্য্যাদি বন্ধ করিতে হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, দিল্লী, সুরাট, পুনা, পাটনা, ভাগলপুর, করাচী উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে ইহার প্রকোপ হইয়া থাকে। অধুনা ইহা পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে শীতের শেষে ও বসন্তকালে অর্থাৎ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এই রোগে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। আর ম্যালেরিয়ার ত কথাই নাই !!

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইন্দুর হইতে প্লেগের পরিব্যাপ্তি হয়। এক জাতীয় কীট বা পিশু ইন্দুরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের দংশন দ্বারা প্লেগবীজ ইন্দুরের দেহ হইতে মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হয়। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন, যে স্থানে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সেই স্থানেই ইহার আধিপত্য। রোগীর বস্ত্রাদি অবলম্বনপূর্ব্বক প্লেগ দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করে। চীনা পণ্ডিতেরা বলেন, যাহার মুখ ভূমির যত নিকট, সে তত শীঘ্র প্লেগ রোগাক্রান্ত হয়। ডাক্তার রসেল বলেন, ইহা সংক্রামক এবং পালাজ্বরের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া সময় বিশেষে প্রবল হয়।

প্লেগের চিকিৎসা বিষয়ে চিকিৎসকগণ এখনও ভালরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই। এই রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক বাস-স্থান কোথায় তাহা জানা যায় না। তবে সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল বায়ুতে ইহার বীজ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহার প্রতিকারের বিশেষ কোন ঔষধ বা প্রতিষেধক পদার্থ আবিস্কৃত হয় নাই। অনেকে বলেন, প্লেগের সময় এক ছটাক জলে কয়েক ফোঁটা টিংচার আইওডিন্ দিয়া একবার প্রাতে ও একবার সন্ধ্যায় সেবন করিবে; জ্বর অনুভব হইলে জোলাপ খাইয়া উদর পরিষ্কার রাখিলে ইহার প্রকোপ হয় না। ইহাতে প্লেগবীজ বিনষ্ট হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্লেগ নিবারণের বহু উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—স্বতন্ত্রীকরণ, ইন্দুর ধ্বংস

হাফকীনের টীকা, প্লেগের সময় বাসগৃহ ত্যাগ ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্ট প্লেগের টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই টীকা লইলে প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত তাহা কার্য্য করে; কিন্তু পরে পুনরায় টীকা লইতে হয়। আবার অনেক স্থলে টীকাতে কোন উপকার হয় না। কবিরাজী মতে খাঁটী সরিসার তৈল প্রত্যহ সমস্ত শরীরে ভালরূপে মর্দ্দন করিলে প্লেগ হয় না।

প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে এবং সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল বায়ু বিশিষ্ট স্থানে বাস করিলে এই রোগের সংক্রামকতা নিবারণ হইতে পারে। দূষিত জলবায়ু প্রভৃতি দ্বারা অনেক সময় মহামারী উপস্থিত হয়। রোগীকে একাকী পৃথক স্থানে রাখা উচিত এবং আরোগ্য হইলে পর, অন্ততঃ এক মাস কাল তাহার পৃথক গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য, এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে তাহার থাকা উচিত নহে। শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে রোগী কেহ স্পর্শ করিবে না। মড়কের সময়ে পর্য্যন্ত না এই পীড়া সম্পূর্ণরূপে হ্রাস হয়, তা বাসগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মাঠের মধ্যে পরিষ্কার স্থা গিয়া বাস করা উচিত। কোন স্থানে পীড়া হই তথায় লোককে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। প্লেগে সময় বাটীর দরজায় অথবা ফটকে চূণ ছড়াইয়া রাখি যে কোন ব্যক্তি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহা চূণ মাড়াইতে হয়। পায়ে বা জুতায় যে প্লেগ বাহির হইতে আসিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা এইরূ নষ্ট হইতে পারে। তৎকালে পায়ে মোজা ও জু থাকিলে অনেক সময় উপকার হয়। ফল ক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যত্নের সহিত পালন করি ইহার আক্রমণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি ল করিতে পারা যায়।

তাম্রকূট-মাহাত্ম্য।

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ]

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'আলবোলার' জয়গান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে—ধূম-পানে বাঙ্গালী যুবা, বৃদ্ধ ও বালক মজিয়াছে। তামাক কোন না কোন আকারে সকলেই ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। বৃদ্ধ আলবোলাতে তাম্রকূটের পূজা করেন—আলবোলা মধ্যস্থিত জল-কল্লোল তাঁর কাছে কোন সুদূরের সমুদ্র-কল্লোলবৎ প্রতীয়মান হয়। প্রৌঢ় ও যুবক চুরুট ও সিগারে মত্ত—স্কুলের পড়ুয়া ছাত্র নস্য লইয়া মাতিয়া আছে। রাস্তায় ঘাটে পল্লী-বাসী বিড়িতে মসগুল হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—তামাকু তুমি ধন্য। পৃথিবীতে এমন সভ্য অথবা অসভ্য জাতি নাই যাহার নিকট তামাকুর মহিমা অপরিজ্ঞাত। পণ্ডিতেরা বলেন, তামাকসেবীর সংখ্যা না কি বর্ত্তমানে ৬০ কোটি। পাশ্চাত্য দে বিলাসিনীরাও না কি তামাকুর প্রেমে পড়িয়াছেন এ শুনিতেছি। ডাঃ জর্জ্জ টমাসন (Dr. George Thomason M. D.) মহাশয় দুঃখ করি বলিয়াছেন—"Smoking among women growing at an appalling rate. It is reporte as now involving all classes of women হায় কবি ঈশ্বরগুপ্ত, তুমি আজ বাঁচিয়া থাকিলে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতে।

তামাকসেবীকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি কেন পয়সা দিয়া এই বিষ খান, তিনি উত্ত বলিয়া থাকেন যে, "ইহাই সনাতন রীতি। আম ঠাকুরদাদা প্রত্যহ ১ পোয়া তামাক পোড়াইতেন,

১০ বছর বাঁচিয়া গিয়াছেন—তামাক খাইলে আয়ু বাড়ে।"

অনেকের যেমন ধারণা আছে যে, চা পানে জীবনী-শক্তি বাড়ে—(The cup that cheers but not inebriates), তেমনি আবার এক দল লোকের ধারণা এইরূপ যে, তামাকু সেবনে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ করা যায়। তামাকুর মহিমার বিস্তারিত ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা যে কোন তাম্রকূটসেবীর নিকট গেলেই তামাকু-মাহাত্ম্য সবিস্তারে শুনিতে পাইবেন।

ডাক্তারেরা বলেন, তামাকের উপাদানগুলি এমনই বিষাক্ত যে, উহাতে মানুষের আয়ু-ক্ষয় না হইয়াই পারে না। তামাকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিকোটিন (nicotine) নামক বিষ থাকে। ডাক্তারেরা নিকোটিনের কি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন শুনুন—Nicotine is one of the most violent poisons known. It closely resembles prussic acid. নিকোটীন বিষ প্রুসিড় এসিড তুল্য। অনেকে হয়ত বলিবেন, এ বিষে ত কৈ একটী লোকও মরিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, তামাকু সেবনে প্রথম প্রথম কত কষ্ট হয়। গা বমি বমি করা, দীর্ঘ শ্বাস উঠা, মানসিক চাঞ্চল্য ও বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপসর্গগুলি প্রত্যেক novice (শিক্ষানবীশ) তামাকুসেবীই অনুভব করিয়া থাকেন। ধীরে ধীরে অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয় (habit is second nature)। তখন আর ও-সব লক্ষ্য হয় না।

তামাকের দ্বিতীয় উপাদানটী কলিডাইন (collidine)। ডাক্তারেরা বলেন, ইহা হইতেই তামাকের সুগন্ধ হয়। কলিডাইনও নিকোটিনের মতই বিষাক্ত। ইহার ১ ফোঁটার ২০ ভাগের ১ ভাগ খাইলেই একটী বেঙ্ মরিয়া যায়। ডাক্তারদের নিজেদের কথাই শুনুন—Another constituent of tobacco is collidine, a liquid of very penetrating odour and the principal substance giving the odour to tobacco. Collidine is an alkaloid as poisonous as nicotine. It is so poisonous that the twentieth part of a drop will rapidly kill a frog."

তামাকের তৃতীয় উপাদানটী পূর্ব্ব-কথিত প্রুসিক্ এসিড স্বয়ং। প্রুসিক্ এসিডের (Prussic acid) দরুণই তামাকু সেবনের পর মাথাধরা অথবা গা বমি বমি করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। হাভানা চুরুটে ইহার মাত্রা অধিক পরিমাণে থাকে।

চতুর্থ উপাদান কারবন্ মনোক্সাইড্ (carbon monoxide)। ইহার মহিমায় তামাকুসেবীর লাল রক্তকণিকা (red blood cells) গুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে—ফলে তামাকুসেবী রক্তশূন্য হন। এই বিষয়ে ইহার মহিমা অপার। ইহার ফলে সদ্য মৃত্যু হয় না সত্য, কিন্তু ইহা তামাকুসেবীকে জীবন্মৃত করিয়া রাখে। হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ইহারই ফল। ডাক্তারেরা বলেন—If it does not kill it leaves its pernicious effects—nervous troubles, irregular pulsation of the heart, partial paralysis, inflammation of the respiratory organs and a weakened digestion.

পঞ্চম উপাদানটী ফারফারল (Furfurol)। ভার্জ্জিনিয়া ও টার্কিশ তামাকে (Virginia and Turkish tobacco) এই উপাদানটী প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাও বিষ—Furfurol is 50 times as poisonous as alcohol.

তামাক যে যে বিষাক্ত উপাদানে গঠিত, তাহার ফর্দ্দ পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখন তাম্রকূট মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করা যাক্।

মদ্যপায়ী বেশ জানে যে মদ অপেয় ও অদেয়। সে তাহার অভ্যাসের জন্য অনুতপ্তও হয়। কিন্তু তামাকসেবী জানেও না যে সে ধীরে ধীরে বিষ সেবনে জর্জ্জরিত হইতেছে। তামাক সেবনে blood pressure

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। Janeway has shown that a single cigarette or cigar causes a rise of blood pressure ten to fifteen points. ক্রমাগত তামাক সেবনে রোগ-প্রতিষেধক শক্তিও লোপ পায়; কারণ তামাকের মধ্যে যে নিকোটিন বিষ থাকে, উহা রক্তকণিকাগুলিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। লাল রক্তকণিকা দুর্ব্বল হইলেই মানুষকে রক্তশূন্য দেখায় এবং তাহার শরীর "ব্যাধি-মন্দির" হইয়া দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা আরো বলিতেছেন যে, গত ৫০ বৎসর যাবৎ যে মস্তিষ্কের পীড়া ও বাতুলতা (insanity) বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহারও মূলে তামাকু সেবন। মদ্যপান, তামাক সেবন ও দুশ্চিন্তা বাতুলতার প্রধান কারণ। বঙ্গবাসী সাবধান হও কি? ম্যালেরিয়া কালাজ্বরেই তুমি জর্জ্জরিত। তার উপর সৌখীন ব্যাধিগুলি আর ডাকিয়া আনা কেন? স্কুলের বালকদের মধ্যে এই কথাগুলি প্রচারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আমি কোন যুবকের সহিত এক কিছু দিন ছিলাম। তাহাতে দেখিয়াছি, তাহার দৈনিক চা ও চুরুটেরই খরচ ৷৷০। অথচ শুনি আমরা না কি গরীব। থিয়েটার, বেস্, চা, চুরুট এগুলির বিক্রয় দেখিলে কিন্তু স্বতঃই মনে হয় যে আমরা গরীব নই। বাঙ্গালী যুবক ও অভিভাবক এখনও সাবধান না হন এই চা-চুরুটেই জাতির সর্ব্বনাশ হইবে।

জনৈক বৃদ্ধ মহাজনের ডায়েরী

[শ্রীরাখালদাস ভৌমিক]

১৩৩২ সাল যায় যায় হইয়াছে। পুরাতন বৎসর আর কয়েকদিন পরেই শেষ হইবে, আমরা আবার নূতন বৎসরে পদার্পণ করিব। এরূপ কত পুরাতন বৎসর গিয়াছে, কত নূতন বৎসর আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তবে আমার গণনা মধ্যে যে কয় বৎসরের হিসাব আছে, তাহার যদি একবার নিকাশ লই তবে দেখিতে পাই যে, অপরাপর পুরাতন বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও আমার ব্যবসায়ে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হইয়াছে। আর সেই ক্ষতি পূরণের চেষ্টা না করিয়া আমরা পুরাতন বৎসরের ক্ষতির জের নূতন বৎসরে টানিয়া আনিতেছি। লাভের মধ্যে এই হইতেছে যে পুরাতনের জের মিটাইতে মিটাইতেই নূতন বৎসর চলিয়া যায়। নূতন লাভের আশায় নূতন উদ্দীপনায় আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি না—পুরাতনের ঋণ পরিশোধই নূতন বৎসরের কাজ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং কবি যে বলিয়াছেন "নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা" এ সব আমাদের ঘটিয়া না। এমতাবস্থায় বুঝিতেছি যে কারবার করিয়া নাই। তবে যে পর্য্যন্ত না একেবারে দেউলিয়া হই, পর্য্যন্ত ঠাট বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র; কারবার আমার লোকসানী।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন কারবার তবে উঠাই দাও না কেন? উত্তরে বলি যে, দেখ, যত লোকসা কারবারই হোক, এ কারবারে আমার এক দিন ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল,—হঠাৎ তুলিয়া দিতে নিজে পারিব না। তবে যদি আপন আপনি ধ্বংস হয়, আক্ষেপ নাই; কারণ, সময়ে সবই ধ্বংস-প্রাপ্ত বুঝিতেছি যে, আমার এ কারবারী ইমারতের জানালা দিন দিন খসিয়া পড়িতেছে; ইটে লোণা য়াছে, ছাদ ফুটা হইয়াছে, ভিত বসিয়া যাইতে তবুও স্বেচ্ছায় আমি ইহার ধ্বংস সাধন করিতে না; কারণ, অনেক রক্ত জল করিয়া, মাথার ঘাম

পেনিয়া আমি এ সাধের ব্যবসা দাঁড় করাইয়াছিলাম। এ কারবার আমার প্রাণে স্বর্গাদপি গরিয়সী। বিজ্ঞ লোক বলিবেন যে, লোকটা কি মূর্খ! লোকসানী কারবারের জন্য চেঁচাইয়া মরিতেছে! তাঁহাকে আমি বলি যে, মরিবার পূর্ব্বে একবার জানিয়া যাইতে চাই যে, এমন লোক আছেন কি না, যিনি আমার কারবার আবার গড়িয়া তুলিতে পারিবেন; যাঁহার দ্বারা আমার কারবারের হৃত স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। এমন লোকের যদি সন্ধান পাই, তবে আমি সুখে মরিতে পারিব; নতুবা আমার মরিয়াও শান্তি নাই।

পরিশেষে একটী আশার কথা আমি শুধু বলিব যে, যদিও আমি দিন দিন নিরাশ হইতেছি, তবুও একেবারে আমি আশা হীন হই নাই। কারণ, আমার ধারণা আছে যে, আমার কারবারের যেমন বাঁধ, যেমন নিয়ম ও যেমন শৃঙ্খলা ছিল, তাহা যদি একবার জোর বাঁধে, তবে আমার কারবারী জাহাজ ভাঁটার মুখে পাল তুলে তীর বেগে একেবারে ঘাটায় গিয়ে পৌঁছাইবে।

যদি উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাই, তবে শেষ শ্বাস রোধের পূর্ব্বে আর একবার আমার কারবারের কোথায় ক্ষতি ও লোকসান হইতেছে, দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমার কারবারের শেষ পৃষ্ঠা

কোন কোন ব্যক্তি আমার কারবারের ইতিহাস জানিতে চাহিতেছেন বলিয়া আমি তাহার আলোচনা আরম্ভ করিব। আমার ব্যবসয়ের পূর্ব্বে নাম ছিল "বাঙ্গালী ভাই কারবার"; এ কারবার এ দেশেই এ দেশীয় লোক দ্বারা চালিত হইত, কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, এখন অনেক গণ্য মান্য বিজ্ঞ লোক ইহার নামকরণ করিয়াছেন "বাঙ্গালী ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কারবার।" কারবারের নূতন নামেই বুঝিতে পারিবেন যে, কারবারের বর্ত্তমানে অবস্থা কিরূপ। যদি বলেন যে Proper name has no meaning—আমি বলিব, তাই বা কেন? এই ত কত সর্ব্বনামের মানে হয়। যেমন কালকাট্টা থেকে কলিকাতা আর ঢাক থেকে ঢাকা। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশীয় যুবকবৃন্দের নামকরণের খাতা উল্টাইলেই দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গালী যে military race নয়, তাহার নামই তাহার দ্যোতক। নতুবা প্রতাপ নাম আজকাল সেকেলে হইয়াছে কেন? আর তৎস্থলে সুখেন্দুই বা কেন হইল? পঞ্জাবে শিখদের ভিতরে দেখিতে পাইবেন, রঞ্জিৎ সিং তেজ সিং ইত্যাদি নাম,—শুনিলেই মনে হয় যেন গুঁতো দিতে আসিবে। তাহলে দেখা গেল যে, নামের সঙ্গে ভাবেরও সামঞ্জস্য আছে।

পূর্ব্বে আমার এই কারবারে ৫ কোটি লোক কাজ করিত; স্ত্রী ও পুরুষ কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে কাজ ভাগ করিয়া লইত। এখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিনে কাহাকেও কোন কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার উপায় নাই—সবাই যার যার কাজ বাছিয়া লয়। যদি আমি কুমোরের ছেলেকে সূতার হইতে নিষেধ করি, আর নাপিতের ছেলেকে ধোবা হইতে, না দিই তাহলে না কি আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়, লোকে আমায় নিন্দা করে—বলে যে, লোকটী পরশ্রীকাতর। ফলে এখন ব্রাহ্মণের ছেলে হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর ব্যক্তিও ইউনিভার্সিটী, টোলের বিদ্যাবাগীশ অধ্যাপক মহাশয় পর্য্যন্ত Dyeing and cleaning house খুলিয়াছেন।

আমার কারবারে এই ভাগ-বিভাগের গণ্ডগোল হওয়াতে কাজ ভাল চলিতেছে না—এমন কি কতকগুলি কেন্দ্র আমাকে তুলিয়া দিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আমি বস্ত্রবয়ন ও সূতাকাটা বিভাগ তুলিয়া দিয়াছি। দেশের লোকের লজ্জা নিবারণের জন্য বিদেশ হইতে ৬০ কোটি টাকার কাপড় আনাইতেছি। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কৃষকদের তুলার চাষ করিতে উপদেশও দিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা না কি তুলার চাষ ভুলিয়া গিয়াছে। বাহিরে অপারগ হইয়া ঘরে ফিরিলাম—গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি সূতা কাট না কেন? তিনি বল্লেন, এই কি তুমি শিক্ষিত হয়েছ? কোথায়

আমার একটা Singr sewing machine এনে দিবে তা নয়, আমি আমি তাঁতি জোলাদের জন্য সূতা কাটতে যাব ! আর সাহস করিলাম না।

শিল্প বিভাগের বড় কর্ম্মচারীকে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কিহে বাপু তোমার বিভাগে লাভ দাঁড়াচ্ছে না কেন ?" সে বল্লে, কি করব মশায়, আমার দোষ কি ? দেখছেন না বাজারে জিনিসের কাটতি হয় না, সেটা ত আর আমার দোষ নয়। আমি জিনিস তৈরী করিতে পারি। যদি খদ্দের না হয়, আমি কি করিব। যা দেখছি—আপনার এ কারবারও চলবে না। শুনিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিয়া গেলাম। হঠাৎ স্বাস্থ্য সমাচারের এক রিপোর্টে কারণ খুঁজে পেলাম। রিপোর্টে আছে যে বাঙ্গালী মেয়েদের ভিতরে স্বাস্থ্যের অভাব দেখা দিয়াছে, তাঁদের ভিতরে ক্ষয় রোগ এসে দিন দিন তাদের শক্তি ক্ষয় কচ্ছে। তাঁরা এখন কাঁখে কলসী করে দু'পা হেঁটে জল আনতে সাতবার হাঁপান। হেঁসেলের কাযে হাঁড়ী নামাতে পা পুড়িয়ে ফেলেন, কব্জির জোর কমে যাওয়াতে দরবারী হাতা চালনা করিতে পারেন না। এখন তাঁহারা তাঁদের ভর্ত্তাদের বলছেন—

"দেখ, আমার শরীর ত খারাপ হয়েই চলেছে—আর যে ভাল হবে আশা হয় না। তুমি যদি একটু পাতলা হাঁড়ি, ঠুনকো না হয় এমন জিনিস—এনে দিতে পার আমার তাতে ভারী উপকার হয়।" বাবু অমনি বাজার ঘুরে মুর্গীহাটা থেকে রাঁধিবার উপযুক্ত একসেট এ্যালুমিনিয়মের তৈজস কিনে নিয়ে এলেন। গিন্নী ভাবলেন যে কর্ত্তা তাঁকে সত্যই আদর করেন। আর কর্ত্তাও গিন্নীর শ্রম লাঘব করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। আমি যা দেখছি, আমার বিভাগও চলবে না।

এখন আমার আড়তদারী কারবারের কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। যাঁরা আমার এ কারবারটার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে আমার আড়তের চাল খেয়েছেন এমন লোক নাই বলিতে হইবে। চাল আমি দেশের জন্য বেখে বাকী কত বিদেশে বিতরণ করেছি। এখন আমার বিদেশে দানসত্র বেড়েছে ; কিন্তু দেশে সত্রের অভাব হয়েছে। ধানের আমদানীর কমতি দেখে কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওহে, ধান দাও না কেন? সে বলে ধানে কি হবে বাবু ? ধানে লাভ কি ? শুনে আমি অবাক। বলিলাম, ওরে বাঁচবি কিসে? সে বলিল বাবু ধানে কি বাঁচি ? বাঁচি ত পয়সায়। সেই পয়সা পাটে। পয়সা যদি থাকে তবে ধানের অভাব কি? আমার আড়তদারী ব্যবসায়ে ধানের স্থানে পয়সা দেখা দিয়াছে। কৃষক যেখানে গোলাভরা ধান রাখিতে চেষ্টা করিত এখন সে সিন্দুকভরা টাকা রাখিতে ব্যস্ত। আমার ব্যবসায়ে জিনিসের স্থানে টাকা আসিয়াছে। এ সমস্যার সমাধান কোথায় ? আমার মনে হয় যে আমাদের অন্তিমকালে ধনকুবের Rothschild এর দশা হবে— Rothschild dies without food.

পল্লী-সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ

[গত ৯ই ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে পল্লী-সমস্যা সম্বন্ধে বিশ্বকবির রবীন্দ্র নাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার সেই বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু পাঠকগণকে উপহার দিলাম। সম্পাদক।]

"যে দেশের মানুষ আমরা, সে দেশকে গভীরতর করে জান্তে হলে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার মিলনসূত্র আছে, সেইটাকে নূতন করে উপলব্ধি করতে হবে।"

একদিন ছিল—এদেশে যথন জীবন প্রণালী অন্যরকম ছিল—সকলের জীবন যখন সচ্ছল ও আনন্দময়, তখন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার ভাবটী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন অতিথি এলে তাড়ান যায় না—আত্মীয় স্বজনকে বিমুখ করা যায় না—বুভুক্ষুকে বল্‌তে পারা যায় না—না তোমাকে দেব না।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন পরিবর্ত্তন হয়েছে।

আজকে সমস্ত পৃথিবীর দাবী আমাদের সামনে এসেছে। দূরদূরান্তর হতে লোক এসেছে—তাদের ঠেকান যায় না। এ শুধু যে আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য তা নয়—এ হচ্ছে যুগধর্ম্মের ফল—পৃথিবীর দাবী আমাদের মিটাইতেই হবে। তাই আজ অন্নের ভাগ বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আমাদের সভ্যতা—আত্মীয়তার সভ্যতা—কিন্তু সেটির রস শুকিয়ে যাচ্ছে—তাই ক্রমশঃ আত্মীয়তায় বাধা পড়েছে। এখন আর আমরা যেমন করে সকলকে বল্‌তে পারিনে যে, এস এস তোমরা সবাই এস—তোমাদের সেবার জন্যই আসন পাতা হয়েছে। পূর্ব্বে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কত রবাহূত, কত অনাহূত লোক আসত—সকলের জন্যই সমানভাবে মুক্তদ্বার। তখন একটী বহুবিস্তৃত পরিবারের মত সকলেই একই সুখের, একই ঐশ্বর্য্যের ভাগ পেত। আজ সে স্বচ্ছলতা না থাকলেও তাহাদের হৃদয়জাত আত্মীয়তা—সেবার ঔৎসুক্য এখনও বর্ত্তমান। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। আমার নিজের অনুষ্ঠানটিতেই আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। সেখানে ছেলেরা রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তাহা বাস্তবিক হৃদয়স্পর্শী।

আমাদের দেশের সভ্যতা আত্মীয়তামূলক সভ্যতা। আমি নিজে কলিকাতায় জন্মেছি—সেখানে দেখেছি আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল —সেখানে মিলমিশ শুধু সভা সমিতিতে, হৃদয়ের যোগাযোগ সেখানে নেই। আমি সহরে থাকি—কিন্তু সে যেন একটা কারখানা—সেখানে প্রয়োজনের জন্য আত্মীয়তা হতে পারে—কিন্তু আত্মীয়তার জন্য আত্মীয়তা শুধু গ্রামেই সম্ভব। সেই আত্মীয়তার পুনঃস্থাপনেই আবার দেশের সর্ব্বত্র জলাশয় জেগে উঠবে, ভাঙ্গা দেউল গড়ে উঠবে—আবার সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠবে— আনন্দের কল্যাণে, সখ্যে।

তাহলে আমাদিগকে পল্লীতে যেয়ে কাজ করতে হবে। এ আমি বল্‌ছি ভাবুকতায় নয়—অভিজ্ঞতায়। আমার যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র সেখানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই আছে। যেসব ছেলেরা তাদের ভিতরে গিয়ে কাজ কচ্ছে তাদের আমি ব্রতীবালক নাম দিয়েছি। তারা সবাই সমান কাজ করে। এই কেন্দ্র থেকে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সেবা পাচ্ছে। আমাদের লোকেরাই তাদের সব বিরোধ মিটান। পূর্ব্বে কত মারামারি, মাথা কাটাকাটি হত, পুলিস এসে শাসন করতে পারেনি, কিন্তু আজ তারা নিরস্ত হয়েছে কেন ? কারণ আমি তাদের নিকট কোন স্বার্থের দাবী করিনি তাই। আমি শুধু তাদের বলেছি, আমি তোমার দেশের লোক, তোমাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে ; সে অধিকার রুদ্ধ করোনা, হৃদয়ের দ্বার খোল। তোমরা সবল হও, সুস্থ হও, আমি কৃতার্থ হব। আমার আর কোন দাবী নেই, আর কোন প্রয়োজন নেই, আমি আর কিছু চাইনে। তুমি বড় হও, ভাল হও, তবেই আমার কাজ শেষ হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এতে তেত্রিশকোটী ভারতবাসীর কি হবে ? এতে কিছু হবে না। আমি বলি, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও আত্মশক্তি যদি সত্য হয়, তাতেই ভারতের সেবা হবে। প্রদীপের আলোটী ক্ষুদ্র হলেও তাতে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। অসত্য দ্বারা ভারতের কোন কাজই হবে না। গীতার উপদেশ—আমাদের শুধু কর্ম্মের অধিকার—আমরা শুধু কাজ করি, ফল পাই বা না পাই—ফলের ভার শুধু তাঁরই উপরে ন্যস্ত।

আমাদের দেশের যেখানে যে আছে, সকলের ভিতর শক্তি দিতে হবে। আমরা তা করতে পেরেছি ? আমাদের দেশের নমঃশূদ্র জাতি সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। তাহাদের কেমন করে যেতে দিলুম ? আত্মীয়তার বন্ধন নেই বলে আজ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বলছি—এস ভাই, তোমরা এস। এতে আত্মীয়তা হবে না। এতে দেশের শুধু ক্ষতিই হবে। আমাদের

দেশে শুধু ত্যাগ করে, গ্রহণ নেই—ব্যয় আছে আয় নেই। কিন্তু তাতে ত চলবে না। যারা নিকটে আছে তাদের আরও নিকটতর--যারা আপন, সেবা দ্বারা তাদের আরও ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় করতে হবে। এই হচ্ছে আমার ব্রতীবালকদের কাজ।

মানুষের দুই দিক। ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ। অর্থ প্রয়োজন—ধর্ম্ম আদর্শ।

আদর্শ এবং প্রয়োজন উভয়কেই স্বীকার করতে হবে। অর্থের সংকীর্ণ বন্ধন, ধর্ম্মের বৃহৎ বন্ধন। ভারতের ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই দরকার। আমি অর্থকে উপেক্ষা করিনি—সেবাকে সত্যে পরিণত করতে গিয়ে তাকে উপেক্ষা করতে পারিনি। আপনারা আমার কাজ যদি চোখে দেখতেন, তাহলে আজ আর আমাকে বক্তৃতা করতে হত না। যুবকগণ দেশের প্রাণ ফিরিবার প্রতি দৃষ্টি করুন। ঘরে ফিরে আসুন, দেশের মাটিকে সার্থক করুন, দেশকে সফল করুন।

পল্লীর প্রাণ সজীব শুধু অন্নবস্ত্র দ্বারা হবে না—শিক্ষার আবশ্যক। পল্লীতে প্রাণ আছে, তাকে পুষ্ট করা চাই—তাকে সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্ট করতে পারলে সমস্ত চেষ্টা সার্থক হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু তাতে দেশে যে চৈতন্য জাগল তাতে চিত্তকে উর্ব্বরা করে চারিদিকে ছাপিয়ে উঠল। তখন শুধু ধর্ম্মের নয়, চারিদিক হতেই দেশ সজীব হতে পেরেছিল। তেমন কোন সত্যকে পেলে ভারত আবার শুধু আধ্যাত্মিকতায় নয়, সমস্ত রকমে প্রাণ পাবে। ইয়োরোপে Christianityর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্যতাও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। প্রদীপ শুধু এ... কাজ করে না। প্রদীপ একবার জ্বললে তাতে অনে... কাজই হয়।

তাহা বলছি, পল্লীর বিপুল প্রাণে নব বসন্তে... সমাগম হইলে তাতে শুধু মধুকর গুঞ্জন নয়, তাতে ফুল হবে, ফল হবে। তেমনই বাংলায় বসন্ত হউক। ন... প্রাণের হিল্লোলে একবার জেগে উঠুক, সেই আনন্দে... ভিতর দিয়ে সর্ব্বকর্ম্মের জন্য দেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠুক। আমার শান্তিনিকেতনের জ্ঞান শিক্ষিতদের ... Reserved নয়, তাতে সকল দেশের সকল লোকের সমান অধিকার—সকলে তা লাভ করুক, তাতে জেগে উঠুক—এই আমার নিবেদন।

বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে উদ্যত হউক—যেখানে স... করেছে—সেখানেই সে ধন্য হয়েছে! এতে সিদ্ধিলাভ... বাক্য দ্বারা হবে না, গ্রামের ভিতর গিয়ে কাজ করতে হবে। নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হবে। স... বাধা ভুলে গিয়ে কাজে লাগতে হবে। তা'হলে ... গ্রামেই যে আলো জ্বলে উঠবে—সমস্ত দেশের লোক... তাকে দেখতে পারবে। সত্য বালকবেশে আস... ভগবানের মত; অনেক বাহু রাক্ষসের, তাই রাবণের বিংশতি বাহু ছিল, কিন্তু আমাদের ভগবানের তা দরকার হয় না। তিনি ছোট হয়ে গোপালের বেশে আমাদের প্রাণে এসে যে বাঁশী বাজান, তাতে বিশ্বাস থাকলে সবই আমরা সহজে বুঝব।

আমাদের সাধনাকে সত্য করতে হবে এই ... জানি। তাতেই দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত

(১) রোগের আশ্রয় দ্বিবিধ—শরীর ও মন। বায়ু পিত্ত ও কফ ইহারা শরীর-প্রভব দোষ। রজ ও তম ইহারা মন-প্রভব দোষ। এই দুই প্রকার দোষের অভাব হইলে আর রোগোৎপত্তি হয় না।

(২) যে স্থানে স্বাস্থ্য নাই, সে স্থানে অর্থও নাই। স্বাস্থ্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং যতক্ষণ না লোকে ইহা হইতে বঞ্চিত হয়, ততক্ষণ স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না।

(৩) শরীরকে সুস্থ রাখা এবং অকাল-মৃত্যু নিবারণ করাই স্বাস্থ্য-বিদ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়।

(৪) সাধারণতঃ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে এবং রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে হয়। বিষাদযুক্ত জীবনে রোগের আক্রমণ অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে।

(৫) পুরুষের একবিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে সর্ব্বাবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বালকের ষোড়শ ও বালিকার ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে যৌবনের সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে ১২।১৩ বৎসর বয়সেই বালকের দেহে বীর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা পূর্ণ এবং কীটযুক্ত ষোড়শবর্ষে হয়। পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীলোকের শোণিতে সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। বাল্য-মাতৃত্বের ফলে বাঙ্গালী ক্রমে বালখিল্য জাতিতে পরিণত হইতেছে।

(৬) সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক দীর্ঘজীবনী হয়। অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষের পরমায়ু বেশী হইয়া থাকে।

(৭) অতিভোজন, অতিনিদ্রা, অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা অল্পায়ুর কারণ। অবশ্য পরিমিত পানাহারের জন্যই মানুষের দীর্ঘজীবন লাভ হয়। আহারের ন্যায় বিলাসিতার বাহুল্যের জন্যও মানুষের পরমায়ু কমিয়া যায়।

(৮) যাহারা স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে বাস করে, সহরের লোকের অপেক্ষা তাহাদের পরমায়ু অন্ততঃ ষোল বৎসর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(৯) ভাল চিকিৎসক না পাইলে বিনা ঔষধে থাকা উচিত। ঔষধ যত কম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ হয়, ততই নিরাপদ। যত অধিক পরিমাণ ঔষধ ব্যবহার করিবে, শরীর তত শীঘ্রই অধিক পরিমাণে জরাগ্রস্ত হইবে।

(১০) বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল, সূর্য্যালোক ও পর্য্যাপ্ত উত্তাপ যাহা করে, লক্ষ চিকিৎসক তাহা করিতে পারে না।

মুষ্টিযোগ

(১) যাহাদের হস্ত অত্যধিক ঘামে, তাহারা গরম জলে ফিটকারি বা ভিনিগার গুলিয়া সেই জলে হস্ত ধৌত করিলে উপকৃত হইবে।

(২) কাঁচা আলু থ্যাঁৎলাইয়া দেহের পোড়া স্থানের উপর পুলটিসের ন্যায় প্রলেপ দিলে তাহাতে দাহের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া যায়। দেহের কোন স্থান কাটিয়া ছড়িয়া বা থ্যাঁৎলাইয়া গেলে মাখন ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) শরীরের বাহিরে কোন স্থানে রক্ত পড়িলে তথায় চায়ের পাতা অথবা ফিটকারি চূর্ণ দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

(৪) যাহাদের নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া রোগ আছে, তাহাদের নাসিকা দিয়া যখন রক্ত পড়িবে তখন গুঁড়া ফিটকারি নস্যের ন্যায় নাসিকায় টানিয়া লইলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

(৫) হস্তের অঙ্গুলি পুড়িয়া গেলে পোড়া যায়গার উপর যন্ত্রণা কমিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বরফ চাপিয়া রাখিলে চামড়া শুকাইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ফোস্কাও হইবে না।

(৬) সামান্য রকমের কর্ণের ভিতরের বেদনায় গরম গ্লিসারিনে তুলা ভিজাইয়া কর্ণে দিলে উপকার হয়।

(৭) তার্পিন তৈলের সহিত কিছু ময়দা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পায়ের কড়া সারিয়া যায়।

(৮) কাটা ঘায়ে আইওডিন্ দিলে ঘা আর বিষাক্ত হইতে পারে না এবং শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়।

(৯) বোলতা কামড়াইলে সেই স্থানে সামান্য তেজা তামাক দিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা কমিয়া যায়। কোন কোন স্থানে জলে নীল গুলিয়া সেই জল লাগাইলেও উপকার পাওয়া যায়। কাঁকড়া বিছার কামড়ে দষ্ট স্থানে মধুর প্রলেপ দিবা মাত্রই সকল যন্ত্রণা আরোগ্য হইয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে যক্ষ্মা রোগ।—

কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহরেই যে কেবল যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহা নহে—মধ্য প্রদেশের অনেক স্থলেই যক্ষ্মা রোগ বড় প্রবল হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এ কারণ উক্ত প্রদেশের অধিবাসীরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। মধ্য প্রদেশে যক্ষ্মা রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া রবার্টসন মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাক্তার এস, সি, রায় নাগপুর—ইতরাসি লাইনের ধারে বেতুল নামক স্থানে একটী যক্ষ্মা চিকিৎসাগার বা স্যানাটোরিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বেতুলের জলহাওয়া খুব ভাল। যক্ষ্মা রোগ যাহাতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত না হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে জন সাধারণকে যক্ষ্মারোগ নিবারণ সম্বন্ধে উপদেশ দিবারও চেষ্টা হইতেছে। কেবল মধ্য প্রদেশ কেন—ভারতে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব নাই এমন স্থান কোথায়? ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এক বা একাধিক যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসাগার স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যে সকল প্রদেশে স্যানাটোরিয়ম স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নাই কিম্বা অন্য কারণে স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করা সম্ভব নহে, সেই সকল প্রদেশের জন্য ভারতের কোন কেন্দ্রীয় স্থানে একটী নিখিল ভারতীয় যক্ষ্মাযজ্ঞাগার স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। এই সকল স্যানাটোরিয়ামে প্রধানতঃ পাস্তর সাহেবের চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। আর স্যানাটোরিয়াম কোন পর্ব্বতোপরি উচ্চ স্থানে স্থাপিত হইলে এবং সেখানকার জল হাওয়া ভাল হইলে এবং বারোমাস সূর্য্যকিরণ পাওয়া গেলে রৌদ্র চিকিৎসাই সমধিক উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

জন্ম সংরোধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।—

আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাঙ্গারের "বার্থ কণ্ট্রোল রিভিউ" বা জন্ম সংরোধ সমালোচন নামক সাময়িক পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি কৃত্রিম উপায়ে জন্ম সংরোধের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন্ম সংরোধ আন্দোলন একটা মস্ত বড় আন্দোলন। ইহার দ্বারা, স্ত্রীলোকেরা অনিচ্ছার গর্ভধারণ করিতে বাধ্য হওয়া হইতে কিম্বা অবাঞ্ছনীয় সন্তানের জননীত্ব হইতে রক্ষা পাইবে ত বটেই, তদুপরি, একদেশের অতিরিক্ত জনগণের সংখ্যা কমাইয়া শান্তি স্থাপনে সহায়তা করিবে। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপীড়িত দেশে নির্ভাবনায় অসংখ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া, তার পর তাহাদের রীতিমত প্রতিপালন করিতে না পারা একটা মস্ত বড় পাপ। ইহাতে সন্তানদের কষ্টের সীমা থাকে না, সমগ্র পরিবারেরও অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। দারিদ্র্যজনিত অসহায়তার ফলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিবারিত হয় না। লোকে স্বভাবের অনুসরণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে থাকে—তাহার অপকারিতা বুঝে না। অতএব জন্ম সংরোধ আন্দোলন আবশ্যক বটে। আমরাও জন্ম-সংরোধের বিরোধী নহি। কিন্তু জন্ম সংরোধের নামে ইয়োরোপ আমেরিকায় যে সব অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহার আমরা সমর্থন করিতে পারি না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জন্ম-সংরোধ করার চেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা আর নাই সত্য, কিন্তু রক্ত মাংসের ক্ষুধা (Biologic urge) সকলেরই আছে। সেই জন্য বহু কৃত্রিম গর্ভ-নিয়ামক যন্ত্র ও ঔষধাদির উদ্ভব হইয়াছে। এইগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া বুঁটিয়া বাছিয়া দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী উপায়-গুলি দেশহিতৈষী সুপণ্ডিত বৈদ্যগণ দ্বারা নির্ণীত হইয়া যথাসম্ভব প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের সময় পরিবর্ত্তন।—

আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের সময় দুপুর বেলা হইতে সকাল বেলায় পরিবর্ত্তন করায় বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামত লইয়াছিলেন। অধিকাংশ চিকিৎসকই সকাল বেলা স্কুল হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করায় স্কুলের কর্ত্তারা সকালে স্কুল বসাইতেছেন। সকাল বেলা স্কুল হওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশের পক্ষে খুব উপযোগী। দুপুর বেলা স্কুল কলেজ হওয়া এ দেশের লোকের আচার ব্যবহারের আদৌ উপযোগী নহে। আমাদের সনাতন প্রথা অনুসারে পাঠশালা, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষায়তনে সকাল বেলাতেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম্মও সকাল সন্ধ্যাতেই হয়। কেবল ইংরেজিওয়ালাদের কল্যাণে মাধ্যাহ্নিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ছেলেদের লেখাপড়া কিম্বা সরকারী ও বেসরকারী আপিসের কেরানী বাবুদের কাজকর্ম্ম করা এ দেশের আবহাওয়া ও দেশবাসীর আচার ব্যবহারের কোন রকমেই উপযোগী নহে এবং হইতেও পারে না। স্কুলে ও আপিসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিবার জন্য ছেলেদের ও বাবুদের অসময়ে কোন রকমে তাড়াতাড়ি অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত তরকারী নাকে মুখে গুঁজিয়া দৌড়াইতে হয়। খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণের অবসর তাহাদের হয় না, কাজেই ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ জীর্ণও হয় না। ইহার বিষময় ফলও ফলিতেছে—দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগ, অকালে দন্ত ধ্বংস প্রভৃতিও দেখা দিয়াছে। এই গ্রামপ্রধান দেশে দুপুর-বেলা কাজকর্ম্ম করা দুঃসাধ্য বলিয়া স্কুল কলেজগুলি গ্রীষ্মের দুইমাস বন্ধ রাখিতে হয়। দুর্ভাগ্য কেরাণীকুল অবশ্য এ সুবিধাটুকু পান না। ইহাতে ছাত্রদের পড়াশুনায় যে যথেষ্ট ক্ষতি হয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের মনে হয়, সকালে ও বৈকালে পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকিলে এই দুই মাস কাল লোকসান হইত না। আমরা আশা করি, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের সদ্দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে সকল স্কুল কলেজেই অনুসৃত হইবে।

কালাজ্বর কনফারেন্স।—

গত ২১শে নবেম্বর হইতে ২৪শে নবেম্বর পর্য্যন্ত যে কালাজ্বর কনফারেন্স বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট এত দিনে প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ, বাঙ্গলার বহু জেলাবোর্ড, এবং প্রায় দুইশত গ্রাম্য এণ্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটীর প্রতি-নিধিরা কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় সকল প্রধান প্রধান বক্তার বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি রিপোর্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানগুলির অধিবাসীরা এই রিপোর্ট হইতে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণের পক্ষে অনেক সহায়তা পাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।—

দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল ছাত্রগণ। তাহাদের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা দেখা দেশ-বাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, চিকিৎসকগণের দ্বারা মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আবশ্যকতা

দেশের লোকে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোকেই ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষার দাবী করিতেছেন। এ দাবী যেমন সময়োপযোগী, তেমনি সুসঙ্গত। পৃথিবীর তাবৎ সুসভ্য দেশেই আইন প্রণয়ন করিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাকা রকম বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ দেশে এখন সবেমাত্র গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ হইয়াছে—আসল পালা আরম্ভ হইতে এখনও অনেক দেরী। ছাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্বন্ধে এখন এ দেশে মাত্র লোকমত গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার ফল ফলিতে কিছু সময় লাগিবে। দেশের প্রজাবর্গের বাপ-মা আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজের ছাত্রদের পড়াশুনার বিষয়ে খুব কড়া নজর রাখিয়া থাকেন। ছেলেরা কুশিক্ষা পাইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য স্কুল ইনস্পেক্টর ও সবইনস্পেক্টর বহুকাল হইতেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। ছেলেরা পাছে যা তা বই পড়িয়া কোন রকম কুশিক্ষা পাইয়া বসে, এই আশঙ্কায় স্কুল-পাঠ্য পুস্তকগুলি সরকারের তত্ত্বাবধানে সরকারী টেক্‌ষ্ট্‌বুক কমিটির পরামর্শে সরকারী ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া হয়। কুশিক্ষা নিবারণের দিকে সরকারের ঝোঁক এত বেশী; অথচ ছাত্রদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে সরকারের এতটুকুও লক্ষ্য নাই—এ বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। ইহা অতি বিসদৃশ ব্যাপার এবং কলঙ্কের কথাও বটে। আশা করি, সরকার এ বিষয়ে অবিলম্বে কলঙ্ক-মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন।

আমাদের ছাত্রজীবন।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে ছাত্রজীবন অন্য একরকম ছিল, এখন তাহার অনেকাংশে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেকালে টোলের ও পাঠশালার ছাত্রেরা সকালে ও বৈকালে বিদ্যাভ্যাস করিত। এখনও টোল পাঠশালার ছাত্রেরা বোধ হয় তাহাই করিয়া থাকে কিন্তু যাহারা ইংরেজী লেখাপড়া করে তাহারা দুপুর বেলা স্কুল কলেজে গিয়া পড়াশুনা করে। ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য তাহাদিগকে ৯টা সাড়ে ৯টার মধ্যে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে চারিটি ভাত গুঁজিয়া বিদ্যালয়ের অভিমুখে ছুটিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে প্রায়ই রীতিমত রন্ধন হইয়া উঠে না। কোন রকমে ভাতে ভাতটা তৈয়ার হইয়া উঠে মাত্র। আবার তাহাও এমন গরম যে তাহা উদরস্থ করিতে ভোক্তাদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। আবার ঘড়ির তাড়ির দরুণ ভাত চর্ব্বণ করিয়া খাইবারও সময় পাওয়া যায় না। ফলে অজীর্ণ রোগ দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। দেশের আশা ভরসার স্থল বাঙ্গালার যুবক সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই কারণে অনেকে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন; এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সময় পরিবর্ত্তনের জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত এই আন্দোলনের সফলতা কামনা করিতেছি। ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যুগ সময় পরিবর্ত্তনের আন্দোলনটিও ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ন্যায় সকালে ও বৈকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইলে ছাত্রেরা মধ্যাহ্নে তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার ও বিশ্রামের যথেষ্ট সময় পায়। কেবল ছাত্র সমাজ কেন, বাঙ্গালী কেরাণীকুলের দুর্দ্দশা আরও আরও বেশী। তাহাদিগকে বেলা ৮টা সাড়ে ৮টার মধ্যেই কোনরকমে দুইটী ভাত মুখে দিয়া আপিস দৌড়াইতে হয়। ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের দুর্দ্দশার কথা ত লেখনীর মুখে আসেই না। এই সকল বিকৃত নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়া অতীব আবশ্যক। নতুবা বাঙ্গালী জাতিটা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বাস্থ্য-সমাচার

স্বাস্থ্য-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি।

পঞ্চদশ বর্ষ

১৩৩৩

স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত

কার্য্যালয়

৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা মাত্র